নব্যভারত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ খণ্ড—১৩০২।

কলিকাতা।

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত, ও ২১০।৪ নং
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।

ত্রয়োদশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

(১৩০২)

বিষয়।	নাম।	পৃষ্ঠা।

নাম — পৃষ্ঠা।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

ত্রয়োদশ খণ্ড—১৩০২।

নব্যভারতের যুগান্তর।

পতন ও উত্থান, প্রকৃতির নিয়ম। মানব-শিশু বহুবার ভূপতিত হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। বহুবার পাপ-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, মানব-পিতা, বিজয়ের পুণ্য ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে নিয়ম ব্যক্তি সম্বন্ধে, তাহা জাতি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বিনাশকারী, অত্যুন্নত ষষ্ঠি সহস্র বৌদ্ধ প্রচারকের শ্মশান-ভূমিতেই শঙ্কর এবং কুমারিল ভট্টের নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়-পতাকাধারী নব ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। মানব রাজা খ্রীষ্টের রক্তপাতেই প্রাচীন ইহুদি জাতি ও ধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল। চিরকালই পৃথিবীতে প্রাচীনত্বের পতন-দুর্গ ভেদ করিয়া নব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। যাহা সত্য ধর্ম্মরাজ্যে, তাহা সত্য রাজনীতিক্ষেত্রে। ইতিহাস স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে, ধর্ম্মের উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি, ধর্ম্মের পতনেই রাজ্যের পতন। বুদ্ধের অনাবিল স্বর্গীয় ধর্ম্মবলেই অশোক রাজ্যের শাসন সমস্ত জয়যুক্ত হইয়াছিল; আবার সেই ধর্ম্মবলের পতনেই বৌদ্ধ-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের তেজ ও গৌরবের দিনেই যুধিষ্ঠির, জনক, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজার প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল, সেই ধর্ম্মের মলিনতার সহিত হিন্দু-রাজ্য যবন রাজার করে কবলিত। মুসলমান ধর্ম্মের উজ্জ্বলতার দিনেই মুসলমান রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, বিধর্ম্মী আকবরও শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জক বলিয়া এদেশে পূজিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ জাতির অন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম আজকাল চরম উন্নতিতে আরূঢ় বলিয়াই ধরায় ইহার এত বিস্তৃতি ও এত সম্মান। এই ধর্ম্ম যতদিন এই জাতির চরিত্র-ভিত্তির মূলে সুদৃঢ় থাকিবে, ততদিনই ইংরাজ-রাজ্য পৃথিবীতে অটল ও অচল। দৃষ্টান্তের বাহুল্য প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম পতনে রোমের পতন হইয়াছিল, আবার ম্যাট্‌সিনির পুণ্য-প্রভাবে ও ধর্ম্ম গৌরবে রোম স্বাধীনতার স্বর্গীয় প্রভায় আজ প্রদীপ্ত। চীনের পতনে বর্ত্তমান সময়ে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পতনেরই আভাস পাইতেছি; এবং জাপানের বিজয় উন্নতিতে পুণ্য প্রভারই পরিচয়। জাতির উন্নতি অবনতিতে ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির পূর্ণতার প্রকাশ। নব্যভারত এই সাধারণ নিয়মের অতীত কি?

কে বড়, কে ছোট? আমাদিগকে কেহ যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এক কথায় বলি, যে ব্যক্তি আপন বিশেষত্ব-পূর্ণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে অটল, যে ব্যক্তি পাপ সংগ্রামে জয়ী, তিনিই বড়; আর যে ব্যক্তি

পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় চালনায় বাতিব্যস্ত, বিলাসের দাস, কাম ক্রোধের অধীন, ঐশ্বর্য্যে ও পাণ্ডিত্যে ভূষিত হইলেও তিনি পশ্বপেক্ষা নীচ। ধর্ম্মে ও চরিত্রে এ জগতে শ্রেষ্ঠ, রাজার রাজা বুদ্ধ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য ও কনফিউসস্। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ, ম্যাট্‌সিনি, পার্কার, ব্রাইট ও গ্লাডষ্টোন, আমাদের দেশে রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ। • যুগ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও চিরদিন জগতে সমভাবে আদৃত হন নাই, সমভাবে পূজা পান নাই। পতন ও উত্থান, ইঁহাদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। যদি এই পতন উত্থানের ক্রম-বিকাশ আমরা জাতি পরম্পরা, দেশ পরম্পরায় নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া থাকি, তবে ইতিহাস পাঠ বৃথা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে কখনও ধর্ম্ম ম্লান হয়, কখনও উজ্জ্বল হয়, জাতির জীবনেও কখন ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। যে ব্যক্তি যখন ধর্ম্মে ও চরিত্রে উজ্জ্বল, সেই ব্যক্তিই তখন শ্রেষ্ঠ; যে জাতি যখন ধর্ম্মে উজ্জ্বল, সেই জাতিই তখন শ্রেষ্ঠ। সম্বৎসর ও যুগ পরম্পরায় ব্যক্তিগত ধর্ম্মের পতন ও উত্থান হইতেছে, জাতিগত ধর্ম্মেরও পতন উত্থান হইতেছে। আর্য্যের গৌরব, ধর্ম্ম গৌরবের পরিণতি,—ধর্ম্মের পতনের সহিত তাহা বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। জোর করিয়া, ঢাক বাজাইয়া যদি ঘোষণা করি, আজও আর্য্যই শ্রেষ্ঠ, সে কথায় পৃথিবীর কোন মহীয়ান্ ব্যক্তিই সায় দিবে না। যাহা নাই, যাহা ডুবিয়াছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কে শুনিবে? কালসহকারে অত্যুন্নত আর্য্যভূমি প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে:—আর্য্য জাতি পুণ্য-প্রভাব-বর্জ্জিত যখন, তখন আর ইহাকে বড় বলিলে, পৃথিবীর লোক শুনিবে কেন? তোমার মুখ তাই তাহাতে প্রকাশ পাইবে। যাহা ডুবিয়াছে, তাহা কি আবার উঠিবে না? উঠিবে, উঠাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কি ভাবে, কি প্রভাবে উঠিবে, বিধাতাই জানেন।

যে ঘটনায় ইংরাজ জাতি এ দেশে জয়ী, সে ঘটনাকে প্রবঞ্চকের ক্ষণক্রীড়া বলিয়া উপেক্ষা করি, কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার করি, ভারতে ইংরাজ-আগমন, ভারতের নবজীবনের কারণ। বহুদিন, বহুযুগ, বহু শতাব্দী গত হয় নাই, ইংরাজ এদেশে আগমন করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই বিপর্য্যয়, ধ্বংস, আন্দোলন যথেষ্ট হইয়াছে। যে জাতি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, সে জাতিরও একটু একটু সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে। সহস্র কণ্ঠে বলিব, ইংরাজ-শাসন প্রদীপ্ত না হইলে, মুসলমান-শাসনের কঠোরতায় এদেশ চিরকালের জন্য চূর্ণিত। ব্যক্তিগত উন্নতি অবনতির কথা এ স্থলে বলিতেছি না,—কোন লোক বড় পদ পাইয়া সে সময়ে সম্মানিত হইলেও হইতে পারিতেন; কিন্তু সমগ্র ভারতীয় জাতির ধ্বংস, দেশ-ধ্বংসের আর কিছু বাকী থাকিত না। বাকী ছিলই বা কি? মাতৃ-জাতি, আর্য্যজাতির চিরপূজ্য; মুসলমান শাসনে সেই মাতৃজাতি বিলাসের সহচরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। আজও এ দেশের লোক, রমণীজাতিকে তেমন সম্মান ও পবিত্রতার চক্ষে দেখিতে পারে না! তাঁহাদিগকে অবরোধ-নিগড়ে, বৈষম্য-কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াও সন্দেহের হস্ত হইতে পুরুষজাতি রক্ষা পায় নাই—তার উপরও পদাঘাত, নির্য্যাতন, কুটিল দৃষ্টি। এই মাতৃজাতির নির্য্যাতন, আর্য্যভূমিতে, সীতা সাবিত্রীর সময়ে, ক্ষণা লীলাবতীর সময়ে, মহীয়ান্ পুণ্যযুগে ছিল না। যে দেশের শাস্ত্র কীর্ত্তন করে, নারী জাতির পূজা ভিন্ন দেব-

তারা প্রসন্ন হন না, সে দেশে নারীকে এমন হীনাবস্থায় কে আনয়ন করিল? যে দেশে নারী ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, রাজ্য শাসন হয় না, সেই দেশে নারীকে ঘৃণার সামগ্রী কে করিল? বলিবই, মুসলমান শাসন, এ দেশের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের যে দেশে মুসলমানগণের যে পরিমাণে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে, সেই দেশে সেই পরিমাণে নারীর দুর্দ্দশা হইয়াছে! স্ত্রী-শিক্ষা ডুবিয়াছিল, স্ত্রী-স্বাধীনতা ডুবিয়াছিল, স্ত্রী-অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, পূজ্যা মাতৃজাতির ছিল কি? এখনই বা আছে কি? বিধি ব্যবস্থা সকলই রমণীর এক প্রকার, পুরুষের অন্য প্রকার;—রমণী এক বার পতিতা হইলেই চির-পতিতা, পুরুষ শত বার পতিত হইয়াও সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তা! রমণী অতি বাল্যকালে পতি হারাইলেও ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরুষ আমরণ পত্নী-বিয়োগে কেবল পত্নীগ্রহণই করিতে থাকিবেন!! এ সকল বিসম্বাদী চিত্র, সহধর্ম্মিণী বলিয়া যে দেশে নারী কীর্ত্তিতা ছিলেন, সে দেশে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল? মুসলমাননীতি, শ্লথ-আর্য্যনীতিকে পরাজয় করিয়া, এস্থলে যোগ্যতমের অধিষ্ঠানের (Survival of the fittest) চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। মুসলমান শাসনে আর্য্যজাতির আর্য্যত্ব ডুবিয়াছে—ধর্ম্ম ডুবিয়াছে,—পুণ্য পবিত্রতা ডুবিয়াছে,—সাধন ভজন বিশ্বাস ভক্তি সবই ডুবিয়াছে। মরণের চির অন্ধকারময় তীরে আর্য্যত্বের সমাধি হইতেছিল যখন, এমন সময়ে ইংরাজ এদেশের ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। পলাসি সমরের অস্তমিত সূর্য্য আবার নবতেজে উদিতহইলেন। প্রখর জ্যোতিতে, মরণের তীরে শায়িত নর-নারী আবার নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। পাখী সুপ্রভাতে সুস্বরে আবার ডাকিল, ফুল ফুটিয়া সৌরভ ছড়াইল, আর্য্যভূমিতে সুবায়ু বহিল। মরা মানুষের শরীরে একটু একটু জীবন সঞ্চার হইল।

মরা মানুষের জীবন সঞ্চার হইলে যাহা হয়, ইংরাজীশিক্ষার প্রথম যুগে এদেশে তাহাই হইল। অনুকরণের একটা প্রকাণ্ড হই-চই পড়িয়া গেল, দলে দলে লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল, ধুতি চাদর ছাড়িয়া হ্যাটকোট ধরিল; আহার বিহারের কথা আর কি বলিব, মদ্য মাংস প্রচুর পরিমাণে সমাজে চলিতে লাগিল। ইংরাজের রমণীপূজা বা মাতৃপূজা, ধর্ম্মভাব বা চরিত্রবল, ধৈর্য্য বা অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতা বা তিতিক্ষা, স্বাধীনতা বা শ্রমশীলতা—এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না; কেবল কু-অনুকরণের দিকে এ জাতির অবিরাম গতি চলিল। ইংরাজিশিক্ষা এ দেশের প্রাচীন কুসংস্কার-ধ্বংস করিয়া আপন বিজয় নিশান আকাশে তুলিল। মহামতি রামমোহন রায় এই কু-অনুকরণ-প্রিয়তার প্রতিরোধের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। দলে দলে লোক জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া খ্রীষ্টান হইতেছিল, তিনিই এ গতি ফিরাইলেন। জাতীয় ভাষা বলিয়া একটা ভাষা ছিল না, বাঙ্গলা গদ্য লেখার প্রথা ছিল না, তিনিই প্রথম গদ্য প্রচার করিয়া জাতীয় ভাষার সূত্রপাত করিলেন। সতীদাহ নিবারণ করিয়া মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি যে বর্ত্তমান আন্দোলনের সর্ব্ব প্রধান অধিনায়ক, এ কথা ঘোরতর শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন, তাঁহারই চেষ্টার ফল। সমাজ-সংস্কার তাঁহারই প্রখর-বুদ্ধির প্রবর্ত্তিত কার্য্য। তাঁহার পর আসিলেন, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর। ধ্বংস কার্য্যের স্থানে প্রতিষ্ঠান

কার্য্য করিতে এবং রমণী সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিতে এই মহাত্মারাও সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। অসঙ্কোচে বলিতেই হইবে, ইঁহাদের চেষ্টাতেই ভারতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা হইল। অনুকূল অবস্থায়, যথা সময়ে, মহামতি রিপণ, এই যুগের প্রধান পুরোহিতরূপে ভারতে আসিলেন। এই সময়ে আমরা, বহুজনের ঠাট্টা বিদ্রূপ মস্তকে করিয়া, ভারতকে নব্যভারত-নামে অভিহিত করিলাম। সুখের বিষয়, অধিক দিন আমাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইল না; রিপণ-আগমনের অল্পকাল পরেই কটন সাহেব (New India) নামক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। নবযুগের নব্যভারত নাম অক্ষয় হইল। ১২৯০ সালের সেই প্রথম দিন, আর আজ এই ১৩০২ সালের প্রারম্ভ। চক্ষের সমক্ষে বারবৎসরের ঘটনারাশি ভাসিতেছে। এই বারবৎসর নব্যভারতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সকলেই জানেন, বুঝিতেছেন। এ দেশের অলিখিত জাতীয় ইতিহাস কখনও লিখিত হইলে, সকল জাতি এই যুগকে পতিত ভারতের উত্থানের পূর্ব্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিবেন। সংক্ষেপে এই যুগের সকল কথা ব্যাখ্যাত হইবার নয়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। তাহা প্রীতিকরও নহে, পরাধীন জাতির পক্ষে তাহা সহজও নহে। জাতীয় উন্নতি অবনতিই আমাদের লক্ষ্য। কিরূপে ভারতে একজাতিত্বের অভ্যুদয় হইবে, তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়।

এই যুগে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা দেশ শাসন না করিলে, দেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে, দেশের উন্নতি অসম্ভব। স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনে এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। দলে দলে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও অকাতরে পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন,—নির্ভীকতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান-নেসন-প্রমুখ দল যত অভাব বা দোষ ত্রুটির কথাই বলুন না কেন,* স্বায়ত্ত-শাসনের বার বৎসরের ইতিহাস যে আশাপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি সমূহের কার্য্যকলাপ-সমালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টও এখন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। একদিনেই কোন লোক বড় হয় নাই, এক যুগেই কোন জাতি উন্নতির উচ্চ শেখরে উঠে নাই। নির্ব্বাচন প্রথার দোষ আছে, স্বীকার করি। কিন্তু এই উপায় ভিন্ন জাতির উত্থানের অন্য পথ নাই। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যেকের হাতেই কাজের ভার দিতে হইবে। একজনকে কর্তৃত্ব দিলে, সে শিক্ষা হয় না। সকলের শক্তির বিকাশ ভিন্ন—জাতির উন্নতি অসম্ভব। হাতে ধরিয়া শিশুদিগকে যেরূপ "ক খ" শিখাইতে হয়, গবর্ণমেণ্ট জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির ভার দেশীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, সেইরূপ, সকলকে রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের "ক খ" শিখাইতেছেন। কালে ইহাতে যে কি সুফল প্রসব করিবে, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমান করিতে সক্ষম। অল্প পরিমাণে ভারতের ব্যবস্থাপক সভায়, বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ নির্ভীক ব্যবস্থাপকের অভ্যুদয় দেখিয়া এই যুগে আমরা পরম আনন্দিত হইতেছি।

এই যুগের দ্বিতীয় শিক্ষা—জাতীয় মহাসমিতি। সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস, এ দেশের আত্মীয়তা-বর্দ্ধন ও সম্মিলনের আদি কারণ। বহুকাল পূর্ব্বে "সোপানে" লিখিয়াছিলাম, অত্যা-

* See Indian Nation, April 15, 1895.

চার ভিন্ন কোন জাতি জাগে না। ম্যাট্‌সিনির কারাবাস ভিন্ন ইতালী স্বাধীনতার মুখ দেখিত না, রবার্ট এমেটের ন্যায় শত শত বীর্য্যবন্ত বীরের রক্তপাত না হইলে, আজ আইরিস জাতি স্বায়ত্ত-শাসন-আইনের (Home-rule) অধিকারী বলিয়া মহামতি গ্লাডষ্টোনের নিকট প্রতিপন্ন হইত না। এদেশে সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের এক বিষম অঙ্ক। নরিশের নিন্দা করি না, কেন না, তিনিই প্রকারান্তরে এই কার্য্যের বা পবিত্র ভারত-সম্মিলনের প্রধান অধিনায়ক। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের পর হইতে একতার দিকে ভারতীয় জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই একতার পথে অগ্রসর হওয়ায় ইংরাজ-অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ইংরাজ-মনে অবিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মিতেছে। অন্যদিকে এই অত্যাচার অবিশ্বাস-অঙ্কুর হইতেই আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের কারণ সকল জন্মিতেছে। সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস হইতে এ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ কত যে বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে পর্য্যন্ত উৎসাহ-ইন্ধন দিতেছেন। ক্ষতি, রক্তপাত, স্বার্থত্যাগ, কাজেই ভারতের অনেক সহ্য করিতে হইতেছে। এইরূপ সহ্য করিতে করিতেই পতিত জাতির অভ্যুত্থান হয়। ছেলে বারম্বার আছাড় খাইয়াই দাঁড়াইতে শিখে। প্রথম ক্ষতি, প্রথম জীবনত্যাগ, প্রথম স্বার্থত্যাগ, প্রথম আত্মত্যাগ—তার পর জাতীয় উন্নতি; ইহাই জগতের চিরন্তন প্রথা। দেশোন্নতির মহাযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য, ভারতের বহু সুসন্তান, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, ইহা স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত। মহাযজ্ঞের আহুতিতে অনেকে সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতেছেন। জীবন বিসর্জ্জন আরো সময় সাপেক্ষ। অনেক ব্যক্তি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। জাতীয় সমিতির প্রস্তাব সকলের (Resolutions) কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না; সে সকল গবর্ণমেণ্টের নিকট উপেক্ষিত হইতেছে, আমাদের মতে তাহা ভালই; কেন না, তাহাতেই জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। অত্যাচার, অত্যাচার, অবিচার, অবিচার, আমরা কেবল ইহাই চাই। এইখানেই ভারতের বহুজাতির সম্মিলন সম্ভব। এইখানেই ভারতের অসংখ্য জাতির একত্ব সম্ভব। এইখানেই চিরপূজ্য স্বাধীনতা সম্ভব। পাড়ায় আগুন লাগিলে, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া, জাতি মান ভুলিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণে সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতে যখন অত্যাচারের মহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, তখনই, কেবল তখনই ভারতের একতা সম্ভব। তখনই সকল লোক, জাতি মান ভুলিয়া একস্থানে মিলিবে। জাতীয় মহাসমিতির কল্যাণে সেই অত্যাচার দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে; কি শুভক্ষণে জানি না, ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞেরা অন্ধ কুহকে পড়িয়া, জাতীয় উন্নতির মূল নীতি ভুলিয়া, অত্যাচারের দ্বার দিন দিন আরো উন্মুক্ত করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায়, এ দেশের ভাবী উন্নতির বীজ নিহিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও দরিদ্রদের প্রতি এই মহা সভার সহানুভূতি জন্মিতেছে না। জাতিভেদের শেষ অঙ্কুর উৎপাটিত করিয়া, আমরা সকলে ভাই, ভল্টেয়ার, রসো ও বুদ্ধের ন্যায় এই সাম্য নীতি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখনও উন্নত হয় নাই। এদেশের জনসাধারণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারে আজিও নিমজ্জিত; এই জনসাধারণের উন্নতি ভিন্ন এদেশের

উদ্ধার নাই। সাম্যানলে আভিজাত্য ভাবপোড়াইয়া,এদেশের অসংখ্য দরিদ্রের জীবন গঠন করিতে হইবে। জীবন দিলে তবে জীবনের অভ্যুদয় হয়! জাতীয় মহাসমিতি কবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন! জাতীয় মহাসমিতি হইতে ভারতের জাতিভেদের শেষ অঙ্কুর যে দিন উৎপাটিত হইবে, এবং চরিত্র ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া,এদেশের প্রবীণগণ,যখন নিম্নশ্রেণীর উদ্ধারের জন্য ও স্বার্থ রক্ষার জন্য, জীবন, প্রাণ, অর্থ সামর্থ্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিবেন,সেই দিন মহাত্মা হিউম ও নারোজির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং ভারত পৃথিবীর উন্নত জাতি সমূহের মধ্যে সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। পূর্ব্বে এদেশে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষীর তালিকা একরূপ প্রায় শূন্য ছিল, কিন্তু জাতীয় মহাসমিতির এই কয়বৎসরের ইতিহাসে বহু কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশহিতৈষী বীরের অভ্যুত্থান হইয়াছে,দেখিতেছি। নারোজি,মেটা,বানর্জি,অযোধ্যানাথ, সুরেন্দ্রনাথ এখন এদেশের প্রকৃত সুসন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। উন্নতি-যুগের ইহা যে একটু পূর্ব্বাভাস, তাহাতে সন্দেহ কি ?

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের পর জাতীয় মহাসমিতির উত্থান; আর কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর এদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান! কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা এবং হিন্দু রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন, হিন্দুদেব দেবীর আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁহা কর্তৃক প্রথম সূচিত। তাঁহার তিরোধানের পর, সেই আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লইয়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শশধর প্রভৃতি অবতীর্ণ হইলেন। উদ্গার ভক্ষণে এদেশের নরনারী চিরাভ্যস্ত, বিশেষত, অনুকরণের যুগে। কেশবচন্দ্রের,মৌলিক তত্ত্ব লইয়া,পুনরুত্থানের যুগে, কত কত তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর লোক যশ ও অর্থাগমের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন, কে সংখ্যা করিতে পারে? যত ছিল নাড়া-বুনে, সব হলো কীর্ত্তুনে। চতুর্দ্দিকে বক্তার দল গজাইয়া উঠিল, বঙ্গে একটা বিষম কোলাহল উঠিল। অধিকারী ভেদে উপদেশ প্রদানের শাস্ত্রীয় উপদেশটা গঙ্গায় ভাসাইয়া, রামু, শ্যামু, চামু আসরে নামিলেন। কবি ও তর্জ্জার লড়াই,গালাগালি, সময় বুঝিয়া, সভামণ্ডপে আশ্রয় লইল। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ভারত অনৈক্যজালে জড়িত; সেই ভেদবুদ্ধির অভ্যুদয়ে, আবার ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, প্রতিভাশালী ব্যক্তি, শীঘ্রই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের কুহক বুঝিতে পারিলেন; তাঁহারা অল্পে অল্পে এই দল হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শশধর প্রমুখদল বেশ দশদিন যশ মান ও তৎসঙ্গে অর্থ রোজগারের পথ পাইলেন। স্বার্থ লইয়া ধর্ম্ম সংস্কার করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইল, অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহাদের প্রতিপত্তি কমিয়া আসিল। এখন তাঁহারা কোন্ অন্ধকারকে আলোকিত করিতেছেন, কেহ জানে না। মধ্য হইতে সাধু ও ভক্তচূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসের দল জাঁকিয়া উঠিল। কিছু দিন হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের স্রোত এতই প্রবল হইয়াছিল যে, কতিপয় সংবাদপত্রে ধর্ম্মপ্রচার, নাটকে থিয়েটারে ধর্ম্ম প্রচার, উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার, বক্তৃতায় ধর্ম্ম প্রচার—চতুর্দ্দিকে হরিসভা, ধর্ম্ম সভা। বোধ হইতেছিল, যেন এটা প্রকৃত ধর্ম্মের যুগ। ধর্ম্মোন্নতিতে কাহার না আনন্দ হয়? ধর্ম্ম ভিন্ন যখন জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব,

তখন এ যুগের ধর্ম্মান্দোলনের কেন নিন্দা করিতেছি? আমরা কোন দিন মতের ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহি, চিরদিন জীবন্ত ধর্ম্মের পক্ষপাতী। ধর্ম্ম যখন জীবনগত হয়, তখনই জীবন্ত; ধর্ম্ম যখন কথা ও বক্তৃতায়, তখনই মৃত বা সাম্প্রদায়িক। ধর্ম্মের উন্নতিতে আনন্দিত আমরা তখনই, যখন দেখি, মানুষ হুজুগ ছাড়িয়া, নির্ব্বাক হইয়া, চরিত্রের ভিত্তিতে দিন দিন অটল হইতেছে। তুমি বারমাসে তের পার্ব্বণ কর, গির্জ্জায় যাও, নমাজ পড়, ব্রহ্মোপাসনা কর, বা গৈরিকে ভূষিত হইয়া নিরামিষ ভোজন-রত হইয়া যোগসাধন কর, যত দিন তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা না দেখিব, ততদিন তোমার ধর্ম্মলাভ হইতেছে, কখনও মনে করিব না; হুজুগপ্রিয় দেশে কেবল বাহ্য হুজুগ লইয়া মরিতেছ, মনে করিব। নীতি সাধনের বিষয়, রিপু সংযমের অধীন, ধর্ম্ম বিধাতার কৃপার দান। নীতি অর্জ্জন কর, রিপুদিগকে সংযত কর, বিধাতা বিশ্বাস ভক্তিতে তোমাকে উজ্জ্বল করিবেন। মানুষের সাধ্য নাই, কাহাকে ধর্ম্ম দিতে পারে, চরিত্রে অটল করিতে পারে। মানুষ, মানুষকে যোগ শিক্ষা দিতে পারে, মন্ত্র দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম ও চরিত্র লাভ, নিজ চেষ্টা ও ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন হয় না। মানুষ, দেখিতেছি, কখনও নিরামিষ খাইতেছে, কখনও গৈরিক পরিতেছে, কখনও শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তোতাপাখীর ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে; কিন্তু সত্য সকল জীবনগত করিতে, ব্রত সকল পালন করিতে, অতি অল্পকেই সচেষ্টিত দেখিতেছি। তুমি বলিতেছ, হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "পুনরুত্থানের অর্থ কি? হিন্দুধর্ম্ম গিয়াছে ত গিয়াছে, আর উত্থিত হইবে না; থাকে ত আছেই, আবার উত্থান কি?" তুমি বলিতেছ, হিন্দুধর্ম্ম জাগিতেছে? জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুধর্ম্ম ডুবিয়াছিল স্বীকার কর কি? যদি কর, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, এখনও ডুবিয়া রহিয়াছে! এই যুগের ঘোর আন্দোলনে, কই, এদেশের কয়টা লোক প্রকৃত চরিত্রবান হইয়াছে? ধর্ম্মনিষ্ঠা, কই, কয়জনের বাড়িয়াছে? রমণীজাতির প্রতি সম্মান করিতে কই এদেশের পুরুষেরা শিখিয়াছে? মিথ্যা-আচরণ, পর-নিন্দা, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, ব্যভিচার, কই এ দেশের লোকেরা ভুলিতে পারিয়াছে? জাল, জুয়াচুরি, হিংসা বিদ্বেষ যে দেশের ঘরে ঘরে বিচরণ করিয়া আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে, ধর্ম্মের প্রকৃত উত্থান সে দেশে হইতেছে, মনে করি না। একজন লোক একসময়ে লিখিয়াছিলেন, "এ দেশের বড় বড় লোকের মাথার মূল্য ৫৲"—অর্থাৎ এদেশের বড় বড় লোকও ৫৲ টাকা উৎকোচের বশ। কথাটা এতদূর সত্য না হইলেও, প্রতারণা, মিথ্যার রাজত্ব যে অব্যাহত প্রভাবে চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিয়াছি, ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে মানুষ চরিত্রের দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়; দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ দেশে সে লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। যে ভেদবোধের অঙ্কুর ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যে আভিজাত্য ভাব এদেশের নিম্নশ্রেণীকে উন্নতি-সমুদ্রের পর পারে রাখিয়াছে, দেখিতেছি, বুঝিতেছি, জাগিতেছে এদেশে, সেই ভেদবোধ, সেই সর্ব্বনেশে আভিজাত্য ভাব। কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, সর্ব্বত্র বংশমর্য্যাদা, জাতিভেদ ষোলআনা দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য, জাতি বিশেষের প্রাধান্য স্থাপনের

জন্যই যেন সর্ব্বত্র আয়োজন হইতেছে; সব মানুষ ঈশ্বরের, আপন আপন বিশেষত্বে মানব-সাধারণ সকলেই বড়, এ সকল শিক্ষা কল্পনার রাজ্যে দিন দিন আশ্রয় লইতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পুনরুত্থিত হইতেছে, কেমনে বলিব? এদেশের ধর্ম্মজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান এত নির্ব্বাণ হইয়াছে যে, বিবি বেসান্তকে লইয়াই মহা আনন্দের রোল চলিয়াছে, ধারণা নাই যে, শাস্ত্র স্পষ্ট নিষেধ করে, ম্লেচ্ছের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে নাই। শশধর গেলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গেলেন, শেষে পুনরুত্থানের আসর রাখিবেন, বিবি বেসান্ত!! ইহা উত্থান না পতন, বিধাতাই জানেন।

তবে পুনরুত্থানের হুজুগের মধ্যে শুভলক্ষণ কি একেবারেই নাই? আছে। এমন দিন ছিল, যে দিন, এ দেশের লোক ধর্ম্মের নামে মহা বিরক্ত হইত। ছেলে বদ্‌মায়েস হউক, দুষ্ট হউক, ক্ষতি নাই, ছেলে ধার্ম্মিক হইলেই বিপদ। কিছুদিন এই ভাব চলিয়াছিল। সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিলে কান্না পায়। জাতীয় ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং ধর্ম্মের প্রতি গভীর উদাসীনতা, সেই সময়ের প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। জাতীয় ভাষায় কথা বলিলেও লোকেরা ঘৃণা করিত, ধর্ম্ম সমাজে গেলে বা ধর্ম্মের কথা বলিলেই লোকেরা উপহাস করিত। এই অবস্থা, এই যুগে কতক তিরোহিত হইয়াছে। পরম সৌভাগ্যের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে এই মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব। এই বারবৎসরে এ কথা এ দেশে যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, এই কারণে, তাঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ধর্ম্ম-কথা বলিলে এখন আর লোক পূর্ব্বের ন্যায় উপহাস করে না। ধর্ম্মকথা শুনিলে এখন আর লোকেরা তত ঘৃণা করে না। ইহাই শুভলক্ষণ। ধর্ম্ম কথা বলিতে বলিতে, ধর্ম্ম কথা শুনিতে শুনিতে—কালে ধর্ম্মগত জীবন লাভ হইবে, আশা করি। আশা করি, নব্যভারতের আদি যুগে যে ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, কালে ইহার বাহিরের আড়ম্বর-জঞ্জাল বিদূরিত হইলে, চরিত্র ও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আরো শুভলক্ষণ আছে। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, নীতি রীতির প্রতি যে এদেশবাসীর প্রগাঢ় তন্ময়ত্ব জন্মিয়াছিল, তাহা এই যুগে কতক তিরোহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সকলই ভাল, পূর্ব্ব শিক্ষিত লোকের এই ধারণা ছিল, এখন প্রতীচ্য সকলই ভাল, এই ধারণা হইয়াছে। দেশীয় রীতি নীতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বাড়িয়াছে। "বঙ্গবাসী' এ স্থানে প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ভিন্ন, এই পতিত জাতির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ের এক দেশদর্শী এই ভাববিপর্য্যয়ের পর যে সমন্বয়ের যুগ আগমন করিবে, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইংরাজ জাতি যতদিন এদেশে আছেন, ইংরাজি শিক্ষা ততদিন এদেশে প্রচলিত হইবেই হইবে; ইংরাজি-শিক্ষা-বিস্তারের সহিত প্রতীচ্য দর্শনকাব্যের প্রতি যখন এদেশের অনুরাগ জন্মিবে, তখনই সমন্বয়ের যুগ আসিবে। এই সমন্বয়ের পূর্ব্বাভাস কতক পরিমাণে পাওয়াও গিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের লোক কেবল ব্রাহ্মণের নিকটই ধর্ম্ম কথা শুনিত। বেদে অন্যজাতির অধিকার নাই, এই শিক্ষা বদ্ধমূল ছিল। এই সমালোচ্য যুগে মহামতি রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন,

শাস্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে। কোন কোন লোক ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবি বেসান্তের ধর্ম্মপ্রচারে ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় কই, আর কাহাকেও বিশেষ আন্দোলন করিতে দেখিতেছি না। ইহা সমন্বয়-যুগ আগমনের যে পূর্ব্বাভাস, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন দলে দলে লোকেরা হিন্দু রীতি নীতির অনুসরণ করিতেছে—বহু শিক্ষিত লোক গুরুর নিকট দীক্ষা লইতেছেন, শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রাধ্যয়ন বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। এক ভগবদ্গীতার বহুসংস্করণ এই বারবৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, ভাগবত, সংহিতা, দর্শন—সকল শাস্ত্রেরই বহুল প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। দেশীয় শাস্ত্র পাঠের ইচ্ছা, জাতিনির্ব্বিশেষে,সকলের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও শাস্ত্রে অধিকার নাই, এই প্রাচীন প্রবাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। অনেকেই শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে, আর একটী শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলাভাষার ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে। এই বারবৎসরের মধ্যে,গীতা সংহিতা, বেদ বেদান্ত, দর্শন কাব্য প্রভৃতির বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলাভাষা দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। মহাত্মা শিশিরকুমার প্রভৃতি ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদকগণও আজ বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিবিধ শাস্ত্র তন্ত্র অনুবাদ হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এক সময়ে বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, যে কারণেই হউক, আজ তাঁহারাও বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এদেশের নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা, এই বারবৎসরে সকলই ধর্ম্মমূলক নীতিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম, জীবনগত, বদ্ধমূল বা চরিত্রগত হওয়ার জন্য, এইরূপ জাতীয় ভাষায় পুস্তকগত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। এদেশে এ যুগে তাহা প্রভূত পরিমাণে হইয়াছে। ধন্য রমেশ চন্দ্র, তিনিই এ পথের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক। পূর্ব্বে এদেশে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কেবল অক্ষয়কুমার এবং দ্বিজেন্দ্র নাথ। এ যুগে, ধর্ম্মগ্রন্থ-লেখক, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ভূদেব, শশধর, শিশির কুমার, জগদীশ্বর, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, গৌর-গোবিন্দ, গিরীশচন্দ্র, যোগেন্দ্র নাথ, নবীন চন্দ্র, কত কত মহারথী। নিমেষে যেন এ যুগের সকল গ্রন্থকারের লেখনী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা যে এদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া আশা হয়, নব্যভারতের দ্বিতীয় যুগে, এই দৃষ্টান্তে আরও কত ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইবে।

আধ্যাত্মিক বিভাগে বঙ্গপ্রদেশ ভারতের শীর্ষস্থানে, কার্য্যবিভাগে বোম্বে ভারতের গৌরব। পার্সিজাতির অভ্যুদয় ভারতের যে পরম সৌভাগ্যের সোপান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভারতমাতার দুই পুত্র,—বঙ্গ ও বোম্বে। এই দুয়ের মস্তকে সমস্ত আশা ভরসা বিন্যস্ত;—এক জন ধর্ম্মোন্নতি,নৈতিক উন্নতি লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে মাতোয়ারা, আর এক জন,সংসারের উন্নতি,প্রাকৃতিক বিজ্ঞান লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বার বৎসর ইহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক জন মস্তক, আর এক জন যেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি। বুদ্ধিতে বিদ্যাতে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্যে অধ্যবসায়ে ও সাংসারিক উন্নতিতে বোম্বাইবাসী শ্রেষ্ঠ। বোম্বে যখন কলকারখানায় ছাইয়া ফেলি-

য়াছে, বাঙ্গলা তখন এ সম্বন্ধে উদাসীনতার সুষুপ্তিতে ধ্যান-মগ্ন। যোগ-তপস্যা লইয়া থাকিতেই যেন বাঙ্গালী ভালবাসে। সংসারের উন্নতি, বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার উৎকর্ষ সাধন করা আদর্শ পার্সির নিত্যব্রত। দুয়ের সমন্বয় ভিন্ন ভারতের মঙ্গল নাই। এই যুগে উভয় দেশেই সেই সমন্বয়ের কতক সূত্রপাত হইয়াছে। বোম্বাই বাসী নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমাজ-সংস্কারে এখন একটু একটু মন দিতেছেন। বহুপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন বোম্বে মান্দ্রাজে সেই আন্দোলন চলিয়াছে। বোম্বের মালাবারি, বঙ্গের বিদ্যাসাগরের স্থান এই যুগে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর বঙ্গ প্রদেশ এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। বেঙ্গল-প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ইহার প্রধান উদাহরণ। কাচের কারখানা, ম্যাচের কারখানা, পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার প্রভৃতির কথাও আভাস দিতেছে, বঙ্গের বায়ু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জানি, এখনও বঙ্গের ধনিগণ কোম্পানির কাগজের মায়ায়, কোম্পানির কাগজের ছায়ায় নিদ্রিত; কিন্তু আশা হইতেছে, এই যুগে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দৃষ্টান্তে আর এক যুগে তাহার সুফল ফলিবে। অর্থাৎ বাঙ্গলা বোম্বের ভাবে আরও অনুপ্রাণিত হইবে। তখনই পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্যক্ সুফল ফলিবে। এই সমন্বয়ের প্রধান প্রবর্ত্তক, বঙ্গদেশে বাবু অমৃতলাল রায়। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়াছেন, আশা করি, তাঁহার আদর্শে বঙ্গে নবযুগের অভ্যুত্থান হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বঙ্গ এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। এ যুগে এ বিভাগেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম এ, বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

শিল্প সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কালীঘাটের চিত্রই এ দেশের আদর্শ ছিল। এই যুগে আর্টষ্টুডিওর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সচিত্র পুস্তক পূর্ব্বে এদেশে বটতলা ভিন্ন কোথাও প্রকাশিত হইত না। এ যুগে সচিত্র পুস্তক প্রকাশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বাবু রোহিণীকান্ত নাগের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপে গমন, এ যুগের বিশেষ ঘটনা। কারুকার্য্যের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ উন্নতি হয় নাই। লোকের দৃষ্টি এ সকল দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, ইহাই উন্নতির পূর্ব্বাভাস বলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য আদর্শে সার্কাস কোম্পানী এ দেশে গঠিত হইয়া উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। ঢাকার বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে এ যুগের প্রধান আদর্শ। থিয়েটার এ যুগে যাত্রার স্থান অধিকার করিয়াছে।

এদেশবাসীর বেলুনে আরোহণ এ যুগের অন্যতর ঘটনা, দুঃখের বিষয়, ইহাতে সুফল ফলে নাই।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির তীব্র সমালোচনা এ যুগে বিশেষ ভাবে সূচিত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ইহাতে একতা সংস্থাপন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।

এযুগের বিশেষত্ব—জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন। ভারতের অন্যান্য ভাষার একটু একটু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গলা

ভাষার উন্নতিই ভারতের এই যুগের প্রধান ঘটনা। পূর্ব্বতন যুগের অভ্যুদিত অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, বিহারীলাল এই যুগে বঙ্গভূমিকে দারুণ শোকে নিমগ্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহারাই এযুগের সাহিত্যসেবকদলের অগ্রণী; ইহাদের আশ্রয়ে, ইহাদের সহায়ে, ইহাদের আদর্শে বাঙ্গলায় অগণ্য সংখ্য লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। রমেশ চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, যোগেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রজনীকান্ত, শিবনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ আজও বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় জীবনকে ধন্য করিতেছেন; তাঁহাদের সহিত মিলিত—আজ কালকার বহু শিক্ষিত, সুবুদ্ধিমান, উৎসাহী সুলেখকগণ। ইহাদের চেষ্টায় বহু সাপ্তাহিক, বহু মাসিক পত্রিকা চলিতেছে। এই যুগে যত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, পূর্ব্বে কোন যুগে এরূপ হয় নাই। সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, সময়, ভারতবাসী, পতাকা, নববিভাকর, হিতবাদী, বঙ্গনিবাসী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা এদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশ, সাধারণী, সুরভি, ভারতমিহির ও সহচর যে দেশের প্রধান পাঠ্য বাঙ্গালা পত্রিকা ছিল, সে দেশে এতগুলি পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া বিশেষ পরিচয় দিয়াছে, বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সহচর, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও সময় এখনও অদম্য উৎসাহে, অদম্যতেজে, বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা এখন দোকানী পসারীর ঘরে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গলা পত্রিকা এখন দেশে একটা শক্তিরূপে প্রদীপ্ত। উৎকর্ণ হইয়া ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ এখন বাঙ্গলা ভাষার মধুর কথা শ্রবণ করিতেছে। মাসিক পত্রিকারও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন ও বান্ধব যদিও এই যুগের পূর্ব্বেই সময়ের গহ্বরে লুকায়িত হইয়াছে, কিন্তু বহুপূর্ব্ব যুগের তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী, পূর্ব্ব যুগের ভারতী আজও অশেষ যত্ন ও গৌরবে পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদীও সাময়িক পত্রিকার গৌরব স্বরূপ। এ যুগের নবজীবন ও প্রচার যদিও কালের গর্ভে ডুবিয়াছে, কিন্তু অল্প বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় নাই। এ যুগের জন্মভূমি, সাধনা, সাহিত্য, অনুসন্ধান শিক্ষা পরিচয়, চিকিৎসাসম্মিলনী, সমীরণ ও চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রিকা অধ্যবসায়, কৃতিত্ব এবং যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। দাসী, তৃপ্তি, পুরোহিত ও পূর্ণিমা প্রভৃতি পত্রিকা অল্পকালের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে না বলিয়া উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই যে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশে বিশেষ কোন চেষ্টা হইত না। দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাস পাশা খেলিয়া সময় কর্ত্তন করিত। এযুগে দেশে অসংখ্য সভা ও সাধারণ লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে। এক কলিকাতাতে সাবিত্রী, বিদ্যাসাগর, চৈতন্য, সিকদার-বাগান বান্ধব, কম্বলিটোলা প্রভৃতি বহু লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুচারুরূপে চলিতেছে। পল্লিগ্রামের বহুস্থানে অসংখ্য লাইব্রেরি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হইতেছে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে পূর্ব্বে পাঠক-শ্রেণী ছিল না বলিলেই হয়, এখন আংশিক রূপে যে পাঠকশ্রেণী অভ্যুদিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পর যুগে এ সম্বন্ধে আরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, আশাকরি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের বিশেষত্ব এই, কলেজে থাকিতে থাকিতেই ছাত্রবর্গ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে, পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না। কিন্তু এযুগে এই বিশেষত্ব, এদেশের কৃতবিদ্য ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে কতক প্রবেশ লাভ করিতেছে। বহু এম-এ, বি-এ উপাধিধারী ব্যক্তি এখন বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিতেছেন। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,বাবু বরদা চরণ মিত্র প্রভৃতি অসাধারণ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ জাতীয় ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণই দেশের আশা ভরসা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন,আশা করা যায়, কালে এদেশের অধিকাংশ কৃতবিদ্য জাতীয় ভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিবেন। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের যত্নে "সাহিত্য পরিষদ"প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য এরূপ চেষ্টা এদেশে কেবল এ যুগেই হইয়াছে। এ যুগে কত মৌলিক গ্রন্থ যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর সেরূপ হয় না, ইহা যাঁহাদের ধারণা, আমরা বলিতে বাধ্য যে, এ যুগের সহিত তাঁহারা বিশেষরূপ পরিচিত নহেন। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে, ইহা প্রাচীন কথা। আমাদের কথা, যাহা নাই নব্যভারতের প্রথমযুগে, তাহা নাই পৃথিবীর কোন দেশের কোন যুগে। রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আমাদের দেশে এই যুগে সেইরূপ হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে কোন দেশের যে কোন পুস্তকের সমতুল্য। নাম করিতে চাই না,করিয়া কাজই বা কি ? বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র,ধর্ম্মতত্ত্ব,জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্যলীলামৃত, ভূদেব ও রাজকৃষ্ণের বিবিধপ্রবন্ধ পুস্তক, চন্দ্রনাথের ত্রিধারা ও হিন্দুত্ব,নবীনচন্দ্রের রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র,যোগীন্দ্রনাথের মাইকেলের জীবনচরিত এবং রবীন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দদাস,কামিনী,মৃণালিণী ও মানকুমারী প্রভৃতির গীতি কবিতা যে কোন দেশের যে কোন প্রধান লেখকের যোগ্য। এ যুগে বাঙ্গলা ভাষায় যেরূপ বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কোন যুগে এ দেশে তেমন হয় নাই। ইতিহাসে সে সকলের কথা চির-অঙ্কিত থাকিবে।

কিন্তু হইলে কি হয়,এখনও এদেশের বহুপ্রবীণ ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষার প্রতি উদাসীন। সভাসমিতিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা চলে না,আদালত হইতে বাঙ্গলা ভাষা-প্রচলন ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে, উড়িয়া ও আসামীয় ভাষা, বাঙ্গলা ভাষার অনুরূপ হইয়াও, গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায়,স্বতন্ত্র আকার ধরিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষের ন্যায়,ভাষা-বিদ্বেষ জন্মাইতে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আমাদের দেশের ধুরন্ধরগণ এ কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন,ইংরাজি ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হইবে। এই মত-

ভ্রান্তি বিদূরিত না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। জাতীয় ভাষা ভিন্ন জাতিত্ব গঠন হয় না। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষাভাবে একজাতিত্ব গঠনের চেষ্টা এ দেশে তদ্রূপ হইতেছে না। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন তাহা হওয়াও অসম্ভব। জাতীয় ভাব জাতীয় ভাষার ভিতর দিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে অণুপ্রবেশ করাইতে হইবে, নচেৎ জাতিত্ব গঠিত হইবে না। এ সকল কথা আমরা বারম্বার বলিয়াছি; আজ আর বিশেষ করিয়া বলিব না। এ বিষয়ে জাতীয় মহাসমিতি পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন।

এ যুগে স্ত্রী শিক্ষা এবং পল্লিগ্রামের উন্নতির জন্য বঙ্গে বহু সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সুচারুরূপে চলিতেছে। সাধারণের উন্নতি এবং দরিদ্রের সেবা-ব্রতে অনেকের লক্ষ্য হইয়াছে। নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের শিক্ষার জন্য পুনাতে শ্রীযুক্তা রমাবাই এবং বঙ্গে শ্রীযুক্ত শশীপদ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে এখন অনেক সহৃদয় ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইতেছেন। এ সকল একজাতিত্ব গঠনের পূর্ব্বাভাস। একজাতিত্ব গঠন ভিন্ন দেশের উন্নতি অসম্ভব।

একজাতিত্ব গঠনে চেষ্টা করিবেন, ব্রাহ্মসমাজ, এক সময়ে আশা ছিল। কতক করিতেছেনও বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার-কার্য্যে যেরূপ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, গঠন কার্য্যে তদ্রূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেছেন না বলিয়া আমরা দুঃখিত আছি। এই যুগেও ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত গঠন-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এ সমাজে কোন প্রথা, কোন রীতি, কোন অনুষ্ঠানই স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-স্রোতের প্রাবল্যে সমস্ত গঠন-কার্য্য ভাসিয়া যাইতেছে। দলের উপর দল বৃদ্ধি হইতেছে, একপক্ষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপ্রতিহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, আর একদল, গুরু বা নেতার চরণে সমস্ত আশা ভরসা উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিষয়ে আদর্শ, কিন্তু দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে এই সমাজও ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা পরিহার করিয়া নেতৃত্বের সাদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আভিজাত্য-ভাব (Aristocracy) এখানেও প্রকারান্তরে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ইহার পরিণাম কি, অনুমান করিতে পারি না; তবে একথা ঠিক, এই সমাজ বর্ত্তমান নেতা বা পুরোহিত নির্ব্বাচনে "সাধারণত্বের" বিশেষত্বে যে পদাঘাত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তা যাউক। আভ্যন্তরীণ গঠন কার্য্যেই যখন ব্রাহ্মসমাজ অকৃতকার্য্য, তখন দেশের অসংখ্য জাতি ভাঙ্গিয়া একজাতি গঠনের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, জানি না। দেশের নবোত্থিত হিন্দু-সম্প্রদায় পুনঃ জাতিভেদ সংরক্ষণে সচেষ্ট, ইংরাজি-শিক্ষা-বিস্তারের প্রবল স্রোতের মুখে তাহা সম্ভব কি না, জানি না; তবে ইহা জানি, হিন্দুসমাজের মধ্যে লালিত পালিত, হিন্দুভাবাপন্ন, হিন্দু-প্রশংসা-প্রত্যাশী ব্রাহ্মসমাজে এই জাতিভেদ পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা বদ্ধমূল হওয়ায়,* দেশের আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। তদুপরি, হিন্দু-পুনরুত্থানের স্রোতের হুজুগও অল্পাধিক পরিমাণে এই সমাজে প্রবেশ করিতেছে। আত্মার সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলন সম্ভব, ইহাই জগতে ব্রাহ্মসমাজের নূতন কথা। কিন্তু এখন আবার গুরুবাদের আলোচনা ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাতে চলিয়াছে এবং অনেক লোক আবার "গুরু-ব্রহ্ম" বলিতে আরম্ভ করিয়া, ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূলে আঘাত করিতেছেন, এবং গুরুর পদতলে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া গড্ডলিকাপ্রবাহ সৃষ্টি করিতেছেন। গুরুবাদের পর যে অবতারবাদ পুনঃ যৌক্তিকতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হইবে না, কে

* See Indian Messenger, August 5, 1894—"Caste in the *Brahmo Samaj*".

জানে ? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সমাজের গতি এখন অনেকটা পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য ভাব সমন্বয়ের বিরুদ্ধে,প্রাচীন হিন্দুত্বের একদেশদর্শিতার দুর্গের দিকে। পূর্ব্বে পৃথিবীতে অনাবিল পবিত্র একেশ্বরবাদ, যে সকল কারণে সাম্প্রদায়িকতা,গুরুবাদ ও অবতারবাদের মত-পঙ্কে মলিন হইয়া গিয়াছে,আজিও সে সকল কারণ বর্ত্তমান; বর্ত্তমান কেন, ব্রাহ্মসমাজে অংশতঃ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই স্রোতের গতি প্রতিহত না হইলে,ব্রাহ্মসমাজের নিকট সমন্বয়ের,পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য ভাব সম্মিলনের—একজাতি গঠনের আশা কিছুতেই করা যাইবে না।

কিন্তু একথা প্রতি নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজ এদেশের বাঙ্গলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির মূল। জাতিত্ব গঠনের মূল যদি জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ধর্ম্ম হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া দেশের যে কি মহৎ উপকার করিতেছেন, সংক্ষেপে ব্যক্ত করা কঠিন। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম ভিন্ন এক জাতি সংগঠন অসম্ভব। একেশ্বরবাদ যেমন ভারতের সকল ধর্ম্মের সার; সংস্কৃত ভাষা, তেমনি ভারতের সকল ভাষার মূল। এই একেশ্বরবাদই,নামান্তরে,প্রাচীন ও নবীনত্বের সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম; এই সংস্কৃত ভাষাই বর্ত্তমানে প্রাচীন ও নবীনত্বে সরলীকৃত বাঙ্গলা ভাষা। এই দুয়ের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ এদেশকে রূপান্তরিত করিতেছেন। ইহাতে যে সুফল ফলিবার, তাহার গতি প্রতিহত হইবে না; বিশেষ চেষ্টাতেও এযুগে তাহা হয় নাই,ইহা সৌভাগের বিষয় বই কি?

প্রিয় এবং অপ্রিয়,ভাল এবং মন্দ, আশা এবং নিরাশা—সকল দিকের সকল কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। ইঙ্গিতে বলিয়াছি,নব্যভারতের প্রথম যুগের সকল কার্য্য, সকল ঘটনা ভাল না হইলেও, সকল ঘটনাতেই উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। মৃত দেশ যে একটু একটু জীবন সঞ্চারের পরিচয় দিয়াছে, সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বহু যুগ যুগান্তের পর, ভারতে যেন একটু একটু আশা-পবন বহিতেছে। সাম্য এবং বৈষম্যের প্রতিদ্বন্দী ক্ষেত্র হইতে নব্যভারতের নবজীবন সঞ্চারিত হইবে,আমরা আশা করি। তবে বলিতেই হইবে,ঘোর অস্থৈর্য্যের ভিতর ভারত-সমাজ এখনও নিমজ্জিত। বর্ত্তমান অবস্থাকে সম্পূর্ণ উত্থানও বলি না, সম্পূর্ণ পতনও বলি না। পতন-উত্থানের মধ্যবর্ত্তী অস্থৈর্য্য-উপত্যকার ঘোরান্ধকারের মধ্যেই উন্নতির দীপ্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে; মনে হইতেছে, উন্নতি-সূর্য্য অদূরে। কিন্তু সুসভ্য ও সমুন্নত দেশের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া, ধীরভাবে আলোচনা করিলে, অসংখ্য অভাবই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই; মনে হয়,এখনও ভারত দিশেহারা,লক্ষ্যশূন্য,—সহায় নাই,নেতা নাই,—প্রজাশক্তি নাই, সমাজশক্তি নাই। নাই—নাই—নাই; সকলই যেন নাই। ধৈর্য্য নাই, অধ্যবসায় নাই, চরিত্র নাই, সাহস নাই, বীর্য্য নাই, ধর্ম্ম নাই,—নাই—নাই—নাই, সকলই যেন নাই। নাই-হাটে কেবল গণ্ডগোল আছে,—একতা নামক মহাশক্তি এখনও বহুদূরে,স্বাধীনতা নামক স্বর্গীয় পবিত্র শক্তি কোথায়, কে জানে? জাতিত্ব নামক মহাবীর এখনও ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন; ভাষার সমন্বয়, ধর্ম্ম সমন্বয়, স্বার্থ ও পরার্থ সমন্বয়, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য সমন্বয়,জ্ঞানী মূর্খ সমন্বয়, ধনী দরিদ্র সমন্বয়—এ সকল এখনও বহুদূর। এই কূলহীন বিষম অস্থৈর্য্য-সাগরে আছে

তবে কি? আছে কেবল ব্রহ্মকৃপা!! ব্রহ্ম কৃপাই নিরাশার আশা, অন্ধকারের আলো। এই ব্রহ্মকৃপাতেই নব্যভারত উন্নত হইবে, ধর্ম্ম ও চরিত্র ধনে অধিকারী হইবে। এই ব্রহ্ম-কৃপার প্রচারই এ যুগের উন্নতির পূর্ব্বাভাস। এই ঘোরান্ধকারে কেবল চতুর্দ্দিকে শুনিতেছি, কে যেন মাভৈ, মাভৈ রবে গাহিতেছেন, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" আকাশ নক্ষত্র জগৎ ছাইয়া কেবল এই বিশ্ব-বিজয়ী কৃপার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে উঠিতেছে। সকলে জ্ঞাত অজ্ঞাত অবস্থায় ঐ সুরে মজিতেছে। সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঐ সুরে যোগ দিতেছে। সুপ্তোত্থিতা ভারত-মাতা ঐ সুর ও ধ্বনিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন। তোমরাও ভাই, বন্ধু, দেশ কাঁপাইয়া সকলে বল—"ব্রহ্ম-কৃপাহিকেবলম্।" বল বল, বীর্য্য বল, চরিত্র বল, ধর্ম্ম বল, প্রেম বল, পুণ্য বল, নব্যভারতের সমস্ত অবতীর্ণ হইবে ব্রহ্মকৃপায়। তবে সমস্বরে মান অভিমান ভুলিয়া গাও—"ব্রহ্ম-কৃপাহিকেবলম্।" নব্যভারত যুগান্তরে, ব্রহ্ম কৃপায়, অবশ্য নবজীবন লাভ করিবে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইক।

দার্শনিকজ্ঞান ও ব্রহ্ম। (১)

ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বৃত্তি। যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই তুল্যরূপে আবশ্যকীয়। কেবল ভক্তি অন্ধতার উপাদান, কেবল জ্ঞান শুষ্কতার আধার। ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়েই, মানসিকক্রিয়া সমূহের চরম পরিণতি ও পরমোন্নতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ত্বের পথিক হইতে হইলে, ঈশ্বর-জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিতে হইলে, এই দুই শ্রেষ্ঠবৃত্তির সমন্বয় আবশ্যক। কেবল নিরবচ্ছিন্ন কঠোর দার্শনিক-তত্ত্বের আবিষ্কারে এবং শুষ্ক জ্ঞানের অবিরত বিচারে মানব ক্রমশঃ নাস্তিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভাদ্রমাসীয় মধ্যাহ্নকালীন খরতর সূর্য্য-কিরণ যেমন প্রান্তরবর্ত্তী বৃক্ষকে দিনে দিনে শুষ্ক করিয়া তোলে, তেম্নি ভক্তির সুশীতল বারি-ধারা পতিত না হইলে, ভক্তিরূপ সুমন্দ মধুর পবন না বহিলে, কেবল জ্ঞানের আলোচনাতেও মানবহৃদয় ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া পড়ে। জ্ঞান নির্ম্মল-গগনে মধ্যাহ্নের সূর্য্য; ভক্তি নীলরজনীতে শরতের চন্দ্র। এই দুই বৃত্তির সমন্বয়-সাধন করিতে হইলে, একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। বিশ্বাস, এই দুই বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে সখ্য স্থাপন করাইয়া দেয়। বিশ্বাস, এ উভয়েতেই সমান উপযোগী। ব্রহ্ম-পদার্থে বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাতে ভক্তি বা তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান কখনই প্রকৃষ্টরূপে জন্মিতে পারে না। একদিকে বিশ্বাস যেমন জ্ঞান ও ভক্তির প্রথম-প্রবর্ত্তক, তেম্নি এ দুইএর একতা সাধনেতেও—সমন্বয় ক্রিয়াতেও—বিশ্বাস সেইরূপ উপযোগী। আমরা বলিয়াছি, সমন্বয় সাধনে একটী প্রণালীর অনুগামী হইতে হইবে। এখন আমরা সেই প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। মনে কর, আমার বিশ্বাস আছে। ব্রহ্মে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এ বিশ্বাস ভ্রমমূলক হইতে পারে; এ বিশ্বাসে অন্ধতার বীজ নিহিত থাকিতে পারে। আমি যাহাকে "রাম" বলিয়া বিশ্বাস করি, সে "শ্যাম" হইতে পারে। আমি যাহাকে প্রচলিত রীতি বলে পুণ্য

চন্দন দিয়া বিশ্বাস করিতেছি, কালে সে মাটীর ডেলায় পরিণত হইবে বিচিত্র কি? তাই বলি, আমার যাহা বিশ্বাস, তাহাকেই সর্ব্বস্থলেই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। অন্ধকারে বৃক্ষকে দানব বলিয়া মনে হইতে দেখা যায়। এই জন্যই বিখ্যাত দার্শনিক Descartes বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"The senses often deceive. I can therefore in no case trust them implicitly. Dreams deceive me by false images; but I find no sure criterion by which to determine whether at this instant I am asleep or awake. Perhaps our bodies are not such as they appear to our senses. * * In the case of first knowledge which I have acquired, nothing but the *clear* and *distinct* perception of that which I assert assured me of its truth, hence it seems to me that I may adopt it as a general rule that all things which I conceive very clearly and distinctly are true."

যে পদার্থের সুস্পষ্ট এবং সুপরিস্কৃত জ্ঞান না জন্মিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করা অন্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব, ব্রহ্ম-পদার্থে বিশ্বাস থাকিলেও জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন ও পরিমার্জ্জন বিধেয় হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বাস থাকিলেও আমাকে বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, ঈশ্বর কি? এই রূপে ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মিলে, তবে তাঁহাতে যে ভক্তি হইবে, সে ভক্তি অটুট ও অচল। সে ভক্তি নির্ম্মল ও মানবাত্মার মধু-স্বরূপ। বিশ্বাসের উপরে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, যে নির্ম্মল ভক্তি জন্মে, তাহাই মানবাত্মাকে উন্নতির চরমসীমায় উপস্থাপিত করিতে সক্ষম। এইরূপ ভক্তিনিষ্ঠাই ব্রহ্মোপাসকের চরম-সাধন। জ্ঞানশূন্য প্রেমোপাসনাকে আমরা প্রতিভাশূন্য অন্তঃকরণবৎ অসার বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। আজকালকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভ্রমান্ধ কি না, বলিতে পারি না, আমরা কিন্তু ওরূপে "মধুর ভাবে" উপাসনার পক্ষপাতী নহি। সমস্তকার্য্যেরই প্রতিষ্ঠাটী সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। বিশ্বাসোপরি সুসংস্থাপিত জ্ঞান, যে উপাসনা ও প্রেমের প্রবল ও পরম প্রতিষ্ঠা, সেই উপাসনাকেই আমরা প্রকৃত উপাসনা বলিয়া মনে করি। তাহা হইলেই আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বর-বিশ্বাসী পুরুষকে প্রথমতঃ ঈশ্বর কি—এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে,—ঈশ্বর জ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। এখন আমরা দেখিব, কিরূপে এই দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

যে কালে ও যে জাতির মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা ও পরিশীলন হইয়াছে, সেইকালে ও সেই জাতির মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য তীক্ষ্ণ-মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চিন্তা ও একাগ্রতার ফলস্বরূপ এক একটী মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহারই পরিণামে দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তার। ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ে দর্শন-শাস্ত্রই প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। যুক্তি, তর্ক ও বিচারশক্তি দ্বারা দর্শনশাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছে। দর্শন তাহা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে বা আরও হইবে, যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে যাহার মীমাংসা হইবে, তাহাই মনুষ্যের গ্রহণীয়, সন্দেহ নাই। বিচার ব্যতীত কোনও পদার্থের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, ভারতীয় দর্শনই উৎকৃষ্ট এবং অন্য দেশের দর্শন ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা এ কথা আংশিক সত্য বলিয়া স্বীকার করি। ভারতীয় দর্শন যে জটিলজ্ঞানের অন্ধকারাবৃত দ্বারে সুস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইয়াছে, বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্র ততটা না পারিলেও, ব্রহ্ম মীমাংসায় তাহারাও কম অগ্রসর নহে। জ্ঞান

কাহারও একচেটিয়া নহে। যাহা তোমার আছে, আমার তাহা নাই; আবার যে টুকু আমার আছে, তাহা তোমায় দেখিতে পাই না। জ্ঞান-রাজ্যের নিয়মই এইরূপ। দার্শনিক সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। প্রকৃতি-রাজ্য ও মানব কিরূপ সম্বন্ধে ব্রহ্মের সহিত আবদ্ধ,—ব্রহ্ম,মানব ও প্রাকৃতিক জড়রাশির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ;—মানবাত্মা কি উপায়ে কেমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পদার্থজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সেই জ্ঞানই বা কিরূপ;—এই গুলি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্র ক্রমে কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, তাহারই কতিপয় মতের আলোচনা ও পরিস্ফুটন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। বৈদেশিক দর্শনশাস্ত্রেও কেমন উত্তম মীমাংসা আছে, এবং আমাদের স্বকীয় দার্শনিক মতগুলির সঙ্গেও কেমন তাহাদের ঐক্য আছে, এই বিষয়টী সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত না আছে, তাহা নহে। এ দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর অনেকেই এ বিষয়টী ভাল করিয়া জানেন না বলিলেই হয়। এ প্রবন্ধের দ্বারা অনেকের অনেক ভ্রম বিদূরিত হইতেও পারে, এই ভরসায় আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আজ আমরা একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিকের মত বিশ্লেষ করিতে অগ্রসর হইব।

সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি চেতন (Mind), অপর গুলি অচেতন বা জড় (Matter)*। এই দুইটী প্রধান বিভাগ দ্বারা পৃথিবী আবৃত। জড় ও চেতন ভিন্ন পৃথিবীতে তৃতীয় পদার্থের সত্ত্বা নাই। এই দুইটারই আবার পৃথক্ পৃথক্ দুইটী উপাদান (Essence) রহিয়াছে। এই Essence লইয়াই উহাদিগের চেতনত্ব ও জড়ত্ব। চেতনের সাধর্ম্ম্য চিন্তা বা ভাবনা (Thought) এবং জড়ের সাধর্ম্ম্য ঘনত্ব বা আকৃতি (Extension)। এই দুই সাধর্ম্ম্য পৃথক্ করিয়া দিলে পদার্থ-দ্বয়ের সত্ত্বাই বিলুপ্ত হইবে। Thought লইয়াই চেতনের চেতনত্ব; আবার Extension লইয়াই জড়ের জড়ত্ব। সুতরাং "ভাবনা" ও "ঘনত্ব"ই যথাক্রমে চেতন ও জড়ের সাধর্ম্ম্য বা জাতি বা Essence। এই দ্বিবিধ পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই দুই প্রধানতম সাধর্ম্ম্য ব্যতীত চেতন ও জড় পদার্থের মধ্যে আমরা আরও কতকগুলি অপ্রধান গুণ (Modes) দেখিতে পাই। জড় পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার আকার (Shape) এবং গতি (Motion) রহিয়াছে। যেরূপেই আরম্ভ হউক না কেন, জড়ের গুণ-গতির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, উহা সরলরেখাক্রমে ধাবিত হয়। আবার চেতন বা মনকে বিশ্লেষ করিলে উহাতেও আমরা কতকগুলি অপ্রধান গুণ (Modes) দেখিতে পাই। আমরা দেখি,মন (Mind) দ্বিবিধ রাজ্যে বিভক্ত। (১) জ্ঞান-রাজ্য বা Cognitive Faculties; (২) ক্রিয়া বা ইচ্ছা রাজ্য বা Active Faculties.। মনের বা চেতনের এই দ্বিবিধ রাজ্য আছে। জ্ঞানশক্তি পদার্থসমূহের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মুখে উপনীত করিয়া দেয় এবং ইচ্ছাশক্তি সেই অনুভূতির উপরে স্বীয় প্রতাপ বিকাশ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনে পদার্থের যে ছায়া বা আকার প্রতিফলিত হয়, তাহাকে সেই পদার্থের Idea বলে।

* বঙ্গভাষায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষার স্থিরতা নাই। "বঙ্গীয় পরিষদ" ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা অনুবাদে যে ভাষা ব্যবহার করিলাম, তাহ নিজের সৃষ্টি।

জ্ঞানরাজ্যকে (Cognitive Faculties) আরও বিশ্লেষ করিলে আমরা আরও কতকগুলি বৃত্তি দেখিতে পাই। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় (Senses), স্মৃতি (Imagination), এবং বিচারবৃত্তি (understanding), -এই তিনটী বৃত্তিই প্রধান। প্রধানতঃ এই তিনটীকে লইয়াই চেতনের জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। ইহারা কিরূপে বাহ্য পদার্থের অনুভূতি ও জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহা একটু বিস্তৃতভাবে দেখা আবশ্যক হইতেছে। বাহ্য জড় পদার্থ-নিচয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মস্তিস্কে কার্য্য বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সেই পদার্থের অনুভূতি (Sensation) জন্মাইয়া দিয়া, মস্তিস্কে তাহার একটী স্থায়ী ছায়া অঙ্কিত করাইয়া দেয়। আমরা একটী দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। মনেকর, আমার হস্তের অতি সন্নিকটে একটী জলৎকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে,এস্থলে ত্রিবিধ ক্রিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ আমার হস্তে জলৎ-কাষ্ঠের পরমাণু সমূহের উত্তেজনা প্রবিষ্ট হইল। দ্বিতীয়তঃ, তদ্দ্বারা আমার হস্তের স্নায়ু সকলের কম্পন তাহাকে আমার মস্তিস্কে প্রবাহিত করাইয়া দিল। তৃতীয়তঃ, তদ্দ্বারা ঐ জলৎ-কাষ্ঠের একটী অনুভূতি বা Sensation সূচিত হইল। তৎপর বিচার বা understanding এর প্রভাবে ঐ ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যগুলির "জ্ঞান" অঙ্কিত হইল। এইরূপে বাহ্য জড়পদার্থ সমূহের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মনে যে বস্তুর জ্ঞান জন্মে, সেই পদার্থের একটী আকার বা Idea উপস্থিত হয়। এই Idea হইতেই বস্তুজ্ঞান। এই দার্শনিকের মতে,এই পদার্থের Idea গুলি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চেতনে সংস্পৃষ্ট ও লগ্ন হইয়াছে। এই Idea গুলি চিরন্তন, অনাদি ও অপরিবর্ত্তনীয়। বাহ্যপদার্থগুলি এই অনাদি Ideas সকলেরই বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। বাহ্যবস্তু সকল, এই Idea গুলিরই সাদৃশ্যজ্ঞাপক। একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে।

শারদীয় চন্দ্র নীলাকাশে উঠিবার সময়ে, আমাদের মন কি এই দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া আলোক-পথে সেই চন্দ্রের অতি সন্নিকটে দৌড়িয়া উপস্থিত হয়? না, তাহা ত সম্ভবপর নহে। তবে কেমন করিয়া চন্দ্রজ্ঞান জন্মে? বস্তুর অনুভূতির সম সময়ে, আমরা দেখি আমাদের মনে তাহার একটা আকার বা Idea আসিয়া উপস্থিত হয়। এই Idea না হইলে, কৈ আমরা ত কোন বস্তুরই জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এই যে পদার্থসকল মানবমনে নিজের নিজের সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটা ছায়া উৎপাদিত করে, ইহাই ত Idea.। এখন আমাদিগকে নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিতে হইতেছে,পদার্থ রাশির এই Ideas গুলি কোথা হইতে আসিল? অন্ততঃ চারি প্রকার প্রণালীতে বস্তুর এই Idea নির্ণীত হইতে পারে। (১) পদার্থের Idea, সেই সেই বাহ্য-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়। পদার্থগুলিই তাহাদের স্বরূপসূচক Ideas সকলকে মানব মনে প্রেরণ করে। কিন্তু এ মত সত্য নহে। যাহা পদার্থ হইতে সঞ্জাত, তাহা শারীরী বা বস্তুগতই হইবে। সুতরাং অনন্ত পদার্থের অনন্ত রকম সাদৃশ্যের ছায়া কিরূপে পরস্পর অস্পৃষ্ট ভাবে—না মিশিয়া—উপস্থিত হইতে পারে, ইহা বুঝিয়া উঠা ভার। আবার Solid বা কঠিন পদার্থের ছায়া বা আকার সকল কি করিয়া তত্তৎ সদৃশ-আকারে নানারূপে কর্ত্তিত

ও স্বল্পায়তন হইয়া মানবমনে প্রতিফলিত হইতে পারে, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং এ মত ভ্রম-বিজৃম্ভিত। (২) মানবমনের প্রকৃতিই এই যে, পদার্থের Idea আপনিই উৎপাদিত করিতে পারে। এমতও দোষ-স্পৃষ্ট; কেননা, Ideas গুলি জড়বৎ নহে; উহারা জড় হইতে উৎকৃষ্ট। উহারা Material নহে; উহারা spiritual.। সুতরাং মন যদি এরূপ কোন জিনিষ স্বয়ং সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে মন ত ঈশ্বর অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। (৩) ইহা হইতে পারে যে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বিধাতা মানব মনে বস্তুর সাদৃশ্য-সূচক আকারগুলিকে নিহিত ও প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। এ যুক্তিও ভ্রম-যুক্ত। পদার্থ অনন্ত ও নানা শ্রেণীর। সুতরাং ঈশ্বরকে প্রতি মনে অনন্তসংখ্যক ও অনন্ত শ্রেণীর Idea নিহিত করিতে হয়। এবং মনকেও সেই অনন্ত Ideas গুলির মধ্য হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তত্তৎ পদার্থোপযোগী এক একটী করিয়া Idea বাছিয়া লইতে হয়। (৪) মানব মনে নিজের সম্পূর্ণতা ও নিজের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঐ Idea গুলি স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন, মনের স্বীয় প্রকৃতি হইতেই বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এরূপ মতেরও একটী দোষ আছে। মনের এরূপ গুণ সসীম মনুষ্যের থাকা সম্ভব নহে; ইহা অনন্ত ব্রহ্মের গুণ হইতে পারে। তাঁহাতে সমস্ত পদার্থ থাকিতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন মানব মন অনন্ত পদার্থ ধারণ করিতে পারে, ইহা ত কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং উল্লিখিত চারি প্রকারের কোন রকমেও Idea উৎপন্ন হইতে পারিল না। তবে এ Idea কোথা হইতে আইসে?—আমরা সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মেতেই দেখিতে পাই; অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের Idea ব্রহ্মেতেই অবস্থিত। এই Idea মানবমনেও নহে এবং বাহ্য পদার্থেও নহে। ব্রহ্মে Idea বর্ত্তমান; এবং সেই ব্রহ্মও সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। সুতরাং মানবমন সেই Ideas গুলির প্রতিষ্ঠা-ভূমির সঙ্গে সদাসংযুক্ত। মানবাত্মা ব্রহ্মাত্মার সহিত এক এবং কাজে কাজেই একইরূপ Idea উভয়েতে নিহিত। ব্রহ্মের চিন্তা ও Idea আমাদের চিন্তা ও Ideaর সহিত একই। অর্থাৎ চেতন ও জড় উভয়ই তাঁহাতেই অবস্থিত। Matter এবং Mind এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য Thought ও Extension উভয়ই তাঁহাতে অবস্থিত। তিনি ভাবেন, তাই মনও ভাবে।

"Mind can think without body, but can know nothing save in the Divine Reason. Body can be extended without mind, but can exist only in the immensity of God."

সৃষ্টির পূর্ব্বে বস্তুর এই Idea ব্রহ্মেতেই ছিল। এই Idea, সৃষ্টির পূর্ব্বে, বাহ্যবস্তুর Archetypes স্বরূপে ছিল। সৃষ্টির পর ইহা পদার্থের Essence স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং আমাদের মনের সম্বন্ধে, ইহাই জ্ঞাতব্য "পদার্থ"। এই Idea চিরবর্ত্তমান। ব্রহ্মও ইহার অন্যথাকরণে সক্ষম নহেন। এই অংশে হিন্দুদার্শনিকদিগের "কর্ম্মের" সঙ্গে এই Ideaর সমতা লক্ষিত হয়।

কিন্তু এস্থলে একটী গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। মানিলাম, আমার চিন্তা ও Idea, ব্রহ্মের চিন্তা ও Idea এর সঙ্গে একই। তবে কেন আমার Idea ও চিন্তা গুলি সসীম, কুৎসিৎ ও অন্ধকারাবৃত? ব্রহ্মের Idea কখনই সমল হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহার উত্তর অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, understanding (জ্ঞান)

এবং Will (ইচ্ছাশক্তি) নামে মনের দুইটী রাজ্য। এখন এস্থলে একটু বিবেচনা করিয়া একটী বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই জ্ঞান-প্রণালী দ্বিবিধ। বাস্তবিক জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, বিশুদ্ধ-মনের জ্ঞান —অর্থাৎ দেহ বা Matter হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ যে নির্ম্মল মন বা আত্মা, তাহার জ্ঞান এক প্রকার। এই জ্ঞান বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। ইহারই অপর নাম Reason। ইহা দ্বারা আমরা জাগতিক সত্য সমূহের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এ জ্ঞান ঈশ্বর-জ্ঞানের সদৃশ ও তুল্য। নৈতিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও গণিত-বিষয়ক জ্ঞান ইহা হইতেই লাভ করা যায়। দ্বিতীয়, দেহ-সম্বলিত মনের জ্ঞান,—অর্থাৎ যখন মন বা আত্মা শরীরের মধ্যে আবদ্ধ হইল, চেতন যখন জড়ের সঙ্গে মিশিল, তখনই আর এক প্রকারের সমলজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জ্ঞানই সসীম,দুঃখময় ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন। এই জন্যই মানবমনে নির্ম্মল ও সমল, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম যে, "জ্ঞানের" প্রণালী দ্বিবিধ। কেবল নিরবচ্ছিন্ন আত্মা এবং শরীরাবদ্ধ-আত্মা ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। এইরূপ, "ক্রিয়া-শক্তি"ও দ্বিবিধ। ইহাও পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও সমল-আত্মাভেদে দুই প্রকারের। নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল মনের যে ইচ্ছা বা ক্রিয়া, তাহা ব্রহ্মাভিমুখিনী; ইহা সংসারাভিমুখিনী বা বাহ্যপদার্থগামিনী নহে। ইহার গতি উর্দ্ধদিকে। ইহারই বলে আমরা উপাসনা প্রভৃতি সাধু প্রবৃত্তি-নিচয় পাইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, শরীর-সংযোগী-আত্মার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা আবার অন্যরূপ। ইহা সমল বাহ্যবস্তুর দিকে মনকে আকৃষ্ট করায়। নিজের সুখ-স্বার্থ, নিজের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি সমলা প্রবৃত্তি গুলির ইহাই নিদান।

এতদূরে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা প্রসিদ্ধ দার্শনিক Malbrancheর মত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম। পাঠক দেখিবেন, এ মতের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের সঙ্গে অনেক ঐকমত্য রহিয়াছে। ইহাও একরূপ ঘোরতর অদ্বৈতবাদ। অতি সংক্ষেপে আমরা কেবল মূলীভূত মতটী প্রদর্শন করিলাম। বারান্তরে, এইরূপ প্রকৃতিজ্ঞান ও ব্রহ্ম জ্ঞানের দোষ-গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আবাহন।

আমার সহেনা তারে অত ডাকাডাকি,
আমারি নূতন শেখা,
আমিই ডাকিব একা,
মোর সাধ, প্রাণ দিব সে চরণে মাখি,
সারা বিশ্ব তারে কেন করে ডাকাডাকি?

২

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
মুখে যা প্রভেদ বলি,
কাজে এক পথে চলি,
একই তপনে শত সূর্য্যমুখী আঁখি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি

৩

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
রাঙা রবি নিয়ে বুকে,
ঊষা ডাকে সোণা মুখে,
গোধূলি বালিকা ডাকে শ্যাম ছটা মাখি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
উজ্জল মাণিক ইন্দু,
তারা সে হীরার বিন্দু,
গ্রহ ধূমকেতু সবে করে হাঁকাহাঁকি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

৫

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
ঘনঘটা বজ্রনাদে
সেই নাম সদা সাধে,
নীরবে বাসব চাপ নীলাকাশে থাকি,
কেবলি তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

৬

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
কাকের কর্কশ গান,
কোকিলের কুহু-তান,
দোয়েল ঝঙ্কার করে মুদি যুগ আঁখি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

৭

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
বরষার প্রস্রবণ,
বসন্তের ফুলবন,
অতুল রূপের ছটা তাহাতেই রাখি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

৮

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
নিবিড় বিজন বন,
কিবা জন-নিকেতন,
মরুভূমি শূন্য দেহ বালুকায় ঢাকি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

৯

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
ভূধর বিরাট বীর,
অতল নীরধি-নীর,
কুসুমভূষণা লতা, দৃঢ়কায় শাখী,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

১০

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
ভূপতি সোণার খাটে,
ভিখারী ধূলার মাঠে,
বালক, স্থবির, হায়! কেহ নহে বাকী,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

১১

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
মৃত্যু জীবনের স্তর,
শ্মশান, সূতিকা-ঘর,
আদি অন্ত মধ্য আছে তাই নিয়ে আঁকি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

১২

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
কিবা বেদ, কি পুরাণ,
বাইবেল, কি কোরাণ,
শত বা সহস্র দূর—যাহা ভেবে থাকি,
সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি।

১৩

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
মুখে বটে, ভাই ভাই,
মুখ দেখাদেখি নাই,
রক্ত-পিশাচের মত রক্ত-মাথামাখি!
কাজে তো একই, মা'রে"মা"বলিয়া ডাকি।

১৪

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
কেহ জ্ঞানী, কেহ চাষা,
নানা ভাণ, নানা ভাষা,
কেহ মিত্র, কেহ শত্রু, দিতে যাই ফাঁকি!
অথচ সকলে মিলে এক জনে ডাকি।

১৫

সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি,
একি অন্ধকার হিয়া!
আছি সনে কি বুঝিয়া?

অন্তরে রেখেছে মোহ-আঁধারেতে ঢাকি,
তাতেই বুঝি না সবে এক জনে ডাকি!

১৬

আমার সজনা তারে এত ডাকাডাকি,
আমারি নূতন শেখা,
আমিই ডাকিব একা,
মোর সাধ, প্রাণ দিব সে চরণে মাখি,
তারে যে সারাটা বিশ্ব করে ডাকাডাকি!

১৭

সকলে তোমারে ডাকে, আমি দীন ডাকি,
এস হে অনাথবন্ধো!
এস হে করুণাসিন্ধো!
এস! হেরি ও মূরতি অনিমেষ থাকি;
এস তুমি শিবশক্তি!
এস জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি!
এস ব্রহ্ম! ব্রহ্মময়ি! প্রাণে পুরে রাখি;
এস মাতা পিতা মম!
ভাই বন্ধু! প্রিয়তম!
কে জানে পূরিবে সাধ কি বলিয়া ডাকি!
এস সরবস্ব ধন!
জানি না তো আবাহন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমা করে ডাকাডাকি,
আমি ভাবি তুমি নাথ! আমারি একাকী।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১১)

পাঠকগণ! কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অনাদি—ঈশ্বর প্রণীত। অপরাপর শাস্ত্র আধুনিক—মানব কল্পিত; সুতরাং ভ্রমপূর্ণ। অতএব বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্য করা এবং উহার মতে চলা উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদের অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে বলিয়া, ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র (পুরাণ, তন্ত্রাদি) প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও বেদের ন্যায় সত্য এবং ইহার মতে চলা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলেন,বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম-পুস্তক ও ঈশ্বরের বাক্য; অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা। আবার মুসলমানগণ বলেন যে, আমাদের কোরাণই একমাত্র সত্যশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল ধর্ম্ম মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী যথার্থ সত্য ধর্ম্ম আচরণ করেন? আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে "সত্য" এক কি বহু? আর সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক কি দুই জন? "সত্য" এক বই দুই হইতে পারে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত। যদি একই সত্যপুরুষ দ্বারা বেদ,বাইবেল,কোরাণ, পুরাণ,তন্ত্রাদি লেখা হইয়া থাকে,তাহা হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। ঈশ্বর মানুষ নহেন যে,বয়সের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা শাস্ত্র লিখিত হইলে, সকল শাস্ত্রই এক মত হইবে,সন্দেহ নাই। তবে যে এই সকল শাস্ত্র মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়,ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে---কেবল স্বার্থপরতা। যাঁহারা আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের সহিত কখনই মিল থাকিবে

না স্থির-নিশ্চয়। যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থ-ভাবে সারতত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে, আর জগতের কাহারও সহিত (অবশ্য সত্যতত্বানুসন্ধায়ী লোকের) অমিল হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। "সত্য" সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য; "মিথ্যা" সকল স্থানেই ও সকলের নিকটেই মিথ্যা।

পাঠকগণ! প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ কাহাকে বলে? আর ইহা কি বস্তু? নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হয়েন ত অদৃশ্য, মন বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়-অগোচর। যদি সাকার হয়েন, তাহা হইলে ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম। ইঁহারা ছাড়া ত আর কেহই নাই। তবে কাহাকে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি বলে? যদি সত্যকে বলেন, তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য বিরাজমান আছেন। যদি মিথ্যাকে বলেন, তবে মিথ্যা কি বস্তু? যদি কাগজ কালীকে বলেন, তাহা হইলে জগতে যত দপ্তর খানায় কাগজ কালী আছে, সকল গুলিই বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ হইতে পারে! যদি শব্দকে বলেন, তাহা হইলে শব্দ মাত্রেই আকাশের গুণ, সুতরাং সকল শব্দই বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ! যদি আকাশকে বলেন, তাহা হইলে একই সর্ব্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছে—তাহার মধ্যে কোন উপাধি নাই। সুতরাং কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি জ্ঞানকে বলেন, তবে জ্ঞান একটি না দুইটি? জ্ঞান ত একই; একই জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে আপনাদের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আ[illegible] লিখিয়া থাকেন, [illegible] বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি[illegible] হয় কেন? ইহার ম[illegible] কোন টিকে বেদ, বাইবেল, পু[illegible] স্বীকার করেন? পাঠকগণ! [illegible] আপন জয় পরাজয় মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখুন। সকল মত, সকল ভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকাররূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ অখণ্ডাকার আত্মা গুরুকে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহা হইলে আপনাদের পরস্পরের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে; এবং বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিবেন। যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবানকে মানেন, তিনিই যথার্থ বেদাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখেন; নতুবা যিনি মুখে বেদকে মানি বলেন, অথচ তাহার অর্থ বুঝেন না এবং তাহার কার্য্য করেন না, স্বার্থপ্রযুক্ত অন্তরে একভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ বেদাদিশাস্ত্রের অমর্য্যাদাকারী—ভণ্ড। এ সকল লোকের কোন কালেই মঙ্গল নাই। চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য সেই একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে। ব্রহ্ম ব্যতীত একটি তৃণ পর্য্যন্ত নূতন উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই

ও মধ্য নাই। যেমন [illegible] পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকা[illegible] [illegible]গৎস্বরূপে অনাদি কাল হইতে প্রত[illegible] [illegible]র আছেন। আদিতে যে পৃথিবী [illegible] [illegible] সেই পৃথিবী আছে সেই [illegible], সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চ[illegible], সেই সূর্য্যনারায়ণ, আদিতে যেমন ছিল, এখনও তেমনিই আছে। নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না। যাহা আছে, তাহা অনাদিই আছে। ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই, সুতরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই। সারবস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। দেখুন পূর্ব্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যাবসানে আমরা এক্ষণে আর এক রাজার শাসনে আছি। এক্ষণে যদি আমরা বলি যে, এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক, আমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। এস্থলে বুঝা উচিত যে, এই রাজা নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা (বস্তু) ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত নহে যে, প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন তিনি পুরাতন তাঁহাকে মানিব, পিতামহ নূতন ইঁহাকে মানিব না। ইহা যে কত বড় ভুল ও অন্যায়, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে এই পিতামহ আদিতে ছিলেন, তাই এখন আসিয়াছেন, যদি আদিতে না থাকিতেন, তবে এখন আসিতেন না। পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয়। এই শাস্ত্র বেদ প্রভৃতিতে বিচারপূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিতে হয়। সাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে, নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার পুতুল।*

১

আমার পুতুল,
এ নহে মোমের গড়া, পোড়া মাটী রং করা,
এ যে মমতায় ভরা স্নেহের মুকুল,
এ নহে বিলাতী চীনা, এ নহে এ দেশে কিনা,
নন্দনের আমদানী পারিজাত ফুল,
আমার পুতুল!

২

আমার পুতুল,
সে কহে স্বর্গের কথা, সুখশান্তি পবিত্রতা,
অধরে অমৃত-গঙ্গা বহে কুল্ কুল্,
ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতে, শঙ্কর ধরেন মাথে,
বাঁচায় সহস্র আশা নিরাশ-নির্ম্মূল,
আমার পুতুল!

৩

আমার পুতুল,
কলপ লতার সম, ধমনী শিরায় মম,
শত শাখা প্রশাখায় স্থাপিয়াছে মূল,
যাহা চাই তার কাছে, সকলি তাহাতে আছে,
অন্নদার ঝাঁপি যেন অক্ষয় অতুল,
আমার পুতুল!

৪

আমার পুতুল,
আনন্দ উল্লাসে ধায়, নাচিয়া আছাড় খায়,
কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে কি সুন্দর ভুল!
তাহারি মধুর গীতে, আসে যেন পৃথিবীতে,
নব-বসন্তের কোলে বন-বুল্‌বুল্,—
আমার পুতুল!

* দেবীপ্রসন্ন বাবুর মেয়ে—সান্ত্বনা।

আমার পুতুল,
ধরিয়া সে সোণাহাতে, বিকালে বেড়ায় সাথে
উজলিয়া 'মধুপুরে' নিঝরের কূল,
কনক চরণে তার, সুখে করে নমস্কার,
নোয়ায়ে রজতশির সুখে 'লুসীফুল'—
আমার পুতুল!

৬

আমার পুতুল,
কভু সে রজত সোতে, পাথরের নুড়ি পোতে,
পলাইয়া যায় জল করি কুল্ কুল,
সেও ছোটে পাছে তার, আরেক শোভার ধার
আনন্দ উল্লাসে আমি অবশ আকুল!—
আমার পুতুল!

৭

আমার পুতুল,
সে যখন কাঁদে রাগে, লাবণ্যে পূর্ণিমা লাগে,
হৃদয়ে উছলে রক্ত—তরঙ্গ তুমুল,
সত্যই তাহার মুখে, দেখি বিশ্ব মহাসুখে,
ঠিক্ বুঝি যশোদার হয় নাই ভুল!—
আমার পুতুল!

৮

আমার পুতুল,—
হাসিভরা রাঙ্গাঠোঁটে, অরুণ ভাঙ্গিয়া ওঠে,
এ পারে পলাশ ফোটে ও পারে পারুল,
ললাটে সুন্দর সাঁদা, শরতের শশী আধা,
মিশিয়া ফুটেছে গালে যূথী 'জহরুল'!—
আমার পুতুল।

৯

আমার পুতুল,—
যদি অলি দুই দলে, দেখে থাক শতদলে,
তবেই বুঝিবে তার সীতিকাটা চুল,
থাকেনা চামেলী বেলী, দৌড়াইতে দেয় ফেলি,
কাণের খসিয়া পড়ে 'ধুতকীর' দুল!—
আমার পুতুল!

১০

আমার পুতুল,—
কখনো ঘোমটা মুখে, বালিসের ছেলে বুকে,
খাওয়ায় তাহারে বুনী বেহুস—বেকুল,
বুঝেনা চেতন জড়, নাহি বুঝে আত্মপর,
জগতে জননী কই তার সমতুল,
আমার পুতুল!

১১

'আমার পুতুল',—
সে বলে আমারে তার, আমি বলি সে আমার,
আমাদের দু'জনের বিবাদের মূল,
গলাধরি চুমা খাই, দু'জনেরে দু'জনাই,
কে কার দখলে ভাই ভেঙ্গে দেও ভুল!—
আমার পুতুল!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

পত্রাবলী (২)।

শিবাজীর প্রতি সখীবাই

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ—শিবাজী বিজাপুর রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলে, বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া, তাঁহার পিতা সাহজীকে অবরোধ পূর্ব্বক, এইরূপ প্রচার করেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিবাজী আত্ম-সমর্পণ না করিলে, সাহজীর কারাগারের দ্বার প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করা হইবে। শিবাজী, এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, আপনার পত্নী সখী বাইকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পিতার উদ্ধারের জন্য, শিবাজী পরে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা অবগত আছেন।

রাজগড় অধিষ্ঠাত্রী রাজরাজেশ্বরী
বরিলা আপনি যাঁরে মহারাজ পদে
স্থাপিবারে হিন্দুরাজ্য, কৃতাঞ্জলিপুটে
নমে সখীবাই তাঁর চরণ কমলে।
হীনবুদ্ধি নারী দাসী, কি সাধ্য তাহার
দিবে রাজযোগ্য মন্ত্র ; তবুও প্রাণেশ,
বাড়ায়েছ মান তার জিজ্ঞাসিয়া তুমি
"সখীর কি অভিরুচি" ? কহিব চরণে
কহিব কি ইচ্ছা মম। ক্ষমিও দাসীরে,—
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি,—চাহে বুঝাইতে
রাজনীতি কথা তোমা অল্পমতি নারী।
"বন্দী বৃদ্ধ মহারাজ" এ কথা শুনিয়া,—

পুত্র পুত্রবধূ মোরা,—উচিত কি কভু
বিলম্বিতে ক্ষণকাল? কিন্তু প্রাণেশ্বর,
দেখ বিচারিয়া তুমি, রোগনাশ তরে
ঔষধের প্রয়োজন, সে ঔষধ যদি
না পারে দমিতে ব্যাধি, কিবা ফল তাহে?
পতিত-পাবনী দেবী জহ্নু-দুহিতারে
পূজে মোক্ষ আশে লোক, কূপোদক সেবি
কে লভে বাঞ্ছিত ফল? দেখ ভাবি তুমি
কি ফল ফলিবে তব আত্ম-সমর্পণে?
রক্ষিবারে পিতৃদেবে, জন্মি হিন্দুকুলে
হেন নরাধম পুত্র কে আছে ভারতে
করিবেক দ্বিধা সেই? এ তব কিঙ্করী
নহে প্রতিবাদী তাহে; কিন্তু বীরবর,
চাহে জিজ্ঞাসিতে দাসী, যবন-সম্রাট
না রাখে প্রতিজ্ঞা যদি, কি ঘটিবে তবে?
হেরি নিঃসহায় তোমা আপনার পুরে,
রাখে যদি বন্দী করি, কেবা উদ্ধারিবে?
মৃগেন্দ্র-শাবকে ব্যাধ গিরিগুহা হ'তে
চুরি করি আনে গৃহে; কিন্তু পলে পলে
উচাটয়ে চিত্ত তার; পত্রের মর্ম্মরে,
বায়ুর গর্জ্জনে, ভীম জলদ হুঙ্কারে,
ভাবে মনে,পশুরাজ আসিছে অদূরে
সংহারিতে প্রাণ তার; ব্যাকুলিত চিতে
অনিদ্রা অশান্তি শেষে না পারি সহিতে
মুক্ত করে সিংহশাবে; কিন্তু সে কিরাত
পারে যদি মৃগরাজে বাঁধিতে শৃঙ্খলে
কি আনন্দ হয় তার। হে বীরকেশরি,
স্বেচ্ছায় এ ব্যাধ-পাশে প্রবেশিয়া তবে
ফলিবে কি ফল, আজি, কহতো দাসীরে।
জানি উত্তরিবে তুমি, "রাজবাক্য সখি,
অটল হিমাদ্রি সম।" কিন্তু বীরবর,
কেমনে এ দাসী তব, বিশ্বাসিবে বল
যবন-রাজের বাক্যে? ভুলেছ কি তুমি,
রাজকুল-পতি রাণা ভীমসিংহ রায়ে
কি করিলা দুষ্ট আলা? * নাহি কি স্মরণে
দুর্জ্জয় রেসীন দুর্গে পাপমতি সের,
উল্লঙ্ঘিয়া সন্ধিপত্র, বধিলা কেমনে
হিন্দু-বীরবরগণে? † শতবার যারা
ভেঙেছে প্রতিজ্ঞা নিজ, কি বিস্ময় নাথ,
ভাঙিবে প্রতিজ্ঞা তারা শতাধিক বার!
কিন্তু অবিশ্বাস ক্রূর-যবন রাজনে
নহে এক মাত্র বাধা। হে বীরেন্দ্র তুমি,
ভুলিবে কি শৈশবের প্রতিজ্ঞা তোমার,
ভুলিবে কি বৃদ্ধ "দাদা"‡ অন্তিম সময়
কহিলা যে সব কথা? জন্মি ক্ষত্র কুলে
পীড়িতের আর্ত্তনাদ, ব্যথিতের ব্যথা,
চাহকি ভুলিতে তুমি? কি বুঝাবে দাসী,
তব ইষ্টদেব মূর্ত্তি, চূর্ণি পদতলে।
নিষ্পেষিছে নিত্য যারা, তা সবার সনে

* ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দীনের ব্যবহার সম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাস লেখক সাহেব টড এইরূপ লিখিয়াছেন;—"The Rajpoot, unwilling to be outdone in confidence, accompanied the king to the foot of the fortress, amidst many complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned. It was for this that Alla risked his own safety, relying on the superior faith of the Hindu. Here he had an ambush; Bheem-Sing was made prisoner,hurried away to the Tartar camp, and his liberty made dependent on the surrender of Padmini."

† সের সাহের রেসীন দুর্গ বিজয় সম্বন্ধে ভারতেতিহাস লেখক এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন;—"The garrison surrendered on terms: but when they had left the fort, the capitulation was declared null, on the authority of the legal opinion of some Mahomedan lawyers, and the Hindus, who had confided to the faith of their engagement, were attacked and cut to pieces, after a brave resistance. No motive can be discovered for this act of teachery and cruelty. There was no example to make or injury to revenge, and the days of religious fury were long since gone by; yet there is no action so atrocious in the history of any Mahomedan prince in India, except Tamerlane."

‡ দাদাজী কোণ্ডদেও শিবজীর শৈশবের অভিভাবক ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি শিবজীকে দেব ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

সন্ধিপত্র, সখ্য তব কতদিন রবে ?
উত্তেজিতে চিত্ত তব না চাহে কিঙ্করী,
কিন্তু একবার তুমি মানস নয়নে
দেখ ভারতের পানে ; ম্লেচ্ছ অত্যাচারে
হের বিকলাঙ্গ ওই দেবমূর্ত্তি কত,—
নয়নে অশ্রুর বিন্দু, ছিন্ন অঙ্গ হ'তে,
ঝরে রক্তধারা যেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে
দেখাইয়া নিজ দেহ, কহেন তোমারে,
"হের শিব, হের আজ কি দশা মোদের"।
চাহ অন্য দিকে নাথ, হের পয়স্বিনী

*　　*　　*　　*

*　　*　　ভাবি যবে আমি
নিত্য নিত্য এই দৃশ্য ঘটিছে ভারতে,
ফাটে যেন বুক মোর ; না জানি বিধাতা,
কোন মহাপাপে তোর ললাটে ভারত,
লিখিলা এ হেন দণ্ড অভাগী জননি।
গভীর নিশীথ এবে, পুরজন যত
ঘুমাইছে অকাতরে। দূর হতে ওই
বৃকের বিকট নাদ পশিছে শ্রবণে
আন্দোলিয়া তরুরাজী নিশা সমীরণ
গর্জ্জিতেছে হুহুরবে ; নগর প্রহরী,
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ তলে, "হর হর" রবে
ফুকারিছে ঘন ঘন। জাগ্রতা এ দাসী
লিখিছে এ লিপি তোমা। খুলি বাতায়ন,
কভু একদৃষ্টে চাহি দূর শূন্য পানে
হেরিতেছি নভ-ছবি ; ঘনমেঘ-মালা
ঘিরিয়াছে নভোদেশ, তারা, সুধাকর,
পলায়েছে বহুদূরে ; কিন্তু তবু নাথ,
একটী তারকা ওই পশ্চিম আকাশে
ঢালিছে উজ্জ্বল কর। ভারত-গগনে
এক মাত্র তারারূপে গৌরব তোমার
উজলিছে তথা এবে। ভেবে দেখ তুমি,
আত্ম-সমর্পণে তব কি ঘোর তিমির
গ্রাসিবে ভারতাকাশ চিরদিন তরে।

রোধি বাতায়ন, পুনঃ আসি শয্যো'পরে
আসীনা কিঙ্করী তব ; দীপালোকে ওই
প্রাচীর লম্বিত চিত্রে দেবমূর্ত্তি যত
শোভিতেছে সমুজ্জ্বল। সম্মুখে আমার
নরমুণ্ড মালা গলে বিলোল রসনা
শোভিছেন মহাকালী ; ভীম খড়্গ করে,
পদতলে মহাকাল, অসুর শোণিত
রঞ্জিয়াছে দশদিক্। দেবীর দক্ষিণে
করাল-ভৈরব ওই, ভ্রূকুটী বদনে,
সংহার ত্রিশূল করে। নরসিংহ দেব
শোভিছেন বামদিকে, বিদারিয়া নখে
পাপ অসুরের বক্ষ, অট্টহাসি মুখে
নয়নে অনল শিখা। তাঁ সবার মাঝে
হে বীরেন্দ্র, শৈশবের বীরত্ব তোমার
শোভিতেছে চিত্ররূপে। রাজসভা মাঝে
বসি বীরাসনে তুমি, যবন সম্রাট
বিস্মিত, স্তম্ভিত তব শিশুমুখ পানে
চাহি আছে অনিমেষে ; বৃদ্ধ মহারাজ,
হর্ষ-লজ্জা-ভয়-চিন্তা-অঙ্কিত বদনে
দাঁড়াইয়া এক দিকে। সিংহ শিশু সম
নির্ভীক, নিশ্চিন্ত তুমি ; বদনে তোমার
ভাতিছে মহিমা ছটা। অনুরোধে মোর,
আঁকিয়াছে রাজশিল্পী এই চিত্র তব ;
নিত্য নিত্য এই চিত্র পূজে এ কিঙ্করী,
নিত্য গরবিণী দাসী এ চিত্র নিরখি ;—
ভাবি তবে দেখ তুমি, যবনের পদে
আত্ম-সমর্পণে তব, অধিনীর প্রাণে
কি সন্তাপ, কি বেদনা বাজিবে নৃমণি।*

* শিবাজীর বাল্যকালের একটী সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া, উপরি উল্লিখিত পংক্তিগুলি কল্পিত হইয়াছে। শৈশবে পিতার সহিত বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, বালক শিবাজী তৎকালে মুসলমান সম্রাটদিগের সম্মুখে যেরূপ রীতিতে উপবেশন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে "বীরাসনে" উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

জানি আমি মহাবল যবন ভূপতি,
জানি মহারাষ্ট্রগণ সম্মুখ সমরে
নহে সমকক্ষ তার। কিন্তু বীরবর
আপনি ভবানী যাঁরে সমর বিজয়ে
অর্পিলেন নিজ খড়্গ কে আঁটিবে তাঁরে?
গো-ব্রাহ্মণ বধে এই যবনের দল
হইতেছে তেজোহীন; জীর্ণ গৃহ সম
প্রচণ্ড ঝটিকারূপী বিক্রমে তোমার
হইবেক ভূমিসাৎ। আপনি মঙ্গলা
সুপ্রসন্না যাঁর প্রতি, হে বীর-কেশরি,
তাঁর অমঙ্গল কভু সম্ভব কি ভবে?
কহি এবে শুন নাথ, অপূর্ব্ব বারতা,
গত অমাবস্যা দিনে শ্বশ্রূদেবী মোরে
সঙ্গে লয়ে, গিয়াছিলা পূজিবার আশে
"কঙ্কণ-কালিকা" মায়ে। নিশা সমাগমে
শ্রান্ত, ক্লান্ত-দেহ দোঁহে মন্দিরের মাঝে
ঘুমাইনু পীঠ-তলে; প্রভাত সময়,
হেরিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, কি কহিব নাথ,
এখন এ দেহ মোর, স্মরি সে স্বপন,
হইতেছে রোমাঞ্চিত; নিজে মহাকালী,
(সে অরূপ রূপ ছটা পারি না বর্ণিতে)
ঘনশ্যামা, ত্রিনয়না, অর্দ্ধশশী ভালে,
নাগিনী জড়িত বেণী শোভে পৃষ্ঠদেশে,
কহিলেন মোরে আসি; "কেন সখি তুই,
কাঁদিস্ বিবশা হেন, প্রাণপতি তোর
আশ্রিত, পালিত মোর; ত্রিজগৎ মাঝে
কার সাধ্য স্পর্শে তারে? ওই দেখ্ চেয়ে"
হেরিনু বিস্ময়ে আমি রণসভা মাঝে
বসি উচ্চাসনে তুমি; বিরিয়া তোমারে
শত মহারাষ্ট্রবীর; বন্দিনীর বেশে
অশ্রুসিক্তমুখী এক যবন-যুবতী
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব; সৌন্দর্য্যে বামার
আলোকিছে সভাতল; সে মোহন রূপে
মুগ্ধ কত বীরবর অপাঙ্গ ভঙ্গিতে
হেরিছেন মুখ তার; ক্ষমিও প্রাণেশ,
কাঁপিল হৃদয় মোর। কিন্তু ঋষিসম
হেরিনু অটল তুমি; মাতৃ সম্বোধনে,
সম্বোধিয়া রমণীরে, সুমধুর ভাষে
কহিলে বীরেশ তুমি, "মাতঃ, গর্ভে তব
জন্মিতাম আমি যদি, তোমারই সমান
আমারও সুন্দর রূপ হইত, মা তবে।"
ডাকি অনুচরে পরে আদেশিলে তুমি
বস্ত্র অলঙ্কার দানে তুষিয়া বামারে,
পাঠাইতে নিজগৃহে; আনন্দের ধারা
বহিল নয়নে মোর; সম্বোধিয়া মোরে
কহিলেন ভগবতী, "সতীগণ যত
আমার আশ্রিত সবে; সতী নারী প্রতি
এ হেন সম্মান যার, অবনী-মণ্ডলে
তার কি বিপদ সখি, ঘটেরে কখন?
যা চলি আপন গৃহে, চিন্তা নাই তোর।"
ভাঙ্গিল স্বপন মোর, শাশুড়ীর পদে
কহিনু সকল কথা, হাসিয়া জননী
কহিলেন, "সত্য বধু, সত্য, শিব মোর
ঋষিসম রিপুজয়ী; নহে বহুদিন,
"কল্যাণ" বিজয়ে এক যবন নারীরে
তুষিয়াছে হেনভাবে, এ বারতা তুমি
শুন নাই এত দিন? সত্য স্বপ্ন তব।"
আনন্দে বিস্ময়ে প্রাণ ভাসিল আমার,
উদ্দেশে তোমার পদে নমি শত বার,
ভাবিলাম মনে আমি, কি ছার যবন,
সমগ্র পৃথিবী যদি হয় সম্মিলিত,
তথাপি তোমারে কভু নারিবে জিনিতে,
আত্মজিতে জিনে কেবা? পুণ্য ভিত্তি'পরে
স্থাপিলে যে রাজ্য তুমি, প্রতাপে তাহার
যবনের সিংহাসন টলিবে নিশ্চয়।*

---

* এই কয়েকটী পংক্তি যে সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত তাহা বোধ হয় আর পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। যাঁহারা শিবাজীর চরিত্রের একদেশ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ঘৃণনীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহারা অতি ঘোর প্রবঞ্চক।

নারী দাসী, নারীপ্রাণে উঠে যে বাসনা
কহে সে পতির পদে; আদরে তোমার
চির আদরিণী দাসী, কহিবে চরণে
(ক্ষমিও প্রাণেশ তুমি) কি বাসনা তার।
কিশোর বয়স যবে, বিবাহের পরে
লইয়া সঙ্গিনী বৃন্দে, একাদশী দিনে
যাইতাম দেবালয়ে; শুনিতাম সেথা
মধুর পুরাণ কথা। গাইতেন কবি,
জনম-দুঃখিনী দেবী জনক নন্দিনী,
কেমনে পবন পুত্রে অভিজ্ঞান মণি
সঁপিয়া কহিলা তায়,—"যাও বীরবর,
কহিও প্রাণেশে মোর, সর্ব্বংসহা-সুতা
নহে অসহিষ্ণু সীতা, জপি রাম নাম
সহস্র বৎসর সীতা পারে সহিবারে
নিদারুণ কারা-ক্লেশ, কিন্তু তব পদে
এই নিবেদন তার, রঘুরাজ-বধূ
হে বীরেন্দ্র, চোরবেশে আনিল যে হরি,
হৃদয়-শোণিতে তার না তর্পি মহীরে,
উচিত কি তব এই অশ্রু বিসর্জ্জন,
রঘুবংশধর তুমি?" বসি দ্বৈত-বনে,
গাইতেন কভু কবি, পাঞ্চাল-কুমারী
অগ্নিশিখা রূপী বামা দ্রৌপদী কেমনে
পৃষ্ঠে আলুলিত বেণী চীর-পরিধানা,
কহিলেন ধর্ম্মরাজে, "কঠিন পাষাণে
বেঁধেছ কি মহারাজ অন্তর তোমার?
এই ভ্রাতৃগণে, এই দুঃখিনী দাসীরে,
নিরখি না হয় দয়া? রাজ-সভা মাঝে
রজঃস্বলা রমণীরে আকর্ষিয়া বলে
বিবস্ত্রা করিল যারা, এখনও তা'সবে
চাহ ক্ষমিবারে তুমি? ধন্য! মহারাজ,
ধন্য সহিষ্ণুতা তব।" আবার কখন
সারঙ্গে তুলিয়া তান, গাইতেন কবি,
বিজয়ী বীরেন্দ্র বৃন্দ রণক্ষেত্র হতে
ফিরিতেন গৃহে যবে, কুলবালা যত
উচ্চে বাজাইয়া শঙ্খ, জয়মাল্য দিয়া
বরিতেন তা সবায়; কিশোর হৃদয়
উচ্ছ্বসিত হ'ত মম; ভাবিতাম মনে
হে বিধাতঃ, হেন দিন অধিনীর ভালে
আসিবে কি বল কভু; রণক্ষেত্র হতে
প্রাণেশ আমার যবে জিনি রিপুগণে
আসিবেন গৃহে ফিরি, লয়ে সখী দলে,
ধাইব উল্লাসে আমি জয় মাল্য দিয়া,
বরণ করিতে নাথে? কিশোরের আশা
অঙ্কুরিত এবে নাথ, না ফলিতে ফল
নিষ্ঠুরের মত পদে দলিবে কি তুমি?
রাজরাণী উচ্চপদ নাহি চাহে সখী,
কিঙ্করী তোমার চির রহিবে কিঙ্করী
কি সম্মান তার হ'তে? রাজ-রাজরূপে
বিরাজিবে তুমি, শুধু এই চাহে দাসী।
বীর তুমি, উদ্ধারিতে বৃদ্ধ মহারাজে
লহ তীক্ষ্ণ অসি করে; দলি রিপুদলে,
দেখাও যবনে নাথ, সুপ্ত হিন্দুজাতি
হয়েছে জাগ্রত এবে; এ ভারত ভূমে
তব সম রাজনীতি কে পারে বুঝিতে?
কর সদুপায় যাহা। কিন্তু, ভীরুসম,
আত্ম-সমর্পণ কভু সাজে কি তোমারে?
বজ্রনাদে পশুরাজ করে প্রতিধ্বনি,
লুকায় বিবরে শিবা। ভুলোনা প্রাণেশ,
কোটী অনিমেষ আঁখি চাহি তব পানে
দেব, দ্বিজ, ধেনু, বৎস, আছে আশালয়ে
ভুলোনা তা'সবে তুমি, স্মরিবে যখন
বন্দী বৃদ্ধ মহারাজ, স্মরিও অমনি,
বন্দী মাতৃভূমি তব যবনের করে।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

---

* যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এই কবিতাটী স্থাপিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক Grant Duff সাহেব তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;— "Sivajee, when heard of the imprison-

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (২)

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাচীন বংশাবলী।

নেপালের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত। ইংরেজ রেসিডেণ্ট জেনারেল কার্কপেট্রিক সাহেব খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, খাটমণ্ডু নগরে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। তিনি স্বপ্রণীত নেপালের বিবরণে

ment and danger which threatened his father, is said to have entertained thoughts of submitting; but if he ever seriously intended to adopt such a plan, it was overruled by the opinion of his wife, Sukhee Bayee, who represented that he had a better chance of effecting Sahajee's liberty by maintainining his present power than by trusting to the mercy of a government notoriously treacherous."

মহারাষ্ট্র লেখকগণ,এই ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"শিবাজী পিতার কারারোধের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া,চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—"পিতা দেবতা স্বরূপ। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত। কিন্তু পৃথিবী হইতে সমস্ত ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া,সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছময় হইয়াছে। ম্লেচ্ছগণের উচ্ছেদ সাধন ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য আজীবন পরিশ্রম করা, আমাদের কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই শ্রেয়স্কর মার্গ অবলম্বন করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় পিতার আদেশ পালন করাই বা কিরূপে ঘটিয়া উঠে ? এদিকে আবার আমার জন্য পিতার উপর সুলতান রুষ্ট, সেজন্য পিতা হয়ত কতই কষ্ট পাইতেছেন। ইহারই বা কি উপায় করিব ?" শিবাজী এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী সখী বাই তাঁহাকে তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,"পিতার এইরূপ পত্র আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে কি করিব তাহাই ভাবিতেছি। ভাল, এ বিষয়ে তোমার মত কি ?" ইহা শুনিয়া সখী বাই বলিলেন ;—আমি সামান্য স্ত্রী লোক.; এ বিষয়ে আমি আপনাকে কি পরামর্শ দিতে পারি ? বিশেষতঃ শাস্ত্রে বলে, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংগতা"। মহারাজের নিকট অনেক ভাল ভাল মন্ত্রণাকুশল"কারকুন" ও সেনাপতি আছেন, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ

নেপালের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহের সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা করেন। তিনি পার্ব্বতীয় (নেপালী) ভাষায় লিখিত 'বংশাবলী' অবলম্বনে নেপালের বিভিন্ন প্রাচীন রাজবংশের এক তালিকা প্রকাশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ James Prinsep সাহেব সেই তালিকা স্বরচিত 'Useful Table' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে নিবিষ্ট করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ সুপণ্ডিত ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রাজী নেপালের পুরাতত্ত্ব সংগ্র-

করিয়া কার্য্য করাই ভাল। তথাপি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,তখন বলিতেছি যে, "আমার বিবেচনায় রাজ্যসাধন ও দেব ব্রাহ্মণাদির রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সংস্থাপনের যে অভিলাষ আপনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাহা আপনার মত মহাজনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও স্বাভাবিক। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া, অবলম্বিত পথে অগ্রসর হউন্। অভীষ্টপ্রদান করিতে ভগবানই সমর্থ। কটিদেশে তরবারি বন্ধন করুন্। পরে যাহা ঘটিবার হয়, ঘটিবে। ভবানীর যেরূপ নির্ব্বন্ধ সেইরূপ ঘটিবে। রাজ্যসাধন করিতে হইলে মোহের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। বৃদ্ধ মহারাজ দূরদেশে আছেন ; নচেৎ তিনি আপনার এই সাধু উদ্যম দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেন। আপনি যখন সুলতানের দুর্গাদি অধিকার করিয়াছেন, তখন তিনি যে আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নয়। বৃদ্ধ মহারাজের উদ্ধারের জন্য যাহা করিতে হয়, এখান হইতেই করুন্, সুলতানের নিকট গমন কর্ত্তব্য নয়।"

শিবাজী সম্বন্ধীয় মহারাষ্ট্র-বখরের শ্রীমান্ সখারাম গণেশ দেউস্কর কৃত অপ্রকাশিত অনুবাদ হইতে গৃহীত।

৪র্থ বর্ষের "সাহিত্যে" শ্রীমান্ সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত শিবাজী বিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিলে, পাঠক, এই কবিতায় উল্লিখিত অনেক ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। লেখক।

হের জন্য জুনাগড়ের নবাব সাহেবের ব্যয়ে নেপালে উপনীত হন। তিনি কৈলাস পর্ব্বত স্বামীর নিকট সেই পার্ব্বতীয় 'বংশাবলী' দর্শন করেন। ডাক্তার রাইট সাহেব যে দ্বিতীয় 'বংশাবলী' অবলম্বনে স্বপ্রণীত নেপালের ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তাহা ললিতপত্তনের 'মহাবুদ্ধবিহার'বাসী এক বৌদ্ধ যতি দ্বারা শতবর্ষেরও অধিক পূর্ব্বে পার্ব্বতীয় ভাষায় লিখিত হয়। ললিতপত্তনের ব্রজাচার্য্য তাহার এক প্রতিলিপি ডাক্তার ভগবান লালকে প্রদান করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ সপ্তমভাগ Indian Antiquary পত্রিকার ৮৯-৯২ পৃষ্ঠায় এই উভয় বংশাবলী প্রকাশিত হয়। নেওয়ারী ভাষায়ও কতিপয় বংশাবলী বিদ্যমান আছে বলিয়া, পণ্ডিত ভগবানলাল অবগত হন। কিন্তু তাহার একখানি প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। এই সকল বংশাবলীর নামমালা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শাসনকাল নিতান্ত অপ্রামাণিক ও অবিশ্বাস্য। নেপালের প্রাচীনতম ইতিহাস সংগ্রহের জন্য অন্য কোন উপায় নাই। বংশাবলীর নামমালায় কি পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। আমরা প্রথমতঃ বংশাবলীর অনৈতিহাসিক কালের বিবরণ প্রদান করিয়া ডাক্তর ভগবানলাল ইন্দ্রাজী, বুলার ও বেণ্ডাল সাহেবের প্রকাশিত তাম্রশাসন সমূহ হইতে নেপালের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রবাদ আছে, নেপাল মুনি নেপালের প্রথম রাজা। তাঁহার নাম অনুসারে সমগ্র দেশের নামকরণ হয়। তিনি যে "গোপাল" বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, বংশাবলীর মতে তাহা আটপুরুষে ৫২১বৎসর রাজত্ব করে। মাতাতীর্থ নামক স্থানে এই বংশের রাজধানী স্থাপিত ছিল। ৭২ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশীয় অষ্টম রাজা যক্ষগুপ্ত নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, নেপালে "আহীর" বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আহীরবংশীয় তৃতীয় ভুবনসিংহকে পরাজিত করিয়া, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে "কিরাত"বংশীয় যলম্বর নেপালে আধিপত্য সংস্থাপিত করে। দ্বাপর যুগ শেষ হওয়ার বার বৎসর পূর্ব্ব হইতে নেপাল কিরাতবংশের অধিকারভুক্ত হয়। গোকর্ণ নগরে কিরাতবংশীয় ২৯ জন রাজা ১১১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। কিরাতবংশীয় সপ্তম রাজা জিতেদাস্তির সময়ে বুদ্ধদেব নেপালে আগমন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা মহাভারত-বর্ণিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিহত হন। ট্রয়ের যুদ্ধে যেমন গ্রীসদেশের সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের নরপতিগণ গমন করিয়া মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যে স্থান প্রাপ্তি হেতু অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় যাবতীয় রাজন্যবর্গ সেইরূপ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

বংশাবলীর মতে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নেপালরাজ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে সমরে নিহত হইয়াছেন!! বংশাবলীর মতে "ভুক্তমানগত" গোপালবংশের প্রথম রাজা! তিনি ৮৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বংশাবলীর কাল্পনিক নামাবলী ও শাসন কালের অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।* কিরাতবংশীয় চতুর্দ্দশ-

* গোপালবংশ (৫২১)।—১। ভুক্তমানগত (৮৮) ২। জয়গুপ্ত (৭২) ৩। পরমগুপ্ত (৮০) ৪। হর্ষগুপ্ত (৯৩) ৫। ভীমগুপ্ত (৩৮) ৬। মণিগুপ্ত (৩৭) ৭। বিষ্ণুগুপ্ত (৪২) ৮। যক্ষগুপ্ত (৭২)

তম নৃপতির সময়ে মগধের মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের আধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ অশোক স্বয়ং নেপালে আগমন করেন। অশোকের তনয়া রূপমতীর সহিত ক্ষত্রিয় জাতীয় দেবপালের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। দেবপাল নেপালে উপনিবিষ্ট হইয়া পশুপতি মন্দিরের সমীপে দেবপত্তন নগর সংস্থাপিত করেন। কিরাতবংশীয় অষ্টবিংশতম রাজা সোমবংশী রাজপুতদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, শঙ্খমূলতীর্থে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র ললিতপত্তনের নিকটবর্ত্তী ফুলোচ্ছা নগরে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অবশেষে সোমবংশীয় নিমিষের আক্রমণে তিনি পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন।

সোমবংশীয় চতুর্থ রাজা ১৮৩৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পশুপতির মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু তাঁহার শাসন কালে নেপালে উপনিবিষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র ভাস্করবর্ম্মণ সমগ্র ভারতবর্ষে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া রাজধানী দেবপাটনের বিস্তৃতি সাধন করেন। তিনি পশুপতির পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে বিবিধ নিয়মাবলী প্রণয়ন পূর্ব্বক, তাহা এক তাম্রপত্রে খোদিত করাইয়া চারুমতী বিহারে রক্ষিত করেন। পাঁচপুরুষে সোমবংশ ৬০৬ বৎসর নেপালে রাজত্ব করেন। সোমবংশীয় শেষ রাজা ভাস্করবর্ম্মণের কোন পুত্র সন্তান না হওয়াতে, তিনি সূর্য্যবংশীয় ভূমিবর্ম্মণকে দত্তক গ্রহণ করেন। সূর্য্যবংশীয় ৩১ জন নরপতি (১৭১২-১০১ খ্রীঃ পূঃ) পর্য্যন্ত ১৬১১ বৎসর রাজত্ব করেন।

সূর্য্যবংশীয় একাদশ রাজা হরিদত্ত বর্ম্মণের সময় চাঙ্গু নারায়ণ, চৈঞ্জু নারায়ণ, ইচঙ্গু নারায়ণ, ও শিখর নারায়ণের চারিটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি বুড্ডা নীলকণ্ঠ নামক স্থানে জলশয়ন দেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশীয় অষ্টাদশ রাজা বৃষদেব বর্ম্মণের ভ্রাতা বালার্চ্চন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা স্বয়ং নানাবিধ বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত করাইয়া তন্মধ্যে লোকেশ্বর ও অন্যান্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বৃষদেব বর্ম্মণের সময়ে শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথ হইতে নেপালে আগমন করিয়া, তথায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃষদেবের পুত্র শঙ্করদেব পশুপতির মন্দিরের শিরোভাগে এক ত্রিশূল প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করের পৌত্র মানদেব মতিরাজ্যের নিকট চক্রবিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। সূর্য্যবংশীয় সপ্তবিংশতিতম রাজা শিবদেব বর্ম্মণ দেবপাটন নগরের বিবিধ সংস্কার সাধন করিয়া তথায় আপনার রাজধানী আনয়ন করেন। তিনি প্রথমতঃ শক্তির উপাসক ছিলেন। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করেন। তাঁহার পুত্র পুণ্যদেব বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সূর্য্যবংশীয় একত্রিংশত্তম নরপতি বিশ্বদেববর্ম্মণের সময়ে নেপালে বিক্রমাদিত্য আগমন করেন। তদবধি নেপালে সংব-

---

(২) আহীর বংশ।—১। বরসিংহ ২। জয়মতি সিংহ ৩। ভুবন সিংহ।

(৩) কিরাতবংশ (১১১৮)।—১। যলম্বর,২। পবি, ৩। স্কন্ধর, ৪। বলম্ব, ৫। হৃতি, ৬। হুমতি, ৭। জিতেদাস্তি,৮। গলি,৯। পুষ্ক,১০। সুবর্ম্ম,১১। পর্ব্ব,১২। থুনকা,১৩। স্বানন্দ,১৪। স্থুনকো, ১৫। গিধরি, ১৬। নমে,১৭। লুক,১৮। থোর,১৯। থোকো,২০। বর্ম্ম, ২১। গুঞ্জ,২২। পুষ্কর,২৩। কেশু,২৪। সুংস,২৫। সম্মু, ২৫। গুণন,২৬। খিম্মু,২৭। পটুক,২৮। গস্তি।

(৪) সোমবংশ।—১। নিমিষ,২। মণাক্ষ, ৩। কাকবর্দ্ধন, ৪। পশুপ্রেক্ষদেব, ৫। ভাস্করবর্ম্মণ।

তাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। বিশ্বদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা অংশুবর্ম্মন ১০১খ্রীঃ পূঃ নেপালে ঠাকুরীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যলখু নামক স্থানে অংশুবর্ম্মণ রাজধানী স্থাপিত করেন।

১০১ খ্রীঃপূঃ অংশুবর্ম্মন নেপালে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ৯৯১ বৎসর পর্য্যন্ত (১০১ খ্রীঃ পূঃ—৮৯০ খ্রীঃ) নেপালে রাজত্ব করে। এই বংশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন নৃপতি আবির্ভূত হন। অংশুবর্ম্মনের ভ্রাতা বিভুবর্ম্মন এক সপ্তমুখী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত করেন। ঠাকুরীবংশীয় চতুর্থ রাজা নন্দদেবের সময়ে শালিবাহনের শকাব্দ নেপালে প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার পুত্র বীরদেব ললিতপট্টন নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। ললিত নামক এক জন সামান্য ঘাসবিক্রেতার নাম অনুসারে নগরের নামকরণ হয়। তিনি দেবমন্দির, জলাশয় ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি নির্ম্মিত করাইয়া নগরীর সৌষ্ঠব বিধান করেন। দেবমন্দিরে শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য হিন্দু দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজার ইষ্টদেবতা মণিযোগিনীর নাম অনুসারে ললিতপট্টন নগরে মণিতালাও নামে এক সরোবর খনিত হয়। এই বংশীয় সপ্তম রাজা নরেন্দ্রদেব লোত্রীদেবীর নিকটে তীর্থবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহা পিতার গুরুদেবের পুত্র বন্ধুদত্ত আচার্য্যের আবাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। নরেন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র পদ্মদেব ও মধ্যম পুত্র রত্নদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, তৃতীয় পুত্র বরদেব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। বরদেব ললিতপট্টনে রাজধানী স্থাপিত করেন। শঙ্করাচার্য্য এই সময়ে নেপালে আগমন করেন। ৫২২খ্রীঃ বরদেবের রাজত্বকালে অবলোকিতেশ্বর নেপালে উপনীত হন। বরদেবের পুত্র বর্দ্ধমানদেব সাঙ্কু নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উগ্রতারা দেবীর মন্দির স্থাপন করেন। ঠাকুরীবংশীয় পঞ্চদশতম রাজা গুণকামদেব ৭২৩খ্রীঃ বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে কান্তিপুর নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই উত্তরকালে কাটমণ্ডু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যেখানে বিক্রমাদিত্যের সংস্থাপিত প্রাচীন বিহার বিদ্যমান ছিল, তথায় রাজা গুণকামদেব থান্‌হেল নামে গ্রাম স্থাপন করেন। এই বংশীয় অষ্টাদশতম রাজা জয়কামদেব নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে বাইশ ঠাকুরীবংশের এক শাখা নবাকোট হইতে আগমন পূর্ব্বক ললিতপট্টনের সিংহাসনে আরূঢ় হয়।

ভাস্করদেব এই বংশের প্রথম রাজা। এই বংশীয় পঞ্চম রাজা শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর ঠাকুরীবংশীয় বামদেব নেপালের সিংহাসন অধিকার করেন। ললিতপট্টন ও কান্তিপুরের সামন্তরাজগণ এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করে।

বামদেবের পৌত্র সদাশিবদেব কাটমণ্ডু নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে কীর্ত্তিপুর নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৭৫০খ্রীঃ পশুপতির মন্দিরের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। তিনি লৌহমিশ্রিত যে তাম্রমুদ্রা নেপালে প্রচলিত করেন, তাহার পৃষ্ঠভাগে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইতে থাকে। দশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর তাঁহার পুত্র মানদেব সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া চক্রবিহারে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই বংশীয় সপ্তম রাজা রুদ্রদেব ১৯ বৎসর রাজত্বের পর বৌদ্ধযতির বেশধারণ করিয়া শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত হন। রুদ্রদেবের পৌত্র অরিদেব যখন মল্লযুদ্ধে নিরত ছিলেন, তখন তাঁহার মহিষী এক পুত্র-রত্ন প্রসব

করেন। রাজা রাজকুমারের নাম অভয়মল্ল রাখেন। অভয়মল্লের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেবমল্ল ৮৮০খ্রীঃ পৈতৃক সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, নেপালী সংবৎ প্রচলিত করেন। তিনি কান্তিপুর ও ললিতপট্টন শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমল্ল ভক্তপুর (ভাটগাঁ) নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বেণীপুর, পনৌতি, নালা, ধোমখেল, খড়পু (যড়পু) চৌকট ও সাঙ্গা নামে সাতটী নগর শাসন করিতে থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে বংশাবলী হইতে গোপাল, আহীর, কিরাত ও সোমবংশীয় নৃপতিবর্গের নামমালা ও শাসনকালের পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যবংশ ও ঠাকুরীবংশের নামাবলী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বংশাবলীর সময় নির্দ্দেশ যে নিতান্ত অসত্য ও কাল্পনিক, তাহা প্রামাণিক শাসনপত্রের সাহায্যে পরে প্রদর্শন করিব। গোপাল ও কিরাতবংশের রাজত্বকাল বংশাবলীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আহীর ও সোমবংশের নৃপতিগণের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গোপালবংশীয় ৮ জন রাজা ৫২১ বৎসর, কিরাতবংশীয় ২৯ জন ১১১৮ বৎসর, সোম বংশীয় ৫ জন ৬০৬ বৎসর, সূর্য্যবংশীয় ৩১জন ১৬১১ বৎসর এবং ঠাকুরীবংশীয় ৩৪জন ৯৯১ বৎসর নেপালে রাজত্ব করেন। আহীরবংশীয় তিন জন রাজার শাসনকাল ৩০৩ বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, বংশাবলীর মতে ১১০ জন নরপতি নেপালে ৫১৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। গড়ে প্রত্যেকে ৪৭ বৎসর রাজ্যশাসন করেন।

বংশাবলীর মতে মহাভারতীয় কুরুপাণ্ডব-সমরের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব নেপালে আগমন করেন। তখন কিরাতবংশীয় সপ্তম রাজা জিতেদাস্তি নেপালের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া সমরে নিহত হন। ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অলীক। কিন্তু ইহা হইতে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, বুদ্ধদেবের নেপালে আগমনের পর হইতে তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হয় এবং বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রচারার্থ নেপালে আগমন করেন। ইহাহইতে পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী নেপালরাজবংশ সমূহের আনুমানিক সময় নির্ণীত হইতে পারে।

---

(৫) সূর্য্যবংশ।—১। ভূমিবর্ম্মন, ২। চন্দ্রবর্ম্মন (৬১) ৩। জয়বর্ম্মন (৮২) ৪। বর্ষবর্ম্মন (৬১) ৫। সর্ব্ব-বর্ম্মন (৭৮) ৬। পৃথ্বীবর্ম্মন (৭৬) ৭। জ্যেষ্ঠবর্ম্মন (৭৫) ৮। হরিবর্ম্মন (৭৬) ৯। কুবের বর্ম্মন (৮৮) ১০। সিদ্ধি-বর্ম্মন (৬১) ১১। হরিদত্তবর্ম্মন (৮১) ১২। বসুদত্তবর্ম্মন (৬৩) ১৩। পতিবর্ম্মন (৫৩) ১৪। শিব বৃদ্ধিবর্ম্মন (৫৪) ১৫। বসন্তবর্ম্মন (৬১) ১৬। শিববর্ম্মন (৬২) ১৭। রুদ্রদেব বর্ম্মন (৬৬) ১৮। বৃষদেববর্ম্মন (৬১) ১৯। শঙ্করদেব (৬৫) ২০। ধর্ম্মদেব (৫৯) ২১। মানদেব (৪৯) ২২। মহীদেব (৫১) ২৩। বসন্তদেব (৩৬) ২৪। উদয়দেব বর্ম্মন (৩৫) ২৫। মানদেববর্ম্মন (৩৫) ২৬। গুণকামদেব বর্ম্মন (৩০) ২৭। শিবদেববর্ম্মন (৫১) ২৮। নরেন্দ্রদেব বর্ম্মন (৪২) ২৯। ভীমদেব বর্ম্মন (৩৬) ৩০। বিষ্ণুদেব বর্ম্মন (৪৭) ৩১। বিশ্বদেববর্ম্মন (৫১)।

(৬) ঠাকুরীবংশ।—১। অংশুবর্ম্মন (৬৮) ২। কৃতবর্ম্মন (৮৭) ৩। ভীমার্জ্জুন (৯৩) ৪। নন্দদেব (২৫) ৫। বীরদেব (৯৫) ৬। চন্দ্রকেতুদেব, ৭। নরেন্দ্রদেব, ৮। বরদেব, ৯। শঙ্করদেব,(১২) ১০। বর্দ্ধমানদেব,(১৩) ১১। বলিদেব (১৩) ১২। জয়দেব (১৫) ১৩। বালার্জ্জুনদেব (১৭) ১৪। বিক্রমদেব (১২) ১৫। গুণকামদেব (৫১) ১৬। ভোজদেব (৮) ১৭। লক্ষ্মীকাম দেব (২২) ১৮। জয়কামদেব (২০)।

১৯। ভাস্করদেব, ২০। বলদেব, ২১। পদ্মদেব,২২। নাগার্জ্জুনদেব, ২৩। শঙ্করদেব।

২৪। বামদেব,২৫। হর্ষদেব,২৬। সদাশিবদেব, ২৭। মানদেব, (১০) ২৮। নরসিংহদেব (২২) ২৯। নন্দদেব (২১) ৩০। রুদ্রদেব (১৯) ৩১। মিত্রদেব (২১) ৩২। অরিদেব (২২) ৩৩। অভয়মল্ল, ৩৪। জয়দেবমল্ল (১০) ও আনন্দ মল্ল (২৫)।

৫৫৮খ্রীঃপূঃ কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত হন। পরে পরমজ্ঞান লাভ করিয়া, তিনি বুদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৪৭৮ খ্রীঃপূঃ ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। অনুমান ৫০০ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধদেব নেপালে গমন করিয়া থাকিলে, তাঁহার সমকালিক রাজা জিতেদাস্তি সেই সময়ে নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চারি পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে,৬৫০খ্রীঃপূঃ কিরাতবংশের আধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে আহীরবংশকে ৭২৫খ্রীপূঃ এবং গোপালবংশকে ৯২৫ খ্রীঃপূঃ নেপালে প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠিত পাওয়া যাইতেছে। বংশাবলীর নামমালাকে অভ্রান্ত ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন দশম শতাব্দীতে নেপালের আদিম গোপাল রাজবংশ সংস্থাপিত হয়। এত প্রাচীনকালের ঘটনা যে নানা কল্পনা জল্পনায় পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

কিরাতবংশের শাসনকালে অপর একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বংশাবলীর মতে এই বংশীয় চতুর্দ্দশতম রাজা স্থুঙ্কোর সময়ে মগধের বৌদ্ধসম্রাট অশোক (প্রিয়দর্শী) নেপালে আগমন করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ২১৮ বৎসর পরে (২৬০ খ্রীঃপূঃ) মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ২৬০-২২৩ খ্রীঃপূঃ পর্য্যন্ত মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জিতেদাস্তি হইতে স্থুঙ্কো ছয় পুরুষ অন্তর। নেপালের রাজবংশাবলী হইতে ৩২৫ খ্রীঃ পূঃ স্থুঙ্কো ও অশোকের আবির্ভাবকাল পাওয়া যাইতেছে। এই সময় গণনার প্রকৃত সময় হইতে অশোকের সময় ৪৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু সিংহলের প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশের নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত এই সময় নির্ণয় সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। মহাবংশের মতে ৫৪৩ খ্রীঃপূঃ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই ঘটনার ২১৮ বৎসর পরে (৩২৫ খ্রীঃপূঃ) অশোক পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহলের ইতিহাসের প্রামাণিকত্ব দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

২৬০ খ্রীঃপূঃ স্থুঙ্কোর সিংহাসন লাভের সময় অনুমান করিয়া, তাহার শেষ বংশধর গস্তির রাজ্যচ্যুতির সময় ১৪০ খ্রীঃ পাওয়া যাইতেছে। তৎপর সোমবংশ পাঁচ পুরুষে ১২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, গোপালবংশ (৯২৫-৭২৫ খ্রীঃপূঃ), আহীর বংশ (৭২৫-৬৫০ খ্রীঃপূঃ),কিরাতবংশ (৬৫০খ্রীঃ পূঃ-১৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সোমবংশ (১৪০-২৬৫খ্রীঃ) পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন। এই গণনা অনুসারে সোমবংশীয় চতুর্থ রাজা পশুপ্রেক্ষ দেব (২১৫-৪০খ্রীঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু বংশাবলীর মতে ১৮৬৭ খ্রীঃপূঃ তিনি পশুপতির মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন জাতি আনয়ন করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বংশাবলীর সময় নির্দ্দেশে অন্ততঃ ২১০০ বৎসর কালের ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে। বংশাবলীর নামমালা যে অভ্রান্ত হইতে পারে না, ইহা হইতে তাহাও অনুমিত হইতেছে। যে পুস্তকের সময় নির্ণয়ে এত ভ্রম, তাহার নামমালায় যে ভ্রমপ্রমাদ নাই, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? বংশাবলীর নামমালাকে প্রামাণিক অনুমান করিয়া, ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন

রাজবংশের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সোমবংশীয় শেষ রাজা ভাস্করবর্ম্মন অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সূর্য্যবংশীয় ভূমিবর্ম্মনকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,২৬৫ খ্রীঃ ভাস্করবর্ম্মনের মৃত্যু হয়। সূর্য্যবংশীয় ভূমিবর্ম্মন (২৬৫ ৯০খ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মন (২৯০-৩১৫খ্রীঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তদনন্তর চন্দ্রবর্ম্মনের পুত্র জয়বর্ম্মন রাজপদ লাভ করেন। জয়বর্ম্মন হইতে ষোড়শতম রাজা শিববর্ম্মন পর্য্যন্ত নেপালের অধিপতিদিগের নামমালা ও আমাদের অনুমিত শাসনকাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, আমরা বংশাবলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

জয়বর্ম্মন (৩১৫-৪০খ্রীঃ) বর্ষবর্ম্মন (৩৪০-৬৫,,) সর্ব্ববর্ম্মন (৩৬৫-৯০,,) পৃথ্বীবর্ম্মন (৩৯০-৪১৫,,) জ্যেষ্ঠবর্ম্মন (৪১৫ ৪০,,) হরিবর্ম্মন(৪৪০-৬৫,,) কুবেরবর্ম্মন (৪৬৫-৯০,,) সিদ্ধিবর্ম্মন (৪৯০-৫১৫") হরিদত্তবর্ম্মন (৫১৫-৪০,,) বসুদত্তবর্ম্মন (৫৪০-৬৫,,) পতিবর্ম্মন (৫৬৫-৯০,,) শিববৃদ্ধিবর্ম্মন (৫৯০-৬১৫,,) বসন্তবর্ম্মন (৬১৫-৪০,,) শিববর্ম্মন (৬৪০-৬৭,,)।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১২)

গো-বসন্ত

জীবিত অণু সকল কিরূপে সহজে জন্মিতে অথবা একদেশ হইতে অন্যদেশে পরিচালিত হইয়া পড়িতে পারে, তাহা গো-জাতির প্রধান কয়েকটী ব্যাধির বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গোজাতিকে তিনটী প্রধান ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিতে দেখা যায়। এই তিনটী গো-বসন্ত (Anthrax) গলাফুলা রোগ (Quarterill) ও ক্ষুরে (Foot and Mouth disease)। গলাফুলা ও ক্ষুরে হইয়া বড় অধিক গরু মরে না। ক্ষুরে হইয়া কেবল বাছুরকেই মরিতে দেখা যায়, গাভী অথবা ষাঁড় বা বলদের এই রোগ হইলে প্রায়ই আপনা হইতেই আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ক্ষুরে মাইক্রোককাশ্ জাতীয় অণু বিশেষ হইতে জন্মিয়া থাকে; গলাফুলা রোগ ব্যাক্‌টিরিয়াম্ জাতীয় অণু বিশেষ হইতে জন্মিয়া থাকে; গো-বসন্ত ব্যাসিলাস্ জাতীয় অণুবিশেষ হইতে ঘটিয়া থাকে। এই তিনটী পারিভাষিক শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যাইতেছে বলিয়া এস্থলে ইহাদের ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করা আবশ্যক। এই তিন জাতীয় অণুই কখন কখন 'ব্যাক্টিরিয়া' কখন বা 'ব্যাসিলাস্' নামে অভিহিত হয়। 'ব্যাক্টিরিয়া' ও 'ব্যাসিলাস্' শব্দের বিশেষ অর্থ থাকাতে, ইহাদের সাধারণ অর্থে ব্যবহার অবিধেয় বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত অণুর আর একটী সাধারণ নাম 'শিজোমাইসিটি' অথবা 'বিভাজ্যমান অণু'। এই সাধারণ সংজ্ঞাটীই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কেন না, এই সকল অণুর বৃদ্ধির সাধারণ প্রকরণ বিভক্তি। অর্থাৎ একটী অণু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দুইটী, দুইটী বর্দ্ধিত হইয়া চারিটী, এইরূপে বিভক্ত হইয়া ইহারা অল্প কালের মধ্যেই সংখ্যাতীত হইয়া পড়ে। বিভাজ্যমান-অণুগুলি সমস্তই উদ্ভিদ জাতির অন্তর্গত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভাজ্যমান অণুগুলি দেখিলে বোধ হয় যেমন লেবুর কোষের মধ্যে যে রসপূর্ণ ছোট ছোট দানা থাকে, উহারা সেইরূপ রস ও ত্বক সম্বলিত দানা। আকারে ইহারা এত ছোট যে,অণু-

বীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা ৫০০।৭০০ গুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াও অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বা রেখা মাত্র পরিলক্ষিত হয়। কখন কখন এক একটী অণুর বেধ এক মাইক্রোমিলিমিটার অপেক্ষাও ন্যূন মাইক্রোমিলিমিটার মিলিমিটারের সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র; আবার মিলিমিটার মিটারের সহস্রাংশের এক অংশ, এবং এক ইঞ্চি='০২৫৪ মিটার। সকল অণুর আকার সমান নহে। মানুষের বসন্ত রোগের রস অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে ৫০০ গুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া দেখিলে উহা কতকগুলি বিন্দু সম্বলিত বলিয়া মনে হয়। এই বিন্দুগুলি মাইক্রোককাস্। কুক্কুটের গুটির এবং ক্ষুরে রোগের রস ঐরূপে পরীক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের বিন্দু দেখা যায়, অর্থাৎ তাহাদের আবর্ত্ত রেখা ও মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তুলাকার স্থল উভয়ই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইহারাও মাইক্রোককাস্, কেবল বৃহজ্জাতীয় মাইক্রোককাস্। গলাফুলা রোগের রস পরীক্ষা করিলে দেখা যায়,অণুগুলি গোলাকার অথবা বিন্দুর ন্যায় নহে, উহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। যে সকল অণুর দৈর্ঘ্য বিস্তারের অপেক্ষা অনেক অধিক, অপচ যাহারা সূক্ষ্মসূত্র খণ্ডের ন্যায় দৈর্ঘ্য প্রধান নহে, তাহাদের ব্যাক্টিরিয়াম্ কহে। গো-বসন্তে মৃত জন্তুর প্লীহার রক্ত পরীক্ষা করিলে ৫০০ গুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া অণুগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সূক্ষ্ম সূত্রখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ সূক্ষ্মসূত্রবৎ অণুকে "ব্যাসিলাস্" কহে। ব্যাসিলাস্গুলি যদি 'কর্ক-স্ক্রু' ভাবে পাকান মনে হয়, তবে তাহাদের 'স্পাইরিল্লাম্' এই বিশেষ আখ্যা দেওয়া হয়। একজাতীয় অণু অপর জাতীয় অণু হইতে আকার সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন নহে যে, অণুবিশেষ মাইক্রোককাস্ বা ব্যাক্টিরিয়াম্ জাতিভুক্ত অথবা ব্যাসিলাস্ বা ব্যাক্টিরিয়াম্ জাতিভুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত না হয়, বস্তুতঃ কোন কোন জাতীয় অণুকে কেহ বা ব্যাক্টিরিয়াম্ কেহ বা ব্যাসিলাস্ বলেন। গো-বসন্তের অণু সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ নাই। গো-বসন্ত ব্যাসিলাস্ বিশেষ দ্বারা ঘটিয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরোগ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই পরিলক্ষিত হয়। এই রোগেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ ধেনু মরিয়া যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ,মুসলমানেরা অথবা সাহেবেরা দেশের গোরু সমস্ত উদরসাৎ করিয়া ফেলিল, মধ্যে মধ্যে এইরূপ রব তোলেন। এই সকল আন্দোলনকারীদের গোরু, বাছুর ও কৃষকদের সহিত সম্পর্ক এত অল্প যে, তাঁহাদের মুখে গো-বসন্ত দ্বারা যে দেশের লক্ষ লক্ষ গোরু প্রতি বৎসর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে,একথা কখন শুনিতে পাই না। যখন দরিদ্র কৃষক অথবা গোপের গোষ্ঠের সমস্ত গোরুগুলিই গো-বসন্ত হইয়া মরিয়া যায়, তখন যে সে জগৎকে কিরূপ শূন্য ও পাষাণময় স্থান মনে করে,রাজনৈতিকগণ তাহা কি কখনও অনুভব করিয়াছেন? কয়েক মাস পূর্ব্বে এই মুরশিদাবাদ জেলায়, কেহ বা "আমার ১৫টী গোরুর মধ্যে ৩টীমাত্র বাঁচিয়া গিয়াছে," কেহ বা "আমার ১৬টী গোরুই মরিয়া গিয়াছে," কেহ বা "আমার দুই জোড়া বলদই মরিয়া গিয়াছে" এইরূপে কত লোকের সমক্ষে দুঃখের কাহিনী গাহিয়াছে। এই ৮ বৎসরের মধ্যে এই জেলায় আমি তিনবার এইরূপ ভয়ঙ্কর গো-মড়ক হইতে দেখিলাম; দারজিলিং পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূভাগেও কৃষকগণ গত বৎসর প্রায় ধেনুশূন্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আসি-

লাম। যে জেলার লোককেই জিজ্ঞাসা করি, তাহারাই বলে "২।৫বৎসর অন্তর আমাদেরও ঐরূপ হইয়া গোরুগুলা মরিয়া যায়।" এই রোগের প্রাদুর্ভাব পাহাড়ের উপর গ্রীষ্মকালে ও নিম্নভূভাগে শীতকালেই অধিক হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কালেই এ রোগের ছাড় নাই। কি বঙ্গদেশ, কি বোম্বাই প্রদেশ, কি মান্দ্রাজ প্রদেশ, কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব,সকল প্রদেশেই সমভাবে এই রোগের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাধির প্রকোপ হেতু ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত টাকা ক্ষতি হয়, দেশের আদালত বা সৈনিক বিভাগগুলি উঠাইয়া দিলেও সেই ক্ষতি পুরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক গো-বসন্তের হস্ত হইতে গো-জাতি রক্ষা করাতে দেশের যত উপকার সাধিত হওয়া সম্ভব,কোন রাজনৈতিক উন্নতি দ্বারা তত উপকার সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। পাস্তার সাহেবের অনুগ্রহে ফ্রান্স,জর্ম্মণী, সুইট্‌জর্লণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজ্য এক বারে এই গো-বসন্তের হাত হইতে রক্ষা পাই-য়াছে। আমরাই যে তুল্য উপায় অবলম্বন দ্বারা তুল্যফল লাভ করিব না, ইহা সঙ্গত নহে। বিষয়টী কত গুরু, কত আবশ্যক, কত বিচিত্র, তাহা আর পাঠককে বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

বঙ্গদেশ গো-বসন্তকে 'গুটি' 'মাতা' ও 'ঠাকুরাণী' বলিতেও শুনা যায়। উত্তর পশ্চি-মাঞ্চলে ও পঞ্জাবেও 'মাতা' নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রায় এই রোগ গো-মড়ক বলি-য়াই সাধারণভাবে খ্যাত হয়। পুলিসের একটী কর্ত্তব্য গো-মড়ক উপস্থিত হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে রিপোর্ট করা। পুলিশ স্থানীয় নামের একটী না একটী সঙ্গত রকমের অনুবাদ করাতে, ভারতবর্ষে গো-বসন্তের দুইটী ইংরাজী প্রতিশব্দ হইয়া পড়িয়াছে, একটী Rinderpest অর্থাৎ গো-মড়ক, অপরটী Cow-pox অর্থাৎ গোরুর বসন্তরোগ। রাইণ্ডারপেষ্ট্ শব্দের আভিধানিক অর্থ মাত্র দেখিতে গেলে সাধারণ ভাবে এই শব্দের প্রয়োগ চলিতে পারে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু রাইণ্ডারপেষ্ট শব্দের একটী বিশেষ প্রয়োগ থাকাতে এবং ভারতবর্ষীয় গো-বসন্ত ইউরোপীয় এন্‌থ্রাক্স হইতে কোন রূপে ভিন্ন নহে বলিয়া, গো-বসন্তকে এন্‌থ্রক্স নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ অন্যথা নামের দ্বারা অনেক সময়ে যে অনেক ক্ষতি হয়, গো-বসন্তের ইংরাজী অনুবাদ তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। গো-বসন্তকে স্মল-পক্স অথবা কাউ-পক্স বলা ভয়ানক দোষের কথা। মানুষের যেরূপ বসন্তরোগ হয়, গোরু ও মেষেরও কখন কখন স্বতঃ ঐরূপ বসন্তরোগ হইতে দেখা যায়। এক শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার্ সাইরেন্‌সেষ্টার ও বার্কেলি নামক গ্লষ্টারসায়ারের দুইটী নগরের নিকট একটী স্থানীয় প্রবাদ অবগত হয়েন। এই প্রবাদটী এই যে,গোরুর বসন্ত-স্ফোটক হইলে মানুষের বসন্ত-স্ফোটক হ্রাস হয়। ১৭৯৬ সাল হইতে কয়েক বৎসর তিনি গোরুর বসন্ত-স্ফোটক-রস লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া জগতে টীকা দিবার প্রথা প্রচার করেন। তাঁহার কৃত An Enquiry into the Causes and Effects of the Cow-pox এবং Further observations on the Variotæ Vaccinæ or Cow-pox আজিও মানুষের বসন্ত-স্ফোটক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ বলিয়া খ্যাত। গোরুর বসন্ত-স্ফোটক দেখিতে মানুষের বসন্ত-স্ফোটকের ন্যায় বটে, কিন্তু এই স্ফোটক গরুর কিছুই ক্ষতি করে না।

এদেশে স্বতঃ-নির্গত গোরুর বসন্ত-স্ফোটক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের বসন্ত-স্ফোটকের রস গোরুর শোণিতের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া দিলে যে গোরুর গাত্রে বসন্ত-স্ফোটক নির্গত হয়, ইহা টীকা দিবার বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়াতে এদেশে অনেকেই দেখিয়াছেন। এই উৎপাদিত স্ফোটক দ্বারাও গোরুর কোন ক্ষতি হয় না, অর্থাৎ টীকা দিবার জন্য যে গোরুগুলি ব্যবহার করা যায়, তাহারা মরিয়া যায় না, এবং তাহাদের দুগ্ধ ব্যবহার করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্বতঃ-নির্গত বসন্ত-স্ফোটক হেতুও গোরুর দুগ্ধে কোন ক্ষতি করে না। যে মাইক্রোককাস্ দ্বারা মানুষের গাত্রে এই ভয়ানক স্ফোটক নির্গত হয়, সেই মাইক্রোককাস্ দ্বারাই গোরুর বসন্ত-স্ফোটক জন্মে। একই অণু মানুষের পক্ষে ভয়ঙ্কর অথচ গোরুর পক্ষে হানিজনক নহে। কেবল তাহাই নহে। গোরুর গাত্রে স্বতঃ-নির্গত অথবা উৎপাদিত স্ফোটক হইতে নিঃসৃত রসে ঐ একই মাইক্রোককাস্ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এই মাইক্রোককাস্ বিকৃত-ধর্ম্ম অথবা বিভিন্নধর্ম্ম সংযুক্ত। এই মাইক্রোককাস্ মানুষের কোন ক্ষতি করে না, বরং ইহার সহযোগে মনুষ্য-দেহ ভয়ঙ্কর বসন্ত-স্ফোটক হইতে কিছু দিনের জন্য পরিত্রাণ পায়। গোরুর বসন্ত-স্ফোটক রস মনুষ্যের শোণিতের সহিত মিশ্রিত করাইয়া দিলে ঐ মানুষ কত দিন যে বসন্ত-রোগের হাত এড়ায়, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। কাহারও শরীরে ঐ টীকা-রসের গুণ ৫০ বৎসর থাকিতে পারে, কাহারও শরীরে ১০ বৎসর কাহারও বা ৩ বৎসর। মারাত্মক বসন্ত-স্ফোটকগ্রস্ত হইয়া যদি কেহ বাঁচিয়া যায়, তাহারও দেহের মধ্যে টীকারসের যে গুণ সেই গুণই থাকে; অর্থাৎ সেও হয় ৫০ বৎসর, নয় ১০ বৎসর, নয় ৩ বৎসর, অর্থাৎ কিছু-কালের জন্য বসন্ত-রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পুনরায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইতে যদিও প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু একবারে দেখা যায় না, তাহা নহে। টীকা দেওয়া সম্বন্ধেও তাহাই দেখা যায়। একবার, এমন কি দুইবার টীকা দিয়াও, পরে বসন্তরোগ হইতে দেখা গিয়াছে। টীকা-রসের অথবা স্বতঃ-উৎপন্ন বসন্ত-রোগের গুণ সকলের পক্ষে চিরস্থায়ী হয় না বলিয়াই যে টীকা-রসের গুণ নাই, তাহা নহে। গুণ অব্যর্থ, তবে গুণের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে দেহ বিশেষে তারতম্য হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন টীকা দিবার অব্যবহিত পরেই যখন স্থল বিশেষে বসন্তরোগ হইতে দেখা গিয়াছে, তখন টীকা-রসের কোনই গুণ নাই, ইহা স্থির করা উচিত, এবং টীকা দিয়া যে অনেকের বসন্ত হয় না, সে কেবল ‘কপাল’। বাস্তবিক টীকা দিবার অল্প দিনের পরেই যদি কাহারও বসন্তরোগ হইয়াছে এরূপ প্রমাণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে টীকা রসের কোন গুণ নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষ অনেকটা সমর্থিত হয়। কিন্তু এরূপ কোন উদাহরণ যদি কাহারও গোচর হয়, তখন তাঁহারই স্কন্ধে দুইটী প্রমাণের ভার পড়িতেছে, তাঁহার এ বিষয়ে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। (১) টীকা দেওরা ঠিক হইয়াছিল কি না? বাহুর উপর ঘা হইলেই যে টীকার ঘা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, ইহা কে বলিল? ক্ষত স্থানে নানা জাতীয় অণু জন্মিয়া ঘা হইয়া যাইতে পারে। এই ঘা যে প্রত্যেক স্থলে মাইক্রোককাস্ ভ্যারিওলা ভ্যাক্সিনি জনিত, ইহার প্রমাণ কি? অথচ

প্রমাণ কঠিন নহে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রণালীতে টীকা দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে। মারাত্মক বসন্তবীজ গোরুর রক্তের মধ্যে পিচকারি করিয়া চালাইয়া দিয়া, গোরুর গাত্রে বসন্ত স্ফোটক উৎপাদন করিয়া, পরে পরিষ্কার (এবং প্রত্যেক বারে অগ্নিশিখা দ্বারা পরিষ্কৃত) অস্ত্র দ্বারা ঐ স্ফোটক-রস লইয়া মানুষের শোণিতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে, ক্ষত স্থলে যে স্ফোটক নির্গত হইবে, তাহা নিশ্চয়ই মাইক্রোককাস্ ভ্যারিয়োলিভ্যাক্সিনি অণু-জনিত। (২) টীকা দিবার পূর্ব্বেই মারাত্মক বসন্তবীজ (অণু) শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কি না? টীকা দিবার পরে ২০ দিবসের মধ্যে যদি কাহারও বসন্ত-রোগ হয়, তাহা হইলে ঐ রোগ যে টীকা দিবার কারণ হইল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। টীকা না দিলেও ঐ রোগ হইত। মারাত্মক মাইক্রোককাস্ ভ্যারিওলি পূর্ব্বেই শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসন্তরোগের সূত্রপাত করিয়াছে, পরে বসন্তের ভয়ে ঐ ব্যক্তি টীকা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় টীকারসের গুণ না ধরিবারই সম্ভব। গো-বসন্তের সহিত মনুষ্য অথবা গোজাতির বসন্ত-স্ফোটকের কোনই সম্বন্ধ নাই, এ কথা বুঝাইবার জন্য মারাত্মক বসন্ত-রোগের জন্য জেনারের টীকা-প্রণালীর সারতত্ত্বের অবতারণা না করিলেও চলিত। কেবল কলিকাতা সহরে কয়েকমাস ধরিয়া এত বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব চলিতেছে, অথচ এই রোগের জন্য টীকা দেওয়া প্রথা প্রকৃত প্রতিকার কি না, এ সম্বন্ধে লোকে এত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়াই বিষয়টী কিছু বাড়াইয়া লেখা হইল।

গো বসন্তে গোরু মরিয়া যায় এবং গো-বসন্ত হইলে গোরুর গাত্রে ফোস্কার ন্যায় কোন স্ফোটক বাহির হয় না, এ কারণ গো-বসন্ত (Anthrax) গোরুর বসন্ত-স্ফোটক রোগ (Cow-pox) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুইটী রোগ যে ভিন্ন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষ জনক প্রমাণ এই যে, গো-বসন্তে মৃত জন্তুর শোণিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে ব্যাসিলাস্ দেখা যাইবে। বসন্ত-স্ফোটক মাইক্রোককাস্ জাতীয় অণুজাত। মাইক্রোককাস্ ও ব্যাসিলাসে গোলোযোগ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। মাইক্রোককাস্ দেখিতে ইংরাজী পূর্ণচ্ছেদের (.)ন্যায়, ব্যাসিলাস্ দেখিতে বাঙ্গালা (।) পূর্ণচ্ছেদের ন্যায়। এই দুইটী পদার্থের পার্থক্য স্থির করিতে বিদ্যাও আবশ্যক করে না, চক্ষুর তীক্ষ্ণতাও আবশ্যক করে না। ফলতঃ গো-বসন্ত কাউ-পক্সও নহে, রাইণ্ডারপেষ্টও নহে। ইহা খাঁটি এন্থ্রাক্স। এই রোগে বাহ্য নিদর্শন, ব্যবচ্ছেদ (Postmortem) নিদর্শন, আণুবীক্ষণিক নিদর্শন, ইত্যাদি ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইবে। মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পুস্তক হইতে উদ্ধৃতাংশ সকল দ্বারাও বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে যে, এ দেশের গো-বসন্তের নিদর্শন সমস্ত ঠিক ইউরোপের এন্থ্রাক্সের নিদর্শনের অনুরূপ, অর্থাৎ এই দুইটী বিভিন্ন রোগ নহে, একই রোগ। অবশেষে পাস্তার সাহেব এন্থ্রাক্স বা গো-বসন্তের জন্য যে সুন্দর প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারও বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

গীতার প্রামাণ্য। (১)

হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ এই যে, যাহার মূল বেদে নাই, তাহা হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত নহে। বেদই প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্ম; কিন্তু বিভিন্ন অধিকারীর জন্য সেই বেদের বিস্তৃতি ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই কারণ আমরা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকে এই কয়েক ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই;—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র। শ্রুতি মুখ্য হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র; এজন্য তাহার প্রামাণ্যও মুখ্য। স্মৃত্যাদি গৌণভাবে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র, এজন্য তাহাদের প্রামাণ্যও গৌণ। গীতা পুরাণান্তর্গত হওয়াতে তাহা গৌণ প্রমাণে প্রামাণ্য হইলেও তাহার প্রামাণ্যের একটু বিশেষত্ব আছে। আমরা সেই বিশেষত্ব একে একে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমে শ্রুতির মুখ্য প্রামাণ্যের আলোচনা করা আবশ্যক। সেই মুখ্য প্রামাণ্য 'শব্দ'। এই শব্দ প্রমাণ কি, একটু বিশদ করিয়া বলা উচিত।

আমরা যে পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতে পাই, তাহা নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা নিত্যবস্তু, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে সনাতন ব্রহ্ম কহে। যাহা নিত্য বস্তু, তাহা অবশ্য চিরকালই বর্ত্তমান। এজন্য হিন্দুধর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম নিত্য ও অনাদি। ব্রহ্ম নিত্য হইলে তাঁহার গুণাদিও নিত্য এবং অনাদি। কারণ, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দীপ্তি অভেদ। তবেই প্রতিপন্ন হয়, যেমন ব্রহ্ম অনাদি, তেমনি জগৎও অনাদি। ব্রহ্ম এবং জগৎ অনাদি হইলে তাহাদের নিয়ম সকলও অনাদি। জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিত্য, এজন্য এই নিয়ম সকলও নিত্য এবং অনাদি। যখন এই নিয়ম সকল নিত্য ও অনাদি, তখন সেই নিয়ম প্রকাশক 'শব্দ'ও অনাদি। শব্দ জগতেরই অন্তর্গত, সুতরাং সমগ্র জগৎ যখন অনাদি, তখন অবশ্য তদন্তর্গত 'শব্দ'ও অনাদি। জৈমিনি এই শব্দকে নিত্য ও অনাদি বলিয়াছেন। আমাদের ভাষান্তর্গত যে শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এ শব্দ নহে। অনাদি কাল হইতে যে শব্দ দ্বারা নিত্য অধ্যাত্ম-জগতের নিয়মাবলি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, সেই শব্দই বেদের প্রামাণ্য। জগতের অনেক বার প্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা, এজন্য এই শব্দ-প্রমাণ শ্রুতির অনেক বার প্রলয় হইয়া থাকিবে। সেই নিমিত্ত আমরা হিন্দুধর্ম্মে বেদোদ্ধারের কথা শুনিতে পাই। সে যাহা হউক, এই যে শব্দ দ্বারা বৈদিক নিয়ম সকল প্রতিযুগে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শব্দই বেদের নিত্যতা রক্ষা করিয়াছে।

এই নিত্য শব্দকে আমাদের ভাষান্তর্গত বর্ণাত্মক অনিত্য শব্দ হইতে পৃথক করিবার জন্য পাণিনি তাহাকে "স্ফোট" * শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই স্ফোট নিত্যকাল বর্ত্তমান। যাহা অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান, তাহা কোন বিশেষ পুরুষ কর্ত্তৃক সঙ্গাত হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ পুরুষ বিশেষ কালের ফল। কিন্তু এই স্ফোট তৎপূর্ব্বেও বর্ত্তমান। সুতরাং এই স্ফোট অনাদি বশতঃ অপৌরুষেয়। বেদ নিত্য স্ফোট দ্বারা অনাদি কাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। অতএব, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়।

---

* A collective term for the sounds which gave expression to the External Law or *Veda* and which were audible by the *Sidhas* only in every *Yuga* or age.

বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় হওয়াতে তাহা কেবল শ্রুতিরূপেই লব্ধ হইতে পারে। প্রলয় কালে যেমন বেদের তিরোভাব ঘটে, পুনঃ সৃষ্টির আবির্ভাবে বেদেরও তেমনি আবির্ভাব ঘটে। পুনঃসৃষ্টি ও সংসারকালে আবার বেদ নূতন নূতন সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক আবির্ভূত করা হইয়াছে। সেই সিদ্ধপুরুষগণও সেই স্ফোটের শ্রুতি অনুসারে বেদকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। এই কারণ, বেদ শ্রুতি-পরম্পরায় চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে তাহা বর্ণাত্মক সংস্কৃত শব্দ-গ্রথিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সংস্কৃত শব্দ সকল সেই স্ফোটেরই লিঙ্গমাত্র। ভাষার শব্দ ও বর্ণ কেবল সঙ্কেত মাত্র। এই ভাষার শব্দ ও বর্ণ বিভিন্ন এবং অনিত্য; কিন্তু স্ফোট বোধক শব্দ নিত্য। এজন্য, মহাভাষ্য গ্রন্থে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, বেদের অর্থ নিত্য, বেদের বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণের আনুপূর্ব্বী নিত্য নহে। এই বর্ণ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, তাহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বেদ-প্রতিপাদ্য অধ্যাত্মনিয়ম প্রকাশক যাহা, সেই বেদার্থ নিত্য। জৈমিনিও ঠিক সেই কথা বলেন ;—

"বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা।"
"অনিত্য দর্শনাচ্চ।"—২৭। ২৮ সূত্র।

জৈমিনির মতে বেদ ঈশ্বর নির্ম্মিত নহে, তাহা কোন পুরুষ কর্ত্তৃকও নির্ম্মিত নহে ; বেদ কেবল 'শব্দের' শ্রুতি এবং তাহার কর্ত্তা কেহ নাই*। বেদ এইরূপ সাক্ষাৎ 'শব্দ'-প্রমাণ। পৌরুষেয়বাদীর মতে এই নিত্য শব্দক ব্রহ্ম-বাক্য বলিয়া বেদ ব্রহ্মবাক্য হইয়া পড়ে। অতএব, বেদ শব্দ-ব্রহ্ম।

*দার্শনিকগণের মধ্যে নৈয়ায়িকেরা পৌরুষেয়বাদী রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ এবং সাংখ্য কার কপিল অপৌরুষেয়বাদী।

বেদ শব্দব্রহ্মরূপে আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্য কি? যাহাতে মনুষ্যবাক্যের দোষ স্পর্শ করে না, তাহাই আপ্তবাক্য। মনুষ্য বাক্যের দোষ কি কি? দর্শনে মনুষ্যবাক্যের এই কয়েকটি দোষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—

(১) ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান—ভ্রান্তি। ভ্রম ঠিক প্রমা জ্ঞানের বিপরীত। যে বস্তু যাহা, তাহাকে সেইরূপে প্রতীত করাই প্রমা। সুতরাং প্রমা ভাব-পক্ষ (Positive)। ভ্রম অভাব-পক্ষ (Negative)।

(২) প্রমাদ—অনবধানতা বশতঃ যে মিথ্যা-জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাদ।

(৩) বিপ্রলিপ্সা—যে অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা না বুঝান। বিপ্রলিপ্সা সুতরাং প্রতারণা বাক্য হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা বশতঃ যথাযথ বস্তু গ্রহণে অসামর্থ্য।

আপ্তবাক্যে এই চতুর্ব্বিধ দোষ সম্ভবে না। এই আপ্তবাক্য আবার ত্রিবিধ।

(১) নিত্য আপ্ত। (২) স্বাভাবিক আপ্ত। (৩) সিদ্ধ আপ্ত।

বেদই কেবল নিত্য আপ্ত। বেদের পর অন্য দ্বিবিধ আপ্ত সম্ভাবিত হইয়াছে। আপ্তবাক্য মাত্রই ভগবদ্বাক্য। ভগবদ্বাক্য আবার অপৌরুষেয় এবং পৌরুষেয়। অপৌরুষেয় ভগবদ্বাক্য বেদ। পৌরুষেয় ভগবদ্বাক্য দ্বিবিধ—যাঁহারা স্বভাবতঃই ভগবান বা মন্বাদির ন্যায় ভগবানের অবতার বিশেষ, তাঁহাদের বাক্য ; এবং যাঁহারা সিদ্ধি বশতঃ কপিলাদির ন্যায় ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য। বেদে আমরা যে সমস্ত ঋষিগণের উক্তি দেখিতে পাই, তাহা এইরূপ সিদ্ধ আপ্তবাক্য। মনুর স্মৃতি স্বাভাবিক আপ্তবাক্য। ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণোক্তি বশতঃ স্বাভা-

বিক আপ্তবাক্য। ভগবদ্গীতা ঋষি-প্রোক্ত বশতঃ আবার সিদ্ধ আপ্তবাক্য। সুতরাং ভগবদ্গীতায় এই দ্বিবিধ আপ্তবাক্যের প্রমাণ।

(১) গীতা স্বাভাবিক ভগবদ্বাক্য। (২) তাহা সিদ্ধ আপ্তবাক্য।

শাণ্ডিল্যঋষি ভক্তিসূত্রে ভগবদ্গীতার প্রামাণ্য প্রদর্শন করিবার জন্য এইসূত্র দিয়াছেন।

তদ্বতঃ প্রপত্তি শব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ।

এই সূত্রের মুখ্যার্থ বিবৃত করিয়া টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ভক্তিশাস্ত্র-প্রধান গীতাকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিলেন ;—

"ইদন্ত চিন্ত্যতে ভগবদ্গীতাবাক্যানি ন শব্দ বিধয়া বেদবৎ প্রমাণম্। কিন্তু ভারতে স্মৃতিত্বেন। তথাচ কথং শব্দাদিতি নির্দ্দেশঃ। অত্রেকেঽনুমিতশব্দাদিতি ব্যাচক্ষতে।

অনেকে বলেন, ভগবদ্গীতা শ্রুতি মধ্যে গণ্য নহে বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। শ্রুতির যেমন সাক্ষাৎ প্রমাণ 'শব্দ', গীতার তেমন সাক্ষাৎ শাব্দ প্রমাণ নাই। তবে স্মৃতির ন্যায় তাহার গৌণপ্রমাণ স্বীকার্য্য বটে; যে হেতু তাহা মহাভারতান্তর্গত।

এ কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। কিন্তু স্বপ্নেশ্বর গীতাকে শ্রুতিবৎ প্রতিপন্ন করিতে চান। তিনি উক্ত যুক্তি নিরসনার্থ এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন ;—

"অত্রোচ্যতে অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্যত্বমেব বেদত্বং তচ্চ গীতাস্বপ্যবিশিষ্টম্।"

অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্যই বেদ। গীতা তদ্রূপ বাক্য। যেহেতু, গীতা ভগবদ্বাক্য এবং সেই বাক্যের বিষয় সকলও অদৃষ্টার্থক—তাহা লৌকিকজ্ঞানে বা দৃষ্টি দ্বারা প্রতিপন্ন নহে। অতএব, গীতা বেদবৎ প্রামাণ্য। তৎপরে তিনি নিজ কথা সমর্থনার্থ ব্যাসবাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন।—

"অতএব, ভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্বিতি দৃশ্যতে কেবলং ত এব শ্লোকা ব্যাসেন নিবদ্ধাঃ।

গীতাবাক্য উপনিষদ্রূপে ব্যাস ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সেই বাক্য সকল শ্লোকাকারে "নিবদ্ধ" (Recorded *) করিয়াছেন মাত্র।

যদি বল, গীতা ভারতান্তর্গত নাও হইতে পারে; তাহা মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ। স্বপ্নেশ্বর এ কথার উত্তরে বলেন যে, গীতা ভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে পারে না, যেহেতু গীতার শ্লোক সমূহ ধরিয়াই ভারতের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ শ্লোক পূর্ণ হয়।

"তবিহায়েতি চেন্ন লক্ষতাপরিপূর্ত্তেঃ।"

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, স্বপ্নেশ্বর গীতাকে দুই কারণে বেদবাক্য বলেন।

প্রথমতঃ। তাহা ভগবদ্বাক্য।

দ্বিতীয়তঃ। তাহা অদৃষ্টার্থক।

আমরা এই দুই বিষয়ই একে একে আলোচনা করিব। এই হেতু এই প্রবন্ধকে ঐ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলাম।

প্রথমতঃ। গীতা ভগবদ্বাক্য।

গীতা শ্রীকৃষ্ণোক্তি, এই জন্য তাহা ভগববাক্য। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের অবতার, তৎসম্বন্ধে দ্বিবিধ মত হিন্দুশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। (১) পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ—যিনি স্থূলশরীরী ঐতিহাসিক পুরুষ। (২) বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এই দ্বিবিধ মত বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এই দুই মতই এক; কেবল বিভিন্ন অধিকারীর জন্য এই স্বাতন্ত্র্য। স্থূলদর্শী জনগণের নিমিত্ত পুরাণ; এইহেতু বৈদিক মূর্ত্তিকে স্থূলরূপে ব্যক্ত করাই পুরাণের অভিপ্রায়। ব্যাস যে কৌশলে পৌরাণিক অবতার গড়িয়াছেন, তাহা গীতা মধ্যেই নিবে-

* Cowell's edition of শাণ্ডিল্য। মনু এই অর্থে "নিবদ্ধ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

শিত হইয়াছে। ভগবান কি প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত কি উপায়াবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই অবতার-তত্ত্বের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা তাহা একে একে প্রদর্শন করিব। ব্যাসের কৌশল এই যে, তিনি এই অবতার-তত্ত্ব মধ্যে বৈদিক শ্রীকৃষ্ণকেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমরা সে কৌশলও প্রকাশ করিয়া দিব। প্রথমে আমরা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী পৌরাণিক কৃষ্ণাবতারের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ—যিনি স্থূলশরীরী ঐতিহাসিক পুরুষ। শাণ্ডিল্যসূত্রানুযায়ী পৌরাণিক কৃষ্ণাবতারের ব্যাখ্যা স্বপ্নেশ্বর এইরূপ দিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন :—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।

আমার এবং তোমার, হে অর্জ্জুন, বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।

মনুষ্যের জন্মের সহিত ভগবানের জন্ম যে পৃথক, তাহা ব্যাস অর্জ্জুনের প্রশ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, আপনার মনুষ্যের ন্যায় জন্ম কিরূপে সম্ভবে? আপনি ত মনুষ্যের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের বশীভূত নহেন। কর্ম্মফল ভোগার্থই শরীর। যাহার পূর্ব্বজন্ম নাই, তাহার কর্ম্মফল নাই, সুতরাং তাহার কর্ম্মফলভোগার্থ শরীরও সম্ভবে না। তবে আপনার জন্ম কিরূপে সম্ভব? আপনি ত অজ। এ কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেনঃ—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"

আমার জন্ম কর্ম্ম সকলই দিব্য। তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, ভগবানের জন্ম কর্ম্ম মনুষ্যের ন্যায় নহে, তাহা অলৌকিক। সেই দিব্য জন্ম কিরূপে ঘটে? গীতা বলিতেছেনঃ—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া

আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া দ্বারা শরীর গ্রহণ করি। শরীর গ্রহণের উপায়, ঈশ্বরের মায়াশক্তি। সেই মায়াশক্তি দ্বারা ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, সেই শরীর দিব্য; মানুষ-শরীর নহে। যে মায়াশক্তি বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহাতে সৃষ্টিবীজ নিহিত আছে, তদ্দ্বারা অমানুষী কায়া-সৃষ্টির অসম্ভাবনা কি? মায়াশক্তি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। সুতরাং দিব্যশরীর সেই মায়ারই একবিধ আবির্ভাব এবং সেই শরীরের সংহৃতি, সেই শক্তিরই তিরোভাব মাত্র। মহাভারতান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে নারদের প্রতিও ভগবান এই কথা বলিয়াছেনঃ—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।"

হে নারদ! এই যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মায়াময়। এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং দিব্যশরীর বলিলে মায়াময় অলৌকিক শরীর বুঝিতে হইবে। এ শরীর ভোগ-শরীর নহে। মানুষীভোগশরীরেরই জন্ম মৃত্যু আছে; কিন্তু মায়াময় দিব্যশরীরের জন্মমৃত্যু নাই। এই জন্য, ভগবানের এক নাম অজ এবং এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়া-

"অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

এক্ষণে কথা এই, পঞ্চভূত নির্ম্মিত মানুষী শরীর ভিন্ন মায়াময় দিব্য শরীরের সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? আস্থাপূর্ণ ভক্ত জনগণের নিকট এমত দিব্য শরীর অসম্ভাবিত নহে। পুরাণ যাহাদিগের জন্য সৃষ্ট, তাহাদিগের নিকট স্থূল অবতারবাদ সম্ভবযুক্তিতে প্রামাণ্য। তাহারা ঐতিহাসিক প্রমাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

স্থাপন করিতে পারে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলিয়াছে যে,পুরাণবাদিগণ দর্শনোক্ত প্রমাণাবলির অতিরিক্ত আর দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই প্রমাণদ্বয় সম্ভব ও ঐতিহ্য।

"সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।"

এই সম্ভবযুক্তি অনুসারে ভগবানের দিব্য শরীর স্থাপনার্থ শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন ঃ—

"তচ্চ দিব্যং স্বশক্তি মাত্রোদ্ভবাৎ।

ভক্তিসূত্র—৪৮ শ্লোক।"

তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি সমস্ত দিব্য এবং তাঁহারই শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভূত হয়।

শাণ্ডিল্যের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর উক্ত যুক্তি অনুসারে তাঁহার অলৌকিক এবং অভৌতিক শরীর স্থাপন করিয়া এইরূপ তর্কে তাঁহার দিব্য কর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন ঃ—

যদি বল যে, যে শরীরে ভোগ হয় না, তাহাকে কি শরীর বলিতে পার? তৎসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ঃ—

সাক্ষাৎ প্রযত্ন (volition) হইতে চেষ্টা (effort) সম্ভূত।

চেষ্টা, ক্রিয়া (action) হইতে সম্ভূত।

শরীর ক্রিয়ার আশ্রয় স্থান।

যদি ক্রিয়ার আশ্রয় স্থান শরীর হয়,তবে দিব্য শরীর হইবার বাধা কি? যাঁহার ক্রিয়া স্বীকার্য্য,তাঁহার শরীরও স্বীকার্য্য। যদি বল প্রতিক্রিয়াই কি প্রযত্নজ চেষ্টা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কি বলিতে পার যে, মৃত শরীরের চেষ্টা প্রযত্নজ ক্রিয়া? তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চেষ্টা এক প্রকার ক্রিয়া বিশেষ। আরও দেখা যায় যে, চেষ্টা মাত্রই সাক্ষাৎ প্রযত্ন সম্ভূত নহে। যে হেতু ঘটে যখন পাকক্রিয়া চলিতেছে, তখন কি বলিতে পার যে, পাকচেষ্টা ঘটের প্রযত্ন হইতে সম্ভূত হইতেছে? অতএব দেখা যাইতেছে যে ঃ—চেষ্টা থাকিলেই যে সাক্ষাৎ প্রযত্ন আছে, এমত নহে, এবং ক্রিয়া থাকিলেই যে প্রযত্নজ চেষ্টা আছে, এমতও নহে। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রযত্ন ব্যতীত চেষ্টা ও ক্রিয়া সম্ভব; কিন্তু শরীর ব্যতীত প্রযত্ন সম্ভব নহে। শরীর সেই প্রযত্নের আশ্রয়স্থান। যে ক্রিয়া প্রযত্নজ চেষ্টা সম্ভূত,তাহাই শারীরিক ক্রিয়া। ভগবানের ক্রিয়া প্রযত্নজ চেষ্টা সম্ভূত ক্রিয়া। অতএব, ভগবানের কেবল যে শরীর সম্ভব এমত নহে; তাঁহার শারীরিক ক্রিয়াদিও সম্ভবনীয়। সুতরাং ভগবানের শরীর অলৌকিক এবং চেষ্টাবান হেতু, তাঁহার ক্রিয়াদিও অলৌকিক বা দিব্য।

একথায় একটি আপত্তি হইতে পারে। যদি ঈশ্বরের দিব্য শরীর সম্ভব হয়, তবে কি দর্শনশাস্ত্রে যে তত্ত্ব-সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা? বেদান্ত মতে তত্ত্ব সমুদায় ছাব্বিশটি,কিন্তু ভগবানের দিব্য শরীর স্থাপিত হইলে সেই সংখ্যা আরও একাধিক বা সাতাইশটি করা ত আবশ্যক? সে সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর বলেন।

"নচ তত্ত্বাধিক্যং তচ্ছরীরস্য ব্রহ্মাণ্ডানুপাদানত্বাদ্ ঘটাদিবদ তত্ত্বভাবাৎ ইন্দ্রিয়া প্রকৃতিত্বাচ্চ।"

এই দিব্য শরীর বেদান্ত নির্ণীত ষট্‌বিংশতত্ত্বের অতীত পদার্থ নহে। যে হেতু এই শরীর কিছুরই বিবর্ত্ত বা পরিণাম নহে, কোন বাহ্য পদার্থেরও উপাদান কারণ নহে এবং কোন ইন্দ্রিয়েরও উপাদান নহে। তাহা সেই ষট্‌বিংশ তত্ত্বের অন্তর্গত চিত্তেরই সাক্ষাৎ মায়া সম্ভূত। সুতরাং তাহা তত্ত্বসংখ্যার অতীত নহে।

ঈশ্বরের শরীর যেন দিব্য হইল,কিন্তু যখন ভগবান পূর্ণকাম এবং সেই অর্থে বিভু নামে খ্যাত,তখন তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন (motive) কি? যাঁহার প্রয়োজন নাই, তাঁহার কর্ম্মও

নাই। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন আছে বৈ কি? সে প্রয়োজন গীতায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

তিনি শুদ্ধ ভক্তজনগণের পরিত্রাণার্থ এবং দুষ্কৃতজনগণের বিনাশার্থ অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং তাহার দিব্যকর্ম্ম শুদ্ধ সাত্বিক করুণা বশতঃ সমুৎপন্ন। এজন্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিলেন।

"মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্।"

তিনি মুখ্যকারুণ্য হেতু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই কারুণ্য সাত্বিক ও অলৌকিক। লোকে আমরা যে করুণা প্রবৃত্তি দেখিতে পাই, তাহাতে কামনার অংশ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু কেবল ভগবানের কোন ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ নাই। মনুষ্য হয় তো পুণ্য উপার্জ্জনার্থ, না হয় পরোপকার দ্বারা নিজ প্রকৃতিকে উন্নত করিবার জন্য দয়াধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভগবানের তদ্রূপ কোন ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায় হইতে পারে না। যদি নিঃস্বার্থ কারুণ্য ব্যবহার কিছু সম্ভব হয়, তবে তাহা এই ভগবানের করুণা। এ কারণ এই করুণাকে অলৌকিক ও প্রকৃত সাত্বিক করুণা বলে। মানুষীতে এ প্রকার করুণার দৃষ্টান্ত সম্ভবে না।

মনুষ্যের কারুণ্যব্যবহার অন্য এক কারণ হেতু সমুৎপন্ন হয়। অনেক মনুষ্যকে দেখা যায়, তাহারা স্বভাবতঃই করুণাশীল, অপর কতিপয় মনুষ্য স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর প্রকৃতি। এই যে স্বভাবের বিশেষ প্রবণতা তাহা কেবল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হেতু। কিন্তু ভগবানের করুণা সেরূপ কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করে না। তবেই মানুষের করুণা দুই কারণে গৌণ।

(১) সে কারুণ্যব্যবহারে ইষ্টসিদ্ধি আছে বলিয়া তাহা অন্য নিমিত্তের কারণ এজন্য গৌণ।

(২) তাহা পূর্ব্বজন্মের ফলাফলরূপ অদৃষ্টকে অপেক্ষা করে বলিয়া গৌণ।

কেবল ভগবানের কারুণ্যব্যবহারকেই মুখ্য করুণা বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও অলৌকিক করুণা হেতু যে কর্ম্ম প্রণোদিত হয়, তাহা দিব্যকর্ম্ম। সুতরাং

ভগবানের শরীর দিব্য,
তাঁহার কর্ম্মাদি দিব্য,
তাঁহার কারুণ্যব্যবহার দিব্য,
তাঁহার প্রয়োজনমূলক ইচ্ছাও দিব্য।

কিন্তু সর্ব্ববিধ অবতারেই কি এই দিব্য ও অলৌকিকত্ব আছে? জীব মাত্রই ত ব্রহ্মাংশ। যাহার শরীর প্রাকৃত ও কর্ম্মফলহেতু তাহার কিছুই দিব্য ও অলৌকিক নহে। কেবল যখন ভগবান "আপনাকে সৃষ্টি করেন" যখন

'তদাত্মানংসৃজাম্যহম্' হয়।

তখনই কেবল "সম্ভবামি যুগে যুগে" ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবানের অবতার, বেদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং "সৃজাম্যহমের" প্রমাণ ও প্রত্যভিজ্ঞা বেদবাক্য। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।"
অথর্ব্বশির উপনিষদে ষষ্ঠদশকে নবম বাক্য।

নারায়ণোপনিষদেও বাসুদেবের অবতার বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রমাণ আছে। শুদ্ধ যে বিষ্ণুপুরাণে প্রমাণ আছে ঃ—

"যদুবংশে পরব্রহ্ম নরাকৃতি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন"
৪র্থ অংশ ১১ অধ্যায়।

এমত নহে, শ্রুতি ও তাহার প্রত্যভিজ্ঞা। এজন্য শাণ্ডিল্য বলিলেন ঃ—

"প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ।"

স্মৃতি এবং পুরাণের প্রমাণ ব্যতীত শ্রুতির প্রমাণ দ্বারাও বাসুদেবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। গীতা আরও বলিতেছেন—

"রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি"
১০ অ ২৩ শ্লোক।

এবং পুরাণে কথিত হইয়াছে ঃ—

বিষ্ণুরুদ্রান্তরং ব্রুয়াদ্‌যঃ শ্রীগৌর্য্যন্তরং তথা।
তস্যাস্তিকস্য মূর্খস্য বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্।
স্কন্দপুরাণ। কাশীখণ্ড। পূর্ব্বভাগ ২৭ শ্লো-১৮১।

যাহারা বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদ জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ; তাহাদের বাক্য সর্ব্বদা শাস্ত্র বিগর্হিত।

বেদোক্ত দেব দেবীর উক্তি সমস্ত গীতা এইরূপ সম্ভব যুক্তি দ্বারা সাধারণ জনগণের আদরণীয় করিয়াছেন।

পুরাণে তাঁহাদের লীলাদি বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

অবতারতত্ত্বের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রকাশ করিয়া গীতা পরে তাহার ফলাফল বর্ণন করিতেছেন।

স্থূলদর্শী জনগণের ভক্তি-উদ্রেকের নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের এই পৌরাণিক সৃষ্টি। কারণ, সামান্য জনগণ এক বিশেষ কালে এক বিশেষ দেশে এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভগবানকে স্থূলরূপে ভাবিতে বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ভাবনার ফল ভক্তি। অতএব, পৌরাণিক স্থূল অবতারতত্ত্বের সৃষ্টি কেবল ভক্তি উদ্রেকের জন্য। তাই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

আমার দিব্য জন্ম কর্ম্ম জানিলে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। ভগবানের দিব্য জন্ম কর্ম্ম জানিলে মোক্ষ লাভ হইবে কি প্রকারে? শাণ্ডিল্য বলেন, তদ্দারা সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হয় না। তদ্দারা সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয়। সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ এবং তাঁহার অলৌকিক জন্ম কর্ম্মাদি স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি উদ্রেকের কারণ। ভক্তি হইতে ক্রমে মনোমালিন্য নিরাকৃত হইয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মে। চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানাধিকারের উপায়। জ্ঞানাধিকার না হইলে মুক্তিপথে যাওয়া যায় না। এইরূপে অবতারতত্ত্বজ্ঞান গৌণরূপে মুক্তির উপায়।

পুরাণান্তর্গত গীতোক্ত স্থূল অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা স্বপ্নেশ্বর এইরূপ দিয়া গিয়াছেন। পুরাণ বেদেরই বিস্তৃতি মাত্র। সুতরাং পুরাণের প্রমাণ বেদমূলক ঋষিবাক্য। অধ্যাত্ম-জগতের যে সমস্ত নিত্য নিয়ম বেদের প্রতিপাদ্য, পুরাণ তাহারই স্থূল ব্যাখ্যা। যেমন সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক ভাবের স্থূল দেহ দেবদেবী, পুরাণ বেদের তেমনি স্থূল শরীর। এ জন্য বেদের প্রমাণ যাহা, পুরাণেরও প্রমাণ তাহা। তদ্ব্যতীত পুরাণের প্রমাণ ঋষিবাক্য। ঋষিবাক্যের প্রতি সাধারণ জনগণের বিশেষ আস্থা। গীতা ও সেই কথা বলিতেছেন ঃ—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
৩—২১।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অপরাপর সামান্য ব্যক্তি তাহা তাহা করে, এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণ্য রূপে অবধারণ করেন, অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহারই অনুসরণ করে।

সামান্যবুদ্ধি স্থূলদর্শী লোকের নিকট ঐতিহাসিক পরতঃ প্রামাণ্যই স্বীকার্য্য। "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য" নামক প্রস্তাবে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মের ত্রিবিধ প্রামাণ্য—পরতঃ, স্বতঃ এবং আনুমানিক। পরতঃ প্রামাণ্য স্থূলদর্শী সাধারণ জনগণের নিমিত্ত; এবং স্বতঃপ্রামাণ্য বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞানিগণের জন্য। গীতার স্থূল অবতারবাদ পরতঃ এবং ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন। সম্ভবযুক্তি এই পরতঃ প্রমাণের মহাবল। সম্ভবযুক্তি শুদ্ধ যে স্থূল অবতারবাদের

পক্ষ কক্ষীকৃত করে এমত নহে, এই সম্ভবযুক্তির উপর সাধারণ জনগণের অনেক ধর্ম্মতত্ত্বের আস্থা স্থাপিত আছে। এই সম্ভবযুক্তি বলেই তাহারা ঋষিপ্রোক্ত আত্মা ও পরলোকাদির সত্তা এবং স্বরূপতত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়াছে। যে প্রমাণে ধর্ম্মের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই প্রমাণে স্থূল অবতারবাদও সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সম্ভব যুক্তি এবং পরতঃ প্রমাণ ব্যতীত সূক্ষ্মদর্শীগণের নিকট ধর্ম্মের অলৌকিক তত্ত্বসমূহের অন্য এক প্রমাণ আছে। তদ্দ্বারা সেই তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। এক্ষণে আমরা গীতার সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপনীত হইলাম। যে স্থূল অবতারবাদ পরোক্ষবাদীর নিকট সম্ভব যুক্তিতে ঐতিহাসিকতত্ত্ব, তাহা সূক্ষ্মদর্শী অলৌকিক-প্রত্যক্ষবাদীর নিকট নিত্যসত্য ও প্রত্যক্ষানুভূতি। এই প্রত্যক্ষানুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। এই বৈদিক শ্রীকৃষ্ণও গীতার অবতারতত্ত্ব মধ্যে নিহিত আছেন। স্বপ্নেশ্বরের মতে গীতা যে ভগবদ্বাক্য তাহা সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণও অনুভব করেন। ব্যাস যে কৌশলে পৌরাণিক অবতারবাদের সহিত বৈদিক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

(২) বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ যিনি সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ী মূর্ত্তি—পরোক্ষবাদিগণ গীতার অবতারতত্ত্বকে স্থূলযুগাবতাররূপে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভগবান যুগাবতাররূপে মনুষ্যকায়া ধারণ করিয়া গীতাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং গীতা ভগবদ্বাক্য বলিয়া সত্য। যাহারা এ যুক্তিতে পরিতুষ্ট, তাহাদের নিকট গীতার প্রমাণ অকাট্য। গীতা এই স্থূলদর্শী লোকমণ্ডলীর নিকট যেমন অকাট্য যুক্তিতে প্রামাণ্য; সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট গীতা তদধিক অকাট্য প্রমাণে অবস্থিত। গীতা নিজেই এই দ্বিবিধ প্রমাণের পরিচায়ক। শ্রীধর স্বামী গীতার অবতারবাদের মধ্যে কেমন বৈদিক চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন। (১)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক পাঠে মহাভারতের সেই ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনের পুণ্য-তীর্থ ভূমি 'গিরিব্রজপুর' বা আধুনিক রাজগৃহ দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলাম। আত্মীয় বন্ধুগণের মুখে সেই রমণীয় স্থানের বর্ণনা শুনিয়া ঔৎসুক্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। অবশেষে বিগত ১৮৯৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে, রবিবার বেলা ১০টার লোকেল ট্রেনে আমরা কয়েক জন বন্ধু, দুইজন চাকর, একজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে, বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে উঠিয়া ২৮ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী বখ্‌তিয়ারপুর ষ্টেসনে বেলা ১২টার সময় উপস্থিত হইলাম।

এক্ষণে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেসন বখ্‌তিয়ারপুর হইয়াই রাজগৃহ যাইতে হয়। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বিহার ১৮ মাইল দক্ষিণে, এবং বিহার হইতে রাজগৃহ ১৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বিহার যাইতে হইলে লোকেরা সচরাচর মেল কার্টে যায়, কারণ গরুর গাড়ীতে যাইতে বড় বিলম্ব হয়, প্রায় ১২ ঘণ্টা লাগে, এবং এক্কায় যাওয়া

বড় কষ্টকর। কিন্তু রাজগৃহ দর্শনার্থী পশ্চিম দেশীয় যাত্রীরা স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ লইয়া গরুর গাড়ীতেই গিয়া থাকেন। যদিও বখ্‌তিয়ারপুরে ধর্ম্মশালা, ডাক্‌বাঙ্গলা প্রভৃতি থাকিবার স্থান ছিল, কিন্তু সকলের মত হইল, পর দিনের অপেক্ষা না করিয়া ৭টা রাত্রেই যাওয়া শ্রেয়। রিজার্ভ গাড়ীতে আমাদের মধ্যে ছয়জন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করাতে মেনেজার মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে একজন চাকর সঙ্গে করিয়া বেলা তিনটার সময় বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং রাত্রি ৭টার সময় আমরা বাকী ছয়জন সেই পৌষ মাসের দারুণ শীতে স্পেশেল কার্টে যাত্রা করিলাম। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বেহার যাইবার পাকা রাস্তার দুইধারে সারি সারি নানা রকমের বড় বড় গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় সুন্দর পুল; কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অতি নিম্ন জলাভূমি বলিয়া গ্রামাদির সংখ্যা বড় কম। মেলকার্ট যাইতে তিনঘণ্টা লাগে। তিন জায়গায় ঘোড়া বদল হয়; বন্দোবস্ত মন্দ নয়।

বিহারঃ—আমরা বিহারে পঁহুছিয়া রবিবার রাত্রে স্বর্গীয় ডিপুটি বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত 'বেলিসরাই' নামক বিশ্রামগৃহে অতিবাহিত করিলাম। বেলিসরাই চাঁদার পয়সায় তৈয়ার হয়, উহা বিমলা বাবুর যত্ন এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। এমন সুন্দর সরাই দেখি নাই। দক্ষিণে সরাই, বামে দাতব্যচিকিৎসালয়; প্রবেশ দ্বারে বিচিত্র রঞ্জিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্লক্‌-টাওয়ার। টাওয়ারোপরি ঘড়ির সরঞ্জামও কিছু কিছু দেখা গেল। সরাইয়ের সম্মুখভাগে নাতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ। সরাই দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বদিকে ভদ্রলোকদিগের থাকিবার জন্য সারসী খড়খড়ী দেওয়া পাকা ঘর, প্রত্যেক ঘরের ২৪ ঘণ্টার ভাড়া ।৷০ আনা মাত্র, কিন্তু একঘরে ৮ জনের অধিক লোক থাকিবার অধিকার নাই; পশ্চিম দিকে গরিবদিগের থাকিবার জন্য ছোট ছোট পাকাঘর, প্রত্যেক যাত্রীর একদিন থাকিবার ভাড়া এক পয়সা মাত্র। এই দুই বিভাগের মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে বৃহৎ কূপ। ভদ্রলোকদিগের থাকিবার যে বিভাগ, তাহা আবার অর্দ্ধেক হিন্দুর জন্য এবং অর্দ্ধেক মুসলমান এবং ভিন্ন জাতির জন্য বিভক্ত। এক এক অংশে পাঁচ ছয়টি করিয়া ঘর। বাড়ীর প্লিন্থ খুব উচু, চারিদিকে পলতোলা বড় বড় গোড়া থাম ওয়ালা বারাণ্ডা, কার্ণিসে সুন্দর কারুকার্য্য। উত্তর দিকে ছাতে যাইবার দুইটী সিঁড়ি, সরাইয়ের ছাত হইতে হাঁসপাতালের ছাতে যাইবারও পথ আছে। শুনিলাম, এক সময়ে সরায়ের প্রত্যেক ঘর টানাপাখা, টেবিল, চেয়ার, খাট প্রভৃতি নানা রকম সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে সব কিছুই নাই। এ সরায়ের ভার আজকাল মিউনিসিপালিটির হস্তে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদিগের অযত্নে দিন দিন অমন সুন্দর সরাই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পাকা সারসীখড়খড়ীওয়ালা পাইখানার আধুনিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

আমরা রাজগৃহে যাইবার এবং সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই রাত্রেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট গেলাম, তাঁহার সঙ্গে আমাদের মধ্যে দু এক জনের অল্প আলাপ ছিল এবং তাঁহার নামে চিঠিও আমাদের কাছে ছিল। নন্দবাবু বড় ভদ্রলোক, তিনি সেই রাত্রেই আমাদের রাজগিরি যাইবার জন্য তিনখানি উৎকৃষ্ট স্প্রিংওয়ালা এক্কা এবং

একখানি গরুর গাড়ী ঠিক্ করিয়া দিলেন, এবং রাজগৃহে ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গলায় থাকিবার অনুমতি দিলেন। প্রত্যেক একায় যাইবার আসিবার ভাড়া ৩৲ টাকা এবং যে কয় দিন থাকিবে প্রত্যেক দিনের খোরাকী ৷৷৹ আনা, এবং গরুর গাড়ীর যাইবার আসিবার ভাড়া ১৷৷৹ টাকা স্থির হইল। আমরা সে রাত্রে খাবার বিশেষ গোলযোগ না করিয়া বাজারের মোটা লুচি ও ধূলামাখা মিষ্টান্ন খাইয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম।

সোমবার—প্রত্যুষে গরুর গাড়ীতে আমাদের বিছানা পত্র এবং একজন চাকর রওনা করিয়া দিলাম। আমরা মুখ হাত ধুইয়া চা রুটি খাইয়া রাঁধুনি ব্রাহ্মণ এবং এক বেলার মত আহারীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া বেলা সাতটার সময় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বিহার হইতে রাজগৃহে যাইবার দুইটি পথ, একটী গিরিয়াক্ হইয়া এবং অন্যটি শিলাও হইয়া। গিরিয়াকের পথ পাকা কিন্তু তিন জায়গায় নদী পার হইতে হয় এবং সে পথে রাজগৃহ ১৮ মাইল; শিলাওয়ের পথ কাঁচা কিন্তু ঐ পথে নদীপারের গোলযোগ নাই, আর রাজগৃহ ১৫ মাইল মাত্র, লোকে সচরাচর এই পথেই রাজগিরি গিয়া থাকে। আমরা শিলাওয়ের পথে চলিলাম। দক্ষিণাভিমুখে কিছুদূর গিয়া পঞ্চানন নদ পার হইলাম; নদবক্ষ শুষ্ক,স্থানে স্থানে কেবল একটু একটু জল দেখা যাইতেছে। পঞ্চানন নদ পার হইয়া গিয়া বরাগাঁও যাইবার পথ দেখিলাম। বরাগাঁও বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত। নলন্দা বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় এইখানেই ছিল, শুনিলাম, আজি তাহা বৌদ্ধ মন্দির ও সমাধির ভগ্নরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া কাল মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। আমরা সময়াভাবে বরাগাঁও যাইতে পারিলাম না। পথের দুইপার্শ্বে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে, খর্জ্জুর ও তালিবনের মর্ম্মর শব্দ শুনিতে শুনিতে,বেলা সাড়ে দশটার সময়, শিলাও গ্রামে উপস্থিত হইলাম। শিলাও একটি বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম, প্রায় তিন চারি হাজার লোকের বসতি হইবে। এখানকার খাজা ও চিড়ে প্রসিদ্ধ। আমরা দুইই কিছু কিছু কিনিলাম। ভাল খাজা টাকায় ⁄২৷৷৹ সের এবং চিঁড়ে ⁄১৩ সের ⁄১৪ সের করিয়া। শিলাও হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়া আমরা আধুনিক রাজগৃহ বা রাজগিরি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। রাজগিরি নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, অনেক গুলি পাকা বাড়ী দেখিলাম, বাজারও মন্দ নয়। এখানে একটী বৃহৎ সাধু-সঙ্গত আছে। রাজগিরির বাজারে আমরা কিঞ্চিৎ ঘি এবং তেল কিনিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালাভিমুখে চলিলাম। রাজগিরি গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিম দক্ষিণ দিকে গিয়া সেই বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। সেখানকার চৌকিদার, আমরা নন্দ বাবুর পরিচিত ভদ্রলোক, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। বাঙ্গলায় দুইটি ঘর, সম্মুখে বারাণ্ডা, ঘরের মেজেতে মেটীং করা, উপরে চাঁদওয়া; টেবিল, চেয়ার, আলগানি খাট প্রভৃতি নানারকম ইংরাজি আসবাবে ঘরগুলি সজ্জিত, প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন একটি একটি বাথরুম, তাহাতে কমোড ইত্যাদি রহিয়াছে দেখিলাম। সাহেবেরা আসিয়া এইখানে থাকেন। সার চার্লস ইলিয়াট এইখানে ছিলেন। আমাদের ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গলায় পঁহুছিতে প্রায় দুই প্রহর হইল। পরামর্শ হইল যে,মকদুম কুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান

করিতে হইবে, কিন্তু সেখানে মুসলমান ভায়ারা যেরূপ ভাবে দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিলাম তাহাতে স্নান করিতে ভক্তি হইল না। পরে সপ্তধারায় স্নান করাই স্থির হইল। পথে যাইতে যাইতে নদীতে বিস্তর ছোট ছোট মাছ খেলা করিতেছে দেখিয়া বাঙ্গালী লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি' গামছা দিয়া বিস্তর মাছ ধরিয়া বাসায় রাঁধিবার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। পরে সপ্তধারা কুণ্ডে এবং ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রথমে উত্তম রূপে জলযোগ করা গেল, পরে বেলা তিনটার সময় খিচুড়ি খাওয়া গেল। আহারান্তে অল্পমাত্র বিশ্রাম করিয়া আমরা পর্ব্বতারোহণে বহির্গত হইলাম।

এইখানে আমাদের বাসস্থানের এবং রাজগৃহের পর্ব্বতমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে বোধ হয় পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধা হইবে। মহাভারতে দেখিতে পাই, রাজচক্রবর্ত্তী মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধের রাজধানী, 'বরাহ, বৈভারাচল, বৃষভ, চৈত্যক, ঋষিগিরি সম্মিলিত পঞ্চগিরি মাঝে 'গিরিব্রজপুর'। সে আজ বহুদিনের কথা। ইংরাজি হিসাবেও তিন হাজার বৎসরের অধিক হইবে; কারণ হণ্টার সাহেবের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪২৬ অব্দে জরাসন্ধের আবির্ভাব কাল। পরে মগধদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময়ে যখন বৌদ্ধভিক্ষুকেরা ঐ পর্ব্বতমালার গুহাদিতে তপস্যা নিরত হইতে লাগিলেন, যখন বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমিতে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধরাজত্ব দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন, তখন ঐ পঞ্চগিরি কিঞ্চিৎ ভিন্ননামে অভিহিত হইতে লাগিল; আবার যখন জৈন শ্রেণিক, উপশ্রেণিক, মহাশ্রেণিক সম্প্রদায়ের বিহার ভূমিতে ঐ পর্ব্বতমালা পরিণত হইল, যখন ঐ পঞ্চগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে শৃঙ্গে জৈন মন্দির সকল নির্ম্মিত হইল, তখন ঐ পর্ব্বতমালার ভিন্ন নাম হইল। এক্ষণে বৈভার ভিন্ন অন্য পর্ব্বতগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন; "বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকুট গিরিব্রজ, রত্নাচল ইতিখ্যাতা পঞ্চইতি পবনা নগা।" দেখিলাম, সেই গিরিব্রজপুরের উত্তরে বৈভারগিরি এবং বিপুলাচল, দক্ষিণে গিরিব্রজগিরি, মধ্যে রত্নাচল এবং রত্নকুট বা রত্নগিরি পর্ব্বতমালা অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান; দেখিলাম, পূর্ব্বদিক্ বিপুল এবং তৎসংলগ্ন রত্নগিরি বা রত্নকুট পর্ব্বত প্রাচীরে, পশ্চিমদিক্ বৈভারের একাংশ চক্রানামক পর্ব্বতে, দক্ষিণ গিরিব্রজগিরির উন্নত শিখরমালায় এবং উত্তরদিক্ বিপুলকায় বিপুল এবং বৈভারের অভেদ্য পর্ব্বত প্রাচীরে সুরক্ষিত। ঐ বৈভার এবং তৎসম্মুখস্থিত রত্নাচল পর্ব্বত মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমিতেই জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং তাহা হইতেই গিরিব্রজপুরের আধুনিক নাম রাজগৃহ হইয়াছে। 'রাজগৃহে' প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার ছিল। প্রথম, বিপুল এবং বৈভারের মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে, দ্বিতীয় গিরিব্রজগিরির মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে, তৃতীয় গিরিব্রজগিরি এবং রত্নকুট বা রত্নগিরির মধ্যস্থিত ভূমিতে এবং চতুর্থ বোধ হয় রত্নাচল এবং বৈভারের অংশ চক্রার মধ্যে। উপরোক্ত পর্ব্বতমালার উচ্চতম স্থল ১০০০ ফিটের অধিক হইবে না। হণ্টার সাহেবের মতে এই পর্ব্বতরাশির প্রস্তর ইগিনিয়স্। ঐ সকল পর্ব্বতমালায় গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর স্লাব, কিম্বা বাসনপত্রাদি তৈয়ার হইবার মত প্রস্তর পাওয়া যায়, এমন বোধ হইল না। পর্ব্বতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-

রাজিতে আচ্ছাদিত এবং ব্যাঘ্র-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থল। আমাদের বাসস্থান পূর্ব্বোক্ত বৈভারগিরির পাদদেশেই অবস্থিত ছিল। সেই ইন্সপেক্সন্ বাঙ্গালার পশ্চিমে আম্রকানন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সরস্বতী কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, উত্তরে বৌদ্ধের সমসাময়িক নৃপতি অজাতশত্রুর পিতা বিম্বসার-নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, এবং দক্ষিণে উন্নতশিখর বৈভারগিরি।

সোমবার সন্ধ্যা:—আজি আমাদের প্রথম পর্ব্বতারোহণ। কেহ বা কোট্ পেন্ট্‌লান পরা নেকটাই বাঁধা পুরা সাহেব; কেহ বা ধূতি ওভারকোট্ আঁটা আধ বাঙ্গালী আধ ইংরাজ; আবার কেহ ফুল মোজা পায়, গায় শাল, হাতে সৌখিনী ছড়ি, ধূতি পরা ফুলবাবু। এইরূপে বিচিত্র বেশ ভূষা করিয়া বেলা চারিটার সময় বিপুলাচল আরোহণার্থ বহির্গত হইলাম, সঙ্গে গাইড নাই, নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের জনৈক স্থূলকায় বন্ধু পর্ব্বতারোহণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। তাঁহার নেকটাই বাঁধাই সার হইল। আমরা পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম, তিনি ম্লান মুখে একাকী ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। দেখিয়া দুঃখও হইল, হাসিও আসিল। আমরা আন্দাজি একটি পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম; কিছু দূর উঠিতে না উঠিতে ঘাম ছুটিতে লাগিল, কেহ ওভারকোট্ খুলিলেন, কেহ রেপার ফেলিলেন, কেহ বা কোট কমফর্টার ফেলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত ফুট উপরে উঠিয়া আমরা একটী জৈন মন্দির দেখিতে পাইলাম, এখানে আসিতেই সূর্য্যাস্ত হইল, কিন্তু সেখান হইতে গিরিব্রজপুরের ভালরূপ দৃশ্য পাওয়া গেলনা, ক্রমে আরও উপরে উঠিয়া আর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম, তাহাতেও আশা মিটিল না, আরও কিঞ্চিৎ উপরে উঠিলাম। সেখানে এক প্রাচীন দুর্গ প্রাচীর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। অবশেষে সমাগত সন্ধ্যা দেখিয়া নামিতে লাগিলাম। ধরণী আঁধারের ধূসর বেশ পরিয়াছে, অচেনা পথ ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্মলতাদিতে আচ্ছন্ন; যাহা হউক, সাহসে ভর করিয়া নামিতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সকল সাহস লোপ হইল। কেহ হরি হে! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আবার কেহ বা "কুছ পরওয়া নাহি" বলিয়া দ্রুতবেগে নামিতে লাগিলেন। পথে উঠিবার সময় যে সকল বস্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা নামিবার সময় পথ-প্রদর্শনের অনেক সহায়তা করিল। কিছু দূর নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে দুই জন অপথে গিয়া পড়িলেন, দেখিলেন আর যাইবার পথ নাই, তাঁহারা সেইখান হইতে আমাদের সাবধান করিয়া দিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া সকলে এক সঙ্গে নামিতে লাগিলাম। হিল্‌ওয়ালা জুতা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল, কেহ বা বাহাদুরি করিয়া শিলা খণ্ডের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। যাহা হউক, কোন ক্রমে তো ভালয় ভালয় সে রাত্রে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতারোহণের যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিলাম। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্থূলকায় বন্ধুটী সকলের জলযোগের বিশেষ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া একটু তাস খেলা গেল। পরে পরা-

মর্শ হইল যে, পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একদিনে সমস্ত গিরিব্রজ দেখিতে হইবে, এবং পাণ্ডাকে ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, সে যেন খুব সকাল সকাল আসে।

মঙ্গলবার :—রাত্রে আমরা সুখে নিদ্রা গিয়া ভোর পাঁচটার সময় সকলে উঠিলাম, উঠিয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, কিন্তু বঙ্গীয় যুবক এ সামান্য বাধায় পশ্চাদ্‌পদ হইবার নয়। ছাতা মাথায় দিয়া মাঠে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করা গেল। বাসায় আসিয়া কেহ বা ইংরাজি মতে, কেহ বা আধ হিন্দু আধ ইংরাজি মতে, এবং কেহ বা হিন্দু মতে, জলযোগ করিয়া বেলা ৭টার সময় গিরিব্রজপুর দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম। আমাদের মধ্যে দু একজন অনাহারেও রহিলেন, আমরা পকেটে হিন্দু বিস্কুট লইলাম

আমরা বিপুল এবং বৈভারের মধ্যবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করিলাম। দক্ষিণে বৈভার, বামে বিপুলাচল, এই গিরিপথেই জরাসন্ধের জরারাক্ষসী রক্ষিত সূর্য্যদ্বার ছিল। এক সময়ে যে এই প্রবেশপথে দৃঢ় দুর্গদ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন আজও লক্ষিত হয়।

বিপুলাচল—লোকে বলে বিপুলাচলই মহাভারতের চৈত্যক পর্ব্বত। বিপুলাচলের পাদদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিলাম, উহার মধ্যে পশ্চিম-উত্তর পাদদেশে স্থিত মকদুমকুণ্ড বা শৃঙ্গীঋষি-কুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে শৃঙ্গীঋষি এইস্থানে অবস্থিতি করিতেন, পরে মুসলমানেরা ঐ স্থান অধিকার করিলে মকদুম্ সাহ সেখ্ সরিফ্‌উদ্দিন আহমেদি এহিয়া নামক জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির ৭১৫ হিজারিতে তথায় আসিয়া বাস করেন, এবং তাঁহা হইতেই ঐ শৃঙ্গীঋষিকুণ্ডের নাম মকদুম্‌কুণ্ড হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম সরিফউদ্দিন, পিতার নাম আহমদ্‌এহিয়া, জাতিতে সেখ্, বাসস্থান পাটনার নিকটবর্ত্তী মনের গ্রামে, তিনি সাহ বা উদাসীন ছিলেন, এবং তিনি সকলের সেবনীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মকদুম্ বলিত।

মকদুমকুণ্ড—মকদুমকুণ্ড চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, কুণ্ডের পরিসর ছয় হাত দীর্ঘ এবং প্রায় পাঁচ হাত প্রস্থ হইবে। ৺ অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ প্রথম ভাগে পড়িয়াছিলাম "স্থানে স্থানে ভূমণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহা প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম উষ্ণপ্রস্রবণ।" কিন্তু মকদুমকুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত নয়, পর্ব্বতগাত্র হইতে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা উষ্ণজল নির্গত হইতেছে। বাহির হইতে সে স্থানটি দেখিবার যো নাই; তবে এইমাত্র দেখিলাম যে, প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী নল দিয়া কুণ্ডেতে নাতি উষ্ণ জল পড়িতেছে। কুণ্ড মধ্যে সদা সর্ব্বদা আড়াই হাত তিন হাত জল বদ্ধ থাকে, অতিরিক্ত জল পয়োনালা দিয়া বাহিরে বহিয়া যাইতেছে। কুণ্ডের সংলগ্ন একটি মসজিদ্ আছে, মসজিদের বহিঃপ্রাঙ্গণে বড় বড় বৃক্ষ; ভিতরের প্রাঙ্গণ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে মকদুম সাহের চিল্লা অর্থাৎ পর্ব্বতগুহা দেখিলাম। এই খানে বসিয়া মকদুম সাহ নিত্য উপাসনা করিতেন। গুহাটি ক্ষুদ্র, উহার প্রবেশ পথের উপরিভাগে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিম্নদিকে লম্বমান। তথাকার মুসলমান গুহারক্ষক বলিলেন, এক সময়ে মকদুম সাহ একাদিক্রমে চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া এই গুহা মধ্যে

তপস্যা নিরত হন। হিন্দুদৈত্যেরা, হিন্দুগুহা যবনাধিকৃত এবং হিন্দুর কঠোর তপস্যা যবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইতে চলিল দেখিয়া,ঐ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার রুদ্ধ করিয়া মকদুম সাহকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, মকদুম সাহের সহসা ধ্যানভগ্ন হইল, তিনি একবার উপর দিকে দেখিলেন, প্রস্তর খণ্ড সেই অবস্থায় রহিয়া গেল, আর পড়িল না। সে দিন হইতে আজি অবধি উহা ঐ অবস্থায় রহিয়াছে। এই চিল্লার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দক্ষিণদিকে মকদুম সাহের নিত্য নিমাজের স্থান যত্ন সহকারে রক্ষিত রহিয়াছে দেখিলাম। মকদুমকুণ্ড আজি বিহারের মধ্যে মুসলমানদিগের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বহুসংখ্যক নরনারী এই কুণ্ডে স্নানার্থ আসিয়া থাকেন। যাঁহাদের কোন মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে,তাঁহারা মকদুমকুণ্ডে স্নানান্তে আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন করিয়া উপরোক্ত গুহাদ্বারের দুইপার্শ্বে দোলায়মান চামরে বাঁধিয়া দেন ; দিন দিন চামর দুইটি নানা বর্ণের ফালিতে পরিপূর্ণ হইয়া আয়তনে বাড়িতেছে। মকদুমসাহ হিন্দুদিগেরও মাননীয় ছিলেন, আজও অনেক হিন্দু তাঁহার চিল্লা দর্শনার্থ গিয়া থাকেন, এবং 'রাজগিরির পাণ্ডারা হিন্দুদিগের দত্ত পয়সার অংশও পাইয়া থাকেন। আমরা যে দিন মকদুমকুণ্ড দেখিতে যাই,সেদিন জনৈক মুসলমান জমিদার স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে মকদুমকুণ্ডে স্নানার্থে আসিয়াছিলেন। পুরুষেরা তাঁবুর ভিতরে,এবং স্ত্রীলোকেরা উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত দেখিলাম, বহির্প্রাঙ্গণে পোলাও, কালিয়া তৈয়ার হইতেছিল। কুণ্ডের নিম্নদেশে সমতল ভূমিতে অনেকগুলি মুসলমান পিরের কবর দেখিলাম। মুসলমানদিগের অধিকার কালে এখানে যে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় ছিল,সে গৃহের ভগ্নাবশেষ এই কবরগুলি হইতে উত্তরে অবস্থিত, এক্ষণে কেবল দু তিনটি পাথরের থাম অবশিষ্ট রহিয়াছে।

মকদুমকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দক্ষিণে অন্য পাঁচটি উষ্ণপ্রস্রবণ,যথা, সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং সোমকুণ্ড। ইহাদের মধ্যে কোনটির জল মকদুমকুণ্ডের জলের অপেক্ষা উষ্ণতর, কোনটির বা জল অপেক্ষাকৃত শীতল। এই পঞ্চকুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত। হিন্দু এবং জৈন উভয়েই এই সকল কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া থাকেন। এই পঞ্চকুণ্ডের পাশ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিন বিপুলাচলে উঠিয়াছিলাম। বৈভারাচলের পাদদেশে যে সকল কুণ্ড এবং পর্ব্বতোপরি যে সকল মন্দিরাদি দেখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে বৈভার এবং তৎসম্মুখীন রত্নাচলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা ভূমিতে অর্থাৎ জরাসন্ধের রাজগৃহে যাহা দেখিলাম, তাহার বিষয়ে দু একটী কথা বলিতে চাহি। আমরা বৈভার গাত্রস্থিত কুণ্ডের নিম্নদেশ দিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সরস্বতীর কূলে কূলে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম, কিছু দূর গিয়াই এক শ্মশানে উপস্থিত হইলাম। 'রাজগৃহের' প্রবেশদ্বারে, পার্ব্বত্য নদীকূলে সেই শ্মশানভূমি দেখিয়া মনে হইল, রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের সমৃদ্ধিশালিনী 'রাজগৃহ' আজি যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহারই নিদর্শনচিহ্ন বুঝি বৈভারের পূর্ব্বাঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা শ্মশানভূমি অতিক্রম করিয়া নাতিদূরে একটি উচ্চস্থানে জরারাক্ষসীর* মন্দির দেখিতে

* জরারাক্ষসী এবং জরাসন্ধের বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতের সভাপর্ব্বের সপ্তদশ অধ্যায় এবং পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে দেখুন।

পাইলাম। পাণ্ডা বলিলেন জরা রাক্ষসী উত্তর দ্বারের রক্ষয়িত্রী ছিল বলিয়া তাঁহার মন্দির এইখানে স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা এখান হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনপথ দিয়া 'শূন্যভাণ্ডার,' 'জরাসন্ধের আখাড়া' প্রভৃতি স্থান দেখিতে চলিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ, বন গুল্ম লতাদিতে স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ, সূর্য্যদেবও প্রখর কিরণে উদিত হইলেন দেখিয়া আমরা ওভারকোট প্রভৃতি ভারি কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিলাম, জনৈক রাখাল সেই পথে যাইতেছিল, আমাদের পাণ্ডার কথামত সেই সকল কাপড় তাহাকে আমাদের বাসায় রাখিয়া দিবার জন্য দিলাম, এই খানেই বলিয়া রাখি, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সে সমস্তই পাইয়াছিলাম। আমরা আধক্রোশ আন্দাজ গিয়া বৈভারাচলের দক্ষিণাঙ্কে একটি মনুষ্য-খোদিত গিরিকক্ষ দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডা বলিলেন, ইহারই নাম 'শূন্যভাণ্ডার'। এই গিরি কক্ষটি চতুষ্কোণ, দীর্ঘে ১১ হাত, প্রস্থে ৬ হাত, এবং মধ্য স্থলের উচ্চতা ৪হাত হইবে। কক্ষ দক্ষিণ দ্বারী, দক্ষিণ দিকের দেওয়াল প্রায় আড়াই হাত মোটা; প্রবেশ দ্বার ৪ হাত উচ্চ এবং ২ হাত প্রশস্ত, প্রবেশ দ্বারের বামদিকে একটি গবাক্ষ উহা উচ্চ ২ হাত, প্রস্থে ১॥ হাত। ঐ কক্ষের ভিতরের এবং বাহিরের দেওয়ালে খোদিত অক্ষর সকল দেখিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না। গিরিকক্ষের উত্তর দিকের দেওয়ালের পশ্চিম ভাগে একটি লম্বা ফাটা দাগ দেখাইয়া আমাদের পাণ্ডা বলিলেন যে, ইহারই পশ্চাতে জরাসন্ধের স্বর্ণভাণ্ডার ছিল। ইংরাজ গোলাগুলি মারিয়া এই দরজা ভাঙ্গিতে পারেন নাই। সহসা দেখিলে বোধ হয় বটে যে পূর্ব্বে ঐ খানে একটি দরজা ছিল, পরে কেহ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা পর্ব্বত গাত্রে একটি ফাটমাত্র। এই কৃত্রিম গিরিকক্ষ যে এক সময়ে উত্তম রূপে প্লাসটর করা ছিল, এবং উহার বহির্দ্দেশে বারাণ্ডা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিখোদিত এক ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড দেখিলাম। এই কক্ষের অন্য নাম সোণভাণ্ডার, বোধ হয় স্বর্ণভাণ্ডার বা সোণাভাণ্ডারের অপভ্রংশ মাত্র। ইহার নাম শূন্যভাণ্ডার বা সোন্‌ভাণ্ডার যে কেন হইল, তাহার কোন বিশেষ পরিচয় পাইলাম না, উহা যে কোন সময়ে ধনাগার ছিল, তাহারও কোন চিহ্ন দেখিলাম না। আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, এই কক্ষেই বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ ছিলেন, এই কক্ষে বসিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের আদি নীতিমালা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ইহাই সেই 'উরু বিল্ব' কক্ষ; কেহ বলিলেন, এই সেই সপ্তপানি গুহা; আবার কেহ বলিলেন, এইখানেই বুঝি জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ কারাগার ছিল। যাহার যা মনে আসিল, তিনি তাহাই বলিলেন; আমরা এ তর্ক বৃথা দেখিয়া জরাসন্ধের আখাড়া দেখিবার জন্য পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কিছুদুর গিয়া দেখিলাম, এক প্রশস্ত সমতল ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে লাল মৃত্তিকা এবং প্রস্তর মিশ্রিত উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সরস্বতী নদী প্রবহমানা। কেহ বলিলেন, এইখানে জরাসন্ধের অন্তঃপুর ছিল, কেহ বলিলেন শূন্যভাণ্ডার নয়, ইহাই জরাসন্ধের সেই কারাগার—যেখানে জরাসন্ধ রুদ্রদেবের পূজার্থ 'অশীতি নৃপতি জিনি ভুজবলে রেখেছিল বন্দী করি কারাগারে'। আমাদের পাণ্ডা এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তৎপরে শূন্যভাণ্ডার হইতে আধক্রোশ পশ্চিমে গিয়া বৈভারের পাদদেশে সেই ভারত খ্যাত রঙ্গভূমি—সেই জরাসন্ধের আখাড়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা বলিলেন, জরাসন্ধ নিত্য এই

স্থানে মল্লযুদ্ধ করিতেন, এবং ভীমের সহিত এইখানে জরাসন্ধের ১৩ দিন মল্লযুদ্ধ হয়, ইষ্টকের চূর্ণরাশি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন রক্ত-চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থান টুকুর বিশেষত্ব এই যে, সেই শৈল-উপত্যকার বন্ধুর উপলরাশির মধ্যে ইহাই একমাত্র মসৃণ মৃত্তিকাময় স্থান; নিম্নে রাঙ্গামাটি, উপরে এক ফুট আন্দাজ ভাঁটা মাটির মত মসৃণ এবং শ্বেতাভ মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত, একবিঘা জমি প্রায় এইরূপ। এক সময়ে যে এই আখাড়ার চতুর্দ্দিকে গৃহাদি ছিল, তাহারও নিদর্শন দেখিলাম। একস্থানে দেখিলাম, ইষ্টকরাশি সহস্রাধিক বৎসর প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছুইলেই গুঁড়া হইয়া যায়। আমরা ঐ ইষ্টক-চূর্ণ এবং আখড়ার শ্বেত মৃত্তিকা লইলাম, প্রবাদ যে, জরাসন্ধের আখাড়ার মাটি মাখিলে লোকে সবলকায় হয়। এই আখাড়ার পশ্চিমে আর কিছু দর্শনীয় স্থান আছে কিনা, পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, আর কিছুই নাই; কিন্তু আমরা দেখিলাম, দূরে বৃক্ষাচ্ছাদিত মৃত্তিকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত তিন চারিটি স্থান রহিয়াছে, জানিনা, তথায় কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে কি না, কিন্তু পশ্চিম-দিকের বন গাঢ়তর এবং দূরতা বশতঃ আমরা আর পশ্চিমদিকে না গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এই উপত্যকা ভূমির প্রায় মধ্যভাগে যে একটি তড়াগ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তড়াগের পূর্ব্বদিকে একটু উচ্চস্থানে একটি মন্দির এবং কূপ দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, পাণ্ডা বলিলেন উহার নাম 'নির্ম্মাণকূপ', কিন্তু উহা কবে নির্ম্মিত হইল এবং কেই বা নির্ম্মাণ করিল, তাহার বিষয় কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের বোধ হইল, উহা কোন বৌদ্ধ-কীর্ত্তি হইবে। পথ দুর্গম এবং বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়াছে দেখিয়া আমরা উহা দেখিতে গেলাম না। রাজগৃহ উপত্যকা দেখা এইখানে শেষ করিলাম।

রাজগৃহ আজি বনগৃহে পরিণত দেখিলাম, সে উপত্যকা ভূমি স্থানে স্থানে যে দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ আজি বনবৃক্ষাচ্ছাদিত, রাজপ্রাসাদাদি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, তবু সেই পাষাণময় অট্টালিকার প্রস্তররাশি স্থানে স্থানে স্তূপাকার রহিয়াছে, বৈভারাঙ্কে বাসস্থানার্থ যে সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। আমরা এখান হইতে গিরিব্রজপুরের দক্ষিণ দ্বার দেখিতে চলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিব্রজপুর দক্ষিণ দিকে গিরিব্রজগিরি দ্বারা রক্ষিত। এই গিরিব্রজ গিরির মধ্যভাগে যে গিরিসঙ্কট, তথায় 'গজদ্বার' নামক রাজগৃহ প্রবেশের দক্ষিণদ্বার ছিল। পূর্ব্বোক্ত বৈভার এবং বিপুলের মধ্যবর্ত্তী 'সূর্য্যদ্বার' হইতে ঐ গজদ্বার অবধি যে বিস্তৃত রাজপথ ছিল, আজও লোকে সেই পথ অনুসরণ করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে; সর্ চার্লস ইলিয়টের আগমনোপলক্ষে এই পথের স্থানে স্থানে জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল। আমরা শীঘ্র ঐ রাজপথ ধরিবার জন্য অপথ দিয়া, বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, যাইতে যাইতে কেহ সুন্দর বনফুলে দেহ সজ্জিত করিলেন, কেহ বনকুল তুলিয়া খাইলেন, আমাদের কবিরাজ মহাশয় কুঁচ, কুরচি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমরা এইরূপে কতদূর অপথে গিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজপথে পড়িলাম, বন কণ্টকাদিতে বস্ত্রাদি ছিন্ন হইল, কাহারও বা দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। প্রায় একক্রোশ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া আমরা গিরিব্রজগিরির পাদদেশে পথপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড কূপ সন্নিকটে বৃক্ষতলে অল্প বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া পথের উপরে বামধারে প্রস্তরে বিচিত্রভাষায় খোদিত শ্লোকাদি দেখিলাম। বঙ্গেশ্বর ইলিয়াট বাহাদুর যাহাতে ঐ সকল চিহ্নাদি লোকের চলাচলে বিনষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা এখান হইতে পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখে কিছু দূর গিয়া গিরিব্রজ গিরিমধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলাম। ইহার কথা পরে বিবৃত করিব। ক্রমশঃ

শ্রীরামলাল সিংহ।

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই [illegible]

গত পৌষ সংখ্যার নব্যভারতে আমি বাঙ্গালী অবনতির কারণ শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরি নামক বিলাতী মাসিক পত্রে বেঞ্জামিন কিড্ নামক একজন সমাজতত্ত্ববিদ্ তাঁহার লিখিত Social Evolution নামক পুস্তকের আলোচিত তত্ত্ব গুলি সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা এক্ষণে বিলাতি পণ্ডিতগণও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,—

The history of *evolution of life* has necessarily been the record of continuous rivalry, effort and self-sacrifice. Progress ......necessitates a state of constant effort and self-sacrifice in the individual.

অর্থাৎ জৈব পরিণতির মূলসূত্র আত্মত্যাগ, উদ্যম ও প্রতিযোগিতা। মনুষ্য ব্যতীত সকল জীবই তাহার সহজ জ্ঞান বা (Instinct) হইতেই এই আত্মত্যাগ যতটুকু প্রয়োজন, তাহা শিক্ষা করে। সন্তানের লালন পালনে, সাধারণ জীবের এই আত্মত্যাগ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আবার যে সকল নিম্নশ্রেণীর জীবগণ সমাজবদ্ধ, তাহাদের মধ্যেও সমাজের জন্য কতকটা আত্মত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে নিয়ম কিছু স্বতন্ত্র। কেন না, মনুষ্যের সহজ জ্ঞান বুদ্ধি দুইই আছে। সেই বুদ্ধি বলে তাহারা ভাল মন্দ বুঝিয়া লইতে পারে। বুদ্ধি বশে যখন মানুষে কর্ম্ম করিতে যায়, তখন সে সাধারণতঃ স্বার্থ-চালিত হয়। কর্ম্ম—ত্যাগগ্রহণাত্মক। অর্থাৎ সাধারণ[illegible] বিষয় [illegible] বার জন্য [illegible] জন্য কর্ম্ম ক[illegible]সুখকর, কো[illegible] বিষয় দুঃখকর, ত[illegible] আমরা স্থির করিয়া লই[illegible]

কিড্ সাহেব বলিয়াছেন ;—

A fundamental factor of human evolution is that we are concerned with a creature, which possesses two associated characteristics not encountered anywhere in life...The first characteristic is human reason: the other associated with it, is the capacity which the man possesses of acting under its influence in concert with his fellows in social groups. He can only obtain his highest development and employ his powers to the fullest in association with his fellows...and we witness in the individual the *highest possible degree of social efficacy.*—In the second place, we find the process of evolution also tending to the *highest possible development of reason in the individual.*

তবেই হইল, মানবজাতির উন্নতির সহিত প্রত্যেক লোকের বুদ্ধির উন্নতি হইবে ও সামাজিকতার উন্নতি হইবে। তাহার ফলে মানুষ নিজের সুখ ও অপরের সুখ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, এবং প্রত্যেক মানবের ও সমাজের দুঃখের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবে। সমাজের মধ্যে যাহাতে struggle for existence তিরোহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

কিড্ সাহেব আরও বলিয়াছেন যে—সে যাহাই হউক, মানুষ যদি শুধু তাহার নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তবে সে আগে নিজের সুখই অন্বেষণ করিবে। কিম্বা যেখানে নিজের সুখ বিসর্জ্জন না দিয়া সমাজের পক্ষে কার্য্য করা যায়, সে বড় জোর ততদূর করিতে পারে।

কর্ত্তব্যজ্ঞান ও নীতির মূলসূত্র, যদি

আমাদের নিজের বুদ্ধিতে অন্বেষণ করি, তবে Utilitarianism বা 'সুবিধাবাদের' অধিকদূর আর আমরা যাইতে পারি না। তাহারও মূলসূত্র স্বার্থ। কিড্ সাহেব বলিয়াছেন—

The fundamental error of Utilitarianism is to find a sanction for right conduct in our inclinations...Philosophy presents the ever unsuccessful effort to convince that there is a rational sanction for right conduct in the individual. It has urged from generation to generation the utilitarian doctrine that the all-sufficient sanction for right conduct is *simply enlightened self-interest*.

এখন কথা হইতেছে, ইহার কারণ কি? কেবল তর্ক ও যুক্তির দ্বারা কেন আমরা নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম কর্ম্মের বা কর্ত্তব্যবাদের মূলসূত্র বুঝিতে পারি না? কিড্ সাহেব বলেন, ইহার কারণ—

There is a third factor of human evolution তাহাকে Law of disintegration বলে। ইহা Law of retrogression এর বিপরীত। কিড সাহেবের কথাতেই তাহা বলিতেছি—

The ideal of average individual is not the effort and sacrifice, but the desire to live in the greatest possible ease and comfort with the least possible exertion. The history of classes presents an example of the same tendency. The ideal is, the maximum of ease, comfort and security, with the minimum of effort and sacrifice.

অর্থাৎ সাধারণতঃ মানুষের কার্য্যের মূলসূত্র এই যে, সে যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণে কার্য্য ও আত্মত্যাগ করিয়া যত অধিক সম্ভব সুখ ও 'আয়েস' ভোগ করিবে। এখনকার সমাজ বুদ্ধিপ্রধান বলিয়া এই মূলসূত্রেই চালিত হইতেছে।

এই বুদ্ধিচালিত সমাজে কতদূর কুনিয়ম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কিড্ সাহেব দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

A difference in his (man's) case is, that by the possession of reason he has become equipped with the power to obtain satisfaction of such instinct, without entailing the consequences. He has......particularly in his declining civilization, engaged to circumvent even some of the most imperative of them like the parental instincts. He has......by the restriction of the propagation, and by the *perversion* of the institution of marriage and the family, succeeded in obtaining its satisfaction for the individual while suspending its operations in furthering the...interest of society and race.

এরূপ হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরও কিড্ সাহেবই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

In human affairs we are concerned with a creature, subject to the law of retrogression, and, therefore, only able to hold its place, much less make progress, by submitting to an onerous process of evolution, the benefit of which is remote—far beyond the limits of his own life-time—and in the success of which he has, as an individual, absolutely no interest. If he, therefore, holds the world to be a mere sequence of materialistic cause and effect, and if he possesses the power to suspend the process or to escape its effects, it follows with almost the cogency of mathematical demonstration, that his own reason can never supply him with any effective sanction for submitting to it.

তবেই দেখা গেল যে, মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিজের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারে না। জগতের উন্নতি বা শুধু মানব জাতির উন্নতি ভাবিয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন সে কখন তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না।

সে প্রয়োজন বুঝিবার জন্য ও স্বার্থত্যাগ করিয়া সমাজের বা সংসারের হিতার্থ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন বুঝিবার জন্য, কেবল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলে চলে না। তাহার মূলসূত্র ধর্ম্ম। বুদ্ধি আমাদিগকে স্বার্থচালিত করে। ধর্ম্ম আমাদের স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়। একটী স্বার্থাভিমুখী বা centripetal শক্তি—অন্যটী স্বার্থবিমুখী বা centrifugal শক্তি। মনুষ্য সমাজে এই দুই শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত সর্ব্বদা চলিতেছে। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস এই দুই শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের ইতিহাস মাত্র।

কিড্ সাহেব বলিয়াছেন ঃ—

The history of the world is merely the history of its religions......It is their function to supply the ultimate sanction for that effort and sacrifice necessary to the continuance of the process of evolution proceeding in society, but which man, as a reasoning creature, subject to the law of retrogression, is in the nature of things, precluded from ever finding in his own reason.

* * Two things are immediately apparent. In the first place, we have found in religion the characteristic feature of human evolution the essential motive force, from which all cosmic progress in society proceeds. In the second place we have found in religion itself its essential element, namely, the ultra-rational sanction it prescribes for conduct.......For *the principle common to all religion is the merit of self-sacrifice* : it has provided, as it still provides, the sublimest conception of self-abrogation, that has ever moved humanity.

অতএব ধর্ম্মই আমাদের আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মের ভিত্তি না থাকিলে প্রকৃত আত্মত্যাগ থাকিতে পারে না। অবশ্য মানুষ কেবল যদি সহজ জ্ঞানে কার্য্য করিত, তবে আপনা হইতে তাহার কতকটা আত্মত্যাগ প্রবৃত্তির উন্নতি হইতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে,বুদ্ধি আমাদের সেই সহজজ্ঞান ক্রমে নষ্ট করিয়া দেয়। সমাজ যত উন্নত হয়,মানুষের বুদ্ধির যত বিকাশ হয়,ততই এই সহজজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। এই সহজজ্ঞানই আমাদের 'inspiration' স্বরূপে কখন কখন বিকাশিত হয়। এই সহজজ্ঞান ব্যতীত আমাদের সহজ বৃত্তি বা Nature, আমাদের চিত্তে স্বভাবতঃ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়া কখন কখন আমাদিগকে পরার্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির বিকাশের সহিত সে inspiration বা সে nature ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়।

কিড্ সাহেব বলিয়াছেন যে ঃ—

The process of evolution in progress having ultimately no sanction in the individuals' reason, the tendency of the rational factor, if uncontrolled is always eventually towards disintigration and arrest of progress.

এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কিড সাহেব ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের কতকগুলি প্রধান মূলসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

কিড্ সাহেব এই কয়টী তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন—

I.—All religion is essentially ultra-rational. No form of belief, is capable of functioning as a religion in the evolution of society which does not provide sanctions for conduct, outside of, and superior to reason.

II.—The social system founded on a form of religious belief, forms an organic growth...

III.—The process at work in human society is always developing two inherently antagonistic but complimentary tendencies : namely, (1) the tendency requiring the increasing subordination of the individual to the society, and (2) the rationalistic tendency leading the individuals at the same time to question the authority of the claims requiring him to submit to a process of social order in which he has absolutely no interest.......In a healthy and progressive society, the fundamental principle of its existence is, that the second tendency must be continually subordinated to the first. But intellect has no power to effect this subordination.

IV.—The problem with which every progressive society stands continually confronted is :—How to retain the highest operative ultra rational sanction for those onerous conditions of life, which are essential to its progress, and at one and the same time to allow the freest play to those intellectual forces, which, while tending to come in conflict with this sanction, contribute nevertheless to raise to the highest-degree of social efficacy, the whole of the members.

অর্থাৎ প্রথম কথা এই,—যে ধর্ম্ম আমাদের আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়া সমাজের ক্রমোন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ অবস্থিত, সে ধর্ম্ম যুক্তি ও তর্কের বিষয়ীভূত নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সমাজ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, তাহারই ক্রমোন্নতি হয়, আর সেই সমাজের

উন্নতির তত্বই প্রকৃত ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। তৃতীয় কথা এই যে, সমাজে দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তি কার্য্য করে। একটীতে মানুষকে সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়, আর একটীতে আমাদের বুদ্ধিকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজকে জলাঞ্জলি দিতে, সমাজকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ ধারণা করিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা দেয়। যে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়,তাহাতে প্রথম শক্তি এই দ্বিতীয় শক্তিকে সংযত করিয়া রাখে। চতুর্থ কথা এই যে,প্রত্যেক ক্রমোন্নত সমাজ এরূপে সংগঠিত করিতে হইবে যে, যেন উল্লিখিত দুইটী শক্তির মধ্যে একটী শক্তি আর একটীকে একেবারে অভিভূত করিয়া না ফেলে। সমাজের উন্নতির পক্ষে ব্যক্তিগত বুদ্ধির (ও শক্তির) ক্রমবিকাশের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ স্বার্থত্যাগেরও প্রয়োজন। দুইটী পরস্পর বিরোধী হইলেও যাহাতে এ দুইটীরই সমানভাবে উন্নতি হইতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে।

অতএব দেখা গেল,কিড্ সাহেব যে কথা বুঝাইয়াছেন, আমি পূর্ব্বকথিত প্রবন্ধে কতকটা তাহারই আভাস দিয়াছিলাম। আমরা বুঝিয়াছি যে, সমাজের যাহা প্রাণ, যাহাতে সমাজ সংগঠিত করে, সমাজ-শরীরে প্রকৃত প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, সেই শক্তি স্বার্থত্যাগ। ধর্ম্মই আমাদের এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেয়। অতএব ধর্ম্মই সমাজের মূলভিত্তি।

আধুনিক অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে,কেবল বুদ্ধিবলে, ধর্ম্মের মূল না থাকিলেও, এই স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিতে পারা যায়। এ কথা যে অসঙ্গত, তাহা কিড্ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি এ স্থলে দুই এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের কথা মাত্র বলিব। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্যাণ্ট বলেন, আমাদের মনে 'I ought' রূপ যে বাণী সর্ব্বদা স্ফূর্ত্ত হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্যের পথে—স্বার্থত্যাগের পথে—পরোপকার প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,এই 'I ought' বাণীর একমাত্র মূল—সাধারণ জীবের সহজজ্ঞান। কখন কখন এই বাণী আমাদের অন্তরে দৈববাণী বা আদেশ স্বরূপেও প্রতিভাত হইতে পারে। কবির বা ঋষির প্রজ্ঞালোক বা inspiration এই সহজ জ্ঞানের রূপান্তর মাত্র। সেই সহজজ্ঞানচালিত কর্ম্মপ্রবৃত্তিবলে জীবমাত্রেই আবশ্যক মত স্বার্থত্যাগ ও পরার্থে কর্ম্ম করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্মই এই সহজ জ্ঞানের প্রাণ। ধর্ম্ম ব্যতীত শুধু বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত এই সহজজ্ঞান ক্রমে মলিন হইয়া যায় ও ক্রমে তাহা লোপও পাইতে পারে। সুতরাং 'I ought' এই মনোবৃত্তি মনুষ্যের বুদ্ধিজ নহে। ইহা সহজজ্ঞানজ অথবা সাধনাজাত। আর্য্যঋষিগণ এই সহজজ্ঞানের মূলসূত্র আমাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছেন। যে মানবের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম বা সুকৃতির ফলে ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে,সে-ই এই জন্মে এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বা 'I ought' এই রূপ মনোবৃত্তি লাভ করিতে পারে, অন্যে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে Conscience বলে, তাহা এই 'I ought' বৃত্তির নামান্তর মাত্র।

যাহা হউক,কেবল বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার ও তর্কের উপর নির্ভর করিয়া যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের মূলসূত্র পাওয়া যায় না,তাহা যাঁহারা আধুনিক

বিলাতী Ethical Philosophyর কূট তর্কজালের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

জর্ম্মান পণ্ডিত ফিক্তে কেবল ধর্ম্মবিশ্বাস বা faithএর উপরই এই স্বার্থত্যাগ বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য বুদ্ধির মূলসূত্র দেখিতে পাইয়াছেন। পণ্ডিত সপেনহর ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী পলডুসেন দেখাইয়াছেন যে, মানবের মধ্যে বাসনা (will) দুইটী ভিন্নপথে কার্য্য করে,—একটী assertion of the will, আর একটী Denial of the will। অর্থাৎ স্বার্থ ও পরার্থ চেষ্টা মানুষকে চালিত করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত এই পরার্থ বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের এই একমাত্র ভিত্তি—স্বার্থত্যাগ। ভ্রান্ত অহং জ্ঞানে মানুষ নিয়ত আত্মসুখ চেষ্টায় চালিত হইয়া চিরদিন দুঃখ পায়। মানুষ ক্রমে ক্রমে স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে, যখন 'আমি' বা অহংজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়া স্বার্থত্যাগের চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন তাহার নির্ব্বাণ হয়, তাহার সকল দুঃখ দূর হয়। এই একমাত্র দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কারেই শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব লাভ হয়। এই একমাত্র তত্ত্বের উপরই বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল।

আর্য্য ঋষিদিগের মতে ধর্ম্মসাধন হইতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞান যখন বুদ্ধিকে তাহার সহায় করিয়া লয়, তখনই আমাদের বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু বুদ্ধি যখন মন অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত, তখন তাহাতে এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না। যুক্তি তর্কের দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হয় না। কেননা, জ্ঞান, বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে। এই সকল তত্ত্ব অতি গুরুতর। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

আমাদের এস্থলে এই মাত্র বুঝা আবশ্যক যে, আমাদের এই স্বার্থত্যাগ বৃত্তিই সমাজের মূল। ধর্ম্ম হইতেই সেই স্বার্থত্যাগ বৃত্তির উৎপত্তি ও পরিণতি হয়। বুদ্ধিতে বা স্বার্থবুদ্ধি-অভিভূত সহজজ্ঞানে তাহার মূল পাওয়া যায় না। সুতরাং ধর্ম্মই সমাজের মূল। ধর্ম্ম সমাজে এরূপে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক যে, তাহা দ্বারা যেন সকল সমাজস্থ লোকেরই স্বার্থ প্রবৃত্তি যতদূর সম্ভব দমন হয়। অথচ তাহার সহিত যেন মনুষ্যত্বের অবনতি না হয়। মানুষের চিত্তবৃত্তি আছে, কর্ম্মবৃত্তি আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে। এই তিনের উন্নতিতে মানুষের উন্নতি। চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে, কিন্তু স্বার্থের উপকরণে সেরূপ স্ফূর্ত্তি-করিতে নাই। পরার্থবৃত্তি, অর্থাৎ দয়া, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি পরার্থ বৃত্তির উন্নতির দ্বারা চিত্তবৃত্তির উন্নতি করিতে হয়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা করিতে হয়, কেননা, প্রকৃত চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি কালে আমরা অহংজ্ঞান ভুলিয়া যাই বলিয়া তখন আমাদের স্বার্থ ভাবনা আদৌ থাকে না। তাহার পর যতদূর সম্ভব, ততদূর অধিক পরিমাণে পরার্থ কর্ম্ম করিয়া, এবং যতদূর সম্ভব হয় ততদূর অল্প পরিমাণে নিজের জন্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবৃত্তির উন্নতি করিতে হইবে। বুদ্ধিও সেইরূপ যাহাতে পরার্থ বিকাশ হয়, অর্থাৎ নিজের কিসে সুখ হইবে ও কিসে সুবিধা হইবে, সেই সকল বিষয় আলোচনা না করিয়া, শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে। পরার্থ বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা কখন মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তির ও বিকাশের অন্তরায় হয় না। তাহাতে বরং এই বিকাশ আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

অতএব যে সমাজে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধিক বিকাশ থাকে, এবং যে সমাজে বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি,ধর্ম্মবলে,অথবা পরার্থ কর্ম্মাদি চেষ্টার দ্বারা বিকাশিত হয়, সেই সমাজই প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। যে সমাজ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, তাহার যেমন মূলসূত্র ধর্ম্ম, সেইরূপ অন্যান্য বিকাশোন্মুখ সমাজেরও মূলসূত্র ধর্ম্ম হওয়া প্রয়োজন। যে সমাজ যখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হয়, তখনই তাহা উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। অন্যথা তাহার উন্নতি হইতেই পারে না। কিড্ সাহেব বলিয়াছেন—

The central element in all religions,is the ultra-rational sanction provided for conduct : the principle common to all religion, is the sublimest conception of self-abnegation.......It is to the first we owe the integrating world-building spirit......which still renders the catholic dogma and the English Puritan faith, the two most powerful antiseptic influence in our western civilization. It is to the second—the unexampled conception of self-abnegation—that we owe the evolutionary force that has been behind the entire process of social development......which has transferred a military organisation into the modern state.

উপরি উদ্ধৃত কথা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর অবনতির কারণ শীর্ষক প্রবন্ধে আমি যেরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মই সমাজের জীবন, ধর্ম্মই সমাজের উন্নতির কারণ বিলাতেও সেইরূপ কথা সম্প্রতি একজন সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু কিড্ সাহেব যদিও বুঝাইয়াছেন যে,ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও স্বার্থত্যাগ সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, তথাপি তিনি কিরূপে সমাজ সংগঠিত হইলে, সাধারণে সেই নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পারে ও তাহাদের নিজের উদ্যম স্বার্থপ্রবৃত্তি সংযত করিতে পারে,তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। কিড্ সাহেব কেবল বলিয়াছেন যে, সমাজ বিকাশের তাহাই প্রধান সম্পাদ্য বিষয়। কিড্ সাহেবের কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই কঠিন তত্ত্বের একরূপ মীমাংসা হইয়াছিল। আর্য্য ঋষিগণ সমাজে জাতিবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,সমাজ এরূপ সংগঠিত হওয়া কর্ত্তব্য যে, লোকের স্বার্থ প্রবৃত্তির দমনের সহিত যেন তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া না যায়, যেন রাজা কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারা লোকের উদ্যম স্বার্থপ্রবৃত্তি দমন করিতে গিয়া তাহাদের একেবারে নিস্তেজ করিয়া না দেন বা তাহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট না করেন। কিন্তু যেন মানুষ কর্ম্ম দ্বারা ও জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপনার উন্নতি করিতে পারে; যেন সমাজের প্রত্যেক লোক তাহার মানসিক শক্তির (intellectual force) অবাধে স্ফূর্ত্তি (freest play) পাইয়া ক্রমে উন্নত হইতে পারে। এবং অন্যদিকে যেন এই স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি, স্বতঃ স্ফূর্ত্তি পাইয়া অন্যের সহিত স্বার্থ সংঘর্ষ আপনা হইতেই (সুধু ধর্ম্ম বলেই) তিরোহিত হয়। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য পূর্ব্বে আর্য্য সমাজের প্রত্যেক লোক তাহার স্বভাবানুরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুকূল নিজ বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াই সর্ব্বদিকে উন্নত হইতে পারিত ও সেই সঙ্গে সমাজকে উন্নত করিতে পারিত।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূলসূত্রের প্রয়োজন। তাহা অবলম্বন করিয়া তবে সে, ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। সাধারণতঃ লোকে স্বার্থকেই সেই মূলসূত্র করিয়া লয়,ও মানুষ স্বভাবতঃই নিজের সুখ ও উন্নতি লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞানা-

র্জ্জন করে ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন করে। ধর্ম্ম এই স্বার্থসূত্র ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু সে যদি তাহার অবলম্বনীয় অন্য সূত্র না পায়,তবে সে কর্ণহীন তরণীর ন্যায় বিপন্ন হইয়া পড়ে, আর সে উন্নতির পথে যাইতে পারে না। তাহার বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির আর উন্নতি হয় না। সুতরাং সে সমাজও উন্নতির পথে যাইতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্ম কেবল আমাদের এই স্বার্থসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকে না, আমাদের আর একটী অবলম্বনীয় সূত্র দিয়া দেয়। সেটী নিষ্কাম কর্ম্মসূত্র। সেটী আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি, তাহা সনাতন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। আমাদের সমাজে লোকে অনেক অবস্থায় এই ধর্ম্মবিহিত কর্ত্তব্য বুদ্ধি চালিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ও আশ্রম ও বর্ণবিহিত ধর্ম্ম বা কর্ম্ম আচরণ করিত। সেই জন্য আমাদের সমাজ এত দৃঢ় সম্বদ্ধ ছিল। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সমাজই আদর্শসমাজ হইয়াছিল,সমাজ দৃঢ়তম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বিলাতী সমাজতত্ত্ব জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া আজিও প্রকৃত রূপে সমাজের মূলসূত্র ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের সমাজতত্ত্ব কোন দিন পর্য্যালোচনা করিতে অগ্রসর হন, তবেই তাঁহারা সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র বুঝিতে পারিবেন। সমাজের উন্নতি কল্পে এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মভেদ প্রথা কতদূর প্রয়োজন, তাহা স্থির করিতে পারিবেন। বিলাতী পণ্ডিতগণকে যে এখন এই পথেই সমাজতত্ত্ব বুঝিতে যাইতে হইবে, তাহা কিড্ সাহেবের উল্লিখিত প্রবন্ধের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। এই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

আর যে সকল বাঙ্গালার সুসন্তান বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কল্পে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত, যাঁহারা মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন,তাঁহাদের এ সমাজের উন্নতির জন্য কোন্ পথে অগ্রসর হইতে হইবে,তাহার আলোচনার জন্য পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবং সেই কথার সমর্থন জন্য আজ আর দুই একটী কথা বলিলাম। ধীর পাঠকগণের চিন্তাস্রোত যদি এই আলেচনা হইতে কতক পরিমাণে সমাজতত্ত্ব অনুশীলনে নীত হয়,তবে আমার এই শ্রম সার্থক মনে করিব।

সমাজের রক্ষার জন্য,তাহার উন্নতির জন্য, ধর্ম্ম যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং সমাজ মধ্যে এই'ধর্ম্ম'শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়,যাহাতে লোকে স্বার্থত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে, এরূপ শিক্ষা যে এক্ষণে আমাদের প্রচার করা কর্ত্তব্য,এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সকলের প্রথম যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহাও বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কেবল স্বভাব অনুসারে জাতিভেদ ও কর্ম্মভেদ প্রথা যে সমাজের পক্ষে অনুকূল, একথা অনেকে স্বীকার করিবেন না।আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই তত্ত্ব বিশেষ আলোচনা করিয়া যাহা সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করেন।

একটা চলিত কথা আছে, "Few think, but every one must have opinion," চিন্তা না করিয়া সকল দিক্ আলোচনা না করিয়া এবং ধ্যান ধারণা ব্যতীত তত্ত্বচিন্তায় সিদ্ধ না হইয়া যাঁহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন,তাঁহারা কতকটা জড়প্রকৃতি সম্পন্ন। এরূপ প্রকৃতি যেন আমাদের কাহারও না থাকে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দার্শনিকজ্ঞান ও ব্রহ্ম। (২)

আমরা গতবারে যে মহাত্মার দার্শনিক মত বিবৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে,ইনি ত্রিবিধ পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ঃ—(ক) ব্রহ্ম, (খ) চেতন বা আত্মা, এবং (গ) জড়। আত্মা ও জড় উভয়ই ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে,ইহার মতে বাস্তবিক পদার্থ (substance) দ্বিবিধ। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যদিও পূর্ব্বোক্ত Idea ধরিয়া বিবেচনা করিলে, ইঁহার দার্শনিক মত বেদান্তদর্শনের ন্যায় একরূপ অদ্বৈত-বাদের আকারে আসিয়া পড়ে, তথাপি পদার্থ সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইনি দ্বৈত-বাদী। ইঁহার দর্শন দ্বৈতবাদের (Dualism) উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইঁহার মত-বিশ্লেষ কালে দেখিয়াছি, জড় (Matter) এবং চেতন (Mind) এই উভয়েরই Idea বা ছায়া বা আকার ব্রহ্ম-পদার্থে সর্ব্বদা অবস্থিত ও অনুস্যূত। জড় ও চেতন সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াও উভয়ই সর্ব্বদা ব্রহ্মে সংলগ্ন। এই Idea ইঁহার মতে চিরন্তন ও অনাদি; স্বয়ং ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেও এই Ideaর অন্যথাকরণে সমর্থ নহেন। চেতন এবং জড় এই উভয়ই ব্রহ্মেচ্ছায় যে দিন একত্রীভূত হইল, যে দিন আত্মা জড়দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া পড়িল, সেই দিন হইতেই পদার্থ সমূহের ছায়া সকল আত্মায় আসিয়া অনুভূত ও পরিজ্ঞাত হইতে লাগিল। এবং তখন হইতেই আমরা জড়রাশিকে পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যাভিব্যক্তরূপে দেখিতে পাইলাম। ব্রহ্মেতেই আমরা পদার্থ সকল দেখিয়া থাকি; সুতরাং তাঁহার চিন্তা প্রভৃতি আমাদের নিজের ঐ বৃত্তিগুলির সঙ্গে একই। এই দার্শনিকের এইরূপ মতের কোন দোষ আছে কি না, তদ্বিষয়ে সমালোচনা করিয়া দেখিবার অগ্রে, আমাদিগকে আর একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতের মত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইতেছে। Malbranche ইঁহারই মতানুগামী,—ইঁহারই শিষ্য ও পৃষ্ঠ-পোষক। ইঁহারই নিকট Malbranche স্বীয় অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র গ্রহণ করিয়া আপন দার্শনিক-মতের প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহারই মত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, একেবারে উভয়েরই মত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা যাঁহার কথা বলিলাম, ইঁহার নাম Descartes.।

Descartesএর মত-সম্বন্ধে আমাদিগের অতি সংক্ষেপে সামান্যতঃ দুই চারিটী কথা বলিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন; কেননা ইঁহার মতের সঙ্গে পূর্ব্ব-বিবৃত মতের অনেকাংশে ঐক্য আছে। উভয়েই দ্বৈত-পদার্থবাদী, উভয়ই Ideaর পরিপোষক। কিন্তু উভয়ের প্রণালী-গত একটু বিভিন্নতা আছে। Descartes বলেন,—আমরা সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমুদয়ের অস্তিত্বে আমরা সন্দেহ করিতে পারি। ঐ যে নীলাকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত তারকামালা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, ও সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত কৌশল ও বিচিত্র নির্ম্মাণ-শক্তির গীতি গাহিয়া বেড়াইতেছে,—কে বলিল ঐ নক্ষত্রমালার আকার ঐরূপ ক্ষুদ্র? তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র বলিতেছ, তাহা শত যোজন বিস্তৃত। এইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আমরা যে পদার্থেরই অনুভব করি না কেন, তাহারা তদ্রূপ না হইতেও পারে।

"That there is such a thing as extension, seems indeed to be beyond doubt; yet I know not whether some all powerful being

has not caused that there should exist in reality neither earth nor heavens, nor any extended object,nor figure, nor magnitude, nor place, and that nevertheless I should possess notions which represent to me as in a mirror all these objects as existing. My imperfection may be so great that I am always deceived."

কিন্তু তিনটী পদার্থে আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারি না। আত্মা, ব্রহ্ম এবং জড়—এই ত্রিবিধ পদার্থে সন্দেহ যাইতে পারে না। ইহারা সন্দেহরাজ্য হইতে দূরে অবস্থিত। সর্ব্বপদার্থে অবিশ্বাস হইতে কিরূপে আমরা এই ত্রিবিধ পদার্থের অস্তিত্বে উপনীত হইতে পারি,তাহাই যুক্তি দ্বারা দেখান যাইতেছে।

(১) আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, সমস্ত পদার্থেই আমি অবিশ্বাস করিতে পারি; বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে আমার সন্দেহ আসিতে পারে; এমন কি আমি মনে করিতে পারি যে, শরীর—ইহাও বুঝি আমার ভ্রম হইতে পারে। এইরূপে যখন জাগতিক সমস্ত পদার্থে আমার সন্দেহ জন্মিল, যখন সমস্ত পদার্থই উড়িয়া গেল, তখন কিন্তু একটী পদার্থ অবশিষ্ট রহিল। এই যে আমার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী "সন্দেহ", এই 'সন্দেহের' উপরে আমি সন্দেহ করিতে পারি না। একই সময়ে,একই পদার্থ আছে এবং নাই হইতে পারে না। যাহা এই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে না থাকিতে পারে না। আমি যে মুহূর্ত্তে দ্রব্যরাশির অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছি, সেই মুহূর্ত্তে বস্তুরাশি মিথ্যা হইলেও, সে "সন্দেহ" আমার থাকিয়াই যাইতেছে। এই সন্দেহ একরূপ মনের চিন্তা বিশেষ (Thought)। চিন্তা থাকিলেই,সুতরাং একজন চিন্তাকর্ত্তাও থাকিবে। সুতরাং এই চিন্তা বা Thought যাহার উপাদান (Essence),সেই চিন্তা-কারক মন (Soul) আমার থাকিবেই। সুতরাং (Soul)এর অস্তিত্বে আমি সন্দেহ করিতে পারি না। কেননা, Soul ই ত সন্দেহ করে। অতএব আমার মন বা আত্মার অস্তিত্ব আছে।

(২) আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মনে আর এক প্রকারের Idea সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটী অনন্ত, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সম্পূর্ণ পদার্থের Idea আমাদের মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক। এই Idea আমাদের স্বীয় সসীম ও অপূর্ণ মন হইতে পারে না। সান্ত মন কি করিয়া অনন্তের Idea জন্মাইবে? অথচ আমরা বুঝিতে পারি যে,এই অনন্তের Idea আমাদের মনে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং একজন অনন্ত-প্রকৃতি-সম্পন্ন এইরূপ Ideaর জনক ব্রহ্ম এই Idea মানব-মনে প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, একটী অনন্ত পূর্ণতাযুক্ত (Perfect) পদার্থ (যাহা সান্ত ও অসম্পূর্ণ Soul হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন) রহিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন ও সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।

"If the representative reality of any one of my ideas is so great that it exceeds the measure of my own reality, I can conclude that I am not thé only being existing, that there must exist something else which is the cause of that idea. Since I am finite, the idea of an infinite substance could not be in me, if this idea did not come from a really existing infinite substance."

(৩) মানব-মনে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ Idea ব্যতীত, আর এক প্রকারের Idea নিহিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সে Idea জড় পদার্থের। Thought-এর ন্যায়, Extension (জড়ের ঘনত্ব) এর Idea মনে প্রোথিত আছে। সুতরাং Thought এবং Extension অথবা চেতন এবং জড় উভয়ই সমসাময়িক, অথচ পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ

রূপে বিভিন্ন। আমার মনে বাহ্যপদার্থের Idea নিহিত রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইতেছে, এই Idea কোথা হইতে আসিল? ইহা আমার নিজের মন হইতে উৎপন্ন নহে; যেহেতু আমার মনের চিন্তা বা Thought ব্যতীতও ইহা আমার মনোমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "These ideas of sensible things pre-suppose no *thought* of mine." এই Idea প্রাপ্ত হইতে আমার চিন্তার আবশ্যক করে না। তবে কি উহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন? না, তাহাও ত হইতে পারে না। কেননা, যদি ব্রহ্ম আমার অজ্ঞাতসারে—আমার চিন্তারাজ্য হইতে পৃথক্ ভাবে—ঐ Ideaগুলি আমার মনে দিয়া থাকেন, তবে ত ঈশ্বর প্রবঞ্চক সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণস্বরূপ বিধাতা ত বঞ্চক হইতে পারেন না। সুতরাং ইহারা অবশ্যই বাহ্যপদার্থ রাশি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। দেশ ও কালের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বাহ্যজড় হইতে এই Idea মানবমনে নিহিত হইয়াছে।

এখন একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, Malbrancheর দর্শন Descartesর দর্শন হইতে একটু বিভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছে। ইঁহার মতানুসারে, এই Ideaগুলি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্ম-পদার্থে নিহিত হয় নাই; ত্রিবিধ পদার্থের Ideaগুলি মনোমধ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে মন বা Soul আপনা হইতেই ব্রহ্মের ও নিজের Idea প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের Idea, স্বয়ং ব্রহ্ম মানব মনে প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন এবং নিজের Idea, মনেরই Essence বা উপাদান স্বরূপ। এবং জড়পদার্থের Idea, মন জড়পদার্থ হইতেই পাইয়াছে। ইঁহার মতে, জড়রাশি বাস্তবিক বর্ত্তমান; জড় ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিত Ideaর বাহ্য-অভিব্যক্তি নহে; ইহাদের Real validity আছে। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলে এই Ideaগুলি অন্যরূপ করিতেও পারিতেন; ইহারা অপরিবর্ত্তনীয় নহে।

Malbrancheর ন্যায়, ইঁহারও মতে ইন্দ্রিয়, স্মৃতি প্রভৃতি মনের অপ্রধান গুণ (Modes or qualities); এবং আকৃতি, গতি প্রভৃতি জড়ের অপ্রধান গুণ বা qualities.। ইঁহারও মতে Thought বা চিন্তা মনের উপাদান বা অপরিবর্ত্তনীয় প্রধান গুণ (Essence or attribute); এবং Extension বা ঘনত্ব জড়ের প্রধান গুণ বা attribute.। ঘনত্ব জড়পদার্থের উপাদান হওয়াতে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও স্থান (Space) নাই, যাহাতে জড় বা Matter বর্ত্তমান না আছে;—কোনও স্থান শূন্য নহে*।

আমরা Descartesএর মত-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম; এবং ইহা পূর্ব্ববিবৃত মতের সঙ্গে কোন্ কোন্ অংশে একরূপ এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাও তুলনা করিয়া দেখা হইল। কিন্তু এস্থলে একটা বিষম প্রশ্ন আসিয়া স্বতঃই উপস্থিত হইতে পারে। সে প্রশ্নটী এই :—যদি Mind এবং Matter সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইল, যদি উভয়ই পরস্পর সম্বন্ধ-শূন্য হইল, তবে কি বাস্তবিক মন ও শরীরে কোনই সম্বন্ধ নাই? যদি কোনও সম্বন্ধ না থাকে, তবে মনোমধ্যে ইচ্ছা উপস্থিত হইলেই, সেই ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়া কি করিয়া শরীরে উৎপন্ন হয়? মনে কর, তোমার সম্মুখে একটী সুন্দর গোলাপ-পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। উহার নয়নোল্লাসকারী

* ইনি বলেন যে, দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি আকৃতি ও গতি —ইহারা জড় পদার্থেতেই বর্ত্তমান। কিন্তু শব্দ, বর্ণ, উষ্ণ স্পর্শ প্রভৃতি সুখ ও দুঃখের ন্যায় মানবাত্মাতেই বর্ত্তমান; ইহারা জড় পদার্থে নাই।

মনোহর বর্ণ সকল, এবং হৃদয়াহ্লাদকারী মনোমাদন সুরভি, তোমায় আকুল করিয়া তুলিল। তোমার মনে ঐ পুষ্পচয়নের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল; ঐ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, তোমার হস্ত ঐ কুসুমচয়নের জন্য প্রসারিত হইল; পদদ্বয় দৌড়িল; অঙ্গুলি কুসুমটী ছিঁড়িল; এবং ছিঁড়িয়া নাসিকার নিকটে উপনীত করিল। চেতন ও জড় যদি পৃথক্‌ই হইবে, দেহ ও মন যদি সম্বন্ধ-শূন্যই হইবে, তবে কেমন করিয়া ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অতগুলি কার্য্য হইল? এ সম্বন্ধে Descartes কিরূপ উত্তর দেন, তাহাই দেখা যাউক্। ইনি শরীর মধ্যে Animal-spirits নামক একরূপ তরলপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পদার্থই বাহ্যানুভূতির সময়ে বহিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হয়, এবং তথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া স্নায়ুপথে দৈহিকক্রিয়াস্থানে উপস্থিত হইয়া শরীরের গতি উৎপাদিত করাইয়া দেয়। আত্মা সর্ব্বদা মানুষের মস্তিষ্কের একটী সূক্ষ্ম-বিন্দুতে অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনিই এই Animal-spiritsকে চালান। তিনিই ঐ বিন্দুতে বসিয়া ইচ্ছা করেন, চিন্তা করেন, এবং ঐ পদার্থের সাহায্যে হস্ত-পদাদির পরিচালনা করাইয়া থাকেন। এই আত্মার প্রভাবেই 'অনুভূতি' জন্মায়। এই অনুভূতি হইতেই ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, এই ইচ্ছাই দৈহিক পরিচালনা জন্মাইয়া দেয়। তাই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি ও বিচার করি। উদ্ভিজ্জ-রাজ্যে, এমনকি প্রাণীরাজ্যেও ইনি আত্মার অস্তিত্ব এবং অবস্থিতি স্বীকার করেন না। তাহাদের কার্য্যে চিন্তার প্রয়োজনীয়তা নাই। Descartesএর মতাবলম্বী পণ্ডিত Geulinx এ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ—দেহ ও মনে কোনও সম্বন্ধ নাই; কিন্তু দৈহিক গতি বা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ঈশ্বর তাহার একটী আভাষ আমাদের মনের মধ্যে উৎপাদিত করান, এবং মনে মনে যখনই কোন কিছুর ইচ্ছার উপস্থিত হয়, তখনও স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যের হস্তপদাদির পরিচালনা করাইয়া থাকেন। সুতরাং এমতে কার্য্যকারণবাদ এইরূপ দাঁড়াইতেছে,—(ক) মন নিজেরই উপরে ক্রিয়া করে,—চিন্তা ইচ্ছা প্রভৃতি করিয়া থাকে; কিন্তু মনোরাজ্যের বাহিরে ইহা কিছুই জানিতে বা করিতে পারে না। (খ) শরীর নিজের উপরেই কার্য্য করিতে পারে, নিজেরই কার্য্যের উপরে কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে। (গ) স্বয়ং ব্রহ্ম মানসিক ও দৈহিক কার্য্যাদির মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া উৎপাদন করান। ইহাকে occasionalism বলে।

আমরা এতদূরে উভয় দার্শনিকের মত দেখিয়া আসিলাম; পাঠক, উভয়ের মত-গত ঐক্য ও পার্থক্য বুঝিয়াছেন। যতদূর সম্ভব, আমরা অতি সহজভাবে ও সহজভাষায় উভয়েরই মত-বিশ্লেষ করিয়া দেখাইলাম। পাঠক দেখিবেন, কেমন উত্তমরূপে ও যুক্তি সহকারে প্রকৃতি, প্রাণী ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, আমরা প্রথমতঃ নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানই পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইতেছি; ভক্তি এবং উপাসনা-সম্বন্ধে আমাদিগের মত পরে বিবৃত করিব, ইচ্ছা রহিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়ে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান সমালোচিত হইয়াছে এবং এবিষয় দর্শন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমরা ক্রমশঃ তাহাই সংক্ষেপে দেখাইতে যত্নশীল ও চেষ্টিত হইয়াছি। প্রত্যেক দর্শ-

নের দোষ গুণ বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা করাও তত সহজসাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তবে এইমাত্র আমরা দেখিব যে, দার্শনিক মতগুলি বিবৃত করিতে করিতে যে যে স্থলগুলি বুঝিতে একটু কঠিন বা অসামঞ্জস বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থলেরই সংক্ষেপে দোষ গুণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিব মাত্র। পাঠকের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রধান প্রধান দার্শনিক-মতগুলি যাহাতে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ প্রচারিত হয়,—যাহাতে সকলেই স্থূল স্থূল দার্শনিক জ্ঞান জানিতে পারেন, তাহাই বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য, এইটী যেন পাঠক মনে রাখেন।

প্রথমতঃ, দেহ ও মনে যদি কোন সম্বন্ধই না থাকে, তবে পৃথিবী হইতে কার্য্য-কারণ ভাব উঠিয়া যায়। এবং ইহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, কেমন করিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বদাই দেহ ও মনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎকার্য্যে শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন ; কি করিয়া মনের প্রত্যেক ইচ্ছায় ও তদনুযায়ী শরীরের প্রত্যেক কার্য্যে সর্ব্বদা ঈশ্বর আসিয়া উপস্থিত হন ও হস্তক্ষেপ করেন। এই দার্শনিক পণ্ডিতেরা ব্রহ্ম এবং জড় ও চেতনকে পরস্পর নিরপেক্ষ, সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত ও সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাতেই, আমাদের বোধ হয়, এইরূপ গোলযোগ ও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এবং জড় বা চেতন একইরূপ পদার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম স্রষ্টা, জড় ও চেতন উভয়ই সৃষ্ট-পদার্থ। ব্রহ্ম কারণ, জড় ও চেতন তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। কার্য্য ও কারণ পরস্পর সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হইবে, ইহা হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণ এক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না ; আর হইলেও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিবেই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের প্রথমোক্ত দার্শনিকের মতে মানবাত্মা ও ব্রহ্মাত্মার চিন্তা, জ্ঞান ও Idea প্রভৃতি একই। ভগবান্ ভাবেন, তাই মানুষও ভাবে। এরূপ মতও আমরা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ব্রহ্ম ও আত্মার এমনতর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা বড়ই দুরূহ। মনেকর, একটী গণিত বিষয়ক সত্যে (যেমন ২+২=৪) আমি জ্ঞানলাভ করিলাম ; এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই যে জ্ঞান ইহা ব্রহ্মের না মানুষের ? বস্তু-জ্ঞানে দুইটী বিষয়ের আবশ্যক ;—একটী (Subject) (জ্ঞাতা), আর একটী (Object) (জ্ঞেয়)। যে জ্ঞান লাভ করে, যে দেখে শুনে, সেই জ্ঞাতা এবং যাহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, যাহাকে দেখা যায় শুনা যায়, সেই জ্ঞেয়। এখন দেখ, যদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা (Subject) হন, তবে তিনি, একটী দুইটী নহে এইরূপ সহস্র সহস্র সত্যের বা জ্ঞানেরও জ্ঞাতা হইবেন সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয়, তবে শতসহস্র জ্ঞানের কি করিয়া একটী (Subject) হইতে পারে ? জাগতিক সত্য অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে, এই জ্ঞান সকলেই জানিতে পারে। ইহা তুমিও জান, ব্রহ্মও জানেন এবং আরও দশজন জানে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি—আমি—আর দশজন—ও ব্রহ্ম সকলেই পৃথক্ ও ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক জ্ঞান সেই সেই জ্ঞাতার পৃথক পৃথক কার্য্য। একই সূর্য্য লক্ষলোকের দর্শন ক্রিয়া জন্মাইয়া দেয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দর্শনক্রিয়া একটী নহে। দর্শন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। অতএব ব্রহ্ম পদার্থ-ভাবেন এবং তাই আমরাও ভাবি, একথা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। আরো ভাবিয়া দেখ,

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে Ideas গুলিই "পদার্থ" এবং এই পদার্থ বা Idea গুলি ব্রহ্মে নিয়ত বর্ত্তমান। সুতরাং এই একই Idea ব্রহ্মাত্মা ও মানবাত্মার Object বা জ্ঞানের বিষয়। যদি তাহাই হয়,তবে ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় আমরা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ বা জ্ঞেয় (object) এক হইলেও, তাহার জ্ঞাতা (Subject) এক হইতে পারে না। তুমি ও আমি একই বিষয়ে চিন্তা করিতে পারি বটে, কিন্তু দুই জনের চিন্তার প্রণালী দুইরূপই হইবে। চিন্তনীয় বস্তুর একত্ব, চিন্তকের অনেকত্ব নষ্ট করিতে পারে না। অতএব,ব্রহ্ম এবং আত্মার জ্ঞেয় ideas এক হইলেও তিনি সেই জ্ঞেয় পদার্থ যেরূপে চিন্তা করিবেন,তাহার প্রণালী, এবং আমি তাহাকে যেরূপে চিন্তা করিব, তাহার প্রণালী, পৃথক হইবেই। প্রণালী এক হইতে পারে না। এইরূপে, মনের জ্ঞান-রাজ্যে যেমন, তেমনি মনের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া রাজ্যেও ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমরা এই দুই দার্শনিক মতের দোষ দেখাইলাম। তৃতীয় প্রবন্ধে, আমরা সুবিখ্যাত দার্শনিক (Spinoza)কে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রাজগৃহ বা রাজগিরি দর্শন। (২)

গিরি-ব্রজগিরিসঙ্কট—এমন রমণীয় স্থান আর দেখি নাই। দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত মালা, মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। সেই সৌম্য শান্ত অটল অচল মধ্যবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া স্বচ্ছসলিলা বাণগঙ্গা লজ্জা-নম্র বধূসম ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে,সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উভয় তট শ্বেত রক্ত হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত মসৃণ প্রস্তরাচ্ছাদিত। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, এইখানেই 'গজদ্বার' ছিল। এক সময়ে এই গিরি-সঙ্কট যে সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত ছিল,তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম। নিম্নদেশে স্থানে স্থানে প্রবেশ দ্বারের ভগ্নাংশ সুচারু সজ্জিত প্রস্তর রাশি এখনও বর্ত্তমান; উভয় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতোপরি ১৩ ফুট প্রস্থ পাষাণ-প্রাচীর বহুদূরাবধি অজগর সর্পের ন্যায় শায়িত রহিয়াছে। আমরা পশ্চিমদিকের পর্ব্বতে উঠিয়া এই প্রাচীরের উপর দিয়া বহুদূর গেলাম, কিন্তু কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলাম না। এই গিরিসঙ্কটের দক্ষিণেই বিস্তৃত উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্র, পূত-সলিলা বাণগঙ্গা,গিরিব্রজ গিরির দক্ষিণ পাদ বিধৌত করিয়া,সেই ক্ষেত্র রাশির মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, পঞ্চানন নদে মিশ্রিত হইয়াছে। পুরাকালে গিরিব্রজপুরের বহির্দ্দেশে,ঐ গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ দিকে,শস্য-শালিনী সমতল ভূমিতে যে সমৃদ্ধশালী গ্রামাদিতে পরিপূর্ণ ছিল,তাহারও চিহ্ন দেখিলাম। সে গ্রাম নাই, সে সৌধমালা নাই,আছে শুধু সেই প্রাসাদাবলির প্রস্তর খণ্ডের স্তূপরাশি! পাঠক, একবার এইখানে আসিয়া ভারতের লুপ্ত-গৌরবের কঙ্কাল রাশি দর্শন কর। এই গিরিসঙ্কট দেখিতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইল, জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল,সকলে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। আমাদের বাসা সেখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ, নিকটস্থ গ্রাম এক ক্রোশের অধিক দক্ষিণে লক্ষিত হইল, সকলেই চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে জনৈক ব্যাপারী বলদ পৃষ্ঠে ছালা লইয়া তথায় উপ-

স্থিত হইল, সে গিরিসঙ্কট পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা-গেল—বাপু হে, তুমি বলদ পৃষ্ঠে কি লইয়া যাইতেছ, আমাদের কিছু আহারীয় সামগ্রী দিতে পার? সে বলিল, আমি মহাজনের চিঁড়ে লইয়া যাইতেছি আমার নিকট আপনাদের আহার-যোগ্য কিছুই নাই। আমাদের অবস্থা জানাইলাম, অনুনয় বিনয় করিলাম, তাহাতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইল না। ক্রমে দেখিলাম, বলদগুলি অতি সাবধানে মসৃণ প্রস্তরের উপর দিয়া বাণগঙ্গা পার হইল, ব্যাপারীও চলিয়া যায়, তখন অনন্যোপায় দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু ভয়প্রদর্শনার্থ সেই ব্যাপারীকে বলিলেন, তুমি হাকিমদের কথা শুনিতেছ না, তোমার বিপদ সমূহ দেখিতেছি। তখন সে রাজি হইল এবং আমাদের নিকট যে ১৪টী গোলকপুরি পয়সা ছিল, তাহা লইয়া দুই অঞ্জলি উৎকৃষ্ট চিঁড়ে এবং কতকগুলি পানিফল দিল। আমরা তাহাকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই শিলাতটে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম, এবং কতক চিঁড়ে সকলে আপনাপন পকেটে পূরিয়া লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

আমরা যখন গিরিব্রজোপরি উঠিবার পথের নিকট আসিলাম, তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত, কিন্তু গিরিশিখরস্থ মন্দির দর্শনাভিলাষ বড়ই বলবতী, কাজেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম, পথ মন্দ নয়, তবে আমরা অনেক পথ চলিয়াছিলাম বলিয়া একটু একটু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমাদের যে বন্ধুটি পূর্ব্বদিন বিপুলাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি আজি সকলের ধিক্কারে লজ্জিত হইয়া আমাদের সঙ্গে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু তৃতীয়াংশ পথ উঠিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, আমরা কাজেই তাঁহাকে সেইখানে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিলাম। শৃঙ্গস্থ মন্দিরে আসিয়া আমরা সকল ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। এইখানে আসিয়াই গিরিব্রজপুরির যে পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। মন্দিরের গঠন বাঙ্গালা দেশের মন্দিরের ন্যায়, মন্দির প্রাঙ্গন চতুর্দ্দিক উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং প্রাচীরের বহির্দ্দেশে প্রশস্ত চত্তাল, প্রাঙ্গণের চতুঃপ্রাচীরে চারিটি অর্দ্ধ-মন্দির বক্রভাবে নির্ম্মিত এবং প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধদেবের যুগল পাদুকা কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত। প্রধান মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত শতফণী-উপরি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষীদিগের হস্তে সে সুন্দরমূর্ত্তি স্থানে২ বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে। মন্দির বহুদিনের যে পুরাতন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল না। পাঠক, যদি কখন রাজগৃহে যাও, তবে গিরিব্রজগিরির শিখরদেশে উঠিয়া পঞ্চগিরি ব্যুহস্থিত জরাসন্ধের লীলাভূমির ভগ্নাবশেষ দেখিও, সেই পর্ব্বতের কটিদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনির শতকম্পন শ্রবণ করিও, প্রাণ পুলকিত হইবে।

আমাদের মন্দির দেখিয়া নীচে নামিতে বেলা প্রায় ১টা হইল। ফিরিয়া আসিতে পথে গিরিব্রজপুরির মধ্য-উপত্যকা ভূমিতে, বৈভার, রত্নাচল, রত্নগিরি এবং বিপুল মধ্যস্থিত বিস্তৃত সমতল ভূমিখণ্ডের মধ্যভাগে চন্দ্রাকার দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বনবৃক্ষাচ্ছাদিত হইয়া আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। পাণ্ডা বলিলেন, ইহা এক অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, ইহা ‘সূর্য্যদ্বার’ হইতে ‘গজদ্বার’ অবধি যে পথ এবং গৈরিক গিরি-

শৃঙ্গ হইতে জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ অবধি যে পথ ছিল, তাহারই সন্ধিস্থলে স্থিত। যাহাতে কোন শত্রু রাজপ্রাসাদে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথাটা বড় অসম্ভব বোধ হইল না। কিন্তু আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,এই উপত্যকার স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান দেখিলাম, উহা যদি জরাসন্ধের সময়ের হয়, তবে ত সে আজি প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরের কথা,মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে,আর পাষাণময় সৌধমালার চিহ্ন বিলুপ্ত হইল? আর সেই পঞ্চগিরি-বেষ্টিত বিপুল সৈন্যে রক্ষিত উপত্যকা ভূমিতে দ্বিতীয় দুর্গ নির্ম্মাণের আবশ্যক কি ছিল? পাণ্ডা বলিলেন, সে সৌধমালা, সে প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদাদি বিজেতা ও বিধর্ম্মিদিগের হস্তে বিদ্ধস্ত হইয়া, প্রকৃতির সহিত এতকাল যুদ্ধ করিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে; আর আজি যে প্রাচীর মৃত্তিকাময় দেখিতেছেন, তাহা এক সময়ে প্রস্তরাচ্ছাদিত ছিল,এবং উহাদের প্রতি এত মনুষ্য অত্যাচার হয় নাই, তাই সেই সকল স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পার্ব্বতীয় হিংস্র বন্যজন্তু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, রাত্রিকালে বন্য জন্তুর এবং গুপ্তশত্রুকুলের পথ অবরোধ করিবার জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে লিখা আছে। আমাদের কেহ কেহ বলিলেন,বোধ হয় উহা বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। যখন মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে স্থাপিত হইল, যখন গিরিপথ সকল বিপুল সৈন্য দ্বারা রক্ষা করা অসম্ভব হইল, তখন বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ উপত্যকা ভূমিতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ তর্ক করিতে করিতে বেলা তিনটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, স্নান আহারাদি করিতে চারিটা বাজিল। সে দিন আর কোথাও যাওয়া হইল না, বাসায় বসিয়া কেহ তাস খেলিতে লাগিলেন, কেহ বা আমাদের পাণ্ডার সহিত শাস্ত্রালাপ লইয়া রহস্য আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় রাজগিরি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া আপনার বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ,কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছেন। "শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছে বিস্মৃতির জলে, স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা, তেজহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস"। এখানকার পাণ্ডারা বলেন,তাঁহারা কান্যকুব্জ, মহারাষ্ট্রীয়, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী এবং কর্ণাটী ব্রাহ্মণের বংশধর। কিন্তু আজি তাহারা অতি দরিদ্র, চরিত্র বড়ই দূষণীয় এবং নিন্দনীয়। আমাদের পাণ্ডা একটি কদর্য্য পীড়া ভোগ করিতেছেন দেখিতে পাইলাম।

বুধবারঃ—আজি প্রত্যূষে আমাদের মধ্যে তিন জন বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈভারাচল আরোহণ করিতে চলিলাম। সমতল ভূমি হইতে পাকা সিঁড়ি দিয়া কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়াই বৈভারের পূর্ব্বপাদে সাতটি কুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া গেল। যথা (১) সপ্তঋষি কুণ্ড বা সপ্তধারা কুণ্ড,(২) ব্রহ্মকুণ্ড,(৩) গঙ্গা-যমুনা কুণ্ড, (৪) ব্যাসকুণ্ড,(৫) মার্কণ্ডকুণ্ড, (৬) অনন্তঋষি কুণ্ড, (৭) কাশ্যপঋষি কুণ্ড।

সপ্তঋষিকুণ্ড বা সপ্তধারাঃ—এই কুণ্ডটি দীর্ঘে পঞ্চাশ ষাট হাত এবং প্রস্থে দশ বার হাত হইবে, চতুর্দ্দিক উচ্চ ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত। এই কুণ্ড মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি

পাথরের নল দিয়া অনবরত উষ্ণজল পড়িতেছে, পাঁচটি নল পশ্চিম দিকে এবং দুইটি দক্ষিণদিকে। পাণ্ডারা বলেন, এই সাতটি নল সাতটি পৃথক্ পৃথক্ প্রস্রবণের মুখ, কিন্তু আমরা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলাম যে প্রস্রবণ একটী এবং উহার জল পয়োনালা দিয়া বহিয়া গিয়া ৭টি ভিন্ন মুখ দিয়া কুণ্ড মধ্যে পড়িতেছে; পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের নলের নিকটই প্রস্রবণের মুখ, সেই জন্যই ঐ নল হইতে প্রবলতমবেগে অধিকতর জল নির্গত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পয়োনালায় কোনরূপ গোলযোগ হওয়াতে উত্তর-পশ্চিম কোণের নল হইতে জল পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কুণ্ডের জল মকদুমকুণ্ডের জল অপেক্ষা উষ্ণতর, কুণ্ড মধ্যে সদা সর্ব্বদা আন্দাজ আধহাত জল থাকে, অতিরিক্ত জল পয়োনালা দ্বারা বহির্গত হইয়া গিয়া সরস্বতীবক্ষে পড়িতেছে। জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল খণ্ড কুণ্ডের তলায় বিছান আছে। এই কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, যামদগ্ন্য, দুর্ব্বাসা, পরাশর এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। এই ঋষিদিগের নামে কুণ্ডের একটি একটি নলের নাম হইয়াছে, এবং সেইজন্যই ইহাকে সপ্তঋষিকুণ্ড বলে। আবার সপ্তধারায় জল পড়িতেছে বলিয়া সচরাচর লোকে সপ্তধারা কুণ্ড বলিয়া থাকে। এই কুণ্ডের জল মকদুমকুণ্ডের ন্যায় পর্ব্বতগাত্র হইতে নির্গত হইতেছে, জল অতি পরিষ্কার এবং ইহার ক্ষুধাকারী শক্তি অত্যন্ত অধিক। উষ্ণজল অল্পক্ষণ মাত্র মাটীর বাসনে রাখিলেই শীতল হইয়া যায় এবং খাইতে সুমিষ্ট।

ব্রহ্মকুণ্ডঃ—সপ্তধারার পার্শ্বেই ব্রহ্মকুণ্ড, ইহার জল অত্যন্ত উষ্ণ। যাত্রীদিগকে প্রথমে সপ্তধারায় স্নান করিয়া, অন্ততঃ কাপড় ভিজাইয়া, এই উষ্ণতর কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই কুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত, কুণ্ডটি সাত আট হস্ত প্রস্থে এবং ঐরূপ দীর্ঘে হইবে, চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই কুণ্ডে মুখধুইবার বা কুলকুচা করিয়া ফেলিবার অধিকার নাই। কুণ্ডমধ্যে জল বুদ্‌বুদ্ অনবরত দেখিতে পাওয়া যায়। সদা সর্ব্বদা কুণ্ড মধ্যে এক গলা জল থাকে, অতিরিক্ত জল ক্ষুদ্র পয়োনালা দিয়া বহিয়া গিয়া সরস্বতী নদীতে পড়িতেছে, কুণ্ডে নামিবার সিঁড়িও আছে।

(৩) গঙ্গা-যমুনা কুণ্ডঃ—দুইটি পাশাপাশি নল দিয়া জল কুণ্ডেতে পড়িতেছে, একটিনল গোমুখী এবং অন্যটি মকরমুখী। পাণ্ডা বলিলেন, একটি ধারার জল শীতল এবং অন্যটির জল উষ্ণ বলিয়া গঙ্গা-যমুনা নাম হইয়াছে, আমরা নীচে নামিয়া ইহার পরীক্ষা করিলাম না, এই কুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত পঙ্কিল বলিয়া বোধ হইল। ব্যাসকুণ্ড প্রভৃতি অন্য চারিটী কুণ্ডের জল ভূগর্ভোত্থিত; কুণ্ডগুলি ছোট ছোট, ইহাদের জল বড় ব্যবহৃত হয় না, কেহ কেহ দেখিলাম শৌচক্রিয়ার্থ ঐ জল ব্যবহার করিতেছেন।

উপরে যে সকল কুণ্ডের কথা বলিলাম, তাহা পর্ব্বত সানুদেশ হইতে দশ পনর হাত নিম্নে, কুণ্ডে স্নান করিতে হইলে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইতে হয়। উপরস্থ সমতল ভূমিতে দুইটি শিবমন্দির দেখিলাম, একটি সপ্তধারা কুণ্ডের উত্তরদিকে এবং অন্যটি পূর্ব্বদক্ষিণকোণে, পূর্ব্বদিকে একটি অসম্পূর্ণ মন্দির, ইহা গয়ার জনৈক হিন্দু তৈয়ার করাইতে ছিলেন, তাঁহার সহসা মৃত্যু হওয়াতে

বিগ্রহ স্থাপিত হয় নাই। ব্যাসকুণ্ডের নিকট আমরা কামাখ্যা গুহা নামক একটি ক্ষুদ্র গুহা, এবং দণ্ডশ্রেয় মুনির সমাধি দেখিলাম। হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অত্যাচারের নিদর্শন সুদূর মগধের এই গিরি-প্রস্রবণের নিকটে বৈভরাঙ্কে আজিও অঙ্কিত দেখিলাম। পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত মুসলমানদিগের নিমাজ পড়িবার স্থান। শুনিলাম মুসলমানেরা বৎসরান্তে বকরিদের সময় আসিয়া ঐখানে নিমাজ পড়িয়া থাকেন, অন্য সময়ে উহা বন্ধ থাকে।

বৈভারের পূর্ব্বপাদে এই উষ্ণ-প্রস্রবণগুলি হিন্দু এবং জৈনের পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি তিন বৎসরে হিন্দি মলমাসে এখানে বৃহতী হিন্দুমেলা হইয়া থাকে, বহুসংখ্যক হিন্দু নরনারী স্নানার্থ সমবেত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ড মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মিত হয়। জৈনেরা মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি এই সকল কুণ্ডে এবং সরস্বতী ও বাণগঙ্গা নদীতে স্নান, পঞ্চপর্ব্বতস্থিত মন্দির সকল দর্শন এবং বুদ্ধ 'পাতুকার' পূজা করিয়া থাকে। রাজগৃহ জৈনদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ যুবা সকল শ্রেণীরই লোক দেখিলাম রাজগৃহে আসিয়া থাকেন। যাঁহারা সবলকায় কিম্বা যাঁহদের সঙ্গতি অল্প, তাঁহারা পদব্রজেই রাজগৃহ-দর্শন এবং পর্ব্বতারোহণ করিয়া থাকেন, কেহ নগ্ন পদে কেহবা কাপড়ের জুতা পায় দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা অক্ষম বা সঙ্গতি-সম্পন্ন, তাঁহারা ছোট ছোট ডুলিতে করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া থাকেন। প্রত্যেক ডুলিতে দুইজন, কখনও চারিজন বেহারা, উহাদিগকে মায় ডুলি ভাড়া ২৷৷/১০ দিলে তোমাকে পাঁচটি পাহাড়ের উপরে যতগুলি জৈনমন্দির আছে, সকলগুলি দেখাইয়া দিবে। ইহারা জাতিতে 'কাহার'—কৃষ্ণকায়, পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকে বলিয়া যে বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট তাহা নয়, তবে বড়ই কষ্টসহিষ্ণু এবং পর্ব্বতারোহণে বড় দক্ষ। ইহারা পিঠে করিয়া বালক বালিকা কিম্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাও দেখিলাম। হিন্দুরা পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ মন্দির দেখিতে যান না। স্রোতস্বতী সরস্বতী হিন্দু ও জৈন উভয়ের নিকট সমান সমাদৃতা। পাণ্ডা বলিলেন, "কর্ম্মভ্রষ্টা যে লোকা, পতিত-বেদ বিবর্জ্জিতা, শ্রুতি স্মৃতি বহির্ভূতা অস্তেষাং শুদ্ধে সরস্বতী" কিন্তু আমাদের ন্যায় নবোশিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় ঐ সূত্রের অন্তর্গত হইতে পারেন না জানিয়া আমরা সরস্বতী নদীতে স্নান করি নাই। ইহাতে আমাদের পাণ্ডা বিশেষ কিছু যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এমনও বোধ হইল না।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড সকলের উপরে বিহারের জনৈক প্রসিদ্ধ জমিদারের অতিথিশালা, কিন্তু এখানে থাকিবার একটি অসুবিধা এই যে কোন ঘরের দরজা নাই। এখান হইতে ৬০ কিম্বা ৭০ ফিট উপরে উঠিয়াই একটি বৃহৎ পুরাতন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। ইহার চারিটি গবাক্ষ। ইহা এক সময়ে প্রবেশ দ্বার এবং পর্ব্বতস্থ প্রাচীর রক্ষার্থ প্রহরীদিগের থাকিবার স্থান ছিল বলিয়া বোধ হইল। এই প্রকোষ্ঠের উপরিভাগ প্রস্তরাচ্ছাদিত, ছাদের উপরে একটি মুসলমানি কবর দেখিলাম। ঐ প্রকোষ্ঠের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে সোমেশ্বরনাথ মহাদেবের হিন্দুমন্দিরে যাইবার পথ। মন্দির এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায়।

বৈভার পর্ব্বতোপরি আমরা পাঁচটি জৈন

মন্দির দেখিলাম। প্রথমটি প্রায় চারিশত ফিট উচ্চে হইবে, মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত; মন্দির মধ্যে 'বুদ্ধ পাদুকা' অর্থাৎ এক প্রস্তর খণ্ডে ক্ষুদ্র চরণদ্বয় খোদিত। একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত দুইটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া কাছাকাছি আরও তিনটি জৈন মন্দির দেখিলাম, উহার মধ্যে প্রথম মন্দিরটিতে একটি প্রস্তর খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত। প্রবেশ দ্বারেও ঐরূপ মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। মন্দিরে উঠিবার সিঁড়িগুলি কোন ভগ্নগৃহ বা মন্দিরের ক্ষুদ্র পাথরের থাম দিয়া তৈয়ারি। দ্বিতীয় মন্দিরটি চতুষ্কোণ, মন্দির বেষ্টনের জন্য চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত পথ, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের ভিতর দিকে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। একদিকে 'নেমজিকা পাদুকা' নামক বুদ্ধ পদচিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত। মুরসিদাবাদের জৈনেরা সম্প্রতি ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। তৃতীয়টি কতকটা পিরামিডাকৃতি। ইহাকে প্রাণ বিবির মন্দির বলে। মন্দিরের দেয়াল প্রায় পাঁচফিট প্রস্থ, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে পাথরের থামওয়ালা বারাণ্ডা। এখান হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চে আসিয়া বৈভারের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গস্থ জৈন মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে আবার সেই বুদ্ধ পদচিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত, দেখিলাম একজন জৈন-যাত্রী চাল এবং একটি বাদাম দিয়া সেই চরণদ্বয়ের পূজা করিলেন। এই মন্দিরের নিকটে আসিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। মন্দিরের ১৫।২০ হাত দক্ষিণেই পাহাড় একেবারে নামিয়া গিয়াছে। এইখান হইতে ঠিক নিম্নদেশে রাজগৃহ উপত্যকার পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম,জরাসন্ধের সেই মল্লভূমি, সেই উপত্যকা মধ্যস্থিত তড়াগ,সেই নির্ম্মল কূপ,সেই মৃত্তিকা প্রাচীর বেষ্টিত উপত্যকা খণ্ড সবই সুন্দর দেখা যাইতেছে। উপত্যকার মধ্যভাগে মেখলার ন্যায় শোভমানা ক্ষীণা সরস্বতী যুগযুগান্তের অতীত কথা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবহমানা। অগণন গো মহিষাদি পিপিলিকা শ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের গলদেশস্থিত ঘণ্টার মধুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে। কোথাও বা রাখাল বালকেরা খেলা করিতেছে, কোথাও বা কাঠুরিয়ারা গান গাহিতে গাহিতে দলে দলে কাঠ কাটিতে যাইতেছে। এই স্থানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম। উপরোক্ত পিরামিডাকৃতি মন্দিরের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া, উত্তর দিকে নামিয়া গিয়া, বৈভারের উত্তরাঙ্কস্থিত দুইটি গুহা দেখিতে চলিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ, এক স্থানে একদিকে বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন, অন্য দিকে পাহাড় সিধে নামিয়া গিয়াছে, একটু পদস্খলিত হইলেই সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইতে হইবে। যাত্রীরা এখানে আসেন না, সাহেবেরা কখনও কখনও এই গুহা দেখিতে আসিয়া থাকেন। আমাদের পাণ্ডা এ গুহা দ্বয়ের পথ জানিতেন না। আমরা আর এক দল পাণ্ডার (যাঁহারা সর্ চার্লসকে এই গুহা দেখাইয়াছিলেন) সাহায্যে সেই দুর্গম পথ দিয়া বৈভারের কটিদেশে উত্তরদিকে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ সুন্দর গুহায় উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিকের গুহাটির ভিতরে খানিকটা গিয়া দেখিলাম, বক্রভাবে বামদিকে বহুদূরাবধি গুহা চলিয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা বলিলেন,উপরে (পিরামিডের ন্যায়) মন্দিরের নিম্নদেশে যে গহ্বর দেখিয়াছেন, তাহাই এই গুহার অন্যমুখ। কিন্তু গুহা অন্ধকার,অপরিষ্কার পূতিগন্ধময় বলিয়া বেশী ভিতরে যাইতে

সাহস হইল না। পার্শ্বস্থ গুহাটিও খুব বড়, কিন্তু উহা তত দীর্ঘ নয়। অনেকগুলি শজারুর কাঁটা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া কুড়াইতে লাগিলাম, এমন সময়ে এক স্থানে দেখিলাম,টাটকা রক্ত চিহ্ন—বৃহৎ বৃহৎ হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের রাজগিরে পঁহুছিবার পূর্ব্বদিনে গুলি দ্বারা আহত একটি ব্যাঘ্র ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়াছিলাম, তাই আমাদের মধ্যে দু একজন অত্যন্ত ভীত হইলেন, কাজেই আমরা তৎক্ষণাৎ সেই থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বৈভারাচলে নীলবর্ণের একপ্রকার সুন্দর বনফুল দেখিলাম, সৌরভে মন মোহিত হইল। আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,কৈ সাধু সন্ন্যাসী কৈ ? তিনি বলিলেন, যদি ধ্যানস্থ সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে চান, তবে তপোবনে যান। তপোবন রাজগৃহের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। সেখানে আজিও সন্ন্যাসীগণ তপস্যানিরত আছেন দেখিতে পাইবেন ও এইরূপ পাঁচটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান। আমাদের সময়াভাবে তপোবন দেখা হইল না। আমরা বৈভারের উত্তর গাত্রে প্রস্তর প্রাচীরের ভগ্নস্তম্ভের সারি উচ্চতম শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিলাম, মনুষ্য-হস্ত-পরিষ্কৃত অধিত্যকা ভূমিতে বহুসংখ্যক গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিলাম।

আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় এগারটা হইল। বাসায় আসিয়া দেখি,আমাদের তিনজন বন্ধু আহারাদি করিয়া বিহারে চলিয়া গিয়াছেন,আমাদের জিনিষপত্র একজন পুলিশ সবইনস্পেক্টর বাঙ্গলার বাহির করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিয়াছেন, আমাদের চাকরব্রাহ্মণদের তাড়াহুড়া দিতেছেন যে,শীঘ্র রান্না ঘর খালি করিয়া দাও। শুনিলাম, বেহারের সবডিভিজনাল ডিপুটীবাবু টুরে আসিতেছেন, সঙ্গে আত্মীয় স্বজনও রাজগির দেখিতে আসিতেছেন। একটা বৃহৎ তাঁবু পড়িয়াছে, কেহ মাছ আনিতেছে, কেহ দুগ্ধ দধি আনিতেছে, কেহ বেগার ধরা পড়িয়া জল আনিতেছে, স্তূপাকার কাষ্ঠও সঞ্চিত হইয়াছে,মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহারাদি করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি, আমরা বেহারে আসিয়া শুনিলাম,ডিপুটিবাবুর ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। তিনি যাহাতে আমাদের কষ্ট না হয়, সেই জন্য নিজের থাকিবার নিমিত্ত তাঁবু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা পাণ্ডাকে একটাকা বিদায় দিয়া, রাজগৃহ গ্রামের মধ্য হইয়া পূর্ব্বদিকে বিপুলাচলের পার্শ্বদেশ দিয়া 'গিরিয়াক্' গিরি দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। রাজগৃহ গ্রামের দুই তিন মাইল পূর্ব্বে বিপুলাচলের একাংশের নাম সোণা পাহাড়,সোণা পাহাড়ের তলদেশে কল্যাণপুর গ্রাম। ভূতপূর্ব্ব কল্যাণপুর গোল্ড মাইনিং কোম্পানির বাঙ্গলা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। রাজগৃহ গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে আসিয়া কিছুদূর দক্ষিণদিকে গিয়াই গিরিয়াক্ গিরির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রত্নকূট এবং বিপুলাচল সম্মিলিত হইয়া যে শৃঙ্গমালা উঠিয়াছে, তাহারই নাম গিরিয়াক গিরি। এই পর্ব্বতের অধিকাংশ প্রস্তর গৈরিক বর্ণের,বোধ হয় সেই জন্য ইহাকে গৈরিক গিরি বলিত এবং গিরিয়াক্ গৈরিক্ গিরির অপভ্রংশ মাত্র। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গোপরি ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বৃহৎ স্তম্ভ,উহার পরিধি ৬৮ ফিট এবং উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফিট।

ইহা জরাসন্ধের বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রস্থ প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোরম, পশ্চাতে গৈরিক গিরির অভ্রভেদী শিখরমালা, সম্মুখে বিপুল বৈভার প্রভৃতি পঞ্চগিরির নির্ঝরিণী বারি বক্ষে ধারণ করিয়া পঞ্চানন নদ গিরিয়াক্‌ গিরির পূর্ব্বপাদদেশ বিধৌত করিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া চলিয়াছে। ভীম অর্জ্জুন এবং পার্থ সখা শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চানন নদ পার হইয়া, গৈরিকগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, গুপ্তবেশে জরাসন্ধের রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী এই পঞ্চানন নদে স্নান করিয়া, আপনাদের জীবন পবিত্র করিয়া থাকেন। পঞ্চানন নদ এখন পঞ্চানেহ্‌ বা পঞ্চানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অপর পারে গিরিয়াক্‌ গ্রাম। গিরিয়াক্‌ গ্রামের সম্মুখস্থ পর্ব্বতাংশের নিকটে আসিয়া গৈরিক গিরি শৃঙ্গস্থ স্তম্ভ দেখিতে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলাম। এখানে মেলার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যাত্রীরা বড় আসেন না বলিয়া পাণ্ডারা এখানে থাকেন না, রাজগিরির পাণ্ডারাই যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডা না থাকাতে আমরা উপরে উঠিবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম না, আন্দাজি একটা পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, তৃতীয়াংশ পথ উঠিতেই তিনটা বাজিয়া গেল, অবেলায় আর উপরে উঠা যুক্তিসঙ্গত নয় বুঝিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু স্থানে স্থানে দেখিলাম, পুরাকালে যে সকল উঠিবার পথ ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভশালী শিখরের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে সমতল ভূমি হইতে ৬০ কিম্বা ৭০ ফিট উচ্চে একটি বৃহৎ গুহা দেখিলাম। গুহার বহির্দ্দেশে মধুচক্রাকৃতি প্রায় ২০ ফিট দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শৈলগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। নীচে কোন রূপ সাহায্য নাই, মনে হয় উহার তলায় গেলে মাথায় পড়িবে। কিন্তু কতকাল হইতে যে উহা ঐরূপ শূন্যে রহিয়াছে, কে বলিতে পারে? গুহাটি বিলক্ষণ প্রশস্ত, মধ্যভাগের উচ্চতা ১২ ফিটের কম নয়। ইহার দুইটি প্রবেশপথ দেখিলাম, একটী পূর্ব্বদিকে, অন্যটি পূর্ব্ব উত্তর কোণে। কিন্তু শেষোক্তটি অতি ছোট। এই গুহা দেখিতে যাইবার পথ একটু কষ্টকর, আমরা জুতা খুলিয়া ধরাধরি করিয়া কোন ক্রমে উপরে উঠিয়াছিলাম। যাত্রীরা এই গুহাতে আসিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন, বোধ হইল। গুহার প্রবেশ পথে সিন্দূরের ফোঁটা এবং গুহার ভিতরে ছোট ছোট গোল গোল আলতা মধ্যভাগের পাথরে আঁটা রহিয়াছে দেখিলাম। অতঃপর অপরাহ্ন হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা পঞ্চানন নদ পার হইয়া গিরিয়াক্‌ গ্রামাভিমুখে চলিলাম। পঞ্চানন নদেতে জল এক হাঁটুর কিছু বেশী। কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে হইলে আমাদের ধুতি পরা দেশিবেশই সুবিধাজনক দেখিয়া আজ প্রায় সকলেই ধুতি পরিয়া, এক জন কেবল মাত্র পেণ্টুলান পরা, কাজেই তাঁহার নদ পার হইতে অসুবিধা হইল। এক্কাগুলিও অনায়াসে পার হইয়া গেল। আমাদের গিরিয়াক্‌ গ্রামের নিকট একজন মুসলমানের সহিত দেখা হইল। সে বলিল, আমরা যে দিক দিয়া গৈরিক গিরিশৃঙ্গোপরি উঠিতেছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই উপরে উঠিবার আসল পথ। পথটি গিরিয়াক্‌ গিরির উচ্চতম শৃঙ্গস্থ স্তম্ভ অবধি গিয়াছে, দেখিলাম। মধ্য পথে ঋষি আসন মাইর মন্দির। গিরিয়াক্‌ গ্রামের

এক ক্রোশ দক্ষিণে গিরিব্রজগিরি এবং গৈরিক-গিরি মধ্যস্থিত গিরিসঙ্কটে রাজগৃহে প্রবেশের যে পূর্ব্বদ্বার ছিল, শুনিলাম তাহার ভগ্নচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদিও ডাকবাঙ্গলা ও ইন্‌সপেক্‌সন্ বাঙ্গলা নিকটেই ছিল, তত্রাচ সময়াভাবে আমরা সেখানে না থাকিয়া গিরিয়াক্ গ্রামের মধ্য দিয়া বেহারাভিমুখে ফিরিলাম। বেহারে আসিবার পথ পাকা ও প্রশস্ত, এবং দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজি। গিরিয়াক্ গ্রাম পাটনা জিলার সীমান্তে অবস্থিত, বেহার ঐখান হইতে ১১ মাইল। আমরা পথে আসিতে আসিতে জৈনদিগের প্রধান তীর্থ স্থান পাওপুরী দেখিতে পাইলাম। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর মন্দিরাদি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেলা পাঁচটার সময় বেহারে পঁহুছিলাম। সেই বেলিসরায়ে আবার রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে মেল-কার্ট করিয়া বখতিয়ারপুরে আসিয়া, এবং সেখানে এক আত্মীয়ের বাটীতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

বাল্যকালে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম যে, "যে প্রদেশে আগ্নেয়গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোনকালে ছিল, কিম্বা যেখানে অগ্নিঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাতের ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশেই অনেক উষ্ণপ্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।" কিন্তু আমরা রাজগৃহে আগ্নেয়গিরি কিম্বা অগ্নিঘটিত অন্য কোন নৈসর্গিক উৎপাতের নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না।

পাঠক! রাজগৃহে ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা সেই শৈল উপত্যকার, সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সেই শৈলমালার অধিত্যকা ও উপত্যকা ভূমিতে যে সকল প্রাসাদ এবং দুর্গাদির ভগ্নচিহ্ন দেখিলাম, পর্ব্বতোপরি সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর ও প্রাচীর-স্তম্ভের যে ভগ্নাবশেষ দেখিলাম, সুরক্ষিত প্রবেশদ্বারের যে নিদর্শন দেখিলাম, তাহাতে প্রতীতি জন্মিল যে, রাজগৃহ এক সময়ে প্রবলপরাক্রান্ত বহু অনীকিনীশালী নৃপতির রাজধানী ছিল। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার, সে নৃপতি কে, এবং তাঁহার আবির্ভাবকালই বা কবে? যদি মহাভারতের আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া মান, তবে সেই নৃপতির নাম জরাসন্ধ, এবং তিনি যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। সে আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের কথা। মহাভারতে দেখিতে পাই, যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাগত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যিনি সকলের প্রভু ও অখণ্ডভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি, তিনিই কেবল রাজসূয় যজ্ঞে অধিকারী হইতে পারেন। যতদিন জরাসন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রাজসূয় যজ্ঞ করা কঠিন। জরাসন্ধ যাবতীয় নরপতিকে পরাজয় করিয়া একাধিপত্য করিতেছে। অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি ভগদত্ত তাহার প্রিয়ানুষ্ঠানে ব্যাপৃত, পুরুজিৎ তাহার অনুগত, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশাধিপতি পৌণ্ড্রক তাহার শরণাপন্ন, পৃথিবীর চতুর্থাংশের অধিপতি ভীষ্মকও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া তাহার অনুগত। দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ও পূর্ব্বকোশল নিবাসী রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য নৃপতিমণ্ডলী স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কুন্তিদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া রৈবতক শৈলে পরিশোভিত কুশস্থলী নাম্নী পুরীতে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। শিশুপাল-

সেনাপতি, অমরতেজা অস্ত্রের অবধ্য হংস ও ডিম্বক ভ্রাতৃদ্বয় জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক। সেই দুই ভ্রাতা ও জরাসন্ধ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে কেহ তাহাদের সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম নয়। তিন অক্ষৌহিণী সেনা তাহার বশবর্ত্তী। সমস্ত দেব দানব একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও সম্মুখসমরে জরাসন্ধকে পরাজয় করা অসম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গোপন ভাবে জরাসন্ধগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া ষড়-অশীতি নৃপতিদিগকে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্যে নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া ভীম অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই কার্য্যের ভার অর্পিত করিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতৃদ্বয় মিলিত হইলেন,—জ্ঞানবল, বাহুবল, এবং নীতিবলের সংযোগ হইল। অনন্তর কুরুদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ কুরুজাঙ্গাল, পদ্মসরোবর, কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ ও সদানীরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সরযুসরিৎ পার হইয়া পূর্ব্বকোশল দেশ অতিক্রম করিয়া, মালা, পরে চর্ম্মণ্বতী নদী পারে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণনদ পার হইয়া বীরত্রয় কিয়দ্দূর পূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক মগধরাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিলসমাকীর্ণ, গোধনপূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষরাজিবিরাজিত গোরথনামক পর্ব্বতের অধিত্যকা দেশস্থ মগধরাজার নগরী সন্দর্শন করিলেন। তদনন্তর চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিয়া রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীম জরাসন্ধের সহিত ত্রয়োদশ দিবস বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। "জরাসন্ধবধ অদ্ভুত কৌশল,—কারা মুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ-নিবারণ বিনাযুদ্ধে কৌশলে হইল সাধিত।" পাঠক! তুমি ইহা কবি-কল্পনা বলিতে পার। তুমি বলিতে পার, মহাভারতের রচনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহুকাল পরে হয় নাই কে বলিল, জরাসন্ধ যে আধুনিক কোন নৃপতি নন, তাহারই বা প্রমাণ কি? মহাভারতের গিরিব্রজপুরীর পূর্ব্বোক্ত ভৌগলিক বিবরণের সহিত আধুনিক রাজগৃহ উপত্যকার কি সমতা হইতেছে না, মহাভারতের গিরিব্রজপুরী কল্পিত স্থান নহে, আধুনিক রাজগৃহই যে সেই পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত গিরিব্রজপুর, তাহা কি আর বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে হইবে? তবে জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের বহু পরবর্ত্তী কোন 'ঐতিহাসিক পুরুষ' কি না? হণ্টার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ঐতিহাসদিগের মতে সে অনুমান ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়, তাহা হইলে দেখাইতে পার, তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন 'ঐতিহাসিক পুরুষ' কোন মগধদেশাধিপতি অখণ্ডসাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ঐ পঞ্চগিরিব্যূহ মাঝে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন? যদি বল জরাসন্ধ কল্পিত পুরুষ, যে ভগ্নরাশি দেখিলে তাহা বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরাদির অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বৌদ্ধনৃপতিগণ যে সময়ে মগধদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত, তখন তাঁহাদের রাজধানী ঐ পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমিতে নয়, বিম্বিসারের রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০৭ হইতে ৪৮৫ অব্দ মধ্যে, যে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহা বৈভারের উত্তরদেশে সমতল ভূমিতে, হাউনস্যাং মগধ পরিদর্শনকালে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে যাহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহা আজও বর্ত্তমান; চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে। আর মহাভারতে বলে জরাসন্ধ বিনাযুদ্ধে কৌশলে বিনষ্ট হন, তোমার ইতিহাসও বলেনা যে এই পঞ্চগিরিস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরমালা, রাজপ্রাসাদাবলী কোন

ঘোরযুদ্ধকালে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাই পুরাবৃত্ততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি, সেই সুদৃঢ় প্রাচীরমালা, প্রবেশ দ্বারাদি কত কালে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অযত্নে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে? আমরা এই ভারতেই বুদ্ধগয়া এবং বারাণসীর নিকটে সারনাথে দেখিয়াছি, দুই সহস্রবর্ষাধিক ইষ্টকনির্ম্মিত বৌদ্ধমন্দির শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত হইয়াও দণ্ডায়মান আছে, ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, কতকাল রাজগৃহের সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর এবং দ্বারদেশগুলি এই ভগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বলি, মহাভারতের জরাসন্ধ কল্পিত পুরুষ নহে। পঞ্চগিরিমধ্যস্থিত গিরিব্রজপুর কল্পিত স্থান নহে। তবে নিয়তির গতি অপ্রতিহত। সেই পঞ্চগিরি এখনও উন্নত, সেই সরস্বতী এখনও ধাবিত, সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মগধভূমি এখনও বিস্তৃত, নাই শুধু সেই পূর্ব্বগৌরব। জরাসন্ধের যে সুন্দরীপুরী একদিন নাট্যশালাসম উজ্জ্বলিত ছিল, আজি তাহা নিয়তির বলে মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, বন্য হিংস্র জন্তুর চর-ভূমি হইয়াছে। আজি রাজগৃহের বীর্য্যসাক্ষী উষ্ণপ্রস্রবণ ভারতের শোক-প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে, আজি মগধের বিপুল ও বৈভার নেত্রদ্বয়ে তপ্তশোক-অশ্রুধারা অনর্গল বহিতেছে।

পাঠক! যদি মহাভারতে অবিশ্বাস হয়, যদি ঐ ভগ্নরাশি বৌদ্ধকালে নির্ম্মিত প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ বল, তবে সেও তো অল্প দিনের কথা নয়। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরাদির ভগ্নাংশ দেখিতে কি বাসনা হয় না? উত্তরভারতে বহু হিন্দুতীর্থ স্থান দেখিয়াছি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যা নগরী দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়াছি, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশী, হরিদ্বার দেখিয়াছি, কিন্তু রাজগৃহে আসিয়া যে সুখলাভ করিলাম, তাহা কুত্রাপি হয় নাই। সেই ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, যে সময়ে ঐ দুর্গ প্রাচীরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন মগধদেশ আর্য্যসভ্যতার আলোকে আলোকিত, তখন ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও স্থপতি বিদ্যার উন্নতিকাল। মনে হইল, প্রবাদ যে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাণান্তর ব্রহ্মার আদেশানুসারে জরাসন্ধের পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহা বড় মিথ্যা নয়। পাঠক! যদি পার্ব্বত্যসৌন্দর্য্য দেখিবার বাসনা থাকে, যদি মহাভারতের গাথা কবিকল্পনা নহে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহ, যদি উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিয়া তাপিত হৃদয় শান্ত করিতে চাহ, তবে একবার রাজগৃহে আসিও। যদি বনফুলের আঘ্রাণে, বনবিহগের মধুর কূজনে, পর্ব্বত কন্দরের প্রতিধ্বনি-কম্পনে প্রাণ পুলকিত করিতে চাহ, যদি অধিত্যকা উপত্যকাভূমি গিরিগুহা একস্থানে দেখিতে চাহ, তাহা হইলে একবার এই ঐতিহাসিক পুরীতে আসিও। একবার রাজগৃহে আসিয়া ভারতের লুপ্তগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন শৈলমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত দেখিও। যদি তুমি ভক্ত হিন্দু হও, তাহা হইলে রাজগৃহ পবিত্রতীর্থস্থান; যদি অসুস্থ হও, তবে তোমার দার্জ্জিলিঙ্গ মধুপুর, বৈদ্যনাথ যাইবার আবশ্যক নাই, শীতকালে রাজগৃহে আসিয়া সপ্তধারায় স্নান কর, তাহার জল পান কর, সকল তাপ দূর হইবে; আর যদি তুমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ হও, তবে এই শৈলমালায়, ঐ উপত্যকাভূমিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ব কথা জানিতে পারিবে। আর যদি ঘোর বিষয়ী হও, তাহা হইলে বলিব যে রাজগৃহ ডেয়ারি ফারমিংয়ের প্রশস্ত স্থান, ওয়াটার মিল স্থাপনের উপযুক্ত ভূমি।

শ্রীরামলাল সিংহ।

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ম্মযোগ।]

কিন্তু যে মানব হয় আত্মাতে নিরত
আত্মাতেই রহে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট আত্মাতে,
কার্য্য তার কিছু আর না থাকে তখন। ১৭
কর্ম্মে কিম্বা কর্ম্মত্যাগে—নাহি হেথা তার
থাকে কোন অর্থ আর ; সর্ব্বভূতমাঝে,
কিছুতে আশ্রয় তার নাহি প্রয়োজন। ১৮

১৭। আত্মাতেই রহে তৃপ্ত—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ও বিষয়াসক্তিহীন হইয়া কেবল আত্মাতেই নিরত থাকে (শঙ্কর)।

কার্য্য তার—সে কর্ম্মাধিকারী নহে বলিয়া তাহার বৈদিক বা লৌকিক কোনরূপই কার্য্য নাই (মধু)। তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই (স্বামী), করণীয় কিছুই নাই (শঙ্কর)। শ্রুতিতে আছে "আত্মক্রীড়া আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ।" রামানুজ বলেন "যিনি জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ সাধন নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত। তিনি আত্মদর্শনহেতু মুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি জন্য তাঁহার মহাযজ্ঞাদি বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।"

পূর্ব্বের কয় শ্লোকের সহিত ও পরবর্ত্তী ১৮ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক ও ১৭ অধ্যায়ের ২৪।২৫ শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, আত্মজ্ঞানীদের বা ব্রহ্মবাদীদের 'নিজের' জন্য কোন কার্য্য করিতে হয় না। কেন না তাহাদের কিছুতে আসক্তি নাই, স্বর্গাদিভোগের বাসনা নাই, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রতি নাই, তাঁহারা ইষ্টকাম চাহেন না। কিন্তু অন্যের জন্য—লোকের জন্য তাঁহাদের কার্য্য করিতে হয়। সেরূপ কার্য্য তাহাদেরও কর্ত্তব্য। পরের শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেও এই অর্থ অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

১৮। কর্ম্মে কিম্বা কর্ম্মত্যাগে—আত্মদর্শন লাভ করিলে পরে আত্মদর্শন সাধনভূত কোন কর্ম্ম করিলে লাভ নাই—কোনরূপ কর্ম্ম করিলেও ক্ষতি নাই (রামানুজ)। কর্ম্ম করিলে তাঁহার পুণ্য নাই, কর্ম্ম না করিলেও পাপ নাই (স্বামী, শঙ্কর)। অভ্যুদয়ের জন্য, মোক্ষের জন্য, বা পাপ দূর করিবার জন্য তাহাদের কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই (মধু)।

কিছুতে আশ্রয়—নিজ কর্ম্মের জন্য প্রকৃতির পরিণাম আকাশাদি কোন ভূতের অবলম্বন তাহার প্রয়োজন হয় না (রামানুজ)। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূত বিশেষের আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া তাহাকে সাধন করিতে হয় না (শঙ্কর)। তখন দেবকৃত বিঘ্ন সম্ভাবনা না থাকায় তাহা নিবারণ জন্য, কোন কর্ম্ম দ্বারা দেবতার সেবা করিতে হয় না, মোক্ষে কোনরূপ বিঘ্ন না থাকায়, সে অবস্থায় আশ্রয়নীয় কিছুই থাকে না (মধুসূদন)। শ্রুতিতে আছে "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি।" অর্থাৎ দেবতারাও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের ব্রহ্ম ভাবনায় প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না (স্বামী)। দেবমানব কাহাকেও বিঘ্নোৎপাদন নিবারণ জন্য কর্ম্মের দ্বারা তাহার সেবা করিতে হয় না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই দেবতারা বিঘ্নউৎপাদনকারী। আত্মরত হইতে পারিলে আর তাহাদের প্রভাব থাকে না (বলদেব)।

মধুসূদন এইস্থলে বশিষ্ঠের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষ সাধনের সাতটী স্তর আছে। তাহার প্রথম তিনটী স্তর জাগ্রত অবস্থার, চতুর্থ স্তর স্বপ্নাবস্থার ও শেষ তিনটী স্তর সুষুপ্তি অবস্থার। জাগ্রত অবস্থার স্তর যথা—(১) শুভ বা মোক্ষ ইচ্ছা, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিবেক পূর্ব্বক মোক্ষ ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা। (২) বিচরণ—অর্থাৎ গুরুর নিকট গিয়া বেদান্তবাক্য বিচার, শ্রবণ ও মনন করা। (৩) তনুমানস—অর্থাৎ নিদিধ্যাসন অভ্যাস দ্বারা মন একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণযোগ্য হওয়া। সুষুপ্তি অবস্থার স্তর—(৪) সত্ত্বাপত্তি ;—অর্থাৎ বেদান্তবাক্য হইতে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মাত্মৈক সাক্ষাৎকার অবস্থা ; তখন এই সমস্ত জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন অদ্বৈত বুদ্ধি স্থির হয়, দ্বৈতবুদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এই চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিলে যোগী ব্রহ্মবিদ্ হন। শেষ সুষুপ্তি অবস্থা, জীবন্মুক্তি অবস্থা। এ অবস্থায় সবিকল্প সমাধি অভ্যাস দ্বারা মন নিরোধ হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবান্তর ভেদে তাহার তিন স্তর ; যথা,—(৫)

আসক্তি ত্যজিয়া তবে কর আচরণ
সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; অনাসক্ত হয়ে
কর্ম্ম করি করে লোকে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ। ১৯

অসংসক্তি—এ অবস্থায় সুষুপ্তি হইতে কখন কখন ব্যুত্থান হয়। (৬) পদার্থাভাবনী—এ অবস্থায় যোগী অনেক চেষ্টার ফলে আর ব্যুত্থিত হন না, অভ্যাস পরিপাকের দ্বারা স্থায়ীরূপে সুষুপ্ত হন, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একীকৃত হন, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে চিরনিদ্রিত হন (২।৬৯ দেখ)। (৭) তুরীয় অবস্থা—তখন ব্রহ্মে তন্ময় হয়, আদৌ ভেদদর্শন থাকে না, স্বতঃ পরতঃ কখন ব্যুত্থান হয় না, পূর্ণানন্দ ভোগ হয় ; তখন নিজ প্রযত্নে আর দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না, বিদেহ মুক্তি হয়।

মধুসূদন বলেন, ইহার মধ্যে প্রথম তিন স্তরেও কর্ম্মাধিকার থাকে না, শেষ চারি স্তরের ত কথাই নাই। পূর্ব্বের শ্লোকে দেখাইয়াছি যে, এরূপ অর্থ কেবল জ্ঞানবাদীরা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ অর্থ ধরিলে পরের শ্লোকে 'তস্মাৎ' বা সেইজন্য, অসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর,' যে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কষ্টকল্পনা সাধ্য হয়। এই দুই শ্লোকে বোধ হয় কেবল এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে,আত্মজ্ঞানী কখন নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না। কিন্তু পরের জন্য, সংসারের জন্য, আসক্তিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

(১৯) **সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম**—(মূলে আছে সততং কার্য্যং কর্ম্ম") অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। (স্বামী)। নিত্যকর্ম্ম (শঙ্কর)। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্ম (মধু) কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম (বলদেব)। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক এই—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্মলিপ্যতে নরে॥" পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ শ্লোকের টীকা দেখ।

কর্ম্ম করি—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিয়া (শঙ্কর, মধু)।

শ্রেষ্ঠ পদ—আত্মশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষ পদ লাভ করে (মধু, শঙ্কর)। আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)।

(২০) **করেছে সুসিদ্ধি লাভ**—কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—মোক্ষলাভ করিয়াছেন (শঙ্কর)। সংসিদ্ধ=সম্যকজ্ঞান (স্বামী) জ্ঞাননিষ্ঠ।

করেছে সুসিদ্ধি লাভ জনকাদি সবে
কর্ম্মেতে কেবল ; লোক-সাধারণ রক্ষা
লক্ষ্য রাখি কর্ম্ম পুনঃ কর্ত্তব্য তোমার। ২০

জনকাদি—জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি (শঙ্কর)।

কর্ম্মেতে কেবল—ক্ষত্রিয় বিদ্বানগণ কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর বলেন, জনকাদি ক্ষত্রিয়দিগের প্রথমে আত্মদর্শন হয় নাই, পরে কর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামানুজ বলেন,জনকাদি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হইয়াও কর্ম্ম করিতেন, অতএব জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন বলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত নহে। এইজন্য জনকাদি গৃহীর বিহিত কর্ম্মমার্গাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মধুসূদন আরও বলেন, স্মৃতিতে আছে "সর্ব্বে রাজাশ্রিতাধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ।" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় (রাজা) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন জন্য অবশ্য কর্ম্ম করিবেন।

মধুসূদনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি রাজা বা যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে নিযুক্ত,তিনি জ্ঞানযোগীই হউন আর কর্ম্মযোগীই হউন, কদাপি প্রজারক্ষা কর্ম্মত্যাগ করিবেন না। আর এই কর্ত্তব্য পালন করিলেও তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। এই জন্যই পরে বলা হইয়াছে লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিবে।

লোক সাধারণ রক্ষা—(মূলে আছে "লোক সংগ্রহম্"। অর্থাৎ লোকের উন্মাদ প্রবৃত্তি নিবারণ (শঙ্কর), লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন (স্বামী)। আমি কর্ম্ম করিলে জন সকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করিবে) অন্যথা আমার কর্ম্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহারাও নিত্যকর্ম্ম ও বিহিত কর্ম্মত্যাগ করিয়া পতিত হইবে ইহা দেখিয়া (স্বামী)। লোকের নিজ নিজ ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি নিবারণই লোকসংগ্রহ,—এক কথায় সমাজরক্ষা। ক্ষত্রিয় জন্ম পাইবার মত কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে করিয়া,তাহার সংস্কার বলে এ জন্মে ক্ষত্রিয় শরীর গ্রহণ করিয়া, বিদ্বান হইলেও জনকাদির ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে অর্জ্জুনকে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে, এবং অর্জ্জুনের তাহাই কর্ত্তব্য। এ অর্থ কিছু সংকীর্ণ। কেন না,

শ্রেষ্ঠ লোক যে যে রূপ করে আচরণ
সাধারণে করে তাই ; যাহা সপ্রমাণ
করে তারা—লোকে তার হয় অনুগামী।২১

লোকরক্ষার জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় যেমন লোকের ধর্ম্মরক্ষা করিবে, লোককে যেমন শত্রু হইতে রক্ষা করিবে, তেমনি ব্রাহ্মণেরও কর্ত্তব্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, লোকমধ্যে জ্ঞান, যতদূর সম্ভব, বিস্তার করিবে। এই জন্য ব্রাহ্মণ বরাবর আচার্য্য ও শিক্ষক হইয়া ও সৎগ্রন্থাদি লিখিয়া লোককে শিক্ষা দিতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মহতী বাক্য অনুসরণ করিয়াই তাঁহার সময় বেদব্যাস লোকশিক্ষার জন্য বোধ হয় বেদসংগ্রহ করেন, পুরাণেতিহাস লিখেন, বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। নতুবা সে কার্য্যে ব্যাসের নিজের কোন স্বার্থ সে কালে থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান স্বয়ং ২২ শ্লোকে বলিয়াছেন, তাঁহার কোন কর্ম্মই নাই, তথাপি তিনিও লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আর শঙ্করাচার্য্য মুখে যে উপদেশই এখন দিন, কিন্তু তিনিও নিজে লোকসংগ্রহ জন্য ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈতমত সংস্থাপন করেন ও কত গ্রন্থ লিখিয়া যান। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের এই উক্তি একদেশদর্শী নহে। আত্মদর্শী হউন, আর কর্ম্মযোগী হউন, ব্রাহ্মণ হউন, আর ক্ষত্রিয় হউন, যোগী হউন আর সন্ন্যাসী হউন—সকলেরই লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এ শ্লোকের ইহাই অর্থ।

(এই শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোক আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অতি গভীররূপে অঙ্কিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এ দুর্দ্দিন শীঘ্র ঘুচিয়া যাইবে।)

(২১) এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে লোক সংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করা কেন কর্ত্তব্য তাহা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)।

শ্রেষ্ঠ—রাজাদি প্রধান লোক (শঙ্কর)।

সাধারণে করে তাই—(মূলে আছে ইতরজন) অর্থাৎ প্রাকৃত জন (স্বামী) তাহাই করে। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া তাহাই অনুকরণ করে। (মধু)।

সপ্রমাণ করে—লৌকিক বৈদিক যাহা ভ্রমণ করে (শঙ্কর) কর্ম্ম শাস্ত্র ও তৎনিবৃত্তি শাস্ত্র যেরূপ প্রামাণ্য বলিয়া নির্ণয় করে (স্বামী) বলদেব বলেন, এই

নাহি এ ত্রিলোকে কিছু কর্ত্তব্য আমার,
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছু নাহি মম আর,—
তথাপি অর্জ্জুন আমি করমে নিরত। ২২
যদি আমি কভু পার্থ, সদা সাবধানে
কর্ম্মে নাহি রত হই—তাহলে নিশ্চয়
লোক সব মম পথে হবে অনুগামী। ২৩
আমি না করিলে কর্ম্ম, এই লোক সব
হবে নষ্ট ; হব আমি সঙ্করের হেতু ;
আমিই তাদের হব নিধন কারণ। ২৪

জন্য তেজস্বী শ্রেষ্ঠ লোকের কোনরূপ স্বৈরাচার করা কর্ত্তব্য নহে। রামানুজ বলেন, এই জন্য তাহাদের স্ববর্ণ ও আশ্রমোচিৎ কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয়।

(২২) করমে নিরত—অর্থাৎ লোক রক্ষার জন্য বা লোক সংগ্রহ কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত (শঙ্কর, গিরি, রামানুজ)। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মে নিরত থাকিবার কারণ এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে (বলদেব)।

(২৩) কর্ম্মে নাহি রত হই—ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকর্ত্তা। কিন্তু এই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য বিভাগ হেতু ব্রহ্মেরও নাম বিষ্ণু হইয়াছে। এই জন্য শাস্ত্রে আছে যে, সত্ত্বগুণে পালন কার্য্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষ ঈশ্বর বা বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়। বিষ্ণু এই জগতের রজঃ ও তমঃ শক্তি ক্ষয় করিয়া ও সত্ত্ব শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ইহার রক্ষা করেন। সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর যে প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ও কর্ম্ম করেন, তাহা ৪ অধ্যায়ে ৭।৮ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। সাধুর রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্মের রক্ষা সেস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত লোকসংগ্রহ জন্যও তিনি কর্ম্ম করিয়া সাধারণকে ও লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেন। এক কথায়—সত্ত্বশক্তির বৃদ্ধি জন্য যে কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা মনুষ্য নিজ শক্তিতে করিতে পারে না ; তাহার জন্যই অবতার।

সদা সাবধানে—(মূলে আছে "অতন্দ্রিতঃ") অর্থাৎ অনলস হইয়া (শঙ্কর, স্বামী)।

অনুগামী—অর্থাৎ কর্ম্ম করিবে না। স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিবে না (রামানুজ)।

(২৪) হবে নষ্ট—(মূলে আছে 'উৎসীদেয়ুঃ' অর্থাৎ উৎসন্ন যাইবে।) লোক-স্থিতি-কারণ কর্ম্মের অ-

নির্ব্বোধ আসক্তি বশে কর্ম্মকরে যথা
লোক রক্ষা তরে পার্থ আসক্তি ত্যজিয়া
সেইরূপ কর্ম্ম করা বিজ্ঞের উচিত। ২৫

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি বিচলিত
বিজ্ঞে না করিবে; নিজে যোগ যুক্ত হয়ে
কর্ম্ম করি, কর্ম্মে তারে করিবে যোজিত।২৬

প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা হয় সর্ব্বরূপে
কর্ম্ম সব সম্পাদিত; 'কর্ত্তা আমি' ইহা—
অহঙ্কার বশে ভাবে মূঢ়মতি জনে। ২৭

ভাবে নষ্ট হইবে (শঙ্কর), ধর্ম্মাভাবে নষ্ট হইবে (স্বামী), কুলোচিত কর্ম্ম না করিয়া নষ্ট হইবে (রামানুজ)। ঈশ্বর পালনকার্য্য না করিলে, অথবা তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে, সর্ব্বভূতের কর্ম্ম প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইবে, ও স্থিতিহেতু অভাবে পৃথিব্যাদি ভূত সকলের বিনাশ সাধিত হইবে, অর্থাৎ জগতের বিকাশ অবস্থা আর থাকিবে না এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে সকল লোককে ধারণ করা আছে, সে ধর্ম্মলোপে তাহাদের বিনাশ হইবে (গিরি)। এই শেষ অর্থ কিছু দূরার্থ ও এই শ্লোকের শেষ অংশের সহিত ঠিক সঙ্গত হয় না।

সঙ্করের হেতু—সকল লোক শাস্ত্রীয় আচার পালন না করায় আমি সঙ্করের কর্ত্তা হইব (রামানুজ)। কোন টীকাকারই এই কথাটী পরিষ্কার করিয়া বুঝান নাই। কামনা করিয়াই হউক, আর নিকাম ভাবেই হউক, যে সকল লোক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনেক পরিমাণে নিজ প্রকৃতি দমন করিতে শিক্ষা করে। সাধারণতঃ লোকে আসুরী বা রাক্ষস-স্বভাবযুক্ত; অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন। তাহারা ১৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকোক্ত নরকের দ্বার স্বরূপ—কাম ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী। তাহারা সর্ব্বদা কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া থাকে। এ সকল লোকের চিত্ত অস্থির, বুদ্ধি অব্যবসায়াত্মক। তাহারা নিজে ভাবিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না। তবে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোককে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এবং যদি তাহারা দেখে যে, শ্রেষ্ঠ লোক সকলেই বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম পালনে ও শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়াতে সর্ব্বদা লিপ্ত আছে, তবে তাহারাও উহাদের অনুকরণ করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে রত হইবে। এই রূপে তাহাদের কামনা নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া তাহাদের উন্মার্গ প্রবৃত্তি দমন করে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সত্ত্বশক্তির তাহাতে কতক স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। কিন্তু যদি শ্রেষ্ঠলোক কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করে, যদি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ না করে, তবে এইসকল সাধারণ লোকও শাস্ত্রীয় বিধানোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। তাহার ফলে তাহারা কামাচারী বা যথেচ্ছাচারী হইবে (গীতার ১৬। ২৩ শ্লোক দেখ) তাহার ফল বর্ণধর্ম্ম লোপ। অর্থাৎ এক বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য বর্ণে প্রবৃত্তিবশে করিতে যাইবে। তাহা হইলে গুণ বিভাগ অনুযায়ী বর্ণ বিভাগ নষ্ট হইবে, সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। তাহাকেই এস্থলে সঙ্কর উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। বর্ণভেদ ও তদনুসারে কর্ম্মভেদের বন্ধন শিথিল হইলে সমাজ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বর্ণের মিশ্রণ হয়, তাহা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। (আমি এই তত্ত্ব গত পৌষের নব্যভারতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম)। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭, ১৮, ও ১৯ শ্লোক দেখ।

নিধন কারণ—সঙ্কর জন্মহেতু প্রজাদের মলিন করা হইবে (স্বামী)। ধর্ম্মলোপ হেতু নষ্ট হইবে (মধু)।

(২৫) কর্ম্ম করা বিজ্ঞের উচিত—জ্ঞানযোগাধিকারী ও কর্ম্মযোগাধিকারী উভয়েই কর্ম্ম করিবে। ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। (রামানুজ)।

(২৬) বুদ্ধিবিচলিত—যাহারা কর্ম্মে আসক্ত ও অবিবেকী, তাহারা আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমান বশে, 'ইহা কর্ত্তব্য' 'ইহা জ্ঞাতব্য' 'এইরূপ কর্ম্মের এইরূপ ফল' এইপ্রকার বুদ্ধিযুক্ত। সাধনার দ্বারা তাহাদের কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি নিয়মিত ও সংযত হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই। কারণ চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায়, তাহারা জ্ঞানোপদেশ হইতে কোন লাভ করিতে পারিবে না, কেন না তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানচর্চ্চা স্থান পাইবে না, অথচ বিহিত কর্ম্মে তাহাদের শ্রদ্ধা দূর হইবে। সুতরাং তাহারা ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইবে (মধু ও শঙ্কর)। বুদ্ধিবিচলিত হইলে কর্ম্মে আর তাহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে না, অথচ জ্ঞানেরও উদয় হইবে না। সুতরাং তাহারা উভয় মার্গ ভ্রষ্ট হইবে (বলদেব)। শাস্ত্রে আছে—

"অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিত॥"

(২৭) প্রকৃতিজ গুণ……—সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি (সাংখ্যদর্শন ১।৬১)

কিন্তু পার্থ, গুণ আর কর্ম্ম বিভাগের-
তত্ত্বদর্শী জন কর্ম্মে আসক্ত না হয়—
ভাবে তারা, গুণ হয় গুণে প্রবর্ত্তিত। ২৮

বা প্রধান। সেই সাম্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে গুণত্রয়ের যে বিকার হয়,ক্রমে তাহার দ্বারা কার্য্য কারণরূপ কর্ম্ম সূত্র উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম,—লৌকিক ও শাস্ত্রীয় (শঙ্কর)। প্রকৃতির গুণ বা প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়ই সকল কর্ম্ম করে (স্বামী)।

সত্ত্ব রজ তমগুণময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের শক্তি বা মায়াই প্রকৃতি। (বলদেব ও মধুসূদন) শাস্ত্রে আছে—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং॥"

সেই প্রকৃতির কার্য্য-কারণরূপ গুণবিকার হইতেই কর্ম্ম হয় (মধু)। লোকে নিজ প্রকৃতি বা গুণানুরূপ কর্ম্ম করে (রামানুজ)। ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত ও প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে জাতশরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও প্রাণ দ্বারা সর্ব্বকার্য্য সম্পাদিত হয় (বলদেব)।

সাংখ্যতত্ত্বসমাসে আছে "পুরুষ কর্ত্তা হইলে সকল কর্ম্মই শুভ হইত। তিনরূপ বৃত্তি থাকিত না। ধর্ম্ম সৌহিত, যম, নিয়ম, নির্বৈরতা, সম্যক্ বিবেচনা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক বৃত্তিই সাত্ত্বিকী। রাগ,ক্রোধ,লোভ, পরপরিবাদ, অতিরৌদ্রতা, অতুষ্টি, বিকৃতআকৃতিরূপ পরুষতাই রাজসিক বৃত্তি। উন্মাদ, মদ, বিষাদ, নাস্তিক্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গিতা, নিদ্রা, আলস্য ও নির্গুণতা ও অশৌচ ইহাই তামসিক বৃত্তি। এই গুণত্রয় হইতেই জগতে গুণের কর্ত্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধান্ত হয়।" পরে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বুঝান আছে।

অহঙ্কার বশে—(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১ শ্লোকের টীকা দেখ)।

অহঙ্কার—কার্য্য কারণ সঙ্ঘাত আত্মপ্রত্যয় (মধু)। "অভিমানোঽহঙ্কার (সাংখ্যদর্শন ২।১৬)। সম্বিদ্বপু জীবাত্মা অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত বিষয়ভোগ বাসনাক্রান্ত হইয়া ভোগার্থ নিজ সন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ও তাহার কার্য্য দ্বারা অহঙ্কারবশে বিমুগ্ধ ও আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া, শরীরাদিতে অহংভাব যুক্ত হয়, এবং শরীরাদির দ্বারা সিদ্ধ কর্ম্মকে নিজকৃত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে (বলদেব)।

জীব-দেহ বা প্রকৃতি ও ঈশ্বর কর্ম্মের এই তিন কারণ। জীব একা কর্ম্ম করে—এ ধারণা ভ্রান্তি। (গীতার ১৩ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক, ১৮ অধ্যায়ের ১৪—১৬ শ্লোক দেখ) সাংখ্যদর্শনে আছে "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ (৬।৫৪) এবং "নির্গুণ আত্মমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদি শ্রুতেঃ" (৬।১০)। সাংখ্য তত্ত্ব সমাসে আছে, "ত্রিগুণ জন্য বিপরীত দর্শন হয় বলিয়া অবোধ পুরুষ, আমি করিতেছি এইরূপ মনে করে। যে একগাছি সামান্য তৃণকেও নত করিতে অসমর্থ, সেই এ সমস্ত আমি করিতেছি, আমারই সব, এইরূপ অবোধ অভিমানের দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।"

মূঢ়মতি—স্বরূপ বিবেক অসমর্থ অর্থাৎ অনাত্ম বিষয়ে আত্মাভিমান যুক্ত (মধু)।

(২৮)গুণ আর কর্ম্মবিভাগের—(মূলে আছে "গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ") অর্থাৎ গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ উভয়ের (শঙ্কর)। আমি গুণাত্মক নহি এই স্থির করিয়া--গুণ হইতে আত্মার প্রভেদ, ও আমাতে কর্ম্ম নাই এই স্থির করিয়া—কর্ম্ম হইতে আত্মার প্রভেদ (স্বামী)। মধুসূদন বলেন,গুণ কর্ম্ম ও বিভাগ এই তিনের। অর্থাৎ অহঙ্কারের আস্পদ বা অহংজ্ঞানের আধার শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই গুণ; এবং মমতার আস্পদ সেই সকলের ব্যাপার ভূত—কর্ম্ম; এবং এই সমস্ত বিকারযুক্ত জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ বা বিভিন্ন স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা তাহাই এস্থলে বিভাগ; এই গুণ, কর্ম্ম ও বিভাগ বা আত্মার (মধু)। গুণ বা ইন্দ্রিয় হইতে ও কর্ম্ম হইতে যে আত্মার বিভাগ বা ভেদ তাহার(বলদেব)। সত্ত্বাদি গুণ বিভাগের ও তৎকর্ম্ম বিভাগের (রামানুজ)।

ইহার মধ্যে রামানুজের ও শঙ্করাচার্য্যের অর্থই অধিক সঙ্গত। গীতার ৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে আছে, "গুণকর্ম্ম বিভাগ হইতে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণের তিন বিভাগ এবং এই তিনরূপ গুণ হেতু যে কর্ম্মের বিভাগ হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। (গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪১ হইতে ৪৪ শ্লোক দেখ)।

গুণ হয় গুণে প্রবর্ত্তিত—করণাত্মক (ইন্দ্রিয়াত্মক) গুণ,বিষয়াত্মক (ইন্দ্রিয় বিষয়াত্মক) গুণে প্রবর্ত্তিত হয় (শঙ্কর, স্বামী,মধু, বলদেব)। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজ বিষয়ে রত হয়। রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তাঁহার মতে সত্ত্বাদি গুণ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় বা নিজ অনুরূপ কার্য্য করে।

বিমোহিত যারা এই প্রকৃতির গুণে
আসক্ত গুণজ কর্ম্মে—বিজ্ঞে নাহি করে
হেন অজ্ঞ মন্দমতি জনে বিচলিত। ২৯
আমাতে করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম আরোপণ
আত্মরত চিতে, হয়ে নিষ্কাম নির্ম্মম,
যুদ্ধ কর—পরিহরি চিত্তের বিকার। ৩০

সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারের তামসিক বিকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত বা বিষয় উৎপন্ন হয়। আর এই অহঙ্কারের রাজসিক বিকার হইতে মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অতএব এক গুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে।

(২৯) বিমোহিত প্রকৃতির গুণে—মায়াগুণে বিমোহিত (মধু)। পূর্ব্বের টীকা দেখ।

আসক্ত গুণজ কর্ম্মে—দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ কৃত গুণের কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত (মধু)। রামানুজ বলেন, ইহারাই প্রকৃত কর্ম্মাধিকারী; এবং ইহাদের কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইবার পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞ, অজ্ঞ—(মূলে আছে—কৃৎস্নবিদ্, অকৃৎস্নবিদ্) পূর্ণাত্মজ্ঞানী অল্পজ্ঞানী (বলদেব)। মধুসূদন বলেন, বার্ত্তিককারদের ব্যাখ্যামতে কৃৎস্ন অর্থে আত্মপরতা ও অকৃৎস্ন অর্থে অনাত্মপরতা।

বিচলিত—অর্থাৎ এই সকল মন্দবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জনের আচার অনুবর্ত্তী কর্ম্মাধিকারীর কথা ভাবিয়া বিজ্ঞ নিজে কর্ম্মযোগ হইতে বিচলিত হইবেন না (রামানুজ)। বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ লোকদিগকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া কর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবে না (বলদেব)। তাহাদের কর্ম্মে শ্রদ্ধা নষ্ট করিবে না (মধুসূদন)।

(৩০) আত্মরত চিতে—(মূলে আছে "অধ্যাত্ম চেতসা") বিবেক বুদ্ধিতে (শঙ্কর)। ঈশ্বরই কর্ত্তা আমি ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করি এই বুদ্ধিতে (মধু ও স্বামী)। আত্মবিষয়ক জ্ঞানে বা আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া (বলদেব)।

কর্ম্ম সমর্পণ—ঈশ্বরই সর্ব্বভূতে অধিষ্টিত হইয়া সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, অতএব তিনি এবং গুণ সকলই কর্ম্মের কারণ, ইহা নিশ্চয় করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্ম আরোপ করিতে হইবে (রামানুজ)। গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬১ শ্লোক দেখ। ঈশ্বরই সর্ব্বভূত শরীরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্ম করান, সুতরাং তিনিই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই ধারণা করিয়া কর্ম্মে মমতা রহিত হও (রামানুজ)।

যুদ্ধ কর—কর্ত্তব্য বা বিহিত কর্ম্ম কর (মধুসূদন)। যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য কার্য্য কর (রামানুজ)।

যে করে এ মত মম নিত্য অনুষ্ঠান
হয়ে শ্রদ্ধাবান আর অসূয়া-রহিত,
সেই জন মুক্ত হয় সর্ব্ব কর্ম্ম হতে। ৩১
কিন্তু যে অসূয়া বশে এ মত আমার
আচরণ নাহি করে, জানিও সে জন
সর্ব্বজ্ঞান মূঢ়, নষ্ট-বিবেক বিহীন। ৩২
জ্ঞানী যেই—সেও নিজ প্রকৃতির মত
করে চেষ্টা; চলে জীব প্রকৃতির বশে,
—কিরূপে করিবে তবে নিগ্রহ তাহার? ৩৩

(৩১) এ মত—এই মত গীতা উপনিষদের সারভূত (রামানুজ)। কর্ম্ম আপাততঃ দুঃখদায়ক বোধ হইলেও পরম কারুণিক ঈশ্বরের দ্বারাই সে কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে এই মত (মধুসূদন)।

অসূয়া—গুণযুক্ত বিষয়ে দোষ আবিষ্কার প্রবৃত্তি (মধু)।

কর্ম্মহতে—কর্ম্ম জনিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে (মধুসূদন)।

(৩২) সর্ব্বজ্ঞানমূঢ়—সর্ব্বকর্ম্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞান তাহা বিরহিত (মধু)। বিপরীত জ্ঞানযুক্ত (রামানুজ)। কার্য্যাদি ও বস্তুর স্বরূপজ্ঞান বিমূঢ় (রামানুজ)।

(৩৩) নিজ প্রকৃতির মত—পূর্ব্ব জন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানেচ্ছাদি জনিত সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই লোকের নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, বলদেব)। প্রাচীন বাসনা (রামানুজ)। (২ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের টীকা দেখ)।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—মূলে আছে "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি') স্বামী বলেন এস্থলে নিগ্রহ অর্থে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। কিন্তু অন্য টীকাকারগণ ভিন্ন অর্থ করেন। শঙ্কর, গিরি ও মধুসূদন বলেন যে, "এই মত কেন

আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে
বিরাগ বা অনুরাগ ; তাহাদের বশ
নাহি হ'ও—প্রতিকূল তাহারা ইহার। ৩৪

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হতে
বিগুণ স্বধর্ম্ম ভাল ; স্বধর্ম্ম পালনে
মরণ (ও) মঙ্গল—পরধর্ম্ম ভয়ানক। ৩৫

লোকে অনুসরণ করিবে না?" অর্জ্জুনের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই ভাবিয়া এই শ্লোকে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা এই স্থলে এই অর্থ করেন যে "আমার (শ্রীভগবানের) বা রাজার বা অন্যের নিগ্রহ নিষেধ বা দণ্ডে কি ফল হইবে?" তাঁহাদের মতে নিগ্রহ অর্থে দণ্ড বা নিষেধ। কিন্তু গিরি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, নিগ্রহ অর্থে প্রকৃতিনিগ্রহ। রামানুজ বলেন, শাস্ত্রকৃত নিগ্রহ। এই অর্থ অনেকটা স্বামীর অনুরূপ। অনুবাদে, অধিক সঙ্গত বোধে, এই অর্থই অবলম্বন করা হইয়াছে। বলদেব অর্থ করেন, সৎ-প্রসঙ্গ শূন্যের কি দণ্ড দিবে? রামানুজ বলেন, জ্ঞান-যোগ কেন দুষ্কর ও প্রমাদযুক্ত, তাহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

(৩৪) বিরাগ বা অনুরাগ—(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকের টীকা দেখ)। সুখকর বিষয়ে অনুরাগ, ও দুঃখকর বিষয়ে বিরাগ। জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শব্দাদি যে কোন বিষয় গ্রহণ বা অনুভব (perceive) করি না কেন, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যাদি যে কোন বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। মন আকৃষ্ট না হইলে, বিষয় গ্রহণ সম্ভব হয় না। এই জন্য মন আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। অনাদিকালপ্রবৃত্ত প্রাচীন বাসনা আমাদের বৃত্তিকে যেরূপ সংগঠিত করিয়াছে, তদনুসারে অর্থাৎ আমাদের নিজ স্বভাবানুসারে সেই সকল বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। এবং তদনুসারে যাহাতে অনুরক্ত হই, তাহা পাইতে চেষ্টা করি, ও যাহাতে বিরক্ত হই, তাহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টা বলে আমরা সাধারণতঃ কর্ম্ম করি।

তাহাদের বশ নাহি হ'ও—এখন কথা হইতেছে যদি এরূপ হয়, তবে বিধিনিষেধ শাস্ত্রের ফল কি, (গিরি)। ফল আছে, কেন না আমাদের পুরুষকার আছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির কার্য্য দেখাইয়া, এস্থলে পুরুষকারের স্বরূপ বুঝান হইতেছে (শঙ্কর)। প্রকৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে রাগ দ্বেষ উৎপাদন করাইয়া পুরুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। পুরুষকার বলে সেই রাগ দ্বেষকে বশ করিতে হইবে। এই রাগ দ্বেষের বশেই লোকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর)। শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ে আপাততঃ ইষ্টকর মনে করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়, ও শাস্ত্রবিহিত বিষয়ে আপাততঃ কষ্টকর বা অনিষ্টকর ভাবিয়া তাহাতে বিরক্ত হয় (মধুসূদন)। কেবল শাস্ত্রীয় বিবেক জ্ঞান প্রবল হইলে, পুরুষ স্বাভাবিক অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া প্রকৃতির বিপরীত পথে—শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে (মধুসূদন)। বলদেব আরও বলেন, যখন কেবল শাস্ত্রের নিষেধ দৃষ্টি করিয়া মনের স্বাভাবিক অনুকূল বিষয়ে লোকের বিরাগ জন্মাইতে পারে ও শাস্ত্র বিধি হেতু মনের প্রতিকূল বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইতে পারে, তখন বিধি নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। ইহা আমাদের প্রবৃত্তি দমনের অনুকূল।

মায়াময় প্রকৃতিজ শরীর ও আত্মা এই উভয়ে জীবাত্মা সংগঠিত। ইহার মধ্যে প্রকৃতি যখন আমাকে বশীভূত রাখে, তখন মানুষ বাসনার অধীন হইয়া প্রকৃতি বশে চালিত হয়। ইংরাজী কথায় তখন সে necessity বশে চালিত হয়। কিন্তু আত্মা যখন প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, বাসনা দমন করিতে পারে, বা denial of the will শিক্ষা করে, তখন সে তাহার free will বলে আর necessity বা অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনার অধীন থাকে না। (স্বামী বলেন, আত্মার ধর্ম্ম নিবৃত্তি ; আর পশ্বাদি জীব ধর্ম্ম প্রবৃত্তি।) এই তত্ত্বের দ্বারা আধুনিক দর্শনের free will ও necessity তত্ত্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে।

প্রতিকূল—রাগদ্বেষ শ্রেয় মার্গের বিঘ্নকারী। (মধুসূদন, শঙ্কর)। এস্থলে বোধ হয় "অস্য" বা ইহার অর্থ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত নিগ্রহের বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের। টীকাকারগণ অর্থ করেন ইহার—অর্থাৎ লোকের।

(৩৫) স্বধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম (মধুসূদন)। (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের টীকা দেখ।)

রামানুজ বলেন স্বধর্ম্মভূত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম বুঝেন। ইহা অসঙ্গত।

বিগুণ—বিগত গুণ (শঙ্কর)। কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (স্বামী)। প্রমাদগর্ভ প্রকৃতিসংসৃষ্ট বলিয়া দুঃশক (রামানুজ)।

ন—

বল হে বার্ষ্ণেয়! নাহি ইচ্ছা, তবু যেন
কার প্রেরণায়—হয়ে আকৃষ্ট সবলে
নিয়োজিত হয় নর পাপ আচরণে? ৩৬

শ্রীভগবান—

কাম ইহা—ক্রোধ ইহা,—রজগুণ জাত
অতি পাপময়—নাহি পূরণ ইহার,
এ সংসারে অরি রূপে জানিও ইহারে। ৩৭

মরণ(ও) মঙ্গল—এস্থলে যুদ্ধে মরণের আভাস আছে (স্বামী)। বলদেব বলেন, প্রত্যবায় অভাবে ও পরজন্মে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হইবে বলিয়া মঙ্গল। রামানুজ বলেন, এ জন্মে কর্ম্মের ফলে জ্ঞান প্রাপ্তি না হইলেও অন্য জন্মে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মযোগ করিতে পারিবে বলিয়া তাহা শ্রেয়। মধুসূদন বলেন, যুদ্ধে মরিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গ হইবে, এ জন্য মরণ মঙ্গল। স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ বলিয়া শ্রেয় (স্বামী)। মধুসূদনের ও স্বামীর অর্থ এস্থলে অসঙ্গত বোধ হয়।

ভয়ানক—নরকাদি লক্ষণ ভয়ের কারণ (শঙ্কর, স্বামী ও মধুসূদন)। অনিষ্ট জনক (বলদেব)। অজ্ঞানীর জ্ঞানযোগ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া ভয়ানক (রামানুজ)। রামানুজ এই শ্লোকের যে অর্থ করেন তাহা বড় সঙ্গত নহে।

(৩৭) কাম ইহা ক্রোধ ইহা—কাম অর্থাৎ কামনা বা বাসনা। রজঃগুণের দ্বারা প্রথমে আমাদের মনে বাসনার উদ্রেক হয়, এবং সেই বাসনা বশে আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। ক্রোধ এই কামনা হইতে জাত; কামনা যখন পূর্ণ করা যায় না, যখন তাহার গতি প্রতিহত হয়, তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকের টীকা দেখ)। প্রাচীন বাসনা জনিত শব্দাদি বিষয়ে কামনা (রামানুজ)। কাম ও ক্রোধ একই। কামই ক্রোধের কারণ। সুতরাং এই কাম জয় হইলেই ক্রোধের জয় হয়। কারণ নষ্ট হইলে কার্য্য নষ্ট হয়। দুগ্ধে অম্ল দিলে যেমন দধি হয়, কামনা প্রতিহত হইলে সেইরূপ ক্রোধ উৎপন্ন হয়(বলদেব)। মনু বলিয়াছেন,

"অকামতঃ ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তু স্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম॥"

রজগুণ জাত—দুঃখ প্রবৃত্তি বলাত্মক রজগুণ এই কামনার কারণ। তমগুণও ইহার কারণ বটে; কিন্তু দুঃখাত্মক বলিয়া ইহাতে রজোগুণের প্রাধান্য আছে (মধুসূদন)। রজগুণের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এই রজোগুণ ক্ষয় হইলে ও সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, কামনার শক্তিও প্রশমিত হয় (স্বামী ও মধু)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, কামনাকে যেমন রজোগুণ হইতে জাত বলা যায়,তেমনি রজোগুণকেও কাম বা বাসনা হইতে জাত বলা যায়। কেননা অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা বীজই সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছে,এবং তাহাই প্রকৃতিতে রজোগুণ উৎপাদন করে। এস্থলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষ অর্থও সঙ্গত হয়।

ধূমে আবরিত বহ্নি, দর্পণ মলায়—
কিম্বা গর্ভ থাকে যথা জরায়ু আবৃত
সেইরূপ আছে ইহা আবৃত তাহাতে। ৩৮

(৩৮) ইহা—জন্তুজ্ঞান (রামানুজ)। জ্ঞান (বলদেব)। শঙ্কর, স্বামী ও মধুসূদন পরের শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা (মূলে আছে ইদং) এস্থলে জ্ঞানকে বুঝাইতেছে।

কিন্তু 'ইহা' অর্থে জগৎ বুঝিলে এই শ্লোকের অর্থ আরও বিশদ হয়। কেন না বাসনা বীজ এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই বাসনা, কামনা বা সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি, জড়ে জীবে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত হয়, এই সৃষ্টিরূপে আমাদের জ্ঞানে বিকশিত হয়, এবং জড়কে ও জীবকে ধারণ করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। পূর্ব্বে ৯ শ্লোকের টীকায় যে ঋগ্বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল। যথা "কামস্তদগ্রেসবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ॥" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কামবীজই সংসারের হেতু ও কামই সংসারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই এক মাত্র তত্ত্ব জর্ম্মান দার্শনিক শ্রেষ্ঠ সপেন্‌হার তাঁহার "World as Will and Idea" নামক পুস্তকে বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয় এই শ্লোকের উল্লিখিত সাধারণ সত্য, পরের শ্লোকে আলোচিত বিষয়োপযোগী বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্য পরের শ্লোকে এই কাম দ্বারা জ্ঞানাবরণের কথা উল্লিখিত আছে।

আবৃত তাহাতে—এই কামনার আবরণের মৃদু মধ্য ও তীব্র ভেদে তিন স্তর আছে। তাহা এই শ্লোকে

জ্ঞানীদের চির অরি তাহা হে অর্জ্জুন,
কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত—
রাখিয়াছে তাহাদের জ্ঞানাবৃত করি। ৩৯
কহে—এ ইন্দ্রিয়গণ মন বুদ্ধি আর
অধিষ্ঠান স্থান তার ; তাদের আশ্রয়ে
জ্ঞান আবরিয়া করে মুগ্ধ দেহীদের। ৪০

সংযত করিয়া অগ্রে ইন্দ্রিয় সকল,
ত্যজ তবে পাপরূপী ইহারে অর্জ্জুন,
জ্ঞান বিজ্ঞানের হয় বিনাশ যা হতে। ৪১
কহে সবে—শ্রেষ্ঠ হয় ইন্দ্রিয় সকল,
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন, বুদ্ধি—মন হতে,
বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাই ত সেই। ৪২

তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে, ধুম যে অগ্নিকে আবরণ করে, সে আবরণ সামান্য, তাহাতে অগ্নির তেজ অতি সামান্য ক্ষীণ হয় ; দর্পণ মলাময় হইলে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ শক্তি অনেক কমিয়া যায়, এজন্য সে আবরণ অপেক্ষাকৃত অধিক আর জরায়ুতে জ্রূণ সম্পূর্ণ রূপে আবৃত থাকে, তাহার আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না। (বলদেব)। কাম প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে থাকে ; পরে স্থূল শরীরে বৃত্তিরূপে ইহা আমাদের চিত্তে অভিব্যক্ত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করে ; বিষয় চিন্তা করার অবস্থায় ইহা স্থূলতম হয় (মধুসূদন)।

(৩৯) অতৃপ্ত সতত—স্মৃতিতে আছে—

ন জাতু কামঃ কাম নামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কামরূপী—ইচ্ছা বা বাসনাই যাহার স্বরূপ।

চির অরি—বাসনা পূর্ণ হইলে আপাততঃ যে সুখ হয়, তাহাও পরিণামে বিষবৎ (স্বামী)।

(৪০) অধিষ্ঠান স্থান—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় দর্শন শ্রবণাদি হইতে মনে বিষয় ভোগের সঙ্কল্প ও বুদ্ধিতে তাহা ভোগের জন্য অধ্যবসায় জন্মে। এই জন্য ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামনার আশ্রয় স্থান (স্বামী) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের শব্দাদি আলোচনা মাত্র বৃত্তি। পরে বুদ্ধির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, ও দশইন্দ্রিয়ের বৃত্তি এই চারিটী করণের যুগপৎ বা ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়। (সাংখ্য কারিকার ২৮, ২৯ ও ৩০ শ্লোক দেখ)। এ কারণ বিষয়জ কামনা এই চারি বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত।

জ্ঞান আবরিয়া—জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে তাহা নহে। পশুপক্ষী সকল দেহীরই জ্ঞান আছে। চণ্ডীতে আছে—

"জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলং।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষী মৃগাদয়ঃ ॥" ১।৪৪

কাম সকল জীবের জ্ঞানকেই আবৃত করিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তবে মানুষের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অল্প আবৃত। একারণও-পূর্ব্বে ৩৮শ্লোকের 'ইহা' অর্থে সমস্ত ভূতজগৎ বুঝিলে অসঙ্গত হয় না।

(৪১) ইন্দ্রিয় সকল—ইন্দ্রিয় প্রথম বশ হইলে মন ও বুদ্ধির বশ ক্রমে আপনি সিদ্ধ হয় (মধুসূদন)।

জ্ঞান বিজ্ঞান—জ্ঞান—অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান। শ্রবণ মনন হইতে এই জ্ঞান হইতে পারে। বিজ্ঞান—অর্থাৎ ধ্যান নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করা বা আত্ম প্রত্যক্ষ করা। বিজ্ঞান সাধনাসাপেক্ষ।

(৪২) শ্রেষ্ঠ হয় ইন্দ্রিয় সকল...—স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। (স্বামী, মধুসূদন, শঙ্কর, গিরি, বলদেব)। কেন না—ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম প্রকাশক দেহের চালক ও স্থূল দেহ নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় না। ইন্দ্রিয়—এস্থলে ইন্দ্রিয়শক্তি বুঝাইতেছে। চক্ষুতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে যে শক্তির দ্বারা আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বা প্রবর্ত্তক বলিয়া বিকল্প ও সংকল্পাত্মক মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। আর অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি মনের সংকল্পাদি নিয়মিত করে, এই জন্য বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। আর জীবাত্মা বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যিনি সাক্ষীরূপে বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন, এবং সকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে বা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এই কাম দ্বারা বিমোহিত করেন—তিনি আত্মা। (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন)।

রামানুজ একেবারে ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানীদের চির শত্রু কে, তাহাই এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞান অবরোধক তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ই প্রধান, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অধিক প্রবল,

এইরূপে বুদ্ধি হতে ইহা শ্রেষ্ঠ জানি,
আত্মবলে আত্মরোধ করি হে অর্জ্জুন,
কর নাশ কামরূপী দুর্জ্জয় রিপুরে। ৪১
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু

আর মন অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রধান ; কেননা মনকে বিষয় বিমুখ করিলেও,বুদ্ধি বিপরীত অধ্যবসায় বলে আমাদের জ্ঞান লাভে বাধা দেয়। আর এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যাহা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান-বিরোধী যাহা—তাহাই এই কাম।

তাহাই ত সেই—এই শ্লোকের "তাহাই ত সেই" অর্থে—তাহাই এই কাম—ইহা রামানুজ বুঝাইয়াছেন।

অন্য টীকাকারগণ বলেন, কি উপায়ে বা কিসের আশ্রয়ে কামকে জয় করা যাইতে পারে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোক দেখ) ইঁহারা বলেন—তাহাই ত সেই,অর্থাৎ তাহাই ত আত্মা। অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বুদ্ধির দ্রষ্টা (শঙ্কর)। এই অর্থের প্রমাণ স্বরূপ কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ১০-১২ শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

(এস্থলে "মহান্ আত্মা" অর্থে হিরণ্যগর্ভাখ্য সমষ্টি বুদ্ধি।) যাহা হউক, রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে।

(৪৩) বুদ্ধি হতে ইহা শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ, কেন না বুদ্ধি প্রভৃতি কামনাচালিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার ও সাক্ষী (শঙ্কর, স্বামী)। রামানুজ বলেন, বুদ্ধি হইতে কাম প্রধান, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞান-বিরোধী।

আত্মবলে আত্মরোধ করি—মনকে বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মযোগে রত করিয়া (রামানুজ)। মন নিশ্চল করিয়া সমাহিত হইয়া (শঙ্কর)। মনকে নিশ্চল করিয়া (স্বামী)। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মন স্থির করিয়া (মধুসূদন, বলদেব)।

দুর্জ্জয়—(মূলে আছে দুরাসদ) দুর্দ্দমনীয় বা দুর্ব্বিজ্ঞেয় (শঙ্কর স্বামী)।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্ম্ম তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ টীকাকারগণ বলেন যে, কর্ম্ম যোগ সকলের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধনার প্রথম সোপান এই কর্ম্মযোগ। তাহার পর দ্বিতীয় সোপান কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগ। তৃতীয় সোপান ভক্তিযোগ,ও শেষ সোপান জ্ঞানযোগ। সুতরাং এই প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইলে আর কর্ম্মযোগের আবশ্যক হয় না। তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না। এই অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ শ্লোকের টীকা দেখ)।

কিন্তু রামানুজ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্ম্মযোগতত্ত্ব কতকটা ভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, মুক্তির পূর্ব্বে সকল অবস্থাতেই কর্ম্মযোগ করিতে হইবে। এই অর্থও সঙ্গত বোধ হয়। ইহা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই অধ্যায়ে কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) কোন অবস্থায় কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। (৫)।

(২) কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

(৩) আমাদের শরীরস্থ প্রকৃতির শক্তি বা গুণই আমাদের তদনুরূপ কর্ম্ম করায়। কর্ম্মে আমাদের একার কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ তাহা নিতান্ত কষ্টকর সাধনা সাধ্য। (২৭)

এই কারণ আমাদের কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কর্ম্মে যাহাতে বন্ধন না হয়, তাহাও করিতে হইবে। তাহার উপায়ও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

(১) কর্ত্তব্য বোধে নিত্য কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। (৮)

(২) জগতে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তী হইবে, ও সে কারণ কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ করিবে। (১৬)

(৩) সকল প্রাণীর তৃপ্তি ও বর্দ্ধন জন্য পঞ্চ যজ্ঞ কর্ত্তব্য বোধে করিবে। (১৩)

(৪) কেবল নিজের জন্য কাজ করিবে না, আসক্তি ত্যাগিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবে। (১৭)

(৫) কর্ম্ম যোগেই সিদ্ধ হওয়া যায়—দৃষ্টান্ত জনকাদি। (২০)

(৬) লোক সংগ্রহ জন্য কর্ম্ম করিবে। (২০)

(৭) ঈশ্বরে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া কর্ম্ম করিবে ; (৩০) অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে। (৯)

৮। কর্ম্মে অনুরাগ বিরাগ বা আসক্তি ত্যাগ করিবে। ৩৪

৯। স্বধর্ম্ম পালন করিবে। ৩৫

১০। ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কামনা বা বাসনা দমন করিবে। ৪১

রাধিকা

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥"—ভবভূতি।

কি বলিলি প্রাণসই! সে কি রাজা মথুরার?—
ত্যজিয়া এ বৃন্দাবন
মাঠে মাঠে গোচারণ,
সে কি আজ রাজপাটে, পাইয়া রাজত্ব ভার?
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম সে তো রাধিকার?

কি বলিলি ব্রজ আজি মনেও পড়ে না তার-
ভুলেছে সে ছেলেখেলা রাজা হয়ে মথুরার?
শ্রীদাম সুদাম সনে
ধেনু রাখে বনে বনে,
শয়ন তমাল-তলে, ননী চুরি গোপিকার?
আজি তার অগণন,
ধন, মান, বন্ধুগণ,
তুচ্ছ বৃন্দাবন তাই ভাবেনা সে একবার?
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম সে তো রাধিকার?

৩

ছিঁড়িয়া কি বনমালা যজ্ঞসূত্র গলে তার?—
দোলেনা সে শিখি-পাখা ছড়ায়ে শোভার ভার?
খুলিয়া মোহন চূড়া,
খুলিয়া সে পীত ধড়া,
পরেছে কি রাজবেশ, মণিময় অলঙ্কার?—
আজি সে রাখালরাজে
সত্যকার রাজসাজে,
বল্ দেখি প্রাণসখি! হইয়াছে কি বাহার?
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম সে তো রাধিকার!

৪

কি বলিলি প্রাণসই! বামে কি মহিষী তার—
কাঞ্চন-জড়িত ছটা নীলকান্ত-নীলিমার?
কে সে সই! ভাগ্যবতী,
শ্যামেরে পেয়েছে পতি,
নাই কলঙ্কের ভয় পোড়া লোক-গঞ্জনার?
কে বসি সে পদমূলে,
গরবে আপনা ভুলে,
ঢেলে দেয় রাঙ্গা পায়ে সোহাগের অশ্রুধার?
কে গো! সে সুভগা মেয়ে,
অনিমিষ থাকে চেয়ে
সে বিধুবদন পানে—হারাইয়ে ত্রিসংসার?
কিবা তার যোগধর্ম্ম,
কিবা তার পুণ্যকর্ম্ম,
এ ফল ফলেছে তার কত যুগ তপস্যার?
দেবের দুর্লভ মণি,
যে পেয়েছে, সেই ধনী,
শ্যামের জীবনী বাড়ে সিঁথীর সিঁদুরে যার!—
সে যে রাজরাজেশ্বরী
সহস্র প্রণাম করি,
শত রাধা নহে তার দাসী-যোগ্যা হইবার!
শ্যাম সুখী যার সুখে,
থাক্ সে পরম সুখে,
সে পদে মানসে মম কোটি কোটি নমস্কার;
থাক্ থাক্ সুখে থাক্, শ্যাম সে তো রাধিকার!

সত্য যদি প্রাণসখি! শ্যাম রাজা মথুরার,
কেন তবে ব্রজভরা এ আকুল হাহাকার?
ব্রজে তার বহা বাধা,
ব্রজে তার মান সাধা,
পোড়া ব্রজে প্রেমে কাঁদা অবিচার অনাচার!
মথুরায় রাজসুখ,
নাই ব্যথা নাই দুখ,
সেখানে রাধিকা নাই চাঁদের কলঙ্ক তার!—
শ্যাম সুখে আছে যদি,
কেন তবে নিরবধি,
ব্রজভরা এ যাতনা, এ আকুল হাহাকার?
কেন গো! মরম-তলে
এ দারুণ জ্বালা জ্বলে,

কেন নয়নের জল বহে হেন অনিবার ?—
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম সে তো রাধিকার ?

৬

সত্য যদি প্রাণসই ! শ্যাম রাজা মথুরার,
যে কাঁদে সে নাম স্মরি, মুছায়ে দে' আঁখি তার !
বল্ গে' মা যশোদারে,—
নীল যমুনার পারে
সুখে আছে নীলমণি, পেয়ে আজি রাজ্যভার !
মায়ের "রাখাল ছেলে"
সে যদি রাজত্ব পেলে,
তা'হতে জগতে আর কিবা সুখ আছে মার ?
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম শুধু রাধিকার !

৭

বল্ সখি ! পায়ে ধরি, সে কি রাজা মথুরার ?—
রাধা তো শ্যামের আধা,
পরাণে পরাণ বাঁধা,
রাধা নামে সাধা বাঁশি, আমি জানি সমাচার !
শ্যাম গতি শ্যাম মতি,
শত জনমের পতি,
ধরম করম শ্যাম সরবস্ব রাধিকার !—
তার নাম-সুধা-বাসে,
মৃত বুকে প্রাণ আসে,
স্বরগ মরত মিশি হয়ে যায় একাকার !
সে আমার আছে সুখে,
বল্ তোরা শতমুখে,
উথলিবে পোড়া বুকে অমৃতের পারাবার !
পাইব পরাণে বল,
শুকাবে নয়ন-জল,
নিভিবে আগুন তার অদর্শন-যাতনার—
বল্ শ্যাম সুখে আছে, রাজা হয়ে মথুরার !

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ইহকাল ও পরকাল

(শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত।)

চিরঞ্জীব শর্ম্মা নব্যভারতের পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ইহার সুতীক্ষ্ণ লেখনী প্রসূত বহুবিধ প্রগাঢ় ভাবগর্ভ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া তাঁহারা কত সময় আনন্দ প্রবাহে ভাসিয়াছেন। কেবল নব্যভারতের পাঠক কেন, চিরঞ্জীব বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের এক জন চিহ্নিত অধিবাসী। সঙ্গীত ও কবিত্ব বিষয়ে ত কথাই নাই—এই দুইটী তাঁহার নিজস্ব বলিলেও বলা যাইতে পারে। যিনি কখনও চিরঞ্জীবের সুধাসিক্ত ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি ইহজীবনে আর তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহার বাঙ্গলা কবিতাবলীও প্রভূত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া ইনি প্রায় ষোড়শ খণ্ড গদ্য ও পদ্যময় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। চিরঞ্জীবের গীতরত্নাবলী যেরূপ একদিকে ভাবুকের হৃদয় দ্রবীভূত করে, তাঁহার বিদ্যালয় পাঠ্য বাল্য-সখা ও যৌবন-সখাও সেইরূপ বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদিগকে শিক্ষাদান ও আমোদিত করে। তাঁহার "পেটুক গণেশ" "গোবরা মাতাল" প্রভৃতিকে বঙ্গের কোন্ বালক বালিকা না জানে ? আবার ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, কলিসংহার, কেশবচরিত, বিংশ-শতাব্দী প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের অতি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ।

কিন্তু অদ্য আমরা চিরঞ্জীবের যে গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, উহা এক নূতন ধরণের পুস্তক। এরূপ সন্দর্ভ যে বঙ্গ ভাষায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। ই-

হাতে যেমন একদিকে প্রগাঢ় ভাবের উচ্ছ্বাস, অন্য দিকে সেইরূপ কবিকল্পনার অদ্ভুত বিকাশ। আবার সকল কথাই বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। ইহাতে বর্ণিত বিষয় সমূহ সামান্য পৃথিবীর কথা হইতে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতরূপে পাঠককে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবের মধ্যে লইয়া যায় এবং তথা হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম ভূমিতে আনিয়া এককালে অনন্তের অসীম সাগরে ডুবাইয়া দেয়। মনুষ্য এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে ও মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তাহার যেরূপ গতি হইতে পারে, তাহাই বিশদরূপে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

ইহকাল পরকালের নায়ক আত্মারাম। আত্মারাম একজন আদর্শ (typical) মনুষ্য। ইহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ইহকালের অন্তর্ভূত ও মৃত্যু হইতে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহাই পরকালের বিষয়।

আত্মারাম বাস্তবিক একজন চমৎকার ধরণের লোক। একগুঁয়ের বেহদ্দ, পাগলের চূড়ান্ত, বিজ্ঞানবিদের একশেষ,দয়াবান্, রসিক,বিরক্ত,সংসারী,প্রতিভাশালী, ধার্ম্মিক, সংসারাবিষ্ট, উদার, সহিষ্ণু, সকলই একাধারে। আবার, অনাসক্ত ফকীর, স্নেহময় পিতা,প্রণয়ী স্বামী, রহস্যপ্রিয় ও স্নেহ-পরবশ পিতামহ, পরোপকারী প্রতিবাসী, প্রাচীন কালের তপস্বী ও আজকালের দেশ-হিতৈষী। এক হিসাবে,এরূপ লোক মেলা ভার। আবার, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে, তাঁহার ভিতর তুমি, আমি, সকলেই আছি। কোনও না কোনও পথ দিয়া, সকল লোকেই আত্মারামের ভিতর আপনাকে দেখিতে পাইবেন ও চিনিতে পারিবেন। তাই বলিতেছি যে, আত্মারাম নামটি চিরঞ্জীব বৃথা দেন নাই—তাহার সার্থকতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আত্মারামের প্রথম মারামারি "আমি" লইয়া। "আমি" কে? কাহার "আমি"? আমি হইতে "আমার" না "আমার" হইতে "আমি?" এই সকল গভীর ও প্রাচীন প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। করিয়াছেন করুন, তাহাতে আমাদের অধিক ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু সেই পুরাতন, অন্ধকারাচ্ছন্ন, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, অতলস্পর্শ অদ্বৈতবাদের প্রপাতটার নিকট একটু পা টিপিয়া টিপিয়া চলা ভাল ছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, আমরা যেন দেখিতেছি যে, আত্মারাম এই পিচ্ছল ভূমিতে একাধিক বার আছাড় খাইয়াছেন। পাঠক দেখুন দেখি—"কিন্তু "আমি"টে কার? কি পদার্থ? যিনি জগৎস্বামী তাঁহার,কিম্বা জীবোপাধি রূপে স্বয়ং তিনি। বিচার করিলে, আমার বলিবার বাস্তবিক কোনও বিষয়ে অধিকার আছে কি না,তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার স্বতন্ত্রতা কেবল নাম মাত্র। তত্ত্বতঃ যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীব" (২ পৃঃ)। আবার—"এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ছিলও না, থাকিবেও না। অনন্ত জলধি বক্ষে বিম্ব সদৃশ জীব সকল তাঁহার লীলার প্রকাশ। ...দৃশ্যমান বিশ্ব তাঁহার লীলার বিকার মাত্র —অর্থাৎ,স্বগুণত্বের অভিব্যক্তি।"(২১৮পৃঃ)। তাই বলি, আত্মারাম ভারি আছাড় খাইয়াছেন। একটু ফাঁকে ফাঁকে চলিয়া গেলে ভাল হইত। ও সর্ব্বনেশে গর্ত্তের নিকটে লম্ফন কূর্দ্দন করায় লাভ নাই। উহার গভীরতা কে মাপিবে? তবু, আত্মারাম

মিষ্ট কথা বলিয়াছেন—যদি কুসংস্কার, ক্ষুদ্রচিত্ততা, সংকীর্ণ মতিত্ব, অপ্রিয় ত্যাগের প্রবলা ইচ্ছা পরিহার করিতে পার ত—সার কথাই বলিয়াছেন। অনেক লোক জগতে দেখিতে পাই, যাঁহারা উপরে আত্মারাম যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বলেন, আবার "তুই" টার পুচ্ছ ধরিয়াও টানাটানি করিতে ছাড়েন না। আত্মরামও তাহা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, তাহা দুর্ব্বলতা বই আর কিছুই নহে। যাহাতে অরুচি, তাহা গলাধঃকরণ করি কেমন করিয়া? কিন্তু যাক্, আত্মারামের এই এক সামান্য দুর্ব্বলতা লইয়া আর পীড়াপীড়ি করিব না।

আত্মারাম আছাড় খাইয়াছেন সত্য, কিন্তু হাত পা ভাঙ্গেন নাই—আছাড় উদরস্থ হইতে না হইতেই, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, "আমি"র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নতুবা, এত ব্যস্ত, এত ব্যগ্রভাবে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কেন? অতি আগ্রহের সহিত আত্মারাম খুঁজিতেছেন, "আমিত্ব থাকে কোথায়?" দেহের প্রত্যেক অঙ্গে খুঁজিলেন—বুক, পিঠ, মুখ, মাথা, হাত, পা, নাক, চোখ, কাণ, ললাট, হৃৎপিণ্ড;— কিন্তু কোথাও মিলিল না। তাইত "বড় মজার রহস্য; সামান্য প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় যে "আমি"কে আঁকড়িয়া পাওয়া যায় না, সেই আবার ধরিতে গেলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বায়ুতে মিলাইয়া যায়! আত্মারাম ভাবিয়াই অস্থির; আমিত্ব সাগরে তিনি কূল কিনারা দেখিতেছেন না। ব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে আমি!" তুমি কে, কিরূপ এবং কয়জন? দুই জনের মত যেন বোধ হয়।" অদ্বৈতবাদ-গুহা-পার্শ্বের আছাড়জনিত বেদনা এখন আত্মারামের অঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছিল।

যাহা হউক, আত্মারাম অবশেষে দেখিলেন যে, আমিত্ব সমুদ্র অতলস্পর্শ, যতই ডুব না কেন, তাহার তল পাওয়া যায় না। তিনি বুঝিলেন যে, এ রহস্য বড়ই জটিল—যতই ঘাঁটাঘাঁটি করিবে, ততই কঠিন ও প্রহেলিকাময় বোধ হইবে। তখন, তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন। হতাশ দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "এ বিচারে ও তত্ত্বানুসন্ধানে কি কিছু বুঝা গেল? বরং পূর্ব্বাপেক্ষা রহস্য আরও গভীর এবং জটিল হইল।" আত্মারাম দুঃখিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এ বিষয় মীমাংসা করিতে না পারায় আমরা তাঁহার কোনও দোষ দেখি না—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" আর, পৃথিবীতে কেহই যাহা পারে নাই, আত্মারাম তাহা করিবেন কিরূপে? কূট তার্কিক ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য দার্শনিক ঋষিগণ যেখানে অন্ধকার দেখিয়াছেন, আত্মারাম যতই চিন্তাশীল হউন না কেন, সেখানে কি করিবেন? বরং যেরূপ সাহস, সারল্য ও মধুর ব্যাকুলতার সহিত তিনি আমিত্ব সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। পাঠক দেখুন, কেমন মধুর ভাবে কেমন ধীর অথচ ব্যাকুল চিত্তে, কেমন ক্ষুব্ধ অথচ প্রশান্ত মনে আত্মারাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন— "হে 'আমি', তুমি কে, কিরূপ এবং কয়জন? ...তুমি কি বিভিন্ন প্রবৃত্তির চির পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল তরল তরঙ্গ মাত্র? না, তা ছাড়া আর কিছু স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, সারভূত পদার্থ? বরং মেঘের বিজলী, আকাশের নীলিমা, বাতাসের হিল্লোল, নদীর তরঙ্গ, রবির কিরণ, মরুর মরীচিকা ধরিতে পারি, তথাপি 'আমার' 'আমি'কে ধরিয়া রাখিতে পারি

না। এই দেখিলাম স্বর্গে, এই আবার নরকের গভীর তলে।”

আমিত্ব বিচারের পরই আত্মারামের জীবনীর আরম্ভ। জন্মের বিষয় বলিতে গিয়া তিনি আবার আমিত্ব সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে এবার সামলাইয়া গিয়াছেন। আত্মারাম ভাবুক; জীবনী বর্ণনায় বাহ্য অপেক্ষা অন্তরের দিকেই তাঁহার অধিক দৃষ্টি; আবার কখনও কখনও কবিত্ব-পক্ষের ভরে তিনি অসীম কল্পনাকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিহার করেন। শৈশব ও বাল্যে তিনি “সংসারের সাধারণ ছাঁচে পতিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিলেন।” কিন্তু, যখন যৌবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জীবিকা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইল, তখন আত্মারাম আর চিন্তাহীন বালক নহেন—ছাঁচের কাদা নহেন—তিনি একজন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি। সংসারের সাধারণ কার্য্যস্রোতে নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ডের মত ভাসিয়া যাওয়া তাঁহার কর্ম্ম নহে। প্রবৃত্তির তাড়নায় তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইল। নামিয়া দেখিলেন যে, নরনারীকুল যেন পরামর্শ করিয়া একই পথে, একই লক্ষ্য অভিমুখে ছুটিতেছে। প্রথমতঃ তিনি তাহাদিগকে এই ভাবে চলিতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইলেন, তাঁহাকে সেই ভাবে চলিতে না দেখিয়া সকলে ততোধিক বিস্মিত হইল।

ইন্দ্রধনুবৎ পার্থিব ঘটনাপুঞ্জের অন্তঃস্থ ও বাহ্য বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে আত্মারাম চলিলেন। কিন্তু সংসারের কি মহিমা! অতি অল্পকাল মধ্যে, এই ধূলি ও ধূমময় কার্য্যক্ষেত্রের বাতাসে তাঁহার সেই মার্ত্তণ্ড রশ্মিদীপ্ত স্ফটীকবৎ বিমল মনটী মলিন হইয়া গেল। অপার্থিব চিন্ময় সত্বার পরিবর্ত্তে চাকুরি, বাড়ী, টাকা প্রভৃতি, চিন্তার বিষয় হইল। আত্মারাম পার্থিব বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে এক সুবৃহৎ সংসারের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। মোট কথা, সংসার বিষপানে আত্মারাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আত্মারাম এই মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন না। তাঁহার এই নিদ্রা ভঙ্গের বিবরণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী। সংসার পরিত্যাগের সময়, তাঁহার সেই মোহময় আমিত্বের সঙ্গে আত্মারামের সংগ্রাম আরও অনুপম—আরও মধুর, আরও জ্ঞান, গবেষণা ও কবিত্বপূর্ণ। পড়িবার কালে, এই বর্ণনা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘতা প্রযুক্ত ইহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।

মোটামুটি ভাবে বাল্য, যৌবন ও শেষ দশা এইরূপে বর্ণন করিয়া, আত্মারাম নিজ জীবনের ঘটনাবলীর বিশেষ বিবরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমেই জন্ম বিবরণ। আত্মারামের জন্ম কোথায়? কবে, কোন্ দেশে কার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানে না; তবে, এই মাত্র শোনা যায় যে, বারশত ত্রিশ সালের বন্যার সময়, বিষ্ণুরাম পণ্ডিত তাঁহাকে জলস্রোতে এক অপূর্ব্বরূপা রমণীর বক্ষঃস্থলে শুইয়া ভাসিয়া যাইতে দেখেন ও সযত্নে নিজগৃহে আনিয়া স্বপত্নী ভগবতীর সাহায্যে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। আত্মারামের উৎপত্তির বিষয় লেখক এই পর্য্যন্তই বলিয়াছেন; তাঁহার জন্মের গভীর রহস্যময় প্রহেলিকার দ্বার আর অধিক উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করেন নাই। না করিয়া এক প্রকার ভালই করিয়াছেন। কারণ, আত্মারামের জন্মের চতুর্দ্দিকে যে গ-

ভীর অন্ধকার,মানববুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র দীপের আ-লোকে তাহা উদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা করা এক প্রকার ধৃষ্টতা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিতেছি যে অনন্ত কাল স্রোতে জননী প্রকৃতির বুকে শুইয়া, মানব-শিশু ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে আর মানবের দৃষ্টি চলে না। তাই বোধ হয়,আমাদের গ্রন্থকার সে বিষয়ে অধিক চেষ্টা না করিয়া আত্মারামের জন্ম বৃত্তান্তে খানিকটা কবিত্বরস ঢালিয়া দিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

"নদীর উপকূলে, পিতার তপস্যা-কুটীর-প্রাঙ্গণে, প্রমুক্ত আকাশ তলে, বিশুদ্ধ বিমল সমীরণের কোলে", খেলা করিতে করিতে স্বভাবের শিশু আত্মারাম বাড়িতে লাগিলেন। প্রকৃতির দৃশ্য সমূহের মধ্যে ডুবিয়া তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মচৈতন্যের সত্তার আভাস লাভ করিলে মানব মনে যে সকল ভাব সঞ্জাত হয়, এই সময় আত্মারামের হৃদয়ে সে সমস্ত ভাবই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সু-প্রসিদ্ধ "হ্রদকবি" ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জগদ্‌-বিখ্যাত কাব্যে "ওয়াণ্ডরার" এরও মনো-বৃত্তি সমূহের বিকাশ ঠিক ঐরূপ অবস্থায় হইতে আরম্ভ হয়। পাঠক উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে,আমাদের কবি, ইংলণ্ডের সেই অমর রাজকবির কত নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন। তুলনার জন্য আমরা দুই স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারি-লাম না। আত্মারাম বলিতেছেন—"একদিন খুব ছেলে বেলায় নদীতটে বসিয়া আছি। দেখি যে পশ্চিম গগনে সূর্য্য ক্রমে নামিতে লাগিল এবং বিচিত্র কিরণ-ছটায় মেঘমালাকে অনুরঞ্জিত করিল ; এবং সেই প্রতিবিম্বরাশি তটিনীর মৃদু তরঙ্গে মিশিয়া কত সুন্দর ছবি আঁকিল। আহ্লাদভরে এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি আপনিও যেন সেই বিমিশ্র বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে পরিণত হইলাম।" (৪৭ পৃঃ)

Wordsworth এর Wanderer ও

"——————Beheld the Sun
Rise up and bathe the world in light ;
he looked——
Ocean and Earth, the solid frame of Earth
And Ocean's liquid mass in gladness lay
Beneath him. Far and wide the clouds
were touched
And in their silent faces could be read
Unutterable love—— —
-Sensation soul and form
All melted into him"—(Excursion, Bk. I).

আবার, "এই সঙ্গে সময়ের এবং আকা-শের অখণ্ড অসীমত্বে প্রাণ ডুবিয়া গেল।... মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ যাহা কিছু দেখিতাম, সকলের ভিতরেই অনন্তের অনন্তলীলা।"

Wanderer এর চতুর্দ্দিকেও

All things ....
Breathed immortality, revolving life
And greatness still revolving ; infinite ;
Their littleness was not ; the least of things
Seemed infinite."—(Excursion, Bk. I).

এরূপ আরও অনেক ভাবের ও ভাষার সাদৃশ্য আছে।

স্বভাবের বিদ্যালয় হইতে, পিতার অনু-রোধে, আত্মারাম পার্থিব বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে উচ্চশ্রেণীস্থ কালেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তথায় আত্মারামের মনের মত শিক্ষা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সকলেই বলে হয় কোনও রূপ জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় শিক্ষা কর; না হয় কেবল জড় জীবনহীন বিজ্ঞানের আলোচনা কর— জীবন্ত শাস্ত্রের নাম গন্ধও নাই, কেবল স্মরণ-শক্তির পরিচালনা। আত্মারাম বিস্মিত হই-লেন, বলিলেন "হরিবোল হরি! কেবলই উদর আর মস্তিক? আত্মা কৈ?" যাহা হউক, আত্মারাম একপ্রকার "লেখাপড়া" শেষ করিয়া কালেজ হইতে বাহির হন।

কালেজ হইতে বাহির হইয়াই আত্মারাম

সংসারে মগ্ন হইয়া যান। এই দুর্ব্বলতার জন্য তিনি কিন্তু ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার 'আমি' কে গালাগালি দেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন যে, বড় বড় ধার্ম্মিকের বৃহদায়ত ধর্ম্মপোত পর্য্যন্তও সংসার জলধির তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে। "অল্প দুই একজন অনেক লাঞ্ছনার পর পরপারে গিয়া উঠে। ...কামিনী কাঞ্চন দুইটী প্রধান কারিগর উন্নতিশীল যুবকদিগকে দুইদিক হইতে সবলে চপেটাঘাত করিতেছে।" ঠিক কবীরোক্তির প্রতিধ্বনি :—

"চলন চলন সবকোই কহে, পঁহুছে বিরলো কোয়।
এক কনক আরু কামিনী, দুস্তর ঘাটি দোয়॥"

আবার, যখন সংসার নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, তখন দেখিতেছেন—"বিধাতাপুরুষ এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কার কত দূর সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, নিঃস্বার্থভাব, তাহার পরীক্ষা লইতেছেন। তিনি দীন প্রজার ভিতরে বসিয়া রাজা জমিদারের, আশ্রিত ভৃত্যের ভিতরে বসিয়া প্রভুর, সহচর মিত্রের ভিতর থাকিয়া বন্ধুর, শিষ্যের ভিতরে থাকিয়া গুরুদেবের পরীক্ষা লইতেছেন।" (৬৯ পৃঃ)। হিন্দীতেও আছে :—

"রাম ঝারোখে বৈঠ কর সবকা মুজরা লেত।
জৈসি জিসকী চাকরী ঐ সাহি ভব দেত॥"

এই মোহহীন অবস্থায় আত্মারাম যাহা দেখিতেন, তাহাতেই মধুর, গম্ভীর, অপূর্ব্ব, অভিনব ভাব সমূহ সংশ্লিষ্ট থাকিত। এক রাত্রের কথা—

"তদনন্তর, ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে দেখিলাম, অনন্তের পদপ্রান্তে বিশ্বশিশু গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অনন্ত কোটী জীবকে ঘুম পাড়াইয়া বিধাতা একাকী সংগোপনে কি যেন মহাকামে ব্যস্ত রহিয়াছেন। এক বৎসর পরে যে ফুল ফল হইবে, তাহার বীজ এখন রোপণ করিতেছেন।...শত বৎসর পরে যে জাতির অধঃপতন হইবে, আজ লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে, তাহার মূল ভিত্তির একখানি ইষ্টক খসিয়া পড়িল। অনন্তের পদমূলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কাল পরস্পর কার্য্য কারণের বিনিময় করিতেছে, স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। তখন ভাবিলাম, রোজ রোজ রাত্রিকালে, নির্জ্জনে এই সব ব্যাপার হয়, আমি দেখিনা, কেবল ঘুমাইয়া কাটাই! হায়! আমি কি নির্ব্বোধ মন্দভাগ্য! আমার চক্ষের সম্মুখে হাতের কাছে, প্রতিদিন সৃষ্টিলীলার মহা সমারোহ কার্য্য, অথচ আমার চেতনা নাই।"

আবার এক রাত্রি শেষে তন্দ্রাবেশের কথা—

"নিদ্রামিশ্রিত চিন্তার ঘোরে দেখিলাম, পার্থিব জগতের অখণ্ড অবিভক্ত অস্তিত্ব আমাকে যেন তাহার সহিত মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে। ...ভাবিয়া দেখিলাম, পার্থিব পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের পবিত্র শরীরের অস্থি, মাংস, শোণিত রূপান্তর ভাবে স্থিতি করিতেছে। ...তাহাদের দেহের পরমাণু আমাদের এই ভৌতিক দেহে এবং পৃথিবীর ধূলি রাশিতে মিশিয়া আছে। এই পুরাতন আকাশে, পুরাতন বায়ুমণ্ডলে, পূর্ব্বতন ঋষি, যোগী, ভক্তবৃন্দের নিশ্বসিত পুণ্যবায়ু, তাঁহাদের মুখ বিনিঃসৃত ভগবদ্বন্দনার শব্দ তরঙ্গ, এখনও হিল্লোলিত হইতেছে; ঋষি-তপোবনে সত্যযুগে যে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিধ্বনি সহকারে অদ্যাবধি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোনও শক্তিই এককালে নিঃশেষিত হয় না।"

ভৌতিক দেহের চিরপরিবর্ত্তনশীলতার সম্বন্ধে আত্মারামের উল্লিখিত চিন্তা আমাদিগকে হ্যামলেটের উক্তি স্মরণ করাইল।—

"Imperial Cæsar dead and turned to clay
Might stop a hole to keep the cold away—
Oh, that that earth which kept the world in awe
Should patch a wall t'expel the winter flow."

আমাদের আত্মারামের এই চিন্তা যে কেবল কবি-কল্পনা, তাহা নহে; ইহা আপাততঃ অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বোধ হইলেও, কঠোর অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বৈ আর কিছুই নহে। বিশ্বাস না হয়, পাঠক বৈজ্ঞানিক শিরোমণি হক্সলির শরীর তত্ত্ব গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন :—

"And hence it is very possible that atoms which once formed an integral part

of the busy brain of Julius Cæsar may now enter into the composition of Cæsar the negro in Albama and of Cæsar, the house dog in an English homestead.—(Lessons in Elementary Physiology, p. 20.)

মোহ নিদ্রা ভঙ্গের পর,সংসার পরিত্যাগ করিয়া, আত্মারাম পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধ গভীর ও মধুর চিন্তা সমূহ চিত্তকে স্পর্শ করে। ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে পর, তাঁহার মনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কিছুদিনের জন্য, সর্ব্বসংশয়ী হৃদয়হীন নাস্তিকের মত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা তাঁহার হৃদয়কে অধিক দিন অধিকার করিতে পারে নাই। শীঘ্রই পুরুষকারের শক্তি তাঁহার মধ্যে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে পবিত্র আধ্যাত্মিক অনলে অভিষিক্ত করিল। দেবদূতগণ যেন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে এক বনে ধরিয়া লইয়া গেল। সেই বনের মধ্যে আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া তিনি কিছু কাল যাপন করেন। দেখিলেন যে, প্রথমে অন্তর মুখে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে "আমি" "আমি" শব্দে কর্ণ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সেই আমি শব্দের পরিবর্ত্তে "তুমি আছ, তুমি আছ," এই শব্দ এবং তাহার বজ্রগর্ভ নীরদনির্ঘোষবৎ গভীর প্রতিধ্বনি "আমি আছি,আমি আছি" যুগপৎ শ্রবণগোচর হয়। তখন দেহভার ও মায়া বিকার চলিয়া যায় ও যোগানন্দ প্রাপ্তি হয়। সংসারে আর বিরক্তি থাকে না,ঈশ্বরের এই লীলাভূমির প্রতেক পরমাণুকে প্রেমামৃতময় বলিয়া বোধ হয়।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আত্মারাম সংসারে ফিরিলেন; কিন্তু পৃথিবীর সমস্তই এখন তাঁহাকে সংএর খেলার ন্যায় বোধ হইল। সংসারের লোকের বৃথা অহংকার দেখিয়া তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্মশান ও সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই দুই স্থান দেখিয়া তাঁহার মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়—"কোথাও কেহ নাই, বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সমাধিক্ষেত্র, আশে পাশে চারি দিকে সমাধিস্তম্ভ। উন্মাদ পবন আলু থালু বেশে বৃক্ষকুঞ্জ লতামণ্ডপ কাঁপাইয়া হাহাকার রবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তৎসঙ্গে দলে দলে মৃতেরা আমার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। পরকালটা ইহকালের এত নিকটে, আগে তাহা জানিতাম না। শ্মশানের পরেই যে পরকাল, তাহা এখন দেখিতে পাইলাম।"

পাঠক পোপের ভাব স্মরণ করুন:—

"The cradle and the tomb, alas! so nigh,
To live is scarce distinguished from to die."

এই সময় পরলোক গমনের জন্য তাঁহার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মে। কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনাক্রমে আবার তিনি নিজের পুরাতন পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রেমপরিবার গঠন পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টাংশ নির্লিপ্ত সংসার কার্য্যে অতিবাহিত করিলেন।

এই শান্তিময় পরিবার মধ্যে বাস করিবার সময়, আত্মারাম সংসার ও সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক অক্ষরই জ্বলন্ত ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, অখণ্ড্য বেদবাণী স্বরূপ। প্রাচীন সাধুদিগের বচনের সঙ্গে অনেক স্থলে তাহা এরূপ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া হৃদয় আত্মারামকেও সেই অমরত্বের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে চায়। বাহুল্য ভয়ে

আমরা উহার একটীর অধিক উল্লেখ করিতে পারিব না। পাঠক গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই জাতীয় ভূরি ভূরি উদাহরণ নিজেই দেখিতে পাইবেন।

"জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এক স্থানে বাস, উভয়ে অভেদ, বিমিশ্র ;...অবিচ্ছেদে নিরন্তর হরি তোমার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছেন, তুমি হরিদ্বার হৃষিকেশ, তপোবন, কাশী, বৃন্দাবনে গেলে···কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? তোমার হৃদয় যে নিত্য বৃন্দাবন"!"

পাঠক ইহার সহিত বাবা নানকের এই বিখ্যাত মধুর ভজনটীর তুলনা করুন—

"কাহেরে বন খোজন জাঈ।
সরব নিবাসী সদা আলেপা তোহি সংগ সমাঈ॥
পুহুপ মধ্যে জিঁউবাস বসতু হ্যায়,মুকুর মাহিজস্ ছাঁঈ।
তয়েসে হি হরি বসৈ নিরন্তর ঘটহি খোজহু ভাঈ॥"

এই বৃদ্ধ বয়সে আত্মারাম যে এক কল্পনা রাজ্যের সৃষ্টি করেন,তাহাতেও অনেক বিশ্বাস-মূলক অভ্রান্ত সার সত্যের অবতারণা আছে। শরীরের রুগ্নাবস্থায় ও মৃত্যুর সময়,আত্মারাম যাহা বলিয়াছেন,তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি ও গভীর তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তেমনি তাঁহার করুণ ও হৃদয়স্পর্শী ভাব সমূহ অবলোকন করিয়া নয়ন আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, আত্মারাম দেহের নিকট বিদায় লইতেছেন—"বহু কষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া,তারপর,একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মৃতদেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল।...'হে আমার পাঞ্চভৌতিক তনু! তুমি এখন ভস্মের সহিত মিশিয়া যাও, আর এখন তোমায় কেহই আদর করিবে না। ভ্রাতঃ, তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি, কিছু মনে করিও না। ···সখে! এখন বিদায় গ্রহণ করি,প্রণাম হই। তুমি আমার ভগবানের শ্রীমন্দির, শ্রীহরির লীলা-ভবন; তোমার চরণে বার বার নমস্কার।" এইখানে আত্মারামের ইহকালের লীলা খেলার শেষ।

দেহের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর, মহাঝড় তুফানের ভিতর হাবুডুবু খাইতে খাইতে, আত্মারাম ভব সাগরের পারে গিয়া পঁহুছিলেন। সেই অবস্থায় যখন চৈতন্যের উদয় হইল, তখন নিজের একাকীত্ব ও নিরাকারত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছু বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আত্মারামের প্রথম পরলোক প্রবেশের ছবি বড়ই রমণীয়, বড়ই বিচিত্র। নিজের কিছুই পরিবর্ত্তন নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বেও যাহা, পরেও ঠিক তাহাই আছে, কেবল যেন এক ক্ষুদ্র নশ্বর দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি এক নিরাকার অতীন্দ্রিয়,অনন্ত,আধ্যাত্মিক জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। সে অবস্থায়, আলোক অন্ধকার নাই, দিবা রাত্রি নাই, সূর্য্য চন্দ্র নাই, দেশ কালের ব্যবধান কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়ও নাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপরসাদিও নাই; কেবল অবস্থা, জ্ঞান, ভাব আর ইচ্ছা। একে অন্যের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে,এক সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানকেন্দ্রের অভ্যন্তর দিয়া সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। সুতরাং যতদিন সেই মহৎ জ্ঞান কেন্দ্রের অভ্যন্তর দিয়া দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার অধিকার না জন্মে, ততদিন, জীবাত্মা আপনাকে একাকী বোধ করে। বাস্তবিক, আত্মারামের বর্ণিত পরলোকের বিবরণ ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় চমৎকৃত ও পুলকিত হয়,কল্পনা মুগ্ধ ও পাগল হইয়া উঠে। মর্ত্ত্য ও স্বর্গের মধ্যস্থলে একাকী, নিরাকার অবস্থায় অনন্ত অন্ধকারে মগ্ন হইয়া আত্মারাম নিজ অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক নীরবে,নিষ্পন্দভাবে আধ্যাত্মিক সুরে গাহিয়া ছিলেন—

'কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়!

সীমা অন্ত রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।
অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা
নাহি মানে,
বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে,তাঁহারেই প্রাণ চায়
সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার,
তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার, চমকে চপলা প্রায়।
কেহ নাই হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে হে
অনন্তস্বামী!
কোথায় রাখিব, বল কি করিব,লইয়ে আমি তোমায়॥
কাঁপাইয়া মহানাদে যোগধাম, "আমি আছি" রব উঠে
অবিরাম।
"তুমি আছ" "তুমি আছ" প্রাণারাম,আত্মারাম দেয় সায়।
(মিশ্র আলেয়া, একতালা)"

পাঠক ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—এমন গীত পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করিয়াছিলেন কি? এত গাম্ভীর্য্য, এত মাধুর্য্য,এত সারল্য, এত ব্যাকুলতা যে এই কয়টী কথার মধ্যে ঘনীভূত করা যায়, আমাদের ত এ বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে ছিল না। যাক্। চিরঞ্জীবের সঙ্গীতের বিষয় যতই কম বলা যায়, ততই ভাল।

দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া হঠাৎ নিরাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মারাম প্রথমতঃ ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু অচিরাৎ "বাণীর" স্বর শুনিতে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে বল ও সাহসের সঞ্চার হইল। এখন হইতে, এই বাণী তাঁহার সহচর হইলেন এবং সেই অজ্ঞাত দেশের সমস্ত বিষয় তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলেন। আত্মারামের সংসারসংস্কার তখনও দূর হয় নাই,বাসনা প্রবৃত্তি গুলিও প্রায় পূর্ব্ববৎ বলবতী। তবে দেহরূপ আশ্রয় স্থানের অভাবে তাহাদের কিছু কষ্ট, এই মাত্র। যাহা হউক, বাণীর আদেশ মতে আত্মারাম ইহাদিগকে আদৌ কাছে ঘেঁসিতে দিতেন না, এবং দূর হ, দূর হ, করিয়া সর্ব্বদা তাড়াইয়া দিতেন; সুতরাং ক্রমেই ইহাদের প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন অবস্থায় একদা আত্মারাম বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! কৈ? আমি আজোতো দেবতাদের শান্তিধাম দেখিতে পাইলাম না।

বাণী। এখনি শান্তিধাম? হয়েছে কি তোমার? ক্ষেপেছ নাকি?

আত্মারাম। কেন মহাশয়! আমি যে বিদেহ হইয়া পরলোকে আসিয়াছি।

বাণী। তবে ত মাথা একেবারে কিনে নিয়েছ! পরলোকে এলেই বুঝি অমনি তৎক্ষণাৎ শান্তিধাম দেখিতে পাবে?

আত্মা। সেই রূপইত শুনা ছিল। সকলেই বলে, পরলোকে আসিলেই স্বর্গ পাওয়া যায়।

বাণী। কোন্ মূর্খ এমন কথা বলে? ভারি যে তোমার উচ্চ আশা দেখি! দেহটী ত্যাগ করিলে—তাই কি ইচ্ছায় করিয়াছ?—আর অমনি দেবতাদের দলে মিশে স্বর্গভোগ! বা! বা! বা! বামন হয়ে চাঁদে হাত!"

এইরূপে বাণীর কাছে মুখ থাবা খাইয়া আত্মারাম নিরস্ত হইলেন। পরলোক ও স্বর্গ যে এক নহে, স্বতন্ত্র, তাহা বুঝিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পরলোক ও স্বর্গ একই কথা—মরিলেই লোকে স্বর্গে চলিয়া যায়।

এই অবস্থায় বাণীর সহিত আত্মারামের কথোপকথন গভীর চিন্তা ও উপদেশ পূর্ণ। আত্মারাম একে একে সংসারের সংস্কারগুলি বাণীর নিকট বলিতেছেন, আর বাণী তাহাদের অযথার্থতা প্রমাণিত করিয়া ক্রমশঃই আত্মারামকে সেই সকল সংস্কারের অতীত ভূমিতে তুলিতেছেন। এই গুরু-শিষ্য সংবাদ

বড়ই মধুর। বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ,গম্ভীর। তাহার সেই অনন্ত চিদাকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বাণী শিখাইতেছেন আর আত্মারাম শিখিতেছেন! যেমন গুরু তেমনি শিষ্য! আমাদের তুলসীদাস স্মরণ হইল ঃ—

"ব্রহ্ম তু, হোঁ জীব, তু ঠাকুর, হোঁ চেরো।
তাত, মাত, গুরু, সখা তু, সব বিধি হিত মেরো॥"

আমরা এই সারগর্ভ উপদেশের দুই এক স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিব।

"আত্মারাম। আচ্ছা মরিবার সময় কি সকলেরই মন ভাল হইয়া যায়?

বাণী। কারো কারো হয় না। এমন কঠিন এবং কুটিল আত্মা আছে যে, মরিবার আগে সে মরণ কামড় দেয়। তবে, চিত্তের গতি ফিরিবার ইহা একটা সুযোগ বটে। কেন না, বিধাতা প্রেরিত যে মৃত্যুরোগ, সে বড় কাজের লোক। সহস্র উপদেশ, সাধু দৃষ্টান্ত, দারিদ্র্য, কষ্ট, অবমাননায় যাহা না হয়, সাংঘাতিক পীড়ায় তাহা অতি সহজে হয়।"

পাঠক! E. B. Browningএর প্রসিদ্ধ কবিতা, The cry of the Humanএর প্রারম্ভ মিলাইয়া লউন ;—

"There is no God, the foolish saith,
But none, there is no sorrow;
And Nature oft the cry of faith
In bitter need will borrow.
Eyes that the preacher could not school,
By way-side graves are raised,
And men say 'God be pitiful!'
Who ne'er said 'God be praised'!"

আবার—"বাণী বলিলেন "স্বর্গ বহুদূরে এবং অতি নিকটে। ভগবচ্চিন্তা এবং ধ্যানে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে সশরীরেও স্বর্গভোগ হয়। ফলতঃ আত্মাই স্বর্গ এবং নরক।"

পাঠক মিল্টনের জগদ্বিখ্যাত পংক্তিদ্বয় স্মরণ হয়?

"The mind is its own place and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."

আবার যখন বাণী আত্মারামকে লইয়া পরলোকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে,তাঁহাকে বিষয়াকাঙ্ক্ষী বিবিধরূপ লোকের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন—যখন আত্মারাম দেখিলেন যে, বিলাসাভিলাষীরা নিজ নিজ স্বরূপত্বে বঞ্চিত হইয়া স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর আকারে পরিণত হইয়াছে, তখন তাহার ভিতর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর আদেশ যেন শুনা গেল—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।"

এইরূপ, ক্রমশঃই বাণীর উপদেশে আত্মারাম সংসারকে ভুলিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়-শশধর হইতে সংসারসংস্কাররূপ কালিমা-রেখা সকল যেমন একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল, ততই তাহার শোভা বাড়িতে আরম্ভ হইল। তাঁহার জ্ঞাতব্য, ভোক্তব্য,সমস্ত বিষয়ই যে নিরাকার, আর পার্থিব রূপ রসাদি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রূপ রসাদি যে মিষ্টতর ও ঘনতর, তাহা তিনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন! তাঁহার জ্ঞানের সীমা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জ্ঞান-পিপাসাও ততই প্রবলা হইতে লাগিল। এইরূপে যত পিপাসা, তত শান্তি, আবার যত শান্তি, ততই পিপাসার বৃদ্ধি। এতক্ষণে আত্মারাম মুক্তির সোজা রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছেন।

"তখন বাণী পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মধুরভাবে আমাকে বলিলেন, তোমাকে পুনর্ব্বার পবিত্রাত্মার নিকট অভিষিক্ত এবং দীক্ষিত হইতে হইবে। যে যে প্রণালীর ভিতর দিয়া একত্বে বিলীন হইতে হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে আত্মজ্ঞানাবতার সক্রেটিশ, তার পর নির্ব্বাণরূপী মহামুনি শাক্য, তার পর মহাযোগী মহাদেব, তদনন্তর ইচ্ছাযোগে সিদ্ধ বিশ্বাসী সুপুত্র যিশু, তার পর প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, সর্ব্বশেষে সামঞ্জস্যাবতার শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ; ক্রমে ইঁহাদের ভিতর দিয়া প্রতি জনকে আত্মস্থ করিয়া অনাদি আদি পরমতত্ত্বে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে।"

এতগূঢ়, এত গভীর, কথা শুনিয়া আত্মারাম চমকিলেন। তাঁহার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন যে, পরকাল প্রবেশ অবধি যিনি "বাণী" রূপে তাঁহাকে চালনা করিতেছিলেন, তিনি আর কেহই নহেন, পূর্ণ পরব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। তখন আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলেন—

"নাথ হে! কাঙাল জনে কি এত ফাঁকি দিতে হয়? এতক্ষণ কেন আমায় পরিচয় দিলে না বলিতে হইবে। তুমি না চিনাইলে কি আমি তোমায় চিনিতে পারি? মা, দেখা না দিলে দেখিতে পাই।"

তদনন্তর, ব্রহ্মোক্ত সেই পবিত্র উপায়ে আত্মারাম মহামিলন-মহাযোগ লাভ করিলেন। ব্রহ্মকৃপাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পরব্রহ্মের মহাসত্ত্বায় ফিরিয়া আসিলেন। তথায় আসিতেই,তাঁহার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল না; কিন্তু নির্ব্বাণের ইচ্ছা স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হইল।

"অনন্তর নিত্যের অসীম অনন্ত গভীরতার মধ্যে নামিয়া দেখি যে, ব্যক্তিত্ব টুকু ক্রমে গলিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। লয় হয় হয়, এমন সময় বলিলাম, 'ঠাকুর! এ করিলে কি? অনন্ত যে আমায় উদরস্থ করিয়া ফেলিল!' ক্ষণকাল পরে, আর কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না; মহানির্ব্বাণে আপাততঃ জীবোপাধি লয়প্রাপ্ত হইল। যে অবস্থায় আমার আমিত্ব নাই, তাহার কথা কেই বা বলিবে আর কেই বা তাহা বুঝিতে পারিবে? এতকাল পরে, আমার পুরাতন চিরপরিচিত, হারাধন আমিত্বের বিসর্জ্জন হইল।"

এইখানে আমিত্বের বিসর্জ্জন হইল, কিন্তু আত্মারামের হইল না। তিনি অতলস্পর্শ, অনন্ত, সচ্চিদানন্দময়, সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে, দেবতাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন ও অমরাত্মা ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পুরুষপ্রকৃতি মিশ্রিত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুগলমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চিদানন্দসাগরে বিলীন হইয়া গেলেন।

এইরূপে আত্মারামের সহিত আত্মারামের জীবনীর অবসান হইয়াছে। অজ্ঞাত প্রকৃতি আত্মারাম অনন্তের অন্ধকার হইতে আসিয়া আবার অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছেন। কেবল তাঁহার ইহলোক ও পরলোকের আশ্চর্য্য ও বিচিত্র লীলা বিবরণ আমাদের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে মানবজীবন কি রহস্যময় প্রহেলিকা! ক্রমাগতই চলিতেছি, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অনন্তকাল অনবরতই চলিতেছি। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হয় না। সম্মুখে সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকারময় যবনিকা পড়িয়া রহিয়াছে। সেই যবনিকার অন্তরালে অদৃষ্টের সহিত মিলিত হইয়া কাল খাটিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে,—কাহারও পথে কণ্টক, কাহারও বা পথে পুষ্প ছড়াইতেছে; কাহারও বা চিতা সাজাইতেছে, কাহারও জন্য বা সুখদ সুকোমল শয্যা রচনা করিতেছে। একটু ফাঁক নাই, একটু আলোক নাই; নিবিড় সূচিভেদ্য অন্ধকার! এই অন্ধকারে আমাদের আলোক দেখাইবেন বলিয়াই বুঝি আত্মারাম আপনার লীলাকথা মর্ত্ত্যে ফেলিয়া গিয়াছেন!

বাস্তবিক চিরঞ্জীবের "ইহকাল ও পরকাল" এক অদ্ভুত, অমূল্য গ্রন্থ। ইহার অনেক স্থান পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় চমকিয়া উঠে, আত্মার ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। আবার গ্রন্থের প্রত্যেক পত্রেই, ভাবুক পাঠকের অশ্রুজলের চিহ্ন থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহকাল পরকাল কেবল উচ্চদরের কবিত্বশক্তি ও সর্ব্বব্যাপিনী কল্পনার লীলা ভূমি নহে। ইহা অতি পবিত্র, গভীর, সুমহৎ, আত্মতত্ত্বমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ। একদিকে,সর্ব্বসংশয়ী,হৃদয়হীন নাস্তিকতার কঠিন প্রস্তরময় গিরি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া

রহিয়াছে, অপরদিকে, অন্ধ বিশ্বাসের সুগভীর তিমিরাচ্ছন্ন গহ্বর মুখ ব্যাদান করিয়া আছে; এই দুয়ের মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব অদ্ভুত সাহসের সহিত বিজ্ঞানের হাল ধরিয়া, চিরঞ্জীব আপনার চিত্ততরণী প্রবল চিন্তাস্রোতে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহা নক্ষত্র বেগে নির্ভয়ে ছুটিতেছে; আর মাঝি হাল টানিতে টানিতে প্রাণ খুলিয়া, গলা ছাড়িয়া, ব্রহ্মনাম গান করিতেছেন—কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, কি রমণীয় ছবি!

বলিতে কি, এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ইহার ভাব সমূহ আমাদের হৃদয়ের সহিত যত দূর মিশিয়া গিয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের অপর কোনও গ্রন্থের ভাবই তত শীঘ্র ও তত দূর গভীরভাবে আমাদের চিত্তস্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। পরিশেষে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ পাঠ করা প্রত্যেক বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। আমাদের ইচ্ছা যে, ইহকাল ও পরকাল প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসীর গৃহে অত্যাবশ্যকীয় ঘরকরণার দ্রব্যের ন্যায়—খ্রীষ্টানের ঘরে বাইবেলের ন্যায়—সযত্নে সংরক্ষিত হউক।

আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে, এতাদৃশ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে জঠোর (১০৩পৃঃ) বন্ধুক (১০৩পৃঃ) ভগবদেচ্ছার (২০৩পৃঃ) নিরক্ত বৈরাগ্য (৭৯পৃঃ) দ্বার্থ (৬৬পৃঃ) দুর্ণিবার (৮০পৃঃ) ইত্যাদি কতকগুলি অশুদ্ধ শব্দ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে গ্রন্থের ভাব এবং অর্থ এত উচ্চ, তাহাতে ভাষার এই সামান্য ত্রুটি, আমাদের মতে, দোষ বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে না। ভারতগৌরব কালিদাস কহিয়াছেন:—

একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

গীতার প্রামাণ্য। (২)

সগুণ ব্রহ্ম কেমন স্থূলরূপে উপাস্য, তাহা আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি; এইরূপে তিনি সম্ভজনীয়। সগুণের সূক্ষ্মমূর্ত্তি এক্ষণে সূচিত হইতেছে; এই মূর্ত্তি ধ্যানযোগে প্রতীত।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগেযুগে"।

"সম্ভবামি যুগেযুগে" বলিলে যে কেবল স্থূল যুগাবতার বুঝায়, এমত নহে, শ্রীধর বলেন—

"যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ।"

যুগে যুগে শব্দের অর্থ সেই সেই অবসরে বা কালে। কোন্ কালে? যে কালে পাপের বিনাশ সাধন হয় এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হয়। সেই অবসরেই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এ কথায় ভগবানের আবির্ভাবের কাল মাত্র নির্ণীত হইল। সে কাল প্রতি জীবে সম্ভব, প্রতি দেশে সম্ভব এবং প্রতি বৎসরে বা দিনে সম্ভব।

কিন্তু তিনি কি বাস্তবিক শরীর ধারণ করেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের ন্যায় পাপপুণ্যের ভোগ জন্য যাঁহার প্রাকৃত শরীরের আবশ্যকতা নাই, এবং সেই জন্য যিনি মনুষ্যের ন্যায় জন্ম রহিত—"অজ" তাঁহার কিরূপ শরীর হইবে? গীতা বলিতেছেন, তিনি যদিও অজ এবং অব্যয়, তথাচ তিনি বলিয়াছেন যে, আমি—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

শ্রীধর এইরূপ অর্থ করেন:—

স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।

তিনি সত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ সত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন।

শ্রীধর বলিলেন যে, তিনি সত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। যদি সত্বগুণের কোন মূর্ত্তি থাকে, তবে সেই মূর্ত্তি ভগবানের। সে মূর্ত্তি কোথায় অধিষ্ঠিত? না, সত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে। তবেই বুঝা যাইতেছে, মনুষ্যের সত্ব প্রকৃতিতে তিনি আবির্ভূত হয়েন। সেই সত্বপ্রকৃতির যে সমস্ত সাত্বিক চেষ্টা ও প্রযত্ন, তাহাই সাত্বিক শরীরের চেষ্টা। সেই সাত্বিকমূর্ত্তি কিরূপ, শ্রুতি তাহার পরিচয় দিতেছেন—

"আবির্ভাবাতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥"

যাঁহার আবির্ভাব আছে অথচ তিরোভাব নাই, সেই মূর্ত্তিই স্বপদানুগা। তামসী মূর্ত্তি বিজ্ঞানঘন, রাজসীমূর্ত্তি আনন্দঘন এবং সাত্বিকীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, শ্রুতি অনুসারে সত্বমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ। টীকাকার বিশ্বেশ্বর বলেন যে, উক্ত তামসীমূর্ত্তি কৈলাসে, রাজসী রূপ সত্যলোকে এবং সাত্বিকীরূপ বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান আছে। বৈকুণ্ঠে তাঁহার গোপালমূর্ত্তিই বর্ত্তমান। তবেই, সাত্বিকীমূর্ত্তি গোপালমূর্ত্তি। গোপাল মূর্ত্তি কি? শ্রুতিতে গোপালমূর্ত্তি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।

"যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্তমালাতি স গোপালো ভবতি ওঁ তৎ সৎ সোঽহং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোহমোস্তদ্ গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতং সোঽহমিত্যাত্মানমাদায় মনসৈবমুং কুর্য্যাৎ আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি স এবাব্যক্তোনন্তো নিত্যো গোপালঃ।"

যিনি গোপগণ, অর্থাৎ জীব সকলকে আত্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই গোপাল বলা যায়। "ওঁ ও তৎ" এই শব্দ দ্বয়ের বাচ্য যে পরব্রহ্ম "তাহাই আমি" এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া "নিত্যানন্দরূপী কৃষ্ণই আমি" এইরূপ ভাবনা করিবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং তিনিই গোপাল।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দরূপ। সেই সচ্চিদানন্দই মানুষী সাত্বিকীমূর্ত্তি। গোপালই মানুষী সাত্বিকী মূর্ত্তি। সেই গোপালই "গোপীজনবল্লভ' শ্রীকৃষ্ণ। গোপীজনবল্লভ কি? শ্রুতি বলিতেছেন :—

"তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বিদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া যেতি।"

যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী। পালনশক্তি সমূহই গোপী। সেই পালনশক্তি—অবিদ্যাকলার তিনি বল্লভ, অবিদ্যার প্রেরক ঈশ্বর এবং তিনিই অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান। সুতরাং তাঁহাকেই গোপীজনবল্লভ বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতিজ মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত গোপীজন শব্দে জগৎ জানা যায়। সেই জগতের স্বামীই গোপীজনবল্লভ। সেই গোপীজনবল্লভের সাত্বিকামূর্ত্তি কিরূপ, বেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষৎ বলিতেছেন :—

সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং॥

গোপালতাপনী *। পূর্ব্বভাগ-১৩ শ্লোক।

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং" কি? টীকাকার অর্থ করেন :—

সৎ নির্ম্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তং।

* শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষদে" গোপাল তাপনীর প্রামাণ্য দৃষ্ট হইবে। সেই উপনিষৎ যে ১০৮ খানি প্রধান বেদান্ত বা উপনিষদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোপাল তাপনী গণনীয়।

যাঁহাকে নির্ম্মল হৃদ্‌কমলে লাভ করা যায়।

"মেঘাভং" কি? টীকাকার বিশ্বেশ্বর অর্থ করেন :—

মেঘা উপতপ্ত মনসি সচ্চিদানন্দ স্বরূপা আভা যস্য তং।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ বৈদ্যুতিক আভাবিশিষ্ট হইয়া তিনি উত্তপ্ত মনে শান্তি প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণের ধাত্বার্থই সচ্চিদানন্দ। সেই আনন্দস্বরূপ সর্ব্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন। সাত্বিক আনন্দ যে কি অমৃতময় পদার্থ, তাহা কেবল ধর্ম্মশীলেরাই বিশেষরূপে জানেন। আর কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সেই আনন্দস্বরূপ। যিনি সেই রূপে দীপ্তি পান, তাঁহার উজ্জ্বলতা বিদ্যুৎ সমান। সেইজন্য তিনি পীতাম্বর। টীকাকার বলেন :—

বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশম্ অম্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশ।

তিনি স্বপ্রকাশ ও চিদাকাশ স্বরূপ। যাঁহাকে প্রকাশ করিতে কিছুরই আবশ্যকতা হয় না, যিনি নিজ চিদস্বরূপে আপনিই প্রকাশিত হইয়া আছেন, তিনিই পীতাম্বর।

"দ্বিভুজং" কি? বিশ্বেশ্বর বলিতেছেন :—

"দ্বৌ হিরণ্যগর্ভবিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মুক্তিকর্ম্মিহেতুভূতৌ হস্তৌ যস্য তং দ্বিভুজং।"

হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষরূপ তাঁহার দুই হস্ত। ইংরাজীতে যাহা Material cause এবং Formal cause বলে, যাহা উপনিষদে কারণব্রহ্ম এবং কার্য্যব্রহ্ম রূপে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই দুই হস্ত স্বরূপ। তাহাই জগৎসৃষ্টির কারণ, এবং জগতের মূর্ত্তির হেতু। একজন জগতের উপদান দিতেছেন, অন্যজন জগতের মূর্ত্তি দিতেছেন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে এই হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

"জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং'' কি? যিনি "তত্বমসি" রূপে সচ্চিদানন্দৈক রসাকার বৃত্তিতে প্রকাশমান তিনি জ্ঞানমুদ্রাঢ্য। বিশ্বেশ্বরের অর্থ এই—

"জ্ঞানমুদ্রাতৎ ত্বমসীতি সচ্চিদানন্দৈক রসাকারবৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানং।"

আর "বনমালিনমীশ্বরং" কি? তিনি শুধু জ্ঞানমুদ্রাধারী নয়, তিনি বনমালীরূপে সকলের ঈশ্বর। বনমালীর ব্যাখ্যা বিশ্বেশ্বর এইরূপ করেন :—

"বনে বিবিক্ত প্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে।"

তিনি নির্জ্জন প্রদেশে স্বীয় ভক্তগণের নিকট প্রকাশমান।

আর "ঈশ্বরং'' কি? না, "ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্" তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সকলেরই নিয়ন্তা।

এই সত্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল পুণ্ডরীকনয়ন, জলধরকান্তি পীতবসন, দ্বিভুজমূর্ত্তি, জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালাবিভূষিত এবং সকলের ঈশ্বর।"

এই তাঁহার সত্বমূর্ত্তি। গোপালতাপনী এবং ব্রহ্মসংহিতায় এই মূর্ত্তির পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে তিনি কেবল নির্ম্মল ও পবিত্র হৃদয়ে প্রকাশিত। এই শরীর ও মূর্ত্তি মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষে প্রকাশিত নহে। প্রাকৃত শরীর মনুষ্যের স্থূলদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সত্বশরীর সেরূপ প্রকাশিত নহে। ভগবানের এই শরীর কেবল জ্ঞানী ভক্তেরাই দেখিতে পান। যিনি জগতের পালনকর্ত্তারূপে বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহাকে ধ্যানযোগে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই ভক্তই কেবল তাঁহাকে গোপালরূপে দেখিতে পান। এইজন্য তাঁহার নাম গোবিন্দ। বিশ্বেশ্বর বৈদিক গোপাল বিদ্যায় গোবিন্দ শব্দের এইরূপ অর্থ করেন :—

"গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ।

যিনি তত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ তিনিই গোবিন্দ। অতএব এই জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে সেই গোপালরূপ গোবিন্দকে দেখিতে পাওয়া

যায় না। তিনি গোপবেশেই জগতের পালন করিতেছেন। তাহাই তাঁহার মধুর সত্ত্বমূর্ত্তি।

তিনি একবেশে ধর্ম্মের পালন করেন, অন্যবেশে পাপের বিনাশ সাধন করেন। সে বেশ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি * নারায়ণ। সেইবেশে তিনি পূর্ণশক্তিসম্পন্ন হইয়া শঙ্খ (পঞ্চভূত) চক্র (বালস্বরূপ মন) গদা (আদ্যা মায়া) পদ্ম (বিশ্ব) ধারী হয়েন। তখন তিনি শ্রীধরের মতে :—

"সম্যগ্ প্রচ্যুত জ্ঞান বলবীর্য্যাদি শক্তেব ভবানি"

এই মূর্ত্তিরও সমুদায় রূপকময় ব্যাখ্যা বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার দশমে ভগবানের যে সমস্ত বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তদ্দ্বারাই জগতের শাসন ও পালন করিতেছেন। তিনি এই ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিতে সহস্র-হস্ত। সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহার বলবীর্য্যশক্তি। তাহাতেই তিনি জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্ব পার্থিব বলকে দৈববলে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন, পৃথিবীর পাপবল ধ্বংস করিতেছেন,এবং অসুর সকলের বিনাশ সাধন করিতেছেন। যাহা মনুষ্যের অদৃষ্ট, তাহা ভগবানের সুদর্শনচক্র। এই দেববল ও আসুরিক বল গীতার চতুর্দ্দশে সুবিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা তিনি নিজে অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে মূর্ত্তি সহস্র বিভূতি-পূর্ণ সহস্র-বদন। অর্জ্জুন সেই সহস্র বদন যুক্ত ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া তাহা উপসংহার করিতে বলিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তিতে জগতের সমস্ত বিভূতি বলই দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা ভগবানের অনন্ত বা শেষ-মূর্ত্তি। অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অনন্তদেশে ব্যাপ্ত,সেই তাঁহার শেষ মূর্ত্তি। সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহগণই অনন্ত নাগের ফণাস্থিত মণিস্বরূপ দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এ মূর্ত্তিও চর্ম্ম চক্ষে পরিদৃশ্যমান নহে। যাঁহার দিব্য-চক্ষু আছে, তিনিই তাহা দেখিতে পান। সগুণ ঈশ্বরের সকল মূর্ত্তিই ধ্যানজ। কেবল ধ্যানযোগেই সগুণ ব্রহ্মদর্শন ঘটে। সুতরাং চর্ম্মচক্ষে যাহা প্রতীত নহে, তাহাকে শরীর বল, সে শরীরের অর্থ যাহা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তাহা যে কেবল রূপক মাত্র তাহা বলা বাহুল্য। সেই বলবীর্য্যশালী পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিও জ্ঞানচক্ষে প্রতীত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ যেরূপে জগতে অধিষ্ঠিত ও আবির্ভূত হয়েন, সেই অবতীর্ণ মূর্ত্তি কেবল স্বতঃ প্রমাণেই সিদ্ধ। তাঁহার দিব্য শরীর স্থূলদর্শী অজ্ঞগণের নিকট সম্ভব যুক্তিতে প্রামাণ্য এবং সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার।

ভগবানের মূর্ত্তির কথা শেষ হইল। এক্ষণে শ্রীধরোক্ত শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির কথা। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র। এই বসুদেব কি, তাহা পুরাণই বলিতেছেন :—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতঃ। ৪স্ক—৩অ।

বসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায়। কারণ,নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেবই প্রকাশিত হন। এই নিমিত্ত সেই সত্ত্ব স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বসুদেবকে আমি মন দ্বারা সতত নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করি।

তন্ত্রেও ঐ কথা :—

তুরীয়ং ব্রহ্মনির্ব্বাণং মহাবিষ্ণুশ্চিন্ময়তে।
সদা জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং কার্য্যকারণবর্জ্জিতং।

* গোপাল তাপনী শ্রুতিতে চতুর্ভুজের ব্যাখ্যা এই :—
"সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহংকারশ্চতুর্ভুজঃ।"

নিরীহং নিশ্চলং দেবী সত্ততং বিষ্ণুরূপধৃক্‌।
বসুদেবোহপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাত্মক সদা॥

যোগশাস্ত্রে যাহাকে তুরীয় নির্ব্বাণ অবস্থা বলে, সেই অবস্থাই মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু নির্গুণ ও অক্ষয় ব্রহ্ম। এই মহাবিষ্ণু আবার সগুণ এবং অন্তর্যামীরূপে পরমাত্মতত্ত্ব। সেই বিষ্ণুরই অংশ আত্মরূপী বসুদেব।

বাস্তবিক,বাসুদেব বা বসুদেব পুত্র আর কিছুই নহে, তাহা আত্মার সাত্ত্বিক অবস্থা সম্ভূত বিশেষ অবস্থা মাত্র। সেই সাত্ত্বিক অবস্থার সহিত যখন প্রকৃত ভক্তিরূপিণী দেবকীর সম্মিলন হয়—সম্মিলন হয় যেমন পতির সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে পত্নীর সম্মিলন—তখন তাহার ফল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের আবির্ভাব। তাই শ্রীধর বলিয়াছেন যে,তিনি সত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তাই তাঁহার নাম বাসুদেব। বসুদেবের ব্যুৎপত্তি কি?

বহুনিরত্নৈশ্চ দ্যোতয়তি বসুদেবঃ।

ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানাদি রত্ন যে অবস্থার আশ্রয়ে প্রকটিত হয়, আত্মার সেই অবস্থার নাম বসুদেব। আর বাসুদেব কি? যাহা চরাচর জগতে পরমাত্মরূপে সর্ব্বব্যাপ্ত,তাহাই বাসুদেব। সুতরাং,পৌরাণিক কৃষ্ণজন্মবৃত্তান্ত কেবল চিত্তাবস্থার স্থূল রূপক মাত্র। সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণ সেই ভাবেই পৌরাণিক বৃত্তান্ত দেখিয়া বেদের সহিত পুরাণের একতা প্রতিপাদন করেন।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা। জন্মের পর তাঁহার কর্ম্মের কথা। গীতা বলিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্ম সকলও দিব্য। দিব্যজন্ম কিরূপ, তাহা দেখাইয়াছি, এক্ষণে দিব্যকর্ম্ম কিরূপ, তাহা দেখাইব।

পুরাণে আমরা কৃষ্ণলীলা এই প্রকারে বিভক্ত দেখিতে পাই,—ব্রজলীলা,মথুরালীলা, দ্বারকালীলা এবং কুরুক্ষেত্রলীলা। জ্ঞানিগণ এই লীলাদিও আত্মার সাত্ত্বিক অবস্থাবিশেষরূপে প্রতীত করেন। সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যখন চিত্ত আধ্যাত্মিক যোগ পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার আরাধনার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়। এই সমস্ত সাত্ত্বিক অবস্থার প্রতীতি একাদিক্রমে কৃষ্ণলীলারূপে পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। গীতার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগও তাহাই। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন।

কঠোপনিষদ বলিতেছেন—
"পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্র চেতসঃ।"

জন্মরহিত ও অবক্রচেতা (অর্থাৎ নিত্য-প্রকাশস্বরূপ) আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। যে সত্বগুণ দেহকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন ভেদে নানা অবস্থায় প্রকটিত হয়। কোন লেখক বলেন—

মথুরা জীবের সুষুপ্তি, বৃন্দাবন স্বপ্নাবস্থা এবং দ্বারকা জাগ্রতাবস্থা। স্বয়ং ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থা। সুষুপ্তি মনোবুদ্ধ্যাদির জড়াবস্থা। বাহ্যত্যাগও অন্তক্রিয়াবান্‌ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। ভোগ চৈতন্যাদিগত অবস্থাকে জাগ্রদাবস্থা কহে।

দ্বারকালীলায় আত্মা সমস্ত পাপাসুরকে দমন এবং রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সত্বগুণের (বসুদেবের) আধিপত্য পরিস্থাপন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মবীরত্ব, শক্তি ও আন্তরিক বলবীর্য্যের পরিচয় হয়। পৌরাণিক দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও বলবীর্য্যের প্রকাশস্থান। সমস্ত রিপুকুলকে পরাজয় করিয়া তিনি দ্বারকা সংস্কার করিয়াছিলেন। এই দ্বারকা-সংস্কারই চিত্তসংস্কার। এই দ্বারকাবস্থায় আত্মা কর্ম্মবীর। কর্ম্মবীরত্ব

লাভ করিয়া যখন চিত্ত জ্ঞানাধিকারী হয়, তখনও তাহার সংসারাসক্তি সমুদায় শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। তথাপি কংসরূপী ক্রূর পাপ সংসারাসক্তি দ্বারা সত্বগুণকে সংহার করিতে চাহে। জ্ঞানযোগ দ্বারা সংসারাসক্তি একেবারে সংহার করিতে পারিলে চিত্তের অক্রূরতা হেতু ব্রহ্মদর্শন ঘটে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন সূর্য্যের দর্শন, আত্মাতে তেমনি পরমাত্মা সাক্ষাৎকার। ধ্যান যোগের এই উৎকট চেষ্টার নাম মথুরালীলা। মথুরা শব্দের অর্থ উপনিষদ বলেন ঃ—

"মথ্যাতেতু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥"
গোপালতাপনী।

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসার মন্থন করিয়া যে স্থানে সর্ব্বসারভূত কৃষ্ণ লব্ধ হইয়াছে, সেই ধামকে মথুরা কহে।

জ্ঞানযোগ দ্বারা কর্ম্মযোগরূপ কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মাত্মার বিজয়লাভ করাই কুরুক্ষেত্র লীলা। কুরুক্ষেত্রেও এই জ্ঞানকাণ্ড। যে পবিত্র ক্ষেত্র সর্ব্বভূতের মোক্ষপ্রদ তাহাই কুরুক্ষেত্র। শ্রুতি বলিতেছে।

"কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং
ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥"—রামতাপনী।

আর হৃদয়ের সেই ধামই ব্রজপুরী, যে ধামে ভগবান্ রমণ করেন। ব্রজ শব্দের অর্থই বিহার। এ বিহার ষড়রসে রমণ। জীবের সাত্বিক প্রেমানন্দে মাতিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবান্ রমণ করেন। জীবের সেই আনন্দরূপিণী হ্লাদিনী শক্তিই রাধিকা। রাধিকা—শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ আত্মা। রাধিকা বৈষ্ণবগ্রন্থে "মহাভাব স্বরূপা" রূপে উক্ত হইয়াছেন *। সেই হ্লাদিনী শক্তিকে যাহা যাহা পরিপুষ্ট করে, যাহা প্রেমানন্দকে সঞ্চারিত করে, তাহারাই রাধিকার অষ্ট সহচরী (Accessories) আনন্দের অনুকূলা সহচরী সাত্বিক সঙ্গীত, আমোদ, চিত্র, শোভা, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, বাগ্‌বিন্যাস প্রভৃতি ললিতা, চিত্রলেখা, বিশাখা কান্তি শৈব্যা বৃন্দাদি। আর এই প্রেমানন্দ যাহা দ্বারা জাগরিত হয়, তাহাই তাহার Excitants। তাহা শ্রীকৃষ্ণের কমল কান্তি। কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার আনন্দ। রাধা আনন্দে বিভোর। সংসার ভুলিয়া কৃষ্ণরসে প্রমত্তা। বাসন্তী শোভায় রাধা কৃষ্ণকে দেখেন, নবজলধর কান্তিতে তিনি মুগ্ধা হন; ময়ূরপুচ্ছে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন। এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের তনু, রাধার আনন্দরসের Excitants।

যে আত্মা এই আনন্দে ভোর, সেই আত্মাই সংসার ভয় হইতে মুক্ত। তাহাকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। তাহা মুক্তি পদে উপনীত হয়। যিনি ব্রহ্মেতে রমণ করেন,তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই অর্থেই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

ভগবানের জন্মকর্ম্ম জানিলে কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? গীতা পরশ্লোকেই সেই উপায় বলিয়া দিতেছেন ঃ—

"বীতরাগ ভয় ক্রোধো মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥"

যাহাদের অনুরাগ ভয় ক্রোধ সমস্তই অপগত হয় এবং সেই হেতু চিত্ত স্থির হয়; সেই শুদ্ধ ও স্থিরচিত্তে যাহারা আমাকেই আশ্রয় করেন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাই সেই আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্যলাভ করেন।

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ দেখ।

গীতা এই স্থানে সেই ত্রিবিধ উপায় বলিয়া গেলেন—দ্বারকা মথুরা ও কুরুক্ষেত্র এবং ব্রজভাব। রাগ ভয় ক্রোধাদি অপগত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি ও স্থৈর্য্য জন্মিলেই দ্বারকা-লালা জানিতে পারা যায়। আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা মথুরা ও কুরুক্ষেত্র উপলব্ধ। আর সাযুজ্য লাভই মদ্ভাবপ্রাপ্তি ব্রজরমণ। গীতা বলিতেছেন, এই সমস্ত লীলা যিনি প্রকৃতপক্ষে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হয়েন। স্বপ্নেশ্বর বলেন, তাঁহার লীলাদির জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয় না। কারণ, যাঁহারা স্থূলদর্শী এবং পুরাণের স্থূল অবতার-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে লীলা-দির জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু নহে। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী এবং বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মদর্শন ঘটে। তাঁহারা আত্মহৃদয়েই কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বিকাশ দেখিতে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্মের দিব্যজ্ঞান বশতঃ তাঁহাদের সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে এবং মুক্তিলাভ হয়। অতএব জ্ঞানিগণের নিকট ঐ জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ।

গীতা বলিয়াছেনঃ—

"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ১৪ অ—২৭

যেমন ঘনীভূত প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, তেমতি আমি ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি। এবং নিত্যমুক্তত্ব হেতু আমিই নিত্য মোক্ষের প্রতিষ্ঠা; শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকত্ব হেতু আমিই মোক্ষসাধন সনাতন ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি; পরমানন্দ স্বরূপত্ব হেতু আমিই ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা। অতএব, মৎসেবক পুরুষ অবশ্যই মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পৌরাণিক স্থূল অবতারবাদ যে প্রমাণে স্থূলদর্শিগণ গ্রহণ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা সম্ভবযুক্তি এবং ঐতিহ্য প্রমাণে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণের নিকট বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব অন্য প্রমাণে গ্রাহ্য। সে প্রমাণ আত্মানু-ভূতি, সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ অপেক্ষা উচ্চতর প্রমাণ আর কিছুই নাই।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যেরূপ, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত পৌরাণিক স্থূল অবতারবাদের যেরূপ সামান্য বিভিন্নতা, তাহা বোধ হয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী রূপে সকলের অন্তরেই বর্ত্তমান। সাধকের হৃদয়ে তিনি সাধনা প্রভাবে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েন। তাঁহার সেই আবির্ভাবই জন্ম এবং তাঁহার লীলাদি সাত্ত্বিক ভাবের বিরাট বিকাশ। এই সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ সমস্ত একাদিক্রমে স্থূল লীলায় প্রদর্শিত হই-য়াছে। তাই, গীতার যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, সে স্থলে ব্যাস অর্জ্জুনের মুখ দিয়া তাঁহার জন্ম কর্ম্মের সহিত মানুষী জন্ম কর্ম্মের যে আকাশ-পাতাল ভেদ, তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যখন ব্যক্ত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম সম-স্তই দিব্য, তখন অর্জ্জুন সে কথার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তবে নিরস্ত হইলেন। স্বপ্নেশ্বর সামান্য-বুদ্ধি ভক্তজনগণের জন্য বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ দিব্য শরীর গ্রহণ করেন এবং সেই শরীরের চেষ্টিত সকল দিব্য কর্ম্ম। একথা সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শিগণের নিকট তখন অর্থপূর্ণ হয়, যখন তাহা বৈদিক কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত সমঞ্জসীভূত করা হয়। নহিলে তাহার প্রকৃত অর্থ মানুষী-বুদ্ধিতে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। ব্যাস এই কৌশলে দুই দিক বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

এখন কথা এই, গীতার কৃষ্ণতত্ত্ব যে সূক্ষ্মদর্শিগণের নিকট স্থূল অবতারবাদ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, যাহা বৈদিক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন, সেই সূক্ষ্মদর্শিগণ গীতাকে ভগবদ্বাক্য বলিবেন কি রূপে? ব্যাস বলিয়াছেন, গীতা উপনিষদ্বাক্য; শাণ্ডিল্য বলেন, গীতা ভগবদ্বাক্য। গীতা ভগবদ্বাক্য বলিয়া তাহা বেদবৎ প্রামাণ্য। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্তর্যামী ভগবান্ হয়েন, তবে গীতোপদেশ সকল ভগবানের উপদেশ কি রূপে? একথার প্রমাণ গীতা নিজেই দিয়াছেন। ভগবান্ বলিতেছেন--

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"—গীতা—১৫অ—১৫।

আমিই সর্ব্ববেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য, অমিই বেদান্তকৃৎ এবং বেদার্থবেত্তা। সর্ব্ববেদ দ্বারা আমি জ্ঞাতব্য কিরূপে? শ্রীধর অর্থ করেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তৎতদ্দেবতারূপেণাহমেব বেদ্যঃ।"

বেদদ্বারা তত্তদ্দেবতারূপে আমি বেদ্য। তবেই শ্রীধর বলেন, বেদের দেবতা সকলকে যিনি ভালরূপে বুঝিয়াছেন, তিনিই পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। বৈদিক দেবতা সমস্ত পরমেশ্বরেরই অভেদ মূর্ত্তি মাত্র। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ২১ ও ২২ শ্লোকদ্বয় এবং নবমের ২০ ও ২১ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীধরের টীকার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে একথার অভিপ্রায় আরও বিশদ হইয়া যায়। গীতাও একথার অর্থ ক্রমে খুলিতেছেন। গীতা বলিতেছেন, ভগবান্ বেদান্তকৃৎ এবং বেদবিৎ। ভগবান্ বেদান্তকৃৎ কি রূপে? শ্রীধর বলেন—

তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকোজ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ।

বেদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরুরূপে ভগবান্ বেদান্তকৃৎ। হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য নামক প্রস্তাবেও এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—

"হিন্দুধর্ম্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, বেদ কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত নহে। বেদে যে ঋষিগণের ধ্বনি আছে, তাঁহারা বৈদিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা মাত্র। তাঁহারা বৈদিক গুরু বা প্রচারক।"

পাণিনির অনুশাসনে প্রকাশিত যে, বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ উক্ত হইয়াছে মাত্র, তাঁহারা বেদের প্রণেতা নহেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ঋষি শব্দের অর্থই মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে পরিদৃষ্ট হয় যে, এই ঋষিগণের মানসযজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র সকল এবং সাম সঙ্গীত সকল প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা হইতেই ছন্দঃ সকল এবং তাহা হইতেই যজুর্ম্মন্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইল। বেদের এ সমস্তই রূপক কথা মাত্র। যতিগণ সিদ্ধ হইয়া যখন ব্রহ্মভাব লাভ করেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা বেদার্থ সকল সুস্পষ্ট দর্শন করিতে থাকেন। জীব কখন ব্রহ্মত্বলাভ করেন? গীতা বলিতেছেন :—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥
১৪।১৯।

জীব যখন প্রকৃত দ্রষ্টা অর্থাৎ বিবেকী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারেন যে, সত্ত্ব, রজ, ও তম এই ত্রিবিধ গুণ দ্বারাই সমস্ত জগৎ চলিতেছে, এই গুণত্রয় ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই। আত্মা সেই গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র এবং কিছুতেই লিপ্ত নহেন, জীব যখন এইরূপ দর্শন করেন তখন তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্বলাভ করেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে :—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
১০ অ-২।

আমিই সর্ব্বপ্রকারেই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ অর্থাৎ তাহাদিগের উৎপাদক এবং বুদ্ধাদির প্রবর্ত্তক।

এই মহর্ষি ও যতিগণ যখন সিদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহারা সর্ব্ববিৎ হয়েন :—

"যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥"

"হে ভারত! যিনি নিশ্চিতমতি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে আমায় ভজনা করেন এবং তিনিই সর্ব্ববিৎ হয়েন।"
১৫অ—১৯।

দেবৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া যতিগণ সমাধিবলে বেদোক্ত সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়া জানিতে পারেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মত্বলাভ করিয়া সর্ব্ববিৎ হয়েন,তখন তাঁহাদের অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। অধ্যাত্ম জগতের সমুদায় নিয়মাবলী,যাহা চিরকাল প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং যাহা বৈদিক নিত্যনিয়ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা বেদের গুরু ও বেদার্থবেত্তা হয়েন।

গীতার এই সাক্ষ্যদ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইতেছে এবং বেদ ও গীতা যে কিরূপ ভগবদ্বাক্য,তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ অন্তর্যামীরূপে জীবের আত্মাতেই বিরাজ করিতেছেন। যখন জীবের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং যখন তিনি সেই চিত্তে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হন, তখন তিনি ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সেই শুদ্ধচিত্তে প্রতিবিম্বিত দেখেন; তিনি তাঁহার সত্বমূর্ত্তি দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নির্গুণ স্বরূপ জীবের মায়া এবং মায়াসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। জীব যখন সাধনবলে এই মায়া হইতে বিমুক্ত হয়েন, যখন তিনি ত্রিগুণের অতীত হন, তখন তাঁহার আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ প্রভাসিত হইয়া পড়ে। গগন পরিষ্কৃত হইলে যেমন সূর্য্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ মায়ার ঘোর যতদিন না কাটিয়া যায়,ততদিন আত্মস্বরূপে ভগবান্ দেখা দেন না। আত্মস্বরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইলেই সমস্ত অধ্যাত্ম জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মজ্ঞানে সমস্ত বেদ ও বেদজ্ঞান উপলব্ধ হয়। ব্যাস সেই আত্মজ্ঞান গীতা মধ্যেই নিহিত করিয়াছেন; এবং এই জন্য গীতাকে উপনিষদ্বাক্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় বলিয়াছিলেন, আমি যোগারূঢ় হইয়া যে গীতোপদেশ দিয়াছি, হে অর্জ্জুন, সে সমুদায় কথা সামান্য অবস্থায় সম্যক্ উপলব্ধি হইবার নহে। আত্মাতেই সমস্ত অধ্যাত্ম জ্ঞান নিহিত আছে, কিন্তু সে অধ্যাত্মজ্ঞান বিকাশ হইতে গেলে অবস্থা বিশেষের অপেক্ষা করে। জীব যত দিন না সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, ততদিন তাহার গীতোপদেশ সমস্ত আত্মানুভূতিরূপে প্রতীত হয় না। যাহা আত্মাতেই আছে, মায়ার ঘোর না গেলে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় না। এ জ্ঞানকে Intuition বল ক্ষতি নাই; কিন্তু এ তোমার আমার মত সামান্য Intuition নহে। এ জ্ঞান বেদান্তীর অনুভূতি, যোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং Kant এর Intuition। এ জ্ঞান সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বকালে সমান; তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এই Intuitive জ্ঞান বিকাশ হইবার জন্য বিশেষ সাধনা চাই। সিদ্ধ ব্যক্তির অন্তরে ভগবানের বাক্য শ্রুত হয়! তাই শ্রুতি পরম্পরায় বেদ চলিয়া আসিতেছে। তাই গীতাও বেদবৎ ভগবদ্বাক্য।

শুদ্ধ ভগবদ্বাক্য হইলেই কি গীতার বেদত্ব প্রতিপন্ন হইল? শাণ্ডিল্য ত সে কথা বলেন না। তিনি বলেন, যাহা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য,তাহাই বেদ। অতএব,আমাদের এখনও প্রমাণ করা চাই যে,গীতা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য। আমরা ইহার পর গীতার সেই প্রমাণে প্রবৃত্ত হইব।

চন্দ্র বসু।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৩)

গো-বসন্তের লক্ষণ।

বাহ্য লক্ষণ। (১) কাল।—বর্ষাবসানে এবং শীতকালেই প্রায় গো-বসন্ত আরম্ভ হইতে দেখা যায়। ইহার দুইটী কারণ। প্রথম কারণ, ঘাস প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ কয়েক দিবস ধরিয়া জল-নিমজ্জিত থাকাতে এই রোগের কৈশিকাণু (filaments বা batons) জন্মিবার সুবিধা হয়। পরে জল নামিয়া গেলে, বায়ুর সংশ্রবে বীজাণু (spores) জন্মিবারও সুবিধা হয়। গো-বসন্তের অণু বায়বিক (Ærobic) অণু, অর্থাৎ, বায়ুর সহিত অবাধ সংস্পর্শ ব্যতীত ইহার মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয় না। আবার গো-বসন্তের অণু উভজ (facultative) শ্রেণীর অণু, অর্থাৎ, ইহা জন্তুদিগের শরীরের মধ্যেই যে কেবল জীবন ধারণ করিতে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম, এরূপ নহে; এই অণু অবলীলাক্রমে উদ্ভিজ্জ পদার্থেরও মধ্যে জন্মিয়া বংশ রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। বরং জন্তুদিগের শরীরের মধ্যে বায়ুর অসদ্ভাব কারণ ইহাতে বীজ জন্মিতে পারে না, কিন্তু মাঠের মধ্যে পচনশীল উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে এই অণু সহজেই বীজোৎপাদন করিয়া থাকে। এই অণুর বীজ হইতে যাদৃশ ক্ষতি হয়, ইহার কৈশিকাবস্থা হইতে তাদৃশ ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ কোন জন্তু যদি গো-বসন্তে মৃত জন্তুর শরীর, কালবিলম্ব না করিয়া, অবিকৃত অবস্থায় (টাট্‌কা টাট্‌কি) খাইয়া ফেলে,তাহা হইলে ঐ জন্তুর গো-বসন্ত না হইতেও পারে। পাকস্থলীর অম্লরস কৈশিকাবস্থাগত এই অণুকে নাশ করিতে সক্ষম; কিন্তু বীজ অবস্থায় ইহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে জীবিতাবস্থাতেই প্রবিষ্ট হইয়া,পেয়ার্স পথ (peyer's patches) ও কৈশিক ধমনী পথ (capillaries) দ্বারা, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। বর্ষার পরে ভূমি বিশেষে এই অণু জন্মিয়া বায়ু সংযোগে সহজেই বীজাবস্থায় পরিণত হয়। বীজাবস্থাগত অণু খাইয়াই জন্তুগণ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এদেশে শীতকালে ও ইউরোপে গ্রীষ্মকালে গো-বসন্তের অধিক প্রকোপ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই রোগের অণু সেন্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রের ২০ হইতে ২৫ ডিগ্রি উত্তাপে যত সহজে জন্মে, ইহার অধিক ও ইহার ন্যূন পরিমাণ উত্তাপে তত সহজে জন্মে না। সেন্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রের ৪ ডিগ্রি হইতে ৪৩ ডিগ্রি পরিমাণ পর্য্যন্ত উত্তাপে এই অণু জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ২০—২৫ ডিগ্রি উত্তাপে ইহা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া গিয়া আহার ও পান সামগ্রীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অতধিক শীতে বা অত্যধিক গ্রীষ্মে সেরূপ সহজে এই অণু পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। ২০—২৫° ডিগ্রি উত্তাপে এদেশে শীতকালে ও ইউরোপে গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক বলিয়া এই সময়েই গো-বসন্তের প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে।

(২) জাতি।—ছাগল, ভেড়া, মহিষ, গাধা ও বানর,গো-বসন্তে মরিয়া যায়, ইহা বহুদর্শী গোপদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানা যায়। ঘোড়া এই রোগে মরে কিনা, ইহা তাহারা বলিতে পারেনা। সম্ভবতঃ ঘোড়াও এই রোগে মরে,গাধা ও ঘোড়া একই শ্রেণীর জন্তু। গোপগণ গরু চরাইবার সময় মহিষ,মেষ, ছাগও চরাইয়া থাকে; তাহারা রজকদিগের গর্দ্দভও সর্ব্বদা মাঠে দেখিতে পায়; বানরও

সর্ব্বদা তাহারা দেখিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মাঠে এই সকল জন্তু চরিবার বা থাকিবার কথা, অশ্ব ঐ সকল মাঠে না চরিবারই কথা। এদেশে কৃষিকার্য্যের জন্য অশ্বের ব্যবহার নাই। সুতরাং অশ্ব-রোগ সম্বন্ধে কৃষক ও গোপগণের কিছু না জানিবারই কথা। অশ্ব সম্বন্ধে এদেশের সৈনিক বিভাগের চিকিৎসকগণের যেরূপ অভিজ্ঞতা, এমন আর কাহারও নাই। তাঁহাদের লিখিত অশ্বের রোগ সমুদয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যে অশ্বও গো-বসন্ত রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মটর খাইয়া লিভারপুল নগরে ১৮৮৪ সালে অনেকগুলি ঘোড়া গো-বসন্ত রোগে মারা যায়। কিন্তু গো-বসন্ত যে সচরাচর অশ্বকে আক্রমণ করেনা, তাহাও নিশ্চয়। গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি অনেক জন্তুই গো-বসন্ত উপস্থিত হইলে হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, কিন্তু এরূপ মড়কের সময় আমি কখন অশ্ব মরিতে দেখি নাই। ইহার তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রোমন্থক জন্তুদিগের ন্যায় অশ্ব তাদৃশ গো-বসন্ত-রোগ-গ্রস্ত নহে। বস্তুতঃ ক্রকস্যাংক্ নামক ইংলণ্ডের একজন প্রধান অণুতত্ত্বজ্ঞ অশ্ব ও গর্দ্দভ গো-বসন্তরোগে আদৌ আক্রান্ত হয় না, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতটী অভ্রান্ত নহে। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ জীব-চিকিৎসক প্রিন্সিপ্যাল উইলিয়াম্‌স্ পূর্ব্বোল্লিখিত লিভারপুলের ঘটনাটী বর্ণনা কালে (Transaction of the Highland and Agricultural Society of Scotland, vol. xx p. 157) যে চিত্রটী দিয়াছেন,তাহাতে তাঁহার মত সম্পূর্ণই সমর্থন করিতেছেন। ব্যাসিলাস্ এন্থ্রাসিসের আণুবীক্ষণিক আকার ও গো-বসন্তের লক্ষণ সকল দেখিয়া যে প্রিন্সিপ্যাল্ উইলিয়াম্‌স্ এবিষয়ে ভুল করিবেন, তাহার কোনও সম্ভব নাই। গর্দ্দভের যে এই রোগ হইয়া থাকে,এবিষয়ে যদিও কেবল গোপগণের মুখে আমি শুনিয়াছি, অদ্যাবধি পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাই নাই, কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। গোপগণের মুখে যে সকল লক্ষণের কথা শুনিয়াছি, তাহাতে গর্দ্দভও যে এই রোগে মরে,তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে। কুকুর ও শৃগাল গো-বসন্তে মৃত জন্তুদিগের শরীর ভক্ষণ করিয়াও মরেনা,এবিষয়েও অনুসন্ধান করিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। তবে যদি পিচকারির দ্বারা কুক্কুরের বা শৃগালের রক্তের মধ্যে গো-বসন্তের-বীজ চালাইয়া দেওয়া যায়,তাহা হইলে এই দুই জাতীয় জন্তুও হয়ত মরিতে পারে। বিড়াল যে এই রোগে মরে,এবিষয়ে ডি, ব্যারি সাক্ষ্য দিতেছেন (De Bary on Bacteria, page 123) মনুষ্যের শরীরে এই একই অণু হইতে এক প্রকার বিস্ফোটক জন্মে। এই স্ফোটকও (carbuncle) মারাত্মক। পেরু, কুক্কুট ও হংস এই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়, ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ভেটেরেনারি সার্জ্জন ডুরাণ্ট কাম্‌প্তি নগরে সকল প্রকার জন্তু এককালে দুই জাতীয় "শার্বন" (অর্থাৎ গো-বসন্ত ও গলা ফুলা রোগ) হইয়া মরিয়া যায়,এইরূপ বর্ণনা করেন। গো-বসন্ত ও গলাফুলা রোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন রোগ। একটীর ফরাশিশ্ নাম "শার্বন্ ভেরিউলাঁ" অন্যটীর ফরাশিশ্ নাম "শার্বন্ সিম্প্‌টোম্যাটিক্"। উভয় রোগের নামেরই একটী ভাষায় এক অংশ সমান বলিয়া, রোগ দুইটীকে যে এক শ্রেণীর বলিয়া ধরিয়া লইয়া, কতকগুলি জন্তু এই শ্রেণীর রোগ হইতে মরিয়া গেল, এরূপ সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ

করা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। তবে ডুরাণ্ট সাহেব নিজে ঠিক কি লিখিয়াছেন, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার রেভিনিউ এগ্রিকালচার্ ডিপার্টমেণ্ট্ হইতে গো-বসন্ত (Anthrax) সম্বন্ধে যে ১৯ নম্বরের 'লেজার' বাহির হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপে "খিচুড়ি পাকান" হইয়াছে :—

"Veterinary Surgeon Durant has seen Anthrax fever on several occasions in India with symptoms varying. Having perused Mr. Mukerji's notes, he thinks he has seen both forms of the disease Charbon, at Kamptee in 1878, and on the Government Farm at Khandesh in 1879. The disease, as there seen attacked all classes of animals, and amongst them (at Kamptee) fowls and turkeys."

ডুরাণ্ট সাহেব যদি বস্তুতঃই কুক্কুট ও পেরুর মধ্যে গো-বসন্ত দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা ইউরোপীয় কয়েক জন অণুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের গবেষণার বিশেষ সমর্থন করিতেছে। প্রিন্সিপ্যাল উইলিয়াম্স্ গো-বসন্ত "more special to the herbivora and birds" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গিবিয়ের নামক ফরাশিশ্ অণুতত্ত্ববিৎ ও মেট্স্চ্নিকক্ নামক রুশ অণুতত্ত্ববিৎ ভেক ও কৃকলাশ গো-বসন্তে মরে, এইরূপ লিখিয়াছেন। তাবৎ জীব অপেক্ষা মূষিক, গিনিপিগ ও শশক, এই রোগাক্রান্ত হইয়া সহজে মরে। বস্তুতঃ মূষিক এই রোগের বীজ দ্বারা এত সহজে হত হয় যে, গো-বসন্তের লঘু বীজ (attenuated virus) মূষিক মারিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা। যেরূপ লঘুবীজ দ্বারা মনুষ্য, গো প্রভৃতি জন্তুর কোনই ক্ষতি হয় না, এরূপ লঘু বীজ ব্যবহার দ্বারা মূষিক (নেংটী ইন্দুর) মারা যায়। শ্বেত-মূষিক গো-বসন্তে মরে না। শূকর সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) সংক্রামকত্ব।—গো-বসন্ত সংক্রামক রোগ বলিয়া প্রায় সকলেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এককালে একস্থানে নানাজাতীয় জন্তু শত-সহস্র সংখ্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় বলিয়া ইহা সংক্রামক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, ইহাই প্রামাণ্য বলিয়া সহজে মনে হইতে পারে। কিন্তু গো-বসন্ত সংক্রামক কি না, এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেক সময় দেখিয়াছি, একই গোয়ালে ৩৪টী গরু এই রোগে মরিয়া গেল। গোয়াল পরিষ্কার করিবার অথবা ঐ গোয়াল হইতে নীরোগ জন্তুগুলি স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাইবার কোনই বন্দোবস্ত দেখিলাম না; অথচ যে গরুগুলি নীরোগ ছিল, সেগুলি নীরোগই রহিয়া গেল। সকল গোয়ালেই যে কতকগুলি গরু মরিয়া গিয়া কতকগুলি বাঁচিয়া যায়, এরূপ নহে, কিন্তু এরূপ প্রায়ই হয়। কেহ বলিতে পারেন, সেগুলি বাঁচিয়া গেল ও যাহাদের রোগে ধরিল না, সেগুলির পূর্ব্বে কখন না কখন এই রোগ হইয়াছিল। গো-বসন্ত হইয়া যদি কোন জন্তু বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার এই রোগ আর হয় না, ইহা কৃষক, গোয়ালা ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করেন। বস্তুতঃ গো-বসন্তের ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যে সকল জন্তুর এরোগ পূর্ব্বে হয় নাই, এ বিষয় স্থির জানা গিয়াছে, সে সকল জন্তু গো-বসন্তে আক্রান্ত জন্তুর সহিত এক গোয়ালে নিতান্ত অযত্নে থাকিয়াও, নীরোগ অবস্থাতে রহিয়া গেল, এরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায়। কৃষক ও গোয়ালাদিগের এ ধারণা আছে যে, এক জন্তু হইতে অন্য জন্তুতে এই রোগ সঞ্চালিত হইয়া যায় না। তাহাদিগকে যদি বলা যায়, "তোমরা ভাল গরুগুলিকে রুগ্ন গরু হইতে তফাৎ ক-

রিয়া ফেল" তাহারা উক্ত প্রকার কারণ দেখাইয়া "এরূপ করায় কোনই উপকার হইবে না, যেটা বাঁচিবার, সেটা বাঁচিয়া যাইবে, যেটা মরিবার সেটা মরিয়া যাইবে" এইরূপ উত্তর দিয়া থাকে। এক জন্তু হইতে অপর জন্তুতে এই রোগ সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস বলিয়াই বোধ হয়। যে সকল জন্তু মরিয়া যায়, অথবা যাহাদের এই রোগে আক্রমণ করে, তাহারা মাঠে বীজপ্রধান অণুসম্বলিত ঘাস খাইয়া এই রোগাক্রান্ত হইয়াছে। গো-বসন্তের অণু বায়বিক বলিয়া, শরীরাভ্যন্তরে বীজ প্রবেশ করিয়া, রক্তের মধ্যে কৈশিকাবস্থা গত অণু জন্মে বটে, কিন্তু পুনরায় বীজ জন্মে না। রুগ্ন জন্তুদিগের শরীরাভ্যন্তর হইতে কোনও প্রকার যদি অণু বহির্গত হয়, তাহা হইলে উহা কৈশিকাবস্থাগতই থাকে। কৈশিকাবস্থাগত গো-বসন্তের অণু পাকস্থলীর অম্লরস দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ কারণ, রুগ্ন জন্তুর সংশ্রবে নীরোগ জন্তুর গো-বসন্ত হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ সকল তৃণভোজীজন্তু একই সময়ে একই মাঠে এই বিশেষ অণুমিশ্রিত তৃণ খাইবার কারণ, উহাদের এককালে একই রোগ উপস্থিত হয়। তবে এক জন্তু হইতে অন্য জন্তুতে এই রোগ যে একবারে সঞ্চালিত হইতে পারে না, এ কথাও গ্রাহ্য নহে। ভুক্ত বীজাণু (Spores) কতকগুলি মুখের মধ্যে, কতকগুলি পাকস্থলীর মধ্যে, কতকগুলি বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে ও কতকগুলি ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া গিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে; কিন্তু কতকগুলি মলের সহিত নিঃসৃতও হইতে পারে। এইরূপ মল গোয়ালের মধ্যেও জমিয়া যাইতে পারে। এই মল গোয়ালের গরুর খাদ্যের সহিত মিশিতেও পারে; এই খাদ্যের সহিত বীজাণু কয়েকটী গিয়া মুখ, পাকস্থলী বা অন্ত্রের মধ্যে সংলগ্ন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এরূপে রোগোৎপত্তির তাদৃশ সম্ভব নাই বলিয়া দূষিত গোয়াল রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কোন গোয়ালে এইরূপ রোগ উপস্থিত হইলে, গোয়াল হইতে নীরোগ গরুগুলিকে স্থানান্তরিত করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু এরূপ না করিতে পারিলে যে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভব আছে, তাহা আমি মনে করি না, বরং যখনই একটী গরু অথবা ছাগলের এই রোগ জন্মিবে, তখনই গোচারণ স্থান হইতে সকল জন্তুগুলিকে লইয়া গিয়া, গোয়ালে রাখিয়া, খড়, ভুসি, খৈল, লবণ, গুড় ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। রোগী জন্তুটীকে পৃথক স্থানে রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

৪। রোগের বাহ্য লক্ষণ—প্রায় সকল প্রকার জন্তু গো-বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় বলিয়া এ রোগের লক্ষণ বর্ণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। শশক ও মূষিকের এই রোগ যে হইয়াছে, ইহা মৃত্যু ভিন্ন আর বিশেষ কোন লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যায় না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও এই দুই শ্রেণীর জীব স্বভাবতঃ যেরূপ আহার করে, সেইরূপ আহার করিয়া থাকে। পরে হঠাৎ মরিয়া যায়। মৃত্যুর পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, কৈশিকাবস্থাগত অণু উহার মধ্যে রাশি রাশি দেখা যায়। বাছুরের এই রোগ উপস্থিত হইলে, অতি শীঘ্রই অর্থাৎ ২।১ দিবসের মধ্যেই ঐ বাছুর মরিয়া যায়। অধিক বয়সের গরু প্রায় অনেক দিবস ধরিয়া ভোগে ও কখন কখন আরোগ্যও লাভ

করে। সকল বয়সের গরুও দুই এক দিবসের মধ্যেই মরিয়া যাইতে দেখা যায়। কোনটা বা নানা লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে বা মরিয়া যায়। গো-বসন্তে সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ, মল দ্বারা ও নাসারন্ধ্র দিয়া শোণিত নির্গত হওয়া। উভয় দ্বার দিয়া শোণিত নির্গত হইতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গরুর এই রোগ হইলে মলদ্বার দিয়া নিশ্চয়ই রক্ত নির্গত হইবে। অশ্বের কেবল নাসিকারন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইতে পারে। আর একটী কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পিচকারির দ্বারা গো-বসন্তের বীজ কোন জন্তুর রক্তের মধ্যে চালিত করিয়া দিলে, ঐ জন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখাইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। স্বভাবতঃ এই রোগ উপস্থিত হইলে, রক্তের সহিত বীজ মিলিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় এবং কখন বা মুখের অন্তর-ত্বক্ (Mucous membrane) কখন বা অন্ত্রের অন্তর-ত্বক কখন বা উভয় যন্ত্রের অন্তর-ত্বক দিয়া বীজ প্রবেশ করে। এই সকল কারণ বশতঃ স্বভাবতঃ জাত গো-বসন্তের লক্ষণ সকল সময়ে সমান হয় না। কৃত্রিম উপায়ে রক্তের সহিত গো-বসন্তের বীজ চালাইয়া দিলে, পরীক্ষাগত জন্তুগুলি প্রায় ২০ হইতে ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায় ও উহাদের রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে কৈশিকাবস্থাগত অনেক অণু দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রায় ৪৮ ঘণ্টার পরেই জন্তুগুলি মরিয়া যায়। কখন বা ৮।৯ দিবস পরে মরিয়া যায়। রোগ হইবার পরে যদি ১০ দিবস পর্য্যন্ত কোন জন্তু বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ জন্তু প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। যে জন্তু একবার এই রোগ হইয়া বাঁচিয়া যায়, তাহার পুনরায় এই রোগ হয় না। স্বভাবতঃ এই রোগ জন্মিলে রক্তের মধ্যে জীবদ্দশায় অতি সামান্য পরিমাণে এই রোগের অণু জন্মিয়া থাকে। স্বভাবতঃ জন্তুদিগের রক্ত সঞ্চালন পথগুলির মধ্যে তরল পদার্থ ভিন্ন বাহিরের অন্য কোন পদার্থ সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ক্ষত স্থল দিয়া সহজেই বীজ রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু শরীরের বাহিরে বা ভিতরে ক্ষতস্থান থাকা স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না। মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গমন হওয়া স্বাভাবিক গো-বসন্ত রোগের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। অস্বাভাবিকরূপে পিচকারি শোণিতের মধ্যে গো-বসন্তবীজ চালাইয়া দিলে জন্তুগণ কেবল জ্বর হইয়া মরিয়া যায়। গো-বসন্ত গরুরই সর্ব্বপ্রধান রোগ বলিয়া অর্থাৎ এই রোগ দ্বারা গরু মরিয়া গিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে বলিয়া, কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা গো-জাতির এই রোগ হইয়াছে, স্থির করিতে পারা যায়, ইহাই পর অধ্যায়ে বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৩)

তৃতীয় অধ্যায়—ঐতিহাসিক কাল।

বোম্বে নগরীর সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ভাউদাজী নেপালের ইতিহাসের গুরুত্ব অনুভব করিয়া, তাহার সংগ্রহে প্রয়াসী হন। গুজরাটের অন্তর্গত জুনাগড়ের বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নবাবের অর্থ সাহায্যে নেপাল হইতে তাম্রশাসনাদি সংগ্রহের জন্য ডাক্তার

ভাউদাজী স্বয়ং নেপালে গমন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু নেপাল গমনের পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। অনন্তর তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজী গুরুদেবের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য নেপালে গমন করেন। প্রাচীন শাসনপত্র ও বংশাবলীর অনুসন্ধানে তিনি বহু আয়াসে নেপাল পর্য্যটন করেন। নেপালের রাজমন্ত্রী সারজঙ্গ বাহাদুর এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বহু আয়াস ও গবেষণার ফল স্বরূপ আপনার ২৩ খানি সংস্কৃত তাম্র শাসনের মূল ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্য সহ গুজরাটী ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার ভগবান লাল সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বুলার (G. Buhler) সাহেবকে এই সকল শাসনপত্রের প্রতিলিপি প্রদর্শন করেন। ডাক্তর বুলার এই সকল শাসনপত্রের মূল, ইংরেজী অনুবাদ সহ Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশিত করার জন্য বোম্বের উক্ত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক (Dr. J. Burgess) বার্জেস সাহেবকে অনুরোধ করেন। ডাক্তর বুলারের পরামর্শে বোম্বের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রকাশার্থ ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। ডাক্তর ভগবান লালের সহিত পরামর্শ করিয়া, ডাক্তর বুলার, গুজরাটী হইতে শাসনপত্র গুলির ইংরেজী অনুবাদ ১৮৭৯—৮০ খ্রীঃ সম্পন্ন করিয়া, উক্ত পত্রিকার নবম খণ্ডে (Indian Antiquary, vol ix. p. 163-194) তাহা প্রকাশিত করেন। ডাক্তর ভগবানলালের গবেষণার ফল, ডাক্তর বুলারের দ্বারা এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হয়। ১৮৮০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার বুলার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ডাক্তর ভগবান লালের গুজরাটী অনুবাদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ইংরেজী অনুবাদে করা হয় না। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যের নানা স্থলের সংক্ষিপ্ততা ও পরিবর্ত্তন বিধান পূর্ব্বক, ডাক্তর বুলার, ১৮৮৪ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে, ভিয়েনা নগরী হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে তাম্রশাসন গুলির সংস্কৃত মূল, প্রতিলিপি ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বৎসর ডাক্তর ভগবানলালের মন্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে (Indian Antiquary, XIII. 411) প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নেপালের ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবান লালের সুদীর্ঘ মন্তব্য বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা, ডাক্তর বুলারের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। ডাক্তর ভগবান লাল রাজা মানদেব ও বসন্ত দেবের শাসন কাল শকাব্দে ও ডাক্তর বুলার বিক্রমাব্দে উল্লিখিত বলিয়া অনুমান করেন। উভয় পণ্ডিতের অনুমানই যে ভ্রান্ত ও অমূলক, ১৮৮৫ খ্রীঃ সুপণ্ডিত বেণ্ডল ও ফ্লীট সাহেব তাহা প্রদর্শন করেন*। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নবেম্বর মাসে সুপণ্ডিত C. Bendall বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসন্ধানে নেপালে গমন করিয়া, আরও কতিপয় শাসনলিপি ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। নেপালের আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফল ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি পুস্তকাগারের বৌদ্ধসংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকাবলীর বিবরণের ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তিকা ও প্রবন্ধের অধিকাংশ দর্শন ও আলোচনা পূর্ব্বক, আমরা নেপালের পুরাতত্ত্ব যথাসাধ্য লিখিতে বসিয়াছি।

* Indian antiquary for 1885, vol. xiv. P. 97 and 342-49.

নেপালের বংশাবলীতে যাঁহারা সূর্য্যবংশী নামে পরিচিত হইয়াছেন, ঠাকুরী বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় জয়দেবের নামাঙ্কিত প্রস্তর-লিপিতে তাঁহারা লিচ্ছবী বংশ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ পশুপতি-নাথের মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে যে প্রকাণ্ডকায় বৃষভের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তাহার পশ্চাতে ৪১/২×৩১/২ ফুট পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ডে এই লিপি অঙ্কিত রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দির অতি প্রাচীন দেবপাটন নগরে বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। দেবপাটন এক্ষণে শ্রীহীন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। নেপালের বর্ত্তমান রাজধানী কাটমাণ্ডু নগর হইতে তিন মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে এই দেবপাটন নগর অবস্থিত। পশুপতিনাথের বর্ত্তমান মন্দির ৭০৫ নেপালী সংবতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর রাজা শিবসিংহমল্লের মহিষী গঙ্গা দেবীর আদেশে সংস্কৃত ও পুনর্নির্ম্মিত হয়। ইহা ইষ্টক ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ত্রিতল। ইহা ৫০ ফিট উচ্চ। মন্দিরে প্রবেশের জন্য চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে। মন্দিরের অঙ্গনে অন্যান্য বহু দেবতার প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে। যে সকল রাজা ও ধনী ব্যক্তি মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ বা ভূসম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিও মন্দিরাঙ্গনে দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গনস্থ মূর্ত্তিগুলি 'শালিক' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহে প্রায় ৩১/২ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ রূপে পশুপতি নাথ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি চতুর্ম্মুখ ও অষ্টভুজ। তাঁহার দক্ষিণ করে রুদ্রাক্ষ মালা ও বাম করে কমণ্ডলু। এবংবিধ প্রস্তরময় মূর্ত্তি মথুরা ও ভিলসার সন্নিহিত উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছে। গুপ্ত সম্রাটদিগের আধিপত্য কালে ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া থাকিবে। পশুপতিনাথের মূর্ত্তি ১১/২ ফুট উচ্চ ও ৪ ফুট ব্যাসের গোলাকার আসনের উপর স্থাপিত। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারে পশুপতিনাথের বিগ্রহ পূজার্চ্চনার অঙ্গীভূত স্নানের সময় ভিন্ন সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত থাকেন। সমগ্র নেপালে পশুপতি নাথের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহ বিদ্যমান নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-লিপি ১৫৩ শ্রীহর্ষ সংবতের কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতে লিখিত ও উৎকীর্ণ হয়। এই প্রশস্তি ৩৪ টী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার ৫টী শ্লোক (২০।২৫। ২৭।২৮।২৯) মহারাজ জয়দেব স্বয়ং রচনা করেন। অবশিষ্ট বুদ্ধকীর্ত্তি নামে রাজসভাসদ সুকবি দ্বারা রচিত হয়। বুদ্ধকীর্ত্তির অনুপ্রাস-প্রিয়তা ও রচনাপটুতা শ্লোকদ্বয়ে দৃষ্ট হয়। কনোজের সম্রাট মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের রাজ্যারম্ভ কাল হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। ৬০৬-৬৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, পূর্ব্বতন গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ স্থানে আপনার প্রভুত্ব স্থাপিত করেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পশ্চিম নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, নেপালের 'বংশাবলীর' মতে ঠাকুরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা অংশুবর্ম্মনের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য স্বয়ং উজ্জয়িনী হইতে নেপালে আগমন করিয়া, তথায় সংবতাব্দের প্রচলন করেন। বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট এই বিক্রমাদিত্য কনোজের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনই বংশাবলীতে সং

ষতাব্দের প্রবর্ত্তক উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মন মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। হর্ষবর্দ্ধনের নেপালে আধিপত্য বিস্তৃতির পর হইতে ঠাকুরী নরপতিগণ বরাবর হর্ষাব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত শাসনলিপিগুলি স্পষ্টাক্ষরে ইহা সাক্ষ্য দিতেছে।

মহারাজ দ্বিতীয় জয়দেবের বংশাবলী ও লিচ্ছবী বংশাবলী এই প্রশস্তির ১৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রশস্তি ১৫৩ হর্ষ-সংবতে (৭৫৯ খ্রীঃ) লিখিত হয়। নেপালের ইতিহাস সংগ্রাহকের পক্ষে এই প্রশস্তি অমূল্য। এই জন্য ইহার প্রথমভাগের মূল ও সারমর্ম্ম এ স্থলে প্রদান করা আবশ্যক।

এই প্রশস্তির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে পশুপতির বন্দনা করা হইয়াছে। ১৯-৩০ শ্লোকে পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। রাজমহিষী বৎসদেবী বহুতর রৌপ্য-নির্ম্মিত পদ্ম দ্বারা শিবের অর্চ্চনা ও উপাসনা করেন, তদুপলক্ষে এই প্রশস্তি রচিত হয়। মহাদেবের স্তোত্রগীতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ক্ষেপে রাজবংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

"ত্র্যক্ষ-ত্রয্যব্যয়াত্মা ত্রিসময়সদৃশ-স্ত্রিপ্রতীত-স্ত্রিলোকী-
ত্রাতা ত্রেতাদি-হেতু স্ত্রিগুণময়তয়া ত্র্যাদিভির্বর্ণিতোঽলং।
ত্রিস্রোতো-ধৌত-মূর্দ্ধা ত্রিপুরজিদজিতো নির্ব্বিবন্ধ-ত্রি-
বর্ণো যস্যোত্তুঙ্গ-স্ত্রিশূল স্ত্রিদশপতিনুতঃ (শঙ্কর)
তাপনোঽভূৎ ॥১॥
রাজদ্-রাবণ-মূর্দ্ধ-পংক্তি-শিখর-ব্যাসক্ত-চূড়ামণি-শ্রেণী
সঙ্গতি-নিশ্চলাত্মকতয়া লঙ্কাং পুনানাঃ পুরীং।
দ্-বন্ধ্য-পরাক্রমা——————সঙ্গতাঃ
শ্রীবাণাসুরশেখরাঃ পশুপতেঃ পাদাণবঃ পান্তুবঃ ॥২॥
সূর্য্যাদ্ ব্রহ্মপ্রপৌত্রান্-মনু-রথ ভগবাঞ্জ-জন্মলেভে,
ততোঽভূদ্ ইক্ষ্বাকু-শ্চক্রবর্ত্তী-নৃপতিরপি ততঃ
শ্রীবিকুক্ষির্বভূব।
জাতাবিদিতো ভূমিপঃ সার্ব্বভৌমোঽভূতোঽ-স্মাদ্,
বিশ্বগশ্বঃ প্রবল-নিজবল-ব্যাপ্ত-বিশ্বান্তরালঃ ॥৩॥
রাজাঽষ্টোত্তরাবিংশতিভুজ স্তস্মাদ্ ব্যতীত্য ক্রমাদ্
ভূতঃ সগরঃ পতিঃ———সাগরায়াঃ ক্ষিতেঃ।
জাতোঽস্মাদসমঞ্জসো নরপতি স্তস্মাদভূদংশুমান্ স
শ্রীমস্তনজীজনন্নরবরো ভূপং দিলীপাহ্বয়ং ॥৪॥
ভেজে জন্ম ততো ভগীরথ ইতি খ্যাতো নৃপোঽত্রা—
স্তরে ভূপালা———জাতো রঘোবপ্যজঃ।
শ্রীমত্তুঙ্গরথ স্ততো দশরথঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ সমং
রাজ্ঞোঽষ্টাপরান্ বিহায় পরতঃ শ্রীমানভূল্লিচ্ছবিঃ ॥৫॥
অস্ত্যেব ক্ষিতিমণ্ডলৈকতিলকো লোকপ্রতীতো মহান্
অ———প্রভাবমহত্তাং, মান্যঃ সুরাণামপি।
স্বচ্ছং লিচ্ছবি নাম-বিভ্রদপরো বংশঃ প্রবৃত্তোদয়ঃ
শ্রীমচ্চন্দ্রকলা-কলাপ-ধবলো গঙ্গাপ্রবাহোপমঃ ॥৬॥
তস্মাল্লিচ্ছবিতঃ পরেণ নৃপতীন্ প———রং শ্রীমান্
পুষ্প-পুরে কৃতিঃ ক্ষিতিপতি র্জাতঃ সুপুষ্প স্ততঃ।
সাকং ভূপতিভি স্ত্রিভিঃ ক্ষিতিভুতাং ত্যক্ত্বান্তরে বিংশতিং
খ্যাতঃ শ্রীজয়দেব-নাম-নৃপতিঃ প্রদুর্বভুবাপরঃ" ॥৭॥

ব্রহ্মার বৃদ্ধপ্রপৌত্র সূর্য্যের পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে দশরথ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের ৩-৫ শ্লোকে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। মহারাজ দশরথের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র হইতে আট পুরুষ পরে এই সূর্য্যবংশে লিচ্ছবী নামে রাজা প্রাদুর্ভূত হন। এই সূর্য্যবংশীয় লিচ্ছবীর বংশধর সুপুষ্প, পুষ্পপুর (পাটলীপুত্র) নগরে রাজত্ব করিতেন। রাজা সুপুষ্পের চতুর্ব্বিংশতিতম বংশধর জয়দেব নেপালে লিচ্ছবীবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বংশাবলীতে যিনি সূর্য্যবংশীয় জয়বর্ম্মণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই যে প্রস্তরলিপির উল্লিখিত লিচ্ছবীবংশীয় জয়দেব, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বংশাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ৩১৫-৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেব (জয়বর্ম্মন) নেপালে রাজত্ব করেন বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। প্রস্তরলিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে,জয়দেব মগধের সূর্য্যবংশীয় রাজবংশ হইতে উদ্ভূত।

মগধের গুপ্তবংশ সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে এই গুপ্তবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণের মতে অযোধ্যা গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে মগধের গুপ্তবংশের রাজ্য গঙ্গার উপকূলভাগে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধের প্রাচীন রাজধানী পাটলীপুত্রই গুপ্তবংশের প্রধান রাজধানী ছিল। কর্ণেল উইলফোর্ড "এসিয়াটিক রিসার্চেজ" (Asiatic Researches) পত্রিকায়, সুপণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব এসিয়াটীক সোসাইটীর ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এবং ওল্‌ডহাম সাহেব গাজীপুরের বিবরণে পাটলীপুত্রকেই গুপ্তবংশের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটগণের রাজধানী পাটলীপুত্রের সিংহাসনে গুপ্তবংশীয় শ্রীগুপ্ত অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত শকাব্দের ২৪১ অব্দে (৩১৯ খ্রীঃ) পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা গুপ্তাব্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে*। যে সময়ে শ্রীগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে লিচ্ছবীবংশীয় জয়দেব নেপালে লিচ্ছবীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দেব ও শ্রীগুপ্ত উভয়েই এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। উভয়েই সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত। লিচ্ছবীবংশ গুপ্তবংশের শাখা বলিয়া ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে। লিচ্ছবী বংশের মূল অনুসন্ধান করিলে এই অনুমানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

* প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিক আবুরিহান মহম্মদ বিন আমেদ ৯৭১খ্রীঃ খারিজিম প্রদেশের অন্তর্গত বিরুন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনীর বিদ্যোৎসাহী সুলতান মামুদের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া,বিবিধ বিষয়ে বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান মামুদের সহিত গুজরাট আক্রমণের কালে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি "তারিখ উল হিন্দ" নামে ভারতবর্ষের একখানি বিস্তীর্ণ ইতিহাসে স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করেন। তিনি আলবিরুণী নামেই পরিচিত। শকাব্দের ২৪১ অব্দে গুপ্তাব্দ ও বল্লভী অব্দের প্রচলন আরম্ভ হয় বলিয়া আলবিরুণী নির্দ্দেশ করেন। গুপ্তসম্রাটদিগের আধিপত্য লোপের সময় হইতে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়,তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রাজ্যচ্যুতির কাল হইতে অব্দ গণনা আরম্ভ না হইয়া,রাজ্যাভিষেকের সাল হইতেই সালটির আরম্ভ হয়।

৪র্থ অধ্যায়—লিচ্ছবী বংশের বিবরণ।

লিচ্ছবীবংশ পূর্ব্বে ব্রিজি নামে পরিচিত ছিল। শক (তুরেণীয়) বংশ হইতে এই ব্রিজিবংশ উৎপন্ন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক এই ব্রিজি জাতি দলে দলে মিথিলায় প্রবিষ্ট হয়। তখন অতি প্রাচীন বিদেহ বংশ মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রিজি জাতির আক্রমণে বিদেহবংশ মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মগধে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তদবধি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মিথিলা পরাক্রান্ত ব্রিজি জাতির পদানত থাকে। খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বৈশালী নগরীতে ব্রিজিজাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটনার ২৭ মাইল দূরে বেসাড় নামে যে প্রাচীন স্থান বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রাচীন বৈশালী বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রিজিবংশীয় শকগণ প্রথমতঃ নানা সামন্তরাজের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধকালে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া স্ব স্ব দলপতির অধীনে মহাপরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিত। সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এই বিভিন্ন সমবেত দলের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। একতার প্রভাবে তাঁহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠি-

য়াছিল। তাহাদের মধ্যে সামন্তশাসন ও জায়গীরদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। বৈশালীতে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে মগধের সিংহাসনে মিথিলার বিদেহবংশীয় মহারাজ ভাতীর অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে মিথিলায় ব্রিজি জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈশালী নগরে মিথিলার এবং রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপিত ছিল। বৈশালীর প্রাচীন প্রজাতন্ত্র রাজ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। কোরোসি, ক্লেপ্রথ ও টমাস সাহেব বৈশালীর প্রজাতন্ত্র রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সকলের মনোনয়নক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, রণদক্ষ ও যোগ্যতম ব্যক্তি সামন্তরাজগণের মধ্য হইতে দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাহাদের উপর একাধিপত্য করিত। এই দলপতিই কালক্রমে রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী কালক্রমে অনিয়ন্ত্রিত রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হইয়া, রাজার স্বেচ্ছাচারময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এই রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজি জাতির বলবীর্য্য ও একতা যথেচ্ছাচারের নিপীড়নে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। বুদ্ধদেব বৈশালীর ব্রিজিসামন্তগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি তাঁহারা লিচ্ছবী ক্ষত্রিয় নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মগধের মহারাজ ভাতীয়ের পৌত্র অজাতশত্রু ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ আপনার পিতা মহারাজ বিম্বিসরকে নিহত করিয়া রাজগৃহের পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রাচীন রাজগৃহ (কুশাগারপুর) নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার তিন মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে নূতন রাজগৃহে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মিথিলার অতি প্রাচীন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত হন। ব্রিজি নামে শক জাতির পরাক্রমে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে মগধে আগমন করেন। তদবধি মিথিলায় বিদেহ বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হয় এবং মগধে তাঁহাদের অধিকার বদ্ধমূল হয়। এই মহাপরাক্রান্ত ব্রিজি জাতির আক্রমণ ভয়েই সম্ভবতঃ বৈভারাদি পঞ্চপর্ব্বত বেষ্টিত কুশাগারপুরের প্রাচীন গিরিব্রজ পুরের সুরম্য ও সুরক্ষিত উপত্যকায় বিদেহবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহা রাজগৃহ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মিথিলা অধিকারের পর শকবংশীয় ব্রিজি জাতি বৈশালীতে (বর্ত্তমান বেসাড়) আপনাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে। পুণ্য-সলিলা গঙ্গা নদীর উত্তরতীরস্থ সমগ্র ভূভাগ কালক্রমে এই ব্রিজিজাতির পদানত হয়। বর্ত্তমান উত্তর বিহারে ব্রিজি জাতি ও দক্ষিণ বিহারে বিদেহবংশ একই সময়ে রাজত্ব করিতে থাকে।

লিচ্ছবীগণ নানা দলে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন দলের অধিনায়ক সামন্তরাজদিগের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ও একতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা রণকুশল ও শৌর্য্যবীর্য্যের আধার ছিল। স্বজাতীয় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগকে তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত। যুবক ও বালকেরা সকল সময়েই জ্ঞানী বৃদ্ধদিগের পরামর্শ অনুসারে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের মধ্যে সতীত্বের একান্ত সমাদর ছিল। ব্যভিচার সমাজে অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারা পূর্ব্বতন প্রচলিত রীতিনীতি, ধর্ম্ম সভ্যতা এবং আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিল।

রাজা স্বয়ং অপরাধীর বিচার করিতেন।

কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমতঃ "বিনিশ্চয়-মহামাত্য" নামে বিচারকদিগের সম্মুখে নীত হইত। পরে যথাক্রমে ব্যবহারক, সূত্রধারক, অর্থকূলক ও সেনাপতির বিচারে তাহার অপরাধ স্থিরীকৃত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যুবরাজের সমীপে বিচারার্থ প্রেরিত হইত। যুবরাজের বিচারে সে অপরাধী নির্ণীত হইলে সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য অপরাধী রাজার সমীপে প্রেরিত হইত। অধস্তন ছয় আদালতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে অপরাধী নির্ণীত হইলে, প্রচলিত বিধিমতে রাজা স্বয়ং তাহার যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেন। অধস্তন বিচারালয় গুলির দণ্ডবিধানের কোনও ক্ষমতা ছিলনা, কিন্তু তাঁহারা নির্দ্দোষীকে অব্যাহতি দিতে সমর্থ ছিলেন। এইরূপ সূক্ষ্মভাবে অপরাধীর প্রতি সুবিচার বিহিত হইত।

বৈশালীর অন্তর্গত 'শরণদদ' চৈত্যে অবস্থান কালে বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। প্রধান প্রধান লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, স্বজাতীয় সাধারণ লোকের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে থাকে। পৃথিবীর যাবতীয় অসভ্য জাতির ন্যায় শকবংশীয় তুরেনীয় ব্রিজি জাতি দৈত্য দানবাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীর উপাসনা করিত। পরে তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লিচ্ছবী ক্ষত্রিয় নামে আপনাদিগকে পরিচিত করিতে থাকে। লিচ্ছবীগণ বৈশালীতে পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমগ্র মিথিলা (উত্তর বিহার) শাসন করিতে থাকে। বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই সমগ্র জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়া, লিচ্ছবী জাতিকে দুর্দ্ধর্ষ ও মহাপরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করে। তদবধি বৈশালী বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র ও তীর্থ স্থলে পরিণত হয়। লিচ্ছবীবংশের রাজধানী বৈশালী বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় আবাসস্থল ছিল। নির্ব্বাণলাভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এই বৈশালীতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। বৈশালীর লিচ্ছবী (ব্রিজি) জাতি বুদ্ধদেবের প্রিয় সেবক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রিয়ভক্ত লিচ্ছবী জাতির একান্ত হিতৈষী ছিলেন।

মহারাজ বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু উভয়েই বুদ্ধদেবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবতঃ উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন এবং মগধকে বৌদ্ধধর্ম্মের সূতিগৃহে পরিণত করেন। বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশে পিতা-পুত্র উভয়েরই হৃদয় বিগলিত হইয়া, উভয়কেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয় দাতা রূপে পরিণত করে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা—প্রত্যুত্তর। (২)

গঙ্গেশ বাবু তাহার পত্র বলিতেছেন ঃ—"৬২১ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, 'শক্তির দ্বারা তুমি নানা প্রকার কার্য্য করিতেছ; আমরা আপন হস্তে ও পদে যে শক্তি-দ্বারা কাজ করি, তাহা ইন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয় ও শক্তি এক পদার্থ কি না? "নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন" বলিয়া গঙ্গেশ বাবু যে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন, উহা আমার লেখা নহে।

প্রথম ছত্রটি ভিন্ন, অবশিষ্ট অংশটুকু গঙ্গেশ বাবু আমার লেখা পড়িয়া উহার মর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে নিজের কথায় লিখিয়া, তাহার পর প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা কার্য্য করি। ইন্দ্রিয় ও শক্তি এক পদার্থ কি না?

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাস্তবিক এক পদার্থ। দর্শনেন্দ্রিয় বলিলে দর্শনশক্তি বুঝায়। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলে শ্রবণশক্তি বুঝায়। ইত্যাদি। এ বিষয়ে পরে আরও কিছু বলিব।

"যে শক্তি জলরাশিকে প্রবাহিত করিতেছে, তাহা নিরাকার" এই কথায় গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন;—"আমরা বলি গুণের দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে; অতএব গুণ ও শক্তি এক কি না? যাহাদ্বারা ক্রিয়া হয়, তাহাই শক্তি। জলকে যাহা প্রবাহিত করে, তাহা অবশ্য শক্তি। আমরা শক্তি বলিলে যাহা বুঝি তাহাই যদি গুণ হয়, তবে, অবশ্য গুণ ও শক্তি এক। ব্রহ্মশক্তি জলরাশিকে প্রবাহিত করিতেছে। কেবল জলরাশি কেন? ব্রহ্মশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেনঃ—"নগেন্দ্র বাবুর একটি মীমাংসা এই যে, নিরাকার ব্যতীত সাকারকে জানা যায় না; সাকারকে, নিরাকার জ্ঞান দেখাইয়া দেয়। ৬২৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "কেমন করিয়া জানিতে পারি যে, এই অসংখ্য অগণ্য সাকার পদার্থ রহিয়াছে? জ্ঞানদ্বারা। প্রথম প্রশ্ন, চক্ষুর দ্বারা সাকার পদার্থ দেখিয়া জানিলে হয় কি না যে সাকার পদার্থ রহিয়াছে, চক্ষু সাকার, অতএব উক্ত জ্ঞান লাভে সাকারের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইতেছে কি না?"

আমি বলিয়াছি, নিরাকার জ্ঞানদ্বারা আমরা সাকার পদার্থ সকলকে জানিতে পারি। গঙ্গেশ বাবু তদুত্তরে বলিতেছেন, "আমরা চক্ষুদ্বারা সাকার পদার্থ সকলকে দেখিয়া জানি। চক্ষু সাকার পদার্থ। অতএব সাকারের দ্বারা সাকার পদার্থ সকলকে দেখিয়া জানা হইতেছে কি না?"

অন্ধের সাকার চক্ষু আছে কিনা? অবশ্য আছে। তবে সে দেখিতে পায়না কেন? দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া। আমাদের সাকার চক্ষু আছে। দেখিতে পাই কেন? দৃষ্টিশক্তি আছে বলিয়া। তবে দেখুন, সাকার বা জড় চক্ষুদ্বারা যে আমরা দেখি, এমন নহে; দৃষ্টিশক্তিদ্বারাই আমরা সকল পদার্থ দেখিতে পাই। সাকার চক্ষুতে যে নিরাকার দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে সাকার পদার্থ সকল দেখাইয়া দিতেছে। চারিদিকে অসংখ্য অগণ্য সাকার পদার্থ রহিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল সাকার পদার্থকে দেখাইয়া দিতেছে কে? নিরাকার দৃষ্টিশক্তি। সুতরাং সাকারের দ্বারা সাকার দেখিতে পাই, ইহা অতি অসার কথা। নিরাকারের দ্বারাই সাকার পদার্থ সকলকে জানিতে পারি।

আর একটি কথা। আমার যে দুইটা সাকার চক্ষু আছে, তাহা কেমন করিয়া জানিলাম? ইহার এক সহজ উত্তর এই যে, জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারি যে, আমার দুইটা সাকার চক্ষু আছে। জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। যে দিক্ দিয়াই বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন যে, মূলে জ্ঞান। নিরাকার জ্ঞানদ্বারাই আমরা সাকারকে জানিতে পারি।

গঙ্গেশবাবু তৎপরে বলিতেছেন;—"দ্বিতীয় প্রশ্ন, পদার্থ ব্যতিরেকে পদার্থের জ্ঞান হয় কিনা, যদি না হয়, তবে পদার্থজ্ঞান সাকার সাপেক্ষ হইতেছে কিনা?"

পদার্থ ব্যতীত পদার্থের জ্ঞান হয় না।

সাকার পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অবশ্য সাকার পদার্থকে জানা চাই। জ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া কেমন করিয়া জ্ঞান সম্ভব হইবে? পর্ব্বতের জ্ঞান লাভ করিতে চাই, অথচ পর্ব্বত দেখিতে বা কোন প্রকারে পর্ব্বতের বিষয় অবগত হইতে চাইনা, সমুদ্রের জ্ঞান লাভ করিতে চাই, অথচ সমুদ্র দেখিতে বা কোন প্রকারে সমুদ্রের বিষয় জ্ঞাত হইতে চাইনা, ইহা তো বাতুলতা! সাকার পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সাকার পদার্থকে ছাড়িয়া তাহা হয় না। কেননা,সাকার পদার্থ উক্ত জ্ঞানের বিষয়।

সাকার ও নিরাকার, এই উভয় প্রকার পদার্থই জ্ঞানের বিষয়। পদার্থ বলিলে যে, কেবল সাকার পদার্থই বুঝায়, এমন নহে। জ্ঞান, জ্ঞানকে জানে। সূর্য্য যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, সেইরূপ, জ্ঞান আপনাকেই আপনি জানে। আপনাদ্বারাই আপনাকে জানে। জ্ঞান কেবল সাকারকেই জানে, এমন নহে।

জড় ও জড়ের জ্ঞান এক নহে। জ্ঞানদ্বারা সাকারকে জানি, কিন্তু জ্ঞান নিরাকার। ঐ বৃক্ষকে জানিতেছি। বৃক্ষ সাকার। কিন্তু যে জ্ঞান বৃক্ষকে জানিতেছে, উহা নিরাকার। বৃক্ষ ও বৃক্ষের জ্ঞান, এ দুই এক নহে। বৃক্ষ সাকার, বৃক্ষের জ্ঞান নিরাকার। জ্ঞান,জড়কে জানে, ও জ্ঞানকে জানে; কিন্তু উভয় স্থলেই জ্ঞান নিরাকার।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"পদার্থজ্ঞান সাকারসাপেক্ষ হইতেছে কিনা?" সাকার পদার্থের জ্ঞান, অবশ্য সাকারসাপেক্ষ। আমি তো এমন কথা বলি নাই যে, সাকার পদার্থের জ্ঞান,সাকারসাপেক্ষ নহে। তবে এ প্রশ্ন কেন? তাঁহার মনের ভাব কি এই যে, সাকার পদার্থের জ্ঞান, সাকারসাপেক্ষ হইলে আমাদের জ্ঞান সাকার হইয়া গেল? তাহা কি কখন হয়? ঐ নদীকে আমি জানিতেছি। নদী সাকার পদার্থ। কিন্তু নদী ও নদীকে জানা, এ দুই কিছু এক নহে। জানা মানে জ্ঞান, এবং জ্ঞান মানে জানা। নদী ও নদীর জ্ঞান ভিন্ন। নদী সাকার, জ্ঞান নিরাকার।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন;—"আমরা জানি শব্দ, স্পর্শ, রূপ রসাদি বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানই সাকারের দ্বারা লব্ধব্য। চিন্তা ও সাকার-লব্ধ জ্ঞানের আন্দোলন। যদি জ্ঞান সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত বহির্জগতের খবর দিতে পারে, তবে লোক যে এত অধ্যয়ন, ও দেশ ভ্রমণ করে, তাহা ত বৃথা।"

"সাকারের দ্বারা লব্ধ" এ কথার তাৎপর্য্য কি? দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম যে,বহির্জগৎকে জানিতে হইলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় সাকার হয়। জ্ঞানের বিষয় সাকার হইলেই যে, "সাকারের দ্বারা লব্ধব্য" এরূপ হইতে পারে না। বহির্জগৎকে কেমন করিয়া জানিতে পারি? আমাদের জ্ঞানদ্বারা। যদি আমার জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে, আমার নিকট বহির্জগৎ থাকা না থাকা সমান হইত। জ্ঞান আছে বলিয়াই বহির্জগৎকে জানিতেছি। আমার সম্মুখে বৃক্ষ রহিয়াছে। আমি বৃক্ষকে জানিতেছি। কেমন করিয়া জানিতেছি যে বৃক্ষ আছে? আমার জ্ঞানদ্বারা। ঐ কাষ্ঠপুত্তলিকা রহিয়াছে। উহা কি বৃক্ষকে জানিতেছে? না। কেন জানিতে পারিতেছে না? উহা অচেতন, উহার জ্ঞান নাই, সেই জন্য। আমার জ্ঞান আছে বলিয়া আমি ঐ বৃক্ষকে জানিতেছি। কাষ্ঠপুত্তলিকার জ্ঞান নাই বলিয়া উহা ঐ বৃক্ষকে জানিতে পারিতেছে না। তবে প্রতিপন্ন হইল যে, জ্ঞান দ্বারাই বহির্জগৎকে

জানা যায়। জ্ঞান নিরাকার। নিরাকার জ্ঞান-দ্বারা আমরা সাকার জগৎকে জানিতেছি। আমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছি যে, আমরা নিরাকারের দ্বারা সাকারকে জানি। জ্ঞান কেবল সাকারকে জানে, এমন নহে। নিরাকার জ্ঞান সাকার বহির্জগৎকে জানে, এবং নিরাকার অধ্যাত্মজগৎকেও জানে। সাকার ও নিরাকার উভয়ই নিরাকার জ্ঞানের বিষয়।

"যদি জ্ঞান সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত বহির্জগতের খবর দিতে পারে" ইত্যাদি কথার অর্থ কি? বহির্জগৎ ও সাকারজগৎ একই কথা। সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া সাকারের খবর দেওয়ার অর্থ কি? সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া সাকারের খবর দেওয়া আর সাকারকে না জানিয়া সাকারকে জানা, এ দুই একই কথা হইতেছে না কি? বহির্জগৎকে জানিতে হইলে সাকারকে জানিতে হয়। সুতরাং সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া, অথবা সাকারের খবর না হইলে সাকার জগৎকে জানা; অথবা অন্য কথায় সাকারকে না জানিয়া সাকারকে জানা, ইহা তো উন্মাদের কথা! গঙ্গেশবাবু যেমন করিয়াই কথাটা বলুন না কেন, কথাটা এইরূপ দাঁড়াইবে যে, যখন আমরা বহির্জগৎকে জানি, তখন সাকার পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়; কিন্তু জ্ঞান সাকারের দ্বারা লব্ধব্য, এরূপ কখনই প্রতিপন্ন হয় না। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার বিষয় লইয়াই আমাদের চিন্তার ক্রিয়া হইয়া থাকে। জড় জগৎ আছে, এ সংবাদ দেয় জ্ঞান। অজ্ঞান হইয়া গেলে জানিতে পারিনা। সুষুপ্তি বা সমাধিতে বহির্জগতের জ্ঞান থাকে না। বহির্জগৎ থাকিলেও সুষুপ্ত ও সমাধিস্থ ব্যক্তির নিকট উহা না থাকার তুল্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, "সাকারের দ্বারা লব্ধব্য" এ কথার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। এক প্রকার অর্থের কথা বলিলাম, ও তাহার সমালোচনাও করিলাম। আর এক প্রকার অর্থ এই হইতে পারে যে, সাকার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করি।

সাকার বা জড়ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে জড় জগতের জ্ঞানলাভ করি না, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শরীরের যে জড়ীয় অংশকে চক্ষু বলা হয়, তাহাদ্বারা আমরা জড়জগৎকে দর্শন করি না। শরীরের যে জড়ীয় অংশকে কর্ণ বলা হয়, উহাদ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি না, ইত্যাদি। দৃষ্টিশক্তি-দ্বারা আমরা জড়জগৎকে জানি। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নিরাকার। সাকার চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও, উহা নিজে নিরাকার। সাকার জগৎ, দর্শনশক্তি বা দর্শনজ্ঞানের বিষয়। সাকার জগৎ, নিরাকার দর্শনশক্তি বা দর্শনজ্ঞান দ্বারা 'লব্ধব্য'। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তিই নিরাকার। সুতরাং "শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানই সাকারের দ্বারা লব্ধব্য" ইহা নিতান্তই অসার কথা।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন—"সাকার জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়েরা যে সকল সংবাদ আহরণ করিয়া জ্ঞানকে উপহার দেয়, জ্ঞান তাহা সাদরে গ্রহণ করে, এইরূপে জ্ঞান দৃষ্টিলাভ করিয়া ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত সংবাদের দ্বারা বহির্জগৎ জানিতে পারে।"

ইন্দ্রিয়েরা সংবাদ সংগ্রহ করে, এ কথার অর্থ কি? জ্ঞানকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়ের কি স্বতন্ত্রশক্তি বা ক্রিয়া আছে? যে ব্যক্তি হতচেতন,—অজ্ঞান, তাহার ইন্দ্রিয়ের কি কোন কার্য্য হয়? যাহাকে ইন্দ্রিয় বলিতেছেন,

উহা এক প্রকার জ্ঞানমাত্র। দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান ইত্যাদি। সকলই জ্ঞান। সাকার ও সাকারের জ্ঞান এক নহে। জ্ঞান বলিয়া দেয়, সাকার আছে। একটা বিষয়ী, আর একটা বিষয়। উভয়ের মধ্যে অবশ্য সম্বন্ধ আছে।

আমি লিখিয়াছিলাম;—"এই অত্যদ্ভুত সুকৌশলময়, পরম সুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে।" ইহাতে গঙ্গেশ বাবু বলেন;—'বিশ্বদর্শন করে, এরূপ চক্ষু কাহার আছে? সুতরাং অংশ অবলম্বন করাই সঙ্গত হইতেছে। বিশ্বদর্শন শব্দ আমি ব্যবহার করি নাই। সাধারণ ভাবে বিশ্ব ও তদন্তর্গত পদার্থ নিচয় অবলম্বনে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিয়াছি। বিশ্বকে অবলম্বন করিতে হইলে, বিশ্বকে দেখা চাই। কিন্তু বিশ্ব দর্শন বলিলেই যে, সমগ্র বিশ্বদর্শন বুঝায়, এমন নহে। জগৎ দেখিতেছি বলিলে, অসীম জগৎ সকলই দেখিতেছি, এমন বুঝায় না। আংশিক দর্শনের স্থলেও লোকে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় গিয়া হিমালয় দেখিয়া বলেন, "আমি হিমালয় দর্শন করিলাম" গঙ্গেশ বাবু কি তাহার কথায় আপত্তি করিবেন? সে ব্যক্তি তো হিমালয়ের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত;—উহার প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখে নাই; তবে সে কেন বলে হিমালয় দর্শন করিলাম? কোন ব্যক্তি যদি গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গা দেখিয়া বলে, "গঙ্গাদর্শন করিলাম" গঙ্গেশ বাবু কি তাহার কথায় আপত্তি করিবেন? তিনি কি বলিবেন যে, সে ব্যক্তি হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, গঙ্গার সমুদয় অংশ তো দেখে নাই, তবে সে কেন বলে, গঙ্গা দর্শন করিলাম? আংশিকদর্শনেও লোকে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং বিশ্বদর্শন বলিলে দোষ হয় না। এস্থলে বিশ্ব অর্থে মানুষ বিশ্বের যতদূর জানিতে পারে। উহাই বলা অভিপ্রায়।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন;—'৬২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, তিনি অনন্ত; মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি নাই। সাকার নিরাকারের কথা থাক্। অনন্ত কি, তুমি বোঝ? যাহা বোঝ না, তাহা উপাসনা করিবে কিরূপে? যদি অনন্তকে ক্ষুদ্র করিতে না পার, তবে তোমার উপায় কি?"

গঙ্গেশ বাবু যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, সেই প্রবন্ধের মধ্যেই এই সকল কথার উত্তর রহিয়াছে। যদি তিনি সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া উত্তর লিখিতেন, তাহা হইলে, হয় তো, তাঁহাকে এই সকল অযুক্ত কথা বলিতে হইত না। উক্ত প্রবন্ধের সেই অংশটি এস্থলে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে। সেইজন্য উহার কোন কোন স্থান হইতে কয়েক পংক্তি করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই গঙ্গেশ বাবুর কথার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

"অনন্ত কি তুমি বোঝ?" পরিমিত কাহাকে বলে, সকলেই বুঝে। কিন্তু অনন্ত কাহাকে বলে? অনন্তের লক্ষণ কি? যাহা পরিমিত অপেক্ষা বড়, তাহাই অনন্ত। যখন পরিমিতকে জানি, তখন পরিমিত অপেক্ষা বড়, এই বাক্যে কি ভাব, কি জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহা অবশ্যই আমরা বুঝি।

"পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। আপেক্ষিক জ্ঞান পরস্পরকে প্রকাশ করে। ভাল, মন্দ; হ্রস্ব, দীর্ঘ; পিতামাতা, সন্তান; পাপ, পুণ্য; ইত্যাদি জ্ঞান পরস্পর

আপেক্ষিক। যে ভালকে জানে, সে মন্দকেও জানে; যে মন্দকে জানে, সে ভালকেও জানে। যে হ্রস্ব কি,জানে,সে দীর্ঘ কি,তাহাও জানে। পিতা মাতা বলিলেই সন্তান বুঝায়; সন্তান বলিলেই পিতামাতা বুঝায়। পাপ বলিলেই পুণ্য বুঝায়; পুণ্য বলিলেই পাপ বুঝায়। সেইরূপ, পরিমিত বলিলেই অনন্ত বুঝায়; অনন্ত বলিলেই পরিমিত বুঝায়। যাহার পরিমিতের জ্ঞান আছে, তাহার অনন্তের জ্ঞানও আছে। অনন্তকে না জানিলে, পরিমিতকেও জানা যায় না। দার্শনিকেরা বলেন, আপেক্ষিক জ্ঞান, ভিন্ন হইলেও, বাস্তবিক একই জ্ঞান।"

অনন্তকে বুঝি এবং বুঝি না, এ উভয়ই সত্য। বুঝি এবং বুঝি না, এই দুটি দিক্ দেখিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়। এ বিষয়ে মূল প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তবে অনন্তকে বুঝি না, এ কথার কি কোন অর্থ নাই? ইহার অর্থ এই যে,আমাদের পরিমিত মনে উহার ধারণা হয় না। অনন্তকে অনন্ত বলিয়া বুঝিতে পারি; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারি না। উহা apprehend করিতে পারি, কিন্তু comprehend করিতে পারি না। অনন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে উহা ধারণ করিতে পারি না।"

উক্ত প্রবন্ধে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কেবল যে অনন্তের ধারণা হয় না, এমন নহে। সকল পরিমিত পদার্থেরও আমাদের ধারণা হয় না। যে পরিমাণে পদার্থ বৃহৎ হইবে, সেই পরিমাণে তাহার ধারণা অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। ইয়োরোপীয় দার্শনিক এইরূপ জ্ঞানকে symbolic conception বলেন।

তিনি অনন্ত হইলেও তাঁহার উপাসনা কেমন করিয়া সম্ভব হয়,তদ্বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"সেই অনন্ত পুরুষকে মনুষ্য ধরিতে পারে না; অথচ সাধক তাঁহাকে ধরিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করেন। একটি কলসে মহাসমুদ্র হইতে জল তুলিলাম। মহাসমুদ্র কলসের মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু কলসের যতটুকু আয়তন, সেই পরিমাণ সমুদ্রজল উহাতে অবশ্যই ধরিবে। পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন, তাহাতে কি? আমার হৃদয় যতটুকু, সেই পরিমাণে তাঁহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। আমার হৃদয় কলসের যেরূপ আয়তন,অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্য প্রবিষ্ট হইবে। কিন্তু হৃদয় কলসের এমনি প্রকৃতি যে, উহা ক্রমেই বড় হইতে থাকে। যতই বড় হয়, ব্রহ্মসাগরের জল ততই অধিক পরিমাণে উহাতে প্রবিষ্ট হয়।''

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"অনন্ত কি, তুমি কি বোঝ? যাহা বোঝনা, তাহা উপাসনা করিবে কিরূপে?" গঙ্গেশবাবু, যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই একথার উত্তর রহিয়াছে। সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য সহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই, তাঁহাকে এই সকল অযুক্ত কথা লিখিতে হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে;—

'পরমেশ্বরকে বুঝি না বলিয়াই তিনি আমাদের উপাস্য। যাহাকে বুঝিয়া লইয়াছি, তাহাকে গ্রাহ্য করে কে? তাঁহাকে কেহ বুঝে না, জানে না। সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন হার মানিয়াছে। সেই জন্যই জগৎ

তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে। সেই জন্যই তিনি আমাদের উপাস্য। ক্ষুদ্র, পরিমিত কখন উপাস্য হইতে পারে না।"

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন;—"যদি অনন্তকে ক্ষুদ্র করিতে না পার, তবে তোমার উপায় কি?" আবার বলিতেছেন;—"আমি বলি, নিরাকার মূর্ত্তি অনন্ত,উপাসনা করিতে হইলে অনন্তকে সান্ত করিয়া লইতে হয়।" মূল প্রবন্ধেই এ কথার উত্তর রহিয়াছে। নিম্নে সেই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে ধরিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে ছোট করিও না। আপনাকে বড় কর। তোমার হৃদয়,মন, আত্মাকে প্রশস্ত কর। যতই তোমার হৃদয়, মন ও আত্মা প্রশস্ত হইবে, ততই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই অনন্ত পুরুষকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে ধারণ করিতে পারিবে। পিতা মহৎলোক। পুত্র তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পিতার মহত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়া কি সে একজন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা বলিবে? মহাপণ্ডিতের মূর্খ পুত্র, পিতার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় কিছু বুঝে না বলিয়া কি একজন মূর্খকে পিতা বলিবে? ক্ষুদ্র অবোধ শিশুর পিতা, মহাজ্ঞানী, মহাক্ষমতাশালী; পিতার জ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয় শিশু কিছুই বুঝে না। না বুঝিলেও তাহাতে কি? সে পিতার চরণতলে বসিতে পারে; সরল নির্ম্মল প্রেমে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পারে।"

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন;—"মানুষ সামান্য একটু মাটীতে হাত বুলাইয়া ভগবানকে সৃজনের অপরাধী হইতেছে; কিন্তু যিনি স্বয়ং নিরাকার হইয়া, আবার এই সাকার বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাকে অপরাধী করা হয় না কেন? বিশ্ব ত সাকারবাদী নির্ম্মাণ করে নাই!"

সাকারবাদী বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। যাহার মূর্ত্তি আছে, তাহারই প্রতিমূর্ত্তি সম্ভব। কিন্তু যাহার মূর্ত্তি নাই, তাহার প্রতিমূর্ত্তি কেমন করিয়া হইবে? এ জগৎ ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ, ইহা সত্য; কিন্তু ইহা ব্রহ্মের প্রতিমা নহে। আদৌ যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিরূপ কেমন করিয়া হইবে? সেই জন্য পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি তাঁহাকে "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা,—ইহা নহে, ইহা নহে, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না এবং ইহাও জানি না যে, কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্ম বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ॥"

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই,এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হন নাই।

গঙ্গেশ বাবু উপনিষদের এই দুটি শ্লোকের দুটি অংশের প্রতি মনোযোগ করিবেন। ১ম "তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। ২য় "আপনিও অন্য কোন বস্তু হন নাই।" তিনি সকল হইতে ভিন্ন এবং সকলের অতীত, ইহাই ধ্রুব সত্য। তবে,জগদ্ব্রহ্ম মতের

প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

গঙ্গেশ বাবু বলেন ;—"লেখক মনকে নিরাকার বলেন ; সুখ, দুঃখ, দয়া, প্রেম এ গুলিও নিরাকার, আবার স্বয়ং ঈশ্বরও নিরাকার। অতএব এই সকল ও অন্যান্য যত নিরাকার তিনি অবগত আছেন, তাহাদিগের পরস্পরের প্রভেদ কি ? যদি প্রভেদ না থাকে, তবে ঈশ্বরে, মনে, সুখে, দুঃখে পার্থক্য থাকে কিরূপে ?"

আকার নাই এইটুকু সাদৃশ্য, তাহা ভিন্ন অনন্ত প্রভেদ। জল তরল পদার্থ, তৈলও তরল পদার্থ, সেই জন্য কি জলকে তৈল বলিব ? মৃৎখণ্ড জড়, কোহিনুরও জড়, সেই জন্য কি মৃৎখণ্ডকে কোহিনুর বলিব ? একটা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেই যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, ইহা অতি অসার কথা। আকার নাই, এই অভাবাত্মক প্রভেদটুকু আছে বলিয়া,মানুষের মন ও ঈশ্বর এক হইয়া গেল, ইহার তুল্য অযুক্ত কথা আর কি আছে ?

গঙ্গেশ বাবু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে কঠিন বলিয়াছেন। নিশ্চয়ই কঠিন। যথার্থ ধর্ম্ম যাহা, মুক্তির প্রকৃত পথ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই কঠিন। একান্ত যত্ন ভিন্ন কেহ কখন ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হইতে পারে না। কঠিন হইলেও উহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র পথ। ইহাই নির্ম্মল জ্ঞানের মীমাংসা। পরিত্রাণের আর অন্য পন্থা নাই। ইহাই পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণের উপদেশ।

"নান্যপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।"

গঙ্গেশ বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে কবিত্ব ও রসিকতা সহকারে যাহা বলিয়াছেন,তাহার তাৎপর্য্য এই যে,তুমি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক বলিয়া সাকার উপাসককে অবজ্ঞা ও ঘৃণা কর কেন ? সে অক্ষম বলিয়া নিকৃষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত আছে। তজ্জন্য কি তাহাকে ঘৃণা করা উচিত ? তুমি কি প্রমাণ করিতে পার যে, সে পাপ করিতেছে ?

সাকার উপাসককে যে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে সে ব্রহ্মোপাসক নহে। ব্রহ্মোপাসকের নিকট জগতের সকলেই প্রেমের আস্পদ। সাকার উপাসনা যে পাপ, এমন কথা কে বলে ? উহা ভ্রান্তি, অজ্ঞান। জ্ঞানের প্রকাশে ভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে, মানুষ চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপের উপাসনা করিতে অধিকার লাভ করে। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমাদের স্বদেশবাসী নরনারী সকলে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার সুনির্ম্মল উপাসনা অবলম্বন পূর্ব্বক পরিত্রাণ পথে অগ্রসর হউন। একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের জয়পতাকা, ভারতের গৃহে গৃহে উড্ডীন হউক। ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ব্রহ্মনামের জয়ডঙ্কা নিনাদিত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসার ও তাঁহার বিজ্ঞাপন।

আজ কয়েক মাস হইতে কলিকাতা মহা নগরী দারুণ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে শশব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। ছাত্রনিবাসে, ধনীর অট্টালিকায়, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে,মধ্যশ্রেণীর আবাসে, কোথাও ইহার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। যাঁহাদের পলাইবার পথ আছে, তাঁহারা পলাইয়াছেন ও পলাইতেছেন। ১৮৬১ সালের পরে বসন্ত রোগ এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে নাই। সপ্তাহের পর সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যার তালিকা দেখিয়া সকলের মনে ভীতির সঞ্চার

হইয়াছে। কোন এক সপ্তাহে ২৩৩ জন কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। আজও প্রতি সপ্তাহে ৪০।৫০ জন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে। কলিকাতার ভ্যাক্সিনেসনের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বলিয়াছেন যে,গত ২০।২৫ বৎসর মধ্যে কখনই তাঁহাকে ইহার অর্দ্ধেকও পরিশ্রম করিতে হয় নাই। প্রত্যহ প্রাতে ৫ টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এক নিমেষের জন্য তাঁহার বিশ্রাম নাই। ভ্যাক্সিনেসন বিভাগের এইরূপ কার্য্য দ্বারা যে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি,তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের ধূয়া ধরিয়া অনেকে আবার হুজুকে মাতিয়া "টিকা দিয়া যত বসন্ত হইতেছে" এই কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করায়, সাধারণ লোক গোলমালের মধ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ করা ডাক্তর, স্কুল মাষ্টার, হাতুড়ে, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসক নামধারী লোকেরা এই অবসরে কিছু পয়সা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, এখনও তাই। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। ইহারা বসন্ত রোগ নিবারণের কত প্রকার অব্যর্থ মহৌষধি প্রচার করিলেন,তাহার সংখ্যা নাই। আমাদের নিকট দুই চারিটী ঔষধ এণ্টিভেরিওলা সার্টিফিকেট লইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। দুই এক জন সার্টিফিকেটের বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যখন বলিলাম,পরীক্ষা করিবার ত লোক পাই না,তবে আপনাদের নিজের শরীরে যদি এই ঔষধ পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হন,তাহা হইলে হয়। ইহাতে আনন্দের সহিত স্বীকার করিলেন; কিন্তু যখন বলিলাম যে,এই ঔষধ সেবন করিয়া ৪।৫ জন বসন্ত রোগীর নিকট তাহাদের সম্পূর্ণ আরোগ্য পর্য্যন্ত অনবরত থাকিতে হইবে, তখনই তাঁহাদের মুখ শুকাইল,আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন,পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা ভ্যাক্সিনেসনের ফলাফলের উপর সন্দিহান্ হইয়াছেন,তাঁহাদের গোচরার্থে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। প্রথমতঃ, ভ্যাক্সিনেসন যে বসন্ত নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা আমরা বলি না এবং কোন রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ যে নাই,তাহা আমরা বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ, অধিক স্থলে বসন্ত রোগ নিবারণার্থে ইহার ন্যায় ঔষধ নাই। কিন্তু রোগ বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পর ভ্যাক্সিনেসনে কোন ফল হয় না। তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান মহামারীর সময়,ভ্যাক্সিনেসনের পরও কোন কোন লোককে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে; উপরোক্ত দুটী কারণ ভিন্ন তাহার আরও একটী প্রধান কারণ এই যে, অনেক স্থলে লিম্ফ দিয়া ভ্যাক্সিনেসন হয় নাই। শোণিত দিয়া হইয়াছে,ইহা কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। লিম্ফের যে অত্যন্ত অভাব পড়িয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। আর এক কথা এই, বিপদের সময় যাকে তাকে ধরিয়া ভ্যাক্সিনেটর করা হইয়াছিল, অনেক নাড়া-বুনে কীর্ত্তুনে হইয়া উঠিয়াছিল। Vaccine vesicle হউক আর নাই হউক, কোন রূপে একটা ফোস্কা করিয়া দিতে পারিলে হইল ; তাই অনেক স্থানে ভ্যাক্সিনেসনের পর প্রদাহ হইতে দেখা গিয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, মিউনিসিপাল হেল্‌থ্ ডিপার্টমেণ্ট কিরূপ কাজ করিয়াছেন। কলিকাতার ১৯টী ওয়ার্ডে ৫টী মেডিকেল ইন্স-

পেক্টর আছেন এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটী করিয়া কন্সারভেন্সি ইন্সপেক্টর ও তিন জন কন্সারভেন্সি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করা, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা ইহাদের কর্ত্তব্য। মেডিকেল ইন্সপেক্টর ও কনসারভেন্সি ইন্সপেক্টরেরা প্রত্যেকে মাসিক ১২০৲ টাকা বেতন পান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ ২০০৲, ৩০০৲ ও ৪০০৲ টাকা বেতন পান। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী ও কমিসনারদিগের প্রাণশক্তির যে একেবারে অভাব, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কলিকাতার গলিতে গলিতে আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধের আধিক্য কে না দেখিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন? যেখানে ড্রেন খোলা হয়, সেখান দিয়া গমন করে কার সাধ্য? বোম্বাই মহানগরীতে কলিকাতা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে জল পাওয়া যায়, তথাচ সেখানকার ড্রেন এত দিন উদ্গীরণ করে না। এখানকার ড্রেনের এরূপ অবস্থায় স্থানে স্থানে ভেণ্টিলেটর পাইপের বন্দোবস্ত কেন না হয়? কলিকাতার গলির কথা দূরে থাক্, বড় বড় রাস্তারও দুর্দ্দশা কম নয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—হ্যারিসন রোডে একটী বাটীতে ২ বৎসর হইল হেল্‌থ্ অফিসার একটী পাইখানার অনুমতি দেন; কিন্তু ঐ পাইখানার ময়লা-জল নির্গমের কোন পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেন নাই। প্রতিদিন প্রায় ১৫।২০ জন লোক ঐ পাইখানা ব্যবহার করে; তাহাদের সকলের শৌচ জল ও প্রস্রাব নিকটস্থ ভূমিতে একটী গর্ত্তে থাকে। ইন্সপেক্টর প্রভুরা নিজে ত দেখেন না, তাঁহাদিগকে আজ দুই মাস হইল জানান হইয়াছে এবং তৎপরে ইণ্ডিয়ান মিরার কাগজে এই nuisance এবং আরো ২।৪ টার বিষয় লেখা হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিহিত হয় নাই। কিছু দিন হইল, কন্সারভেন্সি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের মধ্যে কোন একজন ঘুষ লওয়া বা ঐরূপ কোন অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কার্য্য ভাল চলিতেছে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ সব দেখে কে? প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক একটী কন্সারভেন্সি ইনস্পেক্টর এবং ১৯টী ওয়ার্ডে কেবল মাত্র নামে ৫টী কার্য্যতঃ ৪টী মেডিকেল ইন্সপেক্টর আছেন। কার্য্যতঃ ৪টী বলিয়াছি, কেন না, একটীকে (বাবু শশিভূষণ ঘোষকে) হেল্‌থ্-অফিসার তাঁহার নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এই কন্সারভেন্সি ইনস্পেক্টরদিগের পরিবর্ত্তে যদি সকলেই মেডিকেল ইন্সপেক্টর হন, তাহা হইলে কার্য্য ভাল চলিতে পারে। অবশ্য এই রোগ বিস্তারের সময় ৪ জনের স্থলে ৮জন হইয়াছেন। ইহাদের পরিশ্রমের ত্রুটী দেখি নাই, তথাচ ই[illegible] স্ব স্ব কার্য্য যথাযথ রূপে সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহাদের একচতুর্থাংশ কার্য্য যদি আমাদের হেল্‌থ্-অফিসার করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এ বিপদের কতদূর লাঘব হইত, বলিতে পারি না। লাঘব না হইলেও যে, আমাদের মন বিশেষরূপ শান্তি পাইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমাদের হেল্‌থ্-অফিসার কি করেন? তিনি সপ্তাহে দুইদিন (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) সহরের মধ্যে গাড়ী হাঁকাইয়া যান। নেটিভ কোয়ার্টরে তাঁহাকে অতি অল্পই দেখা যায়। গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পরিদর্শন করিতে প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যায় না। তবে কালে ভদ্রে কখনও নালিস হইলে, তখন তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। প্রতিবাসীর

বিরক্তিভয়ে যে অতি অল্প সময়েই নালিস হয়, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি ২।৩ টার সময় আফিসে আইসেন ও ৪।৫টার সময় চলিয়া যান। ইঁহার সহকারী (Assistant Health officer) প্রত্যহ প্রাতঃকালে একবার সহর ঘুরিবেন, নাম মাত্র কথা আছে। তৎপরে আফিসে যত কেরানির কাজ, সই, দস্তখত, রিপোর্ট, রিটারন প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহা হইতে প্রধান কার্য্যের অতি অল্পই প্রত্যাশা করা যায়।

আমাদের হেল্‌থ্-অফিসারের দায়িত্ব বোধের সহিত জাহাজের কাপ্তেনের দায়িত্ব বোধের তুলনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। ১৫।১৬টী কাপ্তেনের সহিত ১৫।১৬ বার জলযাত্রায়, প্রত্যেক বার ২০।২৫ দিন হইতে ৫৪ দিন পর্য্যন্ত কাটাইয়া,যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার কথা বলিতেছি। এই কাপ্তেনদের মধ্যে ২৫। ২৬ বৎসরের যুবাপুরুষ হইতে ৫০।৫৫ বৎসরের বৃদ্ধও ছিল। বিপদের সময় ইঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছি এবং সমগ্র ইংরাজজাতিকে ভাল বাসিয়াছি। সাধারণতঃ অন্যান্য কর্ম্মচারী-রাই জাহাজের প্রায় তাবৎ কার্য্য চালাইয়া থাকেন। কাপ্তেন কেবল দ্বিপ্রহরের সময় জাহা-জের অবস্থিতি স্থান,গম্য পথের কতদূর আসি-য়াছে,এবং কত বাকী আছে,এই সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া,জাহাজের গতি কিরূপ হইবে, বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু যখন জলবি-প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণরূপ ধারণ করে, প্রবলবাত্যা বহিতে থাকে,ঘোর ঘনমেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ক্ষুদ্র পোতকে সজোরে আঘাত করে এবং পোতের ক্ষুদ্র জীবন বিপদাপন্ন হয়, তখন কাপ্তেন আর কাহারও উপর নির্ভর করেন না। তিনি স্বয়ং সমস্তভার গ্রহণ করেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত হালের নিকট রহিয়াছেন। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে,ভ্রূক্ষেপ নাই। দিগ্দর্শনের কাঁটাকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাইয়া দেও, সে যেমন ঠিক উত্তরদিকে থাকে, সেইরূপ, এই দুর্দ্দিনের সময় কাপ্তেন হালের নিকট থাকিয়া কিরূপে তাঁহার পোতকে কিনারায় লইয়া যাইবেন, অনন্যমনে কেবল তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। খানসামা সেই Bridgeএর উপর খাদ্য রাখিয়া আইসে,যদি সুবিধা ও সময় হয়,তাহা হইলে সেই ঝড় জলের মধ্যে দাঁড়া-ইয়া কিঞ্চিৎ আহার করেন, নতুবা পড়িয়া থাকে। আমাদের হেল্‌থ্-অফিসার নামে ইংরাজ বলিয়া বোধ হয়; তিনি যে এই মহাধর্ম্মে বঞ্চিত, কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাঁহার আচার ব্যবহারে বিশেষ ভাবে তাহার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এ দোষ তাঁহার নহে, ইহা ভারতবর্ষের মাটীর দোষ। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই অবনতির অনেকগুলি কারণ ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলে বহিতেছে। প্রথম কারণ, তাঁহার শুভাগমনের অল্প দিন পরেই কমিসনারদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ফিল্টার জল সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন,তাহাতে কমিসনরদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি বা ভর্ৎসনা যথেষ্ট ছিল। সকলই যদি রাম শ্যামের ন্যায় কমিসনর হইতেন,তাহা হইলে কিল খেয়ে কিল চুরি করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, দুই চারি জন বাঘ-ভাল্কো কমিসনরও আছেন, তাঁহারা শুনিবেন কেন? একজন বলিয়া বসি-লেন, ডাক্তার সিমসনের জানা উচিত যে, তিনি কমিসনরদিগের ভৃত্য, প্রভুর নিকট যেরূপ ভাষা লেখা উচিত সেরূপ হয় নাই।

আর তিনি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। কুক্ষণে এই বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহাই ডাক্তার সিমসনের অবহেলার প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ১৬০০।১৭০০৲ টাকা মাসিক বেতন ছাড়া ডাক্তার সিমসনের পক্ষে সামান্য দুঃসাহসের কার্য্য নহে, সুতরাং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্যের এইরূপ মন কসাকসিতে, মন দিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তৎপরে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার ম্যাক্লিয়ড স্বদেশযাত্রা কালে মেডিকেল গেজেটের সম্পাদকের ভার তাঁহার উপর দিয়া যান। এই নূতন কার্য্যে শুনিতে পাই, তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পান। ইহার জন্য যে তাঁহার বিশেষরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রবন্ধ লেখা ও সম্পাদকের কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মেডিকেল গেজেটের ভার তাঁহার হস্তে থাকায় তাঁহার প্রধান কার্য্যের যে কিছু না কিছু ক্ষতি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এদেশের লোককে কলেরা হইতে রক্ষা করিতে হাফকিনের আবির্ভাব, হেল্‌থ্‌-অফিসারের কার্য্যের অবহেলার তৃতীয় কারণ। ডাক্তার সাহেব দেখিলেন, "সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, সিমসন কেবল ঘুমায়ে রয়।" দেখিলেন, যুবক হাফকিন একটা নাম কিনিয়া যায়, সুতরাং তিনি উঠে পড়ে লাগিলেন। Laboratory সার করিলেন, যে টুকু সময় আফিসে থাকেন, তাহা ব্যাক্টিরিয়া দেখিতে দেখিতেই চলিয়া যায়, নিজের কাজ দেখিবেন কখন? আমরা কি এইরূপ বিজ্ঞান অনুশীলনের বিরোধী?—না, কখনই নহে। আমরা জানি, মিউনিসিপালিটী কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নহে এবং হেল্‌থ্‌-অফিসারের পদের বেতন সাহিত্য বা বিজ্ঞানানুশীলনের জন্য বৃত্তি নহে। ডাক্তার ম্যাক্লিয়ড, পেন প্রভৃতি অন্যান্য হেল্‌থ্‌ অফিসারদিগের অন্য কার্য্য ছিল। সমগ্র সময় মিউনিসিপালিটীতে দিতে পারিতেন না বলিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিলাত হইতে ডাক্তার সিমসনকে আমদানি করা হইয়াছে। তাঁহাকে মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হয়, এবং তিনি সপ্তাহে দুই দিন চৌরঙ্গির মাঠে হাওয়া খাইবেন বলিয়া মাসিক ১৫০৲ টাকা গাড়ীভাড়া দেওয়া যায়। আজকাল সংবাদ পত্রে—অবশ্য দেশী সংবাদপত্রে, তাঁহার কার্য্যের অবহেলার কিছু তীব্র সমালোচনা চলিতেছে; তাই বুঝি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়াই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বসন্ত রোগীর ঘরের দ্বারে দ্বারে এই নোটীসটী জারি করিয়াছেন।

"তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তুমি গৃহে থাকিয়া বসন্ত রোগের সংক্রমণতা বিস্তার করিতেছ বা করিতে পার, তজ্জন্য তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে, যদি তুমি ১২ ঘণ্টার মধ্যে হাঁসপাতালে না যাও, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ২৬৯ ধারা অনুসারে তোমাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত করা হইবে"। *

যে ধারাটীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই—

"যদি কেহ জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়াও অসাবধানতা পূর্ব্বক এমন কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করে, যদ্দ্বারা কোন রোগের সংক্রমণতা বশতঃ রোগ বিস্তার করিয়া

* "You are hereby informed that by remaining—you are spreading or likely to spread the contagion of smallpox and you are warned that unless you within 12 hours remove yourself to hospital you will be prosecuted before a Magistrate under Sec. 269 of I. P. Code."

জীবনে বিপদ আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ছয়-মাস পর্য্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তিই গ্রহণ করিতে হইবে"। *

এ ধারাটী সুযোগ্য আইনজ্ঞ ইণ্ডিয়ান নেসন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যেরূপ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

"প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, এই ধারা অনুযায়ী দোষী হইতে হইলে, কোন একটী বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। কেবল গৃহে অবস্থিতি করিলে বা শয্যাশায়ী হইলে ঐরূপ অপরাধমূলক বিশেষ কার্য্যকরা হয়, ইহাই কি এই ধারার মর্ম্ম? বসন্তরোগীর অবস্থা অনুধাবন করিয়া আমরা এই দেখিতে পাই যে,রোগী কিছুই করে না, কেবল অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কয়েকটী স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ জীবন ধারণ করে। তাহার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবেরা তাহার যাতনা নিবারণের জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করে। বাস্তবিক রোগী কিছু বীজ বিস্তার করে না; যাঁহারা তাঁহার নিকটে আইসেন এবং নানা স্থানে গমনাগমন করেন,তাঁহাদের দ্বারাই রোগ বিস্তার হয়। কোন লোক নিজের ঘরে বসিয়া জনসাধারণের শ্রুতির অগোচর অশ্লীল সঙ্গীত করিলে কোন সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে যেমন সে অপরাধী হইতে পারে না,সেইরূপ বসন্তরোগী কেবল গৃহে বাস করিয়া,সাধারণ স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ অপরাধী হইতে পারে না"।

কোন স্থানে অবস্থিতি করাকে যদি সংক্রমণতা বিস্তার করা বলা যায়, তাহা হইলে হাঁসপাতালশায়ী এই রোগগ্রস্ত যত রোগী সকলেই এই রোগ বিস্তার করিতেছে, বলা যাইতে পারে, কেননা যে সকল চিকিৎসক তাহাদের দেখিয়া থাকেন এবং যে সকল লোক তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে,তাহারা সকলেই রোগী হইতে রোগ গ্রহণ করিতে পারে। যে সকল গাড়ী পাল্কি রোগীকে হাঁসপাতালে লইয়া যায়, তাহাদ্বারাও রোগবিস্তার যথেষ্ট হইয়া থাকে। আমরা কখন এরূপ ধারণা করিতেই পারি না যে, সংক্রামক রোগগ্রস্তরোগী সকলকে গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দ ও আত্মীয় স্বজনের সেবা শুশ্রূষায় বঞ্চিত করিয়া বলপূর্ব্বক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য। আইনে ত হাঁসপাতালের কথা দেখিতে পাই না। সংক্রামক বিপদজনক রোগগ্রস্ত রোগীরা যেন সাধারণ লোকের মধ্যে গমনাগমন না করে, ইহাই এই ধারার স্পষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। কোনও জ্ঞানী সংব্যবস্থাপকের ইহা হইতে স্বতন্ত্র অভিপ্রায় হইতে পারে না। কুষ্ঠরোগ ক্ষতাবস্থার বিশেষ সংক্রামক। ইহা অন্য কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন; সেইজন্যই কুষ্ঠরোগীকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার নূতন আইনের সৃষ্টি। কিন্তু এ আইনে ত যাহারা নিজ গৃহে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,তাহাদের বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার বিধি দেখি না, কেবল নিরাশ্রয় রোগীকে কুষ্ঠাশ্রমে প্রেরণ করিবার বিধি আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,কোন রোগগ্রস্ত হইয়া গৃহে বাস করা কখনই অপরাধ হইতে পারে না। সুতরাং হেল্থ্-অফিসারের এই বিজ্ঞাপনটীর বিষয় আমরা যতই আলোচনা করি, ততই স্তম্ভিত হই। এই নোটিস জারিকে উৎপীড়ন,স্বেচ্ছাচারিতা,ক্ষমতার অপব্যবহার ভিন্ন আর কি বলিব? ইহা জন সাধারণের স্ব স্ব স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেছে। অনেক রোগই বিপদজনক, এক সংক্রামক রোগের সংখ্যা বড় অল্প নহে। টাইফস,টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, হাম, বসন্ত প্রভৃতি যে

* "Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine or with both.'

কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে আমাদের দুর্দ্দশার আর শেষ থাকিবে না। আমাদের নিজ গৃহকে আর গৃহ বলিতে পারিব না। যাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহাদের সেবাশুশ্রূষায় আমাদের কোন অধিকার থাকিবে না! আমাদের জননী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতাভগ্নী প্রভৃতির কোমল হস্ত আমাদের যাতনা নিবারণ বা লাঘব করিতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না! এবং ইহাদের নিকট থাকিয়া মৃত্যুর সুখভোগ করিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা আমাদের ন্যায় স্বজন-সঙ্গাভিলাষী হিন্দুজাতির ভাগ্যে শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে? আর হয় ত একে একে এক হাঁসপাতাল হইতে অন্য হাঁস পাতালে তাড়িত হইয়া, অবশেষে কোন একটী ভয়ানক স্থানে অর্থগ্রাহী ভৃত্যের যদৃচ্ছা সেবার উপর নির্ভর করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? আবার দেখুন, এ বিজ্ঞাপনটী কেবল বয়স্ক পুরুষদিগের জন্য নহে। ইহার দ্বারা শিশু সন্তানেরা তাহাদের জননীর সুখপ্রদ অভয়-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। অন্তঃ-পুরবাসিনী ভদ্রমহিলারাও গৃহ হইতে তাড়িত হইতে পারেন। এই বিজ্ঞাপনটী বিশেষণ-শূন্য, অনন্ত ক্ষমতাপূর্ণ; সকলের পক্ষে সমানরূপে ব্যবহার হইতে পারে। ইহা দ্বারা মনুষ্যকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিবে এবং স্বাস্থ্যের নামে মনুষ্যের পবিত্র আশ্রমের প্রেমের বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিবে। ডাক্তার সিমসনের দয়া প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই বোধ হয় এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা মনুষ্যের কোমল প্রবৃত্তি ও ভাবের উপর কিরূপ ব্যথা দিয়াছেন, তাহা কি তিনি বিদিত আছেন? এই আইনের কঠোরতা সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়ের মনের ভাব কিরূপ, বলিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুজাতি সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, তাঁহারা নিজে রোগগ্রস্ত হইবার ভয়ে কখনও তাঁহাদিগের আত্মীয়দিগকে হাঁসপাতালে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, আত্মীয়দিগকে সেবা করা তাঁহাদের একটী পবিত্র অধিকার মনে করেন এবং তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে অত্যন্ত মনোবেদনা পান। যদি কেহ কোন রোগীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন, তাহা হইলে এই নোটিস জারি তাহার প্রতি হউক, আমাদের আপত্তি নাই। সৌভাগ্যক্রমে মলকাই দেশে ডাক্তার সিম্‌সনের মত উদ্যোগী, উৎসাহশীল, কার্য্যদক্ষ হেল্‌থ্‌-অফিসার নাই, তাই ফাদার দামিয়েন অভাগা কুষ্ঠীদিগকে সেবা করিতে পারিয়াছেন এবং জগতের নিকট তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। খ্রীষ্টীয়ান হইয়া কিরূপে মরিতে হয়, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ডাক্তার সিমসন মিউনিসিপাল আইন ছাড়িয়া, দণ্ডবিধি আইনের সাগর মন্থন করিয়া কেন যে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে গেলেন, বলিতে পারিনা; ইহাতে তাঁহার কি অধিকার আছে? তাঁহার যদি কোন অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই নোটিস তিনি স্বয়ং জারি না করিলে কোন ফল হইবে না। কোন্ হাঁসপাতালে কিরূপে রোগী লইয়া যাওয়া হইবে, সে বিষয় তিনি কিছু বলেন নাই। হাঁসপাতালে যে রোগীকে গ্রহণ করিবে, তাহার প্রমাণ কি? যদি গ্রহণ না করে, তবে রোগীর দশা কি হইবে? যদি কোন বিচারক ডাক্তার সিমসনের এই কার্য্য আইন-সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে

আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। এই আইন পরিবর্ত্তনের জন্য ঘোর আন্দোলন করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি এই বিজ্ঞাপনের যথেষ্ট প্রতিবাদ না করা হয় এবং ইহাকে নজিররূপে চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে বিষময় ফল ফলিবে। যে বিষয় সম্বন্ধে সকলের এরূপ বিরুদ্ধ মত, তাহা কি কখনও আইন বা আইনের উদ্দেশ্য বা অর্থ হইতে পারে? ডাক্তার সাহেবকে তাই বলি, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন এবং অনধিকার চর্চ্চা ছাড়িয়া তাঁহার মিউনিসিপাল আইন জারি করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। মিউনিসিপাল আইনের ৩২৪ ধারায় সংক্রামক রোগীদের স্থানান্তরিত করিবার বিধি আছে, তাহা এই—"যদি কোন সংক্রামক বা বহুজনপদব্যাপী বা স্থানিক বিপদজনক রোগাক্রান্ত রোগীদিগকে গ্রহণ করিবার স্থান বা হাঁসপাতাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কমিসনরগণ, হেল্‌থ্‌-অফিসারের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দেখিয়া, ঐ হাঁসপাতাল বা স্থানের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, এইরূপ রোগগ্রস্ত (হেল্‌থ্‌-অফিসারের মতে, উপযুক্ত বাসস্থান-বিহীন) পুরুষকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিবেন। এই ধারাটী ইংরাজীতে এইরূপ আছে—

"When any hospital or place for the reception of persons suffering from any dangerous epidemic, endemic or infectious disease has been provided the Commissioners may on the certificate countersigned by the Health-officer and with the consent of the Superintendent of such hospital or place direct the removal thereto of any male person suffering from any such dangerous disease who is in the opinion of such health officer without proper lodging or accomodation."

এই ধারাতে আমরা তিনটী বিষয় দেখিতে পাই (১) রোগী পুরুষ হওয়া প্রয়োজন, (২) তাহার উপযুক্ত বাসস্থান ও সেবা শুশ্রূষার উপায় নাই, (৩) হাঁসপাতাল নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং তাহার অধ্যক্ষেরা রোগী লইতে সম্মত হইবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আশ্রয়বিহীন পথিক, যাহার যত্ন লইবার বা আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। আমরা পুনরায় বলিতেছি, এই বিধি জারি করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

উপসংহারে আমরা কমিসনরদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কয়জন তাঁহাদের বসন্তরোগগ্রস্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারদিগকে এইরূপ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রস্তুত? তাঁহারা কি হেল্‌থ্‌-অফিসারের এই কার্য্যে কৈফিয়ৎ তলব করিবেন না? তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, নোটীস যেরূপই হউক, উহা তাঁহাদের প্রতি কখনই জারি হইবে না। কেবল গরীব দুঃখীদের উপরই জারি হইবে। তাই কি এতদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন? *

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

* কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অত্যাচার বর্ণনা করিতে সুলভ-দৈনিকের সম্পাদকের ন্যায় আর দু'দশজন সৎসাহসী সম্পাদক যদি এদেশে অভ্যুদিত হইতেন, তবে কলিকাতা নিস্তার পাইত। স্বেচ্ছাচার-মহাল সমূহের (Non-regulation Provinces) অত্যাচার কোথায় লাগে? কলিকাতায় দিবা দ্বিপ্রহরে, কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারে ধনী দরিদ্র অস্থির! মিউনিসিপালিটীর কোন কর্ম্মচারীর বাড়ীর নিকটে বাড়ী করিয়া বাস করা এবং কুম্ভীর পূর্ণ নদীতে বাস করা একই প্রকার। তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সকল আদেশ তোমাকে মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ তাহার চেষ্টায় নোটিসে নোটিসে, মকদ্দমায় মকদ্দমায় তোমাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। অবশেষে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে! এরূপ ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ দ্বারা বা খোসামুদী দ্বারা কর্ম্মচারিগণকে বশীভূত রাখিতে পার যদি, তোমার কোন ভয় নাই; আর যদি ঘুস দেওয়াকে পাপ বলিয়া মনে কর, এবং খোসামুদীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কর, এই কলিকাতা তোমার বাসযোগ্য নহে! অতি দুঃখে এসকল কথা লিখিলাম। হেল্‌থ্‌-অফিসারের এই নোটিস সম্বন্ধে তেমন তীব্র প্রতিবাদ হইল কই? স্বায়ত্ত-শাসিত দেশের এ দুর্দ্দশা দেখিলে, হাসি পায়, কান্না পায়; বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মে। হায়রে কমিসনারি পদ!! এই পদ পাইবার জন্য লোকে যত ব্যস্ত, কর্ত্তব্য পালন করিতে যদি তত ব্যস্ত হইত, না জানি, কত কর্ম্মচারীর মাথায় ভীষণ বজ্রপাত হইত!! ন, স।

মেঘ।

অই মেঘ আসে!
আমি যে দেখিগো খালি, ও যেন মনের কালী,
উড়িয়া বেড়ায় কার সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
আমি যেন শুনি কার, বুক-ভাঙ্গা হাহাকার
জগতের অবহেলা ঘৃণা উপহাসে!—
অই মেঘ আসে!

২

অই মেঘ আসে!
যেন সে প্রাণের জ্বালা, জ্বলিছে তড়িত মালা,
রহিয়া রহিয়া হায় নব নীলাকাশে,
জমিয়া জমিয়া তারি, যেন সে আঁখির বারি,
না পেয়ে করুণা কার দেশে দেশে ভাসে!—
অই মেঘ আসে!

৩

অই মেঘ আসে!
আমি যেন দেখি কার, দুর্ব্বহ জীবন ভার,
শ্লথ মন্দ অবসন্ন হতাশে নিরাশে,
উন্মাদের মত ছুটে, পাহাড়ে সে মাথা কুটে,
মৃত্যুর অপেক্ষা করে মহা অভিলাষে!—
অই মেঘ আসে!

৪

অই মেঘ আসে!
ও যেন মর্ম্মের কথা, ও যেন মর্ম্মের ব্যথা,
বলিবে বলিয়া কারে রেখেছিল আশে,
সে যেন দিলনা কাণ, আহত সে অভিমান,
করিতেছে আত্মহত্যা মহা অবিশ্বাসে!—
অই মেঘ আসে।

৫

অই মেঘ আসে!
ও যেন অস্তিমহিক্কা, ও চাহেনা দয়া ভিক্ষা,
নাহি চাহে অনুগ্রহ কৃপা-করুণা সে,
আপনা ফিরায়ে লওয়া, তেজে লাজে ভস্ম হওয়া
আপনার চেয়ে যেন বেশি ভালবাসে!—
অই মেঘ আসে!

অই মেঘ আসে!
পরাণে বিষাদ এত, কাহারে বলেনা সে ত,
গোপনে রাখিতে চায় ঘোর অট্টহাসে,
নীচতার মহাকূপ, যেন উচ্চ অপরূপ
সমুদ্র হইয়া উড়ে উপর আকাশে!—
অই মেঘ আসে!

৭

অই মেঘ আসে!
সে চাহে আঁধারে থাকে, আপনা লুকায়ে রাখে
জগতের দূরতম-দূরে এক পাশে,
সে দেয় শশাঙ্ক রবি, নিবা'য়ে আলোক সবি,
নয়নের অন্তরালে লুকায় উদাসে!—
অই মেঘ আসে!

৮

অই মেঘ আসে!
জগতে নাহি যে আর, আপনি ও আপনার,
নিষ্ঠুর সংসারে কেহ ভুলে না সম্ভাষে,
পরদুখে সুখী যারা, ময়ূর ময়ূরী তারা,
দেখিয়া উহারে দেখ নাচিছে উল্লাসে!—
অই মেঘ আসে!

৯

অই মেঘ আসে!
যদি সে বরষে তার, করুণ নয়নাসার
ভুলিয়া কখনো আহা অদম্য উচ্ছ্বাসে,
বিশ্বাসঘাতক জাতি, চাতক উল্লাসে মাতি,
রহিয়াছে উর্দ্ধমুখে তারি পান আশে!—
অই মেঘ আসে!

১০

অই মেঘ আসে!
পাঁজর ভাঙ্গিয়া তার, বাহিরিলে হাহাকার,
করুণায় রবি শশী চমকে তরাসে,
কর্দ্দমে ভেকের দল, কত করে কোলাহল,
কুরুচি বলিয়া হায় ক্রোধে উপহাসে!—
অই মেঘ আসে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কল্পযুগাদি

লোকে বলিয়া থাকে "আজ ত কলির সন্ধ্যা", "ইহা সত্যযুগের কথা" ইত্যাদি। সত্যযুগে শুম্ভ নিশুম্ভের, ত্রেতায় রামরাবণের এবং দ্বাপরে কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এ সকল কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। পুরাণ-প্রিয় পাঠকের নিকট এইরূপ আরও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়।

আবার, পঞ্জিকায় দেখা যায়, "বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ," "মাঘীপূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ," ইত্যাদি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের আদি দিবস কত নির্দ্দিষ্ট ও সবিশেষ পরিজ্ঞাত, তাহা পঞ্জিকার ঐ সকল উৎপত্তি কাল পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

যুগ সকলের অর্থ কি? সত্যযুগ হইতে ভারতে কি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে? বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ায় সত্যযুগের আরম্ভ, না বৎসরের অপর কোন দিনে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কে গণিয়া আসিয়াছে? কোন কোন পাঠক এই সকল প্রশ্নকে বালকোচিত মনে করিবেন। এগুলি বালকোচিত হউক বা না হউক, কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মন এতদ্দ্বারা বিচলিত হইয়াছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রদত্ত যুগাদির অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ জানি না। উহাদের অপর কোন গূঢ় অর্থ আছে কি না, জানি না। আজকাল অনেক সামান্য কথার অসামান্য ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, এজন্য একটু সতর্কতার প্রয়োজন।

কালবিভাগ।

প্রথমতঃ একবার আমাদিগের কালবিভাগ কিঞ্চিৎ আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করা যাউক। যুগ সকল এক একটা কালবিভাগ, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথমেই দেখা যায় যে, সূর্য্যাংশপুরুষ ময়াসুরকে * বলিতেছেন:—

"কাল দ্বিবিধ। এক কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান, চেতন ও অচেতন সমুদায় জীবের নাশক এবং তাহাদের উৎপত্তি স্থিতিকারক। অন্য কাল খণ্ড; এজন্য জ্ঞানের বিষয়। এই খণ্ডকাল আবার দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। ইহাদিগকে মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তও বলা যায়। একটির নাম সূক্ষ্ম বা অমূর্ত্ত, কেন না, তাহা অত্যন্ত বৃহৎ বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া পরিমাণযোগ্য নহে। অপরটির নাম স্থূল বা মূর্ত্ত, কেন না, তাহা পরিমাণ ও ব্যবহারযোগ্য। অমূর্ত্তকালের আদি বিভাগের নাম ত্রুটি এবং মূর্ত্তকালের আদি বিভাগের নাম প্রাণ। † ছয় প্রাণে এক বিনাড়ী বা পল, ষাইট পলে এক ঘটিকা বা দণ্ড।"

এখানে অখণ্ড জীবান্তকৃৎকাল আলোচ্য নহে। ব্যবহারযোগ্য খণ্ডকালের মধ্যে অমূর্ত্ত কালের বিভাগগুলি সূর্য্যসিদ্ধান্তে নাই। অপর গ্রন্থাদি হইতে মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয়বিধ-কালের বিভাগ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। সূর্য্যের পরিবর্ত্তে সূর্য্যাংশ পুরুষ জ্যোতিষতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ময়াসুরকে জ্যোতিষতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন।

† অত্যন্ত শাণিত সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা নলিনীর একটি দল বেধ করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম ত্রুটি এবং স্বস্থ সুখাসীন ব্যক্তির শ্বাসোচ্ছ্বাসের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের নাম প্রাণ। এক প্রাণ=৪সেকেণ্ড ত্রুটির পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কয়েকটি পরে বলা যাইতেছে।

কাল বিভাগ। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

১০০ ত্রুটি = ১ তৎপর।

৩০ তৎপর = ১ নিমেষ।

১৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা*।

৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা।

৩০ কলা = ১ ঘটিকা।

২ ঘটিকা = ১ক্ষণ বা মুহূর্ত্ত।

৩০ ক্ষণ = ১ দিন (নক্ষত্র)।

সুতরাং ১ ত্রুটি = $\frac{১}{৩৩৭৫০}$ সেকেণ্ড।

অমূর্ত্তামূর্ত্তভেদ করিলে এইরূপ,—

অমূর্ত্তকাল,

১০০ ত্রুটি = ১ লব বা তৎপর।

৩০ লব = ১ নিমেষ।

১৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।

২৭ কাষ্ঠা = ১ গুরুবর্ণ কাল।

১০ গুরুবর্ণ কাল = ১ প্রাণ।

মূর্ত্তকাল,

২ প্রাণ = ১ কলা।

৩ কলা = ১ বিনাড়ী বা পল।

১০ পল = ১ ক্ষণ।

৬ ক্ষণ = ১ ঘটিকা বা দণ্ড।

অথবা

৬ প্রাণ = ১ পল।

৬০ পল = ১ দণ্ড।

৬০ দণ্ড = ১ দিন (নক্ষত্র)।

যুগাদি গণনায় সৌরকালমান ব্যবহৃত হয়। এক সূর্য্যোদয় হইতে পর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম সাবন দিন বা কুদিন। ক্রান্তিবৃত্তের এক অংশ গমন করিতে রবির যে সময় লাগে, তাহা সৌর দিন। এক রাশি সঞ্চরণ কালের নাম সৌরমাস। মেষাদি দ্বাদশ রাশি ভ্রমণকালের নাম রবিবর্ষ। এইরূপে

৩০ সাবন দিন = ১ সাবনমাস।

১২ সাবনমাস = ১ সৌরবর্ষ।

১ সৌরবর্ষ = ১ দিব্য অহোরাত্র।

৩৬০ দিব্য অহোরাত্র = ১ দিব্যবর্ষ।

১২০০ দিব্যবর্ষ = ১ মহাযুগ (৪৩২০০০০ রবিবর্ষ)

৭১ মহাযুগ = ১ মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর = ১কল্প(৪৩২০০০০০০০রবিবর্ষ)

২ কল্প = ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র।

৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্র = ১ ব্রাহ্মবর্ষ।

৫০ ব্রাহ্মবর্ষ = ১ পরার্দ্ধ।

২ পরার্দ্ধ বা১০০ব্রাহ্মবর্ষ = ১ পরা,মহাকল্প বা ব্রাহ্ম আয়ুঃ*।

যুগাদির পরিমাণ

সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিমাণ বলা যাইতেছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি

---

* বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতির মতে ১৫ নিমেষে এক কাষ্ঠা। মনুসংহিতামতে ৩৪ কলায় ১ মুহূর্ত্ত। বিষ্ণুপুরাণমতে পরমাণু কালের আদি বিভাগ। ইহার মতে ১ ত্রুটি = $\frac{১}{২১১০}$ সেকেণ্ড। জ্যোতিষে মূর্ত্তকাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ৬০ দ্বারা প্রায় যাবতীয় কাল বিভাগ করা হয়। যথা,—

৬০ ক্ষণ = ১ লব

৬০ লব = ১ নিমেষ।

৬০ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।

৬০ কাষ্ঠা = ১ অতিপল।

৬০ অতিপল = ১ বিপল = ০.৪সেকেণ্ড।

৬০ বিপল = ১ পল।

৬০ পল = ১ দণ্ড।

৬০ দণ্ড = ১ দিন।

প্রথম কয়েকটি কালবিভাগের নানা প্রকার নাম আছে।

* ব্রহ্মার পরমায়ুঃ, মন্বন্তর প্রভৃতির পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর্য্যভটমতে ৭২ মহাযুগে এক মন্বন্তর। বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে এক সপ্ততিরও অ-

এই যুগ চতুষ্টয়ে এক মহাযুগ বিভক্ত। এই সকল যুগের পরিমাণ † এই :—

৪৩২০০০ রবিবর্ষ = ১ কলিযুগ।
২ × ৪৩২০০০ „ = ১ দ্বাপরযুগ।
৩ × ৪৩২০০০ „ = ১ ত্রেতাযুগ।
৪ × ৪৩২০০০ „ = ১ সত্যযুগ।

অতএব ৪৩২০০০০ রবিবর্ষ = ১ মহাযুগ।
১০০০ মহাযুগ = ১ কল্প বা ব্রহ্মার দিন।

ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও এক কল্প। তাঁহার দিবাভাগে ভূত সৃষ্টিস্থিতি হয়, রাত্রিভাগে ভূতসৃষ্টি লয় ঘটে।

আজ শকের ১৮১৬ অব্দ গতে* সৌর অগ্রহায়ণের ১৪ দিন গতে ১৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার। ব্রহ্মার জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বর্ষ দিন গত হইয়াছে, দেখা যাউক। সম্প্রতি ব্রহ্মার যে দিন চলিতেছে, তাহার নাম শ্বেতবরাহকল্প। ব্রহ্মার জন্মাবধি তাঁহার ৫০বর্ষ অতীত হইয়া ৫১তম ব্রাহ্মবর্ষের প্রথম দিন চলিতেছে। এই দিনের আবার ৬ মন্বন্তর কাল গত হইয়াছে। এখন সপ্তম মনুর অধিকার কাল। সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। তাঁহার আবার ২৭ মহাযুগ গত হইয়াছে। ২৮তম মহাযুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গত হইয়া কলিরও ৪৯৯৫বর্ষ অতীত হইয়াছে। শ্বেতবরাহকল্প পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ রবিবর্ষ। ইহার মধ্যে অদ্যাবধি ১৯৭২৯৪৮৯৯৫ রবিবর্ষ গত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নিশাবসানে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র জগৎ চরাচর প্রকাশিত হয় না। সৃষ্টিকার্য্যে ৪৭,৪০০ দিব্যবর্ষ অর্থাৎ ১,৭০,৬৪,০০০ রবিবর্ষ ব্যয়িত হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথ লিখিতেছেন,—

"বর্ত্তমান ব্রহ্মার গ্রহ নক্ষত্র দেব দৈত্য মানব রাক্ষস ভূ পর্ব্বত বৃক্ষাদিক জঙ্গমস্থাবরাত্মক জগৎসৃজন করিতে অত বর্ষ গিয়াছে। এই সকল বর্ষে ব্রহ্মা গ্রহ সৃষ্ট্যাদি প্রবহ বায়ু * নিয়োজনান্ত কর্ম্ম করিয়াছেন।"

ধিক মহাযুগে এক মন্বন্তর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে ১০৮ ব্রাহ্মবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু ইত্যাদি। সিদ্ধান্তে মন্বন্তরের ব্যবহার নাই। উহা কেবল পুরাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

† কলি দ্বাপরাদি যুগ চতুষ্টয়ের এবং মন্বন্তর কল্পের আদ্যন্ত কালের কিয়দংশ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বিষয় সিদ্ধান্তে বর্ণিত হইলেও তাহাতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। এজন্য যুগ মন্বন্তর ও কল্পের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ আলোচিত হইল না।

* এখন শকের ১৮১৬ বর্ষ গত হইয়া ১৮১৭ শকাব্দা চলিতেছে, না ১৮১৫ গত হইয়া ১৮১৬ চলিতেছে? সর্ব্বদা ব্যবহার বশতঃ কথাটা সামান্য বোধ হইতে পারে। আমি যেমন বুঝি, তাহাতে এ বৎসর ১৮১৬ গতাব্দা ধরা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ের মীমাংসা কোথাও পাইলাম না। তবে, জন্ম পত্রিকা লিখিবার রীতি দেখিলে উক্ত মত সমর্থিত হয়। যাহার আজ জন্ম হইয়াছে, তাহার জন্মকাল লিখিতে হইলে এইরূপ লিখিতে হয়। যথা—১৮১৬।৭।১৪ অর্থাৎ ১৮১৬ শকাব্দা গতে বৈশাখাদি সাত মাস গতে অগ্রহায়ণের ১৪ দিন গতে আজ ১৫ই বৃহস্পতিবারে জন্ম। মাস দিন দণ্ডাদি সম্বন্ধে গত বুঝিতে হয়, আর বর্ষ সম্বন্ধে চলিত ধরিতে হইবে কেন? দ্বিতীয়তঃ, শকাব্দার সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ পাওয়া যায়। এ বৎসর কলির গতাব্দা ৪৯৯৫। ইহা হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে শক গতাব্দা ১৮১৬ হয়। তৃতীয়তঃ এ বর্ষের গ্রহস্ফুট সাধন করিতে হইলে ১৮১৬ পূর্ণ ধরিয়া গণনা করিতে হয়। এ সকল কারণ এ বৎসর শক ১৮১৬ গত ধরা কর্ত্তব্য। তবে, পঞ্জিকায় এ বৎসর ১৮১৬ লিখিত হয় কেন? বোধ হয়, এতদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, ১৮১৬ শক গতে পরবর্ত্তী বর্ষের পঞ্জিকা। ইংরাজীতে চলিত-অব্দ লিখিবার রীতি। বোধ হয়, এই কারণেই আমরা শকাব্দাতেও চলিত ধরিয়া থাকি। অতএব এ বৎসর শকের ১৮১৭ অব্দ চলিত বলিতে হইবে। বাঙ্গালা সনও এইরূপ কিনা, জানি না। কেহ এ বিষয়ের মীমাংসা করিলে আমি উপকৃত হইব।

* যে শক্তি বশতঃ গ্রহ নক্ষত্র সকল প্রতিদিন পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ বায়ু। ইহা

ব্রহ্মার দিন পরিমাণ দশসহস্র মহাযুগ অর্থাৎ ৪,৩২,০০,০০,০০০ সৌরবর্ষ। ইহাই পঞ্জিকার শ্বেতবরাহ কল্পাব্দা বলিয়া লিখিত হয়। ইহার মধ্যে ১,৭০,৬৪,০০০ সৌরবর্ষ তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে আবশ্যক হয়। অবশিষ্ট ৪,৩০,২৯,৩৬,০০০ সৌরবর্ষ হইতে কলির বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত ১,৯৭,২৯,৪৮,৯৯৫ সৌরবর্ষ গত। সুতরাং ব্রহ্মার দিনের অত বর্ষ অতীত হইয়াছে। ইহাই পঞ্জিকার তৎকল্পাতীতাব্দা। পুনশ্চ, ইহা হইতে সৃষ্টিকার্য্যে ব্যয়িত বর্ষ বিয়োগ করিলে যে ১,৯৫,৫৮,৮৪,৯৯৫ বর্ষ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পঞ্জিকার ভূসৃষ্টিতোঽতীতাব্দা নামে খ্যাত।

ব্যাপার অল্প নহে। একদিকে সূক্ষ্ম ত্রুটি, অপরদিকে ব্রহ্মার পরমায়ুষ্কাল! দুই চারি দণ্ডের কীটবৎ মানুষের আস্পর্দ্ধা কত! আজ কলির ৪,৯৯৫ বর্ষ গত হইয়াছে বলিয়াই সন্তুষ্ট নয়। কলির পূর্ব্বে দ্বাপর ত্রেতা সত্য যুগত্রয়, তাহার পূর্ব্বে ২৭ মহাযুগ গত হইয়াছে, ইত্যাদি। পুরাণকারগণ এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল লইয়াই ক্ষান্ত নহেন। তাঁহারা কত কত ব্রহ্মার অবসানের সংবাদ রাখেন। এক দিকে অতি বৃহৎ, অন্যদিকে অতি ক্ষুদ্র কাল! এই সকল দেখিয়াই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদিগকে অতিশয়োক্তি প্রিয় বলিয়া গালি দিয়াছেন।*

বায়ুরূপ হউক কিম্বা অপর কিছু হউক, উহা যে শক্তি বিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে, উহাকে পৃথিবীর আবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে হইবে।

কি জ্যোতিষ, কি পুরাণ সকলেই সেই একই প্রকার কালগণনা। পুরাণ সকলের মধ্যে দুই একটা পরিমাণে মতভেদ থাকিলেও,সাধারণ বিষয়ে সকলেই এক মত। এই কাল গণনাই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। পঞ্জিকাতেও তদনুসারে ক্রিয়া কলাপ ব্যবস্থিত হইতেছে। দিন,মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষের উৎপত্তি বুঝা যায়, এমন প্রায় অনন্তকালের গণনার উৎপত্তি কি?

মানুষের এক বৎসর, দেবতাদিগের এক দিন। একথা আমাদের দেশে অনেক কাল হইতে প্রচলিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একথা স্পষ্টতঃ দেখা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে,—

"পৃথিবীর সুমেরুদেশে ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ বাস করেন। অধোদেশ কুমেরুতে অসুরগণ বাস করেন। * * বিষুব দিনে দেব দৈত্যগণ সূর্য্যকে ক্ষিতিজে (horizon) থাকিতে দেখেন। রবির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গতি কালে দেব ও দৈত্যগণের পরস্পর দিবা ও রাত্রি হয়।"

ইহা হইতে দিব্যমানের উৎপত্তি।

কিন্তু যে অর্থে আমরা যুগশব্দ ব্যবহার করিতেছি,কবে তাহার উৎপত্তি হইল? সংস্কৃত

যুগাদির ইতিহাস।

যুজ্ ধাতু লইতে যুগ শব্দ উৎপন্ন। যুগ ও যোগ একই অর্থবাচক। ঋগ্বেদে কল্প বা মন্বন্তর শব্দের ব্যবহার নাই। তথায় যুগ শব্দ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার অর্থ সামান্য কাল মাত্র। "যুগে যুগে" "উত্তর যুগ" "পূর্ব্ব যুগ" ইত্যাদির ঐ অর্থ করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে এক স্থানে লিখিত আছে যে "আমরা তোমাকে একশত, দশ সহস্র বৎসর, দুই তিন

* আচার্য্য মনিয়ার উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন,—It illustrates very curiously the natural taste of the Hindus for hyperbole, leading them to attempt almost infinite calculations of inconceivable periods in the one direction, and infinitesimal subdivisions of the most minute quantities in the other.* * Hence we find them heaping billions upon millions and trillions upon billions of years, and reckoning up ages upon ages, Æons upon Æons, with ever more audacity than modern geolojists and astronomers."—*Indian Wisdom* by Prof. Monier Williams.

চারি যুগ দিলাম *।" কেহ কেহ † এরূপ অনুমান করেন যে, এক যুগ অর্থে দশ সহস্রের অধিক বৎসর বুঝিতে হইবে।

রবিচন্দ্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী জ্যোতিষতত্ত্ব ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে। অমাবস্যার দিনে রবিচন্দ্রের যোগ হয়। এ কথা ঋগ্বেদের আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। অমাবস্যার চন্দ্রের একটা প্রাচীন নাম দর্শ। দৃশ ধাতু হইতে দর্শ শব্দের উৎপত্তি। অমরকোষ দর্শ শব্দের রবিশশী যোগ অর্থ দিয়াছেন। আমরাও এক্ষণে দর্শ শব্দে অমাবস্যা বুঝিয়া থাকি। এতদ্দারা অনুমান করিতে হইবে যে,ঋগ্বেদের আর্য্যগণ জ্যোতিষ্কগণের পরস্পর যোগ দর্শন করিয়াছিলেন।

ষড়ঙ্গবেদের একটি অঙ্গ জ্যোতিষ। ইহার নাম জ্যোতিষবেদাঙ্গ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, জ্যোতিষ বেদাঙ্গ খ্রীঃ পূঃ অন্যূন চতুর্দ্দশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে রচিত। ইহাতে পঞ্চ বর্ষাত্মক যুগ ব্যবহৃত হইয়াছে। মাঘ শুক্ল পক্ষে ইহার আরম্ভ এবং পৌষকৃষ্ণপক্ষে অবসান। আচার্য্য ওয়েবর মনে করেন যে, ঋগ্বেদেই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ব্যবহৃত দেখা যায় (ঋগ্বেদ ৩।৫৫) বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৈতামহ সিদ্ধান্তে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ দ্বারা‡ গণনার নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। গর্গ একজন জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি বৃদ্ধগর্গ। আজকালকার মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। তিনিও সাবন, সৌর, চান্দ্র, এবং নাক্ষত্র কাল * ঐক্য রাখিবার জন্য সংবৎসরাদি পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ব্যবহার করিয়াছেন। মনে করুন, বৈশাখ মাসের ১লা রবি শশী একত্রে থাকায় অমাবস্যা হইল। যদি চান্দ্রমাস ৩০ দিনে এবং রবিবর্ষ ৩৬৬ দিনে পূর্ণ ধরা যায়, তাহা হইলে এ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার ৬ দিবস পূর্ব্বে শেষ অমাবস্যা হইবে। প্রতি বৎসর ৬ দিন করিয়া পিছাইয়া গিয়া ষষ্ঠ বৎসরে আবার ১লা বৈশাখ দিবসে অমাবস্যা ঘটিবে। ঐ পাঁচ বৎসরের নাম প্রাচীন বাজসেনেয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে তবে যুগ ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু কালক্রমে ঐ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের ন্যায় বহুবর্ষ যুগ ব্যবহার আরম্ভ হয়। মনুসংহিতা খ্রীঃ পূঃ ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রণীত। তাহাতে আমরা কৃত (সত্য), ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০, ১২০০ বর্ষ দেখিতে পাই! এই সকল দিব্যযুগ কিনা, তদ্বিষয়ে মনুর টীকাকারগণ একমত নহেন। যাহা হউক,আমরা দেখিতেছি যে কৃতাদি যুগ সকল

* "We allot to thee a hundred, tenthousand years, two, three, four ages (Yugas)",—Muir's *Sanskrit Texts.*

† See Muir's *Sanskrit texts.*

‡ ৩৬৬ দিনে এক রবিবর্ষ ধরিয়া এই মানের পাঁচ বর্ষ। ইহাতে ৬০টি সৌরমাস, ৬২ চান্দ্রমাস, ৬৭ নাক্ষত্র মাস এবং ২ মলমাস আছে। বেদাঙ্গজ্যোতিষের ন্যায় ইহাতেও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অমাবস্যা সময়ে যুগারম্ভ ধরা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণমতে এই যুগের পাঁচটি বৎসরের নাম এই,—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদ্বৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। বৃহস্পতির ষষ্ট্যব্দকে দ্বাদশ যুগে বিভক্ত করিলে পাঁচ পাঁচ বর্ষ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি বর্ষের নাম এই,—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর এবং উদ্বৎসর। বোধ হয়, সৌরাব্দের সহিত বৃহস্পতিবর্ষের ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির বর্ষের নামও সংবৎসরাদি হইয়া থাকিবে।

* নাক্ষত্রকাল, কোন তারা হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারায় পুনরাগমনকাল। অর্থাৎ চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভ্রমণকাল বা ভগণকাল। ইহার পরিমাণ ২৭.৩২ সাবন দিবস।

অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্য জ্যোতিষীগণ প্রচলন করেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে ঐ সকল যুগের পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল যুগের উৎপত্তি কোন জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবলম্বনে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই *। কেবল নানা সময়ে নানা ব্যক্তির দ্বারা যুগ সকলের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

উপপত্তি।

এক্ষণে আমরা ঐতিহাসিক বিচার ছাড়িয়া যুগের প্রচলিত সিদ্ধান্তাদির অর্থ ও উপপত্তি বুঝিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ব্রহ্মার সৃষ্টি, সৃষ্টি কার্য্যে কালব্যয়,মহাযুগ, কলিযুগ ইত্যাদির উপপত্তি কি? ইহাদের পরিমাণ যেন জানা গেল, কি অসামান্য নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ইক্ষাকুবংশীয় বেধসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র ছিল না। তাঁহার গৃহে তখন পর্ব্বত ও নারদ ঋষি অবস্থান করিতেছিলেন। নারদের উপদেশ মত হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট একটি পুত্র যাচ্ঞা করিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহাকে বরুণের নিকট বলিদান দিবেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রোহিত। রাজার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে বরুণ পুত্রবলি চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুত্র দিতে ইচ্ছুক নহেন। নানাবিধ কৌশল করিয়া কিছুদিন কাটাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে পুত্রও বড় হইল, পিতার অবাধ্য হইয়া ধনু লইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বরুণ তখন হরিশ্চন্দ্রকে ধরিলেন (জলোদর) এবং তাঁহার উদর স্ফীত হইল। ইহা শুনিয়া রোহিত বন হইতে চারিবার প্রত্যাগত হইতেছিলেন। চারিবারই ছদ্মবেশী ইন্দ্র রোহিতকে ভ্রমণের সুখ শুনাইয়া বনে বনে চারি বৎসর ভ্রমণ করাইলেন। পঞ্চম বার যখন রোহিত প্রত্যাগত হইতেছে, এমন সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র বলিলেন যে, "কলি শয়ান, দ্বাপর সঞ্জিহান (উঠিতে চেষ্টা করিতেছে), ত্রেতা উত্তিষ্ঠ (দণ্ডায়মান), কৃত চরন্ (বেড়াইতেছে); তুমিও ভ্রমণ কর।" রোহিত পঞ্চম ও ষষ্ঠবার ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহার পরিবর্ত্তে বলিদানের জন্য শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া দেন।

যুগ সকলের নাম এইখানেই প্রথমে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ খ্রীঃপূঃ ১২শত বর্ষের পূর্ব্বে রচিত। যাহা হউক, এখানে ব্যবহৃত কল্যাদির অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, কল্যাদি অক্ষক্রীড়ার ফলক চতুষ্টয় মাত্র। তদ্রূপ, বাজসনেয় সংহিতায় ব্যবহৃত কৃতযুগাদি অর্থে চারি তিন দুই এক চিহ্ন বিশিষ্ট অক্ষফলক বুঝিতে কেহ কেহ বলেন। আবার কেহ কেহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কল্যাদি শব্দে ধর্ম্মরূপ বৃষ বুঝিতে বলেন। মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে আছে, "বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মঃ"। ইহার অর্থ এই যে, কামনাপূর্ণ করেন বলিয়া ধর্ম্মের নামান্তর বৃষ হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মরূপ বৃষের চারিপাদ। সত্যযুগে ধর্ম্ম চারি পাদ, ত্রেতায় তিনপাদ, দ্বাপরে দুইপাদ এবং কলিতে একপাদ। ইহার সহিত জ্যোতিষের কলিযুগাদির পরিমাণ মিলাইতে পারেন। অর্থাৎ কলিযুগের দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা, চতুর্গুণ সত্যযুগের পরিমাণ। আবার,কৃত অর্থে কার্য্য, ত্রেতা অর্থে ত্রিতয়, দ্বাপর অর্থে সন্দেহ, কলি অর্থে কলহ। এজন্য কেহ কেহ এরূপও অর্থ করেন যে,কৃতযুগে আর্য্যগণ কর্ম্মঠ ছিলেন,এবং যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন; ত্রেতায় তাঁহারা তিনভাগে (তিন জাতি?) বিভক্ত হন এবং যজ্ঞাগ্নিও ত্রিবিধ হয়; দ্বাপরে আর্য্যগণ পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মেও সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল; অবশেষে কলিতে আর্য্যগণের কলহ প্রবল এবং যজ্ঞ ক্রিয়াদির লোপ হইল। মনুও এই প্রকার অর্থে লিখিয়াছেন,

কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে॥ (৯অঃ)

পুরাণাদির মতেও যুগানুসারে ধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য ঘটে। যথা,

আদ্যে কৃতযুগে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ সনাতনঃ।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্যাদ্ দ্বিপাদোদ্বাপরেস্থিতঃ॥
ত্রিপাদহীন স্তিষ্যে তু সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠতি। (তিষ্য =কলি)—কূর্ম্মপুরাণ।

যাহা হউক, সম্প্রতি আমাদের এ সকল বিচারে প্রয়োজন নাই।

করিয়া ইহাদের আরম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? শকাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ প্রভৃতি অব্দ সকলের আরম্ভ আছে, কিন্তু কবে তৎসমুদায় শেষ হইবে, তাহা বলা যায় না। কল্প বা যুগ সেরূপ নহে, ইহাদের আদি যেমন নিশ্চিত,অন্তও তেমনই নিরূপিত। কলিযুগের উৎপত্তি ও পরিমাণ কিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই প্রথমে আলোচ্য। এই সকল বুঝিতে গেলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুই একটা কথা বুঝা আবশ্যক।

আমাদের জ্যোতিষমতে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি, এই সপ্তগ্রহ। রাহু ও কেতু গ্রহ নহে। রবি যে পথে আকাশে সম্বৎসর ধরিয়া পরিভ্রমণ করে, তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত। চন্দ্র রবিপথে ভ্রমণ করে না। তাহার একটা পৃথক্ পথ আছে। এই পথের নাম চন্দ্রের বিমণ্ডল। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিমণ্ডল পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। ঐ দুইটী বৃহদ্বৃত্ত পরস্পর ছেদন করাতে যে দুইটি বিন্দু উৎপন্ন হয়,তাহাদের নাম পাত। রাহু ও কেতু চন্দ্রের পাত মাত্র *।

রব্যাদি সপ্তগ্রহের দৈনন্দিন গতি সমান নহে। তাহারা কখন দ্রুত কখনও বা মন্দগতিতে আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। তবে, তাহাদের গতির হ্রাসবৃদ্ধির একটা ক্রম আছে। যদি রবির গতি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে,তাহার গতি আষাঢ় মাসে দ্রুত এবং পৌষমাসে মন্দ হয়। বৎসরের ৩৬৫ দিনের প্রতিদিন রবি আকাশে কতখানি পথ যায়, তাহা জানিলে গড়ে তাহার দৈনন্দিন কত গতি হয়,তাহা পাওয়া যায়। ইহার নাম রবির মধ্য গতি। আরও সহজ উপায়ে মধ্যগতি নিরূপিত হয়। যদি ৩৬৫ দিন ১৫দণ্ডে রবি ৩৬০ অংশ ঘুরিয়া আইসে, প্রতিদিনের গতি কত, তাহা সহজেই জানা যায়। ইহাই মধ্যগতি। বলা বাহুল্য, রবি ঐ মধ্যগতিতে প্রতিদিন চলে না। কিন্তু যদি তাহা তাহার মধ্যগতি অনুসারে প্রতিদিন চলিত, তাহা হইলে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে সেই ৩৬০অংশ একবার ঘুরিয়া আসিত। গণনার নিমিত্ত একটি রবি কল্পিত হয়। মনে করা হয়,যেন তাহা প্রকৃত বা স্পষ্ট রবির মধ্যগতিতে ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ করিতেছে। এই কল্পিত রবিকে মধ্যরবি বলা যায়। স্পষ্ট রবির দৈনিক পরম মন্দগতি ৫৭ কলা ১২ বিকলা এবং পরম দ্রুতগতি ৬১ কলা ১০ বিকলা। মধ্যগতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা। ইহাই মধ্যরবির দৈনিক গতি। এইরূপ, মধ্যচন্দ্রের দৈনিকগতি ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা,মধ্য মঙ্গলের ৩১ কলা ২৭ বিকলা ইত্যাদি।

মনে করা যাক, যেন রবি ও চন্দ্র ব্যতীত অপর গ্রহ নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, আজ যদি রবিচন্দ্র একত্রে থাকে, অর্থাৎ আজ যদি অমাবস্যা হয়, তবে কত দিন পরে পুনর্ব্বার তাহারা একত্রিত হইবে? সকলেই জানেন, ইহাই চান্দ্র মাসের পরিমাণ। অর্থাৎ আজ যে ক্ষণে রবিশশীর যোগ হইল, তদবধি ২৯

* পৌরাণিক আখ্যানে রাহু ও কেতু গ্রহ শ্রেণীভুক্ত। ফলিতজ্যোতিষেও রাহু কেতুর ফল গণিত হয়। রাহুর আর এক অর্থ ছায়া,আর রাহু কেতুর নিকটবর্ত্তী না হইলে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হয় না। এই অর্থে রাহু রবিশশী গ্রাস করিয়া থাকে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান জ্যোতিষমূলক। অশ্বিন্যাদি সাতাইশ তারা, চন্দ্রের ভার্য্যা, রাহুর রথ ধূসরবর্ণ ইত্যাদি পুরাণে প্রসিদ্ধ। অমৃতবণ্টনের সময় একটা অসুরকে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা ছিন্ন করেন। সেই অসুরের এক অংশ রাহু ও অপর অংশ কেতু। চক্রকে অনেকে ক্রান্তিবৃত্ত কিম্বা রাশিচক্র মনে করেন। ক্রান্তিবৃত্ত দ্বারা চন্দ্রের বিমণ্ডল দুই সমভাগে ছিন্ন হইয়াছে। তাহাতেই রাহু কেতুর উৎপত্তি। যাহা হউক,এক্ষণে এ বিষয়ের বর্ণনা অনাবশ্যক।

দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪মিনিট পরে পুনর্ব্বার তাহাদের যোগ হইবে। কিন্তু আকাশের যে স্থানে তাহাদের যোগ হইল, পুনর্ব্বার অমাবস্যার সময় যে তাহারা সেই স্থানে একত্রিত হইবে, এমন নহে। রবিশশী উভয়ই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিদিন গমন করিতেছে। প্রায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা সময়ে তাহারা একত্রিত হইবে বটে, কিন্তু ঐ সময়ে রবি প্রথম মিলন স্থান হইতে প্রায় ২৯ অংশ পূর্ব্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

অতএব যদি এমন প্রশ্ন হয় যে, আজ যে তারার নিকট রবিচন্দ্রের মিলন হইল, সেই তারার নিকট পুনর্ব্বার কবে তাহাদের মিলন হইবে? ইহা গণনা করিতে হইলে দেখাযায় যে, ২৩৫টি চান্দ্রমাসে যত দিন, ১৯টি সৌরবর্ষেও ঠিক তত দিন। কারণ ২৩৫টি চান্দ্রমাসে ৬৯৩৯ দিন ৪১ দণ্ড এবং ১৯ বৎসরেও ৬৯৩৯ দিন ৫২ দণ্ড। অতএব আজ যে তারার নিকটে রবিশশীর যোগ হইল,১৯ বৎসর পরে বা পূর্ব্বেও সেই তারার নিকট তাহাদের মিলন হইবে বা হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা রবিশশী দুইটি গ্রহ লইয়াছি। যদি এরূপ প্রশ্ন হয় যে, রবি শশী মঙ্গল প্রভৃতি সপ্তগ্রহ আকাশে এই এই স্থানে অবস্থিত এবং তাহাদের মধ্যগতি এত, ইহারা সকলে কত বৎসর পূর্ব্বে একত্রে বা নিকটে নিকটে ছিল? তাহাও গণিত দ্বারা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারা যায়। সপ্তমধ্যগ্রহ লইয়া গণনা করিলে জানা যায় যে, তাহারা সকলে ৪৯৯৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার পরস্পর নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল। যে বর্ষে মধ্যগ্রহ সকল এরূপ অবস্থিত হইয়াছিল, তাহাই কলিযুগ আরম্ভ। বস্তুতঃ অধিকাংশ জ্যোতিষ মতে রব্যাদি সপ্তমধ্যগ্রহ তখন অশ্বিনীর আদিতে অবস্থিত ছিল।

স্থূলগণনায় ঐ বৎসর কলিমুখে রব্যাদি মধ্যগ্রহ অশ্বিনীর আদিতে ছিল। সূক্ষ্মগণনা করিয়া কোন কোন সিদ্ধান্তকার গ্রহগণের স্থিতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ পাইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যমতে কলিযুগমুখে মধ্যরবি ও মধ্যশশীর স্থান ০।০।০।০ অর্থাৎ উভয়ই মেষ রাশির আদিতে ছিল। আর পাঁচটি গ্রহ ঠিক তথায় ছিল না। ভাস্করাচার্য্যের গণনায় তখন মধ্যমঙ্গল প্রায় ৫৬ কলা, বুধ ২ অংশ ৩৬ কলা, বৃহস্পতি ৩২ কলা, শুক্র ১ অংশ ১৮ কলা, শনি ১ অংশ ১৩ কলা পশ্চিমে ছিল। এইরূপ, অন্যান্য কোন কোন সিদ্ধান্তকার রবিচন্দ্র ব্যতীত অন্য পাঁচ মধ্যগ্রহের কিছু কিছু অন্তর পাইয়াছেন।

যাহা হউক, মধ্যগ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্তের একই অংশ কলাদিতে থাক না থাক, কলিযুগারম্ভ দিবসকে আকাশে গ্রহগণের স্থিতি গণনার নিমিত্ত আদি ধরা হইয়াছে। কিন্তু ৪৯৯৫ বৎসর পূর্ব্বে বৎসরের কোন দিবসে গ্রহগণের যোগ ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ সকলে স্বীকার করেন যে চৈত্র অমাবস্যা দিবসে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। আজ অবধি গণিয়া গেলে সে দিবস শুক্রবার পড়ে। অতএব জানা গেল যে, শুক্রবারে কলিযুগ আরম্ভ।

কিন্তু ঐ দিবসের কোন্ সময়ে এরূপ ঘটনা হয়? ইংলণ্ডীয়গণ যেমন গ্রিণীচগত মধ্যরেখাকে ভূমধ্যরেখা বলিয়া গ্রহগণের স্থিতি গণনা করিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ত্রমতে লঙ্কা* সুমেরু যোগ করিলে যে রেখা হয়,

* লঙ্কা অর্থে লঙ্কাদ্বীপ নহে। বিষুবরেখায় লঙ্কাদ্বীপ অবস্থিত নহে। অথচ সিদ্ধান্তকারগণ লঙ্কাকে বিষুবরেখায় স্থিত বলিয়াছেন। কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন যে, পুরাকালে বর্ত্তমান লঙ্কার দক্ষিণে কোন দ্বীপ ছিল। কিম্বা হয়ত বর্ত্তমান লঙ্কাদ্বীপটি বিষুবরেখা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে এই অংশ সাগর

তাহাই ভূমধ্য রেখা বলিয়া পরিগণিত। এই মধ্যরেখায় উজ্জয়িনী ও কুরুক্ষেত্র অবস্থিত। ইংলণ্ডীয় জ্যোতিষমতে মধ্যরবি গ্রিণীচের মধ্যরেখায় আসিলে দিবারম্ভ ধরা হয়, তদ্রূপ লঙ্কার মধ্যরেখায় মধ্যরাত্রি হইলে আমাদের জ্যোতিষে দিবারম্ভ গণিত হয়। কলিযুগ আরম্ভ হইতে কত বৎসর গত হইয়াছে, শকাব্দ সংখ্যার সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে তাহা পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, শকারম্ভের ৩১৭৯ বর্ষ পূর্ব্বে শুক্রবারে চৈত্র অমাবস্যা দিবসে উজ্জয়িনীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে মেষরাশির আদি বিন্দুতে সপ্তমধ্যগ্রহ অবস্থিত ছিল। এই সময়ই কলিযুগমুখ।*

কলিযুগারম্ভ সম্বন্ধে যেমন, সত্যত্রেতা দ্বাপরযুগমুখ সম্বন্ধেও তাহাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে সত্যযুগের অবসান সময়ে ত্রেতাযুগমুখে সপ্তমধ্যগ্রহ মেষের আদিতে ছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভ দিবস কেবল গণিতাগত কালমাত্র। জ্যোতিষিক গণনার নিমিত্ত তৎসমুদায় কল্পিত হইয়াছে।

একদিকে দেখিতে গেলে গ্রহগণের গতি নিয়মানুসারী বটে, সকল গুলিই যথানিয়মে স্ব স্ব ভ্রমণপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। অপর

মধ্যে লীন হইয়াছে। ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে,এক সময়ে লঙ্কা কেন, ভারতের দক্ষিণাংশের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার যোগ ছিল। কিন্তু এরূপ কষ্টসাধ্য অনুমানের প্রয়োজন কি? আর তাহা হইলেও, লঙ্কা ও উজ্জয়িনী এক মধ্যরেখার অন্তর্গত হয় কিরূপে? তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে বর্ত্তমান লঙ্কাদ্বীপ পশ্চিম দিকেও বিস্তৃত ছিল। এ কথার খণ্ডনে আমি অপারগ। তবে লঙ্কাদ্বীপ বিষুবরেখার নিকটস্থ বলিয়া বিষুবরেখার একটা নাম লঙ্কা দিতে আপত্তি কি? আমাদের শাস্ত্রীয় ভূমধ্যরেখার ১৮০ অংশ পশ্চিমে রোমকপুর (Rome) বা যবনপুর (Alexandria) স্থিত। অথচ তত্তৎ নগর ঐ স্থানে স্থিত নহে। কেবল স্থান বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নগরের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ লঙ্কা শব্দ।

* কিন্তু পঞ্জিকায় দেখা যায় যে,মাঘী পূর্ণিমা দিবসে শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। অর্থাৎ চৈত্র অমাবস্যার দেড়মাস (চান্দ্র) পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ। এই দিবস খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ই দিবস। ঐ দিবসে গ্রহগণ আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, তদ্দিবসে বুধ ও বৃহস্পতি একই অংশে ছিল। মঙ্গল ৮ অংশ, শনি ১৭ অংশ দূরে ছিল। কেবল শুক্র ৬২ অংশ দূরবর্ত্তী আকাশের পৃথক্ দেশে অবস্থিত ছিল। অতএব বলিতে হইবে, মাঘী পূর্ণিমা দিবসে শুক্র ও চন্দ্র ব্যতীত অপর গ্রহ সকল পরস্পর নিকটস্থ ছিল। গণনার নিমিত্ত স্পষ্ট গ্রহ আবশ্যক হয় না। সুতরাং মাঘী পূর্ণিমা দিবসে স্পষ্টগ্রহ সকলের স্থিতি দ্বারা গণনার কোন সুবিধা হয় না। বোধ হয়, এই জন্যই চৈত্র অমাবস্যা দিবসকে এক্ষণে কলিযুগ আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে। মাঘী পূর্ণিমাকে পরিত্যাগ করিবার অন্য কোন কারণ ছিল কি না,কিম্বা পঞ্জিকা দত্ত কলিযুগোৎপত্তির অন্য কোন অর্থ আছে কি না, তাহা আমি সবিশেষ জ্ঞাত নহি। তবে দেখা যায় যে, এক সময়ে মাঘী পূর্ণিমা হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইত। অমরকোষে মাঘ মাসকে বৎসরের প্রথম মাস ধরা হইয়াছে। হেমচন্দ্রেও এইরূপ। বস্তুতঃ পুরাকালে অনেকবার বর্ষারম্ভকাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল মাসই কোন না কোন সময় বর্ষের আদি মাস স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এখন যেমন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায়, তদ্রূপ তখন চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হইত। আমরা বঙ্গদেশে সৌরমাস গণনা করি। কিন্তু এখন আর ১লা বৈশাখে রবি-ক্রান্তিপাত বিন্দুতে থাকে না। অয়ন চলন হেতু এক্ষণে ৭।৮ই চৈত্র দিবসে রবি ক্রান্তিপাতে আসিতেছে। আমাদের বর্ষারম্ভ দিন ভ্রমাত্মক কি না, তাহার বিচারে এখন ক্ষান্ত থাকা যাক্।

দিকে গ্রহগণের পরস্পর ক্রিয়া বশতঃ তাহাদের গতির ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল গতি আর দেখা যায় না। গ্রহগণ বৃত্তপথে পরভ্রমণ না করিয়া উপবৃত্তাকার পথে* নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। উপবৃত্তের দুইটি ব্যাস অসমান; একটি ব্যাস বৃহৎ, অন্যটি ক্ষুদ্র। উপবৃত্তের দুইটি কেন্দ্র। ইহাদিগকে উপকেন্দ্র বলা যায়। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষমতে পৃথিবীর চারিদিকে রবি শশী প্রভৃতি গ্রহগণ ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী একটি উপকেন্দ্রে অবস্থিত। এই উপকেন্দ্র-স্থিত পৃথিবী হইতে রবিচন্দ্রাদির উপবৃত্তাকার-পথের যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, তাহার নাম মন্দোচ্চ। সপ্তগ্রহের মন্দোচ্চ আকাশের একই স্থানে নহে।

পুনশ্চ, গ্রহগণ একই ক্ষেত্রে থাকিয়া ভ্রমণ করিতেছে না। রবি ভ্রমণ পথের অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের প্রতি অন্যান্য গ্রহগণের ভ্রমণপথ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবনত। যে যে বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত রবি ভিন্ন গ্রহগণের ভ্রমণ-পথ বা বিমণ্ডলের সম্পাত ঘটিতেছে, তাহাদের নাম পাত। পূর্ব্বে চন্দ্রের বিমণ্ডল ও পাত বর্ণিত হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, গ্রহগণের মন্দোচ্চ বা পাত নিয়ত একই স্থানে থাকে না। চন্দ্রের মন্দোচ্চ ও পাত ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের মন্দোচ্চ ও পাত নিতান্ত মৃদু গতিতে বিলোম-ক্রমে একটু একটু সরিয়া যাইতেছে। গ্রহগণের স্থিতি গণনার নিমিত্ত তাহাদের মন্দোচ্চ ও পাতের স্থিতি জানা আবশ্যক হয়। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট কালে মধ্যগ্রহের স্থান জানা যেমন আবশ্যক, তাহার মন্দোচ্চ ও পাতও জানা তেমনি আবশ্যক। সত্যযুগাদি আরম্ভ কালে মধ্যগ্রহ সকল মেষরাশির আদিতে ছিল। ইহা যে প্রণালীতে গণনা করিতে পারা যায়, সেইরূপ প্রণালীতে গণনা দ্বারা এমন একটা সময় আনিতে পারা যায়, যখন সপ্ত-মধ্যগ্রহ এবং তাহাদের মন্দোচ্চ ও পাত মেষের আদিতে অবস্থিত ছিল। সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ সময় সত্যত্রেতাদি মহাযুগের অনেক পূর্ব্বে হইবে। কেন না, মন্দোচ্চ ও পাত গতি নিতান্ত মৃদু। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ইহারা ব্রহ্মার দিনের বা কল্পের প্রথমে একত্রিত হইয়াছিল। ইহাই কল্পের অর্থ। অতএব সত্যযুগাদি যেমন জ্যোতির্বিক গণনার একটা অব্দ মাত্র, সেইরূপ কল্পও একটি অব্দ মাত্র।

আমরা উপরে বলিলাম যে, কল্পারম্ভে সর্ব্বগ্রহ এবং গ্রহমন্দোচ্চ ও পাত মেষের আদিতে অবস্থিত ছিল। ইহাই প্রথমে কল্প কল্পনার মূল। পরে কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলেন যে, গণনা করিলে ঐ ঘটনা ঠিক কল্পের আদিতে আসে না। এজন্য তাঁহারা সেই সময়ের একটা সংস্কার করেন। এই সংস্কৃত কাল ভূসৃষ্টিকাল নামে খ্যাত হইল। এইরূপে আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখিতে পাই যে, মধ্য-গ্রহগণ ও তাহাদের মন্দোচ্চ ও পাত সকলে সৃষ্ট্যাদিতে লঙ্কার্দ্ধরাত্রে মেষরাশির আদিতে অবস্থিত ছিল। তবে কল্প যে পরিত্যক্ত হইল, এমন নহে। উহার একটা ব্যবহার রহিয়া গেল। তাহা পরে বলা যাইতেছে।

কল্প, সৃষ্টিকাল, মহাযুগ সকলের অর্থ ও ব্যবহার কি, তাহা এক প্রকার বুঝা গেল। সূর্য্যসিদ্ধান্তে মন্বন্তরের কোন ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্যগণ কল্পকাল হইতে একবারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মহাযুগে না আসিয়া কল্পকে ১৪ মন্বন্তরে বিভক্ত করিয়া

* উপবৃত্ত = ellipse ; উপকেন্দ্র = Focus ; মন্দোচ্চ = line of apsides ; পাত = nodes.

থাকিবেন। পুরাণকারগণের পক্ষে উহারা রহস্য বর্ণনার এক একটি সুন্দর পন্থা হইল।

ব্রহ্মার সৃষ্টির জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা কি, তাহা বুঝা গেল। ভূ,চন্দ্র,বুধ,শুক্র,রবি,মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সকলে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। ব্রহ্মার অনুজ্ঞায় সকলে স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে চলিতে আরম্ভ করিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে গ্রহ মন্দোচ্চ পাত প্রভৃতি সমুদায় শূন্যে আকাশে একস্থানে ছিল। আজি কালির পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত নীহারিকা কল্পনার* সহিত ইহার অধিক প্রভেদ আছে কি? স্মৃতি,পুরাণ, জ্যোতিষ সকলেই বলিতেছে যে,বাসুদেবাংশ সঙ্কর্ষণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। 'জল হউক'—এই ধ্যানমাত্র জল সৃষ্ট হইল, সেই জলে শক্তি নিক্ষিপ্ত হইল। তাহারই প্রভাবে ভূ অন্তরীক্ষ উদ্ভূত হইল।

কোন এক সময়ে গ্রহগণের স্থিতি না জানিলে, ভূত বা ভবিষ্যৎ কালে তাহারা কোথায় ছিল বা থাকিবে, তাহার গণনা করা যায় না। কোন কোন সিদ্ধান্তকার কল্পাদিকে গণনাব্দ করিয়াছেন, কেহ বা সত্যযুগের আরম্ভকে, কেহ বা কলিমুখকে,অপর কেহ বা শকের কোন বর্ষ, স্বীয় স্বীয় গণনার অব্দ ধরিয়াছেন। এক্ষণে কলিযুগ মহাযুগ ও কল্পের পরিমাণ কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার আলোচনা করা যাউক।

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বে কতকটা

* যাঁহারা লাপলাস প্রবর্ত্তিত সৌরজগতের সৃষ্টিবিষয়ক নীহারিকাবাদ (LaPlace's Nebular Hypothesis) অবগত আছেন,তাঁহারা পূর্ব্বতন আর্য্যগণের সৃষ্টিকল্পনাকে উপেক্ষা করিবেন না। লাপলাস অনুমান করিয়াছিলেন যে,অনেক অনেক দিন পূর্ব্বে সগ্রহ সূর্য্য নীহারিকাকারে বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে তাপের বিকীরণ বশতঃ ও মাধ্যাকর্ষণবলপ্রভাবে সেই পরিব্যাপ্ত ধূমরাশি একত্রিত ও ঘনীভূত হইয়া তাহা ক্রমশঃ বুধ মঙ্গলাদি গ্রহরূপে পরিণত হইয়াছে। এই নীহারিকাবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। এক সময়ে যে সগ্রহ সূর্য্য একত্রে ছিল, তাহা গণনা দ্বারাও জানা যায়। মন্বাদি শাস্ত্রে ও পুরাণে কথিত আছে যে,ব্রহ্মা প্রথমতঃ জলসৃষ্টি করেন। বেদাভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ঐ জলসৃষ্টি রূপকসৃষ্টিমাত্র। যাহা হউক,এখন এ বিষয় বর্ণনা অনাবশ্যক।

পাইয়াছি। এখানে এতদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে বুঝা যাউক। দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসর এক মহাযুগের পরিমাণ। ৩৬০ রবিবর্ষে এক দিব্যবর্ষ হয়। অতএব ১ মহাযুগ = ১২০০০ × ৩৬০ = ৪৩,২০,০০০ রবিবর্ষ। সত্যাদি চারিযুগে মহাযুগ বিভক্ত। যথা,

কলিযুগ প্রমাণ	= ৪৩২০০০ রবিবর্ষ।	
দ্বাপর	,,	= ২ × ৪৩২০০০ ,,
ত্রেতা	,,	= ৩ × ৪৩২০০০ ,,
সত্য	,,	= ৪ × ৪৩২০০০ ,,
১ মহাযুগ প্রমাণ		= ১০ × ৪৩২০০০ রবিবর্ষ
১ কল্প	,,	= ১০০০ × ১০ × ৪৩২০০০ ”

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,সত্যযুগের আদিতে রব্যাদি সপ্তমধ্যগ্রহ ও চন্দ্রের মন্দোচ্চ ও পাত অশ্বিনীর আদিতে অবস্থিত ছিল। এখন যদি এরূপ প্রশ্ন হয় যে, তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে কত বৎসর পরে সকলে সেইস্থানে পুনর্মিলিত হইবে। গ্রহগণের ও চন্দ্রের মন্দোচ্চ ও পাতের মধ্যগতি জানা থাকিলে, পাটীগণিতের লঘুতমাবর্ত্ত্য* (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক) নিয়মানুসারে ঐ প্রশ্নের সমাধান অনায়াসে করা যাইতে পারে। এইরূপে মহাযুগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব জানা গেল যে, মহাযুগ প্রমাণ কেবল গ্রহগতির লঘুতমাবর্ত্ত্য ফল।

প্রথমে সিদ্ধান্তকারগণ কোন্ কোন্ সংখ্যা অবলম্বনে উক্ত ৪৩,২০,০০০ বর্ষ পাইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু প্রক্রিয়া কিরূপ, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি সংখ্যা গ্রহণ করা গেল। যেমন রবি শনি একস্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় ৩০ বৎসর পরে তথায় পুনর্ব্বার একত্রিত হয়, সেইরূপ রবি বৃহস্পতি প্রায় ১২ বৎসরে, রবিকুজ প্রায় ২৫ বৎসরে, রবি শুক্র ৮ বৎসরে, রবি বুধ ৬ বৎসরে পুনর্ব্বার একত্রিত হয়। প্রায় ৮ বৎসর পরে রবি চন্দ্র ও পূর্ব্বস্থানে আগমন করে। চন্দ্রের মন্দোচ্চ প্রায় ৯ বৎসরে এবং পাত (রাহু) প্রায় ১৮ বৎসরে ঘুরিয়া আসে।

* Least common multiple.

ঐ সকল সংখ্যার লঘুতমাবর্ত্ত্যফল ১৮০০ বৎসর। আমরা যে সকল সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য সূক্ষ্মফলদায়ক সংখ্যা লইলে, বোধ হয়, মহাযুগ প্রমাণ আসিতে পারে।*

যাহা হউক, মহাযুগ ও কল্পের পরিমাণের আর একটি সুন্দর ব্যবহার আছে। একটা উদাহরণ দ্বারা এই ব্যবহার পরিস্ফুট করা যাইতেছে। একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের ২৭.৩২১৬৭ সাবন দিবস লাগে। ইংরাজীতে দশমিক দ্বারা যে কার্য্য হইল, তাহা সিদ্ধান্তে অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্ত মতে বলিতে গেলে, এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ রবি বর্ষে চন্দ্র ৫,৭৭,৫৩,৩৩৬ বার ঘুরিয়া আসে। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে সামান্য ভগ্নাংশ কিম্বা দশমিক ব্যবহার* আবশ্যক হয় না। কল্প পরিমাণেরও এইরূপ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। আশা করি, ইংরাজীশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় ব্রহ্মার দিন সত্যযুগাদি লইয়া প্রাচীন আর্য্যগণকে উপহাস করিবেন না। সকল কার্য্যেরই দোষোদ্ঘাটন করা সহজ; কিন্তু কি অভিপ্রায়ে সেই কার্য্যের সূচনা, তাহা নিরূপণের চেষ্টা না করিয়া বৃথা বিদ্রূপ করিলে কোন ফলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, মহাযুগ প্রমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে আনীত হইয়াছিল। ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫৪ বিকলা। সুতরাং উহা ২৪০০০ বৎসরে ক্রান্তিবৃত্তে একবার ঘুরিয়া আসিবে। কলিযুগ ইহার ১৮ গুণ। এই ১৮ সংখ্যাটি কেন গৃহীত হইল? রাহু বা চন্দ্রের পাত ১৮ বর্ষে একবার ঘুরিয়া আসে। বোধ হয় এই জন্য ঐ সংখ্যা দ্বারা ২৪০০০ গুণিত করিয়া কলি যুগ পরিমাণ আনীত হইয়াছিল। (Selections from the Calcutta Review, Feb. 1881. 2nd edition.) পাঠক দেখিবেন যে, ঐ অনুমানটি ঠিক হয় নাই। যে সে অঙ্ক দিয়া ৪৩,২০,০০০ মিলাইতে গেলে চলিবে কেন? ক্রান্তিপাতের গতি অপেক্ষা গ্রহগণের গতি গণনার পক্ষে অধিক আবশ্যক। আর বহু পূর্ব্বে যে ক্রান্তিপাতের গতি ভারতীয় আর্য্যগণ অবগত ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবারও কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না।

* কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সংস্কৃত পাটী গণিতে দশমিক ব্যবহার নাই। পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশে দশমিক ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল না বটে, কিন্তু তা বলিয়া যে প্রাচীনেরা আদৌ ইহা অনবগত ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে ঘনমূল নিষ্কাশনের যে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দশমিকের মূলতত্ত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। রেশম বিজ্ঞান।— শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, প্রণীত। মূল্য ১৷৷০। নব্যভারতের পাঠকদিগকে, নিত্যগোপাল বাবুকে, এ পরিচয় আর দিতে হইবে না; কৃষিকার্য্যের উন্নতি শীর্ষক প্রবন্ধ সমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে জানেন। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়া এপর্য্যন্ত যে সকল মহানুভব ব্যক্তিকে বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, মাতৃভাষার সেবায় এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত, প্রধানতঃ, নিত্যগোপাল বাবু। বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন, কৃষিকার্য্য ও কৃষকের উন্নতি ভিন্ন এদেশের উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং নিত্যগোপাল বাবু এদেশের ভাবী উন্নতির নেতা। আমরা নিত্যগোপাল বাবুকে অভিবাদন করি।

রেশম-বিজ্ঞান, বাঙ্গালা ভাষার অভিনব পুস্তক। নিত্যগোপাল বাবু নব্যভারতের লেখক, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিতে আমরা কিছু সঙ্কুচিত। এজন্যই, এই পুস্তক সম্বন্ধে পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইল না। কিন্তু সঙ্কোচের সহিত হইলেও, এ কথা না বলিলে নয় যে, রেশম-বিজ্ঞান, বাঙ্গালাভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সাহিত্যের দিক্ দিয়া হউক বা না হউক, এ পুস্তক যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সরল ব্যাখ্যায়, মধুর বিবৃতিতে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষার এক বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। রেশম বিজ্ঞানে কি কি বিষ-

য়ের আলোচনা হইয়াছে, সংক্ষেপে লিখিলে সকলেই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। প্রথমভাগ—তুঁতগাছ ও পলু-পোকা। দ্বিতীয়ভাগ—পলুপোকার ও তুঁত গাছের ব্যাধি। তৃতীয়ভাগ—ব্যবহারোপযোগী রেশম-কোষ। ৪র্থ ভাগ—শিল্প ও বাণিজ্য। পরিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক। কিরূপে রেশম উৎপন্ন করিতে হয় ও কিরূপে তাহা ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়, সে সমস্তই এ পুস্তকে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন—

"আনুপূর্ব্বিক বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার শিক্ষায় সুবিধা কোন ব্যবসায় সম্বন্ধেই এখনও এদেশে হয় নাই বলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় বৃত্তিশিক্ষা (Technical education) সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থের এত অভাব। যেরূপ সুবিধার কথা বলা হইল, রেশম ব্যবসায় সম্বন্ধেও যে এরূপ সুবিধা অদ্যাপি এদেশে কাহারও পক্ষে ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। * * * পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় নকল করিয়া লইয়া মালদহ ও বীরভুম জেলার কয়েকজন রেশম ব্যবসায়ী কার্য্যতঃ এত উপকৃত হইয়াছে যে, পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে শত সহস্র ব্যক্তি ইহার সাহায্যে বঙ্গদেশের একটী প্রধান ও গৌরবজনক ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, এই আশাই এই গ্রন্থ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

যে সকল প্রদেশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ অর্থাৎ বর্ষায় প্লাবিত হয় না, সেই সকল প্রদেশেই তুঁতগাছ জন্মিতে পারে। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তুঁতগাছ সকল প্রকার জমীতেই জন্মে, অর্থাৎ যেখানে অন্যান্য গাছ জন্মে, সেখানে তুঁতগাছও জন্মে। যে দেশে তুঁতের আবাদ নাই, সেখানে এ গাছ জন্মিবে কি না, ইহা ভাবিতে হয় না। তবে শীত-প্রধান দেশে বাঙ্গালা নিয়মে তুঁতের আবাদ চলিতে পারে না।" গাছ গুলি একবার জন্মাইতে পারিলে বহুকাল স্থায়ী হয়। এজন্যই বর্ষার প্লাবন যেখানে পৌঁছে না, এমন স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত। যে স্থানে তুঁতগাছ জন্মিতে পারে, সেখানেই রেশম পোকা (পলু) পোষা যাইতে পারে। ২৫বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলার কুমারখালীর কুঠি বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান রেশম কুঠি ছিল। এক্ষণে নাই। এক্ষণে বগুড়া, হাবড়া, হুগলি ও ২৪পরগণার কোন কোন স্থানে পলু পোষা হয়। প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জেলাতেই বর্ত্তমান সময়ে তুঁতের বহুল চাষ ও অনেক রেশমের কুঠি আছে। আমাদের বিবেচনায়, তুঁত চাষ ও পলু পোষা ব্যবসায় বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে। এমন লাভজনক কার্য্য হইতে বঙ্গদেশ কেন দূরে রহিয়াছে? কেবল শিক্ষার অভাবে। কিরূপে তুঁতগাছের ও পলুর উন্নতি করিতে হয়, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলা মতে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, তাহার আলোচনা এই পুস্তকে হইয়াছে। এই একখানি পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, এ সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান সুন্দররূপে জন্মে। এখন কথা এই, এ শিক্ষা বিস্তারের উপায় কি?

গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসরাবধি আদর্শ কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সে শিক্ষা এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। প্রজার উন্নতি, কৃষকের উন্নতি, সর্ব্বপ্রকারে, তাহাদের পিতৃস্থানীয় জমীদারবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের এই বঙ্গপ্রদেশে আজকাল সহৃদয়, সুশিক্ষিত, উদার জমীদারের অভাব নাই। তাঁহারা যদি সকলে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন, অচিরে বঙ্গদেশ রূপান্তরিত হইবে। রেশম-বিজ্ঞানের ন্যায় পুস্তক দ্বারা তাঁহারা যদি প্রজাদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেন, আমাদের মনে হয়, বিশেষ উপকার হইবে। তা ছাড়া, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে যে, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কায়মনোবাক্যে আপন আপন গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের কৃষকগণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন। জমীদারগণ না করিলেও, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতে পারেন। পাবনা জেলার অধীন ঘোলাকুড়া নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ মৃত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অল্পদিন হইল, মৃত্যু তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে! তাঁহার স্থান পূরণ করিতে আর কি কোন সদাশয় ব্যক্তি অভ্যুদিত হইবেন না? দরিদ্রের বন্ধুর অভ্যুদয় ভিন্ন এদেশের মঙ্গল নাই। উন্নতশ্রেণীর

শিক্ষা নিম্নশ্রেণীতে সংক্রামিত না হইলে, সে শিক্ষায় ধিক্। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও অশিক্ষিতদিগের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহাদের শিক্ষায় ধিক্। শিক্ষিতগণ, অসহায় কৃষকদিগের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হউন!

রেশম বিজ্ঞানের ন্যায় পুস্তক এ দেশে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ভাষা পরিপাটী, প্রাঞ্জল, বর্ণনা সুন্দর। বিষয়টী বুঝাইবার জন্য বহু চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অপার প্রাইমারি,ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল সমূহের পাঠ্য লিষ্টভুক্ত হওয়া উচিত। যদি গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, টেক্সট্‌বুক্ কমিটী উদাসীন থাকেন, সর্ব্বসাধারণের এ সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক আর এদেশে হয় নাই। গ্রন্থকারের প্রথম চেষ্টা পুরস্কৃত না হইলে, ভবিষ্যতে এইরূপ কাজে আর কোন যোগ্য ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিবে না। যাহাতে রেশম-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সেরূপ চেষ্টা করা উচিত।

২। **গোয়েন্দা-কাহিনী**।—শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ৵০। এপুস্তকের লেখা ভাল। বর্ণনায় যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে।

৩। **গ্রীক ও হিন্দু**।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৷০টাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ। আমরা এই সর্ব্বজন-আদৃত পুস্তকের ১ম খণ্ড উপহার পাইয়া বিশেষরূপ বাধিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী ব্যক্তিগণ অনেকেই গ্রীক ও হিন্দু পাঠ করিয়াছেন। এরূপ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তক এদেশে বড় বেশী নাই। এই এক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রফুল্ল বাবু বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে অমর হইয়াছেন। সর্ব্বজন-পরিচিত পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যকতা দেখি না বলিয়া তাহা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

৪। **যুগান্তর**।—সামাজিক উপন্যাস, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত,মূল্য ১৷০। আমরা যতদূর অবগত আছি,শ্রদ্ধেয় শিবনাথ বাবু এক সময়ে উপন্যাসের বিরোধী ছিলেন। "মেঝ-বউ"এর ন্যায় অতি সুন্দর পুস্তকখানি তিনি যখন প্রকাশ করেন, তখন তাহার উপর"উপন্যাস"বলিয়া লেখা ছিল না। যুগান্তরের উপর "সামাজিক উপন্যাস" লিখিত দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। উপন্যাস জীবন গঠন করে, চরিত্রের ভিত্তি প্রোথিত করে, ভাষায় অধিকার জন্মায়, ধর্ম্ম ও নীতি,পুণ্য ও পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া অধর্ম্ম, পাপ ও দুর্ণীতিকে খর্ব্ব করে। পৃথিবীতে এই জন্য উপন্যাসের এত আদর। আমাদের দেশের মধ্যে শিবনাথবাবু একজন প্রধান ব্যক্তি; তিনি যখন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের নিন্দা করিবার অবসরে বাঙ্গলা উপন্যাস সমূহের উপর গালাগালি বর্ষণ করিতেন, তখন মনে বড় বেদনা পাইতাম। বঙ্কিম বাবু এখন স্বর্গে, এখন শিবনাথবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের পদানুসরণ করিতেছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। উপন্যাস মহলে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হউক, শিবনাথবাবুর ন্যায় একজন চরিত্রবান্, ধর্ম্মানুরাগী,সুনীতি-পরায়ণ ব্যক্তি বাঙ্গলা উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যুগান্তর, শিবনাথবাবুর পুস্তক বলিয়া, আমরা খুব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি খুব বড়, ২৯৬ পৃষ্ঠায় পুর্ণ। পুস্তকের প্রধান গুণ এই,পবিত্র ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত, পিতা পুত্রে বসিয়া পাঠ করিলেও মনে বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় গুণ এই,আমাদের দেশের আদর্শ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের চিত্র তিনি এত সুন্দররূপ চিত্র করিয়াছেন, পাশ্চাত্য রীতিনীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে অনেক শিক্ষা পাইবেন। তৃতীয় গুণ এই, কিরূপে, কি আকারে এ দেশে সংস্কারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল,এপুস্তকে তাহার উজ্জ্বল চিত্র আছে। চতুর্থগুণ এই, পাপের পথে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে মানুষের গতি হয়,হরচন্দ্রের চরিত্রে তাহা সুন্দর রূপ দেখান হইয়াছে এবং কিরূপে পাপীকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, বিজয়ার প্রেমের দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্-

কের বহু স্থানের বর্ণনা এত সুন্দর হইয়াছে যে,পড়িতে পড়িতে মোহিত হইতে হয়। এ পুস্তকের প্রথম চিত্র—বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চিত্র, অতি সুন্দররূপ অঙ্কিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়,এ চিত্রের শেষাংশ কিছু নিষ্প্রভ হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্র নবীনচন্দ্র, তৃতীয় চিত্র কৃষ্ণকামিনী। নবীনচন্দ্র একজন উন্নতি-শীল ধার্ম্মিক যুবক, কৃষ্ণকামিনী বালবিধবা। কিছু দিন এক বাড়ীতে উভয়ে ছিলেন। সেই স্থলেই উভয়ের অনুরাগের সঞ্চার হয়। শেষে বিবাহ হয়। বিবাহের পর উভয়ে মিলিয়া নানাপ্রকার সৎকাজের অনুষ্ঠান করেন ও সুখে কালাতিপাত করেন। নবীনের প্রণয় সম্বন্ধে কৃষ্ণকামিনীর মাতা বলিয়া ছিলেন—(২৭০ পৃষ্ঠা) "ওমা,ওমা, পুরুষমানুষ চেনা ভার, ভাল মানুষটীর মত বাড়ীতে থাকৃতো, ভিতরে ভিতরে এই বুদ্ধি। তবে ত আমার দাদা ঠিক বলেছিলেন।''কৃষ্ণকামিনীর মামা নবীন সম্বন্ধে এক সময়ে বলিয়াছিলেন (১৭৯পৃষ্ঠা)"এত বড় বিধবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর, যাকে তাকে কি বাড়ীতে পূরলেই হলো?" শেষে উভয়ের পরিণয় হইলে, তাঁহার কথাই সত্য হয়। কৃষ্ণকামিনীর মাতার ঐ উক্তির বিরুদ্ধে এই পুস্তকে আর কোন কথা বলা হয় নাই। ইহাতে আমাদের মনে হয়,এরূপ বিবাহের অনুমোদন করিবার কিছুই নাই। এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া,এবং তাহাদিগকে আদর্শ করিবার চেষ্টা করিয়া, এক বাড়ীতে পাত্র পাত্রীর থাকার সময়ে প্রণয়-সঞ্চারের যে গ্রন্থকার পক্ষপাতী, তাহা প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন। এরূপ বিবাহে সমাজ কলুষিত হওয়ার খুব সম্ভব; সুতরাং আমরা ইহার অনুমোদন করি না। আমাদের বিবেচনায়, এই এক কারণে এ পুস্তকের আদর্শ অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। তবে একথা অবশ্য বলিব, শাস্ত্রী মহাশয় নবীন ও কৃষ্ণকামিনীর প্রণয়-সঞ্চার ঘটনায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র প্রণয় সঞ্চারের পর হইতেই সতর্কভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের সহিত কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ না হইলে,আমাদের বিবেচনায়, এপুস্তকের সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িত। এ পুস্তকের প্রধান দোষ এই,নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার অযথা বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃতী উপন্যাস-লেখকেরা যে ব্যক্তির যে ভাবটী পাঠকের মনে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাব সম্বন্ধীয় ঘটনা সমূহেরই কেবল উল্লেখ করেন। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের পাঠকগণকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হন। যুগান্তরের গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। অনেক ঘটনা, অনেক বর্ণনা অসংবদ্ধ, অসংলগ্ন ভাবে পুস্তকের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিতেছে। তাহাতেই এই পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ণনাগুলি অনেকস্থলে ভাল বটে, কিন্তু পুস্তকের সহিত তাহার অনেকের কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায়, নীরস বলিয়া মনে হয়, পাঠের সময় ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এই কারণে, এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া উঠিবার সময়,কোন ভাবই অন্তরে মুদ্রিত থাকে না। পুস্তকের প্রথমাংশের সহিত পুস্তকের শেষাংশের অতি অল্পই সম্বন্ধ। আমরা বলিতে কিছু সঙ্কুচিত হইতেছি, "মেঝবউ"নামক পুস্তকের গ্রন্থকার"যুগান্তর" রচনায় পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখিতে পারেন নাই। এজন্য আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। অনেক বিষয়ে শিবনাথ বাবু আদর্শ ব্যক্তি—তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ, নানাদিকে দৃষ্টি সঞ্চারণের জন্য,বুঝিবা, এ পুস্তকে নানা অমার্জ্জনীয় ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে। তিনি একটু সতর্ক হইলে ভাষাকে আরো সুন্দর, মনোমুগ্ধকর, বিশুদ্ধ ও পরিপাটী করিতে পারিতেন, এবং ঘটনা, বিষয় ও চিত্রের উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এ পুস্তক খানিকে অনেক বিষয়ে আদর্শ করিতে পারিতেন। তবে একথা অবশ্য বলিব, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই এতকথা লিখিলাম,অন্য কোন ব্যক্তি লিখিলে, মোটের উপর বলিতাম,"পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই।" শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে সকল কথা বলিলাম, তজ্জন্য তিনি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি।

৫। দাসী।—মাসিক পত্র ও সমালোচন, বার্ষিকমূল্য২৲,সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,এম-এ। আমরা এই পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। যে উদ্দেশ্যে দাসাশ্রম ও দাসী পরিচালিত হইতেছে,এ উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি নাই, এমন লোক কোন দেশে আছে কি? দরিদ্রের সেবা,পরিত্যক্তের সেবা, পীড়িতের সেবা, সাধারণতঃ লোকেরা প্রাণের সহিত গ্রহণ করে না,—ঘৃণা,তাচ্ছল্য, উদাসীনতার ভাবে এখানে কার্য্য করে। যে সকল পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি এই সকল ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারা মানব নামে দেবতা। দাসাশ্রম ও অনাথাশ্রম এই সেবা ব্রত লইয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দাসী এই দাসাশ্রমের সাহায্যের জন্য। যাঁহারা ইহার পরিচালক, তাঁহারা আমাদের প্রণম্য। তাঁহাদের কাজের সহিত আমাদের প্রাণের যোগ। আমাদের দেশের ভাল কাজে অনুরাগ দীর্ঘকাল থাকে না, অতিরিক্ত প্রশংসায় কখনও অনুরাগ কমে, দেশীয় লোকের গভীর উদাসীনতায় কখনও অনুরাগ দমে। যে প্রশংসার জন্য সৎকাজে ব্রতী, সে প্রশংসা পাইলে কাজ ছাড়ে; আর যেব্যক্তি পরের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রত্যাশী, পরের উদাসীনতায় তাহার আবেগ হ্রাস হয়। এই দুই-ই সৎকাজের বিঘ্নকারী। থাকে কি না থাকে,বাঁচে কি না বাঁচে, ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা,দাসাশ্রম এবং অনাথাশ্রমের কাজ সম্বন্ধে বড় উচ্চবাচ্য করি নাই, বরাবর ইচ্ছা,এ দুটী কাজ দরিদ্র বঙ্গ-কুটীরের উজ্জ্বল মণি, দুই থাক্; গোপনে সাহায্য করিয়াছি, বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছি। বঙ্গদেশ ধন্য,এই দুই কাজই আশাতীত কাল ভালরূপ চলিয়াছে। বিধাতা এই আশ্রম-দ্বয়ের উপর কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

"দাসীর" এখন চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে। বর্দ্ধিত কলেবরে, সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে অঙ্গ ভূষিত করিয়া দরিদ্রের সাহায্য করিতে দাসী প্রকাশিত হইতেছে। দাসী নূতন আকারে ৬মাস বাহির হইতেছে। দুই সংখ্যায় সমালোচনা ছিল। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় লিখিত আছে,—"অতপর সাধারণতঃ গ্রন্থ সমালোচনা থাকিবে না।" দাসীর পক্ষে এ নিয়ম ভাল। সমালোচনার প্রলোভন বড় শক্ত প্রলোভন। পরনিন্দা-লোলুপ ব্যক্তিগণের যখন আর কোন কাজ থাকে না, ডাকিয়া হাঁকিয়াও যখন অন্যের নিন্দা কাহাকেও শুনাইতে পারে না, তখন পত্রিকার আশ্রয় লয়,কখনও মাসিকের ঘাড়ে চাপে, কখনও সাপ্তাহিকের ঘাড়ে উঠিয়া,উপযাচিতভাবে, অযথা গালিগালাজ করিয়া তৃপ্তি সাধন করে। নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না; পাণ্ডিত্য কাহাকে বলে, খোঁজ রাখে না। আপন জ্ঞানে, আপন সম্মানে, আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া 'যা'তা' অবাধে লিখিয়া যায়। ভাল ভাল পত্রিকার এরূপ 'বাতুড়ীরোগ' হইলে শ্রোতার অভাব কোথায়? সুতরাং তাহাদের মনোবৃত্তি পরিতৃপ্তির ইহা অতি সুন্দর উপায়। বাঙ্গালার যখন এই অবস্থা,এই সময়ে,দাসী সমালোচনা-ব্রত পরিহার করিতেছেন। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। দাসীর সম্পাদক উপযুক্ত ব্যক্তি, সৎসাহস তাঁহার আছে,কাপুরুষতা তাঁহাতে নাই, তিনি অনেক বিষয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তি। সমালোচনা কার্য্য তিনি উত্তমরূপনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তবুও দাসাশ্রমের মঙ্গলের জন্য ইহা পরিত্যাগ করিলেন,—ভাবেন,কি জানি,কাহারও প্রতি যদি অবিচার হয়, কেহ যদি বিরক্ত হন,তবেই ত দাসাশ্রমের ক্ষতি। এ অতি বুদ্ধিমানের কাজ। এই রূপ কারণে, আমাদের বিবেচনায়, দাসীর মধ্যে বাদপ্রতিবাদ অধিক প্রকাশিত না হইলেও ভাল হয়। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। দাসী খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। দরিদ্রের সেবার ন্যায় পবিত্র কাজে যাঁহারা সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা অগ্রসর হউন। দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করার ইহা সুন্দর অবসর।

৬। কবিবিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী।—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যএম-এ,বি-এল প্রণীত,মূল্য ৸৹। এই গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকখানি অল্পদিন হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারত-মঙ্গল প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকের সহিত পরে ইহার সমালোচনা করিব।

ঋগ্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব। (১)

ঋগ্বেদের মণ্ডল সমূহের সাময়িক ক্রম নির্ণয়। *

আর্য্যজাতির পূজনীয় গ্রন্থ বেদ। বেদের চারি সংহিতা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। সংহিতা সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার মন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা উচ্চারিত হইত। ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র হোতৃগণ আবৃত্তি করিতেন; যজুর্ব্বেদ সংহিতার মন্ত্র অধ্বর্য্যুগণ উচ্চারণ করিতেন; সামবেদ সংহিতার মন্ত্র উদ্‌গাতৃগণ গান করিতেন। অথর্ব্ব সংহিতা অন্য তিন সংহিতার অনেক পরে সংগৃহীত হইয়াছে। চারি সংহিতার মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন,তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। ইহার দশ মণ্ডলের অনেকগুলি ঋক্ অথর্ব্ববেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সামবেদের ৭৫টি ঋক্ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত। ঋগ্বেদের প্রত্যেক মণ্ডল কতকগুলি সূক্তে বিভক্ত। সমুদায়ে ১০১৭টি সূক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত ১১টি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ; কোন কোন পুস্তকে তাহা ঋগ্বেদের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। এই ১১টি লইয়া সমুদায়ে ১০২৮টি সূক্ত। প্রত্যেক সূক্ত কতকগুলি ঋক্ (মন্ত্র) দ্বারা গঠিত। সমুদায়ে ১০,৬৬০ ঋক্ আছে। ঋক্‌বেদে সমুদায়ে ১৫৩৮২৬টি শব্দ আছে। প্রত্যেক সূক্তের এক (বা অনেক) দেবতা আছে, যাহার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং এক (বা অনেক) ঋষি আছে, যাহাদ্বারা রচিত হইয়াছে।

পণ্ডিত মোক্ষমূলর অনুমান করেন যে, ঋক্‌গুলি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে এক সহস্র হইতে আট শত বৎসরের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত ঋক্, ধর্ম্মমত, এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান কতদিনে হইয়াছিল, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারেন না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কল্পনা করেন যে, খ্রীষ্টের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ঋক্‌গুলি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু মোক্ষমূলর তাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই।

আমরা যে সকল দার্শনিক মত ও তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, বাস্তবিক তাহা পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। ঠিক কোন্ সময়ের কথা, তাহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সমস্ত আর্য্যজগতে ইহা অপেক্ষা পুরাতন কিছুই নাই, এবং ঋক্‌বেদের সমালোচনা করিয়া আমরা যে সময়ের চিন্তা ভাব ও কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে অবগত হইতে পারি, তৎসময়ের কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুই সহস্র বৎসরের অবস্থাও আমরা বৈদিক গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অবগত হইতে পারি না।

ঋকের উদ্দেশ্য কি? প্রথম অবস্থায় মানবের চিন্তা ও প্রীতি প্রকাশের জন্যই তাহা রচিত হইয়াছিল। ঋক্‌গুলি কি উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল? ইহার উত্তরে প্রায় সকল পণ্ডিতকেই একমত হইতে দেখা যায়। মোক্ষমূলর বলেন, চারিবেদ ধর্ম্ম ও যজ্ঞের প্রকাশ্য উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা ঠিক হয়, তবে গুরুতর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে,আমরা কেবলমাত্র বেদ সমালোচনা করিয়া ঋক্ রচনাকালীন সময়ের সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারি, সে জ্ঞান কতদূর প্রকৃত? হইতে পারে, বেদ সংগ্রহের সময় আরও অনেকগুলি কবিতা প্রচলিত ছিল,

* উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির বঙ্গানুবাদ প্রায়শঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল।

কিন্তু তাহারা যজ্ঞের উপযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক যজ্ঞ সম্পাদন ঋক্ সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ অনুমান করা যায় না যে, যজ্ঞের অনুপযোগী ঋক্‌গুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাই যদি সত্য হইত, তবে আমরা রথচক্র সম্বন্ধে কোন ঋক দেখিতে পাইতাম না এবং অষ্টম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তের ভেক বর্ণনা আমরা কখনও শুনিতে পাইতাম না। এমন অনেক ঋক্ ও অনেক সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে এরূপও বলা যায় না যে, ঋক্ সংগ্রহের পূর্ব্বে যত কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই ঋক্‌বেদে সন্নিবিষ্ট আছে। অনেক ঋকে এরূপ বলা হইয়াছে যে "পণ্ডিতেরা বলেন" "বিদ্বান্‌গণ উপদেশ দেন"। এই কথার পরে যে সকল মত উদ্ধৃত আছে, তাহার উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে (১) যদিও যজ্ঞ সম্পাদনই সংগ্রহকর্ত্তাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য না হউক, (২) সংগ্রহের পূর্ব্বকালীন সমস্ত সাহিত্য ঋক্‌বেদসংহিতার অন্তর্ভূত হয় নাই।

ঋক্‌বেদ সম্পূর্ণ পাঠে সহজেই বোধ হয় যে, ঋক্‌বেদের শেষ অংশের ঋক্‌গুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভাষার গঠন ও চাতুর্য্যের প্রমাণ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ যুক্তিও অবলম্বিত হয়। ঋক্‌বেদের প্রথমাংশে যেরূপ অল্পসংখ্যক স্থান, নদী ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ অংশে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্থান, নদী ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলের মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষিগণ যে সময়ের, পরাশর অবশ্যই তদপেক্ষা পরবর্ত্তী সময়ের। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ পঞ্চনদীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পরাশর সপ্তনদীর কথা বলিয়াছেন (১৭১।৭; ১৭২।৪)। পরাশর জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে পরস্পরকে অন্নদান করা যায় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১৭১।৭)। পুরাকালে আর্য্যজাতির যেরূপ সদ্ভাব ছিল, তাহার অন্যথা দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছেন "হে অগ্নি! আমাদের পৈতৃক সৌহৃদ্য বিনাশ করিও না, যেহেতু তুমি অতীতদর্শী ও বর্ত্তমান বিষয়ও জান" (১৭১।১০)। দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋক্‌গুলি আরও পরবর্ত্তী সময়ে রচিত। তাহাতে তন্তুবায়, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ, নাপিত প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন লোক সকলকে ঋণজালে জড়িত দেখিয়া গৃৎসমদ ঋষি ঋণের ভয়ে অভিভূত হইয়াছেন (২।২৭।২৪)। এইরূপ অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়া দেখান যায় যে, ঋগ্বেদের মণ্ডলগুলি ক্রমান্বয়ে পর পর রচিত। ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিতেছেন "হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্ব্বকালজাত পুরাতন (অঙ্গিরা প্রভৃতি) ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার বন্ধু হইয়াছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেইরূপ হইয়াছেন।" (৬।২১।৫)। নবম মণ্ডল যে আরও পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইবে।

কি প্রকারে ঋষিগণ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অবশ্য একথা বলা যায় না যে, প্রথম মণ্ডলের সকল ঋষি

অপেক্ষাই দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রত্যেক ঋষি অনেক উন্নত ছিলেন। কোন সময়ে এক মহাপুরুষ লোকাতীত প্রতিভা প্রভাবে উচ্চতর সত্য আবিষ্কার করিলে যে সেই সময়ের প্রত্যেকের মনই তাঁহার ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিবে, একথা বলা যায় না। যীশুখ্রীষ্টের সময়ে সকলেই তাঁহার ন্যায় উন্নত ছিলেন না। নিউটনের সময় সকল বৈজ্ঞানিকই যে তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে কি সকল উচ্চমত সকলে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছেন? যখন আমরা কোন তত্ত্বের ক্রমিক আবিষ্কারের সূত্র অবলম্বন করিতে চেষ্টা করি, তখন সেই তত্ত্বের অঙ্কুর হইতে পূর্ণাবয়ব কি প্রকারে ক্রমশঃ বিকশিত হইল, তাহা দেখাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাতে যে ঋষি যতদূর সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাকে তত উচ্চ আসন প্রদান করিতে হইবে। তবে এই মাত্র স্থির রাখিতে হইবে যে, যেন আমরা সময়ের ব্যতিক্রম করিয়া ভ্রমে পতিত না হই। অনেক পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেক সময়ে এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, তাঁহারা ঋগ্বেদের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বলেন যে, মণ্ডলগুলি পর পর রচিত। কিন্তু কোন তত্ত্বের ক্রমিক বিকাশ দেখাইবার সময়, নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য যথাক্রমে মণ্ডলগুলি উদ্ধৃত না করিয়া, হয়ত পূর্ব্বে পঞ্চম কি দশম মণ্ডলের ঋক উদ্ধৃত করিতেছেন এবং পরে প্রথম মণ্ডলের ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছেন। সাময়িক ক্রমের তদ্রূপ অন্যথা না করিয়া, কি প্রকারে বেদের আদি হইতে অন্ত বিকশিত হইল, কি প্রকারে বেদের প্রথম মণ্ডলস্থ অগ্নি ও ইন্দ্রের উপাসনা হইতে বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষদের পরমাত্মার তত্ত্ব আবিষ্কার হইল, তাহারই সূত্রান্বেষণ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথমকাল।

বৈদিক সময়ের প্রথমাংশ মধুচ্ছন্দা হইতে পরাশর পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা গেল। দ্বিতীয়াংশ গৌতম হইতে ভরদ্বাজ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। ৭ম, ৮ম ও ৯ম মণ্ডল তৃতীয়াংশের অন্তর্ভূত হইল; এবং দশম মণ্ডল চতুর্থাংশ নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপ বিভাগের উপযুক্ত কারণ যথাসময়ে পরিস্ফুট হইবে।

প্রথম কালে দুই শ্রেণীর ঋষির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর ঋষিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকেই প্রধান করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে সব্যঋষিই সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋষিগণ অগ্নির স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকেই প্রধান করিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে পরাশরই সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়।

১। অগ্নি ও ইন্দ্রের প্রাধান্য বিচার।

ক। ইন্দ্রের প্রাধান্য।

ঋগ্বেদের প্রথম ঋষি মধুচ্ছন্দা। তাঁহার সময়ে আর্য্যগণ, বোধ হয়, কোন স্থানেই নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে ছিলেন না। সেই সময়ে তাঁহারা কোন্ স্থানে বাস করিতেছিলেন, কোন্ নদীর জলদ্বারা তাঁহাদের পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছিল, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদের অতি প্রথমে (১।৩।১২) কথিত হইয়াছে যে, "সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন"। তাঁহারা তখনও প্রচুর খাদ্য আহরণ করিতে পারেন নাই, এবং বৃষ্টির জন্য, অর্থের জন্য, গাভীর জন্য ও অন্নের জন্য সর্ব্বদা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যথেষ্ট আহার আহরণ করা দুঃসাধ্য, তাহাতে আবার প্রবল শত্রু চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতেছে। ঋষিগণ নিরতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া "শত্রু-সংহারক" ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

ঋষিগণ দেখিতেছেন, কোন সময়ে সরস্বতীর জল অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া, কূল উপকূল প্লাবিত করিয়া শস্য, গাভী, আত্মীয়বর্গ ধ্বংস করিয়া প্রবাহিত হইল, অমনি তাঁহারা জলদেবতার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রুর রাজ্য প্লাবিত কর। কখনও দেখিলেন, সুন্দর নির্ম্মল আকাশের চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গভীর নীল জলধর ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জগৎ পরিপূর্ণ করিল। ভয়ানক গর্জ্জনে গাভী ও মানবের হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল, বিদ্যুতের ক্ষণিক উজ্জ্বলতায় চক্ষু স্তম্ভিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ বজ্রপাতে বন্ধুবর্গ বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঋষি স্তব রচিলেন, "বজ্রধারী ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না, শত্রুকে স্বগণ সহিত বিনাশ কর", "তোমার সহায়তায় আমরা বীর অস্ত্রধারীদিগের সহিত সৈন্য সজ্জাযুক্ত শত্রুকেও পরাভব করিতে পারি"। (১৮।৪)।

মধুচ্ছন্দা অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিকেও আহ্বান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বীরত্বেরই উপাসক, তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ইন্দ্রের পূজা তৎসময়ে নির্ব্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ যে শত্রুধ্বংসকারী বীর ইন্দ্রের উপাসনা দেশ মধ্যে প্রচলিত হয়। "হে নিন্দুকগণ! এদেশ হইতে এবং অন্য দেশ হইতেও দূর হইয়া যাও"। (১৪।৫) "চারিদিক্ হইতে এই স্তুতি তোমার নিকট উপনীত হউক" (১।১০।১২)। তিনি যে প্রথম ইন্দ্রের পূজার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা নহে; তৎপূর্ব্বে "গাথকেরা বৃহৎ গাথাদ্বারা, অর্কীগণ অর্কদ্বারা, বাণীকারেরা বাণীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছেন" (১।৭।১)। বোধ হয়, স্বয়ং বীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। "ইন্দ্র বহুদর্শন জন্য আকাশে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছিলেন" (১।৭।৩)। "ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট হয়, সে সমস্ত স্তোমই বজ্রধারী ইন্দ্রের" (১।৭।৭)।

মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃঋষিও ইন্দ্রেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্র "বল প্রভাবে জগতের নিয়ন্তা" হইয়াছেন (১।১১।৮)

শুনঃশেফও ইন্দ্রকে দেবতাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সময়েও ইন্দ্রের পূজা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইন্দ্রদ্রোহীর মুখে ইন্দ্রের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "হে ইন্দ্র! ঐ গর্দ্দভ পাপ (বচন) দ্বারা তোমার নিন্দা করিতেছে, উহাকে বধ কর" (১।২৯।৫)। সম্মুখে ইন্দ্রের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; নিন্দুকগণ তৎক্ষণাৎ বজ্রপাতে বিনষ্ট হইলে ঋষির অন্তর্জ্জালা প্রশমিত হইত।

সব্যঋষি ইন্দ্রের একজন প্রধান উপাসক। তাঁহার সময়ে ইন্দ্র পূজার বিশেষ বিস্তার হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রকে "অনেকে আহ্বান করে" (১।৫১।১) এবং তিনি "বহুদিনের পুরাতন দেব" হইয়া উঠিয়াছেন (১।৫৩।২)। কিন্তু সব্যঋষি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছেন না। চতুর্দ্দিকে অনেকে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা অন্যান্য দেবগণকেও আহ্বান করিতেছে; ইহা সব্যঋষির সহ্য হয় না। তিনি নিজে সকল সূক্তই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচনা করিলেন এবং তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, লোকে ইন্দ্রব্যতীত অন্য দেবের পূজা না করে। "হে

বহুলোকের স্তুত ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন অন্য কেহ স্তুতি পায় না" (১।৫৭।৪); তুমি "অমোঘ বল সম্পন্ন ও প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট" (১।৫৭।১); তুমি "মহাত্মা" (১।৫৩।১); "তোমার বলের অন্ত পরিমাণ করা যায় না" (১।৫৪।১); "এই ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষের উপরে থাকিয়া তুমি নিজ ভুজ-বলে আমাদিগের রক্ষার জন্য ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছ" (১।৫২।১২); "তুমি দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকারী; তুমি প্রকৃতই নিজ মহত্ত্ব দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ, অতএব তোমার সদৃশ অন্য কেহ নাই" (১।৫২।১৩)। "দ্যু ও পৃথিবী যে ইন্দ্রের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নাই, অন্তরীক্ষের উপরস্থ প্রবাহ যাহার তেজের অন্ত পায় নাই; হে ইন্দ্র তুমি একাই অন্য সমস্ত ভূতজাতকে তোমার অধীন করিয়াছ" (১।৫২।১৪); "তোমার মন পরিবর্ত্তন রহিত" (১।৫৪।৫)।

মধুচ্ছন্দা, জেতৃ, শুনঃশেফ, এবং সব্য ঋষির স্তোত্র সকল সমালোচনা করিয়া সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক শ্রেণীর ঋষিগণ প্রকৃতির এক অতি প্রবল ও আশ্চর্য্য শক্তির অধিষ্ঠাতাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ এমন এক পুরুষের স্তুতি করিতে শিখিলেন, যিনি সমস্ত ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্যাপক হইতেও ব্যাপক, আকাশ ও পৃথিবী যাঁহার ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নাই, যাঁহার বলের অন্ত পরিমাণ করা যায় না। ইহার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যিনি অন্যদেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র ইন্দ্রের স্তুতিতে নিমগ্ন হইলেন, তিনি আর ইন্দ্রকে হস্তপদাদি বিশিষ্ট সামান্য পরিমিত শরীরযুক্ত বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ইন্দ্র কেবল দ্রুতগামী অশ্ব রথে যোজনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়া ফিরিয়া যান না, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর স্বর্গমর্ত্ত্যের পালন কর্ত্তা।

আকাশে মেঘ বিস্তৃত হইয়া পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীতলকে সুশীতল করে, প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিয়া মানবের ক্ষুধার তৃপ্তি সম্পাদন করে। অথচ সেই মেঘ ভয়ানক গর্জ্জন সহকারে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে প্রাণিগণের চৈতন্য তিরোহিত করিতেছে। বৃষ্টির সহিত মেঘ তিরোহিত হইয়া গেল, সে চিরস্থায়ী হইল না। তাহাকে দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায় না; (পণ্ডিত মোক্ষমুলর অনুমান করেন) এই জন্যই তাহার অন্তরালে এক বিপুল শক্তিমান্ পুরুষের অনুভব হইয়াছিল। ঋষিগণ যে প্রথমেই যুক্তির প্রভাবে শক্তির অন্তরালে শক্তিমানের অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা নহে। মানব মনের প্রথমাবস্থায় শক্তিমান্ ব্যতীত শুদ্ধ শক্তির ধারণা হয় না বলিয়াই তাঁহারা একেবারে শক্তিমান্ ইন্দ্রের সম্মুখীন হইলেন। বোধ হয়, যদি মেঘ স্থায়ী দ্রব্য হইত, তবে প্রথমাবস্থায়, সূর্য্যের ন্যায়, মেঘই উপাস্য হইত, ইন্দ্র পর্য্যন্ত যাইতে হইতনা। উপাসকের অনুভবের বিষয়, মেঘ, বৃষ্টি, শব্দ ও বজ্রাহত প্রাণী। মেঘ, বৃষ্টি ও শব্দ ইহার কিছুই স্থায়ী দ্রব্য নহে এবং প্রাণীহত্যা ক্রিয়া বিশেষ মাত্র। অতএব ঋষির চিন্তায় ইহার গুণ অথবা শক্তিরূপে এক বিরাট পুরুষকে বিভূষিত করিল। কিন্তু ঋষির ন্যায় সরল চিত্তে প্রকৃতির কোন শক্তির অধিষ্ঠাতাকে উপাস্যরূপে অবলম্বন করিলে, অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই অনন্তপুরুষকে স্পর্শ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেঘ ত আকাশের অল্প

একটু স্থান ব্যাপিয়া থাকেনা; কতবার আকাশকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে। আকাশের বিস্তার কে আয়ত্ত করিবে? মেঘের শব্দও গগন মেদিনী ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। মেঘের অধিষ্ঠাতা যে দ্যু ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা অতি সহজেই হৃদয়ে অনুভূত হয়। হৃদয়ের ভক্তি জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতার প্রতি আংশিকরূপে প্রধাবিত না করিয়া, যিনি প্রকৃতির এক শক্তির অধিষ্ঠাতাকে সম্পূর্ণ ভক্তি প্রদান করিলেন, ইন্দ্রের উপাসকদিগের মধ্যে সেই সব্যঋষির হৃদয়েই এই ভাব প্রথম আবির্ভূত হইল। ভক্তি ও চিন্তার একাগ্রতাই স্বীয় স্বীয় বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

খ। অগ্নির প্রাধান্য।

জেতৃ ঋষির অব্যবহিত পরবর্ত্তী মেধাতিথি হইতে সব্যঋষির অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরাশর পর্য্যন্ত অগ্নি-উপাসক ঋষিগণের স্তোত্র সমালোচনা করিলেও উক্তরূপ বিস্ময়কর ক্রমিক বিকাশ লক্ষিত হয়।

মেধাতিথিঋষি অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যকে বিষ্ণুনামে আরাধনা করিবার সময়ই তাঁহার হৃদয়ের সম্যক্ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "আকাশে সর্ব্বতোবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে,বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন" (১।২২।২০)। কণ্বঋষি অগ্নিকে "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১।৩৬।৩)।

প্রস্কণ্বঋষি অগ্নিকে "অমর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "হে অগ্নি! তুমি অমর ও সর্ব্বভূতজ্ঞ" (১।৪৪।১); "হে অমর বিশ্বপালক অগ্নি! তুমি বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা" (১।৪৪।৫); "তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত" (১।৪৪।১১)। ইনিও অন্যান্য অনেক দেবগণের স্তুতি করিয়াছেন।

পরাশরঋষি যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের,তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পরাশরের স্তোত্র সমূহে আমরা যেরূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাই, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্তোত্রে আমরা তদ্রূপ গূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার দেখিতে পাইনা। সব্যঋষির ন্যায় পরাশরের সমস্ত স্তোত্রই এক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁহার একমাত্র দেবতা অগ্নি।

পরাশর অঙ্গিরার বংশোদ্ভব (১।৭২।২) এবং অতি বৃদ্ধবয়সেও স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। "সূর্য্যরশ্মি যেরূপ অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জরা আমাকে বিনাশ করিতেছে" (১।৭১।১০)।

ইনি অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী এবং দূতের ন্যায় বলিয়া আরাধনা করিয়াছেন; (১।৬৮।৪ ; ১।৭২।৭) অর্থাৎ অগ্নিকে প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিই সকল দেবগণের প্রধান "হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যগণের জন্ম অবগত আছ, অতএব সমস্ত ভূতজাতকে পালন কর" (১।৭০।৩) ; "সকল অমর দেবগণ মোহশূন্য মরুৎগণকে অনেক কামনা করিয়াও আমাদিগের প্রিয় ও সর্ব্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নাই" (১।৭২।২), "হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, দীপ্তিমান্ (মরুৎগণ) তিন বৎসর তোমাকে ঘৃত দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, পরে মরুদ্গণ যজ্ঞে প্রয়োগ যোগ্য নাম ধারণ করিলেন" (১।৭২।৩); "যজ্ঞেই দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া রুদ্রের (অর্থাৎ অগ্নির) উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন। মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন" (১।৭২।৪)। "হে অগ্নি! দেবগণ তোমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া উপবিষ্ট

হইলেন এবং পত্নীদিগের সহিত জানুপাতিয়া সম্মুখস্থ অগ্নির পূজা করিলেন'' (১।৭২।৫); "হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! যজ্ঞেই সমস্ত দেবগণ তোমার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া তোমার উপর হব্যস্থাপন করিয়াছেন" (১।৭৩।৭)।

সব্যঋষি ইন্দ্রকে একমাত্র স্তুতিযোগ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অন্য কাহারও স্তুতি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী পরাশর ঋষি অগ্নিকে নিজে সমস্ত স্তুতি প্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। অগ্নিকে সমস্ত দেবগণের প্রধান করিয়া তুলিলেন এবং দেবগণের পূজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সব্য ঋষি ইন্দ্রকে সকল দেবগণের মধ্যে প্রধান দেবরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাশর অগ্নিকে সকল দেবগণের দেব, ইন্দ্রেরও পূজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

সব্যঋষি ইন্দ্রকে যেরূপ ব্যাপকের ব্যাপক, অনন্ত অসীম মহাত্মা, অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্তশক্তিশালী ও স্বর্গের পালক বলিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন; পরাশরও তদ্রূপ স্বীয় উপাস্য দেবকে অনন্ত অসীম ও অন্যান্য প্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়াছেন।

পরাশরের উপাস্য সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অরণিপ্রসূত পরিমিত অগ্নি নহে। তিনি "জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য, যিনি সমস্ত দেবকার্য্য ও মনুষ্যের জন্মরূপ কর্ম্ম বিষয় অবগত থাকিয়া সকল কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন" (১।৭০।১)। "অগ্নি জলের মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন" (১।৭০।২)। "তুমি আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিয়াছ এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করিতেছ" (১।৭৩।৮)। তিনি "বিশ্বায়ুঃ" অর্থাৎ বিশ্বের প্রাণস্বরূপ (১।৬৭।৩; ১।৬৮।৩; ১।৭৩।৪)। তিনি "প্রকৃতির আত্মাস্বরূপ ও পরিবর্ত্তন রহিত; আত্মার ন্যায় সুখকর" (১।৭৩।২); "তিনি যথার্থদর্শী, জ্ঞানী ও নিত্য" (১।৭২।১)।

তিনি "পতিসেবিতা ও অনিন্দনীয়া নারীর ন্যায় পবিত্র'' (১।৭৩।২); তিনি "মেধাবী, দর্পরহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানযুক্ত" (১।৬৯।২)। "জনপদে লোকহিতকর পুরুষের ন্যায় * * প্রীতি দান করেন'' (১।৬৯।২)। "প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কার্য্য করেন, অমর অগ্নিও তদ্রূপ আমাদের হিতকর কার্য্য করেন'' (১।৭০।২)।

পরাশরের চিন্তাশক্তি যে সব্য ঋষির চিন্তাশক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিকশিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। প্রকৃতির অন্তরালস্থ পুরুষের অসীম শক্তির পরিচয় কেবল মাত্র মেঘ, ধ্বনি ও বজ্রাঘাতে অবলোকন করিলে মনের যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইবার সম্ভব; আকাশের নক্ষত্ররাজিতে, অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে, অরণ্যানীর ভীষণ দাবানলে, অমানিশার পথপ্রদর্শক প্রদীপে, পক্ক অন্নের উৎপাদক অগ্নিতে, প্রাণিগণের জঠরানলে সেই অনন্ত বিচিত্র শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইলে চিন্তা শক্তির যে অধিকতর উন্মেষ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিকাশ যত বিবিধ ও বিচিত্র বলিয়া অনুভূত হইবে, শক্তির মহিমা ততই অধিকতর পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরাশরের যে কেবল চিন্তাশক্তিই অধিকতর উন্মেষিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও অধিকতর নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়াছিল। নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ তিনিই বপন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকবার ধর্ম্মের জন্য ও সুখের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভক্তির পবিত্র উচ্ছ্বাসের এক

বিমল মুহূর্ত্তে তিনিই বলিয়াছেন, যাঁহারা "বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করতঃ অগ্নিকে ধারণা করেন ও অগ্নি সেবায় রত থাকেন, তাঁহারা * * দেব ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করতঃ অগ্নির অভিমুখে গমন করেন" (১।৭১।৩)। ইহা অপেক্ষা ভক্তির মহোত্তর উচ্ছ্বাস আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

২। প্রার্থনার বিষয় স্বর্গ ও পাপবোধ

ক। ইন্দ্র-উপাসকদিগের।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে আর্য্যগণ সর্ব্বদা আহার-সংগ্রহে ব্যস্ত ও শত্রুভয়ে ত্রস্ত ছিলেন। সুতরাং অন্য বিষয়ে তাঁহাদিগের চিন্তা বিশেষ ব্যাপৃত দেখা যায় না। মধুচ্ছন্দা পুনঃ পুনঃ বল, ধন, রক্ষা, শত্রুসংহার, স্ত্রী, পুত্র, বৃষ্টি ও গাভী ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সমস্ত অথবা এতদ্রূপ বিষয়েই তাঁহার প্রার্থনা পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জেতৃ ঋষির স্তোত্রেও আমরা এতদপেক্ষা উচ্চতর কিছুই প্রাপ্ত হই না। সব্য ঋষি ইন্দ্রকেই দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকর্ত্তা বলিয়াছেন (২।৫২।১৩)।

খ। অগ্নি-উপাসকদিগের।

মেধাতিথি প্রার্থনা করিয়াছেন "হে ব্রহ্মণস্পতি! পাপ হইতে রক্ষা কর" (১।১৮।৫)। বৃহস্পতি এবং ব্রহ্মণস্পতি বেদের অনেকস্থলে অগ্নিদেবের রূপান্তর মাত্র। "আমাতে যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে, আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আমি যে শাপ দিয়াছি, আমি যে অসত্য কহিয়াছি, হে! জল সে সমস্ত ধৌত কর" (১।২৩।২২)।

ইনি স্বর্গ লোকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তথায় কর্ম্মফল জানা যায়, অর্থাৎ ভোগ হয় (১।২১।৬) এবং দেবতারা স্বর্গবাসী (১।২২।২)। কণ্ব ঋষি বলিয়াছেন, "নিঃঋতি অতিশয় বলবতী, তাহাকে বিনাশ করা যায় না। যেন সেই নিঃঋতি আমাদিগকে না বধ করে; যেন সে আমাদিগের তৃষ্ণার সহিত বিলুপ্ত হয়" (১।৩৮।৬)। বরুণাদি দেবগণ "পাপ সমূহ অপনয়ন করেন" (১।৪১।৩)" "হে পূষা (সূর্য্য)! (বিঘ্ন হেতু) পাপ বিনাশ কর" (১।৪২।১)।

প্রস্কণ্ব ঋষি সুনৃত বাক্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন (১।৪৮।২)।

পরাশর অগ্নিকেই "পবিত্র" ও "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানযুক্ত" বলিয়াছেন। বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করতঃ অগ্নিকে ধ্যান করা ও তাঁহার সেবা করাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং তাঁহার অভিমুখে গমন করাই অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমাদের চরম উদ্দেশ্য।

গ। বরুণ-উপাসকের।

শুনঃশেফ ঋষির অবস্থা স্বতন্ত্র। তিনি ইন্দ্রকে এক জন প্রধান স্তুত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি যেরূপ ঘোর বিপদাপন্ন হইয়া স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দেবতাকেই ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি পাশ দ্বারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণের স্তুতি করেন, সুতরাং কোন দেবগণকেই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। "দেবগণের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন, যে, আমি পিতা মাতাকে দর্শন করিতে পারি?" (১।২৪।১)। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণের প্রবল ধারণা এই ছিল যে, তাহার পাপের দণ্ডস্বরূপ এই শাস্তি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বরুণকে বারংবার আহ্বান করিয়াছেন।

বৈদিক আর্য্যগণ কর্ম্ম ও পুণ্যের পথকে বরুণের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বরুণ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন দেবতা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আর্য্যগণ, ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই, বরুণকে পূজা করিতেন। যাহা হউক, পুণ্যপথকে যে বরুণের পথ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। শুনঃশেফের স্তোত্র হইতেই আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যে "বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ" "সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তার করিয়াছেন" (১।২৪।৮), "জল ও বায়ুর গতি যাহার বেগ (পথ) অতিক্রম করিতে পারে না" (১।২৪।৭); যাহার "আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়" (১।২৪।১০); "যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন" (১।২৫।৭); যিনি "স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন" (১।২৫।৮); "যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন; উপরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগেরও জানেন" (১।২৫।৯); তিনি অবশ্যই মানবের পথও জানেন। যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যাবতীয় পদার্থের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ঋত (পথ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াই তাঁহার "ব্রতখণ্ডন করিয়াই" বিপদে পতিত হই এবং সংসার মধ্যে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করি। শুনঃশেফ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, আমরা সামান্য মানব, তোমার পথ হইতে বিচ্যুত হইবারই কথা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর, ক্রোধ করিও না। "যেমন লোকে ভ্রমে পতিত হয়, সেইরূপ আমরাও দিনে দিনে তোমার ব্রত সাধনে ভ্রম করিয়া থাকি। হে বরুণ! অনাদর করিয়া, হননকারী হইয়া তুমি আমাদিগকে বধ করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের উপর ক্রোধ করিও না" (১।২৫।১; ১।২৫।২)। আমি কাষ্ঠের সহিত তিন পাশ দ্বারা বদ্ধ আছি, "আমার পাশ খুলিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতি পুত্র! আমরা তোমার ব্রতখণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব" (১।২৪।১৫)। "তুমি নিঃঋতিকে (পাপদেবতাকে) পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে রাখ, আমাদের কৃত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর" (১।২৪।৯)।

শুনঃশেফের স্তোত্র সমূহ হইতে আমরা অবগত হই যে, ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পথ বরুণদেব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। নিঋর্তি আমাদিগকে পাপ পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। আমরা পাপ করিলে তজ্জন্য কষ্ট পাই, এমন কি ইহ সংসারেও বিপদে পতিত হই।

শুনঃশেফের স্তোত্র সম্বন্ধে কয়েক বিষয় বিবেচনা করা উচিত। উপরে শুনঃশেফকে ইন্দ্রের উপাসকরূপে গ্রহণ করা না হউক, ইন্দ্রের পূজা প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি বিশেষ সহায়কারী ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সে কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু শুনঃশেফ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত স্তোত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উক্ত বিষয় সমূহের উল্লেখ নাই। সে সমস্তই বরুণের স্তোত্র মধ্যে পাওয়া যায়। বাস্তবিক যদিও শুনঃশেফকে সমস্ত স্তোত্রের ঋষি বলা হইয়াছে, সকল স্তোত্র একজন ঋষিদ্বারা রচিত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথমে শুনঃশেফ নিজে প্রার্থনা করিতেছেন, শেষে অন্য কেহ শুনঃশেফের বিপদ বর্ণনা করিয়া যে দেব তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার যজ্ঞের

স্তোত্র বলিতেছেন (১।২৪।১৩)। শুনঃশেফ স্বয়ং বোধ হয় অগ্নিরই ভক্তছিলেন; কারণ প্রথম স্তোত্রে "কোন্ দেবের চারুনাম উচ্চারণ করিব?" বলিয়া দ্বিতীয় স্তোত্রে বলিতেছেন "দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারুনাম উচ্চারণ করি"(১।২৪।২) এবং অগ্নির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "নিত্য ও বিস্তীর্ণ হব্যদ্বারা অন্যান্য দেবকে আমরা যে যজ্ঞ করি,সে হব্য তোমাকেই প্রদত্ত হয়"(১।২৬।৬)। অতএব যদি কেহ শুনঃশেফকে অগ্নির উপাসক বলিয়া ধরেন, তাহাতেও বিশেষ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূল মত তাহাতে কিছুমাত্র দূষিত হইবে না। কেননা,এস্থলে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, যিনি অন্য দেবগণ ছাড়িয়া এক দেবের উপাসনায় নিমগ্ন না হইয়াছেন,তাঁহার স্তোত্রে আমরা চিন্তার গভীরতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই না। শুনঃশেফের স্তোত্র সমূহে চিন্তার গভীরতা কিছুই লক্ষিত হয় না। মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমাজের প্রচলিত মতের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র, "রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাদিগকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেফ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছিলেন,সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি দান করুন" (১।২৪।২২)। পাপ করিয়া বিপদে পড়িয়াছেন, মানসিক প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতি অনুসারে, প্রচলিত মতের উপর নির্ভর করিয়া, বরুণকেই আহ্বান করিতেছেন, "বরুণ বহুলোকের দ্বারা দৃষ্ট; গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায়, আমার চিন্তা নিবৃত্তি রহিত হইয়া তাঁহার দিকে যাইতেছে" (১।২৫।১৬)।

অতএব মন্তব্য এই যে, (১) শুনঃশেফশীর্ষক স্তোত্রগুলি এক ঋষির রচিত বলিয়া বোধ হয় না; (অন্যান্য অনেক ঋষি সম্বন্ধেও এই বক্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে); (২) তাঁহাকে ইন্দ্রের উপাসক,কিম্বা অগ্নির উপাসক কিম্বা বরুণের উপাসক বলিয়া গ্রহণ করা যায়; (৩) ইন্দ্রের নিন্দুকগণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে উপরে ইন্দ্রের পূজা প্রতিষ্ঠার সহায়কারীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; (৪) শুনঃশেফ শীর্ষক বরুণের স্তোত্র সমূহে পাপের অনুশোচনা, পাপের শাস্তি, ও পুণ্যপথের নির্দ্ধারক বরুণের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া তিনি এস্থলে বরুণোপাসক বলিয়া গৃহীত হইলেন।

সব্য ও পরাশর সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে,তাঁহারা যথাক্রমে ইন্দ্র ও অগ্নিকেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,তিনিই নিয়ন্তা,একথা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সোণা ও রূপা।

সোণার দর বাড়িতেছে। রূপার দর কমিতেছে। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে এক ভরি সোণা ক্রয় করিতে হইলে ১৬৲ টাকা লাগিত; এখন এক ভরি সোণা কিনিতে ৩০৲ লাগে। ১৮৭৩ সালের পূর্ব্বে অনেক বৎসর সোণার বাজার এক রকমই ছিল,এক ভরি সোণা ১৬৲ টাকাতেই পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতে সোণার দর মোটের উপর ক্রমেই

বাড়িতেছে। সুন্দরীদিগের গহনা পরার ক্রমেই অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু ধরুন, আপনি ও আমি নিতান্ত গরিব; সোণার গহনা দূরে থাকুক, রূপার গহনাও গৃহিণীকে দিতে পারি না। তাহা হইলে, সোণার দর বৃদ্ধি হওয়াতে আপনার আমার ক্ষতি কি? গরিব কৃষাণ, গরিব ভাই ভগ্নীর তাহাতে ক্ষতি কি? সোণার দর বাড়ে, বাড়ুক, তাহাতে দেশের গরিব লোকদিগের ক্ষতি বা লাভ কি? না, সোণার দর বৃদ্ধি হওয়াতে আমাদিগের দেশের গরিব লোকদিগের ক্ষতি আছে। কি প্রকারে ক্ষতি হইতেছে, তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ সোণার দর কেন ১৮৭৩ সালে সহসা বাড়িয়া যাইল, তাহা বলিতেছি।

১৮৭৩ সালের পূর্ব্বে ইউরোপের কতকগুলি দেশে, সোণা ও রূপা দুই রকম টাকারই চলন ছিল, দুই ধাতুই চলিত। পরে, ঐ সকল দেশে রূপার টাকা আর চলিবে না, এই আইন হইল। রূপা বেচারির অকারণ নিগ্রহ হইল। তখন পৃথিবী যেন দুইভাগে বিভক্ত হইল। (১) একভাগে কেবল সোণার টাকা চলিতে লাগিল। এই সকল দেশকে আমরা "স্বর্ণ-চলিত দেশ" বলিব। (২) অপরভাগে কেবল রৌপ্যের টাকা চলিতে লাগিল। এই সকল দেশকে আমরা "রৌপ্য-চলিত দেশ" বলিব। এখন, "স্বর্ণ-চলিত দেশ" গুলি একদিকে তাহাদিগের নিষ্প্রয়োজন রূপা "রৌপ্য-চলিত দেশ" সকলের নিকট বিক্রয় জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং অন্যদিকে স্বর্ণ ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সুতরাং ইউরোপে "স্বর্ণ-চলিত দেশ"গুলির বাজারে রূপার আয়োজন বা আমদানি অধিক, প্রয়োজন বা কাটতি কম হইল। এবং সোণার প্রয়োজন অধিক, আয়োজন বা আমদানি কম হইল। যখন কোনও দ্রব্যের আমদানি অধিক হয়, কাটতি কম হয়, তখন তাহার মূল্য কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহা সস্তা হয়। সুতরাং রূপার মূল্য কমিয়া যাইল। আবার, যখন কোন দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক হয়, এবং প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন কম থাকে, তখন তাহার মূল্য বাড়িয়া যায়। সুতরাং সোণার মূল্য বাড়িয়া যাইল। অথবা যদি টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, অথচ অন্য দ্রব্যের পরিমাণ সমান থাকে, তাহা হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ দ্রব্যের দর কমিয়া যায়। ধরুন, কোনও দেশে দুই ক্রোর টাকা চলিতেছে। কোন কারণ বশতঃ এক ক্রোর অর্থাৎ অর্দ্ধেক টাকা কমিয়া যাইল। ইহাতে ঐদেশে সকল দ্রব্যের দর পূর্ব্বের অপেক্ষা অর্দ্ধেক হইবার সম্ভাবনা। কেননা, পূর্ব্বে মোট দ্রব্যের বিনিময় দুই ক্রোর টাকাতে হইতেছিল, এখন তাহার বিনিময় এক ক্রোর টাকাতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক টাকার বিনিময়ে এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা দ্বিগুণ দ্রব্য পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ মুদ্রার দর বাড়িল, দ্রব্যের মূল্য কমিল। ইউরোপে "স্বর্ণ-চলিত দেশে" এখন ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। সমুদয় ইউরোপ ধরিলে ক্রয় বিক্রয়ের অর্দ্ধেক কাজ স্বর্ণমুদ্রায় চলিত, অপরার্দ্ধ রৌপ্য মুদ্রায় চলিত। রৌপ্য মুদ্রা বাদ দেওয়া হইল। থাকিল স্বর্ণমুদ্রা। অর্দ্ধেক মুদ্রা কমিয়া যাইল। ইউরোপে যে অর্দ্ধেক মুদ্রা থাকিল, তাহার অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার দর বাড়িয়া যাইল, অথবা একই কথা, দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইল। তবে নানা কারণ বশতঃ মূল্য ঠিক অর্দ্ধেক হইল না।

অন্যদিকে, রূপার দর কমিয়া যাইল। এমনকি, ১৮৭৩ সাল হইতে রূপার দর কমিতে

কমিতে এখন রূপার দর পূর্ব্বের দরের প্রায় অর্দ্ধেক হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকলেই জানেন, ২৩ বৎসর পূর্ব্বে একভরি সোণা ১৬৲ টাকাতে পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য প্রায় ৩০৲। হয়ত শীঘ্রই ৩২৲ টাকা হইবে। রূপার দর কমিয়াছে, তাহার অর্থ সোণার তুলনায় কমিয়াছে। অন্য দ্রব্যের তুলনায় রূপার দর বড় কমে নাই। পূর্ব্বে ১৬৲ টাকায় একভরি সোণা পাওয়া যাইত। এখন ৩০৲ টাকায় একভরি সোণা পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে ১৬৲ টাকায় ৪ মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখনও ১৬৲ টাকায় প্রায় ৪ মণ চাউল পাওয়া যায়। একটী রৌপ্য মুদ্রায় চীন বা জাপানে ২৩ বৎসর পূর্ব্বে যত সের চাউল পাওয়া যাইত, এখনও তত সের চাউল পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ দুই দেশে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু শস্যের এবং মজুরির দর কিছু বাড়িয়াছে। শস্যের মূল্য দুই কারণে বাড়িতে পারে। (১) শস্যের পরিমাণের ন্যূনতা অর্থাৎ আয়োজন অপেক্ষা প্রয়োজনের আধিক্য। (২) টাকার সংখ্যার বৃদ্ধি। ভারতবর্ষে এই দুই হেতুতেই শস্যের মূল্য বাড়িয়াছে। (১) ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ২০ বিশ ক্রোর টাকার ধান ও গমের রপ্তানি হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া বিদেশে চালান হইয়াছে বিশ ক্রোর টাকার শস্য, এক বৎসরে চালান যদি এই শস্যের মূল্য ফি মণ চারি টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে ৫ ক্রোর মণ শস্য এক বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে একমাসে প্রতি ব্যক্তির আহার যদি আধমণ ধরা যায়, তাহা হইলে ৫ক্রোর মণে ২॥০ক্রোর লোক এক মাস খাইতে পারে, অথবা প্রায় বিশ লক্ষ লোক ১ বৎসর খাইতে পারে। কি দুঃখের বিষয়! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারত হইতে বিশ লক্ষ লোকের এক বৎসরের খোরাক প্রতি বৎসর বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহার উপর এখন স্বর্ণমুদ্রার মূল্য অধিক। পূর্ব্বে একটী মোহরে ১৬৲ টাকা পাওয়া যাইত, এখন একটী মোহরে প্রায় ৩২৲ পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বে ১৬৲ টাকায় যদি ৪৲ মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন একটী মোহরে ৩২৲ টাকা বা ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইবে। সুতরাং স্বর্ণ-চলিত ইংলণ্ড দেশের পক্ষে বেশ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৭৩ সালে যে স্বর্ণমুদ্রায় ইংলণ্ড যে পরিমাণে শস্য পাইতেন, এখন তাহার অর্দ্ধেক মূল্যের স্বর্ণমুদ্রায় সেই পরিমাণ শস্য পাইতেছেন। যে পরিমাণে সোণার বিনিময়ে রূপা অধিক পাওয়া যাইতেছে, সেই পরিমাণে সোণার বিনিময়ে ভারতের শস্য অধিক পাওয়া যাইতেছে। এবং সস্তা দরে ইংলণ্ডও ভারতের শস্য এখন অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন বিলাতে ভারতবর্ষের শস্যের অধিক টান ধরিয়াছে। সেই কারণে ভারতের শস্যের মূল্যও বাড়িতেছে। (২) পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশে টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি হইলে, শস্যের দর বাড়িবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৮৯ সাল হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে প্রায় ৬৪ ক্রোর টাকা মূল্যের রূপা আমদানি হইয়াছে। কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসরে প্রায় ৮ ক্রোর টাকা মূল্যের রূপার রপ্তানি হইয়াছে। ৬৪ ক্রোর হইতে ৮ ক্রোর টাকা বাদ দিলে, ৫৬ ক্রোর থাকে। সুতরাং ঐ পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে মোটের উপর ৫৬ ক্রোর টাকা মূল্যের রূপার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই রূপার মধ্যে অতি

সামান্য পরিমাণ রূপাতে বাসন ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বাকী রূপাতে টাকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে আন্দাজ ৫০ ক্রোর টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে * শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়। সুতরাং ভারতে শস্যের দর বাড়িয়াছে। এখন দেখিলাম, দুই কারণে ভারতবর্ষে শস্যের দর বাড়িয়াছে। (১) সোণার দর বাড়াতে বিলাতে ভারতীয় শস্যের অধিক টান। (২)ভারতে রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি।

শস্যের দর বাড়িলে, (এবং অন্যান্য দ্রব্যের দর না বাড়িলে) সচরাচর যাহারা শস্য উৎপাদক তাহাদিগের লাভ, যাহারা খাদক তাহাদিগের ক্ষতি। কিন্তু আমাদিগের দেশে শস্যের দর বাড়িলে, শস্য-উৎপাদকদিগের যাহা লাভ হইবার কথা, তাহার অধিকাংশ জমিদারের ও মহাজনের গ্রাসে পতিত হয়। কারণ,কৃষকদিগের নিকট জমিদারের ও মহাজনের প্রায়ই অনেক টাকা পাওনা থাকে। আবার যে দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি হয়, সেই দেশে যদি শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কখন কখন আর এক বিপদ ঘটে। বাজার দর খুব সুবিধা বিবেচনা করিয়া শস্য ব্যাপারীগণ, এমন কি কৃষকগণও, নিজের গোলায় এক বৎসরের মত শস্য না রাখিয়া সমুদায় শস্য বেচিয়া ফেলে। মনে করে, এখন শস্যের দর অধিক, এখন বিক্রয় করি, পরে দর কমিলে আবার ক্রয় করিব। ইহাতে প্রচুর পরিমাণ শস্য রপ্তানি হইয়া দেশের বাহিরে যায়। সুতরাং দেশে শস্যের অনটন হয়। পরে দর কমা দূরে থাকুক, কখন কখন দুর্ভিক্ষ হয়। পারস্য দেশে শস্যের দর একবার খুব বাড়িয়াছিল এবং নির্ব্বোধ পারসিকগণ বিদেশীয় বণিকের নিকট দেশের অধিক শস্য বিক্রয় করিয়াছিল, শেষে, দেশে শস্যের অনটন হইয়া দুর্ভিক্ষ হইল। প্রত্যেকেই নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিল, পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবে নাই বা বুঝে নাই। যে কোন কারণেই হউক, দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি হওয়া, আহারের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া, দেশের লোকের পক্ষে অমঙ্গল। সোণার দর বাড়াতে আমাদিগের দেশের শস্য আরও অধিক বাহির হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সোণার দর বাড়াতে গরিব লোকের ক্ষতি হইতেছে।

কিন্তু স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে আর এক রকমে ভারতবর্ষের অত্যধিক ক্ষতি হইতেছে। ভারতবর্ষ শাসন জন্য বিলাতে যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপলক্ষে ইংলণ্ড প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে প্রায় ১৬ মিলিয়ন পাউণ্ড লয়েন। এই ব্যয়কে (Home charges) বলে। ১৮৭৩ সালে ১০৲টাকা দিলে ১পাউণ্ড হইত। তখন ১৬ ক্রোর টাকা দিলে ১৬ মিলিয়ন পাউণ্ড হইত। যখন ১৫ টাকায় ১ পাউণ্ড হইল, তখন ঐ ১৬ মিলিয়ন পাউণ্ডের জন্য ২৪ ক্রোর, অর্থাৎ পূর্ব্বের দেড় গুণ টাকা দিতে হইল। যতই সোণার দর বাড়িতেছে, ভারতবর্ষকে ততই অধিক টাকা দিতে হইতেছে। "Home charges বা বিলাতের ব্যয়ের" পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা সংখ্যায় না বাড়িলেও, রূপার দর যেমন কমিতেছে, "Home charges"জন্য ভারতের ব্যয় বাড়িতেছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে যে অন্যূন ২৪

* ইহার অর্থ যদি শস্য, লোক সংখ্যা, বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতি একরূপ থাকে, অথচ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; তাহা হইলে শস্যের দর বাড়িবে।

কোটি টাকা প্রতি বৎসর সেলামী দিতেছেন, তাহার জন্য ২৪ ক্রোর টাকা পাঠান না; ২৪ ক্রোর টাকার মূল্যের শস্য ইত্যাদি দ্রব্য পাঠান। সুতরাং সোণার দর যত বাড়িবে, Home charges জন্য আমাদিগকে তত অধিক টাকা দিতে হইবে এবং ভারতের শস্য ইত্যাদি ততই অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং সোণার দর বাড়াতে ভারতবাসী সকলেরই ক্ষতি আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

রামপ্রসাদ। (১)

কল্পনা ও লোক-প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রামপ্রসাদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী। তৎপরবর্ত্তী প্রায় সকলেই গড্ডলিকার ন্যায় অসঙ্কোচে তদীয় পন্থানুসরণ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন। অতীতের অন্ধকারে আবৃত ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকারে মতামত প্রকাশ করা বড়ই সহজ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন পর্য্যন্তও এ সহজ সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই অনবধানতা ও কল্পনাপ্রিয়তায় রামপ্রসাদের জীবন ও গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

রামপ্রসাদের সাময়িক কোন ইতিহাসে তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার কোন উপায় নাই। জনশ্রুতিতে যাহা জানা যায়, তাহাতে ভ্রমেরই অধিক সম্ভাবনা। কেননা, রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন; সুতরাং তৎসম্পৃক্ত কথা বহু পরিমাণে রঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, এবং যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিলনা, পরবর্ত্তী লোকের কল্পনা ও আমোদপ্রিয়তা সেই সকল লোকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘটাইয়াছে। এই সকল কারণেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের আশ্রয়দাতা, এবং আজুগোঁসাই বিরোধী কবি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব অমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর না করিয়া আমরা প্রসাদের গ্রন্থ ও গান হইতেই তদীয় জীবনবৃত্ত নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

রামপ্রসাদের নাম বলিলেই রামপ্রসাদী গানের কথা মনে হয়। রামপ্রসাদের দুই একটী গানও জানেন না, বঙ্গে এমন লোক বড় কম। বস্তুতঃ গানেই রামপ্রসাদের কৃতিত্ব। এমন ভক্তির উচ্ছ্বাস, জগজ্জননীর প্রতি এমন অভিমান, এমন নির্ভর ভাব আর কোথাও নাই। সহজ সুরে সহজ কথায় এত ভাব, এত ভক্তি আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে নাই। রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবের মত কৃপাভিখারী—ভজন সাধন জানিনা—এই প্রকার দীনহীন ভক্ত ছিলেন না। তিনি জোর-জুলুমে আইন কানুন দেখাইয়া জগদম্বার চরণে আপনার অধিকার স্থাপন করেন। এবং জোরজুলুমে বুঝাইয়া, শাসাইয়া, কাঁদাইয়া, কাঁদিয়া ফেলেন। এইরূপে গানে রামপ্রসাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সাংসারিক জীবনের বর্ণনা ইহাতে অধিক নাই। ২।৪টী গানে যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের গ্রন্থের মধ্যে কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তনের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। তিনি আরও কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কি-না, জানা যায় নাই। কেহ কেহ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে যতগুলি ভ্রমপূর্ণ কথা প্রচলিত আছে, এইটীই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর মনে করি। কেননা 'বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র গ্রন্থ' এই ভ্রমপূর্ণ মত হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদের সাক্ষাৎ, তৎকর্ত্তৃক কবিরঞ্জন উপাধি ও ১০০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান, কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তোষার্থ রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন, কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরসিদাবাদে গমন, তথায় সিরাজ-উদ্দৌলার সম্মুখে গান করা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর উপন্যাস কল্পিত হইয়াছে (রমগতি ন্যায়রত্ন কৃত বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১১৮ পৃঃ)। দুঃখের বিষয়, যে সকল পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত কল্পনা করিবার কষ্ট সহিয়াছেন, তাঁহারা যদি কালীকীর্ত্তনের অষ্টমঙ্গলাটি (বিদ্যাসুন্দরের শেষভাগে লিখিত) একটু কষ্ট সহিয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আর এই ভ্রমপূর্ণমত প্রচার করিতে হইত না। কিন্তু তাঁহাদের অথবা আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সে পথে চলেন নাই।

ভারতচন্দ্রের রচিত বিদ্যাসুন্দর যেমন কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, অষ্টমঙ্গলাত্মক অন্নদামঙ্গলের এক মঙ্গল বা পালা, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তেমনি তদীয় কালীকীর্ত্তনের এক মঙ্গল বা পালা। যাঁহারা অন্নদামঙ্গল ও কালীকীর্ত্তনের অষ্টমঙ্গলা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর এ কথায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। রামপ্রসাদ এইরূপে অষ্টমঙ্গলা লিখিয়াছেন—

১। নমো বিশ্বভাবিনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ ঘরে।
২। কার্ত্তিকেয় জন্মহেতু, ভস্মরাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥
৩। দুরন্ত মহিষাসুর, তারদর্প কৈল চুর,
লীলায় হইলা দশভুজা।
৪। মহিষ মর্দ্দিনী নাম, সেতুবন্ধে প্রভুরাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥
৫। শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব, সম্মুখ সমরে খর্ব্ব,
শক্তি লাভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্ম জরা মৃত্যু হরা,
তব তত্ব না জানেন বিধি॥
৬। বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে,
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া।
শেষ জন্মে কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদ সরসিজ ছায়া॥
৭। নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পুজে নিত্য নিত্য,
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,
কৃপাময়ী অগতির গতি॥
৮। মালাধর হারাবতী, শাপে জন্মে বসুমতী,
ব্রত কথা জগতে প্রচার॥
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥

এই মালাধর ও হারাবতীই সুন্দর ও বিদ্যা। কবি রামপ্রসাদ দাসের লিখিত এই অষ্টমঙ্গলা হইতে তদীয় কালীকীর্ত্তনে যে আটটী বিষয় লিখিত হইয়াছিল, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহাতে দেখা যায় যে, কালীকীর্ত্তনের ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম মঙ্গল অন্নদামঙ্গলেও কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য মঙ্গল গুলির সহিত অন্নদামঙ্গল ও কালীকীর্ত্তনের মিল নাই। কিন্তু উভয়েরই নির্ম্মাণের কারণ ও প্রণালী একরূপ। যেমন অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গীত রচনা করেন, সেইরূপ কালিকা-মাহাত্ম্য প্রচার জন্য রাজকিশোরাদেশে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দাস কালীকীর্ত্তন বা কালিকা-মঙ্গল গীত রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল যেরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নদা

পূজা উপলক্ষে রচিত হইয়া গীত হইয়াছিল, কালীকীর্ত্তনও সেইরূপ রাজকিশোরের বাটীতে রাজরাজেশ্বরী পূজা উপলক্ষে রচিত হইয়া গীত হইয়াছিল। কালীকীর্ত্তন ও অন্নদামঙ্গল উভয়েই গান। তৎকালে সংস্কৃত ভিন্ন দেশ-প্রচলিত ভাষায় কেহ কাব্য রচনা করিত না। দেশজ ভাষায় যাঁহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেবাদেশ বা প্রভুর আদেশ, এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দেখাইয়া গীত রচনা করিয়াছেন। এইরূপেই চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কণচণ্ডী) অন্নদামঙ্গল,রামমঙ্গল, মনসামঙ্গল কালিকামঙ্গল বা কালীকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। চামর মন্দিরা সহযোগে এই সকল মঙ্গল অদ্যাপি গীত হইতে দেখা যায়। কালীকীর্ত্তনের অষ্টমঙ্গলায় যে আট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে, আমরা সেই অষ্টমঙ্গলাত্মক কালীকীর্ত্তন পাই নাই, প্রথম ও দ্বিতীয় মঙ্গলের কিয়দংশ ও অষ্টম মঙ্গলটী পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতেই রামপ্রসাদের বিষয় অনেক জানিতে পারা যায়। শিবকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই একটী গান ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় না। অতএব তাহা-হইতে কিছু আশা করা যায় না।

বাসস্থান।

কি কালীকীর্ত্তন, কি গান, কোথায়ও রামপ্রসাদ আপনার বাস স্থানের কথা বলেন নাই। ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরাম যেরূপে আপনার নিবাসাদির অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দাস সেরূপ পরিচয় দেন নাই। বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানে একস্থলে তিনি আপনার সিদ্ধির বিষয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপিঠ রামকৃষ্ণ ধাম।
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা,
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা,
ক্ষীণপুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা।
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা।

ইহাতে তাঁহার বাসস্থানের কথা কিছু বুঝা যায় না। কেবল তিনি যে কুমারহট্ট গ্রামে রামকৃষ্ণের বাটীতে মণ্ডপ ঘরে রাত্রিকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র জানা যায়। এক ব্যক্তি কোন স্থানে সিদ্ধ হইলে পরবর্ত্তী শক্তি-উপাসকগণ সেই স্থানে যাইয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে নাকি সত্বর ফল লাভ হয়। রামপ্রসাদও সেই কারণেই সিদ্ধপিঠ রামকৃষ্ণ ধামের শ্রীমণ্ডপে সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন—

'ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।'

এই একচরণ উদ্ধার করিয়া রামপ্রসাদের নিবাস কুমারহট্টে ছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অপর চরণগুলি লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিলে, বোধ হয়, পণ্ডিত ন্যায়রত্ন এই অদ্ভুত মত প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। কালীকীর্ত্তনের ভণিতা গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, রামপ্রসাদ স্বয়ং আপনাকে একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কেবল এ জন্মে নহে, জন্মে জন্মেই যে তিনি সিদ্ধ, এ কথাও আপনিই বলিয়াছেন। লোকের নিকট সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবারও তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল।

বিদ্যাসুন্দরের 'শব-সাধনা' পাঠ করিলেই তাহা প্রতীত হয়। এই জন্যই তিনি কোথায় কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন,

তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারহট্ট রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্র, বাসভূমি নহে। রামপ্রসাদ কোন স্থলেই স্বীয় আবাস স্থানের নির্দ্দেশ করেন নাই, এই জন্য তাঁহার বাসস্থান কোন্ স্থানে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপিঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥"

এই স্থলে যে রামকৃষ্ণ নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এই রামকৃষ্ণ কে, জানিতে পারিলে রামপ্রসাদের সম্বন্ধে অনেক কথার মীমাংসা হইতে পারিত। রামপ্রসাদ আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেই যে সিদ্ধ ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ বংশাবলীতে রামকৃষ্ণ বলিয়া কাহারও নাম নাই; থাকিলে কুমারহট্টই যে রামপ্রসাদের জন্মভূমি, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা না থাকায় আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে উপেক্ষা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

রামপ্রসাদ একটী গানে আপনার বাল্য অবস্থার কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, রামপ্রসাদ বাল্যেই পিতৃহীন হন। তাঁহাকে অসহায় দেখিয়া তদীয় পৈতৃক রাজ্য অন্যে কাড়িয়া নেয়। এমন কি, তিনি বাস্তভিটা হইতেও তাড়িত হন। এই দুঃসময়ে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও বেশী কিছু সাহায্য মিলে নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, শেষে এই বিপদের সময়ে কলিকাতায় স্বীয় ভগিনীপতির আশ্রয় পাইয়া গৃহ-সম্পত্তি-বিহীন রামপ্রসাদ গৃহস্থ হইয়াছিলেন। পৈতৃক-বাসভূমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ হওয়াতেই বোধ হয় রামপ্রসাদ জন্মভূমির কথা বলেন নাই।

রামপ্রসাদ, স্বীয় ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার নিকটেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এমন উপকারী আশ্রয়দাতা বান্ধবের সান্নিধ্য ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করা নিঃসহায় নিরবলম্ব রামপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কলিকাতাতেই রামপ্রসাদের বাসভূমি ছিল, বলা যাইতে পারে।

জাতি।

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে আপনাকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

১। ভব কমলজ শুক　　নারদ মুনিবর যো মাই,
ধ্যান অগোচর মানি,
দাস প্রসাদ বলে　সেই ব্রহ্মময়ী
জগজন মন বিকচ করতহি ভাবি॥

২। কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাবে জননী
মা কত কাচ গো কাচ
তুমি মাতা মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা
মহেশ ঘরে আছ।

৩। কষিত কনক বিমল কান্তি,
মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন সুখ,
কল্মষ নিকর ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস,
সতত কাতর করুণা ভাষ,
বারয় রবিতনয় শঙ্কা
মদন-মথন-অঙ্গনা।

৪। শ্রীরাম প্রসাদ দাসে
একথা শুনিয়া হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।

৫। রামপ্রসাদ দাসে,
প্রেমানন্দে ভাসে।

৬। ভণে রামপ্রসাদ দাস,
মার এই এক ধ্যান।
ইত্যাদি।

যে স্থলে রামপ্রসাদ, দাস বলিয়া পরিচয় দেন নাই, সে স্থলেও তিনি কেবল রামপ্রসাদ, কিম্বা প্রসাদ, অথবা কবিরঞ্জন, কি কবি বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। কুত্রাপি তিনি সেন বলিয়া পরিচয় দেন নাই। গানের ভণিতা গুলিতে প্রসাদ ও রামপ্রসাদ শব্দই অধিক। পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম উল্লেখের সময়েও, রামপ্রসাদ, সেন বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেন নাই। তথাপি ন্যায়রত্ন-প্রমুখ পণ্ডিতেরা কেন যে রামপ্রসাদকে বৈদ্যজাতীয় সেন উপাধিধারী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে কল্পনা, প্রসাদকে কুমারহট্টনিবাসী এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ১০০/ বিঘা নিষ্কর ভূমিভোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, বৈদ্যজাতীয় সেন উপাধিধারী বলিয়া বর্ণনা করাও সেই কল্পনারই কার্য্য, সন্দেহ নাই।

যতদুর জানা যায়, তাহাতে সে কালের বৈদ্যজাতীয় মহাশয়গণ আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়াই পরিচিত করিতেন। কৃষ্ণদাস, বিশ্বনাথ ইঁহারা কবিরাজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। দাস উপাধি, সে কালে কেন, একালেও কায়স্থগণই অধিক ব্যবহার করেন। অন্য উপাধি থাকিলেও কায়স্থগণ সেই উপাধির পর দাস শব্দ ব্যবহার করেন। ঘোষ দাস, বসু দাস না বলিয়া কেবল ঘোষ বসু বলিলে কায়স্থের কোন ক্রিয়া হয় না। কায়স্থগণের ন্যায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবেরা। দাস্য ভাব সাধন করিতে যাইয়া তাঁহারা বাহিরেও দাসত্ব চাহেন। পরিচ্ছদে, আহারে, ব্যবহারে, নামে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব কৃপাভিখারী দাস। রামপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন, ঘোর শাক্ত। এই জন্যই তাঁহার দাস উপাধি দর্শনে আমরা তাঁহাকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া নিশ্চয় করি। বিশেষতঃ সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থই বঙ্গ ভাষার যাহা কিছু অনুশীলন করিয়াছেন। এক কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১) ব্যতীত বৈদ্যদিগের মধ্যে আর কাহাকেও এ পথে বড় দেখা যায় নাই। তদানীন্তন বৈদ্যগণ সকলেই চিকিৎসা ব্যবসায়াবলম্বী কবিরাজোপাধি ভূষিত ছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন, সেন প্রভৃতি উপাধি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। চিকিৎসা ব্যতীত তৎকালে তাঁহারা অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী কবিরাজ রূপেই দেখিতে পাইতাম—গীত-রচক, গ্রন্থপ্রণেতা, জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞরূপে দেখিতে পাইতাম না।

রামপ্রসাদ একটী গীতে লিখিয়াছেন—"শিশুকালে পিতা মলো রাজ্য নিল পরে।" এই গীতাংশ দ্বারা তাঁহার পিতা পিতামহদিগকে জমিদার বলিয়া বোধ হয়। সেকালে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈদ্যের জমিদারীর কথা কোন পুথিতে, পুস্তকে বা লোকমুখে শুনা যায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা নিশ্চিত। রামপ্রসাদের ভগিনীপতিও দাস উপাধিধারী (২)। সেনের নাম গন্ধ কোথায়ও নাই। তথাপি বঙ্গের

(১) কবিরাজ গোস্বামীও বোধ হয় বৈষ্ণব হইয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গ ভাষার চর্চ্চায় আসিয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যের শীতল ছায়ায় তাঁহার চিত্তে ত্রিদোষ চিন্তা আর ভাল লাগে নাই।

(২) অধুনা বৈদ্যদিগের মধ্যেও দাস উপাধি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা শুধু দাস লিখেন না, দাস গুপ্ত লিখেন। আবার দাস সকলে এক গোত্র। সুতরাং রামপ্রসাদ দাস বৈদ্য হইলে লক্ষ্মীকান্ত দাস তাঁহার ভগিনীপতি হইতে পারিতেন না।

কৃতবিদ্যদিগের লেখনীর কৃপায় দাস রামপ্রসাদ, সেন রামপ্রসাদ হইয়াছেন! কায়স্থ বৈদ্য হইয়াছেন!"

এস্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক। রামপ্রসাদের বিরোধী কবি বলিয়া কীর্ত্তিত আজু গোঁসাইয়ের একটী গানের—"ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি" এই চরণে সেন শব্দ দেখা যায়। কিন্তু এই একমাত্র সেন শব্দ দেখিয়া রামপ্রসাদ সেন মনে করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ আজু গোঁসাইয়ের সহিত রামপ্রসাদের সঙ্গীত-সমর বিষয়ক গল্প কেবল গল্প বলিয়াই মনে হয়। উহার কোন মূল আছে, এমন বোধ হয় না। যাঁহারা এই সঙ্গীত-সমরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মধ্যস্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সাময়িক কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং এ সঙ্গীত-সমর যে কেবলই গল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বের ও পরের অনেক কল্পিত ও প্রকৃত ঘটনা বিক্রমাদিত্যের সময়ে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী ও রসিক ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের অসংস্পৃষ্ট অনেক ঘটনা তৎসময়ে বর্ণিত হইয়াছে। আজু গোঁসাইয়ের সহিত রামপ্রসাদের সত্য সত্যই সঙ্গীত-সমর হইয়া থাকিলে, আজু গোঁসাই যেমন রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া গীত বাঁধিয়াছেন, প্রসাদের কোন সঙ্গীতেও গোঁসাইয়ের প্রতি তেমনি কিছু না কিছু কটাক্ষ থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। আর গোঁসাই কেবলই উত্তর গাহিয়াছেন, কদাপি প্রত্যুত্তরের বা প্রশ্নের পদ রচনা করেন নাই। ইহাতেই বোধ হয়, প্রসাদের গীতের বহুল প্রচার হইলে, কোন বৈষ্ণব কবি কি কবিওয়ালা কয়েকটী বিরোধী গান রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী লোকে সেই কথা কাটাকাটি দেখিয়া উক্ত বৈষ্ণব কবিকে রামপ্রসাদের সমকালীন বলিয়া বর্ণনা করিয়া তৎসম্পর্কে বহু উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষমতাশালী কবির বিরোধী বলিয়া পরিচিত হওয়া এই নূতন নহে। এখনও এরূপ ঘটনা হইতেছে। অল্পদিন হয়, মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের উত্তর ছলে কোন নব্য কবি বীরোত্তর কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালে আমাদের এই নব্য কবিকে মাইকেলের সাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। যদি ইতিহাস না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা হইবে। উক্ত বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। ইনি কোন কবির দলের গীতরচকও হইতে পারেন। ভাষা ও ভাব দেখিলে তাহাই মনে হয়। যখন রামপ্রসাদের গান চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে, শাক্তভক্তগণ মহা আদরে উহা গাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন এই বৈষ্ণব কবি বিরোধী গান রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক রামপ্রসাদ ও আজু গোসাঁইর লড়াই বাধাইয়া তামাসা দেখা পরবর্ত্তী লোকের কল্পিত। অতএব আজুগোসাঁইর গান প্রমাণরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে (১)। এরূপও হইতে পারে যে, যখন রামপ্রসাদ দাস রামপ্রসাদ সেন বলিয়া

(১) প্রসাদের বিরোধী কবির নাম আজু গোসাঁই বলিয়া লিখিত হইল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার নাম আজু গোসাঁই কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যাঁহারা এ সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহারাও ঠিক নাম বলিতে পারেন নাই। কেহ অজয়, কেহ অচ্যুত, কেহ অযোধ্যারাম বলেন।

প্রচারিত হইয়াছেন, তাহার পরে আজু-গোসাঁইর গান রচিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি সেন লিখিয়াছেন।

রাম প্রসাদের কায়স্থত্বের প্রতিকূলে আরও একটী কথা আছে। কোন কোন গানের ভণিতায় 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' থাকাতে রামপ্রসাদকে ব্রাহ্মণ মনে করা যাইতে পারে। তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, রামপ্রসাদ দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ না করিলেও শ্রী, কবি, তারা, মাগো, ওমা, ঐ যে, এইরূপ অসংখ্য শব্দের পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী গায়কগণ দ্বিজশব্দ প্রয়োগ করিয়া লইতে পারেন। অনেক গানে তাহাই হইয়াছে। আর কতকগুলিতে বোধ হয় স্বয়ং রামপ্রসাদই দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, জগজ্জননীর সহিত তাঁহার মাতা পুত্র সম্বন্ধ একবারে পাকা হইয়া গিয়াছে,যখন "ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"এই সাহস জন্মিয়াছে, স্নান সন্ধ্যা শৌচাশৌচ কর্ম্মাকর্ম্ম পাপ পুণ্য সকল বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন যে দাস প্রসাদ আপনাকে দ্বিজ প্রসাদ বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জগজ্জননীর দর্শনগর্ব্বে সাধনক্ষেত্রে সিদ্ধরূপে যাহার পুনর্জ্জন্ম হয়,তিনি দ্বিজ বটেনই ত। সুতরাং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অভিমানী রামপ্রসাদ যে, সে সময়ে আপনাকে দ্বিজ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই দ্বিজশব্দে তাহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়া বুঝাইতেছে না। (১)

প্রসাদপ্রসঙ্গকার ৺ দয়াল চন্দ্র ঘোষ এই দ্বিজ ভণিতা দর্শনে লিখিয়াছেন যে—

"যদিচ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন, আমার এই সংস্কার দূর হইল না। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত সঙ্গীত মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ সকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না,বরং কতক পরিমাণে পদহানি হইতেছে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব অপরের ভাণ্ডারে ন্যস্ত হইতেছে। আবার ইহাও এক প্রকার প্রকৃতিরই গতি। সুতরাং যেমন অনেক হীনপ্রভ কালিদাস খরপ্রভ কালিদাসে লীন হইয়াছেন, যেমন অনেক ভাঁড়, ভাঁড়-চূড়ামণি, গোপাল ভাঁড়ে লীন হইয়াছেন, সেই রূপ এক অল্পপ্রাণ রামপ্রসাদ এক মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে লীন হইয়াছেন।"

প্রসাদপ্রসঙ্গকারের এই উক্তির সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকিলেও, রামপ্রসাদের গানে অন্যের গান মিশিয়াছে, অবিশ্বাস করি না। কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালায় দ্বিজ রামপ্রসাদ প্রভৃতি কথার কোন মূল আছে, মনে করি না।

প্রসাদপ্রসঙ্গকারের পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিজ রামপ্রসাদের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রসাদ-পদাবলি-রচয়িতা নীলুর দলের রামপ্রসাদকে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (প্রসাদ-পদাবলী ১৪ পৃঃ)। কিন্তু তাঁহার এ অনুসন্ধানের পরিশ্রমটা একবারেই বিফল হইয়াছে। নীলুর দলের রামপ্রসাদের গান বাঁধিবার শক্তি মোটেই ছিল না। এই জন্যই নীলমণির মৃত্যুর পর যখন রামপ্রসাদ সেই দলে মিশিয়াছিলেন, তখন বিরোধী দলে এই গান গাহিয়াছিল—

নীলমণি ম'লে মিশল সেই দলে,
ঢুকল শিংভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে।
ঢুকে দলে বাছুর পালে
করে ধিতিন ধিতিন তিন,
তেমনি আজ নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন। *

(১) অনেক নীচ জাতীয় তান্ত্রিককেও সিদ্ধ হইয়া উপবীত ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। সিদ্ধ হইলেই তাহারা উপবীত ধারণের অধিকারী হয় বলিয়া মনেকরে।

* বিশেষতঃ, রামপ্রসাদের সময়ে "একটিন" ইংরাজি শব্দটী গানে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। তখন ইংরাজি অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। স, স।

যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে
বাজেনাকো একটি দিন,
তেমনি ঐ নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন।

দ্বিজ ভণিতা যুক্ত যে সকল গান আছে, তাহা প্রসাদ ভণিতাযুক্ত গান অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং যে সে লোক-কে উহার রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এই সকল কারণে দ্বিজ রামপ্রসাদ ও দাস রামপ্রসাদকে আমরা একই ব্যক্তি মনে করি। কায়স্থ কুলোদ্ভব রামপ্রসাদ দাস সিদ্ধ হইয়া আপনাদে দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "প্রবৃত্তে ভৈরী চক্রে সর্ব্ববর্ণঃ দ্বিজোত্তমঃ" তন্ত্রেও এ বিধান আছে। সুতরাং প্রসাদ যখন সাধনায় বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেন, তখন তন্ত্রমতেই আপ-নাকে দ্বিজ বলিয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষ—বংশাবলী—বাল্যকাল।

রামপ্রসাদ এইরূপে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন—

(১) ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী।
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব গুণযুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া।

(২) শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা।

(৩) শ্রীকবিরঞ্জনে কহে করি পুটাঞ্জলি,
শ্রীরাম দুলাল মাগে দেহ পদধূলি।

(৪) জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া,
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া।

(৬) জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী,
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস,
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম,
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণ ধাম।
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা,
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা।
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা।

এই সকল কবিতা হইতে জানা যায়, রাম প্রসাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস অতুল কীর্ত্তিমান্, দয়াবান, দানশীল, শিষ্ট ও শান্ত ছিলেন। কালিকাদেবী তাঁহার উপর প্রসন্না ছিলেন। কৃত্তিবাসের বংশ আদ্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল। ধনগৌরবে কৃত্তিবাসের বংশ বড়ই প্রসিদ্ধ ছিল। সেই বংশে সর্ব্বগুণশালী বহুব্যক্তি জন্মিবার পর দেবীপুত্র রামেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। রামেশ্বরের পুত্র রামরাম —ইনি মহাকবি ছিলেন। কালিকা ইঁহার উপর সর্ব্বদা সদয়া ছিলেন। এই রামরামই রামপ্রসাদের জনক। রাম রাম দুই বিবাহ করেন; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামে এক পুত্র হয়। দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নামে দুই কন্যা জন্মিবার পর রামপ্রসাদ ও বিশ্ব-নাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। লিখিত কবিতা হইতে রামপ্রসাদের বংশ পত্রিকা এইরূপ লেখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বপুরুষ
কৃত্তিবাস
|
রামেশ্বর
|
রামরাম

(১) নিধিরাম (প্রথম পক্ষে) | (২) দ্বিতীয় পক্ষে পুত্র রামপ্রসাদ | (৩) বিশ্বনাথ | কন্যা অম্বিকা ভবানী

পরমেশ্বরী রামদুলাল, জগদীশ্বরী . জগন্নাথ কৃপারাম

প্রসাদপ্রসঙ্গকার এবং তদনুবর্ত্তী প্রসাদ-পদাবলীকার রামমোহন নামে রামপ্রসাদের আর একটী পুত্র ছিল,এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের মতের পোষকতার জন্য রামমোহনের বংশীয় সেন উপাধিধারী কতিপয় জীবিত ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা রামদুলালের বংশীয় কতিপয় সেন উপাধিধারীর উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। ইঁহারা সংগ্রহকার, সুতরাং সংগ্রহের অপূর্ণতা রাখিয়া আপনাদের অক্ষমতার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন নাই। এইজন্য যেরূপেই হউক, সমস্ত অঙ্গ মিল করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোন মতেই তাঁহাদের এই সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। রামমোহন নামে রামপ্রসাদের কোন পুত্র ছিল না; রামপ্রসাদ দাসের পুত্র রামদুলালের পুত্র পৌত্রাদিরও সেন উপাধি হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। তবে কথা এই, সংগ্রহকার মহাশয়েরা সেন উপাধিধারী যে সকল জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কোন রামপ্রসাদ হইতে পারেন, সেন উপাধিও অবশ্যই তাঁহার থাকিবে, কিন্তু তিনি কবিরঞ্জন উপাধিধারী কীর্ত্তন ও গীত-রচক রামপ্রসাদ দাস নহেন। নামের সমতা দেখিয়াই ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন উপাধিধারী কোন কীর্ত্তিমান পুরুষকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়াও অধস্তন বংশ্যগণের উপযুক্ত নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু

আমার বাড়ী।

কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম-ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই!
স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গে চোরে,
হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই!
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফেলি ছিঁড়া,
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই!
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
মনে না হইতে আগে পুড়ে হই ছাই!
বলনা বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে,
আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই!
কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?

২

কোথায় বসতি মোর, কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল বাড়ী, চিহ্ন মাত্র নাহি তারি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই!
রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই!
সে দেশ থাকিত যদি, তবে কিহে নিরবধি,
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই?
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৩

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর,
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই!
আমারি—আমারি দেশে,আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই!
ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বজ্রগীতি,
জলন্ত দীপকরাগে প্রাণ খুলে গাই!
ছিন্নজিহ্ব সিংহ সম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই!
কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?
কেহই শোনেনা যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা,
এ দুঃখ বলিতে নাহি ত্রিভুবনে ঠাঁই !
এ জগতে আছে যারা, সকলে পিশাচ তারা,
প্রকৃত মানুষ কারে দেখিতে না পাই !
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,
'ধ্বজাধারী' 'আর্কফলা' যার দিকে চাই !
"তু" করিতে মেলে হাত, হেন পায়ধরা জাত,
এমন বিবেকশূন্য দেশের বালাই !
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদেরি বলি ঘৃণা করি তাই !
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে,
দয়াল ধার্ম্মিক বীর কোথা গেলে পাই ?
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ, কার বল কাঁদে প্রাণ ?
তেমন মানুষ বুঝি ত্রিভুবনে নাই !
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?

৫

কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল ?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আঁখিভরা শোক-অশ্রুজল ?
তুমি কি দেখেছ বু'ঝে, এত বল আছে ভুজে,
ছিঁড়িতে পারিবে তার লোহার শৃঙ্খল ?
হৃৎপিণ্ড বিদারিয়া, বুকের শোণিত দিয়া,
পারিবে নিবা'তে তার দাহ-দাবানল ?
কোথায় বসতি তবে শুনিয়া কি ফল ?

৬

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর !
দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর !
ছিল সবে শান্তিসুখে, সতত প্রসন্নমুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর !
কত ছিল খেত খোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর !
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধেভাতে সকলেই পূরিত উদর !
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর !
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর !
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারীনর !

৭

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন,
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ !
জননী সমান জানি, সত্যভামা ছিলা রাণী,
মমতার মন্দাকিনী স্নেহ-প্রস্রবণ !
রাজবালা কৃপাময়ী, কৃপার তুলনা কই ?
রাজেন্দ্র নামেতে ছিলা রাজার নন্দন !
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন !
যার খেত সে অবশ্য, পাইত তাহার শস্য,
পারিত না লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ !
সে যায়নি অধঃপাতে,সে খেত' আপন হাতে,
নিজেই নিজের রাজ্য করিত শাসন,
প্রজার কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে,
দেশের মঙ্গলে সদা আছিল যতন !
কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাজ্যের উন্নতি যায়,
তাহাতে অজস্র অর্থ করিত বর্ষণ,
প্রজার শিক্ষার তরে, কত যত্ন সমাদরে,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় করিত স্থাপন ;
নাহি ছিল জলকষ্ট ; রোগে না হইত নষ্ট,
দেশে কভু নাহি ছিল অকাল মরণ,
কাটাইয়া জলাশয়, স্থাপিয়া চিকিৎসালয়,
প্রজার অভাব দুঃখ করিত মোচন !
ছিল 'প্রজাহিতৈষিণী' প্রজা-হিতসংসাধিনী,

রাজার সে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি অতুলন,
কিন্তু তা কোথায় আজ, কোথা সেই মহারাজ?
ডুবেছে সূর্য্যের সহ সহস্র কিরণ!
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন!

৮

যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিলনা পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিলনা ভাই দানব অসুর!
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মরিতে হ'ত না কারে,
দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর,
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভুত প্রচুর!
বিনা দোষে নির্ব্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চুর!
কিম্বা গৃহ পোড়াইয়া, সে দিত না খেদাইয়া,
সে ছিলনা আততায়ী পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর!
সে ছিল ভগিনী ভ্রাতা, সে যে ছিল পিতা মাতা,
সে যে ছিল সকলের মাথার ঠাকুর!
হায়, কোথা গেলা আজ, দেবপুর-দেবরাজ,
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাজাবাহাদুর!
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর!

৯

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশানশয্যা আছে সারদার!
কুমুদ কমলে হায়, শরত সাজায় তায়,
সায়াহ্ন জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধুমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ হংস অনিবার!
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়গীতি গাইয়া তাহার!
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার!
দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমার!

১০

দেবদেশে ছিল ভাই দেবনিকেতন,
যত তরু যত লতা, সবি কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন!
সে দেশের স্রোতস্বিনী, সকলেই মন্দাকিনী,
সকলি অমৃতগঙ্গা সুধাপ্রস্রবণ!
সে দেশের স্বর্ণভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি,
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে সুমেরু কেমন!
সে দেশে 'মাণিকা বিলে', মাণিক-কমল মিলে
কি ছার সে মানসের হেম পদ্মবন!
আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনারী,
সলিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন!
সে দেশে নারীর ঠোঁটে, পারিজাত ফুল ফোটে,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বহে সুধা সমীরণ,
তাদেরি আননে হয়, সে দেশের চন্দ্রোদয়,
তাদেরি চরণে ডুবে কনক তপন!
তাদেরি করুণা স্নেহে, নব বল আসে দেহে,
জরামৃত্যু করে যেন দূরে পলায়ন,
অমৃত তাদেরি কথা, সে আদর সে মমতা,
জুড়ায় বুকের ব্যথা জ্বালাপোড়া মন!
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনী রূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা—সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন!
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন!

১১

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর!
সয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নিছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর,
তাহারা ভুতেরে পূজে, যুতা খায় মাথা গুঁজে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড়!
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,

মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড় ফড় !
ভাবিছে অদৃষ্ট সার,এই লিপি বিধাতার,
এত কাপুরুষ করে দৈবের নির্ভর,
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদাঘাতে,
স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর !

হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংসার দুঃখ ও মুক্তি।

পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাবের সহজ অর্থ, মরণান্তর বারম্বার জন্ম গ্রহণ করা। (প্রেত্য=মৃত্বা, ভাবঃ= উৎপত্তিঃ)। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার সহিত আত্মার সম্বন্ধকে জন্ম কহে এবং সেই সম্বন্ধের অভাবকে মৃত্যু বলে। উক্ত জন্মমরণপ্রবাহরূপ প্রেত্যভাবকে সংসার কহে। এই সংসার অনাদি এবং আত্মার মোক্ষ পর্য্যন্ত ইহার অন্ত হয় না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেকেরই প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। কোন পদার্থের অতি অল্পকাল মধ্যে কাহারও বা কিঞ্চিৎ অধিক সময় মধ্যে সম্পূর্ণ রূপান্তর হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষাদি প্রাণি-দেহ সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে কিয়ৎ কাল পরে, যখন আমাদের স্থূলদৃষ্টির অবিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখন ঐ দেহ সমূহের বিনাশ হইয়াছে এরূপ বলা যায়। দেহের আশ্রয় ব্যতীত আত্মা স্বীয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করিতে অসমর্থ। এই হেতু প্রত্যেক আত্মা স্বীয় অদৃষ্টানুযায়ী প্রাণি-শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। পরিগৃহীত দেহের সাহায্যে পূর্ব্বসঞ্চিত কিয়ৎ কর্ম্মের ক্ষয় ও নূতন কর্ম্মরাশির সঞ্চয় হইলে, আত্মা সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করেন এই রূপে মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি প্রাণিদেহ সমূহের অবিরত উৎপত্তি ও বিনাশপ্রবাহ অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইতেছে। কোন্ সময় হইতে এই জন্মপ্রবাহের আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া মানব বুদ্ধির অসাধ্য। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় যে, বিধাতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সূর্য্যচন্দ্রাদিকে সৃষ্টি করিলেন। সংসারের অনাদিত্ব নিবন্ধন শ্রুতি পূর্ব্বতম কল্প নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস করেন নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও সংসার অনাদি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ;—

নরূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে।
নান্তোনচাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা॥ (গীতা,১৫।৩)

এই সংসার বৃক্ষের রূপ পরিলক্ষিত হয় না ; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই (আত্মার মোক্ষ পর্য্যন্ত) এবং ইহা কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না।

বুদ্ধি আত্মার একটী গুণ। ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধিকে মোহ বলে। এই মোহ হইতে আত্মার ইচ্ছা ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি হইতে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের আরম্ভ হয়। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সুখ দুঃখের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সুখদুঃখ সংবেদনই সংসারের ফল। আত্মা প্রতিজন্মে অসংখ্য কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করতঃ তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। স্বীয় আত্মার সুখ ও দুঃখ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং পরের আত্মার সুখ ও দুঃখ নয়নপ্রসাদ ও মুখমালিন্যাদি দ্বারা অনুমেয়। (বাধনা, পীড়া বা তাপের সংশ্রবকে দুঃখ বলে। যখন আত্মার কোন শক্তির বাধা উপস্থিত হয়, তখন সেই বাধিত অবস্থাকে দুঃখ বলা যায়। আর আত্মার শক্তি যখন অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই অবাধিত অবস্থাকে সুখ বলা যায়। বাধনা বিবিধ প্রকার। নারকীদিগের উৎকৃষ্ট বাধনা, তির্য্যগ্‌জাতির মধ্যম, মনুষ্যের হীন এবং দেবতা ও বীতরাগদিগের হীনতর বাধনা। সুখ ও দুঃখ এক নহে, উহারা পরস্পর বিভিন্ন। স্রক্ চন্দনাদি ইষ্ট কারণ ও অহি কণ্টকাদি অনিষ্ট কারণের পরস্পর বিভিন্নত্ব হেতু সুখ ও দুঃখ পরস্পর বিভিন্ন। অনুগ্রহ, নয়নপ্রসাদাদি সুখের কার্য্য সমূহ ও দৈন্য মুখমালিন্যাদি দুঃখের কার্য্য সমূহ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া উহাদের কারণ সুখ ও দুঃখ পরস্পর বিভিন্ন। আরও দেখ এক সময়ে এক আত্মায় সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় না। অতএব সুখ ও দুঃখ একই পদার্থ নহে। এই সুখ ও দুঃখ বহু প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, প্রায়ণ, অনিষ্টসংযোগ, ইষ্টবিয়োগ ও প্রার্থিতানুপপত্তি নিমিত্ত অনেকবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়।)

বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শারীরিক দুঃখ বলে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃ-শত্রুর আক্রমণে ও বিষয় বিশেষের অদর্শনাদি নিবন্ধন যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাকে মানসিক দুঃখ বলে। এই উভয় দুঃখই আভ্যন্তরিক উপায়সাধ্য বলিয়া ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা যায়। চৌর, ব্যাঘ্র, সরীসৃপ ও কাকাদি কর্ত্তৃক যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। অগ্নি, বজ্রপাত ও গ্রহাদির প্রভাবে যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। দর্শন স্পর্শনাদি নিমিত্ত যে সকল সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে বৈষয়িক সুখ বলে। একটী কার্য্য বারংবার অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐ কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহা হইতে যে

সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আভ্যাসিক সুখ বলে অভিলাষাদি হইতে যে সুখের আবির্ভাব হয়, তাহাকে মানোরথিক সুখ বলা যায়। আত্মাভিমান হইতে যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহাকে আভিমানিক সুখ বলে।

দুঃখ, চৈতন্য-বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই প্রতিকূল। দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক সুখলাভ করা প্রাণিমাত্রেরই অভিপ্রেত। কিন্তু এই সংসারে দুঃখের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং সুখের ভাগ অতি অল্প। যদিও ইষ্ট সংযোগাদি জনিত কিঞ্চিৎ সুখ কখনও উপলব্ধ হয়, কিন্তু পরিণামে সেই সুখ দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারা দুঃখাসম্ভিন্ন সুখপ্রাপ্তির আশা করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। গহন তিমির পুঞ্জের মধ্যে একটী খদ্যোত আলোকের ন্যায় এই অনাদি সংসারে অশেষ দুঃখ রাশির মধ্যে সামান্য সুখকণিকাকে সুখ বলিয়াই বোধ হয় না। এই সংসারে আত্মার শক্তিনিচয় সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। এই হেতু বেদান্তিগণ সুখ ও দুঃখ উভয়কেই দুঃখ আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক সংসারকে তাপক ও জীবকে তপ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীব ও সংসারের পরস্পর তপ্য তাপক সম্বন্ধ। এই তাপক সংসার হইতে পরিত্রাণলাভ করা জীবমাত্রেরই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু জীব যতকাল পর্য্যন্ত পুণ্য ও পাপ নামক কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই ইহার মুক্তি হইতে পারে না।

"যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
যথা লৌহ ময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্নলভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে॥
জ্ঞানংতত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"

"যতকাল পর্য্যন্ত শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত শত শত দেহ ধারণ করিলেও মনুষ্যের মুক্তি হয় না। লৌহময় ও স্বর্ণময় পাশ দ্বারা জীব যেরূপ বদ্ধ হয়, শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারাও তদ্রূপ আবদ্ধ হইয়া থাকে। শত শত কষ্ট সহ্য করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম সম্পাদন করিলেও যত দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপ বিনষ্ট ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, প্রাজ্ঞলোকেরা পদার্থ সমূহের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন।"

ঐহিক ও জন্মান্তরীয় বিশেষ সুকৃতিবলে দ্রব্য গুণ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রোক্ত পদার্থ নিবহের পরস্পর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রকৃত বোধ জন্মে। ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দেহাদিতে আত্মার অভেদ বিষয়ক মোহ বিদূরিত হয়। মোহ দূরীভূত হইলে ইচ্ছা ও দ্বেষের অপায় হয় ও তদনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া জন্মের উচ্ছেদ ও তাপত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ (ইচ্ছা, দ্বেষ ও মোহ) ও মিথ্যা জ্ঞানের উত্তরোত্তর অপায়ে অপবর্গ লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। দুঃখকর জন্মের অত্যন্ত বিমুক্তি অর্থাৎ বাহ্যবস্তু, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় বন্ধন আছে, সেই বন্ধনের উচ্ছেদের নামই মুক্তি। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা চরম দুঃখ ধ্বংসই মোক্ষ। কেহ কেহ বলেন, আত্যন্তিক দুরিত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ, কেহ বা অবিদ্যা নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। কাহারও মতে পরমাত্মায় জীবাত্মার লয়ের নাম

মোক্ষ, কেহ বা নিত্য সুখসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষ অভিধান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মুক্তাদশায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা সকল মতেরই অভিপ্রেত। আত্মা তখন বুঝিতে পারেন, তিনি দেহ নহেন, দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

নাহং দেহো নমে দেহো
বোধোহহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যইব সংপ্রাপ্তে
নস্মরত্যকৃতং কৃতম্॥

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

দার্শনিকজ্ঞান ও ব্রহ্ম। (৩)

স্পীনোজা (Spinoza) অদ্বৈতবাদের প্রধান-প্রবর্ত্তক। ইনি অদ্বৈতবাদের শিরোমণি; আমরা আজ ইঁহারই দার্শনিকমত সংক্ষেপে বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি। পাঠক মনে রাখিবেন, আমাদের শুধু খাঁটি ব্রহ্ম-জ্ঞান সমালোচনা করাই অভিপ্রেত; সুতরাং যতটুকু আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইবে, আমরা প্রত্যেক সমালোচ্য দর্শন হইতে ততটুকুমাত্র গ্রহণ করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধদ্বয়ে যে দুইজন দার্শনিক পণ্ডিতের মত-বিশ্লেষ করিয়া দেখান হইয়াছে, তাঁহারা পদার্থ সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইনি সেরূপ নহেন। ইনি একত্ববাদের (Monism) প্রবর্ত্তক। ইনি জগতে একটী ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থের (Substance) মৌলিকত্ব স্বীকার করেন না; ইঁহার মতে সেই পদার্থ ব্রহ্ম। জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত; অথবা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ঐ ঐ আকারে পরিণত। ইঁহার প্রবর্ত্তিত দার্শনিক-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে কার্য্য-কারণ-বাদ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে। মোটামোটী বলিতে গেলে, যাহা পরবর্ত্তী পদার্থের একান্ত-সন্নিহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জনক, তাহারই নাম কারণ; এবং সেই কারণ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার কার্য্য। এই কার্য্যকারণবাদ লইয়া ভারতে ও ইউরোপে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা এস্থলে সেই সমুদয় বিভিন্ন মত লইয়া টানাটানি করিব না; এস্থলে যাহা আমাদের প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ এসম্বন্ধে স্পীনোজার যেরূপ মত, তাহাই আমরা বলিব। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন বা সাংখ্যদর্শনের "সৎকার্য্য"-বাদ যেরূপ, স্পীনোজার কার্য্য-কারণ-বাদও অনেকটা সেইরূপ। ইনি ব্রহ্মকে জগতের "Immanent cause" বলিয়া গিয়াছেন। কার্য্য, কারণ হইতে কার্য্যাকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম-ভাবে সেই কারণেই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং কার্য্য কারণেরই পরিণতি মাত্র। অভিব্যক্ত হইলেই, কারণই কার্য্যরূপে দেখা-দেয়। কার্য্য, কারণের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল, কেবল কারকব্যাপার দ্বারা তাহাই বাহ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

"The effect is not alient to its cause, but a simple development of it and still organically belonging to it : that which the substance has produced is but a part of its own history : what is caused is after all only a form of the cause itself."

এই কার্য্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে বর্ত্তমান ছিল; সৃষ্টির পরেও এই কার্য্য কার-

ণের মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে, অর্থাৎ কারণ ছাড়া কার্য্য থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্ম-পদার্থই সমস্তের কারণ; সেই একমাত্র কারণ-পদার্থ হইতে সমস্ত উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হইয়া, তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। পাঠক দেখিবেন, এই মত বেদান্তের মতের সঙ্গে একবিন্দুও তফাৎ নহে।

এখন, ইহার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আমরা দেখিয়া আসিলাম, ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ বা Substance.। এই পদার্থের দুইটী উপাদান আছে, ইহাকে উহার Essence বা Attribute বলে। এই দুই উপাদান লইয়াই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মের প্রথম উপাদান Thought বা চিন্তা; আকৃতি বা ঘনত্ব বা Extension ইহার দ্বিতীয় উপাদান। ব্রহ্মের এই মূল উপাদানদ্বয় চিরন্তন, অনাদি, অপরিবর্ত্তনীয় এবং সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট। * এখন দেখিতে হইতেছে যে, যদি জগতে একমাত্র পদার্থই (ব্রহ্ম) বর্ত্তমান ছিল, তবে এ অনন্ত পদার্থ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? আমরা দেখিয়াছি, কার্য্য কারণেই বর্ত্তমান ছিল, অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম যখন পরিণত হইলেন,—যখন সৃষ্টি ক্রিয়া আরব্ধ হইল,—তখন ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বা উপাদান Thought এবং Extension ও বাহ্যাকারে প্রকাশ পাইল (appear as phenomena); তখনই বস্তুরাশিও দেখা দিল। Attributes দ্বয় Modes আকারে প্রকাশ পাইল। জগতের কারণ-স্বরূপ ঐ Attributes দ্বয় যখন কার্য্যাকারে দেখাদিল, তখনই তাহারা Modes নাম ধারণ করিল। সুতরাং Thought বা চিন্তা-সমন্বিত ব্রহ্ম-পদার্থই আত্মার (soul বা mind) আকারে; এবং Extension বা ঘনত্ব-সমন্বিত ব্রহ্ম-পদার্থই আবার জড়ের (Matter) আকারে প্রাদুর্ভূত হইল। Mind বা আত্মা, Thought এরই Mode এবং Matter বা জড়, Extension এরই Mode.। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই কার্য্যাকারে পরিণত হওয়াতে জগতে তাঁহার দ্বিবিধ -উপাদান হইতে জড় চেতন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আমরা বলিয়াছি, Thought এবং Extension ই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব; উহারাই জগতের কারণ। এই দ্বিবিধ ব্রহ্মোপাদানের পরিণতিই Modes নামে কথিত। এই Modesই, Idea, স্মৃতি-জ্ঞান প্রভৃতির ঘনীভূত সমষ্টিস্বরূপ "মন" নামে এবং গতি-আকৃতি প্রভৃতির ঘনীভূত সমষ্টি-স্বরূপ "জড় বা শরীর" নামে অভিহিত। সুতরাং জগতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহাতে ঐ চিন্তা ও ঘনত্বের Modes স্বরূপ Idea ও আকৃতি মিশ্রিত না আছে। অর্থাৎ প্রতি পদার্থই আকার ও চৈতন্য সমন্বিত। * "An particular thoughts have God, as a thinking being, just as all particular bodies have God, as an extended being, for their cause." তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্মের দুই

* ইহা ছাড়া Existence বা সত্ত্বা ও তাঁহার Nature বা উপাদান। যাহার সত্ত্বা নাই, তাহা তাঁহাতে থাকিতে পারে না।

* "There can be nothing in nature, of which there is not, in the soul of that same thing, an *idea.*" "All individual things are *animate*, though in different degrees." ইহাতে যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে, জলেরও Idea বা দেহেরও চেতনত্ব আছে। "পদার্থে Idea আছে"—ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সেই পদার্থটী Idea বিশিষ্ট। উহার অর্থ এই যে, ঐ পদার্থ Ideaর বিষয়ীভূত; উহা হইতে মনে Idea উপস্থিত হয়। অর্থাৎ পদার্থ নিজেই Intelligent এরূপ অর্থ নহে; কিন্তু পদার্থ Intelligible এইরূপ অর্থ। Spinozaর দর্শনে এই বিষয়টী মনে রাখা অতীব আবশ্যকীয়।

প্রকার সত্ত্বা। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার Real Existence বা প্রকৃত সত্ত্বা; এবং সৃষ্টির পর ইহার Phenomenal Existence বা বাহ্যাকারে পরিণত-সত্ত্বা। সুতরাং সৃষ্টির পরে, ঐ Modes গুলি দুশ্ছেদ্য ভাবে তাঁহাতেই সর্ব্বদা অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব আরো দেখা যাইতেছে যে, পদার্থের সত্ত্বা (Existence) এবং ঐশ্বরিকসত্ত্বা একরূপ নহে। কেননা, সত্ত্বা ব্রহ্মের একটী উপাদান; সুতরাং পদার্থের উপাদান সত্ত্বা হইতে পারিল না। পদার্থের সত্ত্বা Limited মাত্র।

এখন, এস্থলে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। অনন্ত ও চিরন্তন পদার্থ হইতে কেমন করিয়া সান্ত ও সসীম জড়াদি জন্মিল? কি করিয়া অনন্তত্ব হইতে বিশেষত্বে পরিণতি দাঁড়াইতে পারে? Infinite হইতে Finite প্রাদুর্ভূত হইল কেমন করিয়া? কারণের গুণ কার্য্যে পরিণত হওয়াই নিয়ম। জল ও উষ্ণতা প্রভৃতির যোগে বাষ্প উৎপন্ন হইল; বাষ্পে এমন কোনও রূপ গুণ থাকিতে পারেনা, যাহা উহার কারণীভূত পদার্থে বর্ত্তমান ছিল না। ঐ যে কুসুমটীর সুন্দর বর্ণ দেখিতেছ, উহা সূর্য্য-কিরণ হইতে গৃহীত, ঐ যে উহার মনোহর গন্ধ তোমার মনকে আকুল করিয়া দিয়াছে,ঐ গন্ধ পৃথিবী হইতে গৃহীত; আবার ঐযে পুষ্পটীর সতেজ তরল ভাব দেখিতেছ, উহাও বাষ্পরাশি হইতে পরিগৃহীত। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত না হইয়াই পারেনা। ইহা বিবর্ত্তবাদের(Evolution theory) মূল নিয়ম; গোতম-প্রবর্ত্তিত ন্যায়-শাস্ত্রেরও ইহাই মূল-ভিত্তি। তবে Infinite হইতে কি করিয়া finite আসিল? স্পীনোজা ইহার কিরূপ উত্তর দেন, দেখা যাউক্। তিনি বলেন,ঠিক্ ব্রহ্ম হইতে এসমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই; ব্রহ্ম তাঁহার অন্য আর একটী কারণ বা উপাদানদ্বারা * ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। "All particular things can be determined to existence and action only through *finite* causes, and not immediately by God" (Ueberweg's History of Philosophy, Vol II. P. 72). এই পদার্থসকল ব্রহ্মেরই অন্য একরূপ "তৃতীয়" উপাদান হইতে পরিণত হইয়াছে।

"The particular (finite) thing is caused by God not as infinite but as affected in the mode of an actually existing particular thing, of which also He is the cause, not as infinite, but as affected by a third &c." (Eth. II. 9) "Imperfection of objects comes not from within their essence, but from without; yet what is there without?—nothing but *other essences*, equally derived from the essence of the same attributes and claiming in like manner to be its *property*." (Martineau, Eth. Vol I.)

আমাদের বিবেচনায় এরূপ উত্তর তত মনঃপূত বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ, এ গুরুতর প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতরূপে স্পীনোজা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। যহাহউক, তবেই স্পীনোজার মতানুসারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রত্যেক সান্ত পদার্থে দুই প্রকার উপাদান সম্মিলিত রহিয়াছে,--একটী পূর্ণ ও চিরন্তন, অন্যটী অপূর্ণ ও সান্ত(Modified attribute)। দ্বিতীয়টী বাহ্যিক, প্রথমটী আন্তরিক কারণ। পদার্থ সৃষ্টিতে এই দুই কারণেরই আবশ্যকতা আছে। প্রথমোক্তটী মানবাত্মায় reason নামে পরিণত হইয়াছে; দ্বিতীয়টীর জন্যই আমরা অনুভূতি লাভ করি, আমাদের স্মৃতি প্রভৃতি জন্মে এবং সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকি। দ্বিতীয় বৃত্তির উপরে প্রথমা বৃত্তি সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেই, মানবাত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে।

* Thought এবং Extension ব্যতীতও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, ব্রহ্মের আরও অনেক Attribute বা উপাদান আছে।

এখন আর একটী বিষয় আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, প্রত্যেক পদার্থই Extension এবং Thought এরই পরিণতি, সুতরাং পদার্থ মাত্রেরই আকার ও Idea আছে। কিন্তু ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা? অর্থাৎ দেহ ও মনে কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কিনা? প্রতি পদার্থে সমবস্থিত ঐ গুণ (Attribute) দ্বয় পরস্পর পৃথক্ ও বিভিন্ন। কেননা, তাহা না হইলে উহারা পরস্পর নিরপেক্ষ attributeই হইতে পারিত না। তবেই জড় ও তন্মধ্যগত বা তাহার Ideaতে কোন সম্বন্ধ নাই। স্পীনোজা বলেন, উহারা পরস্পর পৃথক্ হইলেও 'সমান্তর', সুতরাং Ideas এতে এবং জড়েতে সম্বন্ধ না থাকিলেও একটী সমন্বয় বা শৃঙ্খলা রহিয়াছে; কিন্তু উহারা কেহ কাহারও "কারণ" নহে। অতএব মানসিক ইচ্ছাদি অনুসারে, শারীরিকগতি বা ক্রিয়াদি হইতে পারিল।

মনের দ্বিবিধ রাজ্য আছে;—জ্ঞান-রাজ্য এবং ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি-রাজ্য। জ্ঞানরাজ্যকে বিশ্লেষ করিলে, প্রধানতঃ Imagination ("বিশেষ"-বস্তুজ্ঞান); Ratio ("সাধারণ" নির্ম্মলজ্ঞান); এবং Intuitus (ঈশ্বরীয়জ্ঞান) —এই তিন প্রকার বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। পদার্থের জ্ঞান (বা Idea) লাভ করিবার সময়ে আমাদের দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য থাকে;—প্রথম আমাদের শরীর, দ্বিতীয় আমাদের শরীরের উপরে ক্রিয়াকারী অন্যান্য পদার্থ। আমাদের নিজের শরীরের উপর ক্রিয়া না জন্মাইলে আমরা অন্য পদার্থের জ্ঞান-লাভ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের দেহ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য পদার্থের জ্ঞান হয়। মন, অন্য পদার্থজ্ঞানের সম-সময়ে নিজের আপনার জ্ঞান(বা Idea)ও লাভ করিয়া থাকে,—অর্থাৎ স্বকীয় শরীরের ক্রিয়া-কলাপাদির Idea জানিতে পারে। এইরূপ, যখন কোন পদার্থ আমাদের শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া উৎপাদন করে, তখন উহা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী দিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত একটী স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দেয়; সেই স্রোত মস্তিষ্কে একটী ক্ষণিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত করে। এই পরিবর্ত্তনই তাহার Idea উৎপাদন করায়, ইহা হইতেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের জ্ঞান লাভ হয়। আবার এই বস্তু জ্ঞান স্থায়ী হইলে, বস্তুসত্ত্বা অন্তর্হিত হইলেও, পরে স্মৃতিরূপে মনে জাগরূক থাকে। ইহা লইয়াই আমরা "বিশেষ বিশেষ" পদার্থের এক একটী "সাধারণ" জ্ঞান সৃজন করিয়া লইতে পারি। আমাদের নিজের দেহ ও অন্য পদার্থ, এ উভয়ের যে সমস্ত গুণধর্ম্মাদির একতা বা সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটা জ্ঞান আমরা ইহারই বলে লাভ করিতে পারি। ইহাকেই স্পীনোজা common-notion বলিয়াছেন। এইরূপে মন, জাগতিক সমুদায় পদার্থের একটা বিশাল সাধারণ-ধর্ম্মের (common property) Idea লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই Ideaই ব্রহ্মের চির-বর্ত্তমান উপাদানের Idea. ইহাকেই Adequate Idea বা নির্ম্মলজ্ঞান বলিয়া থাকে। ইহারই শেষসীমা Extension. ইহা দ্বারা প্রত্যেক পদার্থ ধরিয়া ধরিয়া আমরা ক্রমশঃ সেই সেই পদার্থের উপাদান Extensionএর জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। আবার আমাদের আর এক প্রকারের জ্ঞান জন্মে; ইহাকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে। মন অনন্তের অংশ বলিয়া নিজেও অনন্ত; সুতরাং অনন্তের জ্ঞানলাভ করা

ইহার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, মন শারীরিক-উপাদান Extensionএর জ্ঞানলাভে সমর্থ; এই জ্ঞান হইতে,স্বয়ং ব্রহ্মের জ্ঞান ও মন লাভ করিতে পারে। ইহাকেই Intuitive Knowledge বলে। ইহার দ্বারা আমরা সমস্ত পদার্থ যে বিশাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পর ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। এইরূপে আত্মা বিশেষ-জড় পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই সেই পদার্থ যাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

মানব-মনের ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি-রাজ্যের বিশ্লেষ করিলে, সুখ দুঃখাদি কয়েকটী বৃত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমাদের প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে; সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল আর দুই একটী কথা বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। স্পীনোজা বলেন, মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস। ইন্দ্রিয়ও মনোবৃত্তিগুলিকে পরাজিত করতঃ, ঈশ্বরের উপর ভক্তিস্থাপন করাই মানব মনের প্রধান কার্য্য। "কার্য্যের" প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, উহাকে বিশ্লেষ করিতে করিতে একেবারে উহার "কারণ"— মূল উপাদান ব্রহ্মে উপনীত হইতে হয়। ইহারই নাম প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন। এইরূপেই ঈশ্বরে উপনীত হইতে পারা যায়। এমনি, আত্মজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, আত্মা বা মনকে বিশ্লেষ করিতে করিতে ব্রহ্মে উপনীত হইতে হয়। এইরূপ বিশ্লেষ-ক্রিয়ায় মন বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; এবং যখন এই আনন্দ ব্রহ্মে উপস্থিত হয়,—ব্রহ্মরূপ মূল কারণে পৌছায়,—তখনই "ভক্তি" উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সুতরাং এইরূপ আত্মজ্ঞানই ঈশ্বর ভক্তি।

স্পীনোজার মতে আত্মা বা মন অবিনশ্বর। তাঁহার যুক্তি এইরূপ;—Soul বা আত্মা, অবিনাশী উপাদান Thought হইতে উদ্ভূত; দেহও Extension হইতে সঞ্জাত। যখন শরীর ধ্বংস হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর, দেহের Idea স্বরূপ মনেরও ধ্বংস হয়। কিন্তু, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ধ্বংস কাহারই হইল না। রূপান্তর হইল মাত্র। মানবদেহ অন্যরূপ দেহে বা পদার্থে রূপান্তরিত হয়, কেননা উহার উপাদান (Extension) অবিনাশী। দেহধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহের ঐ Idea বা মনও অন্তর্হিত হইল সত্য, কিন্তু ইহা আবার অন্য এক পদার্থের Ideaরূপে জন্মিল; কেননা উহার উপাদান (Thought) অবিনাশী। কাল বা (Time)এর সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য বলিয়া, পূর্ব্বজন্ম আমাদের মনে থাকে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি, বস্তুজ্ঞান প্রভৃতি সবই যায়, কেননা দেহসম্বন্ধ হওয়াতেই এ গুলির জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু আত্মজ্ঞান বা "Personal self-consciousness" মৃত্যুর পরও থাকে। ক্রমশঃ—

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ভট্টোজী দীক্ষিত।

ভট্টোজী দীক্ষিত সংস্কৃত সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মহর্ষি পাণিনির জগদ্বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ সূত্র অবলম্বনে সুপ্রসিদ্ধ "সিদ্ধান্তকৌমুদী" প্রণয়ন করেন এবং তদ্দারা তিনি পাণিনির মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত করেন। অদ্য আমরা

এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের সময়নির্ণয় ও জীবনী সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের সময়নির্দ্দেশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিনা, জানি না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কনোজ (কান্যকুব্জ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি (অনুমান ১৪০—১৬০ খ্রীঃ) প্রাচীন কনোজ নগরীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কনোজের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কনোজ গুপ্তসম্রাটদিগের অধিকারস্থ একতম প্রধান নগরীর মধ্যে পরিগণিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কনোজ গুপ্ত সম্রাটদিগের পদানত থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে(৩৯৯-৪১৪ খৃঃ) বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যটক ফাহিয়ান কনোজ দর্শন করিয়া, স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাহার সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। তখন কনোজ গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্তের সেনাপতি ও সামন্তরাজ যশোধর্ম্মন হুনরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। তিনি সম্ভবতঃ মালবে গুপ্তসম্রাটদিগের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে রাজত্ব করিতেন। আপনার ভুজবীর্য্যে হুনরাজের হস্ত হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, সেনাপতি যশোধর্ম্মন শেষ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক কনোজে আপনার রাজপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই যশোধর্ম্মনের নামাঙ্কিত যে দুইখানি শাসনলিপি পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্লীট সাহেবের যত্নে মন্দসরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি ৫৩৩—৩৪খৃঃ উৎকীর্ণ হয়। মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় হইতে কনোজ আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্ব প্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। অনুমান ৫৩০-৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ষ কাল বিষ্ণুবর্দ্ধন কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর এইরূপে বর্দ্ধনবংশের রাজপাট কনোজে প্রতিষ্ঠিত হয়। থানেশ্বর এই বর্দ্ধনবংশের আদিম বাসস্থল।

বর্দ্ধনবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কনোজের গৌরব ও সমৃদ্ধি সবিশেষ বর্দ্ধিত হয়। তদবধি কনোজ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাতি লাভ করে। বর্দ্ধনবংশীয় শেষ নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ৬০৭—৬৪৮ খৃঃ হইতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপতি সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ৬৩৪ খ্রীঃ হিয়াংসাঙ কান্যকুব্জে উপনীত হইয়া, তাহার শোভা সমৃদ্ধি সবিশেষ বর্ণনা করেন।

প্রবাদ আছে যে, এই মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন 'রত্নাবলী' ;নাজের শা' নামে নাটক সংস্কৃতে রচনা ক[illegible]ত বাণভট্ট এই হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভায় অবস্থিতি পূর্ব্বক আপনার প্রভুর জীবনী "হর্ষচরিতে" লিপিবদ্ধ* করেন।

* হর্ষচরিতের আরম্ভে বাণভট্ট আপনার পূর্ব্বতন কবি সুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তার' অনুকরণে বাণভট্ট সুপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' রচনা করেন। সুবন্ধু বাণভট্টের অব্যবহিত পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কনোজের রাজসভায় প্রাদুর্ভূত হন। সুপণ্ডিত F. E. Hall সাহেব বাসবদত্তার গবেষণাপূর্ণ ভূমিকায় এই বিষয় সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করেন। কয়েক বৎসর গত হইল নব্যভারতে আমরা সুবন্ধুর সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। "কবীনামগলদ্দর্পং নূনং বাসবদত্তয়া" (হর্ষচরিত, ১৮ শ্লোক)।

মহাকবিচক্রচূড়ামণি বাণভট্টের পিতার নাম চিত্রভানু। তিনি অর্থপতির পৌত্র ও কুবেরের প্রপৌত্র। হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রয়ে থাকিয়া, বাণভট্ট "কাদম্বরী" "পার্ব্বতীপরিণয়" নাটক ও "চণ্ডিকাশতক" রচনা করেন। ময়ূরভট্ট এই হর্ষবর্দ্ধনের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া "সূর্য্যশতক" রচনা করেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের শতাধিক বর্ষ পরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোবর্ম্মন নামে রাজা কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীরের মহারাজা ললিতাদিত্য এই যশোবর্ম্মনকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও অবশেষে রাজ্যচ্যুত করেন। মহাকবি ভবভূতি ও বাক্‌পতি নামে অপর এক কবি এই যশোবর্ম্মনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ললিতাদিত্যের সময়ে (৭১৫—৫১ খ্রীঃ) সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে কাশ্মীরে আগমন পূর্ব্বক সরস্বতীপীঠে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্য ও মহাকবি ভবভূতি একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন *।

যশোবর্ম্মনের রাজ্য[illegible] ব্যবহিত পরে কনোজে এক নূতন র[illegible]পনীত হইতে[illegible]ক্তির দ্বারা খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর [illegible]ানার্জ্জন। এই[illegible]ষ্ঠিত হয়। এই দেবশক্তির অধস্তন পঞ্চম বংশধর মহেন্দ্রপালের সভায় প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর "বালরামায়ণ, বালভারত (প্রচণ্ডপাণ্ডব), কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা" নামে চারিখানি নাটক রচনা করেন। তিনি স্বরচিত বালরামায়ণে রামচরিত্র বিষয়ক প্রথম নাটক প্রণেতা মহাকবি ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন।

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা,
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাং।
স্থিতঃ পুন র্যো ভবভূতি রেখয়া,
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ"॥

(বালরামায়ণ, ১।১৬)

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজশেখর রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের সভায় প্রাদুর্ভূত হন। ভবভূতি যে রাজশেখরের পূর্ব্বতন কালে আবির্ভূত হন, ইহা বালরামায়ণের উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

দেবশক্তির শেষ বংশধরকে পরাজিত করিয়া বারানসী হইতে গাহড়বার রাজপুতবংশ কনোজে প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রদেব অনুমান ১০৫০ খ্রীঃ এই কাশ্যপগোত্রজ রাজবংশকে কনোজে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রদেবের পিতার নাম মহীচন্দ্র ও পিতামহের নাম যশোবিগ্রহ। চন্দ্রদেব কনোজরাজ সাহসাঙ্ককে পরাজিত

কবি বাক্‌পতি-রাজ-শ্রীভবভূত্যাদি-সেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণ-স্তুতি-বন্দিতাং॥

(রাজতরঙ্গিনী, ৪।১১৪)

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়ার মতে এই ভবভূতি মহাকবিভবভূতি হইতে পৃথক্‌ব্যক্তি। তাঁহার অনুমান মতে মহাকবি ভবভূতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটক উজ্জয়িনী নগরে সুবিখ্যাত 'কালপ্রিয়নাথ' মহাদেবের মন্দিরে অভিনীত হয়। ভবভূতি উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস ও অমরসিংহের ন্যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ভবভূতির সময়নির্দ্দেশ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত মতের যথাসাধ্য সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। Mr. A. R. Baruah's "Essay on Bhavabhuti and his place in Sanskrit Literature".

---

* রাজতরঙ্গিনীর চতুর্থ তরঙ্গে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে কনোজের অধিপতি যশোবর্ম্মনের পরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

করিয়া কনোজে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এই চন্দ্রদেবের পুত্র রাজা মদন পাল ১০৯৭-১১১৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কনোজে রাজত্ব করেন। রাজা মদনপাল "মদন-বিনোদ নিঘণ্টু" নামে বৈদ্যকশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। * এই মদনপালের সভায় অবস্থিত থাকিয়া মহেশ্বর "সাহসাঙ্ক চরিত" ও "বিশ্বকোষ অভিধান" প্রণয়ন করেন। উইলসন সাহেবের অনুমান মতে ১১১১ খ্রীঃ মহেশ্বর দ্বারা বিশ্বকোষ রচিত হয়। মহেশ্বর আপনাকে 'বৈদ্য রাজশেখর' ও কবিরাজ পরমেশ্বর' বলিয়া বিশ্বকোষের শেষ ভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুজরাটের সুপ্রসিদ্ধ জৈন নরপতি কুমার পালের সভাসদ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের "অভিধান চিন্তামণির" নানার্থভাগ "বিশ্বকোষ" হইতে সংগৃহীত হয়।

মহেশ্বর কবিরাজের পিতার নাম ব্রহ্মেশ্বর ও পিতামহের নাম কেশব। মহেশ নামে কেশবের পিতৃব্য বৈদ্যকশাস্ত্রে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহেশের পিতার নাম দামোদর এবং পিতামহের নাম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গাধিপুরের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা হরিশ্চন্দ্র চরকসংহিতার ব্যাখ্যা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।† বিশ্বকোষের আরম্ভে কবিরাজ মহেশ্বর এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ১৬১৯ শকাব্দের পৌষ মাসে লিখিত বিশ্বকোষের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য কনোজ কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে, এই বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। ভট্টোজী দীক্ষিত এই কনোজের রাজসভায় আবির্ভূত হন। এই জন্য তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে কনোজে সংস্কৃতচর্চ্চা বিষয়ে এই সকল কথা লিখিত হইল।

মহেশ্বর কবিরাজ যে সময়ে কনোজের রাজা মদন পালের সভায় অবস্থিত থাকিয়া "বিশ্বকোষ" অভিধান রচনা করেন, সেই সময়ে হৃদয়ধর ভট্ট কনোজের রাজসভায় অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজা মদন পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেব কনোজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১১২০ খ্রীঃ উৎকীর্ণ মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমান ১১১৫ খ্রীঃ হইতে ১১৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি কনোজে রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিজয়চন্দ্র দেব ১১৬০-৭৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কনোজের শাসন দণ্ড পরিচালন

* জয়তি মদনপাল সর্ব্ববিদ্যা-বিশালঃ,
কৃতসরসিজমিত্রঃ কর্ম্মধর্ম্মে পবিত্রঃ।
সুজনপিকরসালঃ স্তুষ্টগোপালবালঃ,
রুচিরতর চরিত্রশ্চারুচাতুর্য্যচিত্রঃ॥

† "শ্রীসারসাকন্দপতে রণবদ্যাবিদ্যা
বিদ্যাতরঙ্গপদ-মব্যয়মেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্র-চারুচরিতো হরিশ্চন্দ্র-নামা
স্ব-ব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্র-মলঞ্চকার॥
আসীদসী মবসুধাধিপ-বন্দনীয়ে
তস্তান্বয়ে সকল বৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দয়িত ইব গাধিপুরাধিপস্য,
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তি লতাবিতানঃ।"
(বিশ্বকোষ)

গাধিপুর, কুশস্থল, মহোদয় ও কান্যকুব্জ নামে পূর্ব্বকালে কনোজ পরিচিত ছিল। ইহা হইতে মহেশ্বরের কনোজের রাজসভায় পুরুষানুক্রমে অবস্থিতির বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। মহেশ্বর কবিরাজ ভোগীন্দ্র, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক, বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমরসিংহ মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত ও ভাগুরীর রচিত কোষ হইতে সাহায্য লইয়া "বিশ্বকোষ" প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মহেশ্বরের পূর্ব্বতন কোষকারদিগের নাম পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহার সময়ে এই সকল কোষকারের রচিত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহাও জানা যাইতেছে।

করেন। এই বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র কনোজের শেষ স্বাধীন নরপতি। ১১৭৭-৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সপ্তদশ বৎসর রাজত্বের পর জয়চন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ সহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইয়া, আত্মরক্তে স্বদেশ-দ্রোহিতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হৃদয়ধর ভট্টের পুত্র লক্ষীধর মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের মহাসন্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের আদেশে, এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণসচিব দ্বাদশ কাণ্ডে"কৃত্যকল্পতরু" নামে প্রসিদ্ধ ও সুবিস্তীর্ণ স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষীধরের সুবিস্তীর্ণ "কৃত্যকল্পতরু" দেবগিরি নিবাসী হেমাদ্রির রচিত "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত ও সংগৃহীত হয়। দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী দেবগিরির যাদববংশীয় নরপতি কৃষ্ণের ভ্রাতা রাজা মহাদেবের (১২৬০-৭১ খ্রীঃ) আদেশে তাঁহার সভাসদ হেমাদ্রি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কনোজের মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের আদেশে লক্ষীধর ভট্ট "কৃত্যকল্পতরু" সংগৃহীত করেন। 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির' ন্যায় লক্ষীধরের গ্রন্থ কয়েক প্রধান ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'ব্যবহার', 'কাল' ও 'মোক্ষ' কাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৫১০ শকাব্দের (১৫৮৮খ্রীঃ) লিখিত কৃত্যকল্পতরুর 'কালকাণ্ড' নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলাগ্রামের দীননাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে বিদ্যমান আছে।

ভট্টোজিভট্ট এই লক্ষীধরের পুত্র। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে কনোজের অধিপতি মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্রের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" ভিন্ন "শব্দকৌস্তভ," "কারিকা," "ধাত্বর্থ," "তত্ত্বকৌস্তভ," "পূজাপ্রকরণ," "তিথিনির্ণয়,ও" "শ্রাদ্ধকাণ্ড"রচনা করেন। মহর্ষি পতঞ্জলির রচিত মহাভাষ্য অবলম্বনে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের ব্যাখ্যা রূপে 'শব্দকৌস্তভ' রচিত হয়। এই পুস্তকে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, প্রয়োজনীয় বোধে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "তত্ত্বকৌস্তভে" তিনি মধ্বাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যের মত খণ্ডন পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টোজী ভট্ট দীক্ষিত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বারাণসী নগরে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে বারাণসীর ভট্টবংশ সংস্কৃতচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

"বিশ্বেশং সচ্চিদানন্দং বন্দেঽহং, যোঽখিলং জগৎ
চরীকর্ত্তি বরীবর্ত্তি সঞ্জরীহর্ত্তি লীলয়া ॥
নমস্কুর্ব্বে জগদ্-বন্দ্যং পাণিন্যাদি-মুনিত্রয়ং।
শ্রীভর্তৃহরিমুখ্যাংশ্চ সিদ্ধান্তস্থাপকান্ বুধান্ ॥
নত্বা লক্ষীধরং তাতং সুমনোবৃন্দবন্দিতং।
ফণিভাষিত-ভাষ্যাব্ধেঃ, শব্দকৌস্তভং উদ্ধরে ॥
সমর্প্য লক্ষীরমণে ভক্ত্যা শ্রীশব্দকৌস্তভং।
ভট্টোজিভট্ট জনুষঃ সাফল্যং লভ্যতে ॥"

(শব্দকৌস্তভ)

ভট্টোজী দীক্ষিতের ন্যায় শ্রীহর্ষদেব মহারাজা বিজয়চন্দ্রের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীহর্ষদেব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর ও মাতার নাম মামল্লদেবী। মামল্লদেবীর ভ্রাতা মম্মটভট্ট "কাব্যপ্রকাশ" নামে সুবিখ্যাত অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজা বিজয় চন্দ্রের আদেশে শ্রীহর্ষ দ্বাবিংশ সর্গে মহাভারতীয় নলোপাখ্যান অবলম্বনে "নৈষধ

চরিত” নামে মহাকাব্য রচনা করেন।* “নৈষধচরিত” ভিন্ন এই শ্রীহর্ষ “নবসাহসাঙ্ক-চরিত,” “ছন্দ-প্রশস্তি” “বিজয়-প্রশস্তি” ও “খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য” রচনা করেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে কবিত্ব ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ভট্ট বৈদ্যনাথের “কৌস্তুভটীকা” ও কৃষ্ণ মিশ্রের “ভাবপ্রদীপ”এই পূর্ব্বোক্ত“শব্দকৌস্তুভের”টীকারূপে লিখিত হয়। ভট্টোজী দীক্ষিতের রচিত “সিদ্ধান্ত-কৌমুদী” অবলম্বনে তাঁহার শিষ্য বরদারাজ“মধ্যসিদ্ধান্ত কৌমুদী” ও“লঘুকৌমুদী” রচনা করেন। ১২৫০ সংবতাব্দে (১১৯৩খ্রীঃ) “মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী” বরদারাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়।

“নত্বা বরদারাজঃ শ্রীগুরূন্ ভট্টোজি দীক্ষিতান্।
করোতি পাণিনীয়ানাং মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী ॥
কৃতিঃ বরদারাজস্য, মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী।
তস্যাঃ সংখ্যা তু বিজ্ঞেয়া, খ বাণ-কর-বহ্নিভিঃ ॥”

এই বরদারাজ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়া “ব্যবহার নির্ণয়” স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। শিবানন্দভট্টের আদেশে তাঁহার পুত্র রামভট্ট “মধ্যমনোরমা” নামে বরদারাজকৃত ‘মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদীর’ ব্যাখ্যা রচনা করেন। “সিদ্ধান্তকৌমুদী” অবলম্বনে “সারকৌমুদী” নামে অপর একখানি ব্যাকরণ রচিত হয়।

ভট্টোজী দীক্ষিত “প্রৌঢ়মনোরমা” নামে স্বরচিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। বীরেশ্বর ও ভানুজী নামে ভট্টোজীর দুই পুত্র জন্মে। বীরেশ্বরের রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভানুজী দীক্ষিত বাঘেল-বংশীয় রাজা কীর্ত্তিসিংহ দেবের আদেশে অমর কোষের “ব্যাখ্যাসুধা” নামে অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা রচনা করেন। ইহাতে ভানুজী তাঁহার পূর্ব্বতন রায়মুকুটাদি ব্যাখ্যাকারদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভট্টোজী দীক্ষিতের অন্যতম শিষ্য ও মহেশ মিশ্রের পুত্র বনমালী মিশ্রনামে জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ “কুরুক্ষেত্র প্রদীপ” গ্রন্থে পুণ্য তীর্থ কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

ভট্টোজী দীক্ষিতের পৌত্র ও বীরেশ্বরের পুত্র হরিহর দীক্ষিত,ভট্টোজীর প্রণীত “প্রৌঢ়-মনোরমা” ভাষ্যের “লঘুশব্দরত্ন” নামে ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই হরিহর ভট্টের শিষ্য নাগেশ (নাগোজী)ভট্ট অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। নাগেশের পিতার নাম শিবভট্ট এবং মাতার নাম সতীদেবী। নাগেশভট্ট কৃত ‘লঘুশব্দেন্দু-শেখর’, ‘ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত’, ‘বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তমঞ্জুষা’ “সপ্তসতী ব্যাখ্যান”, ও ‘স্ফোট-বাদ’ পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথভট্ট ‘লঘু-শব্দেন্দুশেখর’ ও ‘বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা’ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

অধীত্য ফণিভাষ্যাব্ধিং সুধীন্দ্রহরিদীক্ষিতাৎ।
ন্যায়তন্ত্রং রামরামাদ্ বাদিরক্ষোধরামতঃ ॥
যাচকানাং কল্পতরো রবিকক্ষহুতাশনাৎ।
শৃঙ্গবেরপুরাধীশাদ্ রামতো লব্ধজীবিকঃ ॥
বৈয়াকরণ-নাগেশঃ স্ফোটায়ন-ঋষের্মতম্।
পরিচিন্ত্যোক্তবাংস্তেন প্রীয়তাং উময়া শিবঃ ॥”

(বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা)।

* রাজশেখর নামে একজন জৈন লেখক ১৩৪৮খ্রীঃ “প্রবন্ধকোষ” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি শ্রীহর্ষদেবের কণোজরাজ জয়ন্তচন্দ্রের সভায় অবস্থিতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশাগত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ডাক্তার বুলারের মতে এই জয়ন্তচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দেবের পুত্র এবং জয়চন্দ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি। ডাক্তার রামদাস সেন এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

নাগেশভট্ট শৃঙ্গবেরপুরের রাজা হিম্মত বর্ম্মার পুত্র রামবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ও গুরু-স্থানীয় ছিলেন। এই রামবর্ম্মা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণের "সেতু" নামে টীকা রচনা করেন।

"বিসেনবংশজলধৌ পূর্ণঃ শীতকরোঽপরেঃ॥
নাম্না হিম্মতিবর্ম্মা ভূদ্ধৈর্য্যেণ হিমবানিব॥
তস্মাজ্জাতো রামদত্ত শ্চন্দ্রাচ্চন্দ্র ইবাপরঃ।
মিত্রাণাঞ্চ রিপুণাঞ্চ মানদঃ প্রথিতঃ প্রভুঃ॥
ভট্টনাগেশশিষ্যেণ বধ্যতে রামবর্ম্মণা।
সেতুঃ পরোপকৃতয়েঽধ্যাত্মরামায়ণাম্বুধৌ॥"(সেতু

ভট্টোজী দীক্ষিতের "প্রপ্রৌঢ়মনোরমা"র ভাষ্যরূপে "লঘুশব্দেন্দুশেখর" নাগেশভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত হয়।

"পাতঞ্জলে মহাভাষ্যে কৃতভূরিপরিশ্রমঃ।
শিবভট্টসুতোধীমান্ সতীদেব্যাস্ত গর্ভজঃ॥
নত্বা ফণীশং নাগেশ স্তনুতেঽর্থপ্রকাশকং।
মনোরমোমার্দ্ধদেহং লঘুশব্দেন্দুশেখরং॥"
(লঘুশব্দেন্দুশেখর)।

পায়গুণ্ড বৈদ্যনাথভট্ট হরিহর দীক্ষিতের কৃত 'লঘুশব্দরত্নের'"ভাবপ্রকাশ" নামে টীকা রচনা করেন। এই বৈদ্যনাথ 'লঘুশব্দেন্দু-শেখর"গ্রন্থের টীকা "চিদস্থিমালা"* নামে প্রণয়ন কয়েন। গঙ্গাধরকৃত 'লঘুশব্দেন্দু-শেখরের টীকা"ইন্দুপ্রকাশ" এবং উদয়ঙ্করের রচিত টীকা "জ্যোৎস্না" নামে পরিচিত।

জয়কৃষ্ণভট্ট "সিদ্ধান্তকৌমুদীর"'সুবোধিনী' নামে টীকা রচনা করেন। জয়কৃষ্ণের পিতার নাম রঘুনাথ ও পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন। তিনি মোনিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'স্ফোটচটক', 'কারকবাদ', 'শুদ্ধিচন্দ্রিকা' ও 'বৃত্তিদীপিকা' রচনা করেন। তাঁহার মাতার নাম জানকী। তিনি মাধবেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র ভট্ট 'অমরকোষ' অভিধানের একখানি ভাষ্য রচনা করেন। এই রাঘবেন্দ্র প্রণীত "অভি-জ্ঞানশকুন্তল" নাটকের টীকা বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছে।*

মহামহোপাধ্যায় ভট্টোজী দীক্ষিতের প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অবলম্বনে ইন্দ্রদত্ত উপাধ্যায় "গূঢ়ফাক্কিকাপ্রকাশ"নামে টীকা রচনা করেন।

"গর্গবংশাবতংসো যো বৈয়াকরণকেশরী।
উপাধ্যায়োপনামেন্দ্রদত্তকৈসখা কৃতিরিয়ং॥
ইন্দ্রদত্তেন বিদুষা কৃতোঽয়ং সংগ্রহো মুদা।
সিদ্ধান্তকৌমুদীগূঢ়ফক্কিকার্থঃ প্রকাশ্যতে॥

ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কনোজের মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের রাজত্বকালে বারাণসী নগরে মহামহোপাধ্যায় ভট্টোজী দীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর ভট্ট অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের আদেশক্রমে লক্ষ্মীধর "কৃত্যকল্পতরু" নামে সুবিস্তীর্ণ স্মৃতি-সংগ্রহ প্রণয়ন করেন। "অদ্বৈতমকরন্দ" নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ সম্ভবতঃ এই লক্ষ্মীধর ভট্টের দ্বারাই রচিত হয়। ভট্টোজী দীক্ষি-

* "নত্বাগুরুং বৈদ্যনাথঃ পায়গুণ্ডাখ্যকো বৃতিং।
চিদস্থিমালাং তনুতে লঘুশব্দেন্দুশেখরে"।

* "পিত্রোঃ পাদযুগং নত্বা জানকী রঘুনাথয়োঃ।
মৌনী-শ্রীকৃষ্ণভট্টেন তন্যতে স্ফোটচটকা॥"
(স্ফোটচটক)

"ধ্যাত্বা ব্যাসং গুরুংনত্বা মাধবেন্দ্রসরস্বতীং।
মৌনী শ্রীকৃষ্ণভট্টেন তন্যতে বৃত্তিদীপিকা॥"
(বৃত্তিদীপিকা।)

"কাত্যায়নব্যাড়িশ্রীমাধবাদীন্
কাতন্ত্রতন্ত্রাণি বিচার্য্য যত্নাৎ।
শ্রীরাঘবেন্দ্রোঽমরসিংহকোষে
তনোতি ভাষ্যং সুধিয়াং হিতায়॥"
(অমরকোষ ভাষ্য)

তের শিষ্য বরদারাজ ১১৯৩ খ্রীঃ 'মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী' রচনা করেন। ইহা হইতেও ভট্টোজী দীক্ষিতের সময় নিরূপিত হইতেছে। ভট্টোজী দীক্ষিত "নৈষধচরিত" কাব্যের প্রণেতা শ্রীহর্ষ ও "ব্যবহারনির্ণয়" নামে স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা বরদাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। এই মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত "সিদ্ধান্তকৌমুদী" রচনা করিয়া, জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি "সিদ্ধান্তকৌমুদী" রচনা না করিলে, মহর্ষি পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী" ব্যাকরণ সূত্রের অনুশীলন রহিত হইয়া পাণিনির নাম পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইত।

ভট্টোজী দীক্ষিত "তত্ত্বকৌস্তভ" নামক বৈদান্তিক গ্রন্থে আপনার সমসাময়িক মধ্বাচার্য্যের * মত খণ্ডন পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদের অভ্রান্তি ও সত্যতা প্রতিপাদন করেন। তিনি ব্যাকরণ, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

অধ্যাপক ওয়েবারের অনুমান মতে ভট্টোজী দীক্ষিত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া "সিদ্ধান্তকৌমুদী" রচনা করেন। ডাক্তার জলির মতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কি সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে দক্ষিণা-পথের তামিল দেশে বরদারাজ প্রাদুর্ভূত হইয়া "ব্যবহার-নির্ণয়" নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের অনুমান যে অমূলক, তাহা ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

দগ্ধ হৃদয়।

উহু, একি গো দহন, জ্বলে প্রাণ মন,
হৃদয়ে কি গুরু যাতনা,
একি, গরল ভখিনু অমিয়া-পিয়াসে,
আগুনে মাখিনু বাসনা!
ওই হৃদয়ের স্তরে বহ্নি বিহরে
জড়ায়ে সকল ধমনী,
যেন বৃশ্চিক-দংশন হয় প্রতিক্ষণ,—
প্রাণে বিষ-জ্বালা এমনি!
ওগো, মানুষের প্রাণে সহিবে কত বা,
কত বল তাহে আছে রে,
যদি পলাইতে চায় তার স্মৃতি, হায়,
হাসি ফিরে পাছে পাছে রে!

লোকে বলে ভালবাসা পরাণের আশা
কত গুরু ব্যথা জানে না,
সে যে হৃদি-পদ্ম-বনে মদমত্ত করী
সরমের বাঁধা মানে না!
যদি মরিবারে চাই তার মুখ স্মরি,
মরণ ত নাহি আসে গো,
সে যে হেসে তারি প্রায়, উপেক্ষিয়া যায়,
ভাল মোরে নাহি বাসে গো!
কেন চাঁপার আঙুলে পরশিলি করে,
কহিলি বীণার ভাষা,
যদি জেনেছিলি মনে কঠিন পরাণে,
নাহি দিবি ভালবাসা?

* ১১৯৯ (১১২১ শকাব্দে) খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলবদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধিজীভট্ট। তিনি অনন্তেশ্বর শিবের মন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিয়া, অচ্যুতপ্রচ আচার্য্যের উপদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি উদিপি নগরে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

বল, কেন রে পশিলি স্মৃতির আগারে
জ্বালায়ে রূপের বাতি,
মোরে হৃদি-জতু-গৃহে লাগালি আগুন,
আলোকিতে তার রাতি?
হায়, বিবেক-বিদুর পড়ে বহু দূর
না দিল বারতা মোরে,
দেখি এবে সে আগুন, জ্বলিয়া দ্বিগুন,
বেড়ি চারিধার ঘোরে!
তায় সকল কামনা, সকল বাসনা,
মরণ-যাতনে কাঁদে,
তবু নিবু নিবু প্রাণে দেখিছে স্বপনে
তোরি মূরতি-ছাঁদে!

ওরে ওই দেখ্ চেয়ে, ব্যোমপথ ছেয়ে,
বিহরিছে ঘোর জ্বালা,
ঢালি নীল গগনে শোণিত বরণ,
হুতাশের ধূমে কালা!
আর দেখ্ চেয়ে নীচে, যেথা ছিল মোর
হৃদয়-নিলয়-খানি,
সেথা দাহ-অবশেষ জ্বলন্ত অঙ্গার,
ভস্ম-অবশেষ প্রাণী!
একি! গগন-বিহারী ধূম্র অনলে
তোরি মূরতি আঁকা,
নীচে, মৃত বাসনার ছাইএর মাঝার
তোরি মূরতি ঢাকা!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

কৃষ্ণ।

ঈশ্বর মানুষ হন বা মানুষ ঈশ্বর হয়, দু-ই অশ্রেদ্ধেয় কথা। অথচ অনেক শতাব্দী হইতে এই কথার পৃথিবী-ব্যাপিনী এক ঝটিকা বহিতেছে। তদ্দ্বারা কত প্রতিভা উন্মূলিত ও ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কত অসত্য ইহাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে? কত অধর্ম্ম, ধর্ম্মের পরিচ্ছদে, ইহা রক্ষা করিতে আসিয়াছে, কে তাহা চিনিতে পারে?

ঈশ্বরের এই মানবত্বের আড়ম্বর কিছু আমাদের দেশে বেশী। বালকবালিকাগণের পুতুল খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া তর্কচূড়ামণিগণের টিকীর লীলাপর্য্যন্ত ঈশ্বরের মানবত্বের চিহ্ন কে না দেখিয়াছে? ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পকাল পরেই বালকবালিকার খেলার সামগ্রী রাধাকৃষ্ণের পুতুল, প্রণয়ীযুগলের চিন্তা, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিহার; এবং বৃদ্ধের টিকীদেবী কৃষ্ণ বা রাম নামের ছাপযুক্ত বস্ত্রাবগুণ্ঠিত হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ঘাটে পথে নাট্যমন্দিরে এতাদৃশ ঈশ্বরগুলিকে সশরীরে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ ঈশ্বর যত মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ তদপেক্ষা অধিকতর মানবত্বে তাঁহাকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে!

কাহার মতে ১০, কাহার মতে ২২ বার ঈশ্বর মানুষ হইয়াছিলেন। এই সকল মানবীকৃত ঈশ্বরের লীলাস্থল ভারতের সীমার অন্তর্গত। গড়ে ১০০ বৎসর করিয়া উঁহাদের আয়ুষ্কাল ধরিলে ২২০০ বৎসর এই বিশাল পৃথিবীর অন্যত্র সকল স্থান ঈশ্বর শূন্য ছিল, বুঝিতে হয়। নৈমিষারণ্যের নিষ্কাম মস্তিষ্কতার দৌড় এখানে গিয়াও থামে নাই। ভারতবর্ষীয় মৎস্য, পশু পক্ষী গুলিও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ঈশ্ব-

রের এই মানবত্বে অথবা মৎস্য পশু ও মানবের ঈশ্বরত্বে পৃথিবী বোধ হয় একদিন উৎসন্ন যাইবে। কে বলে অন্যবিধ প্রলয় আছে? এই ত ভয়ঙ্কর প্রলয়!

সম্প্রতি বঙ্গদেশে এই প্রলয়ের যে নূতন সূচনা উঠিয়াছে, স্কুলের ছাত্র ও অন্দরমহলের কুলবধূ যে তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে, তাহার মূলে দুই কবি-প্রতিভা। যে কবি-প্রতিভা "কৃষ্ণচরিত", যে কবি-প্রতিভা "কুরুক্ষেত্র" প্রসব করিয়াছে, সম্প্রতি ঈশ্বরের মানবত্ব বা মানবের ঈশ্বরত্ব প্রচারের কারণ তাহাই। কবি-প্রতিভা কারণ বলিয়া আমাদের আশঙ্কা অধিক। কেননা, ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও বিজ্ঞান অপেক্ষা কল্পনা ও কবিত্ব কার্য্য করে অধিক।

কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমণিকায় বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন;—

"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"

ঐ উপক্রণিকার স্থানান্তরে,—

"আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলিনা। এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচনা করিব।"

আবার পুস্তক সমাপন কালে বলিতেছেন;—

"যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্য মাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন,— "The wiset and greatest of the Hindus." আর যিনি দেখিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্নচ।
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায়তে পরং॥

সুতরাং বঙ্কিমবাবুর প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বরের মানবত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে ভক্তবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য একটি সংস্কৃত বচন তুলিয়া উভয় কুল রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বাঙ্কিমিক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যাবতার মানেন না। কৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বমত যাহাই হউক, শেষ জীবনে তিনি কৃষ্ণকে একমাত্র ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবতার কথা আধুনিক পাঠকের গ্রাহ্য হয় কিনা, সন্দেহ করিয়া, তৎস্থলে আদর্শ মানুষ কথার ব্যবহার করিয়াছেন; সুবুদ্ধি পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, বঙ্কিম বাবুর ভিতরের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে ঈশকৃষ্ণরূপে পরিণত করা। ঈশকৃষ্ণ (Jesus Christ) ভারতবর্ষে একমাত্র ত্রাণ কর্ত্তা হইবার যেরূপ উদ্যোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি-ঈশকৃষ্ণ স্থাপন করার মানসেই বঙ্কিম বাবু পুনর্জ্জন্ম-শূন্য ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্কিম বাবুর গীতাপাঠ নূতন নিয়মের চক্ষেই হইয়াছিল, বোধ করিলে অসঙ্গত হয় না।

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ, কল্পনার আর এক গ্রামে উঠিয়াছেন। নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর শিষ্য; সুতরাং তাঁহার কৃষ্ণও বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণের ন্যায় মূলতঃ মানব। তবে বিভিন্নতা এই, বঙ্কিম বাবু এই কল্পিত মানবের গাত্র হইতে যে যে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছেন (Spurious gospels ফেলিয়া দিয়া যেরূপ ঈশকৃষ্ণের চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে), নবীনচন্দ্র কবিত্বের উদ্দেশ্যে সে সকল অলঙ্কার তাঁহার গাত্রেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা ভাবেন, নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ ভিন্ন-প্রকৃতিক, অর্থাৎ ভাগবতের কৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণের নিজের কথাই তুলিয়াছি। আবার এস্থলেও তুলিলাম—

"নমিব মানব আমি চরণে কাহার?"
কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ, ১২৭ পৃঃ

সুতরাং নবীন বাবু এ কৃষ্ণের মানবত্ব

ভুলেন নাই। তবে এই মানবকে আবার ঈশ্বর করিবার জন্য তাঁহার একটা উল্টা যত্ন হইয়াছে। মহাভারতের অবতার কৃষ্ণকে যেরূপ চেষ্টা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানব করিয়া তুলিয়াছেন, নবীনচন্দ্র আবার সেই মানবকে ঈশ্বর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিপরীত পরিশ্রমের মধ্যে যে কোন কাব্যোচিত নূতন কল্পনা আছে, তাহা নহে; তবে এই উদ্দেশ্য ভীষ্মের দ্বারা সাধন করা বিধেয় মনে করিয়া সেই লোক-বিশ্রুত পবিত্র চরিত্রকে পাপী, তাপী ও নারকী করায় নবীন বাবুর নূতন কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি।

ভীষ্ম কৃষ্ণের মুখে স্বীয় মানবত্বের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিতেছেন;—

"মানব!—মানব তুমি!—তুমিও মানব!
দেবতার ঊর্দ্ধে তবে মানবের স্থান।
রবি শশী, বালুকণা! পারাবার কূপ!
বল্মীকের স্তূপ তবে গিরি হিমবান্‌।"

কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ, ১৪১।১৪২ পৃঃ

রবি শশী, কি বালুকণা হইতে পারে? পারাবার কি কূপ হইতে পারে? হিমবান-গিরি কি বল্মীকের স্তূপ হইতে পারে? সেইরূপ কৃষ্ণ, তুমিও কি মানব হইতে পার?

ভীষ্মের ঈদৃশ বাক্যে কৃষ্ণের ঈশ্বর হওয়ার যে সোপান প্রস্তুত হইল, চতুর কৃষ্ণ অবিলম্বে তাহাতে পদক্ষেপ করিলেন;—

"কর্ম্ম,—যাগযজ্ঞ! জ্ঞান, সংসার বর্জ্জন!
বৈদিক ধর্ম্মের এই ঘোর পরিণাম!
কত দিন আর্য্যজাতি রহিবে জীবিত.
নিরন্তর করি এই মহাবিষ পান?
যেই ধর্ম্মামৃত পানে পাবে মোক্ষ নর,
না পাইল এক বিন্দু সেই শান্তি জল;
আমার জীবনব্রত চলিল ভাসিয়া,
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
হইল না; হইল না ধর্ম্মের স্থাপন।
পড়িলাম ঘূর্ণাবর্ত্তে; দেখিলাম হায়!
এক দিকে অধর্ম্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
অন্যদিকে ধর্ম্ম রাজ্য জ্যোতি নিরমল,—
হইল জীবনে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত সঞ্চার!
সে আশায়, নিরাশায় আলোকে আঁধারে,
করিল কি চিন্তাতীত শক্তির অধীন!
কহিনু অর্জ্জুনে সেই ধর্ম্ম সনাতন,
হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ, বিলীন।
গায়ক সে নারায়ণ; এই গীতা তাঁর;
আমিও মহর্ষি মাত্র নিমিত্ত ইহার।"

কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ, ১৪১, ১৪২ পৃঃ

এস্থলে গীতার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব প্রকারান্তে স্বীকার করিয়া, কৃষ্ণ মহম্মদের ন্যায় উত্তর করিলেন, বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম শোচনীয়; এজন্য নারায়ণ (ঈশ্বর) আমার মুখ দিয়া সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত দমনের জন্য গীতা বলাইয়া দিয়াছেন। আমি ইহার নিমিত্ত মাত্র, নারায়ণই গায়ক।

বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ যেমন যীশু খ্রীষ্ট (Jesus Christ,) নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ তেমন মহম্মদ!

কি কবিত্ব! সত্য নয়, অথচ সত্য! হিন্দুধর্ম্ম নয়, অথচ হিন্দুধর্ম্ম! জলাশয় নয় অথচ জলাশয়।—মরীচিকা! মরীরিকা!! মরীচিকা!!!

তবে কৃষ্ণ কে?

কৃষ্ণ কে, এ কথা বুঝিবার পূর্ব্বে অবতারবাদ বুঝিতে হয় এবং অবতারবাদের সময় স্থির করিতে হয়। ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ করিয়া, মানুষের সুখদুঃখ ভোগ করিয়া, আহার বিহার করিয়া, লোকের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া, গাহিয়া নাচিয়া বেড়াইবার কথা কোথা হইতে উঠিল, একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়।

বঙ্কিম বাবুর নিজের কথাই—রমেশচন্দ্র দেশের "মুখ-উজ্জ্বল-কারক"। এই রমেশচন্দ্র অবতারবাদ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুন —

"The very idea of divine incarnation is modern, and was unkown to Vedic Hinduism or even to Manu. Vedic gods are described as descending to earth and sharing libations offered to them, and departed spirits and manes are similarly described as sharing the offerings made to them. But the

idea of a deity being born as man, and living among men, like Rama and Krishna, belongs to modern Hinduism. It is impossible not to suspect that the idea is borrowed from the Jataka stories of the Budhists."
Mr Dutt's Ancient India, page 651.

ইহার মর্ম্ম এই যে—

"ঈশ্বরের মানবত্ব বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে নাই, এমন কি, মনুর সময়েও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল না। বৈদিক দেবগণ (ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র ইত্যাদি) যজ্ঞে আসিয়া হুত দ্রব্য গ্রহণ করিতেন এবং কখন কখন পিতৃগণ আসিয়া তাহার ভাগ লইতেন। দেবতার মানব জন্ম গ্রহণ এবং মনুষ্য সমাজে বসতি (যথা রাম ও কৃষ্ণের) আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত; বৌদ্ধগণের জাতক গল্প হইতে যে এতাদৃশ গল্প গৃহীত হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব।"

মনুর সময়, রমেশ বাবুর মতে, ঈশকৃষ্ণ জন্মিবার এক শতাব্দী পূর্ব্বে বা পরে। তাহা হইলে দেখা যায়, ঈশকৃষ্ণ জন্মিবার সময়েও এদেশে অবতারবাদের কোন কথা ছিল না। ঈশ্বর মানুষ হন, একথা হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতিগত ঘটনাই উপলব্ধি করিতেন; মানুষকে ঈশ্বর করিয়া পূজা করিবার প্রয়োজন-বোধ তখনও হয় নাই।

এই মহান্ সূর্য্য যে শক্তির বিকাশ, এই বিস্ময়জনক ও ভয়াবহ রুদ্র যে শক্তির কোপের চিহ্ন, এই অগ্নির দাহিকা শক্তি যাঁহার, সেই সর্ব্বকারণ কারণে পবিত্র বিশ্বাস দ্বারা যাঁহারা অভিভূত, তাঁহারা মানুষকে ঈশ্বর করিবে কেন? বা ঈশ্বরই মানুষ হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিবে কেন?

কেবল হিন্দু নয়। ঈশকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে জগতে কোথাও ঈশ্বরের মানবত্বে বিশ্বাস দেখা যায় না। ইহুদিদিগের আদম, নোহ, এব্রাহম ও মোশেস্, কেহই মানবীকৃত ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর তাঁহাদের সহিত প্রয়োজন মত দেখা দিতেন, উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার কথানুসারে চলিলে বংশ বৃদ্ধি ও রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাদের কেহই ঈশ্বরের সিংহাসন শূন্য করিয়া ভূতলে সশরীরে ঈশ্বর হইয়া অবতীর্ণ হয়েন নাই। তবে ঈশ্বরের মানব হওয়ার কথা কোথা হইতে উঠিল?

আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের সময়ে, এদেশে অবতারবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরের মানবত্বে লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

বিভক্তাত্মা বিভুস্তমামেকঃ কুক্ষিস্বনেকধা
উবাস প্রতিমাচন্দ্রঃ প্রসন্নানামপামিব।
রঘু, ১ম সর্গ, ৬৫ পৃঃ

অর্থ—সেই অদ্বিতীয় বিভু অনেকাংশে বিভক্ত হইয়া নির্ম্মল জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাদিগের (কৌশল্যাদির) গর্ব্ভে বাস করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কালিদাসে আরও উল্লেখ আছে।

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ
পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ সজায়াং
রামাভিধানো হরি রিত্যুবাচ॥
রঘু, ১৩শ সর্গ।

অর্থ।—রামাভিধান হরি বিমানের দ্বারায় আকাশে গমন করিতে করিতে, সমুদ্র অবলোকন করিয়া, জায়াকে ইহা বলিতে লাগিলেন।

সুতরাং কালিদাসের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে এবং মনুর তিরোভাবের পরে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় প্রথম পঞ্চ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে অবতারবাদ অন্দোলিত, আলোচিত ও স্বীকৃত হয়। আবার এই সময়েই ইহুদী ভূমে ঈশকৃষ্ণ (Jesus Christ) ঈশ্বরপুত্র বলিয়া লোকের বিশ্বাসরাজ্য অধিকার করেন।

এখন প্রশ্ন এই, এসময়ে ঈশ্বরের মানব হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হইল কেন? জগতের ইতিহাসে ইতঃপূর্ব্বে কোথাও ঈশ্বরকে মানব করা হয় নাই, এখন করা হয় কেন?

এই কথার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা

যায় যে, এসিয়াখণ্ডে ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। ইহাই সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রসারণ সম্বন্ধীয় আন্দোলন। বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যনীতি, রাজনীতির সহায়তা পাইয়া জগতে অতুল্য কীর্ত্তি করিতে বসিয়াছে। অবহেলিত, পদ-দলিত, তিরস্কৃত ও বহিস্কৃত কোটি কোটি লোক আজ"মনুষ্যমনুষ্যের সমান' এই কথা ঘোষণা করিতেছে এবং জগৎ সত্য-ধর্ম্মের নব ও নির্ম্মল জ্যোতিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। এই সত্যধর্ম্মরূপ ভাস্কর কেবল ভারতে নহে,চীনে,গ্রীসে, তির্ব্বতে, সুরিয়ায় প্রকাশমান হইয়াছে। লোকের উৎসাহের সীমা নাই,আনন্দের সীমা নাই। মানব মানব, সকলেই মানব,সকলেরই ধর্ম্মে কর্ম্মে সমানাধিকার, একথা ঘোষিত হইতেছে, রাজশক্তি ইহা প্রচার করিতেছে।

এই সাম্যনীতি প্রচারের কর্ত্তা কি মানব? এই পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের মূল কারণ কি মানব হইতে উদ্ভূত? শাক্যসিংহ কি বাস্তবই মানব ছিলেন? মানবের কি ইহা সাধ্য? ইহাই এই সময়ের প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে? যে সকল ধর্ম্মযাজক পূর্ব্বে বৌদ্ধ-নীতিকে ঘৃণা ও নিন্দা করিতেন, তাঁহাদের ঘৃণা ও নিন্দা করিবার সময় অতীত হইয়াছে। তাঁহারা বাস্তবিকই এক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুদ্ধদেবে লোকাতীত শক্তি বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধচরিত্র দেবচরিত্র হইতে কম নহে। রুদ্রে ও ইন্দ্রে, বজ্রে ও মেঘে যে দেবচরিত্রের আরোপ, তাহা কি শাক্যসিংহের সর্ব্বসংহারিণী ও প্রীতিশালিনী ধর্ম্মনীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ? ইন্দ্রের বর্ষণ কত উপকারী? রুদ্রের বজ্রাঘাত কত সংহারকারী? ব্রাহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য কোথায়? বৌদ্ধচরিত্রের নিকট সকলই পরাভূত। বুদ্ধই দেবচরিত্র; মানব দেহেও ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। সুতরাং বুদ্ধদেবই অবতারবাদের মূল কারণ। যদি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে সে ঐতিহাসিক ব্যক্তি শাক্যসিংহ। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য অবতার শাক্যসিংহের চরিত্রের ছায়ায় কল্পিত। সম্ভবতঃ ঈশকৃষ্ণের চরিত্রও এই শাক্যসিংহের চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। কৃষ্ণচরিত্রও কবিকল্পনা, ঈশকৃষ্ণচরিত্রও কবিকল্পনা; তবে এতদুভয়ের মৌলিকাবলম্বন বৌদ্ধচরিত্র, ইহাই আমাদের বলার উদ্দেশ্য। *

শ্রীমধুসূদন সরকার।

* কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা লইয়া বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, মহোদয়ের সহিত আমাদের কিছু মতভেদ রহিয়াছে। "কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত"" প্রবন্ধে (সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা) তিনি কতকগুলি পত্র প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, "কুরুক্ষেত্রের" মৌলিকতত্ত্ব সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী নহেন। আমরা ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে একথার উত্তর দিয়া লিখিয়াছিলাম—"কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে "কুরুক্ষেত্রে" যে ভ্রমের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহি। ভিতরের কথা যাহাই হউক, বাহিরের কথা লইয়াই জগৎ বিচার করিবে; বাহিরে প্রকাশ, বঙ্কিম বাবুই কৃষ্ণচরিত্র আন্দোলনের মূল। কুরুক্ষেত্র যখন বঙ্কিম বাবুর পুস্তক প্রকাশের পরে বাহির হইয়াছে, তখন ইতিহাস বলিবেই, নবীন বাবু মূলমন্ত্রে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী। বঙ্কিম বাবুর এ সম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে, তাহা প্রকাশিত না হইলে, একথা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।" দুঃখের বিষয়, বঙ্কিম বাবু এ সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত না করিয়াই স্বর্গারোহণ করেন। আমাদের মতে সুতরাং এ বিষয়টী অমীমাংসিতই রহিয়াছে। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসের সাহিত্যের ১৭৯ পৃষ্ঠার হীরেন্দ্র বাবু সাহিত্যের উক্ত প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন—"বাঙ্গালী পাঠক এখন অবগত হইয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনা ও কবিত্ব উভয়ই কবির নিজস্ব, তাহার জন্য কাহারও কাছে তিনি

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৪)

গো-বসন্তের লক্ষণ

এন্থ্রাক্‌স্ রোগ প্রায় সকল জন্তুকে (এমন কি মনুষ্যকেও) আক্রমণ করে, একথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই রোগ দ্বারা গো-ধন যে পরিমাণে নষ্ট হয়, তাহার সহিত কৃষিকার্য্যের অন্য কোন ক্ষতির তুলনাই হয় না। একারণ কি কি লক্ষণ দ্বারা গো-জাতির এই রোগ হইয়াছে, ইহা স্থির করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে এই প্রবন্ধে বিশেষরূপ বর্ণনা করা যাইবে। বস্তুতঃ এই রোগ দ্বারা ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তু বিনষ্ট হয়,একথা কৃষক ও গোপ-গণ বিলক্ষণ জানিয়াও ইহাকে উহারা গো-বসন্ত নামেই অভিহিত করে। অন্য সকল জন্তুর মৃত্যুর দ্বারা তাহাদিগের যে ক্ষতি হয়, উহারা তাহা গণনার মধ্যেই আনে না।

এই রোগ দ্বারা যে কোন গরু আক্রান্ত হয়, তাহার ক্ষুধা এককালীন তিরোহিত হয়, সে প্রায় দণ্ডায়মান অথবা শায়িত ভাবে এক অবস্থাতেই থাকে, অস্থির ভাবে এ দিক্ ওদিক্ দৃষ্টি করিতে থাকে ও রোমন্থন পরি-ত্যাগ করে। উহার গাত্র রোমগুলি দাঁড়া-ইয়া উঠে, সর্ব্বশরীর 'আড়ষ্ট' অর্থাৎ ব্যথা-যুক্ত হইয়া আছে,এরূপ ভাব প্রকাশ করে। যদি উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়,পাল হইতে পৃথক্ থাকিয়া ম্লান ও অন্যমনস্ক ভাবে, কখন বা ধীরে ধীরে বিচরণ, কিন্তু প্রায় একই স্থানে চঞ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, পরে মল তরল, পিচ্ছিল ও শোণিত মিশ্রিত হয়। যদি দুই দিবসের মধ্যেই গরুটী মরিয়া যায়, তবে কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থাতেই মরে, কিন্তু মরিবার সময় মলদ্বার ও নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত হয়। যদি দুই দিবসের অধিক বাঁচিয়া থাকে, তবে উহার আমাশয় পীড়া, অর্থাৎ তরল ও পিচ্ছিল মলের সহিত শোণিত নির্গ-মনই প্রধান লক্ষণ হইয়া উঠে। গো-বসন্ত রোগাক্রান্ত হইলে সকল জন্তুরই প্রথমাবধি জ্বর হইয়া থাকে। গাত্র স্পর্শ করিয়া উষ্ণতা অনুভব করা নাও যাইতে পারে, এমন কি গাত্র অস্বাভাবিকরূপে শীতল, কখন কখন এরূপও মনে হইতে পারে; কিন্তু মলদ্বার মধ্যে তাপমান যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিয়া ৩।৪ মিনিট কাল রাখিয়া দিলে তাপবৃদ্ধি স্পষ্টই বুঝা যাইবে। স্বভাবতঃ গরুর শরীরাভ্যন্তরের তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্। গো-বসন্ত হইলে তাপ ১০৪°। ১০৫° হইতে দেখা যায়। মুখের মধ্য হইতে ফেন নির্গমন, চক্ষু আরক্ত এবং উহা হইতে প্রথম অবস্থায় তরল জল এবং ক্রমশঃ পিচ্ছিল ক্লেদ নির্গমনও এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। সমস্ত শরীর বিশে-ষতঃ পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠা, পৃষ্ঠের উপর ভর দিলে আর্ত্তস্বর করা, শ্বাস ঘন ঘন নির্গত হওয়া, পিপাসার বৃদ্ধি অর্থাৎ জলীয় পদার্থ সম্মুখে ধরিলে পান করিবার জন্য ঔৎসুক্য, মুখের মধ্যে ঘা হওয়া, জিহ্বা নিতান্ত অপরিষ্কার থাকা, মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হওয়া, এবং শেষে ছট্ ফট্ করিতে করিতে

ঋণ গ্রহণ করেন নাই।" নব্যভারতের উপরোক্ত কথাগুলি পাঠ করিলে হীরেন্দ্র বাবু কখনও এরূপ কথা লিখি-তেন না,বোধ করি। "বাঙ্গালী পাঠক" উভয় পক্ষের কথাই অবগত হইয়াছেন। এখন তাঁহারাই এ কথার বিচার করুন। উকীলদিগের ইচ্ছানুসারে কথাটা এক তরফা ডিক্রি বা ডিসমিস না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। ন, স।

মরিয়া যাওয়া, এই সকল লক্ষণও প্রায় দেখা যায়। সকল লক্ষণের মধ্যে চক্ষু ও মুখ হইতে তরল পদার্থ নির্গমন, জ্বর ও মলদ্বার দিয়া শোণিত নির্গমন এই তিনটী, এই রোগের স্থির লক্ষণ। কোন স্থানে বিশেষ কারণ বিনা যদি কতকগুলি গরু মরিয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় মলদ্বার দিয়া শোণিত নির্গত হয়, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, গরুগুলি এন্থ্রাক্স্ অর্থাৎ গো-বসন্ত রোগে মরিয়াছে। আর সকল লক্ষণ ঠিক্ করা সহজ না হইতে পারে, অথবা উহারা নাও দেখা যাইতে পারে।

গো-বসন্ত রোগে গরু যদি দুই তিন দিবসের মধ্যেই মরিয়া না যায়,তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ নিম্ন নির্দ্দিষ্ট দুইয়ের একটী ভাব ধারণ করে। (১)বাহ্য স্ফোটক যুক্ত ভাব (charbon with external eruptions) এবং (২)আমাশয় যুক্ত ভাব (abdominal charbon) অথবা (enteric charbon)। কখন কখন দুইটী ভাবের একত্রাবস্থানও দৃষ্ট হয়। বাহ্যস্ফোটক গাত্রে দেখা যাইলে,ব্যাধি আরোগ্য হওয়া এক প্রকার স্থির। আমাশয় লক্ষণ দেখা যাইলেও স্ফোটক ব্যাধি আরোগ্যের নিদর্শন বলিয়া লওয়া উচিত। স্ফোটক বাহির হইলে গরুটীকে যত্ন করিয়া পান আহার দিলে ও গৃহ মধ্যে পরিষ্কার অবস্থায় রাখিলে, উহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, এরূপ মনে করা উচিত। পীড়া আরম্ভ হইবার আট দিবস পরেই প্রায় স্ফোটক বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু গো-বসন্ত হইলে এই স্ফোটক যে প্রায়ই বাহির হয়,এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। গো-বসন্তের “বসন্ত চিহ্ন” শতকরা একটী গরুরও দেখা যায় না; অথচ শতকরা প্রায় ২০টী গরু গো-বসন্ত হইয়াও বাঁচিয়া যায়। এজন্য বসন্ত চিহ্ন দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার নাই। যে গরুটার বসন্ত চিহ্ন দেখা যায়, সেটা যে বাঁচিয়া যায়, ইহা কৃষক ও গোপগণ জানে, কিন্তু তাহারা ইহাও জানে যে, আমাশয় লক্ষণ যুক্ত হইয়া যদি গরুটা ৯।১০ দিবস বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে যত্ন করিলে উহাও বাঁচিয়া যায়। গো-বসন্ত পালের মধ্যে উপস্থিত হইলে, পালরক্ষক প্রায়ই জন্তুদিগকে অযত্নে ফেলিয়া রাখে। এরূপ করাতে যে গুলি বাঁচিবার, সে গুলিও কাশ রোগে অথবা মুখে বা গাত্রের অন্য কোন স্থানে পচনশীল ঘা (Gangrene) হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ এদেশে শীত কালেই প্রায় হইয়া থাকে। এই কালে শীতল, সিক্ত, অনাবৃত ও ময়লা স্থানে জন্তুদিগকে রাখিয়া পিপাসা নিবারণের জন্য কেবল মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে শীতল জল পান করিতে দিলে, জন্তুগুলি স্বতঃই শীর্ণ ও কাশযুক্ত হইয়া অথবা ক্ষত স্থানে পচনশীল ঘা জন্মিয়া গিয়া, অনেক দিবস বাঁচিয়াও শেষে মরিয়া যায়। এরূপ মৃত্যুকে ঠিক গো-বসন্তের মৃত্যু বলা যায় না। গো-বসন্ত হইয়া ১৫।২০ অথবা ৩০ দিবস পরে যদি জন্তুটী জীর্ণ, শীর্ণ, ও ঘাযুক্ত হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে উহার শোণিত মধ্যে গো-বসন্তের ব্যাসিলাই দেখা যায় না। ক্ষত স্থান হইতে পুঁজ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে কেবল কতকগুলি মাইক্রোককাস্ ও ডিপ্লোককাস্ (যুগ্ম-মাইক্রোককাস্) দেখা যায়; ব্যাসিলাসের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ এরূপ অধিক কাল পরে জন্তুটি মরিয়াগেলে, গো-বসন্ত হইতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইয়া অন্য রোগ হইয়া জন্তুটি মারা গেল, ইহাই স্থির করা উচিত। এরূপ মৃত্যু কেবল অযত্ন-সম্ভূত।

একারণ কাশ ও পচনশীল ঘা, গো-বসন্তের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। বাহ্য স্ফোটক নির্গত হইয়া যে জন্তুটী বাঁচিয়া যায়, তাহার মলদ্বার দিয়া আদৌ শোণিত নির্গত না হইতে পারে। এরূপ স্থলে গো-বসন্তের যে তিনটী স্থির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যেটী প্রধান, সেটীর অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু স্ফোটকযুক্ত গো-বসন্ত দ্বারা জন্তুর কোন ক্ষতি হয় না এবং স্ফোটকযুক্ত গো-বসন্ত নিতান্ত বিরল বলিয়া, গো-বসন্তের এই লক্ষণটী দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করা ঠিক। ইহাই মারাত্মক গো-বসন্তের মুখ্য লক্ষণ (Diagnostic symptom)। দুইতিন দিবসের মধ্যে জন্তু গুলি মরিয়া গেলে,যে শোণিত মলদ্বার এবং নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়, তাহা তরল শোণিত। কয়েক দিবস পরে যদি গো-বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত জন্তু মরিয়া যায়,তবে নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত হইতেও পারে,না হইতেও পারে,কিন্তু মৃত্যু কালে মলদ্বার হইতে শোণিত নির্গত হইতেই হইবে। এই শোণিত পিচ্ছিল অর্থাৎ আমের সহিত মিশ্রিত থাকে। ঘোড়ার প্রথম অবস্থাগত এন্থ্রাকস্(অর্থাৎ বাহ্য স্ফোটক যুক্ত এন্থ্রাকস্) কিছু অধিক হয়, এবং মৃত্যু-কালে নাসিকারন্ধ্র দিয়া শোণিত নির্গমন প্রায় অবশ্যম্ভাবী। গরু অপেক্ষা ঘোড়া এই রোগাক্রান্ত হইয়া অধিক মরিয়া যায়, অর্থাৎ প্রায় এক দিবসের মধ্যেই মরিয়া যায়। তবে স্ফোটক বাহির হইলে উহা প্রায় বাঁচিয়া যায়। এই স্ফোটক গুলি লোল চর্ম্মের অভ্যন্তরে সুপারির আকারের বলিয়া স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল স্ফোটক স্থানেই ঘা হইয়া ঘা পচনশীল (Gangrenous)ভাবধারণ করিয়া রক্তকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে। একারণ স্ফোটক বাহির হইলেই একবারে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। স্ফোটক গুলি ফাটিয়া গিয়া যদি ঘা হয়,তবে ঐ ঘা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। তবে এইরূপ স্ফোটক গরু অপেক্ষা ঘোড়াতেই অধিক দেখা যায় এবং স্ফোটক গরুর পক্ষে যত শুভ লক্ষণ, ঘোড়ার পক্ষে তত শুভ লক্ষণ নহে। গো-জাতি নিজ নিজ ও পরস্পরের গাত্র পরিলেহন দ্বারা ক্ষত স্থান পরিষ্কার রাখে বলিয়াই বোধ হয় ক্ষত স্থান পচিয়া উঠিবার সুবিধা পায় না। বহরমপুরে গত-বৎসরে একটী গরু গো-বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শেষে দুই মাস পরে হাঁটুর ঘায়ে মরিয়া যায়। ইহাও গৌণভাবে গো-বসন্ত-ঘটিত মৃত্যু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পর প্রবন্ধে গো-বসন্তের ব্যবচ্ছেদ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রজাপতি।

১

মৃদু বায়ু ভরে কিবা হেলিয়া দুলিয়া,
ক্ষুদ্র প্রজাপতি ওই চলিছে উড়িয়া।
তরুণ অরুণ-করে,
হেম অঙ্গ শোভা করে,
নব ইন্দ্রচাপ-রঙ্গে তনুয়া মাখিয়া,
ক্ষুদ্র প্রজাপতি ওই চলিছে উড়িয়া।

২

মের'না মের'না ওকে দিওনা যাতনা,
অনন্তের সাথী ওই, অপার বাসনা!

যেই মহাপ্রাণার্ণব-
বিশ্ব মাত্র এই ভব
তাহারি কণিকা এক, কখনো ভুলনা,
ক্ষুদ্র প্রজাপতি ওই, দিওনা যাতনা।

৩

স্বর্গসিংহাসনে বসি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর,
দেখিছেন লীলা তাঁর ধরার উপর,
এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি,
তাঁহারি মঙ্গলারতি
করিতেছে, করি স্বর্ণপক্ষ সঞ্চালন,
যাঁহার আরতি গায় অনন্ত গগন।

৪

যে প্রাণসমুদ্র হ'তে হয়ে বাষ্পাকার,
উঠিয়াছে মেঘরূপী এবিশ্ব সংসার,
এ প্রপঞ্চ ভেঙ্গে যাবে,
জলে জল মিশাইবে,
তুমি আমি প্রজাপতি হয়ে একাকার,
সে মহাসাগর গর্ভে লুকাব আবার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিকৃতি।

বিশাল এ পৃথিবী অঙ্কিত
ক্ষুদ্র এক মানচিত্র মাঝে।
ক্ষুদ্র এক দর্পণ ভিতরে
গ্রহেশ্বর আদিত্য বিরাজে।
এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য অসীম,
ক্ষুদ্র এক বালিকার মুখে!
অনন্ত সে প্রেমিকের প্রেম-অভিধান
ক্ষুদ্র এক বালিকার বুকে!

রত্নাবলী।

ঝিল্লি-মন্ত্র মুখরিত কাননের তল,
কুসুম সুরভি-স্নিগ্ধ সুমন্দ বাতাস।
প্রফুল্ল হীরকপদ্ম নক্ষত্রের হাস
সুনীল অম্বর সরে, স্বচ্ছ, সুবিমল
প্রতিবিম্ব তার বাপীজলে; সহকারে
শত পাশে জড়ায়ে মাধবী, তার তলে
সৌন্দর্য্য স্বপন সম লতাফাঁস গলে—
সাগরিকা রূপে রত্নাবলী,—সঁপিয়াছ
প্রাণ যারে, বিনা তারে মরণ মঙ্গল!—
এই সে কৌশাম্বী আর কোথায় সিংহল—
সে যে দূর অতীতের স্মৃতির আগার!
চমকি উঠিছ কেন পদ শব্দে কার—
সাধনের ধন এ যে!—লাজ বৃথা, বালা,
তব উদয়ন ল'য়ে প্রীতির সম্ভার!

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

সেক্ষপীয়রের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

৩০শ সংখ্যা।

নীরবে নির্জ্জনে যবে স্মরি পূর্ব্বকথা,
আকাঙ্খিত ছিল যাহা বিগত জীবনে
তাহার অভাব লাগি পাই বড় ব্যথা;
নব অশ্রু সিক্ত করি দুঃখ পুরাতনে।
বহে বারি অনভ্যস্ত নয়নে তখন
চির-লুকায়িত মৃত্যু-অনন্ত-আঁধারে
প্রিয়জন লাগি; কাঁদি করিয়া স্মরণ
গত শোক; দেয় ব্যথা জাগিয়া অন্তরে,
কত চিত্র,—লুপ্ত যাহা কালের প্রভাবে;
অতীত কষ্টের করি নব আলোচনা,
পুরাতন শোকগাথা গাহি নবভাবে
যেন কভু পাই নাই সে সব যাতনা!
কিন্তু সখে, সেই কালে স্মরিলে তোমায়,
সব শোক ভুলি, সব দুঃখ দূরে যায়।

শ্রীবিহারীলাল গুহ।

সনা করিলে অজ্ঞানতা লয় হইয়া জ্ঞানের উদয় হয়; জ্ঞান হইলেই মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়; অজ্ঞান অর্থাৎ শূদ্রাবস্থা হইতে জ্ঞানাবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার এক মাত্র উপায় ঐ সকল কার্য্য করা। সুতরাং যাহারা অজ্ঞান অর্থাৎ শূদ্র, তাহাদেরই ঐ সকল কার্য্যে পূর্ণ অধিকার। যাঁহার জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি হইয়াছে,—যিনি ব্রাহ্মণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐ সকল কার্য্য করিবার কোন আবশ্যক নাই। কেননা, অন্ধকার গৃহেই আলোকের আবশ্যক, ক্ষুধার্ত্তের আহারের প্রয়োজন; আলোকিত গৃহে আলোকের, পূর্ণোদরের আহারের কোন আবশ্যক নাই। সুতরাং বেদাদিশাস্ত্র পাঠ, ওঁঙ্কারাদি মন্ত্রজপ করা ইত্যাদি অজ্ঞানীর পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে কিছুই আবশ্যক নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের কোন কার্য্যই নাই, তাঁহারা নিত্যমুক্ত; তাঁহাতে ও ব্রহ্মেতে অভেদ। বেদশাস্ত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে "কো ব্রাহ্মণঃ?" "ব্রহ্মবিদ্ স এব ব্রাহ্মণঃ।" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মঃ ভবতি।" যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়েন। এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির বেদ শাস্ত্রাদি পাঠ ও ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিবার আর আবশ্যক নাই; যে জন্য ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা তাঁহার হইয়াছে। যে জীব ব্রহ্মকে জানেন না, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইবার জন্য অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তি লাভের জন্য বেদাদিশাস্ত্র পাঠ ও ওঙ্কারাদি মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং শূদ্রের অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকের ঐ সকল কার্য্যের আবশ্যক।

শাস্ত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে;—"জন্মনা যায়তে শূদ্রঃ। সংস্কারা দ্বিজ উচ্যতে॥ বেদ পাঠাৎভবেদ্বিপ্রঃ; ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ জীবের যখন জন্ম হয় (কি স্ত্রী কি পুরুষ) তখন তাহাকে শূদ্র সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যখন জীবের সংস্কার অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন তাহাকে দ্বিজ কহে। সেই জীব যখন বেদ পাঠ করে, তখন তাহাকে বিপ্র, এবং যখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, যখন সবই ব্রহ্মময় দেখে, তখন তাহাকে ব্রাহ্মণ কহে। ব্রহ্ম হইতে অভেদ, এই জন্য ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ যেরূপ লেখা আছে, আজ কাল সেরূপ ব্রাহ্মণ পৃথিবী মধ্যে একজনও পাওয়া দুঃসাধ্য। কারণ ঐরূপ ব্রাহ্মণ একজন হইলে পৃথিবীর ভার বিমোচন হয়, জগতের মঙ্গল হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কেবল সামাজিক নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্ট গুণঃ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহা হইলেই প্রমাণ হইতেছে যে, সমাজ স্থাপনের জন্য গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া জাতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ কিছুই নহে। আর অধিকারী অনধিকারী নাই। সকল কার্য্যে সকল মন্ত্রে সকলের সমান অধিকার, সন্দেহ নাই। তবে যে যাহা পারিবে, সে তাহা করিবে। যে যে কার্য্যে সক্ষম, সে সেই কার্য্যে অধিকারী, যে যে কার্য্যে অক্ষম সে সেই কার্য্যে অনধিকারী। ব্রহ্মবিদ্ মুনি ঋষিগণ কখন বলেন নাই ও বলিবেন না যে, একজন ভগবানের উপাসনা করুক, আর একজন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ (এক্ষণকার) ব্রাহ্মণে

আমাকে পূজা করুক, বেদপাঠ করুক, অপরে শূদ্রে করিতে পারিবে না। ইহা ভগবানের বাক্য নহে; এ সকল কথা কেবল অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন স্বার্থপর ব্যক্তিগণের, সন্দেহ নাই। জীব মাত্রেই, কি স্ত্রী কি পুরুষ, শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মের অংশ ও স্বরূপ, গীতাদি শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। ফল স্বরূপ পক্ষে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নহেন। স্বরূপপক্ষে সবই আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। সকলেরই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবার অধিকার আছে।

পাঠকগণ, এস্থলে গম্ভীর ও শান্তভাবে সারভাব গ্রহণ করিবেন। পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, এই কথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব, সূর্য্যপুরাণে সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব, গণেশপুরাণে গণেশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং দেবী পুরাণে দেবীমাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এস্থানে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, যদি এই সকল পুরাণ এক জনের রচনা হইত, তাহা হইলে পরস্পর গ্রন্থে এত অনৈক্য ও বিরোধ দৃষ্ট হইত না। শিবপুরাণে ব্যাস বলিতেছেন যে, শিবই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলকারণ—তাঁহা হইতেই অন্যান্য দেবতা হইয়াছে; আবার সেই ব্যাসদেবই বিষ্ণুপুরাণে বলিতেছেন যে, বিষ্ণুই জগৎপ্রসূ—তিনিই সৃষ্টি স্থিত্যাদির মূল কারণ; এইরূপ প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সৃষ্টি স্থিত্যাদির কারণ অন্যান্য দেবদেবীর আদি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না। একজন লোক এখন এক কথা তখন আর এক কথা, আবার একদিন পরে অন্যরূপ, বিশেষতঃ ব্যাসের মত লোক কথনই বলিতে পারেন না। ইহাতে এইমাত্র সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব একজন প্রভূত তপোবল-সম্পন্ন লোক ছিলেন; তাঁহার যুক্তি তর্ক প্রমাণ অখণ্ডনীয়—মহাভারত ও বেদ-বিভাগ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার নাম দিয়া অন্যান্য উপাসকগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেন না, ব্যাসদেবের কথা কেহ অপ্রামাণিক বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে না। বর্ত্তমানকালে যেমন লোকে বড় লোকের নাম ও দোহাই দিয়া পুস্তক প্রচার করিতেছে, তখনও যে করে নাই, তাহার প্রমাণ কি?

যাহা হউক, এরূপ বিভিন্ন মত হইলেও, উদ্দেশ্য এক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। নদী যেমন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে একমাত্র মহাসাগরেই মিলিত হইয়াছে, সেইরূপ পুরাণাদি শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মূলে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হওয়া। যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন, যে মূর্ত্তিরই পূজা করুন না কেন, ফলে এক পরব্রহ্মকেই উদ্দেশ করিয়া থাকেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

যেমন জল একটি পদার্থ। তাহার নাম ভাষা বিশেষে কত প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা হিন্দু 'জল' বলিয়া পান করিতেছি, মুসলমানেরা 'পানি' বলিয়া পান করিতেছে, ইংরেজেরা 'ওয়াটার' বলিতেছে, এইরূপ কেহ আব, কেহ তনি, কেহ নীর, কেহ নিম্বু বলিতেছে; ফল, আমি যাহাকে জল বলিতেছি, অন্যে তাহাকেই পানি, ওয়াটার প্রভৃতি নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। যে

যে নামে ডাকিতেছে, সে সেই নামকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রচার করিতেছে এবং তাহা হইতেই ফেন বুদ্‌বুদ্ বরফাদি হইতেছে বলিতেছে। কিন্তু পদার্থ সেই এক ব্যতীত দুই নহে। এইরূপে বুঝিবে জল-পুরাণ, পানি-পুরাণ, ওয়াটার-পুরাণ, আব-পুরাণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে যে যে ভক্তগণ যে যে নামে যে যে মূর্ত্তি উপাসনা করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, তিনি সেই সেই নামের সেই সেই মূর্ত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিজ মনঃকল্পিত নাম ব্যতীত অন্য নামকে নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ভারতে এত যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার একমাত্র কারণ, তন্ত্র পুরাণাদির ভিন্ন ভাব।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, তোমরা ইহা নিশ্চয় জানিও যে, পৃথক্ পৃথক্ দেবতা নাই, আর কেহ কাহারও কারণ ও শ্রেষ্ঠ নহেন। এক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার পরিপূর্ণরূপে, অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। সকলের কারণ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা। স্বরূপপক্ষে সকলেই পরিপূর্ণ কারণরূপে বিরাজমান আছেন। যাঁহার নাম সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহারই নাম বিষ্ণু ভগবান, তাঁহারই নাম শিব, তাঁহারই নাম গণেশ, দেবী-মাতা, বিরাট ভগবান্, সাবিত্রী গায়ত্রী প্রভৃতি তাঁহারই নাম। আল্লা, খোদা, গড্ প্রভৃতি নাম তাঁহারই। তুমি যে নামে ডাক না কেন, শ্রদ্ধার সহিত ডাকিলেই তিনি শুনিবেন। নিজ মতের সহিত মিলিতেছে না বলিয়া কাহাকেও নিন্দা করিও না। জগৎ (বাহ্যে) বৈষম্যময়। তিনি কোন ভাবে কাহার প্রতি কিরূপ কৃপা করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার সাধ্য তোমাদের নাই। অতএব সকলকে আপনার আত্মা ভাবিয়া কার্য্য করিবে। পরমাত্মার কৃপায় জ্ঞানের উদয় হইলে সকলই বুঝিতে পারিবে। যাহাতে জগতের মঙ্গল ও শান্তি স্থাপিত হয়, পক্ষপাত, স্বার্থ, মান, অপমান, জয়, পরাজয় ত্যাগ করিয়া তাহাই সকলের করা কর্ত্তব্য।

মহাস্থপিন জাতক।

কোশল রাজের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সে বিষম নিদ্রা। দুঃস্বপ্নে রাজা কাতর হইয়াছেন। ষোলটি ভয়ানক স্বপ্ন। অমাত্যেরা দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীদিগকে একত্র করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, অমঙ্গল নিবারণার্থ মহাযজ্ঞ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক স্বপ্নগুলি ত্রিবিধ অনর্থের শকুন।

নগরোপান্তে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। শত শত বলিপশু সংগৃহীত—ব্রাহ্মণেরা সৌভাগ্য গণনা করিতেছেন—দান ও বিদায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হইবে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, যজ্ঞ ও যূপকাষ্ঠ, কুশ সমিধ ভারে ভারে লইয়া দৌড়িতেছে—তথাপি এ নাই ও নাই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা চীৎকার করিতেছেন। ভৃত্যগণ প্রাসাদ মুখে ধাবমান।

কোশল-মহিষী মল্লিকা স্বামীর নিকট স্বপ্নবিবরণ ও ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা শুনিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে তাঁহার আস্থা নাই। শ্রাবস্তীর জেতবনে তিনি তথাগতের উপদেশ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে কোশলপতি তপোবনে সিদ্ধার্থের সহিত সাক্ষাৎ করি-

লেন এবং তাঁহার নিকট স্বপ্নবিবরণ ও ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা নিবেদন করিলেন।

রাজা বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, কজ্জলের মত কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় চারিটি বৃষ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক্ হইতে আসিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। বৃষ-যুদ্ধ দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র পৌরজন প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। কিন্তু বৃষগণ কিছুক্ষণ গর্জ্জন করিয়া ও শৃঙ্গ আস্ফালন করিয়া বিনা যুদ্ধে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এই আমার প্রথম স্বপ্ন। ইহাতে কোন্ অমঙ্গল সূচনা করিতেছে?

তথাগত বলিলেন, রাজন্, এ স্বপ্নফল তোমার বা আমার জীবিত কালে ঘটিবে না। ভবিষ্যতে যখন রাজাগণ কৃপণ ও অধার্ম্মিক হইবে ও প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইবে, সেই দুর্দ্দিনে আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইবে না। প্রভঞ্জন ভগ্নপাদ হইবে, শস্য শুকাইয়া যাইবে, দুর্ভিক্ষ দেশে দেখা দিবে। তখন চারিদিক্ হইতে মেঘ আসিয়া সমবেত হইবে, যেন কত বৃষ্টি হইবে। ধান্য চাউল শুকাইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা রৌদ্রে দিয়াছিল, মেঘ দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর লইয়া যাইবে, যেন না ভিজিয়া যায়। জলের স্রোতে বাঁধ না ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য পুরুষেরা ঝোড়া ও কোদাল লইয়া বাহির হইবে। বিদ্যুৎ চমকাইবে, বজ্রের গর্জ্জন হইবে, কিন্তু এক বিন্দু বৃষ্টিপাত না হইতে স্বপ্নগত বৃষের ন্যায় মেঘ সকল কে কোথায় চলিয়া যাইবে। রাজন্, এ অনাবৃষ্টি অনেক দিন পরে হইবে, ইহাতে তোমার কোন অনর্থপাত হইবে না।

রাজা বলিলেন, মহানুভব, আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন এই;—আমি দেখিলাম, ছোট ছোট গাছ মাটি ছাইয়া ফেলিল, এবং এক হাত কি আধহাত বড় না হইতেই তাহাদিগের ফুল ফুটিল ও ফল হইল। এ স্বপ্নের অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন, রাজন্, যখন লোক-সমাজের দুরবস্থা ঘটিবে, তখন এইরূপ হইবে। মনুষ্যের আয়ুঃক্ষীণ হইবে, রিপু প্রবল হইবে, শিশু বালিকা বর্ষীয়সীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, অল্পবয়সে গর্ভাধান হইবে ও সন্তান জন্মিবে। ইহাতে তোমার কোন অনর্থপাত হইবে না।

রাজা বলিলেন, আমার তৃতীয় স্বপ্ন এইঃ—আমি দেখিলাম, গাভীগণ সদ্য প্রসূত বৎসতরীর দুগ্ধপান করিতেছে। এ স্বপ্নের অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন, ভবিষ্যতে যখন সমাজের দুরবস্থা ঘটিবে, বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান মিলিবেনা, তখন এইরূপ ঘটিবে। লোকে পিতৃপক্ষীয় শ্বশুরপক্ষীয় জ্যেষ্ঠগণকে উপেক্ষা করিয়া স্বহস্তে সংসারের ভারগ্রহণ করিবে। ইচ্ছা হয় ত গুরুজনকে বস্ত্রাহার দিবে, ইচ্ছা না হইলে তাহাও দিবেনা। বৃদ্ধজন নির্ধন ও নিরাশ্রয় হইয়া বৎসতরী দুগ্ধ-পায়িনী গাভীর ন্যায় সন্তানগণের কৃপার অধীন হইয়া জীবন ধারণ করিবে। ইহাতে তোমার কোন অনর্থ হইবে না।

রাজা বলিলেন, আমার চতুর্থ স্বপ্ন এইঃ—আমি দেখিলাম, লোকে বলবান্ ও দৃঢ়কায় পশু খুলিয়া লইয়া অল্পবয়স্ক পশুদিগকে গাড়ী টানিতে নিযুক্ত করিল। তাহারা ভারবহনে অক্ষম হইয়া এক পা অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইল—যেখানকার গাড়ী সেইখানে রহিয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন, ভবিষ্যতে রাজারা অধার্ম্মিক হইবে, তখন এইরূপ ঘটিবে—অধার্ম্মিক ও কৃপণ রাজাগণ বিজ্ঞ, ব্যবস্থাজ্ঞ, কুশলী ও কর্ম্মঠ লোকের সম্মান করিবে না, বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। মূর্খ

ও যুবকেরা সম্মানিত ও বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। নীতিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে উহারা আত্মসম্মান ও শাসন ভার বহন করিতে পারিবে না। অক্ষমতাহেতু রাজ কার্য্যে অবহেলা করিবে। পূর্ব্বকৃত অসম্মান ও অনাদর স্মরণ করিয়া বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না। রাজ্যশ্রী কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না,পরন্তু হতশ্রী হইয়া ক্রমে রাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ইহাতে তোমার কোন অনর্থ ঘটিবে না।

রাজা বলিলেন, মহানুভব, আমার পঞ্চম স্বপ্ন এইরূপ;—আমি দেখিলাম,একটি অশ্বের দুই দিকে মুখ, দুই দিকে ঘাস দিলে সে দুই মুখেই খাইতে লাগিল। ইহার অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন,ভবিষ্যতে যখন রাজাগণ অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইবে,তখন এইরূপ ঘটিবে। তাহারা লোভী ও অধার্ম্মিকদিগকে বিচারপতি নিযুক্ত করিবে; এই নীচ-প্রবৃত্তি মূর্খেরা সজ্জনের অনাদর করিয়া বিচারাসনে বসিয়া দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিবে; স্বপ্নসূচিত অশ্বের ন্যায় ইহারা দুই মুখেই খাইবে।

রাজা বলিলেন, আমার ষষ্ঠ স্বপ্ন এইঃ—আমি দেখিলাম, লোকে বহুমূল্যের মার্জ্জিত সুবর্ণস্থালী লইয়া শৃগালকে তন্মধ্যে প্রস্রাব করিতে প্রার্থনা করিল। আমি দেখিলাম, শৃগাল সুবর্ণস্থালীতে মূত্রত্যাগ করিল।

তথাগত বলিলেন,ভবিষ্যতে রাজারা যখন অধার্ম্মিক হইবে, প্রাচীন সম্মাননীয় বংশের লোকদিগকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না ও আদর করিবে না,নীচ বংশের আধুনিক লোক তাহাদের প্রিয় হইবে। উচ্চ নীচ ও নীচ উচ্চ হইবে। দারিদ্র্য হেতু কুলীনগণ আধুনিকদিগের শরণাপন্ন হইবে ও তাহাদিগকে আপন আপন কন্যার বিবাহ দিবে। নীচ সহবাসে কুলীনকন্যা মর্য্যাদা হারাইবে।

রাজা বলিলেন,আমার সপ্তম স্বপ্ন এইরূপ;—আমি দেখিলাম,এক ব্যক্তি দড়ী পাকাইতেছে, এবং যে টুকু পাকান হইতেছে,সে টুকু বসিবার বেঞ্চের নীচে ফেলিয়া দিতেছে, সেই বেঞ্চের নীচে এক শৃগালী ছিল,সে সেই দড়ী খাইয়া ফেলিতে লাগিল। লোকটি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।

তথাগত বলিলেন,ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে, নারীগণ পুরুষের সঙ্গ অভিলাষ করিবে। চারিদিকে বেড়াইতে, সুন্দর পোষাক পরিতে ও পার্থিব বিবিধ বিলাস উপভোগ করিতে বাসনা করিবে; তাহারা গৃহকার্য্যে অবহেলা করিবে, ধন মান অপচয় করিবে। স্বামীর বহুশ্রমলব্ধ সম্পত্তি গৃহিণীগণ বিলাসে অপব্যয় করিবে; গার্হস্থ্য সুখের উন্মূলন হইবে। কিন্তু তোমার ইহাতে কোন অনর্থ ঘটিবে না।

রাজা বলিলেন,আমার অষ্টম স্বপ্ন এইরূপ;—আমি দেখিলাম,রাজদ্বারে একটী পূর্ণ কলসী রহিয়াছে, তাহার চারিপার্শ্বে অনেকগুলি শূন্য কলস। আট দিক্ হইতে নানা বর্ণের লোক ভারে ভারে জল আনিয়া সেই পূর্ণ কলসে ঢালিয়া দিতেছে। কলস বহিয়া জল চারিদিকে গড়াইয়া যাইতেছে। তবু সকলে সেই পূর্ণ কলসে জল ঢালিতেছে। শূন্য কলসে কেহ এক বিন্দু দেওয়া দূরে থাকুক,সে দিকে কটাক্ষ করিতেছে না।

তথাগত বলিলেন, ভবিষ্যতে দেশের বড় দুরবস্থা হইবে। দেশ বলশূন্য ও ধনশূন্য হইবে। রাজা কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু হইবে। রাজা ধনলোভে যাবতীয় প্রজাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। লোকে আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। দিন রাত পরি-

শ্রম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিবে, তাহা দিয়া রাজ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবে; রাজভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেও তাহাতে আরও ধন আনিয়া দিতে বাধ্য হইবে, আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে কটাক্ষ করিতে কাহারও অবসর মিলিবে না।

রাজা বলিলেন,আমার নবম স্বপ্ন এইরূপ;—আমি একটী গভীর জলাশয় দেখিলাম,তাহার চারি প্রান্তে পঞ্চবিধ পঙ্কজ ফুটিয়া আছে। দ্বিপদ চতুষ্পদ বিবিধ জন্তু সেই থানে জলপান করিতে সমবেত হইতেছে। জলাশয়ের মধ্য-ভাগ পঙ্কিল কিন্তু তটপার্শ্বে পরিষ্কৃত। ইহার অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন,ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক,স্বেচ্ছাচারী ও বিলাস-পরায়ণ হইবে। তাহারা অর্থগৃধ্নু ও উৎকোচ-গ্রাহী হইবে। প্রজার প্রতি স্নেহ দয়া দেখা-ইবে না। যন্ত্রে যেমন ইক্ষুদণ্ড পেষণ করে,নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ভাবে তাহারা করগ্রহণ ও তাড়না করিয়া প্রজাকে তেমনই পেষণ করিবে। রাজকর প্রদানে অসমর্থ হইয়া প্রজাগণ নগর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সীমান্ত প্রদেশে পলা-য়ন করিবে। রাজ্যের মধ্যভাগ জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইবে। কিন্তু সীমান্ত ভাগ প্রজা-পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

রাজা বলিলেন,আমার দশম স্বপ্ন এইরূপ;—আমি দেখিলাম, একটী স্থালীতে তণ্ডুল সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সুপক হইতেছে না,কতক-গুলি কঠিন রহিয়া যাইতেছে, কতকগুলি অর্দ্ধ সিদ্ধ হইয়াছে, দুই একটি সুসিদ্ধ হই-য়াছে। ইহার অর্থ কি?

তথাগত বলিলেন,ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে। তখন রাজা অধার্ম্মিক হইবে, রাজার পার্শ্ব-দেরা অধার্ম্মিক হইবে। ব্রাহ্মণ বা গৃহস্থ, নগরবাসী বা গ্রামবাসী সকলেই ধর্ম্মশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে তাহা-দের উপাস্য বনদেবতা, বায়ুদেবতা, জল-দেবতা সকলেই অধার্ম্মিক হইবে। বায়ু নির্দ্দয় হইবে ও অনিয়মিত হইবে। ঝটিকায় সংসার বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে ও বারিপাত নিবারণ করিবে। বৃষ্টি নিয়মিত হইবেনা, কোথাও অতিবৃষ্টি,কোথাও অনাবৃষ্টি হইবে। এক দেশে এক গ্রামে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রূপ হইবে। উচ্চ-ভাগে জল হইলে নিম্নভাগে হইবে না। গ্রামের এক অংশে বহুবৃষ্টি অন্যাংশে অনাবৃষ্টি ঘটিবে। এইরূপে একই স্থানীয় তণ্ডুল বিভিন্ন পরিমাণে সিদ্ধ হইবে।

রাজা বলিলেন,আমি দেখিলাম, অম্লময় দধি বহুমূল্য চন্দনের বিনিময়ে বিক্রীত হইতেছে।

তথাগত বলিলেন, ভবিষ্যতে যখন আমার ধর্ম্ম ক্ষীণপ্রভাব হইবে,তখন এইরূপ ঘটিবে। লোভের বিরুদ্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, লোভপরবশ হইয়া ভিক্ষুগণ অর্থের আশয়ে সেইকথা প্রচার করিবে। ধর্ম্মযাজনায় মোক্ষ-লাভ ঘটিবে না। সুস্বরে সুন্দর কথায় ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে অর্থলাভ। যাহাতে নির্ব্বাণলাভ হয়, সেই বহুমূল্য শাস্ত্র কথা অসার ধনের বিনিময়ে বিক্রীত হইবে।

রাজা বলিলেন, আমি দেখিলাম, জলে অলাবু ভাসিতেছে।

তথাগত বলিলেন, ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে। তখন রাজা অধার্ম্মিক ও লোক-চরিত্র বিকৃত হইবে। সদ্বংশজদিগকে উপেক্ষা করিয়া রাজা নীচবংশীয়দিগের আদর করিবে। নীচবংশী-য়েরা উপরে উঠিবে, সদ্বংশীয়েরা নীচে ডুবিয়া যাইবে। মন্ত্রণা গৃহে,রাজদ্বারে ও বিচারালয়ে সর্ব্বত্র অকুলীনের মর্য্যাদা হইবে। সভ্যমধ্যে দুশ্চরিত্র, অশিক্ষিত যুবকেরা সাধনশীল বিজ্ঞ

স্থবিরদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। কিন্তু তোমার ইহাতে কোন অনর্থ ঘটিবে না।

রাজা বলিলেন, আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র মণ্ডূকগণ ভীষণ কৃষ্ণ সর্প ধরিয়া অবলীলাক্রমে মৃণালের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে।

ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে। লোকে এত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইবে যে, ভার্য্যার নিকট আপনার সুখ স্বাধীনতা বলিদান করিবে। ধনজন সম্পদের অধিকারিণী ভার্য্যা স্বামীকে ক্রীতদাসের ন্যায় লাঞ্ছনা করিবে।

রাজা বলিলেন, আমি দেখিলাম, কাঞ্চন-বর্ণ মরালগণ দশ দোষ কলুষিত কাকের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।

তথাগত বলিলেন, ইহাও ভবিষ্যতে ঘটিবে। দুর্ব্বল প্রকৃতি কাপুরুষ রাজাগণ পদচ্যুত হইবার ভয়ে সম্ভ্রান্তগণকে দূর করিয়া ক্রীতদাস, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নীচবংশীয় দাসগণকে প্রাধান্য প্রদান করিবে। সম্ভ্রান্তগণ রাজ-প্রসাদ লাভে লালায়িত হইয়া নীচজাতীয় আধুনিকদিগের পরিচর্য্যা করিবে।

রাজা বলিলেন, এতদিন জানিতাম, বৃকগণ ছাগ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ছাগগণ বৃকের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, বৃকগণকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। ভয়-কম্পিত বৃকগণ পলায়ন করিয়া গহ্বরে আশ্রয় লইতেছে।

তথাগত বলিলেন, ভবিষ্যতে অধার্ম্মিক রাজার রাজত্বকালে এইরূপ ঘটিবে। নীচ-বংশীয়েরা রাজপ্রসাদ ও প্রাধান্য লাভ করিবে। সম্ভ্রান্তগণ দরিদ্র ও মর্য্যাদাশূন্য হইবে। রাজার অনুগ্রহে দর্পিত হইয়া নীচবংশীয়গণ সম্ভ্রান্ত-দিগের বিভব-সম্পদ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সম্ভ্রান্তগণ রাজার আশ্রয় লইবে, নীচ সভাসদ-গণ তাঁহাদিগকে অপদস্থ ও নিগৃহীত করিবে। তাড়নায় সম্ভ্রান্তগণ আপন ধনজন ইচ্ছাক্রমে নীচ সভাসদগণের হাতে তুলিয়া দিবে, বলিবে, এ তোমাদেরই ধনজন, আমাদের নহে এবং নিজ কুটীরে পলায়ন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে। অপণ্ডিত অর্ব্বাচীনদিগের নিগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণ জঙ্গলে আশ্রয় লইবে। এ সকল ভবিষ্যতে ঘটিবে। হে রাজন্! ইহাতে তোমার কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ভগবদ্গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

[জ্ঞানকর্ম্মন্যাসযোগ।]

"আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি॥
পুমবস্থা বিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদং।"

শ্রীভগবান্—

এ অব্যয় যোগ কথা কয়েছিনু আমি

(১) অব্যয়—যাহার ফল অব্যয়, (শঙ্কর, স্বামী)। যাহার ফল মোক্ষ, (রামানুজ, মধু)। বেদমূল বলিয়া অব্যয় (গিরি)।

যোগকথা—কর্ম্মযোগ উপায় দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান নিষ্ঠালক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসযোগ; ইহাতে সমগ্র বেদার্থ পরি-সমাপ্ত হইয়াছে (স্বামী, শঙ্কর)। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ একই, কেননা ইহাদের মধ্যে সাধ্যসাধন সম্বন্ধ আছে এবং ফলও শেষ একরূপ (৫।৫ দেখ) (মধুসূদন)।

বিবস্বতে ; বিবস্বত কহেন মনুরে ;
মনু কয়েছিলা তাহা ইক্ষ্বাকুর পাশে। ১

রামানুজ বলেন—যাহারা প্রকৃতি-সংসৃষ্ট অথচ মোক্ষাভিলাষী, তাহাদের সহসা জ্ঞান-যোগাধিকার না থাকায়, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই ব্যবস্থা। আবার যাহারা জ্ঞানযোগাধিকারী, তাহাদেরও নিজের অকর্তৃত্ব বুঝিয়া কর্ম্মযোগ কর্ত্তব্য,—ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। তৎপরে এই কর্ম্মযোগ যে নিখিল জগৎ রক্ষা ও পালনের হেতু এবং এইজন্য যে ইহা প্রত্যেক মন্বন্তরের প্রথম হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইয়া কর্ম্মযোগের কর্ত্তব্যতা আরও বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম্মযোগেরও অন্তর্গত, কেন না জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মযোগও হয় না—কর্ম্মযোগে জ্ঞানাংশেরই প্রাধান্য থাকে,—ইহাও এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের প্রায় সমান প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, জগৎ সৃষ্টির পরে জগৎরক্ষার্থ প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ উভয় সুখ সাধন মার্গই এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কয়েছিনু—সৃষ্টির প্রথমে কহিয়াছিলাম(শঙ্কর)।

বিবস্বত—সমস্ত ক্ষত্রিয় বা জগৎপালন রূপ কার্য্যের বীজভূত আদিত্য (মধু)। জগৎ পরিপালয়িতা ক্ষত্রিয়দিগের বলাধান জন্য এই যোগবল যুক্ত করিয়া ভগবান্ আদিত্যকে সমর্থ করেন (শঙ্কর)।

বিবস্বত হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি। সূর্য্য হইতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্বেতবরাহকল্পের সপ্তম মনু। ইনি ব্রহ্মার সমষ্টি ক্ষত্রধাতুর বীজ স্বরূপ। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু।

মন্বন্তর বা প্রলয় পরে এই সৌরজগৎ যখন সৃষ্ট হয়, তখন সূর্য্যেতেই সমস্ত জগৎ রক্ষা বা পালন শক্তিনিহিত ছিল। তাহাই সমষ্টি ক্ষত্র ধাতু। এইজন্য সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ বা বিষ্ণুতেজ (বা হিরণ্যগর্ভ) জগৎ ধারণ করেন, এইরূপ কথিত আছে। এই শক্তি বা তেজ জীব জগতে 'মনু' রূপে প্রথম অভিব্যক্ত। এবং মনুষ্য জগতে শেষে ইক্ষ্বাকুতে রাজশক্তিরূপে এই ক্ষত্র ধাতুর বিকাশ হয়।

এইরূপে পরম্পরা প্রাপ্ত হয়ে ইহা
জানিত রাজর্ষিগণে। মহাকাল বশে
এবে সেই যোগ পার্থ হয়েছে বিলোপ। ২
এই সেই পুরাতন যোগকথা আজি

যাহার নিজের আকাঙ্খা আছে, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ব্যগ্র, তাহার পরার্থ প্রবৃত্তির সম্ভব নাই। যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তিমার্গগামী, তাহার স্বার্থ বা পরার্থ কোন প্রবৃত্তি নাই (গিরি)। জগৎ পালন বা রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতে যাহারা নিয়োজিত, তাহাদের নিজের আকাঙ্খা বা প্রয়োজন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইয়া, 'আত্ম'-চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া, নিয়োজিত কর্ম্ম পরার্থ করিতে হইবে। এই জন্য তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব শিখিতে হইবে। এই জন্য, সূর্য্য, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজন্যগণের এই নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা প্রথমতঃ প্রয়োজন। তাই সৃষ্টির সহিত বিবস্বতে এই তত্ত্ব ভগবান্ প্রতিভাত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথাই এ শ্লোকে রূপকে বুঝান হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এই যোগ দ্বারা জগতের ক্ষত্র ধাতু (জগৎ রক্ষার প্রবৃত্তি বা নিষ্কাম কর্ম্ম শক্তি—যাহা শুদ্ধ বা সাত্বিক রজঃ শক্তি জাত) বলযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণত্বও রক্ষিত হইবে ও উভয়ের রক্ষায় তাহাদের জগৎ-অনুষ্ঠান কর্ম্ম ফল দ্বারা সমস্তই রক্ষিত হইবে।

(২) পরম্পরা প্রাপ্ত—গুরুশিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত (মধু)।

রাজর্ষিগণে—রাজাগণ ও ঋষিগণ (শঙ্কর, স্বামী ও মধু)। কিন্তু সাধারণতঃ রাজর্ষি অর্থে ব্রাহ্মণ ঋষি বুঝায় না।

মহাকাল বশে—ধর্ম্মহ্রাসকর দীর্ঘকালবশে।(মধু)

এবে—(মূলে আছে "ইহ" এই কালে বা এই স্থানে)। এই লোকে (স্বামী)। ইদানীং দ্বাপরান্তে লোকে দুর্ব্বল, অজিতেন্দ্রিয়, অনধিকারী ও কামদ্বেষাদির অভিভূত হওয়ায় এই যোগ বিলুপ্ত বা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে (মধু)।

[মূলে আছে নষ্ট = বিলুপ্ত (রামানুজ), বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় (মধু, শঙ্কর)]

(৩) রহস্য উত্তম—অতি গোপনীয়—এই জন্য কেবল শরণাগত ভক্ত উপযুক্ত অধিকারী অর্জ্জুনকে এই

কহিনু তোমারে আমি ;—তুমি ভক্ত মম
সখা মম, আর এই রহস্য উত্তম। ৩
অর্জ্জুন—
তোমার জনম পরে,—পূর্ব্বে জন্মেছিলা
বিবস্বত ; তুমি পূর্ব্বে কয়েছিলা তাঁরে —
কিরূপেতে ইহা আমি পারিব বুঝিতে ? ৪
শ্রীভগবান্—
হে অর্জ্জুন, বহু জন্ম তোমার আমার
হয়েছে অতীত। জানি আমি সে সকল,
কিন্তু তুমি, পরন্তপ, নাহি জান তাহা। ৫

উপদেশ দেওয়া হইতেছে (বলদেব, মধু)। বেদান্তোদিত উত্তম রহস্য জ্ঞান (রামানুজ)।

(৪) পূর্ব্বে জন্মেছিলা—সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যের উৎপত্তি। কাল সংখ্যায় তাহা অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে ; কিন্তু বাসুদেবের জন্ম অর্জ্জুনের সমসাময়িক (রামানুজ)।

পারিব বুঝিতে—নররূপধারী বাসুদেব যে সর্ব্বজ্ঞ,ইহা সাধারণের ধারণা হইতে পারে। এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন (লোকহিতার্থ) এই প্রশ্ন করিয়াছেন (মধু), নতুবা অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে,বাসুদেব স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, কেন না রাজসূয় যজ্ঞস্থলে ইহার উল্লেখ আছে (রামানুজ)। এই অর্থ কিছু কষ্টকল্পিত। স্বামী সহজ অর্থ করিয়াছেন।

(৫) জানি আমি—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাব জন্য ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানাবরিত নহে। কিন্তু অর্জ্জুনের জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্মাদি আবরণে আবৃত। এই জন্য ভগবানের ন্যায় অর্জ্জুন নিজের বা অন্যের জন্মান্তর বৃত্তান্ত জানিতে পারেন না (শঙ্কর)। জ্ঞান অবিদ্যা আবরিত থাকিলে জন্মান্তর স্মৃতি থাকে না (স্বামী)। "জন্মান্তরানুভূতঞ্চ ন স্মর্য্যতে।" অজ্ঞানাবরণ দূর হইলে জাতিস্মর হওয়া যায়। বাসুদেব জন্মান্তর বৃত্তান্ত জাতিস্মর বলিয়া যে জানেন, তাহা নহে। স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় ভগবান্ বলিয়া জানেন, অলুপ্ত বিদ্যাশক্তি হেতু জানেন (স্বামী)।

জন্ম—ভগবানের জন্ম বা অবতার লীলা,—দেহ গ্রহণ ; জীবের জন্ম—কর্ম্মার্জ্জিত দেহ গ্রহণ (মধু)।

বটে আমি জন্মহীন অব্যয়-স্বভাব
সর্ব্বভূত পতি ;—কিন্তু নিজ মায়া বলে,
লই জন্ম, করি মম প্রকৃতি আশ্রয়। ৬

পরন্তপ—'আত্মার' বিরোধী যাহারা, তাহারাই পর (শঙ্কর)। বাহ্য পর-শত্রু ; অন্তরের পর কামক্রোধাদি রিপু। পরন্তপ-শত্রুতাপন বা জিতেন্দ্রিয় (মধু)। কোন কোন টীকাকার বলেন "পর" এই পদে অর্জ্জুনের ভেদ দৃষ্টি বা ভ্রান্তি সূচিত হইয়াছে।

(৬) জন্মহীন—সাধারণ জীবের ন্যায় ভগবানের জন্ম মৃত্যু নাই। জীবের পক্ষে অপূর্ব্ব দেহ ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণই জন্ম ; আর পূর্ব্ব দেহ ইন্দ্রিয় বিচ্ছেদই মৃত্যু। জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম। অজ্ঞানাবরিত দেহাভিমানী জীবের বাসনাজাত কর্ম্মাধিকারই এই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, এজন্য জীবের ন্যায় তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই। 'জন্মহীন' এই বিশেষণের দ্বারা ভগবানের সাধারণ জীববৎ অপূর্ব্ব দেহ গ্রহণ ও পূর্ব্ব দেহ বিচ্ছেদ প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে (মধুসূদন)। কর্ম্মমূল ও মলিন বা হেয় ত্রিগুণযুক্ত প্রকৃতির সংসর্গরূপ যে জন্ম, ভগবানের সেরূপ জন্ম নাই। (রামানুজ)। ভগবানের ভোগ-শরীর গ্রহণ সম্ভব নহে। তিনি মায়াশরীর গ্রহণ করিলেও জন্মমৃত্যুর অধীন হন না।

অব্যয়—পরিণাম শূন্য (বলদেব), অক্ষীণ জ্ঞানশক্তি স্বভাব (শঙ্কর)।

সর্ব্বভূতপতি—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের ঈশ্বর যিনি,তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন নহেন। তিনি কর্ম্ম পরতন্ত্রও নহেন। ইহাই এস্থলে সূচিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও মায়া—এই শ্লোকের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। রামানুজ ও বলদেব একরূপ অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন,প্রকৃতি অর্থে স্বভাব বা স্বরূপ ; আর মায়া অর্থে আত্মজ্ঞান বা আত্মসংকল্প। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিজ স্বরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার ভগবানত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। আর তাঁহার অবতীর্ণ হইবার কারণ নিজজ্ঞানে (মায়াতে) জীবের দুঃখ অনুভূতি ; জীবের প্রতি অনুকম্পা করিয়াই তাহার উপকার জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন।

স্বামী বলেন, প্রকৃতি অর্থে,শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিক প্রকৃতি। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত বলিতে—বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি

গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অবতীর্ণ হন,ইহাই বুঝায়। অবতীর্ণ ঈশ্বরের মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি ষোড়শ কলা যুক্ত লিঙ্গদেহ থাকে না। এই লিঙ্গদেহেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বীজ নিহিত থাকে। অবতীর্ণ পুরুষের লিঙ্গদেহ থাকে না বলিয়া তাঁহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মও থাকে না। তাঁহার কেবল স্থূল সত্ত্বমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তবে তিনি যখন নিজ মায়ায় জন্ম গ্রহণ করেন,তখন তিনি তাঁহার জ্ঞান, বল, বীর্য্য প্রভৃতি শক্তি হইতে সম্যক্ প্রচ্যুত হন।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়া স্বতন্ত্র অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতি ও মায়া একার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন "ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবীমায়া,—সমস্ত জগৎ যাহার অধীন, ও যাহাতে মোহিত হইয়া লোকে নিজ আত্মা বাসুদেবকে জানিতে পারে না, তাহাই প্রকৃতি। আর ভগবান্ যদিও জন্মিয়াছেন, এরূপ প্রতীয়মান হয়, সে কেবল তাঁহার মায়া জন্য ; তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান থাকে, এজন্য তিনি অজ্ঞানাবৃত লোকের ন্যায় জন্মাদিবিষয়ে পারমার্থিকত্ব অভিমান যুক্ত হন না (গিরি)। এই 'মায়া' তাঁহার "নিজ"। ইহাতে এই বুঝায় যে, প্রকৃতি বা মায়ার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহা ভগবানেরই অধীন (গিরি)।

মধুসূদন বলেন, "প্রকৃতিই অঘটনঘটনপটীয়সী বিচিত্র শক্তি বা মায়া নামক ব্রহ্মের উপাধি। ইহা অনাদি,সুতরাং যাবৎ কালব্যাপী, সুতরাং নিত্য। ইহা জগৎকারণ সম্পাদক ঈশ্বরের ঈক্ষণ শক্তি বা ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্ত্তমান, ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। নির্গুণ, 'নেতি নেতি' বিশেষণযুক্ত পরব্রহ্ম কর্ত্তক জগৎরূপ উপাধি যুক্ত হন। ইহাই মায়া। সেই মায়া উপহিত ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর, অজ ও অব্যয় হইয়াও সগুণ বা শুদ্ধসত্ত্ব মায়াত্মক জগৎ মূর্ত্তিযুক্ত। ইহাই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বা দেহ। ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তত্ত্ব। বেদান্তদর্শনে আছে, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"। শ্রুতিতে আছে, "আকাশ শরীরং ব্রহ্মেতি আকাশোহত্রাব্যাকৃতম্ আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।"

বেদান্তমতে ব্রহ্মশক্তি, যাহা জগৎ প্রকাশের কারণ, তাহা দুই প্রকার। এক মায়া আর এক অবিদ্যা। সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলতা হেতু প্রথম প্রকার শক্তির নাম মায়া ; আর মালিন্য হেতু দ্বিতীয় প্রকার শক্তির নাম অবিদ্যা। মলিনীভূত মায়াই অবিদ্যা। মায়া—দৈবী প্রকৃতি। অবিদ্যা—মলিন প্রকৃতি। ইহা হইতে জীব ও জড় জগতের বিকাশ। জীব—পরাপ্রকৃতি, ও জড়—অপরা প্রকৃতি। (৭।৪-৫ দেখ)। পঞ্চদশীতে আছে,

"সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।
মায়া বিম্বোবশীকৃত্য তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥"

বেদান্তসারে আছে "ইয়ং সমষ্টি উৎকৃষ্টোপাধিতয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং...জগৎকারণ ঈশ্বর ইতি ব্যপদিশ্যতে।"

এই জন্য—ব্রহ্ম সগুণ হইয়া তাঁহার প্রকৃতি বা মায়াতে উপহিত বলিয়াই এ জগৎ জগৎরূপে প্রতিভাত। তিনি "চিদাভাসের দ্বারা মায়াকে বশীভূত" করিয়াছেন বলিয়া তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। "ব্রহ্ম নিজ উপাধি মায়াখ্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়ার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পরিণামে আবৃত বা স্বেচ্ছা বিনির্ম্মিত মায়াময় দিব্য শরীরে—শরীরী ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত। তিনি স্থূলভূতে বিরাটরূপে ও সূক্ষ্মভূতে হিরণ্যগর্ভরূপে উপাধিযুক্ত। মধুসূদন বলিয়াছেন "যাহা নিত্য, মায়াখ্যকারণোপাধিযুক্ত ও অনেক শক্তিমান,তাহাই ভগবানের দেহ ইহা ভাষ্যকারের মত।"

বিরাটে মায়ার সূক্ষ্মভূত পরিণাম বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে। হিরণ্যগর্ভে মায়ার আকাশাদি স্থূল পরিণাম জ্ঞান থাকে না (মধুসূদন)। কেবল ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ।

এখন কথা হইতেছে, ঈশ্বরের মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ সম্ভব কিনা। মধুসূদন বলেন, তাঁহার শরীর—স্থূলভূত কার্য্য নহে। তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ব্যষ্টিরূপে জীবের জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানের সমান হইত ও সমষ্টিরূপে বিরাটের জ্ঞানের সমান হইত। সেইরূপ তাঁহার শরীর সূক্ষ্ম ভূতজও নহে তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ব্যষ্টিরূপে জীবের স্বপ্নাবস্থার জ্ঞানের সমান হইত ; ও সমষ্টিরূপে হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানের সমান হইত। ইহাদের সকলেরই জ্ঞান সান্ত। কিন্তু অবতীর্ণ ঈশ্বরের জ্ঞান অনন্ত। এই জন্য ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন ভাবেই ঈশ্বরের ভৌতিক শরীর কল্পনা করা যায় না। মধুসূদন আরও বলেন, ভৌতিক শরীরে ভূতাবেশের ন্যায় ঈশ্বরের আবেশ ও কল্পনা করা যায় না। কেন না, সকল শরীরেই তিনি সাক্ষী ও অন্তর্যামীরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এই জন্য এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে তাঁহার ভৌতিক শরীর নাই, ইহাই "বটে আমি জন্মহীন—" কথায় বলা হইয়াছে।

মধুসূদন এই জন্য বলেন, যে ভগবানের মনুষ্যাদি শরীররূপে প্রকাশ কেবল তাঁহার আত্মমায়া হেতু। তিনি লোককে অনুগ্রহ জন্য দেহীর ন্যায় লোকের কাছে প্রতীয়মান হন। সর্ব্বগুণযুক্ত কারণোপাধি ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া এইরূপ মায়া দেহ ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়েন। দেহীবৎ ব্যবহার করেন। নতুবা সে দেহ বাস্তবিক নহে, তাহা মায়াময়,তাহা কাল্পনিক। তিনি স্বেচ্ছা-বিনির্ম্মিত দিব্য মায়াময় মূর্ত্তিতে জাত বৎ প্রতীয়মান হন। ইহার মূল মায়া। শাস্ত্রে আছে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নতু মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"

অন্যত্র,—

"কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্রদেহীব ভাতি মায়য়া॥"

মধুসূদন বলিয়াছেন, কোন কোন টীকাকারের মতে ঈশ্বরের দেহ দেহীভাব বাস্তব; আবার কেহ কেহ এরূপ দেহদেহী ভাব স্বীকার করেন না। মধুসূদন বলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরিপূর্ণ নির্গুণ পরমাত্মা, তিনিই সে বিগ্রহ। তাঁহার প্রচ্যুতি হয় না। তিনি নিজ স্বরূপেই ব্যক্ত হন বা দেহীবৎ ব্যবহার করেন।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য মধুসূদন প্রভৃতি টীকাকারগণের এইরূপ মত। স্বামী কেবল বলিয়াছেন যে, অবতার কালে ভগবানের সূক্ষ্ম দেহ না থাকিলেও বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি থাকে, এবং সেই কালে তিনি তাঁহার স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত—এইরূপ বোধ হয়।

রামানুজ বলেন, ভগবান্ আত্মসংকল্পের দ্বারা দেব মনুষ্যাদিরূপে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ স্বভাবে বা স্বরূপেই সম্ভূত হন। তাঁহার স্বরূপ শ্রুতিতে উক্ত আছে যথা, "আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ···আদিত্যে হিরণ্য যস্তস্মিন্নয়ং পুরুষঃ মনোময়োমৃতো হিরন্ময়ঃ।···বিদ্যুতঃ পুরুষাদধিভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ··· ।"

বলদেবও এইরূপ অর্থ করেন। তিনি স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "প্রত্যক্ষং চ হরের্জ্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন।" হরির দেহদেহী বা গুণগুণীভাব না থাকিলেও মায়া বা বিশেষ বলে জ্ঞানীর নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান হন।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় হে ভারত,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় যেই কালে—
সেই কালে করি আমি আমাকে সৃজন। ৭
সাধুজন পরিত্রাণ, দুষ্কৃত নিধন

এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে, নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইতে হয়। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। সুতরাং কেবল ঈশ্বর ভাবেই অবতার সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই অবতারের কারণ বা উপায় "মায়া" যে মায়ার এই জগৎ প্রকাশিত, তাহা দ্বারাই অবতারকালে ঈশ্বরের অসাধারণ কায়া সৃষ্টি হয়। সে কায়া মায়ারই একরূপ বিকাশ। তাহা দিব্য, কেন না সেরূপ বিকাশ অন্যত্র সম্ভবে না। আর এই মায়া শুদ্ধ, মলিন নহে, ইহা কিছুরই পরিণাম নহে। এবং কিছুরই উপাদান কারণ নহে।

[গত বৈশাখ সংখ্যার নব্যভারতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু দেখাইয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের এই অবতার-তত্ত্ব পৌরাণিক। ইহা ব্যতীত বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ী মূর্ত্তিময়। সে তত্ত্ব এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।]

(৭) ধর্ম্মের গ্লানি—ধর্ম্ম = বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণযুক্ত ও প্রাণীদিগের নিঃশ্রেয়স সাধক (শঙ্কর); অথবা বেদ বিহিত, প্রাণীদিগের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধক, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত, ও বর্ণাশ্রমবিহিত আচারাদিরূপ ধর্ম্ম (মধু); বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত কর্ত্তব্য (রামানুজ)। গ্লানি = হানি, বিনাশ। ধর্ম্মহানি হইলে সমস্ত পুরুষার্থ ভঙ্গ হয় (গিরি)।

আমাকে সৃজন—মায়া বলে সৃষ্টের ন্যায় আপনাকে দেখাই (মধু)। [পূর্ব্ব শ্লোকের টীকা দেখ। সপ্তম শ্লোকে অবতারের কাল ও অষ্টম শ্লোকে অবতারের প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে (রামানুজ)]

(৮) সাধুজন পরিত্রাণ—যাহারা সন্মার্গস্থ (শঙ্কর), বা স্বধর্ম্মবর্ত্তী (স্বামী) বা পুণ্যকারী ও বেদমার্গরত (মধু) তাহারা সাধু। বৈষ্ণব টীকাকারগণ বলেন, যাহারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ (রামানুজ) অথবা ভগবৎভক্ত, তাঁহার রূপ গুণ নিরত তাঁহারাই সাধু (বলদেব)।

সাধুজন পরিত্রাণ অর্থাৎ তাহাদের রক্ষা (শঙ্কর, স্বামী, মধু, গিরি)। বৈষ্ণব টীকাকারগণ বলেন, বৈষ্ণবগণের ঈশ্বর দর্শন ব্যতীত, তাহারা আত্ম ধারণ পোষণ

করিবারে ; করিবারে ধর্ম্ম সংস্থাপন—
যুগে যুগে করি আমি জনম গ্রহণ ॥৮॥

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সুখ লাভ না করিয়া শিথিলাঙ্গ হইবে ; তাহা নিবারণ জন্য, তাহাদের ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে হয় (রামানুজ)। অথবা বৈষ্ণবগণের ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য যে ব্যগ্রতা হয়, সেই ব্যগ্রতারূপ দুঃখ নিবারণ করাই সাধুপরিত্রাণ (বলদেব)।

দুষ্কৃত নিধন—পাপকারীদের বধের জন্য (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। পাপকারীদের নিগ্রহ জন্য (গিরি)। দুষ্কৃত বা দুষ্টকর্ম্মকারী ভক্তদ্রোহী ও অন্যের অবধ্য যাহারা, তাহাদের বিনাশ জন্য (বলদেব)। স্বামী বলিয়াছেন, দুষ্ট নিগ্রহ জন্য ভগবানের কোন ঘৃণ্য কাজ করা হয় না, অথবা তাঁহাকে নির্দ্দয় বলা যায় না। কেননা,

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ দোষয়োঃ॥"

ধর্ম্মসংস্থাপন—সাধুরক্ষা, দুষ্কৃতনাশ ও ধর্ম্মস্থাপন, এই তিন কার্য্য জন্য অবতারের প্রয়োজন (স্বামী, শঙ্কর) অথবা ইহাই অবতারের ফল (গিরি)। কিম্বা সাধুরক্ষা ও দুষ্কৃতনাশ এ উভয়ের ফল ধর্ম্মস্থাপন (মধু, স্বামী)।

ঈশ্বরারাধনারূপ বৈদিক ধর্ম্ম নাশ হইলে, আরাধ্যস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিতে হয় (রামানুজ)। ঈশ্বর অর্চ্চনা ধ্যানাদি লক্ষণযুক্ত শুদ্ধ ভক্তিযোগরূপ বৈদিক ধর্ম্ম ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ তাহা প্রচারে অক্ষম বলিয়া সেই ধর্ম্ম স্থাপনা বা প্রচার জন্য অবতারের প্রয়োজন (বলদেব)। বেদমার্গ পরিরক্ষণই ধর্ম্মস্থাপনা (মধু)।

যুগে যুগে—সেই সেই অবসরে বা কালে (স্বামী) তাঁহার অবতারের সত্য ত্রেতাদি যুগ নিয়ম নাই (রামানুজ) যখনই প্রয়োজন হয়, অথবা যখন অধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধর্ম্মহানি হয়, তখনই অবতার হয়। অথবা প্রতি যুগে অবতার হয় (শঙ্কর, মধু)। এই অবতার দেব মনুষ্যাদি যেরূপে প্রয়োজন, সেইরূপে হয়। (রামানুজ)।

এই শ্লোক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। যিনি সাধু বা ধার্ম্মিক, তাঁহার পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব, তাহা বৈষ্ণব টীকাকারগণ একরূপ বুঝাইয়াছেন। মধুসূদন বলিয়াছেন, ধর্ম্মের হানিকালে সাধুদেরও ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা হয়। তাহাদের দৈব প্রকৃতি মলিন হইয়া যায়। এজন্য তাহাদিগকেও প্রকৃত ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দেওয়া, ও তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। ইহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যে অধার্ম্মিক, তাহাকে উদ্ধার না করিয়া বিনাশ করা কি ঈশ্বরের কাজ ? আর এরূপ উক্তি কি ঈশ্বরোচিত বা ধর্ম্মসঙ্গত উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ? স্বামী এই কথার একরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলা যাইতে পারে।

জগতের নিয়ম এই যে, যে অধার্ম্মিক, সে কঠোর সাধনা ব্যতীত ধর্ম্মপথে যাইতে পারে না। সে আসুরী বা রাক্ষস স্বভাবযুক্ত রজঃ ও তমোগুণের অধীন। তাহার কর্ম্মসূত্র সে নিজ চেষ্টায় সহজে ছিন্ন করিতে পারে না। ব্যক্ত কি আধ্যাত্মিক জগতের কঠোর নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তবে যদি অধার্ম্মিকের মনে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুকৃতির প্রভাবে ও সত্ত্ব শক্তির সহায়ে সে বীজ অঙ্কুরিত হয় ও ক্রমে জন্ম জন্ম ধরিয়া সাধনার ফলে ধর্ম্মের পথে সে অগ্রসর হইতে পারে। চুম্বক লৌহেতেই চুম্বক শক্তির স্ফূর্ত্তি করে। ভগবান ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য অবতীর্ণ হইয়া সত্ত্ব শক্তির বিকাশ করিলে, কেবল যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত আছে, সেই সাধু হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ কেবল তাহারই উপর সম্ভব হয়। যে আসুরী প্রকৃতি-সম্পন্ন, সে ঈশ্বরকে বা আত্মাকে জানিতে পারে না। সুতরাং অবতীর্ণ পুরুষকেও জানিতে পারে না—এমন কি, শ্রেষ্ঠ ভাবিয়াও তাঁহার আচরণ অনুসরণ করে না। সে অবতার স্বীকার করে না। সে তাঁহার শত্রু হয়।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানো আসুরং ভাব মিশ্রিতাঃ॥"

গীতা। ৭। ১৫।

আর—"অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।"

গীতা। ৬। ৬

এইরূপ লোক আপন দুষ্কৃত হেতু অধোগামী হয়—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"

গীতা। ১৬। ১৯।

অতএব এস্থলে 'বিনাশ' অর্থে একেবারে ধ্বংস বুঝায় না। গীতায় বুঝান আছে জীবের জন্ম মৃত্যু নাই (ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ—২।২০) আত্মা কাহাকে হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না (নায়ং হন্তি ন হন্যতে—২।১৯) সুতরাং দুষ্কৃত নিধন অর্থে এই বুঝা যায় যে, অধার্ম্মিক যাহাতে ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপথে অন্তরায় না হয়,—জগতের ক্রমোন্নতির পথের অন্তরায় না হয়, বিধাতা ইহারই বিধান করেন।

পুরাণে দুষ্কৃতনিধন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, যে অবতীর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হয়, সে একেবারে স্বর্গে চলিয়া যায় বা মুক্ত হয়। তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যাহা বিনাশ বলিয়া বোধ হয়,তাহাই তাহার উদ্ধারের উপায়।

আরও এক কথা বলা আবশ্যক। যতক্ষণ মায়াবশে লোকের ভেদদৃষ্টি থাকে, ততক্ষণই তাহার নিকট এ জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার নিকটই ভগবানের অবতার ও কার্য্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমাদের জ্ঞানের এইরূপ অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই যে,জগতের ক্রমবিকাশের সহিত মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সেই উন্নতির জন্য ধর্ম্মের বৃদ্ধি প্রয়োজন। অধর্ম্মের রাজ্য ধ্বংস করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার প্রয়োজন। যুগে যুগে অধর্ম্মের আধিক্য সময় অধার্ম্মিকের বিনাশ দ্বারাই ধর্ম্মসংস্থাপন হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। যাঁহারা দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন বা শুদ্ধসত্ত্ব মায়া জড়িত, তাঁহারা জগৎকার্য্য মধ্যে কেবল ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দর্শন করেন। জগতের মধ্যে কোন সয়তানের কার্য্য দেখিতে পান না। ইহাঁরা এই অধার্ম্মিকের বিনাশকার্য্য ঈশ্বরে ব্যতীত অন্য কাহাতেও আরোপ করিতে পারেন না। কেন না, জগতে ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তিই কার্য্য করে না। তবে যে কার্য্যে জগতে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাই বিশেষতঃ শুদ্ধ মায়া উপহিত ঈশ্বরের কার্য্য, ইহাই ধার্ম্মিকের মনে প্রতিভাত হয়। যাহার জ্ঞান বড় মলিন, সে জগতে ঈশ্বরের অবতার বা কার্য্য দেখিতে পায় না। কেবল যাহার জ্ঞান অল্প মলিন, বিশুদ্ধ মায়াবৃত সেই এইরূপে জগৎতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে। তাহার পর যখন মানুষ সাধনা সিদ্ধ হইয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া, দিক কাল কারণসূত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, এই বহুত্ব পূর্ণ জগতে কেবল অদ্বিতীয় এককে দর্শনকরে,জগৎ স্বপ্নময় ধারণা করে,তখন তাহার নিকট ঈশ্বরের অবতারও মায়াময় বা কাল্পনিক বোধ হয়। তখন সে অন্যকে অধার্ম্মিক, ভগবানের রিপু, বা নারকী এবং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করেন, এরূপ আর মনে করে না। তখন সে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্মের আধ্যাত্মিক অর্থ ধারণা করে। তখনই সে এই জন্ম ও কর্ম্মের দিব্যত্ব বুঝিতে পারে। তখনই সে ভগবানের জন্মকর্ম্মতত্ত্ব স্বরূপেতে জানিতে পারে। (মধুসূদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের অবতার ব্যাখ্যা কতকটা এইরূপ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি)।

এস্থলে বলা উচিত যে, কোন কোন আধুনিক টীকাকার এইরূপ গোলযোগের মধ্যে না গিয়া সহজ অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, দুষ্কৃত দমন অর্থে পাপের দমন, পাপীর নিধন নহে। এরূপ অর্থ আদৌ হইতে পারে না। 'দুষ্কৃতাম্' বলিলে দুষ্কর্ম্মকারীদের ব্যতীত আর কাহাকে বুঝায় না। ভগবানই কালরূপে সকলেরই বিনাশকারী। জগতে অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই। তাঁহার সেই বিরাট কালরূপী অবতার দেখিয়াই অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ"

সুতরাং তাঁহাকে বিনাশকারী বলিতেই বা আপত্তি কি? ভগবান্ যে প্রতি অবতারেই সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃত নিধন ও ধর্ম্মস্থাপন কার্য্য সমস্তই একেবারে করেন, তাহা নহে। কোন অবতারে তিনি কেবল সাধু পরিত্রাণ করেন (বামন, বুদ্ধ...)। তিনি কখন লোক সংগ্রহার্থ বিহিত কর্ম্ম করিয়া সাধারণকে উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া সাধুকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যান। কোন অবতারে তিনি কেবল দুষ্কৃত নিধন করেন (নৃসিংহ, পরশুরাম)। (চণ্ডীতেও এইরূপ অসুর নিধন বর্ণিত আছে।) কোন অবতারে অন্য উপায়ে তিনি ধর্ম্মস্থাপন করেন। তবে ভগবান্ বাসুদেবেই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ বিকাশ। ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

১। গোবিন্দ দাসের করচা—

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-সঙ্কলিত। মূল্য ৸০। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে যেমন সম্মানিত, সাহিত্যানুরাগী সমাজে তেমনি সমাদৃত। এই বহুমূল্য গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থখানি যে অসম্পূর্ণ, ইহা পণ্ডিত মহাশয় কোথায়ও পরিচয় দেন নাই। ইহা যে অসম্পূর্ণ, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষের নিকট পণ্ডিত মহাশয় পুঁথিখানি রাখিয়া আসেন। সেখান হইতে কোন প্রকারে কয়েকটী পাতা হারাইয়া যায়। আর পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দ দাসের করচা বলিলে গ্রাহক সমগ্র গ্রন্থ পাইলাম বুঝিবেন। পণ্ডিত গোস্বামী সাহিত্যানুরাগী সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার শৈবলিনী সামান্য সমাদর লাভ করে নাই। তিনি কেমন করিয়া অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ বলিয়া লোক সমাজে প্রচারিত করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি নাই।

গোবিন্দ দাসের নিবাস বর্দ্ধমান, কাঞ্চন নগরে। গ্রন্থের সূচনায় তিনি নিজে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম
শ্যামাদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম।
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার।
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নিগুর্ণ মুরখ বলি গালি দিলা মোরে
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে।
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরাতে যাই
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই।"

চৌদ্দশ সাত শকে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং গোবিন্দ ও চৈতন্যদেব প্রায় সমবয়স্ক। যে সময়ে গোবিন্দ কাঞ্চন নগর ছাড়িয়া কাটোয়ায় উপস্থিত হন, তখন শ্রীচৈতন্যের নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। সংসার-বিরক্ত গোবিন্দ চৈতন্যের শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন। যখন নীলাচল হইতে বৈষ্ণববীর ধর্ম্ম প্রচারার্থ দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করেন, গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এবং কোথায় কি কাণ্ড হইয়াছিল,এই করচা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সামাজিক রীতি নীতি, তীর্থ সকলের অবস্থা, পথ ভ্রমণের বিপদ আপদ ও বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, গোবিন্দ দাসের করচা পড়িয়া বেশ বুঝা যায়। গোবিন্দ দাস পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু যে বংশীরবে রত্নাকরকে কবি বাল্মিকীতে,সল্‌কে ধর্ম্মগুরু পলে পরিণত করিয়াছিল,সেই বংশীরবে "নিগুর্ণ মুরখ" গোবিন্দ দাস কবির উচ্চ পদলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ও মুরারি গুপ্তের করচা হইতে কবিরাজ গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যভাগবত লিখিতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। গোবিন্দের গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈতের বিচার নাই, একটী শ্লোকের চৌষট্টি ব্যাখ্যা নাই ; কিন্তু সোজা কথায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, সহজে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয়। যাঁহারা চৈতন্য-সন্ন্যাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভাল বাসেন, তাঁহারা অমিয় নিমাই চরিত পড়িবেন। দেখিতে পাইবেন, ব্যাধেরা যেমন পয়সা রোজগার করিবার জন্য দয়ার্দ্র লোকের নিকট পক্ষী ধরিয়া যন্ত্রণা দেয়, শেষে পয়সা পাইলে পাখীটীকে ছাড়িয়া দিয়া থাকে,

জীবের পাষাণ হৃদয় গলাইবার জন্য তাই নাকি শ্রীচৈতন্য শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে এত যাতনা দিয়াছিলেন। গোবিন্দ এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আভাস মাত্র দেন নাই। সরল মনে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখন বাঙ্গালী ভারতবর্ষের তীর্থ-দর্শনে যাইলে যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন নাই, সেখানে হিন্দীভাষায় কোন প্রকারে মনের ভাব গোচর করেন। সে কিন্তু সামান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয়ে। ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলে হিন্দীভাষাও যথেষ্ট হয় না, এবং যেখানে যথেষ্ট হয়, সেখানেও যতটা হিন্দী জ্ঞানের আবশ্যক, অতি অল্প লোকের ততটা জ্ঞান থাকে। এজন্য আজকাল প্রচারককে ইংরাজী ভাষার সাহায্য লইতে হয়। চৈতন্যদেব হিন্দী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, তবে তিনি কোন্ ভাষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার কবি বিদ্যাপতি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বুদ্ধদেব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সকলের বোধগম্য প্রাকৃত পালিভাষার সর্ব্বত্র প্রচলন করেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। বাঙ্গালাভাষাতেই চৈতন্যদেব গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।" ত্রৈলোক্য বাবুর ভাষা এখানে কিছু অসংযত হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য। তৈলঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালা ভাষায় চৈতন্যদেব উপদেশ দিয়াছিলেন, এ কথা তিনি কখন স্বীকার করিবেন না।

শ্রীচৈতন্য যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দরবারের ভাষা ফার্সি। পণ্ডিতগণ পরস্পরে সংস্কৃত ভাষায় চিঠি পত্র লিখিতেন। আমরা অন্য প্রবন্ধে জীবগোস্বামী, গোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া এ কথার প্রমাণ করিয়াছি। সভা সমিতিতে পণ্ডিতে অদ্যাপি সংস্কৃত ভাষায় বিচার করেন ও উপদেশ দেন। রামানন্দ, রামগিরি প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিত ও মোহন্তগণের সহিত শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতেন, কিন্তু বিচার ভিন্ন তিনি অন্য কার্য্য করিয়াছিলেন। বৃক্ষমূলে হাটে বাজারে তিনি সাধারণ লোককে অমূল্য উপদেশ দিতেন, রীতিমত বক্তৃতা করিতেন। এগুলি কোন্ ভাষায় হইত? গোবিন্দ দাস এমন অনেকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চৈতন্যদেব কি ভারতের সকল ভাষা জানিতেন? অথবা প্রেম জন্মিলে ভাষাজ্ঞান আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়? গোবিন্দ উপদেশ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনিও কি প্রভুর ন্যায় সহস্র ভাষা অধিকার করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে গোবিন্দ দাস যাহা বলিয়াছেন, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"উপদেশে এইদেশ মাতাইল প্রভু।
এমন প্রভাব মুই দেখি নাই কভু॥
কখন তামিল বুলি বলে গোরারায়।
কভুবা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে নাচায়॥"
"এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল।
চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল॥
এই স্থানে আড্ডা করি বত দুষ্টজন।
ডাকাতি করিয়া করে জীবন যাপন॥
একজন লোক আসি কাঁই মাঁই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমজিয়া।
কাঁই মাঁই করি তারে দিলেন বুঝিয়া॥"
"না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে॥
এই দেশে তীর্থ পর্য্যটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল॥
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥"

এমন অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে দুই চারিখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পাঠ মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য ছিল। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় সম্পাদকের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ দাসের করচার নূতন সংস্করণের অভাব আছে।

২। কবিবিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ,বি-এল প্রণীত। মূল্য ৸৹। ত্রৈলোক্য বাবু সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। যে কয়টী লোক মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহাদের অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে অর্থ,সময় ও মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়া সাধারণ লোকের উপেক্ষা সহ্য করিতে হয়—ভরসা, ভবিষ্যতে একদিন তাঁহাদের সেবায় লোকের উপকার হইবে। ব্যবসাদার গ্রন্থকার লোকানুরাগ ও লক্ষ্মীর প্রসাদ উভয়ই লাভ করেন। কিন্তু চিন্তাশীল সুলেখকগণের দীর্ঘ চিন্তা সমুদ্ভূত গ্রন্থমালা অনাদরে স্তূপীকৃত হইয়া কীটের আহার্য্যে পরিণত হইতেছে।

ত্রৈলোক্য বাবুর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ। সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রে তাঁহার গৌরব অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ সমাজে তাঁহার আদর হয় নাই। ফ্রান্স বা জার্ম্মানীতে এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইলে, গ্রন্থকারের আদরের সীমা থাকিত না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের গুণে সে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় গ্রন্থকারকে আপন তহবিল হইতে দিতে হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের জননী। ক্রম পর্য্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যের পরে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হয়। এ পর্য্যন্ত যে দুই তিন খানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশ বলিয়াই তাহাদিগকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ। সেখানিও কল্পনা ও জল্পনায় পূর্ণ আখ্যায়িকা মাত্র। শুনিয়াছি,বাবু দীনেশ চন্দ্র রায় একখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতেছেন। ত্রৈলোক্য বাবুর গ্রন্থখানিও প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড। মহাজন পদাবলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। বিদ্যাপতি,চণ্ডীদাস,গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরাজ গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত হইয়াছে। নব্যভারত ও সাহিত্যে বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণাল ও ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়েটীতে গ্রীয়ার্সন ও বীমস্ সাহেব যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র,অক্ষয়চন্দ্র সরকার,সারদা প্রসাদ মিত্র,রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,রামগতি ন্যায়রত্ন ও রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থ গুলিও মিলাইয়া সকলের সমন্বয় করিয়া গ্রন্থকার আপন মত নির্ভয়ে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও স্বদেশানুরাগ প্রশংসনীয়। তাঁহার এইরূপ চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট চির-ঋণী।

বিদ্যাপতির জীবন-চরিত উপলক্ষে গ্রন্থকার মিথিলার ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। মিথিলা বাঙ্গালার জনকপুর। এ জনকপুরের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত না হইলে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। মিথিলার ইতিহাসের সহিত নেপালের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিদ্যাপতির জীবনচরিতের আলোচনা ক্রমে গ্রন্থকার মিথিলা ও নেপালের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুরূহ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার মত কয়জন মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন?

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নিরূপণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। বিদ্যাপতির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুইটি তারিখ নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রহণ করা যায়। (১) বিসফির দানপত্রে লেখা আছে, সন ৮০৭, সংবৎ ১৪৫৫, শাকে ১৩২১। (২) তিনি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে, ১৪৫৬ খ্রীঃ, শ্রীমদ্ভাগবতের স্বহস্ত প্রতিলিপি সম্পূর্ণ করেন। ১৪০০শত খ্রীষ্টাব্দে সুকবি সুপণ্ডিত ও নবজয়দেব উপাধির সহিত বিস্তৃত জমিদারীর দান পাইবার সময় তাঁহার বয়স খুবকম হইলেও পঁচিশ বৎসরের কম হইবে না,কেহ ত্রিশ,চল্লিশ বৎসরও অনুমান করিতে পারেন। ত্রৈলোক্য বাবু অনুমান করিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অষ্টাদশ

বৎসরের বালক রাজসভায় অন্যান্য সুকবি ও সুপণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া বিস্তৃত ভূমিখণ্ড উপহার পাইবেন, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। কি কারণে জানি না, ত্রৈলোক্য বাবু অনুমিত ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দকে ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিয়াছেন। অন্যদিকে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী প্রভৃতি সন্দিগ্ধ গ্রন্থগুলিও বিদ্যাপতির রচিত স্বীকার করিয়া লইয়া ১৩৮২ হইতে ১৫০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১২৪ বৎসর বিদ্যাপতির জীবিত কাল নির্ণয় করিয়াছেন। দুর্গাভক্তি রাজা ভৈরবসিংহের আদেশে রচিত হয়। তিনি ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪বৎসর কাল মিথিলায় রাজত্ব করেন। যে বৎসর ভৈরবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, সেই বৎসরেই তিনি দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করিবার অদেশ করেন। সেই বৎসরেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পরে বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়, এতগুলি অনুমান না করিলে, বিদ্যাপতি অন্যূন একশত ত্রিশ কি এক শত পঁয়ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন,বিশ্বাস করিতে হইবে। বস্তুতঃ দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী ও বিদ্যাপতির অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা এত ভিন্ন যে, দুর্গাভক্তি তাঁহার লেখা বলিয়া বোধ হয় না। দেবসিংহ, শিবসিংহ,লখিমাদেবী, পদ্মসিংহ, বিশ্বাসদেবী, নরসিংহ,বীরসিংহ ও ভৈরবসিংহ—এই আট জন রাজার রাজত্ব কালে একই ব্যক্তি রাজ সভা পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন—ইহা লীলাময়ী প্রাচ্য কল্পনারও দুরধিগম্য।

জয়দেব,প্রতাপাদিত্য ও ত্রিলোচন দাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমরা ত্রৈলোক্য বাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই। তথাপি ত্রৈলোক্য বাবুর গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয় হইয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ যতদিন উপেক্ষিত হইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গল নাই। কেবল মিষ্ট মিষ্ট গল্প পাঠ করিয়া কোন দিন কোন জাতি বড় হয় নাই। কেবল গল্প-পুস্তকের বাহুল্যে কোন ভাষা কখনও গণ্য হয় নাই। এদেশের সমাজ, হায় কবে, বিদ্যাপতির ন্যায় গ্রন্থের আদর করিতে শিখিবে।

৩। আমাদের সমাজ।—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী বিরচিত। মূল্য।৵০। গোস্বামী মহাশয় সুপণ্ডিত ও সুলেখক। ভগবদ্গীতার উৎকৃষ্ট অনুবাদে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের দুরবস্থায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। ধাতু নিঃস্রবের ন্যায় জ্বলন্ত ভাষায় তিনি হৃদয়বেদনা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন,এবং নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ন্যায় হিন্দুসমাজের গলিত অংশ শলাকা দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু সন্তানকে আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রসাদ দাস বাবু ধনবান, আমরা আশা করি,তিনি এই গ্রন্থের দশ সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন।

৪। হরিলীলা।—শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য।০। এখানি রূপক গ্রন্থ। অসাধুকে লীলাময় হরি কিরূপে সাধু করেন, উপন্যাসচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। রঙ্গনাথের নানা রঙ্গের এক অধ্যায় এস্থলে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভাবুক ও ভক্ত। গ্রন্থখানি ভাবুকগণের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে।

৫। আর্য্যকাহিনী।—শ্রীরাজেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য।০। বালকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোথায় কোথায়ও একটু গ্রাম্যতা দোষ থাকিলেও, গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও মিষ্ট। দুঃখের বিষয়, ছাপা ও কাগজ অতি কদর্য্য। ঢাকার সব বিষয়ে উন্নতি হইতেছে,কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি কেন হয় না,বুঝা যায় না।

৬। জীবন।—শ্রী অক্রুর চন্দ্র সেন প্রণীত। মূল্য।৵০। এখানি বালকের কবিতা রচনার প্রথম উদ্যমের মত অসার ও অসংযত। প্রবীণ লোকের উপদেশ লইলে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রকাশ করিতেন না।

৭। সব্জীবাগ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত। মূল্য॥০। অল্পের মধ্যে নানাবিধ শাক সব্জী উৎপাদনের প্রণালী ইহাতে বর্ণিত

হইয়াছে। সাধারণ লোকে জানে না, এমন কথা ইহাতে অল্পই দেখিলাম। বাগানের বুড়া মালির কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ছাপাইলে সব্‌জীবাগের মত পাঁচ সাতখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে।

৮। আর্য্য-শাস্ত্র প্রদীপ।—শ্রীরামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১ম খণ্ড,১ম সংখ্যা, প্রথম অংশ। আটপেজী দুইশত বত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হয় নাই।

৯। ন্যায়দর্শন।—গৌতম সূত্র নূতন টীকা এবং বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমেত টাকীর সুবিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ, বি-এল মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী দ্বারা প্রকাশিত; প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক। এই গ্রন্থ অন্যূন ১০০ ফর্ম্মায় ১০ খণ্ডে শেষ হইবে।

এই দুই খানি পুস্তক শেষ হইলে আমরা বিস্তৃত সমালোচনা করিব। শাস্ত্রপ্রদীপ শেষ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। ন্যায়দর্শনের টীকা ও অনুবাদ উত্তম হইতেছে এবং বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার বাহাদুরের সাহায্যে সম্পূর্ণ হইবারও সম্ভাবনা আছে। হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে ন্যায়দর্শনের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সে জন্য বাঙ্গলায় এরূপ একখানি পুস্তকের অভাব আছে। যতীন্দ্র বাবু ন্যায় ও বেদান্ত-দর্শনের আলোচনার উৎসাহ দিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার অভিপ্রায় শুভ। তাঁহার অর্থ এইরূপ শুভকর্ম্মে ব্যয় হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

১০। প্রতিধ্বনি।—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, ১নং হেরিংটন্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

দ্বাদশ বৎসরের বালিকা, কৃত্রিম ঘরকন্না ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন, এ দৃশ্য বঙ্গদেশে এত শীঘ্র দেখা যাইবে, এমন আশা ছিলনা। এত অল্পবয়সে কাব্যজগতে প্রবেশ লাভ, শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই সাধারণ ঘটনা নহে। মৃণালিনীর বয়স এখন ১৬ বৎসর মাত্র; "প্রতিধ্বনিতে" তাঁহার "১২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত" বিরচিত কবিতা গুলি স্থান পাইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালিকার কবিত্ব শক্তির কিরূপ বিকাশ হইয়াছে,এই পুস্তকে সুশৃঙ্খলার সহিত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম উদ্যমের ভাষা এবং ভাবের অপরিপক্কতা কিছু অস্বাভাবিক নহে। এই কবিতা-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, কোমল-হৃদয়া বালিকার কচি হাত খানির ক্রমশঃ পরিপক্কতা লাভ—নির্ম্মল নির্লিপ্ত ক্ষুদ্র বালিকা-হৃদয়ের একটু একটু করিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাঝটিকার আবর্ত্তে অভিজ্ঞতা এবং আসক্তি লাভ যেন সহজেই দেখা যায়। গদ্যে পদ্যে বড় বেশী কিছু আসিয়া যায় না; কাব্যের প্রাণ ভাব-রাশিতে। ভাষা ভাববিকাশের সহায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবের খাঁটি সৌন্দর্য্য—স্বর্গীয় সুষমা, ভাষা কখনও ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। সৌন্দর্য্য মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার-বিভূষিতা হইলে অবশ্যই নয়ন-তৃপ্তিকর হয়, তাই বলিয়া নিরাভরণা, মলিন-বসন-পরিহিতা প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি নয়ন মনের আনন্দবর্দ্ধক নহে? কেহ কেহ ইহাকেই অধিক ভালবাসেন। কথা সকলেই বলে, ভাষা অনেকেই ব্যবহার করে, কিন্তু ভাবে কয়জন? সজীব মূর্ত্তিমতী ভাষা কোথায় মেলে? প্রকৃত ভাব সুকবির হৃদয়-প্রসূন; অথবা কবি-হৃদয়ই ভাবময়। ভাবের আদর আছে তো কবি হৃদয়ও পূজনীয়। এই হৃদয় লইয়াই কথা। যে কাব্য কবি-হৃদয়কে উন্মোচন করিয়া পাঠকের সহিত পরিচিত করিয়া দেয় এবং অচ্ছেদ্য ভক্তি এবং প্রেমের বন্ধনে উভয়কে সংবদ্ধ করে, তাহাই সাহিত্যের গৌরব। যে পাঠক,ভাষার প্রাচীর পার হইয়া, মহত্ত্ব-মণ্ডিত কবি-হৃদয়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ প্রাণে,ভক্তিভরে প্রণত হয়, তাহারই কাব্য অধ্যয়ন সফল, তাহারই কাব্য-সম্ভোগ প্রকৃত।

করুণরসাত্মক গীতি-কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোভূষণ। বাঙ্গালী ইহাতে যেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, অন্য কোন বিষয়ে তদ্রূপ নহে। জয়দেব বিদ্যাপতির আবেগময়ী মাধুরীতে কাহার না প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়ে? বর্ত্তমান বঙ্গের কোমলহৃদয়া মহিলা কবিদিগের হাতে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ গৌরব এই গীতিকবিতা উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ

করিয়াছে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সমস্ত প্রীতি-রসের আধার এবং জনয়িত্রী নারী-হৃদয়ই বুঝি গীতিকাব্যের প্রকৃত লীলাক্ষেত্র! এই মহিলা-কবিদের কবিতা পাঠ করিয়া প্রশান্তি-লোভী বাঙ্গালী-হৃদয় প্রীতি-রসে স্নাত এবং দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। ইহাতে মহাকাব্যের মহা-মত্ততা নাই সত্য, কিন্তু গভীর নিশীথে গ্রাম্য নিস্তব্ধতা-প্রবাহিত সুদুর বংশীরবের ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন আছে; পড়িলে প্রাণ অবশ এবং শিথিল হইয়া পড়ে।

জড় বিজ্ঞান, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে আমরা ইংরাজের মুখাপেক্ষী; কিন্তু একথা আজ সাহস করিয়া বলিতে পারি, করুণ এবং প্রীতিরসের শ্যামল স্নিগ্ধতা পরিপূর্ণ গীতি-কাব্যে বাঙ্গালী ইংরাজ অপেক্ষা হীন নহে। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসের কোন্ যুগে, অশিক্ষিতা বঙ্গের কামিনী, গিরীন্দ্রমোহনী, মানকুমারী, প্রমীলা, মৃণালিনীর ন্যায় এত গুলি মহা-মনীষা-সম্পন্ন মহিলা-কবির যুগপৎ অভ্যুত্থান হইয়াছে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গসাহিত্যের এই উজ্জ্বল রত্ন, এই উচ্চ শ্রেণীর গীতিকাব্য—যেন কেবল এক বিরহের সুরে বাঁধা—কেবল হা হতোস্মি পরিপূর্ণ, চির উদাসময়—যেন ইহাতেই কেবল খোলে ভাল! যাহারা বিরহী, শান্তিহারা, তাহাদের কাছে ইহা বিশেষ আদরের, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা মিলন-সুখোৎফুল্ল, যাহারা আশা-পূর্ণ, তাহাদের ব্যবস্থা কই? মৃণালিনী বালিকা মাত্র; ইহার এই প্রথম উদ্যমের কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর আসন-যোগ্য বলিতেছি না; কিন্তু ইনি যে সেই চিরন্তন বিরহের উদাসময় তান ধরেন নাই, মিলনের সুরসাল শান্তিময় মধুরতা কীর্ত্তন করিয়া আধুনিক বঙ্গ-গীতি-কাব্যে এক অভিনব পথ দেখাইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, বয়োবৃদ্ধির সহিত, মৃণালিনী তাঁহার সৌন্দর্য্য-ময় হৃদয়ের দীপ্তরাগ দিয়া বঙ্গকাব্যকে দিনে দিনে সুরঞ্জিত করুন।

কাব্যেই যদি কবি-হৃদয়ের অভিব্যক্তি—সাকার মূর্ত্তি, তবে প্রতিধ্বনির পাতাগুলি আস্তে আস্তে সরাইয়া অতি সন্তর্পণে এই স্বর্গীয় শিশির-স্নাত সুন্দর হৃদয়-কুসুমটীকে একটী বার দেখিয়া লইতে আপত্তি করিবে কি?

প্রথমেই একটী সুন্দর বিশ্বব্যাপী সার্ব্ব-ভৌমিক প্রেমের প্রীতিময় প্রতিকৃতি। যেন প্রেম-বিহ্বল ক্ষুদ্র হৃদয়টী হাতে করিয়া কবি ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, যাহাকে দেখেন, অমনি সমগ্র হৃদয়টুকু দান করিয়া ফেলেন! এই সময়ে কবি মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দর্শনে প্লুত-আঁখি; শিশুর সরল হাসিতে আত্মহারা, ফুলের ফুল্ল শোভায় বিমোহিত; জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে প্রতি-জ্ঞাবদ্ধ; পাপীর প্রতি দয়াবান; নীরব নিশির সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত। এই গদগদ ভাব কিন্তু অনেক দিন থাকিল না। বালিকা-হৃদয়ের পূর্ণতা যেন একটু স্খলিতপদ হইল; আসন্ন যৌবনের শূন্যতা এবং ব্যাকুলতা অজ্ঞাতভাবে কবি-হৃদয়ে একটু একটু সঞ্চা-রিত হইতে লাগিল; কি যেন এক রকম একটা অব্যক্ত "অভাব" বোধ হইল।—

> "কি যেন অভাব আছে, কি যেন নাহিক কাছে,
> কি ধনে বঞ্চিত যেন—অন্তরেতে জানা যায়।
> কি রতন লাগি সদা প্রাণ করে হায় হায়!"

মানসিক বৃত্তির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য গ্রহণ এবং সম্ভোগ-স্পৃহার বিকাশ এবং বৃদ্ধি। এই অবস্থায় ব্যাকুলতা অবশ্যম্ভাবী; ব্যাকুলতার অনুচর "দুঃখ"। "বসন্ত পূর্ণিমার" অনুপম শোভা দেখিয়া যেমন কবির "পরাণ-আকুল," তৎসঙ্গে এই পূর্ণিমা নিশিতেই বিমল জ্যোৎস্না-স্নাত অম্বরে কবি প্রথম "দুঃখের গীতি" শুনিতে পাইলেন (৩১পৃঃ)। কিন্তু এখনও ঝড় বহে নাই, বান আসে নাই, এ কেবল পূর্ব্বকার নিস্তব্ধতা, মন্থরগতি। এখনও সেই প্রশস্ত-চিত্ততা, অদ্ভুত উদারতা, দেবতা-সুলভ স্বার্থ বিসর্জ্জন—বুঝি পূর্ব্বের সেই অনাবিল খাঁটি বিশ্ব-প্রেমেরই অন্ত্যলীলা মাত্র (৩১—৩৩পৃঃ)। এই বিক্ষিপ্ত প্রেমরাশি, ইহার পর, সম্মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড স্রোতস্বিনীতে পরিণত, ইহা অতি গভীর—অতি আবেগময়। কবি এখন দাম্পত্য প্রেমের মধুময় মহাযোগের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত

(৩৪-৪২ পৃঃ)। একই মহাভাবে বিভোর এবং হৃতচেতনা, নিসর্গ সৌন্দর্য্যের অতীত এবং অনমনীয় "এবার বসন্তঋতু জাগাতে পারে নি মোরে"। সুপ্তোত্থিত চকিতের ন্যায় এক দিন কবি দেখিলেন, মলয়-সহচরী কুসুম-সুরভি-পরিপ্লুত পিককুল-মুখরিত সাধের বসন্ত "কখন এলো, কখন বা হলো অবসান।" প্রাণে বড় লাগিল, কিন্তু পাঠক বুঝিলেন, এ বেদনা অন্যরূপ, শুধু বসন্তের অন্তর্দ্ধান জন্য নহে :—

"বসন্ত গিয়েছে চলে, হলোনারে ফুলতোলা,
কি দিব তোমার গলে, গাঁথা তো হয়নি মালা।"
(৪২ ৪৫ পৃ)

বাঁশী কাব্য জগতের এক অতুল সৃষ্টি। কল্পনার মধুর মলয়-কম্পিত ভাবের লহরী-মালা লইয়া কাব্য। ভাবসাগরের উত্তুঙ্গ-তুফান পরিপূর্ণ মহাবেগবতী সর্ব্বশান্তি-বিনাশী খর স্রোতের যাবতীয় রুদ্রতা এবং উগ্রতার চরম সমাবেশ—বিরহীর সদা-অস্থির চির-অতৃপ্তিময়, চির-লাঞ্ছিত উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে। নিশা দ্বিপ্রহরে, জগৎ যখন বিগত-চেতন, মৃতকল্প, অব্যয়িত, সামর্থ্যধারী ইন্দ্রিয়কুল গভীর অন্ধকার এবং নীরবতায় ভীত, দিক্‌-শূন্য, সহায়হীন, ক্লৈব্য এবং শিথিলতার কোটর-প্রবিষ্ট; কেবল মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় অপর সকলের কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া প্রহরীরূপে জাগ্রত এবং কার্য্যশীল; তখন—সেই ভীষণ সময়ে—উৎগ্রীব উৎকর্ণ "ঐ বুঝি আসিল"—"ঐ—বুঝি—শোনা যায়" ভাবপূর্ণ, নিরন্তর সূচিকাঘাতবৎ যাতনাক্লিষ্ট, বিরহীর জ্বলন্ত হৃদয়ের সমস্ত হুতাশন রাশি—এই এক শ্রবণ-দ্বার দিয়াই বহির্গমন প্রয়াসী। এই মহাভাবময় আহা উহু পরিপূরিত হৃদয়োদ্গারে যদি মর্ম্মস্পর্শী বংশীধ্বনি না শ্রুত হয়, তবে যে কোথায় হইতে পারে, তাহা বুঝি না। তাই, এই নিশার নীরবসঙ্গীতের ন্যায় কি যেন কি মাধুরীপূর্ণ অব্যক্ত উদাস-ভাবময় হৃদয়ে, কবি সুদূর দ্বাপরের যমুনা-তীর-বদ্ধ-হৃদয়া ব্রজাভি-সারিকাগণোদ্দিষ্ট বৈদ্যুতী প্রভাবপূর্ণ বংশীরব শুনিতে পাইলেন।

"সখি, পরাণ পাগল করে কে ডাকে মধুর স্বরে,
কে বাজায় বাঁশী কোন সুরপুরে?
চল সই! দেখে আসি তারে।"

এই স্বপ্নময় ঢুলু ঢুলু অবস্থাতে, স্মৃতির অতি রসাল অথচ নির্ম্মম প্রহার অবশ্যম্ভাবী :—

"কবে কোন্ সন্ধ্যাবেলা সেই মুখখানি গো
দেখেছিনু যমুনার তীরে।
সে দিনের সান্ধ্য রবি ম্লান ছবি খানি গো
আঁকা ছিল সে মুখের পরে।
মনে পড়ে অস্ফুটন্ত সেই তনুখানি গো
অবসন্ন বিষাদের ভারে। ইত্যাদি।

এবং "অসম্ভব আশা" হৃদয় যাহা কিছু একদিন পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রেত-মূর্ত্তি সকল বড়ই ভীতি এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়; অসহায় অনন্যগতি কবি-হৃদয়ের বিষাদময়ী ভাষা স্বতঃই বলিয়া উঠে—

"হৃদয়ের তীব্র আশা পুড়ে হোক ছাই!"
"সহিতে হইবে মোরে, অকাতরে সহিব।
কেঁদে সুখ পাই, সখি! চিরদিন কাঁদিব।
বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে মালা গেঁথে রাখিব,
ভুলে যদি কাছে আসে, গলে তার পরাব"।

এই সময়ে মানবের কি দুরবস্থা হয়, তাহা ভুক্তভোগীরই অনুমেয়। অপার ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত, আত্মীয় বান্ধবের অযাচিত করুণায় ভাসমান থাকিয়াও মানুষ এই সময়ে নিজের চিরদুর্ব্বল এবং অসহায় একাকীত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাশ্রুনেত্রে, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের অবলম্বন উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ভবার্ণবের একমাত্র কাণ্ডারীর শরণাপন্ন হয় —

"ঊর্দ্ধে দেখি মহাশূন্য অনন্ত আকাশ, নীচে
সমুদ্র অপার।
উভয়ের মাঝখানে একেলা দাঁড়ায়ে আছি,
নাই পারাবার।"
"মহাশূন্য স্থানে এই, শুনি শুধু সমুদ্রের
ভীষণ গর্জ্জন।
আমিও তাহার সাথে সকাতরে ডাকি সেই
ব্রহ্ম সনাতন।"

কবির এই অবস্থার প্রার্থনাকয়টী কি সুন্দর, কি ব্যাকুলতাময়! ভগবৎপ্রেমের কি এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে, মানব-হৃদয়ে ইহার আবির্ভাব হইলে, সেখান হইতে, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায়, সমস্ত ক্ষুদ্রতা, স্বার্থচিন্তা এবং ভেদজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে স্বর্গীয় প্রেমের ফুল্লকুসুম ফুটিয়া উঠে :—

"পারিনা পারিনা দেখিতে যে আর,
ভায়ে ভায়ে এত ছলনা,

পিতা পরমেশ! তব রাজ্যে কেন,
এত অবিচার বলনা?
ভায়ে ভায়ে পুন জাতিভেদ কেন
জাতি কারে বলে জানিনা।
তোমার অধম সন্তানদের, বুঝেছি এ শুধু কল্পনা।"
"অধীনতা প্রথা যাইবে উঠিয়া সবাই স্বাধীন হইবে।
মানুষ হইয়ে মানুষের কেন দাসত্ব আবার করিবে?"

এই দীর্ঘ প্রার্থনা এবং ভগবৎনির্ভরের ফল স্বরূপ কবির নবজীবন এবং নবদৃষ্টি লাভ হইল। পূর্ব্বে যেখানে নিরাশা-সম্ভূত অন্ধকার এবং যন্ত্রণাদায়ী প্রহেলিকাকুলের রাজত্ব ছিল, এখন সেখানেই শান্তিময় সুশীতল সুমীমাংসা সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। কবি যাহা দেখেন, সর্ব্বত্রই ভগবৎমহিমা প্রদীপ্ত, সুবিশাল বিশ্বসংসার, ভগবৎপ্রেমে অনুপ্রাণিত-অনুরঞ্জিত;—

তব জ্যোতিকণা তপনেতে দেখি।
সুধাকর পূর্ণ তোমারি প্রেমে।
তোমার মধুর হাসিকণা নাথ,
বিকাশে প্রফুল্ল প্রসূন দামে।"

বিশ্বাসীর চোখে মৃত্যুর কুহেলিকা নাই, বন্ধন বিচ্ছেদ নাই, ইহ পরকাল ব্যাপিয়া একই অখণ্ড অনন্ত চিন্ময় রাজ্যের মহা-বিস্তৃতি :—

"মরণের পরপারে, আমরাও পরে
মিলিব একদা
সেথায় বিচ্ছেদ নাই, হরষে সবাই,
সুমিলনে সদা।"

ঘটনা এবং কালপ্রভাবে ইতস্ততঃ-প্রক্ষিপ্ত মানব মন ভগবৎসামীপ্য লাভ করিলে, সমুদায় চঞ্চলতা এবং অস্থিরতার নিরসন হইয়া, সমতা, শান্তি এবং প্রফুল্লতা তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। তখন মানুষ বিশ্বব্যাপারের অন্তরালে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন ভগবানের হস্তকৌশল দেখিতে সমর্থ হয়; প্রকৃতির গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, এবং তাহার সৌন্দর্য্য-রাশি গ্রহণ এবং উপভোগের উপযোগিতা উপস্থিত হয়। মনের এইরূপ অবস্থায় কবি যে সকল প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের যে কোন কবির নিসর্গ চিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রেম এবং প্রণয় সম্বন্ধে এই অস্ফুট বালিকা-কবির আশ্বাস-বাণী বড়ই সুমধুর। প্রেম অহেতুকী—প্রতিদান-নিরপেক্ষ; প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত মলিনতা এবং দুর্ব্বলতার কারণ। কবি এই প্রতিদান-পঙ্ক-পরিশূন্য অতি শুভ্র, অতি সংযত এবং অনাসক্ত প্রেমেরই সেবিকা :—

"দুর ক'রে দাও, দাও ফেলে দাও,
কর তা যা চায় মন
তবু দৃঢ় প্রেমেরি বাঁধন।"

সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য প্রিয় অপ্রিয়ে সংযোগ এবং দ্বন্দ্বভাব আপাত অপ্রীতিকর হইলেও ইহাতেই সংসারের বৈচিত্র্য এবং সমস্ত আকর্ষণের মূল নিহিত। ছায়াটী না আঁকিয়া আলোর প্রকৃতি পরিস্ফুট করা কঠিন, পাপের আবরণ উন্মোচন না করিয়া নিখুঁত পুণ্যের শুভ্র ছবিটী দেখান শক্ত। যেমন কুসুমে কণ্টক, রূপে অভিমান, সৌন্দর্য্যে অতৃপ্তি, শিশুর সরল হাসির পশ্চাতে মৃত্যু—অচ্ছেদ্য যোগে সংজড়িত; তেমনি, এই জরামরণশীল মরধামের ফুল্ল প্রমোদ চন্দ্রিমা,—পাশবিক বন্ধন এবং সন্তাপপূর্ণ-সংসার-মণ্ডপের একমাত্র শান্তিবিগ্রহ—যাবতীয় ক্ষুদ্রতা এবং দুর্ব্বলতার শ্মশানক্ষেত্রে এই বিচিত্র বীর্য্যশালী দৈবীশক্তি প্রেমের সহিতও পরিতাপ, লাঞ্ছনা যন্ত্রণা এবং বিষাদের উৎকটদহন অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত এবং বিমিশ্রিত। সৃষ্টির এই এক অপূর্ব্ব কৌশল! তাই কবি বলিতেছেন, যদি যাতনা-পরিতাপ-শূন্য হইয়া প্রেম-রসাস্বাদ করিতে চাও, তবে প্রেমের মূলে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত কর, পার্থিব মালিন্য-দুষ্ট প্রেমকে সমূলে উর্দ্ধবাহিনী কর, ভগবৎ সমীপে লইয়া যাও, সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে, স্বর্গীয় প্রেমের অনবদ্য দিব্য কান্তি দেখিয়া বিহ্বল বিমোহিত হইবে :—

"আজ বিভুর চরণে প্রেম সমর্পিয়া
লাঘব করেছি হৃদয় ভার।"

কবির প্রেম এবং ভালবাসার পরিণতি বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই আশাপ্রদ। একজনা কায়মনোবাক্যে সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া ভাল-বাসিতে পারিলে, তাহার প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী। কোন কোন পাশ্চাত্য গূঢ়বাদী দার্শনিকও এই মতের সমর্থক। নিরাশা-বিদগ্ধ শান্তি-

হারা ভগ্নহৃদয় নরনারীর কাছে কি রমণীয় আশার কথা!

"প্রিয়তমে! এই সার জেনো, ভালবাসা যার
পশিয়াছে হৃদে, আশা পুরিবে তাহার॥"
"প্রেম যদি লভে স্থান হৃদয় ভিতরে,
বাহির করিতে আর, ক্ষমতা নাহিক কার,
ছিঁড়িবে জীবনবৃন্ত উন্মূলিলে পরে।
পূজা কর নিশিদিন, প্রেম সে মরণহীন,
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ ও হৃদি কোমল।
করি এই আশীর্ব্বাদ, পাবে যারে পেতে সাধ,
এত প্রেম কখনই হবে না বিফল।"

মৃণালিনি, তোমার অমৃতস্যন্দিনী লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক!

উপসংহারে কবির সঙ্গীত রচনার বিষয়ে একটী কথা বলি। ইহাতে কবি বিশেষ গুণপনা এবং নিপুণতা দেখাইয়াছেন। "প্রতিধ্বনি"তে সন্নিবিষ্ট গানগুলি গাহিয়া এবং গাহিতে শুনিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছি। ইহার দুই একটি গান যখন তখন মনে পড়ে—

(১) ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

"এ হৃদয় নহেতো আমার!
করুণ নয়নে কেন মুখ পানে
মিছে তুমি চাহ বার বার?" ইত্যাদি

(২) বসন্তবাহার—ঝাঁপতাল।

শরতের মধু জ্যোছনায়।
আজিকে পরাণ মোর কাহারে চায়। ইত্যাদি।

১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—(সটীক ও সানুবাদ) বঙ্গানুবাদক, পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ। মূল্য ১৲। যতদূর জানি, গীতার বিস্তৃত সংস্কৃত সংস্করণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বহুদিন পূর্ব্বে ৭৲ মূল্যে আমরা একখানি ক্রয় করিয়াছিলাম। তারপরে ক্রমে ক্রমে বহুসংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ সংস্করণ আর্য্যমিসন বিদ্যালয় এবং বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আর্য্যমিসনের সংস্করণে বহু ভুল আছে। ৪ঠা শ্রাবণের (১৩০২) "সময়" নামক পত্রিকায় বাবু জয়গোপাল দে সেই ভুল দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর গীতার সুলভ সংস্করণ, আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি ২৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোকের ধারেই টীকা, তার ধারেই বঙ্গানুবাদ। টীকা ও অনুবাদ, উভয়ই বিশুদ্ধ হইয়াছে। গীতার সূচিপত্র অন্য গ্রন্থে নাই। ইহাতে আছে। এতদ্ভিন্ন গীতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকা খুব চিন্তাপূর্ণ। সব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এ গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। আশাকরি, সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

১১। The Report of the Calcutta Orphanage, for the years 1892 1893, and 1894. গত মাসে দাসী সমালোচনা কালে এই অনাথাশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া কোন সৎকাজে হাত দিলে কিরূপে সেই কার্য্য সুনির্ব্বাহ হয়, এই অনাথাশ্রম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ইহার জীবনী শক্তি। তাঁহারই সদিচ্ছায়, তাঁহারই চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত। সৎকাজ যত সামান্য ভাবেই আরম্ভ হউক, কালে তাহা দেশব্যাপী হয়। অনাথাশ্রম সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সকলের স্নেহ-দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে। আশ্রমটী স্থায়ী হইলে, কালে ইহা আরো বিস্তার লাভ করিবে। আমরা এই পবিত্র আশ্রমের বিবরণ পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। বিধাতা এই আশ্রমের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

১২। পঞ্চস্তোত্র।—মূল ও ভাষা, মূল্য ।০, সিকদার বাগান বান্ধব-পুস্তকালয়। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

১৩। সুচিকিৎসক।—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি, প্রণীত। কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের নবমবার্ষিক উপদেশ। এই চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ উপদেশটীর ভাষা অতি সরল। পড়িয়া সুখী হইলাম।

১৪। জীবন-সম্বল।—শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত। মূল্য ৵০, ভগবৎভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অনেক তৃষিত হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করিবে। ইহাতে অনেক ভাল ভাল কথা আছে।

১৫। বিদ্যাসাগর।—বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৩৲। এই সুন্দর জীবন বৃত্তান্ত খানির বিস্তৃত সমালোচনা আগামী বারে করার ইচ্ছা আছে।

নব্যভারতের মূল্যপ্রাপ্তি।

২৪৪০ বাবু বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ১২৯৯,১৩০০,৪৲

২২৫৯ শ্রীমতী বিধুমুখী দাস ১২৯৭,৯৮,৯৯, ৬৲

২০৪০ বাবু কালীপ্রসন্ন দাস ১২৯৮, ৯৯, ৩৲

৩৮৫ „ অশ্বিনী কুমার দত্ত ১২৯৮, ৯৯, ৫৲

৫০৪ „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস ১২৯৯, ৩৲

২৪০৫ „ চণ্ডীকান্ত ঘোষ ১২৯৯, ২৲

২৭৭৫ „ কৈলাসচন্দ্র সেন ১৩০০, ৩৲

১৪০২ „ তারাপ্রসাদ গুপ্ত ১২৯৬, ২৲

১৫৪৬ „ রাইচরণ বন্দ্যো ১২৯৮, ২৲

১৪০১ „ কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ১২৯৪,৯৫,৩৲

১৪০০ „ হরনাথ গুহ ১২৯৪, ২৲

১৩৯৯ „ গুরুচরণ সেন ১২৯৮, ১৲

২৭৮৪ „ আশুতোষ চট্টো ১৩০০, ৩৲

৬২২ „ দ্বারকানাথ সেন ১২৯৫, ৯৬, ৩৲

১৪০৭ „ দীননাথ দাস ১২৯৬, ৩৲

১৩৯৬ „ গোবিন্দচন্দ্র দাস ১২৯৪, ৯৫, ৩৲

৫৩৪ „ হরিনাথ দাস ১২৯৪, ২৲

১৩৬০ „ গিরিধর দাস ১২৯৭, ৩৲

১৭২৬ „ প্রসন্নকুমার মিত্র ১২৯৪, ৩৲

৪৮৪ „ কৈলাসচন্দ্র দাস ১২৯৫, ৯৬, ৩৲

২৩৯৫ „ কালীকুমার তালুকদার ১৩০০,১,৩৷০

২১৪৭ „ গুরুনাথ সেন ১৩০০, ১, ৫৷৷০

২১৪০ „ কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ১৩০০, ১, ৫৷৷০

২১৪৫ „ রাজমোহন মুখো ১২৯৮, ৯৯, ৫৲

২১৭৬ „ রাজকুমার রায় ১৩০০, ১, ৫৷৷০

২১৪৮ „ উদয়চন্দ্রমিত্র ১২৯৮,৯৯,১৩০০-১,৭৷৷০

২১৪৬ „ রাজকুমারসেন ১২৯৮,৯৯,১৩০০,৫৲

২১৪১ „ তারকচন্দ্রগুহ৯৮,৯৯,১৩০০,১৩০১,৯৷৷৶

২২৩০ „ যুগলকিশোর বসু ১২৯৮, ৯৯, ৫৲

২২৮১ „ কুমার নবদ্বীপচন্দ্রবাহাদুর ১৩০১,৩৲

২৩৬৫ „ মন্মথনাথ সেন ১২৯৭, ৯৮, ৫৲

৫০৮ „ অক্ষয়কুমার বসু ১২৯৮,৯৯, ৬৲

২৮২২ „ বিশ্বেশ্বর বসু ১২৯৯,১৩০০,১, ৬৷৷০

১৬২ „ গঙ্গাচরণ চট্টো ১২৯৬,৯৭,৯৮, ৯৲

২৫৬৯ „ মহেন্দ্রচন্দ্রদেবচৌধুরী ১২৯৯,১৩০০,৩৲

১৪৯২ „ শ্রীযুক্ত বড়ঠাকুর মহারাজা ১২৯৯, ১৩০০, ১, ৯৲

২২৯৭ „ নরেন্দ্রচন্দ্রদেব বর্ম্মন ১৩০০, ১, ৬৲

২৭৭৪ „ কুমারনৃপেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মন ১২৯৯, ১৩০০, ১, ৯৲

১০৩৬ শ্রীযুক্ত আগরতলার মহারাজা ১২৯৯,৩৲

২১০৯ বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৯৬, ২৲

৫৫২ „ বিশ্বেশ্বর সেন ১২৯৮,৯৯,১৩০০,৬৲

১৪৬ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখো ১৩০০, ৩৲

৩৫৯ „ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ১২৯৭,৯৮, ৩৲

২২১৮ „ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বঃ ইউছুফ আলি মিঞা ১২৯৮, ৯৯, ৪৲

৫২৬ „ দ্বারকানাথ দত্ত ১২৯৪, ৯৫, ৫৲

৪১৪ „ কিশোরীমোহনসিকদার ১২৯৬,৯৭,২৲

২৬৩৮ „ কালীপদ দাস ১৩০১, ২৷৷০

৩১৩১ „ আবদুলরহমান খাঁ চৌধুরী ১৩০১,৩৲

২৯৭০ „ আশুতোষ লাহিড়ী ১৩০০, ১, ৩৲

২৭২৩ „ যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত ১৩০০, ৩৲

২৭৭৭ „ নিকুঞ্জবিহারীরায়চৌধুরী ১৩০০,১,৬৲

৩১২৯ „ শ্রীকুমার চৌধুরী ১৩০১, ২৷৷০

২২৭০ „ বি, চাটার্জি ১৩০০, ১, ৬৲

১১৪০ „ মুনীন্দ্রনাথমুখো ১২৯৩,৯৪,৯৫,৯৬,১০৲

২৮৭৯ „ কালীপ্রসন্ন সেন ১৩০০, ২৲

৩১৪০ „ অক্ষয়কুমার বসু ১৩০১, ১৲

২২৪৫ „ নরেন্দ্রনাথ সেন ১২৯৮, ৯৯, ২৲

৬৫৬ „ যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ১৩০০, ৩৲

২১০২ „ শশিভূষণ মুখো ১২৯৯, ১৩০০, ৬৲

২৯৮১ „ রাধাচরণ রায় চৌধুরী ১৩০১-২,৩৲

৩১৪৩ „ মিসেস্, এম, বসু ১৩০১ ২৲

৪২২ „ কৈলাসচন্দ্র সেন ১২৯৬, ১৲

২৪৩৪ „ সুরতনাথ বসু ১৩০০, ১৲

৬৩৭ „ সুরেন্দ্রনাথ কর ১৩০০, ৩৲

২৪২২ „ বসন্তকুমার বসু ১৩০০, ১৷৷০

১০৪৬ „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৩০০, ৩৲

২০০৪ „ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১২৯৫, ১৲

২৬০৭ „ নলিনীভূষণ গুহ ১৩০০, ১৲

১৩৩৪ „ বন্ধুবিহারী বসু ১২৯৮, ৩৲

৩১৪৯ „ জমালদ্দিন আহম্মদ ১৩০১, ৩৲

৩০৯০ শ্রীমতী কুসুমকামিনীমণ্ডল ১৩০১,১৷৷০

২২৪৬ বাবু জগবন্ধু পট্টনায়ক ১৩০০, ৩৲

৪৪৩ বার লাইব্রেরীর সম্পাদক ১৩০০,১,৬৲

৩১৪২ বাবু তারকচন্দ্র চৌধুরী ১৩০১, ৩৲

২৫২০ „ উদ্ধবচন্দ্ররায় ১২৯৯, ১৩০১, ৬৲

২৯৩৬ রাজলাইব্রেরীর সম্পাদক ১৩০০,১,৬৲

২৫০০ বাবু পূর্ণচন্দ্র কর ১২৯৮, ৩৲
৬০৬ „ মোহিনীমোহনতলাপত্র ১২৯৭,৯৮ ৫৲
২৯১৬ „ বেণীমাধব মিত্র ১৩০১, ৩৲
১৩৬১ „ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৯৯, ৩৲
২৪৪১ চৈতন্যলাইব্রেরির সম্পা, ১৩০১, ১৷৷০
১৮০৮ বাবু শ্যামাপ্রসন্ন রায় ১৩০০, ১, ৬৲
১৯৪৫ „ প্রিয়নাথ ঘোষ ১২৯৭, ৯৮, ৩৲
২৫৯৬ „ রামচন্দ্র দত্ত ১২৯৯, ৩৲
২৭৭৮ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১২৯৯, ১৷৷০
৭৪৩ „ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ১২৯৯, ১৲
২৭৫৬ „ রজনীকান্ত বসু, ১৩০০, ১, ৪৲
২২৬১ „ মুরলীধররায়চৌধুরী ১৩০০,১, ৪৸০
২৭৯০ „ উমাচরণ দাস ১৩০১, ৩৲
২৫৮৬ „ পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ১৩০০, ৩৲
১৩০০ „ কৃষ্ণপ্রসাদ কুণ্ডু ১৩০১, ৩৲
১৬৭৩ „ মহেন্দ্রনাথ বসু ১৩০১, ৩৲
২২৪৫ „ নরেন্দ্রনাথ সেন ১২৯৯,১৩০০, ১৷৷০
৩১৫৫ „ মতিলাল চক্রবর্ত্তী ১৩০১, ৩৲
২১০১ „ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ১৩০১, ৩৲
১৯৭৫ „ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১৩০১, ৩৲
৯৮১ „ গোবিন্দলাল দত্ত ১৩০০, ২৲
১১৭৩ শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যো ১৩০০, ২৷৷০
১৮৩৪ বাবু নন্দকিশোর সরকার ১২৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৫৲
৯৩ „ রাজকুমার সরকার ৯৮-৯৯-১৩০০, ৯৲
৩১৫৯ „ মহেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত ১৩০১, ৩৲
২৯৮২ „ ভুবনমোহন নিয়োগী ১৩০১, ১৲
৭৪৩ „ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ১২৯৯, ১৲
১৯৪৫ „ প্রিয়নাথ ঘোষ ১২৯৮,৯৯, ৪৲
২৯২৬ „ যোগেন্দ্র নারায়ণ রাহা ১৩০১, ১৲
১২৮২ „ রামলাল সাহা ১৩০১, ২৲
১২৩৩ „ অমৃতলাল সেন ১২৯৭, ১৲
২০৮৮ „ অবিনাশচন্দ্র চট্টো ১৩০০,১, ৬৲
২০৮৩ „ রঘুনাথ ঘোষ ১২৯৯,১৩০০,১, ৬৲
৩১৫৬ „ শ্রীমতীঅম্বুজাসুন্দরীদাস ১৩০১,২, ৩৲
২৬৩৭ „ বাবু রামশঙ্কর রায় ১৩০২, ২৷৷০
২০৮২ „ চন্দ্রনাথ পালিত ১২৯৭, ৩৲
২০৮০ „ রাজকুমার সেন ১৩০০, ১, ৫৲
৯০৪ „ মধুসূদন রাও ১২৯৯, ১৩০০, ৬৲
২০৭৭ „ প্রসন্নকুমার পাল ১৩০১, ৩৲
২৭৬০ „ বাঞ্ছানিধি সাহু ১২৯৮, ২৲
২০৭৬ বাবু শিবপ্রসাদ ব্রহ্ম ১২৯৯, ২৲
২৬৩৯ „ গোপীবল্লভ রায় ১৩০০, ৩৲
২৬৮৯ „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ ১৩০১, ২, ৫৷৷০
৯১১ „ বৈদ্যনাথ গিরি ১২৯৭, ৩৲
২০৬৩ „ গোবিন্দবল্লভ রায়চৌধুরী ১৩০০,৩৲
২০৬৯ „ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যো ১২৯৭, ৯৮, ২৲
২০৬৭ „ ভৈরবনাথ চন্দ ১২৯৯, ৩৲
১৩১০ „ সদানন্দ চন্দ ১২৯৫, ১৲
২৫৯৩ „ অভয়চরণ ঘোষ ১৩০২, ২৷৷০
১৯২৫ „ বি, দে ১৩০০, ১, ৫৲
১৯৮৪ রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর ১৩০১, ২, ৯৲
২১৩৪ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ১৩০০, ৩৲
২১১৮ „ পীতাম্বর ঘোষ ১২৯৯, ৩৲
৯১২ „ ভোলানাথ দে ১২৯০, ১৲
২২৮৪ „ করুণাকুমার সাহু ১২৯৮ ৩৲
২৭৬৬ „ উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩০১, ২, ৫৷৷০
২১৩২ „ হেমচন্দ্র দে ১২৯৮, ৩৲
২১৩৬ „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস ১২৯৯, ১৩০০, ৬৲
৫৬ „ ভগবানচন্দ্র দাস ১৩০০, ১, ৬৲
২০০১ „ কিশোরীমোহন দাস ১২৯৬,৯৭,৫৲
২৯২৮ „ ব্রজগোপাল প্রধান ১৩০০, ১, ৫৲
১৪১৯ „ ললিতমোহনবন্দ্যো ১২৯৯,১৩০০-১,৫৲
২৭৬৮ „ তিনকড়ি ঘোষ ১২৯৯, ১৩০০, ৩৲
১৫০৮ „ আশুতারণ মিশ্র ১২৯৭,৯৮, ৫৲
৭৫৮ „ কে, পি, কুণ্ডু ১৩০১, ৩৲
৯৪ শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ১৩০১, ৩৲
৩০০১ বাবু রমণকৃষ্ণদত্ত ১৩০২ ২৷৷০
২৮০৩ শ্রীমতী মহারাণী নিস্তারিণী দেবী ১৩০০, ১৩০১, ৬৲
২৫৬৯ বাবু মহেন্দ্রচন্দ্রদেবচৌধুরী ১৩০০,১,৩৲
২২০৩ „ গোপীনাথ মহান্তি ১২৯৭, ৩৲
২২৩১ শ্রীযুক্তময়ূরভঞ্জের মহারাজা ১৩০০-১,৬৲
১৫০৫ „ কুচবিহারের মহারাজা ১২৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৩০০, ১৩০১, ১৫৲
১৮৩৮ বাবু গোপালচন্দ্র বসু ১৩০১, ৩৲
৩১৬৭ শ্রীমতীনগেন্দ্রবালামুস্তফী ১৩০১,২,১৷৷০
২৬৮৮ বাবু শোভালাল চট্টোলাল বাহারা ১৩০২, ৩৲
২৫১২ „ শীতলদাস রায় ১৩০১, ৩৲
২৮৪৫ „ কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ ১৩০০,১, ৬৲

৩২০৩ বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ১৩০২,২॥০
২৬৪১ কুমার জি, নারায়ণ ১২৯৯,১৩০০,১, ৯৲
২৮৩৮ শ্রীযুক্ত আর, মুখার্জ্জি ১৩০০,১, ৬৲
২৫৩১ „ দেওয়ান আলীমদাদ খাঁ ১৩০২, ১॥০
৩১৫৩ „ ত্রিপুরেন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর ১৩০১, ৩৲
৩২০৮ বাবু গণেশচন্দ্র রক্ষিত ১৩০২, ২॥০
৩১৪ „ কালীপদ চট্টো ১৩০১, ২, ৫॥০
২০১৯ „ যজ্ঞচন্দ্র দত্ত ১২৯৮, ২৲
২১৫৯ শ্রীমতী পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী ১২৯৯ ১৩০০, ৬৲
২৯৮২ বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী ১৩০১, ১৷০
৩০৯৪ শ্রীযুক্ত আনামত উল্লা আহাম্মদ ১৩০২ ২৲
৩১৩৬ „ রমেশচন্দ্র বৌদ্ধাচার্য্য ১৩০১ ৩৲
১৩৬০ „ দ্বারকানাথ চট্টো ১৩০০, ১, ৬৲
২৭৫২ „ কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক ১৩০০, ১,৬৲
৩২১৩ „ মিহিরলাল রক্ষিত ১৩০২ ২॥০
২৫৮৩ „ ক্ষেত্রনাথ সিংহ ১৩০১ ২॥০
৯৮ „ ভুবনমোহন সেন ১৩০১ ২॥০
৬২৩ „ মহেন্দ্রনারায়ণ সেন ১৩০১ ১৷০
২১০৭ „ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো ১৩০১ ২॥০
৩০৬০ „ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী ১৩০১ ২॥০
২৪৯২ শ্রীমতী সৌদামিনী ধর ১৩০০ ৩৲
৩১৪১ বাবু ভোলানাথ পড়িয়া ১৩০১ ৩৲
২৮৪১ „ ক্ষেত্রমোহন মাইতি ১৩০১ ৩৲
৪২৫ „ গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত ১২৯৯ ৩৲
২৮২৪ শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ১৩০০ ৩৲
২৩২৯ বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ১৩০০,১, ৬৲
২৮০৩ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নিস্তারিণী দেবী ১৩০২, ১৩০৩, ৬৲
১৬৮৪ বাবু জগদ্বন্ধু রায় ১৩০১ ২॥০
২২৯৩ „ উমাচরণ আচার্য্য ১৩০১ ৩৲
২৫২ „ রামগতি গঙ্গো ১৩০১ ২॥০
২০৬০ „ অক্ষয় নারায়ণ দাস মহাপাত্র ১২৯৮, ৯৯
১১৬ „ কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া ১৩০১ ২॥০
২২৯৪ রায় হেমচন্দ্র সেন বাহাদুর,১৩০১ ৩৲
৯৬ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩০০,১, ৬৲
২৯০ বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩০২, ৩, ৬৲
১৭৪ „ জগদ্বন্ধু লাহা, ১৩০১, ৩৲

২৮০৯ রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর ১৩০০, ১৩০১, ৬৲
২৪৮৫ বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় ১৩০১, ১॥০
২৬৪১ „ পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী ১৩০১, ১॥০
২৬০৫ „ পি, ভট্টাচার্য্য ১২৯৯ ২৲
৮৮৪ „ মহেশচন্দ্র সেন ১৩০১ ৩৲
২৫১৬ „ প্যারীমোহন চাকী,১২৯৯,১৩০০,৪৲
২২৪০ „ তারাপ্রসন্ন সেন, ১৩০০, ১, ২৲
২০৯৯ „ হরিচরণ বন্দ্যো, ১৩০২ ৩৲
২৭০৯ „ হরমোহন বসু, ১৩০১ ৩৲
৩৯৫ „ জানকীনাথ রায় ১২৯৯,১৩০০, ৫৲
৩০৯৯ „ কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী ১৩০১ ৩৲
১৫৩৭ „ উপেন্দ্রনাথ সাহু ১৩০০, ১, ৬৲
৮১১ „ পূর্ণচন্দ্র দাস ১৩০১ ৩৲
৩০১৯ „ বাবু কালীপ্রসন্ন মিত্র, ১৩০১ ৩৲
২৭১১ „ শশীভূষণ গুপ্ত ১২৯৯, ১৩০০, ২৲
২৩৯৬ „ উপেন্দ্রচন্দ্র মুখো ১৩০১, ২॥০
২৫৯১ „ জানকীনাথ দত্ত ১৩০১ ৩৲
৯৪২ „ হরিমোহন সান্ন্যাল ১৩০১ ৩৲
৬৩০ শ্রীযুক্ত দিনাজপুরের মহারাজা ১৩০১,৩৲
২৪৬৩ বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ১২৯৮, ১২৯৯ ২৲
১৩ „ কালীমোহন ঘোষ ১২৯৯, ১৩০০, ৫৲
২৭২৯ „ রজনীকান্ত সরকার ১৩০০, ১, ৭৲
১৩৮ „ বনমালী রায় ১৩০০, ১, ৬৲
২৩৭২ „ মহেন্দ্রনাথ বসু ১২৯৭, ৯৮, ৫৲
২৪৫১ „ তারিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৩০০ ৩৲
২৪৩২ „ মোহন নায়ক ১৩০০, ১, ৩৲
২৩৭৩ „ সুরেন্দ্রনারায়ন রায় ১৩০০ ৩৲
২৮১০ „ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০১ ৩৲
২৩৪৫ „ ভোলানাথ সামন্ত ১৩০০ ৩৲
২২৭৯ „ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১২৯৯, ১৩০০, ৪৲
২০৬১ „ গোবিন্দ বল্লভ রায় চৌধুরী ১৩০১ ৩৲
১৮৯৭ রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর ১৩০০ ৩৲
১২২১ বাবু কু[illegible]কুমার সেন ১২৯৭, ৯৮, ৫৲
২২৯১ „ গিরিজানাথ রায় চৌধুরী ১৩০১ ৩৲
২৫২৫ „ কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস ১২৮৮ ৩৲
২৭৮১ „ ভগবতীচরণ দে ১৩০১, ২, ২॥০
৩১২৬ ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ১৩০২, ১॥০
৩০৯৬ হুগলী বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, ১৩০২ ১॥০
১৬২৯ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছী ১৩০২ ।৶০
৭৭৫ „ গিরিশচন্দ্র রায় ১২৯৫, ৯৬, ২৲
২৬২৬ „ বিনোদবিহারীদাস ১৩০২ ২॥০
২৯৭৭ „ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩০২ ২॥০
২৭২৮ „ হরিপদ চট্টো ১৩০২ ২॥০
২৬৯৭ „ গোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৩০০ ২৲

২৩৯৬ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখো ১৩০২, ৩, ৬৲
২৩৪২ „ সূর্য্যনারায়ণ মুখো ১৩০২ ২॥০
২৫২৯ „ শ্রীশগোবিন্দ সেন ১৩০০, ১, ৪৲
১৮২২ বাবু শরচ্চন্দ্র বসু ১৩০১ ৩৲
১৩০৬ শ্রীযুক্তকেঞ্জোরের মহারাজা ১৩০১, ২ ৬৲
৩১৪০ „ অক্ষয়কুমার বসু ১৩০১, ২, ২৲
২০২১ শ্রীযুক্তা মহারাণী হরসুন্দরী দেবী ১২৯৫,৯৬,৯৭, ৯৮, ৯৯, ১৩০০, ১, ২১৲
২২৭৩ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৩০২ ২॥০
১৩৪৭ বাবু প্যারীমোহন রায় ১৩০২ ২॥০
৩২২২ সম্পাদক আমতা বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী ১৩০২ ২॥০
৩২২৩ শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী চৌধুরাণী ১৩০২ ২॥০
২৩১৯ সম্পাদক নীতিবোধিনী সভা ১৩০২ ২॥০
২১১০ বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার ১৩০২ ২॥০
২০৫ „ পূর্ণানন্দ সাহা ১৩০২ ২॥০
৪৭০ সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা ১৩০২, ২৲
৩১০২ বাবু দিগ্বিজয় রায় ১৩০১ ১৲
৩০১৭ „ বামনদাস মজুমদার ১৩০২ ১॥০
৩২০৫ „ লালা আত্মপ্রসাদ নন্দে ১৩০২ ৩৲
১০৮৯ „ আনন্দনাথ সেন ১৩০২ ২॥০
৫২ „ রামচরণ পাল ১৩০২ ২॥০
৩১৬২ „ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩০২ ২॥০
১০ „ রসিকনাথ দত্ত ১৩০২ ২॥০
৩৯ „ উপেন্দ্রনাথ মৈত্র ১৩০২ ২॥০
২৮৭৯ „ কালীপ্রসন্ন সেন ১৩০১ ২৲
২২৩৮ „ খড়্গেশ্বর বসু ১৩০০, ১৩০১, ৩৲
১১৭৩ শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যো ১৩০২ ২॥০
২৯১৮ বাবু নন্দলাল পাল ১৩০১ ২৲
২২৩৮ „ খড়্গেশ্বর বসু ১৩০২ ২॥০
১১৮৪ „ শশিভূষণ সেন ১৩০২ ২॥০
২৯৩৪ „ নিত্যগোপাল সিংহ ১৩০২ ২৲
৩০৬৫ „ হীরালাল সরকার ১৩০২ ২॥০
২৭৯৪ „ গোকুলচন্দ্র মজুমদার ১৩০১, ২, ২॥০
২৩২১ „ দুর্গাপদ ঘোষাল ১৩০২ ২॥০
৩২৩১ মুন্সী আজিমউদ্দীন সরকার ১৩০২ ২॥০
২৭৬৩ বাবু সীতানাথ দে ১৩০০, ১, ৩৲
২২৬৫ সম্পাদক রাজসাহী পাবলিক লাইব্রেরী ১৩০১, ২, ৩৲
২১০৬ বাবু মতিলাল সিংহ ১৩০২ ২॥০
৩০৭৫ সম্পাদক বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী ১৩০২ ২॥০
১০৩ বাবু নিশিচন্দ্র বড়ুয়া ১৩০২ ২॥০
২৭৪১ „ প্রিয়লাল গঙ্গো ১৩০২ ২॥০
৫৩২ „ সতীশচন্দ্র চট্টো ১৩০২ ২॥০
২৮৫২ „ নিত্যানন্দ রায় ১৩০১, ২, ৫॥০
৯৮ „ ভুবনমোহন সেন ১৩০২ ২॥০
৩২৪৩ নীতিশিক্ষাপ্রদায়িনী সভা ১৩০২ ১॥০
১৫০১ শ্রীমতী সুশীলা দাসী ১৩০২ ২॥০

৩২২০ বাবু ভাবীরাম দাস ১৩০২ ১॥০
২২২৩ „ মহেন্দ্রনাথ বসু ১৩০১ ৩৲
১২৭৫ „ বিহারীলাল ঘোষ ১২৯৭ ১৲
৩১৪১ „ ভোলানাথ পড়িয়া ১৩০২ ২॥০
৩০৩৮ শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ১৩০২ ২॥০
৮১ বাবু চন্দ্রমাধব মুখো ১২৯৯ ১৲
৬২৩ „ মহেন্দ্রনারায়ণ সেন ১৩০২ ১।০
১৭৪ „ জগদ্বন্ধু লাহা ১৩০২ ২॥০
৩২৩০ „ শশিকুমার নিয়োগী ১৩০২ ২॥০
১৬২৫ „ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যো ১৩০২ ২॥০
২২১৫ „ মহেন্দ্রনাথ সেন ১৩০১ ২৲
৩২৪০ „ শশিভূষণ চট্টো ১৩০২ ১॥০
১৮৫৩ „ চন্দ্রমোহন সাহা ১৩০২ ২॥০
৩৬৩ „ দীননাথ গঙ্গো ১৩০২ ২॥০
১০৮৯ „ আনন্দনাথ সেন ১৩০৩ ২॥০
২৯২৩ „ শরৎকুমার ঘোষ ১৩০১ ৩৲
২৫৯২ „ কালীপদ দাস পান ১২৯৯,১৩০০,১, ৪॥০
১৯২২ „ বগলারঞ্জন দাস ১২৯৬ ১৲
২৩২৬ „ গিরিশচন্দ্র দেব ১৩০১ ১॥০
২০৫৭ „ অন্নদাচরণ দাস ১২৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৮, ৯৯, ১৩০০ ১৫৲
১৪২২ বাগবাজার রিডিংক্লব ১৩০২ ১৲
৫৮২ বাবু কালীপদ পান ১২৯৮, ৯৯, ১৩০০,১, ১২৲
১০৪৮ „ দুর্গাচরণ রক্ষিত ১৩০১ ৩৲
১৮৪৩ „ হরি চৈতন্য ঘোষ ১৩০১ ৩৲
২৪৯৪ „ শ্রীমতী সৌদামিনী ধর ১৩০১,২, ৬৲
২২৩১ „ শ্রীযুক্ত ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ১৩০২,৩,৪, ৮॥০
২৬৭৮ বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ১৩০০,১,২, ৭॥০
১১৪৩ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৩০২ ২॥০
৩২৪৫ শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী ১৩০২ ৩৲
২৮৯৩ „ হেমাঙ্গিনী রায় ১৩০১ ২৲
৩২৪৬ অনুশীলন সমিতির সম্পাদক ১৩০২ ১॥০
১৫২৫ বাবু রজনীকান্ত পাল ১৩০০, ১, ৫৲
১৬৫৮ „ কালীগোপাল রুদ্র ১৩০২ ২॥০
৩০৫৯ „ অবিনাশচন্দ্র চট্টো ১৩০২ ২॥০
১১৬২ „ দুর্গাদাস দাস ১২৯৭, ৯৮ ৬৲
২৬১১ „ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ ৩৲
২৯১০ „ অনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ ১৩০১, ১॥০
২৯৭৩ „ বিপিনবিহারী ঘোষ ১৩০০,১, ২৲
২৬৩৪ „ সম্পাদক পাবলিক ইউনিয়ন ষ্টাডি ১৩০২ ১॥০
২৬৯৯ বাবু সিদ্ধেশ্বর মিত্র,১২৯৯,১৩০০ ৩৷৵০
২৭৮৩ „ তারিণীচরণ মুখো ১৩০১,১৩০২ ১।০

ক্রমশঃ।

ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের সাহায্য প্রাপ্তি।

আগামী ২৭শে শ্রাবণ, রবিবার, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়, ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সিটী-কলেজ হলে, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে সভার বার্ষিক হিসাব, দুর্ভিক্ষের হিসাব সহ পরীক্ষিত হইয়া (audited) মঞ্জুরের জন্য উপস্থিত করা হইবে। তৎপর দুর্ভিক্ষের হিসাব নব্যভারতে ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মোট টাকা প্রাপ্তি পূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে। কেবল বরিশালের বাবু যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব প্রদত্ত ২।০ বাদে আর ১৲ টাকা, সিমলাপাহাড় হইতে সংগৃহীত বাবু কালাচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত৪৲, ও জালালপুরের বাবু তারিণীচরণ মুখো, প্রেরিত ॥৵০ পাইয়াছি। অন্যান্যদাতাগণের চরণে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাঁহাদের দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

পাবনা হইতে বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক প্রেরিত, পূর্ব্বে স্বীকৃত ২৫৲ যথা—(নলিনীনাথ মিত্র ১৲, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ।০, মোহিনীমোহন লাহিড়ী ॥০, বনমালী মজুমদার ॥০, শশীকুমার চৌধুরী ॥০, প্রসন্নকুমার আচার্য্য ॥০, একজন বন্ধু ।০, লক্ষ্মীকান্ত চট্টো ॥০, ধর্ম্ম নারায়ণ ঘোষ ॥০, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ॥০, প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী ১৲, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ।০, রাধাবল্লভ দে ।০, আবদুলহাচিব ৵০, বনমালী বন্দ্যো ।০, আনন্দগোপাল গুই ১৲, রাধাবল্লভ সাহা ।০, নগেন্দ্রনাথ সান্যাল ॥০, হরসুন্দর রায় ১৲, গোপীনাথ রায় ॥০, পরীক্ষিৎচন্দ্রদে ॥০, কেশবচন্দ্র দাস ।০, দ্বারকানাথ সরকার ॥০, গুকলালচাকী ॥০, বৈদ্যনাথ চাকী ॥০, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ।০, রামচন্দ্র দাস ।০, মৌলবী রসিদনবী ॥০, দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী ॥০, কৃষ্ণনাথ রায় ॥০, মহিমচন্দ্র চৌধুরী ১৲, গোপালচন্দ্র দত্ত ॥০ যাদবচন্দ্র ঘটক ।০, একজন বন্ধু ১৲, A. B. C. ৫৲, একজন মহিলা ।০, জগদীশ্বরচন্দ্র রায়, ১৲, সীতানাথ অধিকারী ॥০, কৃষ্ণচন্দ্র সাধু ॥০, লালবিহারী দাস ॥০, রামকমল ঠাকুর ।০, মনোমোহন বসু ৵০)। জগন্নাথপুর হইতে দেবী বাবু ও বিপিন বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত, পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৮৲ যথা—(কেদারনাথ রায় ১৲, গোবিন্দ প্রসাদ রায় ॥০, বাসু কাইয়া ২৲, পাঁচু মোল্লা ১৲, মহম্মদ ॥০, উদিতসিংহ ১৲, প্রসন্নকুমার সরকার ১৲, কৃষ্ণচন্দ্র দেব ১৲, বিপিন বিহারী রায় ২০৲)। শ্রীযুক্তা কান্ততারা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক গোহাটী হইতে সংগৃহীত পূর্ব্ব স্বীকৃত ৬১।৶০ যথা—(লুকীর রাণী ১৲, জীবনবালা দত্ত বি, এ, ১৲, চাঁপাসুন্দরী গুপ্তা ২৲, তমালিনী দেবী ৫৲, প্রিয়তমা দেবী ২৲, শ্রীমতী সুশীলা ॥০, সরলাসুন্দরী গুপ্তা ২৲, মরিয়াম মিড্ওয়াইফ্ ১৲, ভৈরবী ॥০, জীবনতারা ।০, নিস্তারিণী সেনগুপ্তা ১৲, দাক্ষায়ণী দেবী ॥০, তরলাসুন্দরী দাসগুপ্তা ১৲, বিনোদবাসিনী গুহ, ১৲, সরোজিনী দেবী ১৲, মোক্ষদা দেবী ১৲, হেমলতা দেবী ।০, কাঞ্চনবালা দেবী ।০, গুণময়ী দাস ।০, রত্নেশ্বরী বড়দলৈনী ।০, সরলা সুন্দরী দাসগুপ্তা ॥০, মৃণ্ময়ী দাসগুপ্তা ।০, নির্ম্মলা সুন্দরী দাসগুপ্তা ।০, দুর্গামণি দাসগুপ্তা ।০, কিরণবালা সেনগুপ্তা ।০, কান্ততারা দাসগুপ্তা ৫৲, মহেশ্বরী দেবী ।০, যজ্ঞেশ্বরী দাস ॥০, শরৎকুমারী দেবী ॥০, ইন্দুমালা রায় ২৲, চম্পকলতা রায় ৫৲, রম্ভাবতী দাস ১৲, পাহেশ্বরী চৌধুরাণী ২৲, সোনেশ্বরী ১৲, বসন্তকুমারী সেনগুপ্তা ॥০, অপর ২২ জন ভদ্র মহিলা ১৭।৶০, হিরণ্ময়ী দাসগুপ্তা ১৲, প্রিয়বালা দাসগুপ্তা ১৲, কুলকুণ্ডলিনী সেনগুপ্তা ১৲)।

মঙ্গলগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ১০৮৵ যথা—(অনঙ্গ সুন্দরী আশ ৫৲, মানকুমারী দত্ত ।০, লক্ষ্মণ বাবুর জনৈক আত্মীয় ১৲, অটলবিহারী, দত্ত ১৲, সত্যচরণ ঘোষ ১৲, হীরালাল ঘোষ ৵০, নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যো ৵০, রামগতি বিশ্বাস ॥০, রামতারণ ঘোষ ॥০, সেবক ১৲, পার্ব্বতীচরণ সরকার ।০, ভূষণচন্দ্র বিশ্বাস ৵০।)

পাবনা হইতে বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৫।০ যথা—(পাবনা গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রগণ ১৫৲, কালীচরণ সেন ১৲, তারকনাথ পণ্ডিত ।০, অধর চন্দ্রদাস ।০, রজনীনাথ তরফদার ৵০, মহেশ চন্দ্র দে ।০, একজন মহিলা ।০, বিপিনচন্দ্র পাল ॥০, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ।০, একজন মহিলা ৵০, অভয়চরণ মজুমদার ২৲, একজন মহিলা

।০, প্যারিমোহন গাঙ্গুলী ।০, জনার্দ্দন মজুমদার ।০, কেশবচন্দ্র লাহিড়ী ॥০, ভুবনচন্দ্র সরকার ১৲, জগদ্বন্ধু মজুমদার ।০, দীননাথ বিশ্বাস ॥০, তীর্থনাথ সাহা ।০, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখো ১৲, বিজয়বসন্ত সাহা ১৲।) চট্টগ্রাম হইতে রজনীনাথ সমাদ্দার কর্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৪৫৮/০ যথা (গুরুদাস শীল ১৲, সরোজিনী দত্ত ২৲; নেক্রিসেইনমাল রাজা ৫৲, বাবু রাজকিশোর গাঙ্গুলী ২৲, বিনোদিনী সেন ১৲, বাবু উদয়চন্দ্র দাস ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুর ১৲, প্যারিমোহন দাস ১৲, অখিলচন্দ্র দত্ত ১৲, বিহারীলাল বানর্জি ২৲, Mr. P. N. Banerji ২৲, যদুনাথ দাস ১৲, বেণীমাধব দাস ১৲, জনৈক ছাত্র ৪৲, মিউনিসিপাল স্কুলের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রগণ ২/০, কাজেমালি স্কুলের হেডমাষ্টার ও ছাত্রগণ ৭৲, হরিশ্চন্দ্র দত্ত ৩৲, হরিশ বাবুর স্কুলের ছাত্রগণ ৫৷০, রাজেশ্বর গুপ্ত ১৲, নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণ ২৲,)

বাগেরহাট হইতে বাবু বিহারীলাল গুহ কর্তৃক সংগৃহীত পূর্ব্ব স্বীকৃত ১০৵০ যথা (সারদাপ্রসাদ মিত্র ॥০, অন্নদাকুমার সেন বি, এল ১৲, পূর্ণচন্দ্র দে এম্, এ, বি, এল্ ১৲, অভয়াচরণ রায় ১৲, আনন্দলাল মুখো ১৲, নবীনচন্দ্র দাস ১৲, বনমালী ঘোষ ৵০, মুন্সি নুরআলি ॥০, মহম্মদ রাসেক ১৲, কাজিসাফিউদ্দিন আহাম্মদ ১৲, বিহারীলাল গুহ ২৲)

জলপাইগুড়ী হইতে মিঞা জালালদ্দিন এবং সিলিগুড়ি হইতে বাবু রাধানাথ রায় কর্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩০।৵০ যথা (ভুবনচন্দ্র নাথ ॥০, কুঞ্জলাল বিশ্বাস ১৲, মুন্সি মির বাহাদুর আলী ।০, শরচ্চন্দ্র রায় ।০, রাজকুমার রায় ॥০, ব্রজেন্দ্রকুমার গোপ ১৲, সলিমদ্দিন সওদাগর ॥০, একজন কাইয়া ।০, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ॥০, হেকিম সামসুদ্দিন ১৲, হাজি তালেবর সওদাগর ।০, পূর্ণচন্দ্র কুরি ।০, ধনেশ্বর সা ৵০, অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ৵০, নবদ্বীপচন্দ্র মোদক ।০, মহারাজদীন ॥০, গোরাকরাম বাবু ।০, আবদুল রেজাক মিঞা ॥০, আনন্দচন্দ্র রাহুত ৵০, শিবলাল ।০, মহেশ শীল ।০, রামলাল সিংহ ৵০, প্রভুদয়াল আগরওয়ালা ১৲, একজন কাইয়া ৵০, গঙ্গারাম বাবু ।০, অন্নদাপ্রসাদ মুখো ৵০, বিহারীলাল গাঙ্গুলী ১৲, কালীপদ বন্দ্যো ১৲, দেবেন্দ্রপ্রসাদ রায় ১৲, একজন বন্ধু ১৲, মুন্সি নিজামুদ্দিন ।০, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ।০, ভগবানচন্দ্র দাস ॥০, কেদারনাথ রায় ।০, নাশক হাগওয়াই ॥০, একজন বন্ধু ৵০, নীলমাধব সিংহ ॥০, মহুরাম ॥০, কানাই কুণ্ড ৵০, মুন্সি মাখু খাঁ ১৲, একজন কাইয়া ।০, উমাচরণ সুর ।০, রজনীকান্ত সেন কবিরাজ ১৲, হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৲, সিলিগুড়ী :—তারিণীচরণ গুপ্ত ॥০, জয়গোপাল দাস ।০, হরিনাথ হাজরা ।০, কালিনাথ বন্দ্যো ।০, গোপালচন্দ্র দে ১৲, বিষ্ণুচরণ দাস ১৲, বাবুলাল সরকার ।০, রাধানাথ রায় ১৲, মির্জা মজাফরহোসেন ১৲, বিনোদবিহারী মিত্র ॥০, গণেশরাম মুদি ॥০, ছেঙ্গালাল মাড়ওয়ারী ।০, কালিদাস সরকার ।০, একজন দরিদ্রের বন্ধু ॥০, রাজেন্দ্রনাথ বসু ।০, দুর্গাদাস বসু ॥০, সিদ্ধেশ্বর নিয়োগী ।০, মুন্সি সাদের আলী ৵১০, জ্যোতিন্দ্রনাথ দে ॥০, হেমেন্দ্রনাথ ভট্টা ৵০, ভুবনমোহন ঘোষ ৵০, কালিদাস বন্দ্যো ।০, হরকুমার দাসগুপ্ত ৵, কালীপদ সরকার ।০, ভাগবত বিশ্বাস ৵০,)। ডেরাডুন ফরেষ্ট স্কুল হইতে বাবু মনোমোহন লাহিড়ী কর্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৪৷০ যথা (মনোমোহন লাহিড়ী ২৲, অমর সিংহ ১৲, কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা ১৲, শরদিন্দু চক্রবর্ত্তী ১৲, খগেন্দ্রনাথ মুখো ২৲, হুকুমচাঁদ ॥০, বীরবল ১৲, মহেন্দ্রলাল সরকার ॥০, S. C. Chatterje ১৲, একজন বন্ধু ১৲, কে,কে, কর ১৲, বিমলাচরণ সোম ॥০, ঈশানচন্দ্র দেব ১৲, এন্, সি, গুপ্ত ॥০, M. N. S. ১৲, S. Shome ১৲, একজন দরিদ্র ।০, যদুনাথ নাথ ॥০, ভূপসিংহ ॥০, J. H. Nichal ২৲, T. S. Martin ২৲, বদরুদ্দিন ১৲, একস্থান ২৲)। বাবু প্রমথনাথ রায় কর্তৃক টাঙ্গাইল ও কলিকাতা হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২০।৵০ যথা (৬১নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট মেস হইতে ৮৲, গিরিজাকান্ত বাগ্‌চী ১৲, শ্রীহর্ষমোহন নিয়োগী ॥০, হরেকৃষ্ণ সাহা ৷০, জানকীনাথ সাহা ১৲, যোগেন্দ্রমোহন সাহা ॥০, হৃদয়নাথ প্রামাণিক ।০, আনন্দচন্দ্র পোদ্দার ৫৲, নবকুমার দত্ত ।০, মানিকচন্দ্র সাহা ॥০, যাদবচন্দ্র সাহা ॥০, প্রাণনাথ সাহা ২৲, উমেশচন্দ্র পোদ্দার ৵০, খগেন্দ্রমোহন সাহা ৵০, প্যারীমোহন সাহা /০, ত্রৈলোক্য

নাথ সাহা ৵০)। বাবু ভোলানাথ সরকার ও বাবু রামলাল মজুমদার কর্ত্তৃক পুরুলিয়া হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বে স্বীকৃত ৪১৵০ যথা (C. H. Bompas Esq. Dy. Commissioner ১০৲ ডাঃ প্রসন্নকুমার দে ১০৲,অক্ষয়কুমার সরকার ৫৲ পরেশনাথ ঘোষ ২৲, উপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখার্জি ২৲, ফণীন্দ্রঘোষ ২৲, রামতারক রায় ১৲, চন্দ্রশেখর তেওয়ারি ১৲, নন্দগোপাল বন্দ্যো ॥০, যোগেশচন্দ্র দাস ।০, কুঞ্জবিহারী সরকার ।০, ক্ষেত্রমোহন বসু ১৲, স্কুল হইতে রাজা উদ্ধব সিংহ ৪৲,ললিতমোহন ঘোষ১৲, অন্যান্য ছাত্র ১৵০)। বাবু গোবিন্দনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক সিলচর কাছাড় হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৪০৲ যথা (রায় শরৎচন্দ্র বন্দ্যো বাহাদুর ৫৲, কামিনীকুমার চন্দ্র উকীল ৫৲, ব্রজনাথ দত্ত ৫৲, মহম্মদ আবদুল কাদের ৫৲, ডাঃ প্রসন্ন কুমার দাস ৪৲, মহেশচন্দ্র দত্ত ২৲, হরিচরণ দাস ২৲, প্রদ্যুম্নচরণ দাস ১৲, অভয়চরণ দাস ১৲, জগৎচন্দ্র দাস ১৲, নরসিংহ দত্ত ১৲, মনগোবিন্দ চৌধুরী ১৲,গোবিন্দকিশোর চান্দ১৲, কৈলাসচন্দ্র দে ১৲, অন্নদাচরণ সেন ১৲, মথুরা নাথ চৌধুরী ॥০, গুরুচরণ শর্ম্মা ॥০, অম্বিকা চরণ নাগ ।০, শ্রীনাথ কাড়াল ।০, জনৈক সমদুঃখী ২॥০)। মরান হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার হাজিবছিরদ্দিন আহম্মদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৩৲,যথা -(নিজ ১৲,নুরুদ্দিন বেপারি সাহেব ॥০, সেখ সফরু ।০, নান্‌কু ।০, চৈতন ৵০, ঘনকান্ত কাকতি ।০, গুরুদিন সিং ।০, ভবানীদিন সিঃ ।০, মহম্মদ গোলাপ ।০)।

ঘাটাল হইতে বাবু চন্দ্রকুমার গুঁই মহাশয়ের দ্বারা প্রেরিত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২০৲যথা (শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুই ১২৲,নন্দিলাল গুই ১৲ শশিভূষণ গুই ১৲, যোগেন্দ্রনাথ গুই ১৲, রামচরণ দালাল ১৲, বেণী মাধব দাস ১৲,মধুসূদন সেন ১৲, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল ১৲, শিব নারায়ণ ভট্টা ॥০,রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী ৮০)। শ্যামপুর হইতে বাবু শরচ্চন্দ্র সান্যাল প্রেরিত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৩৲ যথা—(কৈলাসচন্দ্র গাঙ্গুলি ২৲, শ্যামাচরণ রায় ।০, শরচ্চন্দ্র সান্যাল ডাক্তর ॥০, মজর মণ্ডল প্যাদা ।০)। সেনহাটি হইতে বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রেরিত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৯৲ যথা—

From Shabersha—Girish Chandra Bose Rs. 2, Ambica Charan Bose R 1. Uma Charan Nandi R, 1. Tarack Nath Bose 8 as. Girija Proshanna Bose 4 as. Hridoy Nath Bose 2 as. Jogneswar Chakraborty 2 as. Tarack Nath Harra (Station-master) Phultala 8 as. Banka Charan Bannerjee, booking clerk 4 as.

From—Shenhati, Umesh Chandra sen 4 as. Sreenath sen 2 as. Umesh Chandra Sen 2 as. Amrita Lal sen 2 as. Dakminaranjon sen 2 as. Krisna Chandra Deb 2 as. Mohendra Kumar Sen 2 as, Karunamoi Devi Rs. 2. * * * 4 as. Babu Aswini kumar Sen pice 1 for post-card and Jadu Bhushan Chakraborty money-order fee2. as.

নোয়াখালি হইতে বাবু রমণীকান্ত গুহ দ্বারা প্রেরিত ও পূর্ব্বে দুইবারে স্বীকৃত ১৭॥০ যথা-(মৌলবি আবদুলকাদের ডিঃ মাঃ ২৲,আপছুরদ্দিন মহম্মদ ডিঃ মাঃ ২৲,মুন্সী রমজানআলি ফৌজদারী সেরেস্তাদার ১৲, জজ কোর্টের উকিলগণ ২।৵০, মুন্‌সেফ্ কোর্টের উকিলগণ ৫৲, বাবু তারকনাথ কমিটী হেডক্লার্ক ১৲, দ্বারিকানাথ মজুমদার কেরাণী ।০, দীননাথ চক্রবর্ত্তী কেরাণী পোষ্টাফিস ।০, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী ঐ ।০, উমেশচন্দ্র ঘোষ কেরাণী ॥০, হরচন্দ্র দাস ঐ ।০, আনন্দচন্দ্র সেন ঐ ॥০, হরেন্দ্র কুমার বসু ঐ ।০,অখিলচন্দ্র দে ঐ৵০ রাজেন্দ্র কিশোর গুপ্ত ঐ ।০, কৃষ্ণ কুমার মজুমদার মোক্তার ॥০, রজনী কান্ত বসু জজ কোর্ট একাউণ্টেণ্ট ।০, জয়চন্দ্র ঘোষ কালেক্টরির একাউণ্টেণ্ট ॥০,আনা)। বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রেরিত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৩৭৲ যথা—(জিরিঘাট চা বাগিচার ম্যানেজার, কেরাণী, মোহরিবাবু, ডাক্তারবাবু চাঃঘরবাবু সর্দ্দার চৌকিদার এবং কুলীগণ মোটে ৩৭৲ টাকা)। সিমলা পাহাড় হইতে বাবু প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রেরিত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ১৪৲ যথা—(শ্রীমতী দুর্গা ৬৲, লালা জহরসিংহ ১৲, কেশব দাস ১৲, বাহাদুর সিং থাপা ১৲, বাবু চারু-

চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, প্রিয়নাথ রায়১৲, কে, সি মুখোপাধ্যায় ১৲, মিঃ এফ্ সি ১৲, প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৲, মোট ১৪৲ টাকা)। দৌলতপুর হইতে বাবু কুলদাপ্রসাদ দাস কর্তৃক প্রেরিত ২২৷৷৵০ যথা—(বাবু লক্ষ্মীকান্ত বসু ষ্টেসনমাষ্টার দৌলতপুর ১৲, রমানাথ বক্সী এসিষ্ট্যাণ্ট ঐ ঐ ১৲, ভুবন মোহন মজুমদার সাং মহেশ্বরপাশা ১৲, অটল বিহারী মজুমদার সাং ঐ ১৲, হরষিত চক্রবর্ত্তী সাং ঐ ১৲ কুলদাপ্রসাদ দাস হেডমাষ্টার দৌলতপুরস্কুল ৫৲, সারদাকান্ত দাস সেকেণ্ড মাষ্টার ঐ ১৲, নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 3d Master ঐ ১৲, নিবারণচন্দ্র মজুমদার 4th Master ঐ ১৲, রাস বিহারী চট্টোপাধ্যায় 5th Master ঐ ।০, ভূপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 6th Master ঐ ।০, পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন হেডপণ্ডিত ঐ ৷৷০, বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 2d Pandit ঐ ৷৷০, মৌলবী মহম্মদ এসমাইল Persian Teacher ঐ।০, ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ধর সাং কেশবপুর ।০, বাবু রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত ।১০,—বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মহেশ্বরপাশা ৶০, অন্যান্য ৶১০ ; ১ম শ্রেণীর ছাত্রগণ—দেবেন্দ্র নাথ বসু ৶০, বসন্তকুমার ঘোষ ।০; রামতারণ চক্রবর্ত্তী ৶০(তৃতীয় শ্রেণী) কিরণচন্দ্র কাঞ্জিলাল ৶০, রামলাল নন্দী ৶০, বেনোয়ারী লাল দত্ত ৶০, মনমোহন কাঞ্জিলাল ৴০, অন্নদাচরণ হালদার ৴০, চতুর্থ শ্রেণী বিজয়কুমার মজুমদার ২নং ৷৷০, নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ।০, তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।০, ললিত মোহন সিংহ ।০, বিধুভূষণ দত্ত ৶০, সতীশচন্দ্র রায় ৶০, ভুবন মোহন ঘোষ ৶০, সুরেন্দ্র নাথ মিত্র ৶০, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৶০, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৴০ অখিল চন্দ্র বসু ৴০, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৴০ মেঘনাদ দে ৴০, বিজয়কুমার মজুমদার ১নং ৶০, (পঞ্চম শ্রেণী)হেমেন্দ্র কুমার মজুমদার ৷৷০, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৶১০, নেপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৶০, বিজয়কুমার মিত্র ৴০, যজ্ঞেশ্বর বাইতি ৴০, চারুচন্দ্র বসু ৴০, উপেন্দ্র নাথ বসু ৴০, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৴০, অহেলদ্দি সেখ ৴০, বঙ্কবেহারী বসু ৴০, কালীকান্ত পাল ৴০, ভূপতি গঙ্গোপাধ্যায় ৴০, আয়েনদ্দি সেখ ৴০, (ষষ্ঠ শ্রেণী) অক্ষয়কুমার মজুমদার ৶০, এস্মাইল সেখ ৶০, বসন্ত কুমার ঘোষ ৴০, ইন্দুভূষণ দাস ৴০, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ৴০, সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ৴০, শশীভূষণ ঘোষ ৴০, মতিলাল চক্রবর্ত্তী ৴০, অবিনাশ চন্দ্র পাল ৴০, কালিদাস গুহ ৴০, রাখালদাস মজুমদার ৴০, সেখ রেয়াজদ্দি ৴০, গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৴০, অনন্তকুমার মজুমদার ৴০, সতীশচন্দ্র ঘোষ ৴১০, নেপালচন্দ্র পাল ৴১০, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৴১০, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৴১০, (সপ্তম শ্রেণী)আশুতোষ রাহা ৶০, আরমান সেখ ৶০, কালিদাস ঘোষ ৶০, এস্মাইল খাঁ ৶০, মফিজদ্দিন সেখ ৴১৫, শীতলচন্দ্র দে ৴০, নগেন্দ্র নাথ মিত্র ৴০, এজারদ্দি সেখ ৴০, বিপিন বিহারী দত্ত ৴০, আজিজ সেখ ৴০, বিরজা কান্ত চট্টো ৴০, আব্দুল করিম সেখ ৴০, ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্ত্তী ৴০, (অষ্টম শ্রেণী) রাজেন্দ্র নাথ রাহা ৶০, কামালদ্দি সেখ ৴০, আরমান সেখ ৴০, নগেন্দ্র ভূষণ সরকার ৴০, আনা। (কুটরিয়া হইতে বাবু যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রেরিত, পূর্ব্ব স্বীকৃত ৬৷৷৴০, যথা--(কুটরিয়া হইতে সংগৃহীত ১৷৷৶১০, কোকডহরা হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বণিক ৶০, হরিলাল বণিক ।০, গোবিন্দ চন্দ্র বণিক ।০, পিয়ন ৴০, একটী খলিপা ৴০, পূর্ণচন্দ্র বণিক ।০ কালাচাঁদ নাগ ।০, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ।০, অন্য দুইটী বণিক ৶০ একটী দেশয়ালী ৴১০। চাড়ান হইতে—আব্দুল হামিদখাঁ ১৲, আববায্ আলিখাঁ ১৲, ছলিমউদ্দিন সরকার।০ ; উত্তরাইল শরচ্চন্দ্র গোস্বামী ।০, কৃষ্ণগোপাল গোস্বমী ।০, কাশীরাহা(সিংঙ্গাইর) ৶০, ফুলবাড়ী গয়ানাথ গোপ ।০ ; কোরুডহরা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ।০।

বাবু হরিনাথ নিয়োগী পিঙ্গনা ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ২১।৴০ যথা (কৃষ্ণসুন্দর সাহা ২৲ জানকী মোহন পোদ্দার ২৲ বৈকুণ্ঠ নাথ সরকার ।০, মহেশচন্দ্র সিংহ ১৲ ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, গঙ্গাময় বসু ১৲, শশীভূষণ সেন ১৲, কৈলাসচন্দ্র গুহ ১৲, কুঞ্জমোহন চৌধুরী ৷৷০, হরলাল রায় ৷৷০, হরিনাথ নিয়োগী ৷৷০, দুর্গাচন্দ্র রায়১৲, পূর্ণচন্দ্রচট্টো ৴০, চিন্তাহরণ

বন্দ্যো /০, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ /০, পূর্ণচন্দ্র কর ।০, যোগেন্দ্রনাথ চট্টো ৶, রজনীকান্ত দাস ৶০, কৈলাসচন্দ্র দে, ৶০, প্যারিমোহন মুখো ৶০, বরদাকান্ত সাহা/০, মনোমোহন কর্ম্মকার/০, দীননাথ রায় ।০, শ্যামাচরণ চট্টো ।০, শ্রীনাথ দে ৶০, খুদীরাম সাহা /০, ঈশ্বরচন্দ্র বসাক ৶০, পোষ্টমাষ্টার ৶০, চন্দ্রভূষণ মৌলিক ৶০ দামোদর প্রমানিক ১৲, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস /০, খুন্দুনন্দী৴১০,রামগতি লাল/০,সূর্য্যকুমার দে /০, উদ্ধবচন্দ্র সাহা৶০ ,জগদ্বন্ধু দাস ৷৷০,হরচরণ দে/০,লক্ষ্মণ হালই/০,দীননাথ সাহা/০,আনন্দ সেন ৴১০,ছিটু কর্ম্মকার /০,মহেশচন্দ্র দে /০, শিবনাথ সেন /০,পিঙ্গনা স্কুল৪৷৶১০,চান্দমণি পত্র ।/১০(আনন্দমোহন ঘোষ মোক্তার জামালপুর হইতে সংগৃহীত ২৫৲ যথা(জগচ্চন্দ্র দত্ত ৫৲, ঈশানচন্দ্রপাল ৫৲, আনন্দমোহন ঘোষ ৫৲, হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার ২৲,দুর্গানাথ নিরোগী ১৲, রবিকান্ত বসু ১৲, নন্দকুমার দাস ১৲, ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যো ১৲, কার্ত্তিকচন্দ্র গুহ ১৲, দুর্গাকান্ত চৌধুরী ১৲, কোন বন্ধু ১৲, বিপিনবিহারী বন্দ্যো১৲)। বাবু সুরেশচন্দ্র সান্ন্যাল সৈদাবাদ বহরমপুর হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৩৷৷০ যথা(হরগোবিন্দ বর্দ্ধন৫৲,Mr. J.A. Joyce ৫৲, ক্ষেত্রনাথ নাগ ৪৲,কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় ২৲, অঘোরনাথ বাগ ১৲,বিধুভূষণ ঘোষ ১৲, বিশ্বম্ভর বসু১৲,বেনওয়ারিলাল মুখো ১৲,ক্ষেত্রনাথ খাঁ ৷৷০, অঘোরনাথ বন্দ্যো ৷৷০, যোগেন্দ্রলাল গুপ্ত ।০,রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ ।০,যদুনাথবাগচী ।০,সত্যচরণ চট্টো ৶০,গোপালনাথ ভট্টা ৶০, শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৶০, নবকৃষ্ণ ভট্টা ৶০, মহেন্দ্রনাথ চট্টো ৶০, শশিভূষণ সরকার ৶০, গঙ্গাদাস সাহা ৶০, ফণিভূষণ ভট্টা ৶০, শরৎ কুমারী দেবী ৶০, দ্বারকানাথ পালিত ।০, হরিদাস ভট্টা /০,দীনবন্ধু মল্লিক /০, দেবেন্দ্র নাথ রায় ৴১০, অন্নদাপ্রসাদ সান্ন্যাল ৴১০, হৃষীকেশ ভট্টা ৶০, আশুতোষ বসু /০)

বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী, মোক্তার পটুয়াখালি হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ২১৸০, যথা (নন্দলাল কুণ্ড ২৲ প্রসন্নকুমার কারফরমা২৲ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যো ১৲, শ্যামাচরণ পিপলাই ১৲, আনন্দচন্দ্র সেন ১৲,কালীকমল ঠাকুরতা ১৲, বিহারীলাল সরকার ১৲,কৈলাসচন্দ্র সেন ১৲, মহাম্মদ হোসেন তালুকদার ১৲,রামচন্দ্র চৌধুরী ১৲, মহিমচন্দ্র কর ৷৷০, সূর্য্যকান্ত বন্দ্যো ৷৷০,নর্ম্মদাচরণ চট্টো ৷৷০, মুন্সী কাসিমালী সেখ ৷৷০,মুন্সী সহবাণী সেখ ৷৷০, অক্ষয়কুমার দে৷৷০, রাইচরণ রায় ৷৷০, রাধাচরণ দাস ৷৷০,উমাচরণ গুহ ৷৷০, দক্ষিণাচরণ সেন ।০, অম্বিকাচরণ ঠাকুরতা৷৷০,মথুরানাথ রায় ।০,চন্দ্রকুমার দাস ।০, গুরুচরণ সেন ।০, প্যারিমোহন সেন ।০, পার্ব্বতিচরণ পর্ব্বত ।০,সারদাকান্ত বন্দ্যো ।০, অমৃতলাল বন্দ্যো ।০, রজনীকান্ত ব্রহ্ম ।০, প্রসন্নকুমার বসু ।০, তারিণীচরণ চট্টো ।০, কৃপানাথ দাস ।০, মহেশচন্দ্র দে ।০, শরৎচন্দ্র দাস ।০,প্যারিমোহন রায় ৶০,রামচন্দ্র চট্টো ৶০, আশুতোষ নাগ ৶০, দিগীন্দ্রশঙ্কর দাস ৶০, চন্দ্রনাথ সেন, ৶০, শশিভূষণ দাস ৶০, নিবারণচন্দ্র দাস ৶০, রাজকুমার গঙ্গো ৶০, গিরিশ-চন্দ্র সেন /০,)বাবু বিপিনবিহারী রায় ও বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ১৫৷৷০ যথা (গোলক চন্দ্র বসু এণ্ড কোং ২৲, মধুসূদন সিকদার ১৲ মহেশচন্দ্র ঘোষ ৷৷০, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৲, বঙ্গচন্দ্র ভৌমিক ২৲, পিতাম্বর সরকার এণ্ড কোং ২৲ বানর্জ্জি মল্লিক এণ্ড কোং ১৲,বসন্তকুমার রায় এণ্ড কোং ১৲, গঙ্গাধর দত্ত এণ্ড কোং ২৲, হরদয়াল ভৌমিক ১৲, উমাচরণ গুহ ১৲, ভগবান চন্দ্র ব্রহ্ম ১৲)বাবু প্রমথনাথ রায় কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৯৷৷০ যথা(বিজয় গোবিন্দ রায় ৩৲, কানাইলাল সরকার ৷৷০, বনমালী সরকার ৷৷০, হরচন্দ্র ঘোষ ১৲, গোবিন্দগোপাল সাহা ১৲,রামকৃষ্ণ রাজচন্দ্র নাহা ১৲, হৃদয়নাথ ঘোষ ৷৷০, বৃন্দাবনচন্দ্র ভৌমিক ১৲, মথুরানাথ সাহা ৷৷০,গঙ্গাধর সাহা ৷৷০) বাবু বিপিনবিহারী রায় ও বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ কর্ত্তৃক বহুবাজার হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৩৷৷০ যথা (ললিতমোহন চন্দ্র ২৲, জে, এম, সিংহ ১৲, কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস ২৲, রজনীকান্ত তফিলদার ১৲, বিষ্ণুচরণ ভদ্র ১৲,চণ্ডীচরণ বিশ্বাস ২৲,রাজেন্দ্র লাল দত্ত ১৲, হরগোবিন্দ মল্লিক ৷৷০, তারাচাঁদ কুণ্ড ৷৷০,তারকচন্দ্র ভৌমিক ৷৷০,কৈলাস

চন্দ্র বসু ৫৲, কালীচরণ নাগ ২৲, উমাচরণ সেন ১৲, চন্দ্রকান্ত দাস ১৲, দীননাথ নন্দী ১৲, রামমানিক দাস ১৲, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৲)। বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩৲, যথা (তড়িৎমোহন দাস উকীল ১৲, বামাচরণ তফাদার আবদুল্লাবাদ ।০, উমেশচন্দ্র নাগ ৷৹০, মদনমোহন দাস বাজিতপুর ॥০ পার্ব্বতীচরণ দত্ত ॥০) বাবু কুলদানন্দ রায় কর্ত্তৃক রঙ্গপুর হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ১৫॥০ যথা (কুলদানন্দ রায় ২৲, আনন্দমোহন চক্রবর্ত্তী ১৲, দুর্গাপ্রসাদ নাথ ১৲, বরদাপ্রসাদ বাগচী ১৲, উমেশচন্দ্র রায় ১৲, রাজবল্লভ চৌধুরী ১৲, দুর্গানাথ মজুমদার ১৲, দিগম্বর রায় ১৲, পূর্ণচন্দ্র সেন ১৲, রামকমল মজুমদার ১৲, মুন্সি গোলাম হাফেজ ১৲, রাধাকৃষ্ণ রায় ১৲, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ২॥০)। রাজবাড়ী স্কুল বোর্ডিংএর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ১৬॥৵১০, যথা (যাদবচন্দ্র সরকার ৪৲, কুঞ্জকিশোর গাঙ্গুলী ॥০, গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার ।০, মথুরানাথ রায় ।০, কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী ১৲, বেণীমাধব রায় ১৲, কালীচরণ মৌলিক ।০, নীলমণি লাহিড়ী ১৲, তারিণীচরণ লাহিড়ী ১৲, সি, বি, সেন ।০, শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী ।০, কে, সিকদার ॥০, নগেন্দ্রনাথ সিকদার ।০, অক্ষয়কুমার চট্টো ১৲ ত্রৈলোক্যনাথ সাহা ৵০, দক্ষিণারঞ্জন সেন ১৲, জনৈকবন্ধু ॥০, একটী ব্রাহ্মণ ॥০, গোয়ালন্দ হাইস্কুলের ছাত্রগণ ৩৴১০) বাবু ললিতমোহন বন্দ্যো কর্ত্তৃক মহিষাদল হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৬॥০, যথা—(যোগেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ১॥০, হেমচন্দ্র বন্দ্যো ১৲, জলধর সেন ৷৵০, ভৈরবচন্দ্র ভুঁইয়া ।০, সীতানাথ ভুঁইয়া ।০, হরিকৃষ্ণ দাস ।০, গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী ।০, প্রসন্নকুমার মাইতি ৵০, শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ ॥০, শ্যামাচরণ সিংহ ॥০, মহেন্দ্রনাথ বোয়াল ॥০, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০)

পণ্ডিত ভুবনমোহন কর কর্ত্তৃক দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ১২৷৵০, যথা (গোপালচন্দ্র বড়াল ॥০, শশধর মৈত্র ২৲, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥০, জগচ্চন্দ্র সেন ।০, যাদবচন্দ্র কর ।০, হরনাথ দাস ॥০, প্রসন্নচন্দ্র বসু ১৲, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ১৲, গৌরীপ্রসাদ দাস ॥০ ভুবনমোহন কর ২৵০, আবদুলখালেক ।০, বলরাম দাস ১৲, গিরিজাকান্ত সেন ৵০, হরিলাল ধর ॥০, ইনকাম টেক্স সেকেণ্ডক্লার্ক ।০, এসিষ্টাণ্ট রেকর্ডকিপার ট্রেজারি ॥০, দ্বারকানাথ দাস ॥০, একজন ডেঃ কাঃ মোহরের ।০ পীতাম্বর দাস ৵০, শরচ্চন্দ্র চট্টো ৵০, বাঃ স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ ৵০, পঞ্চমশ্রেণী ৴০)। বাবু আশুতোষ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সন্তোষ হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৬৷০ যথা (পূর্ণচন্দ্র সেন ১৲, প্রাণনাথ মজুমদার ১৲, রমণীমোহন নিয়োগী ॥০, গুরুনাথ দাস ॥০, মুন্সিবাড়ী চারিতরফ হইতে ২৲, তীর্থবাসী দাস ৵০, বিপিনবিহারী রায় ।৴০, জানকীনাথ দে, ৴০, সতীশচন্দ্র নিয়োগী ।০, জনৈক ভদ্রলোক ১৲) বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক পাবনা হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২০৷০ (যথা সাধুচরণ বসাক ৵০, নিত্যানন্দ সরকার ।০, কুমারী কমলকুমারী সেন ১৲, প্রসন্নচন্দ্র লাহিড়ী ।০, হরিশচন্দ্র মজুমদার ১৲, শশধর ভাদড়ী ।০, কুঞ্জলাল সাহা ১৲, বিনোদবিহারী মজুমদার ॥০, বটুকনাথ মণ্ডল ॥০, গৌরাঙ্গবিহারী সাহা ৵৫, একটী মহিলা ১৲, হরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৲, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখো ১৲, পাবনা জেলা স্কুলের ছাত্রগণ ৫৲, পাবনা ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রগণ ৬।০, একটী মহিলা ।৵১৫, অক্ষয়কুমার চট্টো ১৲) বাবু বেণীমাধব মিত্র ফুলছেড়া শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্বস্বীকৃত ৬।৵০ যথা (দুর্গানন্দ ঘোষ ১৲, দীনবন্ধু নন্দী ১৲, জয়গোবিন্দ পান ॥০, ঈশানচন্দ্র নন্দী ॥০, নবকুমার সরকার ।০, বিনয়ভূষণ মিত্র ৵০, মাতঙ্গিনী মিত্র ॥০, কুমারী স্নেহলতা মিত্র ৴০, দুইজন বন্ধু ।০, একজন বন্ধু ।০, কাশীজমাদার ॥০, শ্রীমতী মালতী ।০, আনন্দী ।০, রামচরণ সরকার ।০, কেশব সরদার ।০, লক্ষ্মণ শীল ৵০, চন্দন সিং ৵০, বনমালী ।০)। শ্রীমতী চিন্ময়ী দাস ও বাবু সত্যেন্দ্রনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক নওগাঁও হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব স্বীকৃত ২০॥০ যথা (সারদাসুন্দরী মজুমদার ১৲, বিনোদিনী বন্দ্যো ॥০ ত্রিপুরা চক্রবর্ত্তী ।০, চন্দ্রমুখী চক্রবর্ত্তী ১৲, কুসুমকুমারী বসু ২৲, অন্নপূর্ণা চট্টো ১৲, সুশীলা মজুমদার ১৲, ভুবনমোহিনী চাকী ২৲, নিরদাসুন্দরী সেন ।০, হরবল্লভ দে ১৲,

প্রফেসর হক্সলি।

> Happy the man whose lot it is to know
> The secrets of the earth. He hastens not
> To work his fellows' hurt by unjust deeds,
> But with rapt admiration contemplates
> Immortal Nature's ageless harmony,
> And how and when her order came to be
> Such spirits have no place for thoughts of shame.
>
> Euripides, *Fragm.* 902.

কোন দুরস্থ পীড়িত আত্মীয় বা বন্ধুর শারীরিক অবস্থার সংবাদ যেমন উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকি, সেইরূপ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত গত দুই তিন মাস ধরিয়া প্রফেসর হক্সলির পীড়ার সংবাদ দেশীয় ও বিলাতী কাগজ পত্রে শুনিয়া আসিতেছিলাম। গত ১লা জুলাইএর টেলিগ্রামে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে শুনিলাম, হক্সলি চিরদিনের জন্য এ মর্ত্ত-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদিও সত্তর বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তবুও সমস্ত সভ্যজগৎ তাঁহার মৃত্যুতে আজ বিষণ্ণ। এ পবিত্র বিষাদের বিশিষ্ট কারণ আছে, সে কারণ প্রিয় পাঠক, তাঁহার জীবনের মোটামুটি বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। রত্নপ্রসূ ইংলণ্ড—যে ইংলণ্ড জগৎকে নিউটন দিয়াছে, ডারউইন দিয়াছে—সেই ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক জগতে আজ আর এমন একটী লোক দেখিতেছি না, যিনি হক্সলির শূন্য-সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন। ফ্রান্স, জর্ম্মাণি, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের বিজ্ঞান-আকাশের উজ্জল নক্ষত্র সকল দেখিতেছি, তাহা দেখিয়াও আমরা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে, শুদ্ধ ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক জগৎ কেন, সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞান রাজ্যে আর এমন একটি লোক আজ দেখিতেছি না, যিনি হক্সলির মৃত্যুজনিত মানবজাতির অভাব পূর্ণ করিতে পারেন। পৃথিবীর উচ্চতম চিন্তা-জগতের শীর্ষস্থানীয় এই হক্সলির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, তাঁহার সমুন্নত মনের গঠন, বিজ্ঞান-জগতে তাঁহার মহত্ত্ব কিসের জন্য, দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় সমস্যা সকল সম্বন্ধে তাঁহার মত, আর মানবের সেই চিরদিনের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও চিন্তার বস্তু যে ধর্ম্মভাব, সেই ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে তাঁহার কি মত ছিল, এই সকল বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে সার সার দুই চারিটি কথা বলিব।

গত শীতকালে (নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের শীতকাল) ইংলণ্ডে ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এবার অনেক লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। হক্সলিও মার্চ্চ মাসে ঐ রোগে আক্রান্ত হন; তার পর মাঝে মাঝে কতকটা ভালও ছিলেন। কিন্তু উক্ত রোগে বিশেষতঃ ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) প্রভৃতি উহার আনুষঙ্গিক রোগের (Complications র) হাত হইতে একবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। হক্সলি এই ব্রঙ্কাইটিস দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতেছিলেন। একবার একটু ভাল হইতেছিলেন, আবার পড়িতেছিলেন। মধ্যে একবার এমনি গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হন যে, প্রুফ সংশোধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন বলিয়া Balfourএর

Foundations of Belief নামক পুস্তকের সমালোচনা করিয়া মার্চ্চমাসের Nineteenth Century তে যে প্রবন্ধ আরম্ভ করেন, তাহার দ্বিতীয়ভাগ এপ্রিলের কাগজে বাহির করিতে পারেন নাই, ঐ ভাগ আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ব্রঙ্কাইটিস ভিন্ন, জুন মাসের শেষ ভাগে আবার নেফ্রাইটিস (Kidneyর প্রদাহ) আসিয়া হক্সলিকে শয্যাশায়ী করে। এ সময়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ডেরও (heartর) অবস্থা ভাল ছিল না। এই নেফ্রাইটিসের জন্য হক্সলি জীবনের শেষভাগে কতকটা ঢলিয়া পড়েন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই একদিন তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় (drowsy) হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস ও নেফ্রাইটিস হক্সলির মৃত্যুর কারণ। ২৯শে জুন শনিবার অপরাহ্নকালে হক্সলির জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিবিয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা আজ এ সংসারে কাঁদিতেছে।

হক্সলি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মিডিলসেক্স (Middlesex) নামক কাউণ্টিতে ইলিং (Ealing) নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুদিন স্কুলে অধ্যয়নের পর, ঘরে কিছুদিন নিজে নিজে বিশেষ যত্নের সহিত লেখাপড়ার চেষ্টা করেন। এই গাঢ় অধ্যবসায়পূর্ণ চর্চ্চা তাঁহার ভবিষ্য মহত্বের সূত্রপাত স্বরূপ। তার পর কিছুদিন লণ্ডনস্থ চেরিংক্রস্ হাঁসপাতালের ডাক্তারি স্কুলে ডাক্তারি শিক্ষা করেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সুপ্রসিদ্ধ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক এম্-বি পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় শরীরতত্ত্ব (Anatomy) ও শরীর-কার্য্যতত্ত্বে (Physiology) বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। উক্ত দুই বিষয়ে সম্মান-পরীক্ষায় (Honours Examinationএ) হক্সলি দ্বিতীয় হন এবং একটি মেডাল পান। পাঠক দেখিতেছেন, জগতের একজন প্রধান শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত (Biologist) কিরূপে ধীরে ধীরে সৃজিত হইতেছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন। এই জন্যই উক্ত বিদ্যালয় প্রদত্ত ডাক্তারি উপাধিও (degrees) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডাক্তারি উপাধি অপেক্ষা উচ্চতর। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় কোন বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সে বিষয়টি খুব ভাল করিয়া জানা চাই, এবং তজ্জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা তাই দেখিতেছি, হক্সলি এই সময়ে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত এনাটমি ও ফিজিয়লজি অধ্যয়ন করেন। তার পর দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ এম, বি, পরীক্ষা দিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি উপাধি গ্রহণ করিবার অবকাশ হক্সলি পান নাই। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া নামক রণপোতের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাটেলস্নেক (Rattlesnake) নামক রণপোতের সহকারী ডাক্তার হন; এই কার্য্যে তিন বৎসর নিযুক্ত থাকেন। এই তিন বৎসর উক্ত পোতের উপর সাগরবক্ষে অবস্থান করিতে করিতে, সেই সাগরগর্ভ হইতেই, জীবনবিজ্ঞানের অনেক নূতন সত্যরত্ন উদ্ধার করেন। পুরুভুজ নামক জীবের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই জীব একটী দ্বিখণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড হইতে একটী পূর্ণাবয়ব স্বতন্ত্র পুরুভুজ উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় অযুত অগণ্য জীবই নিজ নিজ শরীর নিঃসৃত প্রস্তরময়

পদার্থ দ্বারা নিঃশব্দে মহাসাগর মধ্যে প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ (Coral Islands) নির্ম্মাণ করিতেছে প্রবাল আর কিছুই নহে, এই পুরুভুজ জাতীয় জীবের শরীর নিঃসৃত এক প্রকার প্রস্তরময় পদার্থ। জীবনবিজ্ঞানবিদের নিকট এই জাতীয় জীবের আদর এইজন্য যে, সমস্ত বহুকোষী জন্তুর (multicellular animals)—কেঁচো, গেঁড়ি, গুগলি, কাক, কোকিল, ছাগল, গরু, মানুষ সকলই বহুকোষী জন্তু—এই সকল জন্তুর আদি পূর্ব্ব পুরুষ, এই পুরুভুজ জাতীয় জীব হইতে বড় ভিন্ন ছিল না। ইহারা এই জন্য আরো আদরের বস্তু যে, যে সুচারু, অতি জটিল, গভীরতম বিস্ময়জনক স্নায়ুমণ্ডল (Nervous System) লইয়া মানব সংজ্ঞাবিশিষ্ট জীব হইয়া আজ বিশ্ব-ব্যাপার বুঝিবার জন্য উন্মত্ত, সেই স্নায়ুমণ্ডলের অতি সাদামাটা সূত্রপাত জীবরাজ্যে এই জাতীয় জীবের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, হক্সলি, 'র‍্যাটল-স্নেক' রণপোতে থাকিতে থাকিতে সাগর-গর্ভ হইতে এই জাতীয় নানা প্রকারের জীব (Hydrozoa) উত্তোলন করিয়া, তাহাদের গঠন ও বংশবিস্তার সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তারপর ১৮৫১ অব্দে পূর্ব্বোক্ত অবিষ্কার সমূহের জন্য ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সর্ব্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সভা—রয়াল-সোসাইটির (Royal Societyর) ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে অতি অল্প লোকই উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হক্সলি লণ্ডনস্থ প্রসিদ্ধ রয়াল-স্কুল-অব-মাইন্‌স (Royal School of Mines) নামক বিদ্যালয়ের—ইহাকে এখন Royal College of Science বলে—প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, এই অধ্যাপনা কার্য্য তিনি অতি সুন্দররূপেই সম্পন্ন করিতেন। ত্রিশ বৎসর ক্রমান্বয়ে এই কার্য্য করিয়া ১৮৮৫ অব্দে শরীর অসুস্থ হওয়াতে ইহা ছাড়িয়া দেন। এই ত্রিশ বৎসর হক্সলি জীবনবিজ্ঞানের অনেক মহামূল্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, অনেক গভীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন; বৈজ্ঞানিক সভা সমিতির পত্রিকাদিতে অনেক বিশুদ্ধ গবেষণাপূর্ণ জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখেন; আর ঐ বিষয়ে অনেক আদর্শ পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। ঐ সকল মৌলিক আবিষ্কার, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির তালিকা দিয়া প্রিয় পাঠক, আপনাকে জ্বালাতন করিব না। ঐরূপ একটি তালিকা দিতে গেলে নব্যভারতের তিন চারিটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাতে কাহারও তেমন বিশেষ উপকারও হইবে না। সেই জন্য আমরা উক্ত তালিকা দিলাম না। আর ইহাও বলা অনাবশ্যক যে, হক্সলির বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি আর বাঙ্গালির বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ। হক্সলির একটি পুস্তক আর Kidd সাহেবের চটুকে 'Social Evolution' কিম্বা Balfour এর অসার 'Foundations of Belief'র ন্যায় পুস্তকের মধ্যেও সেইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ। হক্সলির একটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, এক এক খানি পুস্তক, অনেক কাঠ খড় পোড়ানের ফল। কঠোর অধ্যবসায়, প্রভূত পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত মস্তিক সঞ্চালন বিনা এরূপ প্রবন্ধ বা পুস্তক হয় না। এই সকল আবিষ্কার, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি দেখিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়িল। ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রুশিয়া অষ্ট্রিয়া, ইটালি, স্পেন, আমেরিকার বিশ্ব-

বিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক সভা সমিতি সমূহ হক্সলির সুধীর মস্তকে সম্মানের উপর সম্মান বর্ষণ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত করিলেন। স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সভা সমিতি সকলও নীরব ছিল না; তাহারাও নানা সম্মানে হক্সলিকে বিভূষিত করিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড নিজের সর্ব্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান, রয়াল সোসাইটির সভাপতিত্ব প্রদান করিয়া আপনার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চ্চা যদিও হক্- জীবনের ব্রত ছিল, পি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশহিতকর অনেক কার্য্যে সাধ্যমত যোগ দিতেন। লণ্ডনের স্কুল বোর্ডের মেম্বর থাকিয়া; সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়া; ইংলণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র তীরে মৎস্য সংরক্ষণ, সংক্রামক রোগ, জীবন্ত জন্তুর উপর পরীক্ষা করণ, ইত্যাদি বিষয়ের রয়াল কমিসন সমূহের মেম্বর হইয়া; সমুদ্রতীরে প্লিমথে (Plymouth) জীবন-বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য নানা সরঞ্জামে সুসজ্জিত যে লেবরেটরি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার এবং রোগ নিবারণার্থে ব্যাকটেরিয়া-বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য লণ্ডনে যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংস্থাপনে সাহায্য করিয়া এবং এইরূপ অনেক কাজ করিয়া স্বদেশের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রভূত উপকার সাধন করেন। জীবনের সন্ধ্যা কাল নিভৃত চিন্তা ও শান্তিতে অতিবাহিত করিবার জন্য ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে রয়াল-স্কুল-অব-মাইন্‌সের অধ্যাপনা কার্য্য ও অন্যান্য সভা সমিতির সভাপতিত্বাদি পদ পরিত্যাগ করেন। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্টেও একটি উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। পরিশ্রান্ত হক্সলি পূর্ব্বোক্ত বিশ্রাম ও শান্তির জন্য পিপাসু ছিলেন। ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের দক্ষিণে ইষ্টবোরণ (Eastbourn) নামক সুন্দর নগরে সমুদ্র তীরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু হক্সলির মত কার্য্যপ্রিয় বীর পুরুষের পক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। অবসর গ্রহণ করিয়াও একটু আধটুকু বৈজ্ঞানিক কার্য্য করিয়াছেন; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দিয়াছেন; অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন; নানাবিধ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন; আর মাসিক পত্রাদিতে গ্লাডষ্টোন ও দুই একটি পাদ্রির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের সহিত যুদ্ধ বাইবেল লিখিত জগৎ সৃষ্টির প্রণালী (Mosaic Cosmogony) লইয়া। এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হন, তাহা আর আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। হক্সলি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা গ্লাডষ্টোনের তর্কযুক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। যাহা হউক, বিশ্বসংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। গত ২৯শে জুন, ইষ্টবোরণস্থ নিজ বাটীতে, ঐ মহাকৃতী, মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ হক্সলির পবিত্র জীবন, কালের অনন্ত সাগরে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া গেল।

হক্সলির সমুন্নত মনের গঠন আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার একটি গুণ অগ্রে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে গুণ তাঁহার কঠোর সত্যপ্রিয়তা। আপাততঃ মনে হয়, ইহা এমন কিছু অসাধারণ বিশেষ গুণ নহে; এ গুণ অনেকেরই আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুখে মুখে অনেকেই সত্যপ্রিয়—এমন কি কঠোর ভাবে সত্যপ্রিয়; কিন্তু কাজে নয়। কর্ম্মজগতে হউক,

আর ধর্ম্মজগতেই হউক, এমন কিছুই বিশ্বাস করিব না, যার প্রমাণ নাই—ইহা হক্সলির জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার সমগ্র জীবন এই ভাবে দীপ্তমান। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক উক্তি, তাঁহার পুস্তকাদির প্রত্যেক পংক্তি জ্বলন্ত ভাবে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেবল বিজ্ঞান রাজ্যে বিশুদ্ধ কঠোর যুক্তির আশ্রয়ে যাহার প্রমাণ আছে দেখিব, তাহাই বিশ্বাস করিব, আর যাহার প্রমাণ নাই, তাহা বিশ্বাস করিব না; কিন্তু দর্শন ও ধর্ম্মজগতে ঐরূপ ঐকান্তিক কঠোরতার ও নিরপেক্ষতার ততটা প্রয়োজন নাই; এ রাজ্য ভাবের রাজ্য, বিশ্বাসের রাজ্য; এখানে কোন প্রাচীন, চিরপোষিত, চিরাদৃত, চিরারাধ্য মতের পক্ষে তেমন প্রমাণ না থাকিলেও, তাহা বিশ্বাস করিতে পার,—এরূপ মনের গঠন হক্সলির মনের গঠন ছিল না; এ ভাবকে হক্সলি অত্যন্ত অনিষ্টকর বিষপূর্ণ ভাব মনে করিতেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তির দিব্য আলোক দর্শন-রাজ্যে, ধর্ম্ম-রাজ্যেও লইয়া যাও; লইয়া যাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য; সেখানেও সত্যপ্রাণ হইয়া উক্ত দিব্যালোক সাহায্যে যে মতের পক্ষে প্রমাণ আছে দেখিবে, কেবল সেই মতই বিশ্বাস করিবে; দক্ষিণে বামে চাহিও না; ফলাফলের কথা ভাবিও না; ও রাজ্যে যদি তোমার কোন চিরপ্রিয় মতের —যে মতের উপর তুমি তোমার জীবনের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছ, যে মতের বিনাশের সহিত তুমি ভাবিতেছ, তোমার জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যদি এরূপ কোন চিরপ্রিয় মতের পক্ষে প্রমাণ দেখিতে না পাও, তবে সে মত হইতেও প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন পণ করিয়া (আ! এ মানসিক সংগ্রাম কি বিষম সংগ্রাম!! এ সংগ্রামের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যাঁহাদের মনে এ সংগ্রামের জ্বলন্ত চিতা কখন জ্বলিয়াছে)—হাঁ, জীবন পণ করিয়া, সে মত হইতেও তোমার বিশ্বাস প্রত্যাহার করিয়া লও, —এই মহান্ পবিত্রভাব হক্সলির জীবনের অস্থি মজ্জাগত ভাব ছিল, এই ভাবই তিনি বজ্রনিনাদে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক উক্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। British Association for the Advancement of Science এর এক বার্ষিক অধিবেশনের যে বারে হক্সলি সভাপতি হন, সেই বার্ষিক অধিবেশনে ইংলণ্ডের ঐ বিরাট বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতির আসন হইতে মানব একটি সংজ্ঞা বিশিষ্ট কল মাত্র (Man a conscious Automaton) এই মতের পক্ষে মানব ইচ্ছার স্বাধীনতার (Freedom of Will) বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার শেষভাগে নিজের ঐ অস্থি মজ্জাগত সত্যপ্রাণতার প্রমত্ত ভাবের কি সুন্দর পরিচয় দিতেছেন, আর শ্রোতৃবৃন্দকেও ঐ ভাব দ্বারা কি জলন্ত, জীবন্ত, বৈদ্যুতিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছেন!! দুঃখ রহিল, আমরা স্থানাভাবে সে অংশটুকু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা বারংবারই বলিতেছি, শুধু এই এক স্থানে নয়, হক্সলির প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক উক্তি, জ্বলন্ত সত্যপ্রাণতায় উদ্ভাসিত। আর সেই জন্যই তাঁহার লেখনী এত মর্ম্মস্পর্শী, তাঁহার মত ও যুক্তির এতই অনিবার্য্য আকর্ষণ। দর্শন ও ধর্ম্মরাজ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া যে মতের পক্ষে প্রমাণ আছে, কেবল সেই মতই বিশ্বাস করিব, ইহাতে যা হবার তা হবে, ইহাতে আমার চিরশান্তিপ্রদ মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে

পড়ুক, ইহাতে আমি যে বিশ্বাসকে জীবনের ভিত্তি স্বরূপ মনে করি, সে বিশ্বাসকে চির-দিনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হয় হউক, ইহাতে সংসার উৎসন্ন যায় যাউক, তবুও প্রমাণ নাই, এরূপ কোন মতে আমি কখন বিশ্বাস করিতে পারিব না; এ অকূল সংসার-সমুদ্রে সত্যই আমার ধ্রুবতারা, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব; এই ভাবটী জীবনের মূলমন্ত্র করিতে, এভাবে জীবন-নিয়মিত করিতে অতি অল্প লোকেই পারেন। ইচ্ছা তেমন বলবতী নয় বলিয়া, অনেকেই পারেন না। ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও অনেকে বাল্যশিক্ষার দোষে পারেন না, ভাবরাজ্যের মোহিনী মায়ার টানে পারেন না; অনেকে আবার দুর্ভাগ্য ক্রমে জীবন-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রে মনকে সুসজ্জিত করিবার সুবিধা পান নাই বলিয়া এবং তজ্জন্য কোন মত ও বিশ্বাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিতে অসমর্থ বলিয়া পারেন না;—এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণ অতি অল্প লোকেই পূর্ব্বোক্ত ভাবটিকে কার্য্যতঃ জীবনের মূলমন্ত্র করিতে পারেন। কাণ্ট (Kant) একজন উচ্চদরের দার্শনিক; দুই একটি অমূল্য ধনে তিনি দর্শনশাস্ত্রকে ধনী করিয়াছেন। লোকে যাহাকে চলিত কথায় সত্য-প্রিয়তা বলে, কে বলিবে, সে ভাবে কাণ্ট পূর্ণ মাত্রায় সত্যপ্রিয় ছিলেন না? কিন্তু দর্শন-রাজ্যে পূর্ব্বোক্ত অস্থিমজ্জাগত সত্যপ্রাণতার অভাবে কাণ্টও অজ্ঞাতসারে নিজ দর্শনশাস্ত্রের দুই একটি মূলমতকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। আত্মার অমরত্বে তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে; কেননা তাহা না করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস ঘুচিয়া যায়, সমাজ ছারখার হয়। পাঠক, দর্শনরাজ্যে এ কি বিষম অনিষ্ট-কর যুক্তি প্রণালী! কাণ্টের এই দূষিত যুক্তি-প্রণালীর মূলে ঐ পূর্ব্বোক্ত অস্থিমজ্জাগত সত্য-সর্ব্বস্ব ভাবের অভাব। যদি কাণ্টের দশা এই হইল, তাহা হইলে, সাধারণলোকের ত কথাই নাই।

হক্সলির মনে আর একটি বিশেষ গুণ ছিল—বিশেষ সতর্কতা (Caution)। তাঁহার এ গুণের মূলে কিন্তু ঐ পূর্ব্বোক্ত সত্যপ্রাণতা। কোন মতের পক্ষে তেমন বিশেষ প্রমাণ নাই, তবে সব বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই মতটিকে সত্য বলিয়া মনে হয়, এরূপ স্থলে কেহ কেহ ঐরূপ মতের গোঁড়া হইয়া পড়েন। হক্সলিতে এ গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না। এই গোঁড়ামির অভাবের জন্য, এই সতর্কতার জন্য বিলাতের অনেক লোকে সময়ে সময়ে তাঁহাকে দোষ দিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহারা চান, হক্সলি স্পষ্ট করিয়া বলুন, অমরাত্মা নাই। হক্সলির কিন্তু ঠিক মত হইতেছে—অমরাত্মা যে আছে, তার প্রমাণ নাই। এ বিশ্বাস, আর অমরাত্মা নাই—এ বিশ্বাসের মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, তাহা তাঁহারা দেখেন না। হক্সলি অবশ্য ইহা বিল-ক্ষণরূপে দেখিতেন। এইজন্য অমরাত্মাতে বিশ্বাস না থাকিলেও, হক্সলি কখন ভুলিয়াও বলেন নাই, অমরাত্মা নাই। এরূপ সতর্কতা হক্সলির লেখনীকে সদা সংযত রাখিয়াছিল। এমন কি, অনেক সময় যেরূপ জোরে নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা অপেক্ষা কম জোরে করিয়াছেন। অতিশয়োক্তি, ন্যায় বহির্ভূত মত হক্সলি আদৌ জানিতেন না। কি সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, দার্শনিকোচিত সত-র্কতা হক্সলির মনকে বিভূষিত করিয়াছিল; স্থানাভাব হইলেও তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্তটি একটি মহা প্রশ্ন সম্বন্ধে—এ পৃথি-

বীতে জীব প্রথমে ঘোর ভূতকালে, জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা, এই সম্বন্ধে। আমরা জানি, ঘোর ভূতকালে জীব যে প্রথমে জড় পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, হক্সলি তাহা বিশ্বাস করিতেন। পাঠক দেখুন, কি মধুর কঠোর সতর্কতার সহিত নিজ বিশ্বাস ব্যক্ত করিতেছেন। এ সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাসকে 'বিশ্বাস' বলিতেই কুণ্ঠিত। হক্সলি বলিতেছেন—

"Looking back through the prodigious vista of the past, I find no record of the commencement of life, and therefore I am devoid of any means of forming a definite conclusion as to the conditions of its appearance. Belief, in the scientific sense of the word, is a serious matter, and needs strong foundations. To say, therefore, in the admitted absence of evidence, that I have any belief as to the mode in which the existing forms of life have originated, would be using words in a wrong sense. But expectation is permissible where belief is not; and if it were given me to look beyond the abyss of geologically recorded time to the still more remote period when the earth was passing through physical and chemical conditions, which it can no more see again than a man may recall his infancy, I should expect to be a witness of the evolution of living protoplasm from not-living matter. I should expect to see it appear under forms of great simplicity, endowed, like existing fungi, with the power of determining the formation of new protoplasm from such matter as ammonium carbonates, oxalates and tartrates, alkaline and earthly phosphates, and water, without the aid of life. That is the expectation to which analogical reasoning leads me; but I beg you once more to recollect that I have no right to call my opinion anything but an act of philosophical faith."—*Huxley's Critiques and Addresses.*

হক্সলির মনের আর একটি বিশেষ গুণ—ইহার সর্ব্বগ্রাসিতা জন্তুতত্ত্ব (Zoology) চর্চ্চা জীবন-বিজ্ঞানের এই বিভাগে কতকগুলি অমূল্য নূতন সত্য আবিষ্কার করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কিন্তু হক্সলির মনের মত সুপ্রশস্ত মন গেঁড়ি, চিংড়ি মাছের স্নায়ুমণ্ডল, বনমানুষের মস্তিষ্ক ইত্যাদি ব্যবচ্ছেদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এ সব ত চাইই, আর এ সব তত্ত্বে তাঁহার জ্ঞানও অগাধ ছিল। কিন্তু এ সব তত্ত্বের অন্তরালে যে সুবিশাল প্রাণ-মনমুগ্ধকারী জ্ঞান রাজ্য বিস্তৃত, সে রাজ্যে ভ্রমণ করিবার জন্যও হক্সলির মন লালায়িত। শুধু তাই নয়, ঐ রাজ্যেরও পশ্চাতে গভীর প্রহেলিকা-পূর্ণ যে ঘন অন্ধকারের রাজ্য চির প্রসারিত রহিয়াছে, সে রাজ্য হইতেও একটি আলোক-রশ্মি লাভের জন্য তাঁহার মন সদা লোলুপ ছিল। হক্সলির এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, শত্রু-মিত্র সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। এই জন্যই সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বোর্ডন সাণ্ডারসন (Burdon Sanderson) একদিন বলিয়াছিলেন যে, হক্সলির গরীয়সী ধীশক্তি নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; আর তিনি যে বিষয়টি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকেই নূতন আলোকে আলোকিত, নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। হক্সলি ত জীবন-বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, (একটি বিভাগের সহিত শুধু সুপরিচিত হইতেই সাধারণ লোককে প্রাণান্ত হইতে হয়), এবং ঐ সকল বিভাগকে উজ্জ্বলতর আলোকে আলোকিত করিয়াছেন; কিন্তু তা ভিন্ন তিনি দর্শন-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ ঘুরিয়া আইস, আর একটি লোক দেখিতে পাইবে না, যিনি হক্সলির মত সমুন্নত বিজ্ঞানবিদ্ অথচ হক্সলির ন্যায় দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এইটি হক্সলির বিশেষ অসাধারণত্ব ছিল। অনেক বৈজ্ঞানিক কেবল গেঁড়ি আর ফুল, সল্‌ফিউরিক্ এসিড আর ব্যারিওমিটার লইয়াই জীবন শেষ করিয়া যান। দর্শন ও ধর্ম্মরাজ্যের গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া, সত্যপ্রাণ হইয়া

এই রাজ্যের কল্পনাজাত লূতাতন্তু সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, মানব ও প্রকৃতির সহিত নিজ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত একদেশদর্শী হইয়া পড়েন, এই জন্যই কোন কোন বৈজ্ঞানিক আজও মানবী ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন, যীশুকে ঈশ্বরের সমান করিয়া তাঁর উপাসনা করিতেছেন। বাস্তবিক সত্য-সর্ব্বস্ব হইয়া, প্রকৃতির গভীর রহস্যে প্রমত্ত হইয়া, বিজ্ঞান ও দর্শন এ দুইয়েরই গভীর আলোচনা না করিলে মানব মনের সে বিশালতা জন্মে না, সে বিশালতায় হৃদয় মুগ্ধ হয়, প্রাণ স্তম্ভিত হয়। ভাগ্যবান্ হক্সলির মনের সে বিশালতা ছিল। যাহা হউক, আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহাতে এ বিষয়টি স্বতঃই আরও বিশদ হইয়া পড়িবে। তবে এখানে এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। হক্সলি যেমন একটি অতি উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন। বিজ্ঞান ত তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলই, কিন্তু আমরণ সাহিত্য-সেবারও প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত দু এক খানি পুস্তক এবং অনেক গুলি প্রবন্ধ অতি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য। তাঁহার "হিউম্" (Hume) অনেকেই পড়িয়াছেন, আর যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ভাবের গাম্ভীর্য্যে ত মুগ্ধ হইয়াছেনই, শুধু লেখার পারিপাট্যে ও মোহিত হইয়াছেন। শত্রুমিত্র সকলেই হক্সলির ভাষার প্রাঞ্জলতার ও হৃদয়গ্রাহিতার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়াছেন।

হক্সলির মনের গঠন সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার মহত্ত্বের কারণ অনেকটা অনুমান করিতে পারা যায়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মনের গঠন যেরূপ হওয়া উচিত, হক্সলির মনের গঠন সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই ছিল। এখন বিজ্ঞানরাজ্যে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ একটু আলোচনা করিয়া দেখিলেই সম্যক্ প্রতীতি হইবে, কিসের জন্য হক্সলি বিজ্ঞানজগতে এত উচ্চ আসন পাইয়াছিলেন। আজ কাল বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ (অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ইত্যাদি) এতই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন একটি বিভাগের পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহের সহিত সুপরিচিত হইয়া সেই বিভাগে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এখন অনেক বৈজ্ঞানিককেই একটি বিভাগের একটি অংশকেই নিজের জীবনের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। হক্সলির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এরূপ একটি বিভাগের একটি অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। সমগ্র জন্তুবিদ্যা (Zoology) তাঁহার বিশাল কার্য্যক্ষেত্র ছিল। তিনি অমেরুদণ্ডক জন্তু শারীরবিদ্যায় (Anatomy of the Invertebrata) যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, সমেরুদণ্ডক জন্তু-শারীরবিদ্যাতেও (Anatomy of Vertebrata) তেমনি পারদর্শী ছিলেন। অতি অল্প জন্তুবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত উক্ত দুই বিষয়েই সুপণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন। তা ভিন্ন হক্সলি অতীত জীবশরীরবিদ্যাতেও (Palæontology) বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে তিনি কি কি নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার বর্ণনার স্থান এ নয়। তবে সাধারণের বোধগম্য দুই একটি আবিষ্কারের সম্বন্ধে কিছু

বলা আবশ্যক। এখানে অগ্রেই বলা ভাল, হক্সলি ক্রমবিকাশবাদে (Theory of Evolution) ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ডারউইনের এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারউইনের সুপ্রসিদ্ধ অরিজিন অব স্পিসিজ (Origin of Species) প্রকাশিত হইলে পর, ডারউইন ও তন্মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকগণ,আর ক্রমবিকাশবাদে যাঁহারা অবিশ্বাস করিতেন,তাঁহাদের মধ্যে যে তুমুল যুদ্ধ বাধে,সেই যুদ্ধের একজন প্রধান যোদ্ধা হক্সলি। সকলেই জানেন, ক্রমবিকাশবাদ উচ্চ চিন্তা-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। আজ সকলেই দেখিতেছেন,ক্রমবিকাশবাদের বিজয় নিশান উচ্চচিন্তা-জগতের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান। মানবের উচ্চচিন্তা রাজ্যে এ যুগান্তর আনয়নে হক্সলির অসাধরণ প্রতিভা ও তেজস্বী লেখনী যেরূপ কার্য্য করিয়াছে,ডারউইন ভিন্ন অন্য কোন বৈজ্ঞানিক সেরূপ করিতে পারেন নাই। এখন পাঠক আসুন, জীবন-বিজ্ঞান-রাজ্যে হক্সলির দুই একটি আবিষ্কারের একটু আলোচনা করা যাউক। মনুষ্য বানরজাতীয় একপ্রকার জন্তু,১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হক্সলি এই সত্য প্রচার করিয়া সমস্ত সভ্য-জগতে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করেন। পাঠক এখানে স্মরণ রাখিবেন,ডারউইনের ডিসেণ্ট অব্ ম্যান, (Descent of Man),—যে পুস্তকে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রথম দেখান যে,বনমানুষ এবং মানুষ একই জাতীয় পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, হক্সলির পূর্ব্বোক্ত সত্যপ্রচারের প্রায় দশ বৎসর পরে। মানুষ একপ্রকার জন্তু, হক্সলির এ মত প্রচারের পূর্ব্বে সাধারণ লোকের এবং কুবীর (Cuvier), ওয়েন্ (Owen) প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে,মনুষ্য জন্তুরাজ্যের অন্তর্গত জীব নয়, —ধারণা ছিল, মনুষ্য একপ্রকার স্বতন্ত্র জীব, —মনুষ্যের আসন জন্তুরাজ্যের বাহিরে। হক্সলি দেখাইলেন, অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়,ধমনীতে ধমনীতে,মাংসপেশীতে মাংসপেশীতে, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম গঠনে বনমানুষে মানুষে মিল! এমন একটি অস্থি নাই, যাহা মানুষের আছে, বনমানুষের নাই; মস্তিষ্কের এমন একটি সূক্ষ্ম অংশ নাই, যাহা মানুষের আছে,বনমানুষের নাই। হক্সলি আরও দেখাইলেন,বনমানুষের কথা দূরে থাকুক,গিরগিটি, পক্ষী, কুকুর প্রভৃতি জীবের ভ্রূণ ডিম্বাণু (egg cell) হইতে যেরূপে উৎপন্ন হয়, মনুষ্য ভ্রূণও সেইরূপে উৎপন্ন হয়। বনমানুষের কথা দূরে থাকুক,অন্যান্য নিকৃষ্ট জন্তর ভ্রূণের সহিত মনুষ্য ভ্রূণের সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, দুই মাসের একটি ভ্রূণ দেখিয়া কাহার সাধ্য সহজে বলে এটি মনুষ্যভ্রূণ কি কুকুরভ্রূণ। মানবভ্রূণ-বিকাশ পদ্ধতি (Development of human embryo) কি কুকুর গরু ভেড়া এই সকল জীবের ভ্রূণবিকাশ-পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন? এই প্রশ্ন করিয়া হক্সলি বলিতেছেন;—

"The reply is not doubtful for a moment. Without question, the mode of origin and early stages of the development of man are identical with those of the animals immediately below him in the scale."

হক্সলি আরও দেখাইলেন, উচ্চশ্রেণীর বানরে (বনমানুষে) আর নিম্নশ্রেণীর বানরে যে প্রভেদ, মানুষে আর উচ্চ শ্রেণীর বানরে তাহা অপেক্ষা কম প্রভেদ। ডারউইন বলিতেছেন—

"Our great anatomist and philosopher Prof. Huxley has fully discussed this subject, and concludes that man in all parts of his organisation differs less from the higher apes, than these do from the lower members of the same group. Consequently there is no justification for placing man in a distinct order."

এই সব অকাট্য যুক্তির দ্বারা বিজয়ী হক্সলি দেখাইলেন যে, মানুষের আসন জন্তু রাজ্যের বাহিরে নয়,—মানুষ একপ্রকার বানর জাতীয় জন্তু। আজ সমস্ত শরীরতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত হক্সলির এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হক্সলি যদি মানব জাতিকে আর কোন সত্যরত্নে ধনী না করিতেন, শুদ্ধ এই সত্যটি দিয়া এসংসার হইতে বিদায় লইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিত।

এই সময়ে হক্সলি আর একটি তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বেদ,ক্লেদ,জল,যূষ প্রভৃতি মৃত জড় পদার্থ হইতেই বর্ত্তমান কালে কোন কোন জীব উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব প্রচলিত এই মতটিকে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান (Bastian) পুনর্জ্জীবিত করেন। হক্সলি বলিলেন, এ মতটী ভ্রান্ত মত। হক্সলিতে আর ব্যাষ্টিয়ানে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। পাষ্টর ও টিণ্ডলের সহিত বিজয়ী হক্সলি অবশেষে পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন যে, বর্ত্তমান কালে কোন জীব যে কেবলমাত্র মৃত জড় পদার্থ হইতে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়,তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে ঘোর অতীত কালে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায়, অনবগাহ্য অবস্থা সমূহের সমবায়ে আদিজীব যে প্রথমে জড় পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হক্সলি বিশ্বাস করিতেন।*

পাঠক জানেন, এই পৃথিবীর উপর শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, বৎসর পূর্ব্বে এমন সব নানা জাতির জীব বাস করিত, যাহারা একবারে বিলুপ্ত (Extinct) হইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই সেই জাতির (species) জীবন্ত জীব এখন আর একটি দেখা যায় না। জীবন্ত দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঐ সকল জাতি জীবের প্রস্তরীভূত শরীর (Fossils) প্রস্তরময় ভূপৃষ্ঠের স্তরে স্তরে নিহিত আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইউরোপে এই প্রস্তরীভূত জীব শরীর তত্ত্বের বহুল চর্চ্চা হইতেছে। কত উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব আলোচনাতে জীবন শেষ করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,অসাধারণ প্রতিভাশালী হক্সলি এই অতীত জীবশরীরবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হক্সলি কুম্ভীরের প্রস্তরীভূত পূর্ব্ব পুরুষগণের গঠন বিশেষরূপে আলোচনা করেন। এই আলোচনা করিতে করিতে হক্সলি দেখান যে, ঘোর অতীত কালে, পৃথিবীতে মনুষ্য আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে,Belodon, Stagonolepi's নামক (নাম অবশ্য মানুষ সে দিন ঐ সকল প্রস্তরীভূত শরীরকে দিয়াছে) জাতির যে সকল জীব বাস করিত,—যাহারা বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত (Extinct) হইয়া গিয়াছে; যাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল মাত্র আজ অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেই সকল জীবই কুম্ভীরের আদি পুরুষ ছিল। ইহারা ত অনেকটা কুম্ভীরের মত হইবেই, কিন্তু হক্সলি দেখাইলেন যে, ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকটা গিরগিটির শারীরিক গঠনের মত। পাঠক ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়? কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে,এই সকল জীবই কিম্বা ইহাদের মত জীবই কুম্ভীর ও গিরগিটি,এই দুই

* এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, নব্যভারতে প্রকাশিত লেখকের"জীবোৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ দেখিবেন।

জাতীয় জীবেরই আদি পূর্ব্ব পুরুষ ছিল। কুম্ভীর ও গিরগিটির মধ্যে আজ অনেক প্রভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহারা একই পূর্ব্ব পুরুষের বংশজ; ইহারা জীবন বৃক্ষের একটি শাখার দুটি প্রশাখা মাত্র। এরূপ সত্য ক্রমবিকাশবাদকে কি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছে! ক্রমবিকাশবাদ যাহা বলে, এখানে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ক্রমবিকাশবাদ বলে, একই জাতীয় পূর্ব্ব পুরুষ হইতে কালক্রমে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। অতীত জীবশরীরতত্ব (Polaeontology) এই মত সমর্থন করিয়া এখানে দেখাইতেছে, কুম্ভীর ও গিরগিটি, এই দুই বিভিন্ন জাতীয় জীবের আদি পূর্ব্ব পুরুষ একই জাতীয় জীব ছিল।

হক্সলি ঐরূপ আরও একটি অমূল্য ধনে পৃথিবীকে ধনী করিয়াছেন। হক্সলি দেখাইয়াছেন, সরীসৃপ (Reptiles—টিকটিকি, সর্প, কুম্ভীর, ইত্যাদি) ও পক্ষী এইদুই শ্রেণী একই জাতীয় পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। Compsognathus নামক একজাতীয় সরীসৃপ মনুষ্য আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিত। এইজাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের গঠন আলোচনা করিয়া হক্সলি দেখাইয়াছেন যে, ইহারা মোটের উপর সরীসৃপ হইলেও অনেকগুলি অস্থির আকারে ও গঠনে ইহারা পক্ষীর মত। আবার মনুষ্য সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এমন একপ্রকার জীব (Archeopteryx) তখনকার আকাশে উড়িয়া বেড়াইত, যাহারা মোটের উপর পক্ষী হইলেও অনেকাংশে সরীসৃপের মত। তাই আমরা দেখিতেছি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীর জল স্থল শূন্যে এমন সব জীব ছিল, যাহাদের শরীরের কতকটা সরীসৃপের মত, আবার কতকটা পক্ষীর মত। এই সকল সত্যের সাহায্যে হক্সলি দেখাইয়াছেন যে, এই প্রকারের জীবই বর্ত্তমান কালের সরীসৃপ ও পক্ষীর আদি পূর্ব্ব পুরুষ ছিল। শরীরতত্ত্ববিদ্ সকল পণ্ডিতই আজ এ সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ সিদ্ধান্ত কি বিস্ময়জনক সিদ্ধান্ত! আজ আপনার গৃহে ঐ যে চড়াই পাখিটি কিচ্ মিচ্ করিতেছে, আর ঐ যে টিকটিকিটি টিক্‌টিক্ করিতেছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কত প্রভেদ; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এমন একটি জাতির জীব এ পৃথিবীতে বাস করিত, যাহা ঐ চড়াইটিরও আদি পূর্ব্ব পুরুষ, আর ঐ টিকটিকিটিরও আদি পূর্ব্ব পুরুষ। একই জাতীয় জীব হইতে ঐ চড়াইটিও উদ্ভূত, আর ঐ টিকটিকিও উদ্ভূত। এই সকল অমূল্য সিদ্ধান্ত ক্রমবিকাশবাদের কি জ্বলন্ত প্রমাণ!!

অতীত জীবশরীরতত্ত্বে হক্সলির দৃষ্টি কিরূপ প্রখর ছিল, তার আর একটি অতি সুন্দর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আমাদের প্রস্তাবের এই অংশটুকুর উপসংহার করিব।

পাঠক বোধ হয় অবগত নন যে, ঘোটকের পায়ের 'হাঁটু' (লোকে সচরাচর যাকে 'হাঁটু' বলে) হইতে খুর পর্য্যন্ত সমুদয় অংশটি একটি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত অঙ্গুলি মাত্র। এই অঙ্গুলিটি আমাদের হস্ত পদের মধ্যম অঙ্গুলির সদৃশ; আর খুরটি আর কিছুই নহে, আমাদের অঙ্গুলির নখর যেমন সেইরূপ। অতএব ঘোটক একটি অঙ্গুলির (মধ্যমাঙ্গুলির) শেষ ভাগের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। এ শেষ ভাগটি অবশ্য খুর দ্বারা আচ্ছাদিত। ঘোড়ার বর্ত্তমান অঙ্গুলির (অর্থাৎ

উহার 'হাঁটু' হইতে খুর পর্য্যন্ত অংশের) ত্বকের ভিতরে দুই পার্শ্বে দুইটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষীণ অস্থি আছে। এ দুটি অস্থি নাম মাত্র আছে—ঘোটকের কোন কার্য্যে আসে না। কিন্তু ইহারা অতীতের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া এই বলিয়া দিতেছে যে, অতীতকালে ইহারা দুইটি পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট স্বতন্ত্র অঙ্গুলি ছিল ;—বলিয়া দিতেছে, ঘোটকের অপেক্ষাকৃত নিকটতর পূর্ব্ব পুরুষের প্রত্যেক পদে বর্ত্তমান অঙ্গুলিটি ভিন্ন আরও দুইটি অঙ্গুলি ছিল, অর্থাৎ ঘোটকের নিকটতর পূর্ব্ব পুরুষ ত্রি-অঙ্গুলি বিশিষ্ট জীব ছিল। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া হক্সলি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, ঘোর অতীতকালে বর্ত্তমান ঘোটকের আদি পূর্ব্ব পুরুষ পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট জীব ছিল। চমৎকৃত জগৎ আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছে, হক্সলির এ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর এবং প্রাচীনতর স্তরে এমন এক প্রকার অশ্ব সদৃশ জীবের (Phenacodus) প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—যার প্রত্যেক পদে পাঁচটি ক্ষুর বিশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গুলি ছিল। শুদ্ধ তাই নয়, এই Phenacodus ধারী প্রাচীনস্তর হইতে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তরে উত্থান কর, দেখিবে কি চমৎকাররূপে এই পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষ চতুরাঙ্গুলিবিশিষ্ট পূর্ব্বপুরুষে পরিণত হইয়াছে। এই চতুরাঙ্গুলি বিশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষ আবার ত্রি-অঙ্গুলি বিশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষে পরিণত হইয়াছে এবং অবশেষে দেখিবে, এই ত্রি-অঙ্গুলি বিশিষ্ট পূর্ব্ব পুরুষ এক-অঙ্গুলিবিশিষ্ট বর্ত্তমান ঘোটকে পরিণত হইয়াছে। পাঠক, এখানে বিজ্ঞান চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে, অশ্বের ক্রমবিকাশ কিরূপে সংসাধিত হইতেছে। আমরা যেন আমাদের চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি, একজাতীয় জীব ধীরে ধীরে অপর জাতীয় জীবে পরিবর্ত্তিত (Transformed) হইতেছে। ঘোটকের এই ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ওয়ালাস্ (Wallace) বলিতেছেন ;—

"Well may Prof: Huxley say that this is demonstrative evidence of evolution."

আমরাও বলি, ক্রমবিকাশবাদের ইহা অপেক্ষা জাজ্বল্যমান প্রমাণ মানুষ আর কি প্রত্যাশা করিতে পারে। প্রিয় পাঠক, বাস্তবিক ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরীভূত কঙ্কালগুলি না দেখিলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয় না। কিন্তু এ হতভাগ্য পতিত ভারতে তা দেখিবার উপায় নাই। লণ্ডন ও আমেরিকার মিউজিয়ম সমূহে বিজ্ঞানের এই অমূল্য রত্নরাজী দেখিলে বাস্তবিকই প্রাণ মোহিত ও স্তম্ভিত হয়।

প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে এরূপ নানা সত্যরত্ন আবিষ্কার করিয়া হক্সলি মনুষ্যজাতিকে ধন্য করিয়াছেন এবং আপনিও ধন্য হইয়াছেন। জগৎবিখ্যাত হেকেল (Haeckel) জর্ম্মনির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্তুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত (Zoologist)। এই হেকেল হক্সলির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হক্সলি ইংলণ্ডের জন্তুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী। কিন্তু হক্সলির প্রশস্ত হৃদয় এই সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—বৈজ্ঞানিকসত্যালোক সাধারণ লোকের সম্পত্তি করা (Popularization of Science)। এ সুমহান উদ্দেশ্য সংসাধনে যত্নবান না হইলে, হক্সলি আরও কত অমূল্য নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন।

নূতন সত্য আবিষ্কারের স্বর্গীয় প্রমত্ততা ও উচ্চাভিলাষ হক্সলির পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন,এ উচ্চাভিলাষকে তিনি কখন পূর্ব্বোক্ত মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হইতে দেন নাই। ঐ উচ্চব্রত পালনের জন্য এ অভিলাষকে সংযত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেন,অনেক ত্যাগস্বীকার করেন। আর ইহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জীবনবিজ্ঞানের কত উচ্চ তত্ব, কত গভীর সত্য আজ হক্সলির প্রসাদে সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছে! আজ ইংলণ্ডের স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের যে এত চর্চ্চা হইতেছে, ইহারও মূলে হক্সলি। আর কোন্ উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে সাধারণের সম্পত্তি করিবার জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত পরিশ্রম করিয়াছেন, আর এতদূর কৃতকার্য্যও হইয়াছেন? বিজ্ঞানরাজ্যের এখানেও হক্সলির অসাধারণত্ব জাজ্বল্যমান! বিজ্ঞানের পক্ষ সমর্থন করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক সত্য সকল সাধারণের বোধ্য করিয়া হক্সলি যে সকল বক্তৃতাদি করেন ও প্রবন্ধাদি লেখেন, শুদ্ধ সেই সকল সংগৃহীত হইয়া নয় খণ্ডে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে! বলা বাহুল্য, এই সংস্করণে বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হক্সলির রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,হক্সলির বিশাল মস্তিষ্ক কেবল পুরুভুজ, গেঁড়ি, Compsognathus, Archeopteryx, ঘোটকের পা আর বনমানুষের মস্তিষ্ক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। প্রকৃতির অন্তরতর হইতে অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার মন সদা লালায়িত ছিল। দর্শনশাস্ত্রের মোহিনী মায়ায় তিনি বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। যখন তিনি তের বৎসরের বালক, তখনই দর্শনের অকূল ও ভয়াল সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। তিনি নিজে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"At that time(অর্থাৎ যখন তিনি তের বৎসরের বালক) I was a voracious and omnivorous reader; a dreamer and speculator of the first water, well endowed with that splendid courage in attacking any and every subject, which is the blessed compensation of youth and inexperience. Among the books and essays on all sorts of topics, from metaphysics to heraldry, which I read at that time, two left indelible impressions on my mind. One was Guizot's History of Civilization, the other was Sir William Hamilton's essay "On the Philosophy of the Unconditioned," which I came upon by chance in an odd volume of the Edinburgh Review. The latter was certainly a strange reading for a boy and I could not possibly have understood a great deal of it; nevertheless, I devoured it with avidity and it stamped upon my mind the strong conviction that on even the most solemn and important of questions, men are apt to take cunning phrases for answers; and that the limitation of our faculties in a great number of cases renders real answers to such questions, not merely actually impossible but theoretically inconceivable."

হক্সলির মনের উপর দর্শনের এমনই প্রবল আকর্ষণ ছিল যে,অনেক সময় বিজ্ঞান ফেলিয়া দর্শনে ডুবিয়াছেন। নিজেই বলিতেছেন :—

* * * "the turn for philosophical and historical reading, which rendered Hamilton and Guizot attractive to me has not only filled many lawful leisure hours and still more sleepless ones with the repose of changed mental occupation, but has not unfrequently disputed my proper work-time with my liege lady, Natural Science."

যখন আমরা দেখি, দর্শনরাজ্যের কোন কোন নেতা হক্সলির মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,তখন Descartes, Hume, Berkley, Kantএর নামই স্বতঃই মনে উদিত হয়। ইহাদের মধ্যে হিউম আর বার্কলের প্রভাব অধিকতর প্রবল ছিল। আমরণ বার্কলে (Berkley)ও বার্কলের মায়াবাদের (Idealismএর) দিকে যদিও

হক্সলির ঝোঁক ছিল, তবু হিউমই যে হক্সলির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের মধ্যে হক্সলি হিউমকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন; তাঁহাকে কাণ্টেরও উপরে বসাইয়াছেন। লণ্ডনস্থ প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) দলের বর্ত্তমান নেতা হ্যারিসনের (Harrisonএর) সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে একস্থানে হিউমকে 'that Prince of Agnostics'নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হক্সলি নিজে একজন প্রধান agnostic ছিলেন। এ সকল বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিলাম এই জন্য যে,ইহাতে হক্সলির দার্শনিক মত সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ আমরা অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইব।

হক্সলির সমস্ত দার্শনিক মতের আলোচনা করিবার স্থান নাই। বারান্তরে আমরা সে চেষ্টা করিব। এখানে দর্শন রাজ্যের গভীরতম প্রশ্ন সম্বন্ধে হক্সলির কি মত ছিল,কেবল সেই সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিব। দর্শনের গভীরতম প্রশ্ন, মায়াবাদ(Idealism) সত্য না জড়বাদ (Materialism) সত্য। জড়বাদী বলেন, জড়বস্তুর প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্বা আছে। 'আত্মা' বা 'মন' বলিয়া প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্বা বিশিষ্ট কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মাণ্ডে জড়পদার্থ (matter), শক্তি (force) আর প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম নিচয় (Necessary Laws) ভিন্ন আর কিছুই নাই। সংজ্ঞা (Consciousness)মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের গতি ও সন্নিবেশনের ফল মাত্র। মায়াবাদী বলেন, জড়বস্তুর প্রকৃত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আত্মার বা মনের প্রকৃত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই যে সম্মুখস্থ একটী গোলাপফুল, যাহাকে তুমি জড় বস্তু বলিতেছ, ইহার আকার, কোমলতা, রূপ রস গন্ধাদি ভিন্ন আর কিছুই তুমি জান না। কিন্তু ঐ রূপ রস গন্ধাদি ভিন্ন যে গোলাপের কোন প্রকৃত স্বতন্ত্র অন্তর্নিহিত সত্তা (Substance বা "Substratum)আছে, তাহা নাই। এই রূপ রস গন্ধাদি আর কিছুই নয়,কেবল তোমার ইন্দ্রিয় বোধ(Sensations) মাত্র। সুতরাং গোলাপটী আর কিছুই নয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধের সমষ্টি। একএকটী ইন্দ্রিয় বোধ আর কিছুই নয়,কেবল তোমার সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র (States of consciousness)। সুতরাংগোলাপ তোমার সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ অবস্থার সমষ্টি মাত্র। এ ব্রহ্মাণ্ড মন বা আত্মার বিকাশমাত্র, আর কিছুই নয়। বার্কলের, ফিক্টের (Fichte এর) অমিশ্র মায়াবাদ অনেকটা এই ধরণের। জড়বাদ ও মায়াবাদ উভয়েই (বিশেষতঃ মায়াবাদ) বহুরূপী। নানা দার্শনিক নানাভাবে ঐ দুই 'বাদ' প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মোটামুটী জড়বাদ ও মায়াবাদ কি, সে সম্বন্ধে দু কথা বলিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই, হক্সলি জড়বাদী ছিলেন, না মায়াবাদী ছিলেন। হক্সলি অতি উচ্চদরের জীবন-বিজ্ঞানবিদ্, আবার দর্শনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং দর্শনের এ গভীরতম প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহার মত যে বিশেষ সম্মানার্হ,তাহার সন্দেহ নাই। প্রচলিত ভাবে দেখিতে গেলে হক্সলি জড়বাদী ছিলেন। কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সংজ্ঞা এবং চিন্তা মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের গতি ও সন্নিবেশনের ফল। আমাদের সমস্ত জৈবনিক ক্রিয়া (vital actions) প্রটোপ্লাজমের পরমাণু সমূহের গতিবিধির ফল,এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া হক্সলি বলিতেছেন;—

"And if so, it must be true in the same

sense and to the same extent that the thoughts to which I am now giving utterance, and your thoughts regarding them, are the expression of molecular changes in that matter of life(Protoplasm) which is the source of our other vital phenomena."

আর এক স্থানে বলিতেছেন ;—

"* * * the fundamental truth, that the key to the comprehension of mental operations lies in the study of the molecular changes of the nervous apparatus by which they are originated."

তিনি আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন ;—

"Surely no one who is cognisant of the facts of the case now-a-days doubts that the roots of psychology lie in the physiology of the nervous system. What we call the operations of the mind are functions of the brain, and the materials of consciousness are products of cerebral activity."

এ সকল বাস্তবিকই ঘোর জড়বাদীর ভাষা; আর সাধারণভাবে দেখিতে গেলে হক্সলি বাস্তবিকই একজন জড়বাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কখন আপনাকে জড়বাদী বলেন নাই ; এমন কি, অনেক স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে,তিনি জড়বাদী নহেন। ঘোর জড়বাদীর ভাষা ব্যবহার করিয়া,প্রচলিত জড়বাদের মূল মতে বিশ্বাস করিয়াও হক্সলি কেন পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,তিনি জড়বাদী নহেন, তাহা আমরা এখনই দেখিব। এখানে জিজ্ঞাস্য এই,তবে কি তিনি মায়াবাদী ছিলেন, না, তিনি মায়াবাদীও ছিলেন না। মায়াবাদের প্রধান আচার্য্য বার্কলের মায়াবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বার্কলে জড়ের প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা (substance of matter) উড়াইয়া দিয়াছেন। হক্সলি বলেন, বার্কলের এরূপ করিবার কোন অধিকার নাই ; এখানে বার্কলে মানবের পরিমিত জ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট সীমা (Limits of knowledge) অতিক্রম করিয়াছেন। হক্সলি বলেন,একথা সত্যবটে যে, রূপরসগন্ধাদি গুণ (attributes) ভিন্ন জড়ের কোন প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা (Substance of matter)—যাহাতে ঐ গুণ গুলি আরোপিত করা যায়—আছে কি না, তাহা পরিমিত-জ্ঞান ক্ষুদ্র মানবের জানিবার উপায় নাই ; আর সেরূপ কোন সত্তা (Substance) থাকিলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ সান্তজ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট মানব জানে না,জানিতেও পারে না। কিন্তু তা বলিয়া জড়ের প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা যে নাই, তাহা তুমি বলিতে পার না। হক্সলি বলেন, হইতেপারে ঐরূপ কোন সত্তা নাই, কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, সেরূপ কোন সত্তা আছে। হক্সলির বিশ্বাস,এ গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করা ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। বার্কলে মানবজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া, ঐ অমীমাংসনীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে এক স্থির মীমাংসা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়াই,—জড়ের প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা (substance) একেবারে নাই বলিয়াছিলেন বলিয়াই হক্সলি বার্কলের মায়াবাদে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই এবং আপনাকে মায়াবাদী বলিতে পারেন নাই। তবে কি হক্সলি মায়াবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তমত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ? না, তিনি মায়াবাদে কতকটা সত্য দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, আমাদের সকল জ্ঞান আমাদের মনের বা সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ অবস্থার (states of consciousness এর) জ্ঞান মাত্র। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কেবল আমাদের মনের বা সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ ভাব (states of consciousness) গুলিকে জানিতে পারি। হক্সলির মতে, জড় যাহাই হউক না কেন, জড়ের সম্বন্ধে রূপ রস গন্ধাদি কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ (sensations) ভিন্ন আর কিছুই আমরা জানিতে পারি না। জড়ের সম্বন্ধে

আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঐ সকল ইন্দ্রিয় বোধেই বদ্ধ ও পরিসমাপ্ত। আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়বোধও আমাদের মনের বা সংজ্ঞার বিশেষ বিশেষ ভাব (states of consciousness) মাত্র। * হক্সলি বলেন, সত্য বটে কার্য্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আমাদের অটল বিশ্বাস থাকায় আমরা মনে করি যে, এই সকল ইন্দ্রিয়বোধের কারণ স্বরূপ কিছু আছে এবং ঐ কারণস্বরূপ 'কিছু' কেই আমরা 'জড়' নামে অভিহিত করিয়া থাকি; কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধের কারণস্বরূপ এই যে, 'জড়ের' অস্তিত্ব আমরা মানি, তাহা আমাদের একটী 'বিশ্বাস' (belief) মাত্র, একটী 'অনুমান' (hypothesis) মাত্র। এই অনুমানটী, অর্থাৎ 'জড় আছে' এই বিশ্বাসটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কেন না, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যাহা কিছু করি, তাহাতে কখন প্রতারিত হই না; কিন্তু তাহা হইলেও 'জড় আছে' ইহা একটী আনুমানিক সত্য, প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ সত্য নহে। আরও ডেস্‌কার্টের (Descartesএর) সহিত হক্সলি বিশ্বাস করিতেন যে, আমাদের মনের বা সংজ্ঞার একটী ভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেরূপ নিঃসংশয় হইতে পারি, কোন আনুমানিক সত্য সম্বন্ধে সেরূপ নিঃসংশয় হইতে পারি না। মনে কর, এই মুহূর্ত্তে আমার মনে একটী ভাব উঠিল, এই ভাবটী যে আছে, ইহাতে আমি সন্দেহ করিতে পারি না। আর সকল বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি, কিন্তু ঐ ভাবটী যে আছে, ইহাতে আমি অনুমাত্রও সন্দেহ করিতে পারি না; কেন না, আমার সন্দেহই ঐরূপ একটী বর্ত্তমান ভাব মাত্র। তাই ডেস্‌কার্টের সহিত হক্সলি বলেন 'চিন্তা আছে', 'আমার মনের বর্ত্তমান ভাবটী আছে', এ সকল প্রত্যক্ষজ্ঞান যেরূপ অভ্রান্ত সত্য, কোন 'অনুমান' (hypothesis) ঠিক্ সেরূপ অভ্রান্ত সত্য নহে। সুতরাং 'চিন্তা আছে', 'আমার মনের বর্ত্তমান ভাবটী আছে' ইহারা যেরূপ নিশ্চিত সত্য, 'জড় আছে' ইহা সেরূপ নয়।* মায়াবাদ আলোচনা করিতে করিতে এই মত ও বিশ্বাস হক্সলির মনে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এই মত ও বিশ্বাস তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়াই ঘোর জড়বাদীর ভাষা ব্যবহার করিয়াও, প্রচলিত জড়বাদের মূল মতে বিশ্বাস করিয়াও হক্সলি

* "* * * all our knowledge is a knowledge of states of consciousness. 'Matter' and 'force' are, so far as we can know, mere names for certain forms of consciousness. * * * Thus it is an indisputable truth that what we call the material world is only known to us, under the forms of the ideal world." Huxley's *Lay Sermons.*

* "Nor is our knowledge of anything we know or feel more, or less, than a knowledge of states of consciousness. And our whole life is made up of such states. Some of these states we refer to a cause we call "self"; others to a cause or causes which may be comprehended under the title of "not-self." But neither in the existence of "self," nor of that of "not-self," have we, or can we by any possibility have, any such unquestionable and immediate certainty as we have of the states of consciousness which we consider to be their effects. They are not immediately observed facts, but results of the application of the law of causation to those facts. Strictly speaking the existence of a "self" and of a "not-self" are hypothesis by which we account for the facts of consciousness. They stand upon the same footing as the belief in the general trustworthiness of memory, and in the general constancy of the order of nature—as hypothetical assumptions which can not be proved, or known with that highest degree of certainty which is given by immediate consciousness; but which, nevertheless, are of the highest practical value, in as much as the conclusions logically drawn from them are, always verified by experience." Huxley's *Lay Sermons.*

আপনাকে জড়বাদী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। আমরা যেন শুনিতেছি,হক্সলি বলিতেছেন,"সংজ্ঞা (Consciousness) মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের গতি ও যোগাযোগের ফল বটে, চিন্তা জড়ের কার্য্য সত্য, কিন্তু তুমি যাকে 'জড় জড়' বলিতেছ,সে 'জড়'কে যে আমি কেবল আমার সংজ্ঞার কয়েকটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার (States of consciousnessএর) সমষ্টি মাত্র, এইরূপে ভিন্ন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপে জানিতে পারি না। 'জড় আছে' ইহা যে দৃঢ়ীভূত 'অনুমান' মাত্র। আরও দেখ,তুমি নিশ্চিতরূপে একথা বলিতে পার না যে,জড় বা মস্তিষ্ক ভিন্ন সংজ্ঞা একবারে থাকিতে পারে না। আমি বলিতেছি না যে থাকিতে পারে, কিন্তু তুমিও বলিতে পার না যে থাকিতে পারে না"।* বাস্তবিক এইরূপে হক্সলি জড়বাদ ও মায়াবাদ এই দুই 'বাদে'ই আংশিক সত্য দেখিয়াছিলেন। আর সেই জন্যই তিনি আপনাকে জড়বাদীও বলিতে পারেন নাই, মায়াবাদীও বলিতেপারেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, জড়বাদ ও মায়াবাদের সম্মিলন সম্ভব ; আর ঐ মিলন হইতেই দার্শনিক জগতে এক অমৃতময় ফল ফলিবার সম্ভাবনা। তিনি এই দুই 'বাদ'কে এক উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিবার দুই পার্শ্বের দুইটি পথ স্বরূপ দেখিতেন। দেখিতেন,ইহারা পর্ব্বতের পাদদেশে দুই বিভিন্ন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শিখর দেশে মিলিত হইয়াছে। হক্সলি বিশ্বাস করিতেন,ঘোর জড়বাদ আর ঘোর মায়াবাদ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয় ; ইহারা পরস্পরের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। হক্সলি এইদুই বাদের সম্মিলনের জন্য চেষ্টাও করিয়াছেন। পাঠক,আপনি নিজের চক্ষে দেখুন, হক্সলি কিরূপে ঐ চেষ্টা করিতেছেন ; হক্সলি বলিতেছেন :—

"If we analyse the proposition that all mental phenomena are the effects or products of material phenomena, all that it means amounts to this ; that whenever those states of consciousness which we call sensation, or emotion, or thought, come into existence, complete investigation will show good reason for the belief that they are preceded by those other phenomena of consciousness to which we give the names of matter and motion. All material changes appear, in the long run, to be modes of motion ; but our knowledge of motion is nothing but that of a change in the place and order of our sensations ; just as our knowledge of matter is restricted to those feelings of which we assume it to be the cause.

"It has already been pointed out that Hume must have admitted, and in just does admit, the possibility that the mind is a Leibnitzian monad, or Fichtean world-generating Ego, the universe of things being merely the picture produced by the evolution of the phenomena of consciousness. For any demonstration that can be given to the contrary effect, the 'collection of perceptions' which makes up our consciousness may be an orderly phantasmagoria generated by the Ego unfolding its successive scenes on the back-ground of the abyss of nothingness ; as a fire-work, which is but cunningly arranged combustibles, grows from a spark into a coruscation, and from a coruscation into figures, words, and cascades of devouring fire, and then vanishes into the darkness of the night.

"On the other hand, it must no less readily be allowed that, for anything that can be proved to the contrary, there may be a real something which is the cause of all our impressions ; that sensations,though not likenesses, are symbols of that something ; and that the part of that something, which we call the nervous system, is an apparatus for supplying us with a sort of algebra of fact, based on those symbols. A brain may be the machinery by which the material universe becomes conscious of itself. But it is important to notice that, even if this conception of the universe and of the relation of consciousness to its other

---

* 'If any one says that consciousness cannot exist except in the relation of cause and effect with certain organic molecules, Imust ask how he knows that, ; and if he says that it can, I must put the same question." Huxley on 'Science and Morals,' *Fortnightly Review*, December, 1886.

components should be true, we should, nevertheless be still bound by the limits of thought, still unable to refute the arguments of pure idealism. The more completely the materialistic position is admitted the easier is it to show that the idealistic position is unassailable, if the idealist confines himself within the limits of positive knowledge."

পাঠক, এখন দর্শনের গভীরতম প্রশ্ন সম্বন্ধে হক্সলির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার বিচার আপনি করুন। আজ আমরা এ বিচার করিতে অপারগ;—স্থানও নাই, সময়ও নাই। বারান্তরে হক্সলির এই গভীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, জীবন-বিজ্ঞান আর দর্শন, এই দুই বিষয়েই সুপণ্ডিত না হইলে কেহ এ প্রশ্নটী সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে পারেন না। হক্সলি জীবন-বিজ্ঞান ও দর্শন দুই বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন, আর তিনি উক্ত প্রশ্নটী সম্বন্ধে অনেক দিন ধরিয়া অতি গভীর চিন্তাচর্চ্চাও করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ মহাজনের সিদ্ধান্ত সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই বিশেষরূপে চিন্তা করিবার বিষয়।

আমরা হক্সলির মনের গঠন দেখিলাম, বিজ্ঞানরাজ্যে তাঁহার গৌরবের কারণ দেখিলাম, দর্শনের গভীরতম প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহাও দেখিলাম; এখন ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মতামতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বলা অনাবশ্যক, হক্সলি কোন প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি খ্রীষ্টান বা নাস্তিক, একেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী, এ সকলের কিছুই ছিলেন না। কোমত (Comte) এর দর্শনের প্রতিও হক্সলির কোন শ্রদ্ধা ছিলনা। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন;—

"M. Comte's philosophy, in practice, might be described as Catholicism *minus* Christianity."

তাঁহার মতে মানুষ এত নির্ব্বোধ নয় যে, সে কখন মনুষ্যত্বের (Humanity র) পূজা করিবে। এ সম্বন্ধে হক্সলি বলিতেছেন;—

"But when the positivist asks me to worship Humanity—that is to say, to adore the generalized conception of men as they have ever been and probably ever will be—I must reply that I could just as soon bow down and worship the generalized conception of a 'wilderness of apes."

হক্সলি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন না; আত্মার অমরত্বের কথা দূরে থাকুক, আত্মা বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র প্রকৃত সত্তা আছে, তাহাই বিশ্বাস করিতেন না। ঈশ্বরে, আত্মাতে ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু তা বলিয়া ইহাও বলিতেন না যে, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, আত্মার অমরত্ব নাই। ঈশ্বর যে আছেন, আত্মা যে অমর, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ দাও, এখনি বিশ্বাস করিব; বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ দিবে, ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে পারিব না; ইহাতে মানব সমাজ রসাতলে যায় যাউক; ইহাতে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়, করিব। হক্সলির মত এইরূপ ছিল। আমাদিগের বলিবার পূর্ব্বেই পাঠক এখানে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন, হক্সলির সেই পূর্ব্বোক্ত অস্থিমজ্জাগত সত্যপ্রাণতা। বাস্তবিকই ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাসের কারণ তাঁহার ঐ সত্যপ্রাণতা। কোথা হইতে ঐ কঠোর সত্যপ্রাণতা আসিয়া হক্সলির মনপ্রাণ অধিকার করিল? বোধ হয়, জন্মের গুণে, আর শৈশবে যে সকল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, সেই সব অবস্থার গুণে বাল্যকালের প্রারম্ভেই হক্সলির মনে অস্ফুটভাবে এই সত্যপ্রাণতা জন্মায়। কিন্তু যেরূপেই প্রথমে

উৎপন্ন হউক,পরে যে এইঅস্ফুট সত্যপ্রাণতা দর্শনশাস্ত্রালোচনা-লব্ধ শিক্ষাদ্বারা বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে হক্সলি যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করেন, তাহা তাঁহার অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)। বাস্তবিক তাঁহার অস্থিমজ্জাগত সত্যপ্রাণতা ও অজ্ঞেয়তাবাদ পরস্পর পরস্পরকে প্রস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এ বিষয়টী ক্রমে স্বতঃই বিশদ হইয়া পড়িবে।

এখন হক্সলির এই অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণ কোন কৃতবিদ্য লোককে জিজ্ঞাসা কর,হক্সলির ধর্ম্মমত কি ছিল, তিনি তখনই বলিবেন —'অজ্ঞেয়তাবাদ'। একথা ষোল আনা সত্য না হইলেও মোটামুটি সত্য বটে। একজন সরল বিশ্বাসীর ধর্ম্মমত যেমন তাঁহার জীবনকে নিয়মিত করে, এই অজ্ঞেয়তাবাদকে হক্সলি নিজে তাঁহার 'ধর্ম্মমত' না বলিলেও এই অজ্ঞেয়তাবাদই হক্সলির জীবনকে সেইরূপ নিয়মিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই অজ্ঞেয়তাবাদই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। পাঠক জানেন,এই অজ্ঞেয়তাবাদ আজ পৃথিবীর শত শত মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানীর জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক হার্বার্ট্ স্পেনসার দর্শন ও ধর্ম্মরাজ্যের গভীর প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে করিতে এই অজ্ঞেয়তাবাদেই আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে করিতে হক্সলি ঠিক কিরূপে এই অজ্ঞেয়তাবাদরূপ অমৃত লাভ করিলেন, হক্সলির অজ্ঞেয়তাবাদই বা ঠিক কি ছিল,পাঠক আসুন,তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দর্শনের মোহিনী মায়ায় হক্সলি বাল্যকালেই চিরদিনের জন্য মোহিত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হক্সলির বয়স যখন তের বৎসর,তখনই হামিল্টনের "Philosophy of the Unconditioned" মানবজ্ঞানের পরিমিততার ভাব হক্সলির মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয়। বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা দার্শনিকের মত আলোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে মানবজ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে তাঁহারা কে কি বলেন, সেইদিকে হক্সলির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এরূপ যাঁহার মনের ভাব,তিনি হিউম (Hume) ও কাণ্টের (Kantএর) মীমাংসার দিকে না ঝুঁকিয়া থাকিতে পারেন না। সে মীমাংসা কাণ্ট অতি সুন্দররূপে তাঁহার Critique of Pure Reason এর একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাণ্ট বলিতেছেন ঃ—

"The greatest and perhaps the sole use of all philosophy of pure reason is, after all, merely negative, since it serves not as an organon for the enlargement (of knowledge) but as a discipline for its delimitation; and instead of discovering truth has only the modest merit of preventing error."

তার পর জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত হইলে হক্সলি দেখিলেন,তিনি জড়বাদী, মায়াবাদী,নাস্তিক, আস্তিক,ইহাদের কাহারও মতে বিশ্বাস করিতে পারেন না। দেখিলেন, ইঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস,ইঁহারা বিশ্বপ্রহেলিকার প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজের স্থিরবিশ্বাস যে, তিনি নিজে ওরূপ কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, আর ঐ গভীর প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়াও কাহারই পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিশ্বাসে হিউম ও কাণ্ট তাঁহার সাথী। এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা তিনি

নিজে অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ—

"* * * I had and have the firmest conviction that I never left the 'verace via' —the straight road and that this road led nowhere else but into the dark depths of a wild and tangled forest. And though I have found leopards and lions in the path; though I have made abundant acquaintance with the hungry wolf that 'with privy paw devours apace and nothing said' as a great poet says of the ravening beast; and though no friendly spectre has even yet offered his guidance, I was and am minded to go straight on, until I either come out on the other side of the wood, or find there is no other side to it, at least, none attainable by me."

হক্সলির মনের অবস্থা যখন এইরূপ,তখন তিনি সৌভাগ্য ক্রমে এক দার্শনিক সমিতির (Metaphysical Society ;--এই সোসাইটী অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে) সভ্য হইলেন। সেখানে দেখিলেন যে,প্রত্যেক সভ্যই কোন না কোন 'ist',তখন নিজের বিশ্বাসের কোন নাম না থাকা ভাল নয় দেখিয়া একটা নামের জন্য ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে 'Agnostic'* এবং 'Agnosticism' নামের সৃষ্টি করিলেন। এই রূপে ত হক্সলি দর্শন-শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া অজ্ঞেয়তাবাদামৃত তুলিলেন। কিন্তু এ অজ্ঞেয়তাবাদকে একটি 'ধর্ম্ম' (Religion) বা 'ধর্ম্মমত' (Creed) বলিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন,অজ্ঞেয়তা-বাদ 'ধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মমত' হইতেই পারে না। তাঁহার মতে ইহা একটি" প্রণালী"(Method)। যাহাহউক, অজ্ঞেয়তাবাদ একপ্রকার 'ধর্ম্ম-মত'ই হউক, আর 'প্রণালীই' হউক, ইহার অবশ্য একটি মূল মত বা সূত্র আছে। সে মত বা সূত্র কি ? সে মত বা সূত্র এই ঃ—জ্ঞান বিজ্ঞান, মতামত বিষয়ে বিশুদ্ধ যুক্তি যতদূর লইয়া যাইবে,ততদূর যাও, ফলাফলের চিন্তা করিও না ; আর এমন কোন উক্তি বা মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না, যাহার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ নাই বা যাহার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ অসম্ভব। এসম্বন্ধে আমরা হক্সলির নিজের কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"* * * they (the Agnostics) have no creed ; and, by the nature of the case, can not have any. Agnosticism, in fact, is not a creed but a method, the essence of which lies in the rigorous application of a single principle. That principle is of great antiquity ; it is as old as Socrates, as old as the writer who said "Try all things, hold fast by that which is good" ; it is the foundation of the Reformation, which simply illustrated the axiom that every man should be able to give a reason for the faith that is in him ; it is the great principle of Descartes ; it is the fundamental axiom of Modern Science. Positively the principle may be expressed : In matters of the intellect, follow your reason as far as it will take you without regard to any other consideration. And negatively : In matters of the intellect do not pretend that conclusions are certain which are not demonstrated or demonstrable. That I take to be the Agnostic faith, which if a man keep whole and undefiled he shall not be ashamed to look the universe in the face, whatever the future may have in store for him."

এই ত হইল অজ্ঞেয়তাবাদের মূল মত বা সূত্র। মানুষ অবশ্য এ মূল মত বা সূত্রটিকে নিজের নিজের জ্ঞান বুদ্ধির অবস্থা অনুসারে,

* Agnostic শব্দের উৎপত্তি এইরূপঃ—Agnostic =A + Gnostic. A = একটী Greek privative prefix,অর্থ 'না'। Gnostic শব্দটী Gignoscein নামক একটী Greek verb (অর্থ—to know)হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই gignoscein শব্দের মূলে আমাদের সংস্কৃত 'জ্ঞা' ধাতু ! সুতরাং Agnosticশব্দের অর্থ—যে জানে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অল্পদিন পরেই Gnostic নামে একটী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উত্থান হয়। ইঁহারা বলিতেন,ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল ইঁহারা ঠিক বুঝিতেন। হক্সলি যখন একটী নামের জন্য ভাবিতেছিলেন, তখন ইঁহাদের কথা তাঁহার মনে ছিল। ইহারা বলিতেন,সব জানেন ; হক্সলি জানিতেন, তিনি ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

বিজ্ঞানের অবস্থা অনুসারে খাটাইবে। আজ-যাহা প্রামাণিক নয়, কাল তাহা বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের প্রসাদে প্রামাণিক হইবে। তবে কতকগুলি বিষয়,মানব যত দিন মানব থাকিবে, ততদিন তাহার সান্ত জ্ঞান বুদ্ধির নিকট অজানিতই থাকিয়া যাইবে।

অজ্ঞেয়তাবাদের মূলমতে বা সূত্রে নিজ বিশ্বাস অবিচলিত রাখিয়া হক্সলি ধর্ম্মরাজ্যের সুগভীর প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমারা পূর্ব্বেই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। দুঃখ রহিল, স্থানাভাবে এবার তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে পারিলাম না। উচ্চ চিন্তা-জগতের উচ্চতমস্তরে যে সুনির্ম্মল স্রোত বহিয়া যাইতেছে,সেই স্রোতের সহিত মহারথী হক্সলির জীবন-স্রোত গত ত্রিশ বৎসর এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল যে,তাঁহার জীবনের ইতিহাস লেখাও যা,আর উচ্চ চিন্তা-জগতের বিগত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস লেখাও তাই। আমরা জানি,আমাদের প্রবন্ধে হক্সলির মহৎ জীবনের গৌরব রক্ষা করিতে পারি নাই। আমরা এ প্রবন্ধে কেবল উক্ত জীবনের একটী ক্ষুদ্র অথচ প্রকৃত অবিকৃত ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অতি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ছবি হইতেও পাঠক দেখিবেন, হক্সলির জীবন কি অসাধারণ জীবন ছিল।

উপসংহার কালে আর একটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখর উজ্জ্বল জ্যোতিতে তাঁহার মন ত জ্যোতিষ্মান্ ছিলই; কিন্তু উচ্চনৈতিক জীবনের সুস্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতিতেও তাঁহার হৃদয় দীপ্তিমান ছিল। নৈতিক জীবনের পবিত্র সুরভি যে জীবনকে সৌরভান্বিত না করিয়াছে, এই দুঃখশোক পাপতাপক্লিষ্ট মানব জাতির দুঃখে যে প্রাণ না কাঁদিয়াছে, সে জীবন দর্শনে প্রাণ বিমুগ্ধ হয় না; হউক না কেন, সে জীবন বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম আলোকে আলোকিত। হক্সলি মহাজ্ঞানী ছিলেন সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য, তাঁহার পবিত্র প্রাণ জগতের দুঃখে কাঁদিত। হক্সলি যথাসাধ্য মানবহিতব্রতে ব্রতী ছিলেন। কোন্ প্রকৃতিস্থ মানব এরূপ সুন্দর আদর্শ-জীবন দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন? হক্সলি বিশ্বাস করিতেন, জ্ঞানালোকিত মনে অকলঙ্কিত হৃদয়ে মানব-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করাই মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যদি কোন ধর্ম্ম ভবিষ্যতে পৃথিবীর ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম এই ধর্ম্ম। হক্সলি আমরণ ধর্ম্মজীবনের এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন সংগঠনে প্রকৃত বীরের ন্যায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অবশেষে হক্সলি নিজ হস্তে নিজের যে একটি ক্ষুদ্র ছবি আঁকিয়াছেন, সেটি পাঠক আপনাকে উপহার দিয়া আজ আমরা বিদায় লইলাম।

"To promote the increase of natural knowledge and to forward the application of scientific methods of investigation to all the problems of life, to the best of my ability, in the conviction which has grown with my growth and strengthened with my strength that there is no alleviation for the suffering of mankind except veracity of thought and of action and the resolute facing of the world as it is when the garment of make-believe by which pious hands have hidden its uglier feature is stripped off. It is with this intent that I have subordinated any reasonable or unreasonable ambition for scientific fame, which I may have permitted myself to entertain, to other ends; to the popularization of science; to the development and organization of scientific education; to the endless series of battles and skirmishes over evolution; and to the untiring opposition to that ecclesiastical spirit, that clericalism, which in England, as everywhere else, and to whatever denomination it may belong, is the deadly enemy of science. In striving for the attainment of these objects I have been but one among many, and I shall be well content to be remembered or even not remembered, as such."

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

সমুদ্রগর্ভে।

উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত,
ঊর্ম্মিমালা-বিক্ষোভিত,
ফেনময় অনন্ত সাগর,
অট্ট অট্ট হাসে যেন,
উদ্দাম তাণ্ডবে মাতি,
শূন্যসনে করিছে সমর!

২

চৌদিকে দিগন্তব্যাপী
নিবিড় নীলিমারাশি
দৃষ্টিপথ ফেলিছে ছাইয়া,
সহস্ররশ্মির করে
ফেন পুঞ্জ বিচ্ছুরিত
ইন্দ্রচাপ উঠিছে জ্বলিয়া।

৩

পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
রকত-রঞ্জিত ছবি,
কাঞ্চন লাঞ্ছিত তার রাগে,
ডুবিছে সুবর্ণ থালা,
জ্বলিছে জলদ মালা,
সিন্দুর মাখিয়া অনুরাগে!

৪

চলিছে অর্ণব পোত,
ধূমপুঞ্জ উদগারিয়া,
ধাইতেছে কেশরী-কেতন,
সদর্পে তরঙ্গভঙ্গে,
ফেনপুঞ্জ ছড়াইয়া
বাস্পপোত ছুটিছে কেমন!

৫

অস্তোন্মুখ রবি করে,
সুদীপ্ত নীলাম্বুরাশি,
ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে তায়!
দেখিতে দেখিতে ওই
সুনীল জলধি গর্ভে
সূর্য্যবিম্ব লুকাইয়া যায়।

৬

দেখিতে দেখিতে পুনঃ
পূরব গগনে মরি
কি মাধুরী ছাইল আবার,
রজত চন্দ্রিকারাশি
ছড়াইয়া দশদিশি
চন্দ্রমার হইল সঞ্চার!

৭

দেখিতে দেখিতে পুনঃ
সহস্র হীরক খণ্ড
প্রকাশিল সুনীল অম্বরে,
বিম্বে বিম্বে প্রতিবিম্ব,
চঞ্চল সাগরনীরে,
যেন সবে জলকেলি করে।

৮

হায় হায় কি হইল
ভাবের তরঙ্গে মোর
মন প্রাণ হইল বিভোর,
আকাশে চন্দ্রমাতারা,
সাগরে চন্দ্রমাতারা,
চন্দ্রতারা হৃদয়েতে মোর!

৯

এই না সাগর সেই
যার নীরে নারায়ণ
শুয়েছিলা অনন্ত শয্যায়,
দক্ষিণে নীলোর্ম্মি রাশি
মৃদু মৃদু সঞ্চালনে
ধীরে ধীরে চরণ ধোয়ায়!

১০

প্রেমে মত্ত প্রভঞ্জন
হয়ে মন্দ সমীরণ

করেছিল চামর ব্যজন,
স্বগন্ধি কুসুমগন্ধ
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে বহি
করেছিল চরণে অর্পণ!

১১

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
হইয়া আপনা হারা
অনিমেষ নয়নে তাকায়,
শ্রীঅঙ্গ মাধুরী হেরি
কিরণ সম্ভার লয়ে
শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়।

১২

জলদেবীগণ মিলি
মধুর কাকলি তুলি
মঙ্গল আরতি করে গান,
কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া
সমুদ্র আকুল হিয়া
প্রেমানন্দে ধরিয়াছে তান।

১৩

ত্রৈলোক্যের শ্রীরূপিণী,
প্রথমা প্রকৃতি যিনি,
বসন্ত কুসুমদাম সাতে,
বাসন্তী প্রতিমা খানি,
পূর্ণচন্দ্র নিভাননা,
সেবিছেন চরণ দু'হাতে।

১৪

কোথা সেই নারায়ণ?
সকলিত দেখি আমি,
তাঁরে কেন না হেরি নয়নে?
সকলিত আছে সেই,
হায় হায় প্রভু মোর
নাহি কেন অনন্ত শয়নে?

১৫

সেই চন্দ্র সেই তারা,
সেইরূপ বসুন্ধরা,
সেইরূপ শীতল বাতাস,
উদার সমুদ্র সেই,
উদার আকাশ এই,
প্রভু কেন নহেন প্রকাশ?

১৬

সহস্র মস্তক যার
সহস্রাক্ষ পাণিপাদ
বিরাট অসীম—সুমহান্
স্বর্গ যার সিংহাসন
পাদপীঠ এ ভুবন
সেই প্রভু সমুদ্রে শয়ান।

১৭

ধন্য এই পারাবার,
শ্রীঅঙ্গ পরশে যার,
পবিত্র হইল দেহ প্রাণ,
তরল তরঙ্গে রঙ্গে,
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে,
তাই বুঝি ধরিয়াছে তান?

১৮

গাও তবে পারাবার,
গম্ভীর নির্ঘোষে তাঁর
কর সদা মহিমা কীর্ত্তন,
যাঁহার ইঙ্গিতে হায়
ভ্রাম্যমান শশী রবি,
গায় যারে অনন্ত গগন।

১৯

উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
সরঙ্গে আপনা ভুলে
ঘোষ সেই মহেশের জয়,
সৃষ্টির প্রভাতে যাহা
দেখিয়াছ তুমি আহা
গাও তাহা ভরিয়া হৃদয়।

২০

কেমনে এ দিবাকর,
বিস্তারি সহস্র কর,

বিরাজিল সুনীল গগনে,
কেমনে এ ধরাতল,
চুম্বি রশ্মি শতদল,
প্রণমিল সবিতৃ চরণে!

২১

কেমনে শ্যামলাম্বরা,
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,
বিরাজিল ধাতার আদেশে,
লক্ষ লক্ষ প্রাণিকণ্ঠ,
লক্ষ প্রতিধ্বনি তুলি,
ছুটিলেক বিহ্বল আবেশে!

২২

অষ্ট চন্দ্রহার পরি
বিশাল অম্বরোপরি
বৃহস্পতি হইল উদয়,
মঙ্গল আরতি করি,
কিরণ মেখলা পরি
শনৈশ্চর করে জয় জয়!

২৪

গাও গাও পারাবার,
অনন্ত মহিমা তাঁর,
গায় যারে অনন্ত গগন,
সৃষ্টির প্রভাতে আহা,
দেখেছ যে সব তাহা,
গাও হয়ে আনন্দে মগন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

আচার্য্য হক্সলি।

বিজ্ঞান-জগতের একটি উজ্জ্বল তারকা খসিয়া পড়িয়াছে। গত ২৯শে জুন দিবসে, ৭১ বর্ষ বয়সে আচার্য্য হক্সলি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্ত্রী, তিন পুত্র ও চারি কন্যাকে কেবল বিষাদে ডুবাইয়া যান নাই, তাঁহার তিরোধানে বিজ্ঞান-জগৎ বিলোড়িত হইয়াছে। অনেক ব্যক্তি বিজ্ঞানসেবায় নিযুক্ত আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধাতা এবং ব্যাখ্যাতা সহজে মিলিবে না। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি যে একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতি বিরল। স্বনামখ্যাত দারবিনের এমন প্রকৃষ্ট-শিষ্য, সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা বোধ হয় এখন আর কেহ রহিল না।

১৮২৫ অব্দে টমাস হেন্‌রি হক্সলি ইলিং নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। পিতার গুণ সন্তানে বর্ত্তে, যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলিবেন যে, কেবল পিতার গুণ নহে, সেই গুণের উৎকর্ষতা পুত্র হক্সলি লাভ করিয়াছিলেন। পুত্র হক্সলির শিক্ষকতা কার্য্যে শিক্ষকের মানমর্য্যাদা বিস্তৃত হইয়াছে; তাঁহার গুণে. শিক্ষকপদের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সতর বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে হক্সলি চেরিং-ক্রস্ হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যার্থী হইয়া প্রবেশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন র‍্যাটেলস্নেক নামক জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্র পরিদর্শন করিতে সজ্জিত হয়, যুবক হক্সলি সেই জাহাজের একজন ডাক্তার হইয়া তৎ-

সঙ্গে গমন করেন। এই সমুদ্র যাত্রাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র। জাহাজে বসিয়া সামুদ্রিক কয়েকটা প্রাণী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সূচনা করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেশে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই সামান্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের আবিষ্কারে তখনকার বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল। তিনি 'রয়েল সোসাইটি' নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পর বৎসর সেই সভা তাঁহাকে রাজকীয় পদক রূপ উচ্চ পুরস্কার প্রদান করেন।

দুই বৎসর পরে তিনি জাহাজের ডাক্তারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তখন খনিজ-বিজ্ঞানের রাজকীয় বিদ্যালয়ের(Royal School of Mincs) জীববিদ্যার অধ্যাপক এডওয়ার্ড ফর্বশ অবসর গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হক্সলি যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তদবধি তিনি ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার শিক্ষকতাগুণে ঐ বিদ্যালয়ের এক্ষণে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান শিক্ষার অধ্যক্ষ ছিলেন।

উক্ত রাজকীয় খনিজ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর, তিনি নানা বিষয়ে নানা সম্মানিত পদে নিযুক্ত হইলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কোন সভার সভাপতি, কোন ব্যবসায়ের পরিদর্শক ইত্যাদি নানা কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত হইলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকার যত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিষদ আছে, প্রায় সকলেই তাঁহাকে পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। এইরূপে ২২।২৩টি বৈজ্ঞানিক সভার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা, বৈজ্ঞানিক-সমিতি আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতেন। বস্তুতঃ রাটেলস্নেক জাহাজের সেই সামান্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, কি জীববৈজ্ঞানিকরূপে, কি নাগরিকরূপে, কি অধ্যাপকরূপে, কি গ্রন্থকর্ত্তারূপে, সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই শিক্ষক, সর্ব্বত্রই তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি যাহাই হউক, কর্ম্মক্ষেত্রে হক্সলির অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞানাধ্যাপনের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ প্রদত্ত হইত না। তখন প্রাচীন লাটিন ও গ্রীক ভাষার প্রতি মমতা খর্ব্ব হয় নাই; সাহিত্য ও ভাষাই একমাত্র শিক্ষণীয় ছিল। বিজ্ঞানও একটা শিক্ষার বিষয়, বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারাও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হইতে পারে, একথা তখন জনসাধারণে তত সমাদৃত হইত না। লোকদিগের প্রকৃত শিক্ষার নিমিত্ত কি প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় মত ছিল। রয়াল সোসাইটি নামক সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতিরূপে, নানাস্থানে বক্তারূপে, তিনি সেই মত সমর্থন করিয়াছিলেন। * তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্নের গুণে এক্ষণে ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের সমাদর হইয়াছে; বিজ্ঞানকে সাহিত্যের সমতুল্য আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

আজ ২১ বৎসর হইল, খ্রীঃ ১৮৭৪ অব্দে

* Lay sermons.

প্রসিদ্ধ জর্ম্মান জীববিজ্ঞানবিদ্ হিকেল, হক্ষলিকে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান জীববৈজ্ঞানিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া হক্ষলি প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে যাবতীয় প্রধান বিভাগেই তাঁহার আবিষ্কার দৃষ্ট হয়।"

সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক প্রাণী হইতে বৃহৎ প্রাণী-সম্বন্ধে তিনি ক্রমশঃ তাঁহার গবেষণা বিস্তৃত করেন। প্রাণীবিজ্ঞানবিষয়ক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে * নানা সাময়িক পত্রিকায় এবং প্রাণিবিষয়ক বৃত্তান্তে তাঁহার গবেষণা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

হক্ষলি লোকশিক্ষার জন্য এক ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক চিত্ত-বিনোদন জন্য আর এক ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার প্রবন্ধমালার† ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"জনসাধারণের নিমিত্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয় যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত চেষ্টিত নহে, এ কথা আমি স্বীকার করিতে অপারগ। পরন্তু প্রান্তরে, বিদ্যা-মন্দিরে, কিম্বা কৌতুকাগারে যে সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদয় বিজ্ঞানোচিত যাথার্থ্য ও সূক্ষ্মতা বিবর্জ্জিত না করিয়া লোকসাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টাতে, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে আমার যে শক্তি আছে, তাহার সাতিশয় নিপীড়ন আবশ্যক হইয়াছে। বাস্তবিক আমি দেখিয়াছি যে, জনসাধারণের অনধীত বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের যে পাণ্ডিত্য দর্প সহজে প্রকাশিত হয়, তাহা থর্ব্ব করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।"

দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণ-বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিতে হক্ষলি যেমন দক্ষতা দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান কালে ইংরাজী ভাষায় তাহা দুর্লভ। এমন কি, সুবোধ, বিশদ ও বিশুদ্ধ ইংরাজী গদ্য লিখনে তত্তুল্য আর কেহ আছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। বিজ্ঞান ব্যাখ্যার স্পষ্টতা,ভাষার শব্দ ব্যবহারে যে প্রকার নৈপুণ্য তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবৈজ্ঞানিক সাহিত্য-সেবকেরও অনুকরণীয়।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে দারবিনের জীবজাতির উৎপত্তি (Origin of Species) প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে হার্বার্ট স্পেন্সর ও টিণ্ডাল ক্রমবিকাশ-বাদ সমর্থনকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই টিণ্ডাল হক্ষলি ও স্পেন্সরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রণয় জন্মে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই জনসাধারণের মনে ক্রমবিকাশবাদের ক্ষীণ রশ্মি প্রতিভাত হইতেছিল। কিন্তু দারবিনের উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর জনসাধারণ সহ বৈজ্ঞানিকগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। তদবধি টিণ্ডাল, হক্ষলি, স্পেন্সর নামক ত্রিমূর্ত্তি জনসাধারণের প্রাচীন সংস্কার, প্রাচীন চিন্তাস্রোত নূতন পথে আনয়ন করিতে লাগিল। টিণ্ডাল "জীবাৎ জীবঃ" এই মত বায়ুস্থিত অণুজীব লইয়া প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। হক্ষলি ক্রমবিকাশের সূত্র জীবরাজ্যে বহুবিস্তৃত করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,

"পশুগণের গঠন বিষয়ে যত প্রভেদ আছে,মানব ও পশুর মধ্যে তত প্রভেদ নাই। যদি কোন ভৌতিক ক্রিয়াবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি সম্ভাবনীয় হইতে পারে, সেই কারণই মানবের উৎপত্তির পক্ষে যথেষ্ট। *

স্পেন্সর তাঁহার সমাসন দর্শন দ্বারা বিশ্বজগতের উৎপত্তি,জীবপ্রবাহের গতি, ধর্ম্ম-নীতি, আচার ব্যবহার সমুদয় ব্যাপারে ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিলেন। স্পেন্সর জাগতিক সৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া এক অজ্ঞেয় আদ্যাশক্তিতে

* Comparative Anatomy of the Vertebrata and of the Invertebrata.

† Collected Essays.

* Evidence as to man's place in nature.

উপনীত হইলেন। টিণ্ডাল, হক্সলি ও স্পেন্সর, তিন জন ঘোর অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইলেন। জগতের ক্রমবিকাশে, অজ্ঞেয় আদ্যাশক্তির অন্তরালে পাছে স্রষ্টার আসন টলিয়া যায়,এই আতঙ্কে সকলের মন আপ্লুত হইল। সংসারের লোক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কখন ঘোর কোলাহলে, কখন তুষ্ণীম্ভাব দেখাইয়া ক্রমবিকাশবাদ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। কেহ বা মানবেতর জীবের সম্বন্ধে ক্রমবিকাশবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল, কেহ বা ক্রমবিকাশবাদ অসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিল।

জড়পদার্থে জীবন নিহিত আছে, সামান্য মৃত্তিকায় অমূর্ত্ত্য জীবন সংক্রামিত আছে, টিণ্ডাল ও হক্সলি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক যদি কোন আদি জীবের ক্রমবিকাশ দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে,সেই আদি জীবের উৎপত্তির পরিচয় ক্রমবিকাশবাদের দেওয়া আবশ্যক। জ্যোতির্বিদ্ ও ভূবিজ্ঞানবিদ্ বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে পৃথিবী এখানকার মত শীতল ও জীব-জন্মোপযোগী ছিল না। সেই পুরাতন অগ্নিময় বাষ্পরাশিতে জীব সঞ্চার হইল কিরূপে? অর্থাৎ পৃথিবীর এমন এক দশা গিয়াছে, যখন উহাতে কোন প্রকার জীবের আবির্ভাব অসম্ভব ছিল। যদি জীবই প্রথমে না রহিল, তবে জীবপ্রবাহ হইল কিরূপে? এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাকে মৃত জড় পদার্থ বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ মৃত নহে, যাহাতে আপাততঃ কোন জীবন দৃষ্ট হইতেছে না, অবস্থা বিশেষে তাহা হইতে জীবন সঞ্চার হয়।*

* Comparative Anatomy of the Invertebrata and Lay sermons.

জাগতিক বিষয় সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইহার অনুসন্ধানে বিজ্ঞান ব্যস্ত। এই সম্বন্ধ কিংবিধ, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আর এক প্রশ্ন উদয় হয়। জাগতিক বিষয় সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহা তদ্বিধ না হইয়া অন্যবিধ হইল না কেন? জগৎ কেন প্রকারেণ উৎপন্ন,এ প্রশ্নের উত্তর না পাইলে চিত্ত স্থির হয় না। এই খানেই বিজ্ঞান দর্শনের সমীপস্থ। কিন্তু ইহাতেও মন তৃপ্ত হয় না। এই বিশ্বজগৎ কস্মাৎ,ইহার উত্তর চাই। যাবতীয় ধর্ম্ম,এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর লইয়া দণ্ডায়মান। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অর্দ্ধপথে গিয়া কখন ক্ষান্ত হইতে পারে না। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে প্রথমে কেন প্রকারেণ, পরে কস্মাৎ, এই দুই প্রশ্নই তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হয়।

জড় ও মনের সম্বন্ধ কি, জড় হইতে মনের উৎপত্তি সম্ভাব্য কি না, জড়ের বিকার মন কি না,জড় ও চৈতন্যের জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সামঞ্জস্য কিসে রক্ষিত হয়, ইত্যাকার প্রশ্ন লইয়া দার্শনিকেরা ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হক্সলি এতৎসম্বন্ধে বলিতেছেন, *—

"চৈতন্য কি, তাহা আমরা জানি না; স্নায়ু উত্তেজিত হইলে কিরূপে চৈতন্যের বিকাশ হয়, প্রকৃতির অন্যান্য গূঢ় রহস্যের ন্যায় তাহা গহন।"

পুনশ্চ,—

"চৈতন্যের প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে স্নায়ুমণ্ডলের কোন না কোন স্থানে আণবিক বিকার ঘটে এবং ইহাও সম্ভাব্য যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের সহিত কিরূপ চৈতন্যবিকাশের সম্বন্ধ আছে,তাহারও মানচিত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে। মনে করুন যেন আমরা জানিলাম যে, মস্তিষ্কের এই অংশ উত্তেজিত হইলে চৈতন্যের এই প্রকার বিকাশ হয়। কিন্তু জড়ময় অণুর বিকার ও

* Lesson on Human Physiology.

চৈতন্তের বিকাশ, এই দুয়ের মধ্যে কেন কোন সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান প্রণালীর অধিগম্য ত নহেই, আমাদের কল্পনাশক্তির অতীত বলিয়া বোধ হয়।"

হক্সলির তিরোভাবে, বোধ হয়, কোন কোন লোক সুখী হইয়া থাকিবেন। যাঁহারা তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছিলেন, বিচারে তাঁহারা হক্সলির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন ঘোর অজ্ঞেয়তাবাদে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন আর বৃথা ক্রিয়াকলাপে চিত্ত সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিরক্ত হইয়া উঠে। যে সকল কারণে আজকাল বাইবেলের আধ্যাত্মিক অর্থ গৃহীত হইতেছে, যে সকল কারণে মানব সমাজের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস নূতনমার্গে চালিত হইতেছে, সেই সকল কারণের মধ্যে হক্সলির প্রভাব অল্প নহে। বাস্তবিক, বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের প্রসার বশতঃ বাইবেলোক্ত সৃষ্টি-বিবরণ, অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাইবেল ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া লোকসমাজে খ্যাত ছিল, তাহাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইতেছে; কেহবা তাহাদের অর্থ-বিকার ঘটাইতেছেন। এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মীগণকে দুই দলে বিভক্ত দেখা যায়। একদল ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্ম্মী, অন্যদল তাত্ত্বিক খ্রীষ্টধর্ম্মী। জগৎ ও মনুষ্যের সৃষ্টি, মনুষ্য ও স্রষ্টার সম্বন্ধ, পরলোকে মনুষ্যের গতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। অলৌকিক ক্রিয়া, এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ। বাইবেল গ্রন্থের অলৌকিক উৎপত্তি, ছয় দিবসে ভূ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীবাত্মক সৃষ্টি এবং সপ্তম দিবসে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্রাম, সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীয় রূপ অনুসারে আদি নর নারীর উদ্ভব, উপবনে তাহাদের বাস ও তথা হইতে বহিষ্করণ, আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য তাহাদের এবং তাহাদের সন্তানগণের প্রতি পাপ ও মৃত্যুরূপ শাপ, অবশেষে কত বৎসর পরে স্রষ্টার পুত্রকে মানবরূপে প্রেরণ এবং সেই পুত্রের মৃত্যুতে শাপ বিমোচন ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ ইত্যাদি প্রথম দল মানিয়া চলেন। *

দ্বিতীয় দলের ধর্ম্মে অলৌকিক ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। পরন্তু, বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অন্তরায় বিবেচিত হয়। নাজারেথের রাজপথে একজন সূত্রধরের পুত্র যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তখনও যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনিই সত্য আছে। তাহাদের উৎকর্ষ বা প্রামাণিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। তাঁহার পবিত্র উপদেশ ও মনোমুগ্ধকর জীবনই যথেষ্ট প্রমাণ।

রাজনীতিক্ষেত্রে বীর গ্লাডষ্টোন প্রথম দলের নেতা হইয়া কয়েক বৎসর হইল সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হক্সলি তাঁহার চিত্তচমৎকারিণী ভাষায়, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া গ্লাডষ্টোনের যুক্তিজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। * অলৌকিক ক্রিয়ার সত্যাসত্য সম্ভাবনা অসম্ভাবনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

"আমরা প্রকৃতিকে এখন যেমন দেখিতেছি, উহা যে চিরকালই ঐরূপ ছিল বা থাকিবে, উহা যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে যুক্তি বিচার সঙ্গত নির্ণয় এক পদার্থ, আর প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বা কোন ব্যাপার অসম্ভব বলা আর এক পদার্থ। যুক্তিসঙ্গত নির্ণয়ের দুইটী মূল পাওয়া যায়। (১) বর্ণিত বিষয় সমর্থন পক্ষে যেমন

* S. Laing's Modern Science and Modern thought.

* Essays on controverted Questions.

প্রামাণ আবশ্যক, তাহা পাওয়া এবং (২) উহার যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া। প্রথম স্থলে বর্ণিত বিষয় সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে এবং দ্বিতীয় স্থলে অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। অন্ততঃ ততদিন পরিত্যাজ্য হইবে, যতদিন আমাদের মত পরিবর্ত্তনের কারণ না ঘটে।" *

এই বিশ্বজগতে মানুষই কি সর্ব্বপ্রধান? যাহা ভক্তের প্রাণ, বিশ্বাসীর আশ্বাস, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, তাহা কি সমস্তই অসার? হক্সলি বলিতেছেন, †—

"একটা কীটের জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান যেমন উন্নত, মানুষের জ্ঞানের তুলনায়, বহুপরিমাণে তেমনই উৎকৃষ্ট জ্ঞান এই অসীম দেশে বিক্ষিপ্ত অগননীয় জগতে নাই বলা; প্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তন বিষয়ে একটা শম্বুকের তুলনায় মানুষের ক্ষমতা যত অধিক, তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সত্তা নাই বলা; কঠোর বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে দেখিলে আমার নিকট ঐ দুইটি উক্তি কেবল অমূলক নহে, পরন্তু ধৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহার দৃষ্টান্তের বাহিরে না গিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, এই বিশ্ব এমন সত্তায় পরিপূর্ণ আছে, যাহা ক্রমশঃ উন্নতরূপ ধরিয়া গেলে অবশেষে এমন এক সত্তায় উপনীত হই, যাহা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ হইতে বিভিন্ন নহে।"

খ্রীঃ ১৮৯৩ অব্দের মে মাসে হক্সলি ক্রমবিকাশ ও নীতি (Evolution & Ethics) সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা স্রোত এখনও বন্ধ হয় নাই। অজ্ঞেয়তাবাদী, বিজ্ঞানের বিশ্বস্ত-সেবক আমাদের পাপপুণ্যের সুখদুঃখের কি পরিচয় দিবেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা সেই পুরাণ জটিল দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য সকলে সোৎকণ্ঠ হইয়াছিলেন। যাঁহারা পার্থিব সুখ দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না, যাঁহারা অপার্থিব জগতের প্রতীক্ষা করেন, তাঁহারা হক্সলির বক্তৃতায় কোন আশাপ্রদ বাণী শুনিতে পান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে,—

"যে ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নীহারিকা হইতে সূর্য্যাদি গ্রহগণ ও অসংখ্য জড় পদার্থ ব্যক্তিভূত হইয়াছে, যাহার প্রক্রিয়ায় অসংখ্য জীবসৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে, যাহা হইতে হয় ত এমন সত্তার বিকাশ হইয়া থাকিবে, যাহা আমাদের অজ্ঞাত আছে—এই সমস্তই ভৌতিক পদার্থের অনিত্য রূপ মাত্র। সেই ক্রমবিকাশনিয়মেই সুখ দুঃখ আধিব্যাধি সমুদয়ের উৎপত্তি। স্বার্থই জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে, স্বার্থ দ্বারাই প্রকৃতি তাহার ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানবের যে যে গুণ ব্যাঘ্রে ও বানরেও লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পশুবৃত্তির সাহায্যে মানব বন্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাহার বিচিত্র গঠন, তাহার ধূর্ত্ততা, তাহার সংসর্গশীলতা, কৌতুহল, অনুকরণশীলতা এবং বিরোধকালে তাহার যে ক্রূর ও রৌদ্র-প্রাণহরতা প্রকটিত হইত, এই সমুদয় মানবের বন্য অবস্থা পর্য্যন্ত উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল।"

"কিন্তু সমাজবদ্ধ সভ্য মানবের পক্ষে ঐ সকল গুণই দোষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সভ্য মানব ব্যাঘ্র ও বানর চেষ্টিতকে পাপ বলিয়া পরিত্যাগ করে। উন্নত-মানব পশুবৃত্তির লোপ দেখিবার আশা করেন। কিন্তু আশা করিলে কি হইবে, বন্যাবস্থার উপযোগী গুণ সকল সভ্য মানবসমাজে সময়ে সময়ে প্রকটিত হইয়া দুঃখ ক্লেশ শোকের কারণ হইতেছে। এই সকলকে এক্ষণে মানব দণ্ডার্হ করিয়াছে এবং বিষমস্থলে সেই প্রাচীনকালের সক্ষম ব্যক্তিকে কুঠার ও রজ্জু-দ্বারা লোপ করিয়া থাকেন।"

প্রাচীন বৈদিক সময়ে মানবগণের উৎসাহপূর্ণ জীবন-ব্যঞ্জক কর্ম্ম ও কলহপ্রিয়তা প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তেজিত হইলে তাহারা দেবতাগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইত না। কালের গতিতে সভ্যাবস্থার রসাস্বাদন করিয়া তাহাদের নিকট সংসার মৃত্যুময় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এক্ষণে শত্রু অপর কেহ নহে, আপনাকেই নিজের শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিল। বৈদিককালের

* Possibilities and Impossibilities.

† Preface to his Collected Essays.

প্রাচীন বীর এখন সংসারত্যাগী, কর্ম্মশীল উদ্যোগী পুরুষ এক্ষণে বিরাগী। প্রকৃতি-পরাজয় দুরূহ বোধ হইল, কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগাভ্যাস দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণ বা লয়কেই পরমমোক্ষ জ্ঞান করিল।

কিন্তু সংসারে সজ্জনের অবনতি ও দুর্জ্জনের উন্নতির কারণ কি? হক্সলি বলেন যে,—

"নৈতিক রাজ্যে সক্ষমের জয় ও অক্ষমের পরাজয় নিয়ম খাটে না। সংসারে যাহারা সক্ষম, তাহারা যে নৈতিক জগতেও সক্ষম হইবে, এমন নয়। বাস্তবিক ভৌতিক প্রক্রিয়া বা পশুবৃত্তি (cosmic process) প্রক্রিয়া বা দেববৃত্তির (ethical process) পরস্পর সংগ্রাম চলিতেছে। উভয়ের কখন মিলন হইবে, এমন আশা নাই। বন্যমানব পশুবৃত্তির, সভ্য উন্নতমানব দেববৃত্তির আশ্রয় লয়। কিন্তু সভ্য উন্নত মানবকেও প্রাণধারণ, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবসংগ্রামের জন্য চিরকালই কিয়ৎপরিমাণে পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এই জন্যই উভয়ের কখন মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যের জয় অসত্যের পরাজয়; ধর্ম্মের বৃদ্ধি, অধর্ম্মের হ্রাস; পুণ্যের সঞ্চয়, পাপের বিনাশ ঘটিবে না কি? এই অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন কালের মানবের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না, আমরা এক্ষণে শিশু নই, কিম্বা জরাজীর্ণ বৃদ্ধিও নই। অবিচলিতচিত্তে যাহা অকল্যাণকর, তাহা সহ্য করিতে হইবে, যাহা কল্যাণকর, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে"।

উপরে হক্সলির বক্তৃতার কয়েকটিমাত্র কথার সারাংশ প্রদত্ত হইল। ঐ বক্তৃতায় তিনি মানব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন। মানবেতর প্রাণীর ক্রমবিকাশের পক্ষে জীবনসংগ্রাম নিয়ম সত্য, কিন্তু মানবের উন্নতির পক্ষে স্বার্থত্যাগই নিয়ম, একথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

যে উদ্দেশ্য লইয়া হক্সলি বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"প্রাকৃতিক জ্ঞান বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক বিচারণা-ক্রম জীবন-সমস্যার যথাবুদ্ধি প্রয়োগ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মানবের কষ্ট লাঘব হইতে পারে না, এই বিশ্বাস আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছে। সংসার যেমন, তাহাকে সেই ভাবে না দেখিয়া 'ধার্ম্মিকগণ' যে অন্ধ বিশ্বাসের আচ্ছাদনে উহার কদাকার আবৃত করিয়াছেন, তাহা উন্মোচন করিয়া জানিয়াছি যে, কায়মনোবাক্যে সত্যশীল না হইলে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই; বৈজ্ঞানিক জগতে যে যশোলিপ্সা ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ আমি পোষণ করিয়াছি, তাহা ঐ উদ্দেশ্যের অধীন করিয়া চলিয়াছি। যাহাতে বিজ্ঞান লোকসাধারণের বোধগম্য হয়, যাহাতে বিজ্ঞান শিক্ষার শৃঙ্খলা ও পরিপুষ্টি হয়, ইহাই আমার জীবনের ব্রত ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত ক্রমবিকাশবাদ লইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রামে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। কি ইংলণ্ডে কি অপর দেশে, ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মতই বিশ্বাস করুন্ না, তাঁহারা বিজ্ঞানের আমরণান্তক শত্রু। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত দণ্ডায়মান হইয়াছি। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমি অনেকের মধ্যে এক জন মাত্র। এজন্য কেহ আমাকে স্মরণ করুন্ আর নাই করুন, ইহাতে আমার সন্তোষ বা অসন্তোষ নাই"।

হক্সলি-চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নহে। হক্সলির নাম শুনিলে যাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত পাঠ বা চিন্তা করিয়া কখনই সুখী হইবেন না।

অসংখ্য জীবপূর্ণ জগৎ একবারে সৃষ্ট হয় নাই, অসংখ্য প্রাণী উদ্ভিদ স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই। অসংখ্য জীবের মধ্যে মানুষ একটা জীব। নিকৃষ্ট প্রাণী উন্নত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে, বানরের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠসম্পর্ক আছে, ক্রমবিকাশবাদের ইত্যাকার সিদ্ধান্ত

শুনিলে অনেকে চমকিত হন। স্বাভিমান তাঁহাদের বলবান্, সন্দেহ নাই। আপনাকে অপরাপর জীবের মধ্যে স্থাপিত হইতে দেখিলে তাঁহাদের মনে ক্লেশ হয়। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, তাঁহাদের আতঙ্ক অসার বলিয়া বোধ হয়। যদি সমস্ত জীব জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিকাশই মানুষ হয়, যদি প্রকৃতির বিচিত্র রচনা মানুষে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া থাকে, ইহা কি আনন্দের সংবাদ নয়? যদি জীবন-সংগ্রামরূপ পশুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বার্থনাশে উন্নত মানবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা আত্মাভিমানের চরিতার্থ পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

আর যে আদ্যাশক্তি, যে আদিনিয়মে সমস্ত জড়পদার্থ—সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ্ এক সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার নিকটে বহুত্ব মিলিত হইয়া একত্বে পরিণত হইয়াছে, সেই পরমাশক্তির মহিমা ক্রমবিকাশে কত বর্দ্ধিত হইল, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় মন স্তম্ভিত হয় না কি? যদি দেখিতাম, সেই বিশ্বজননী মানুষ-রচিত কলের ন্যায় একটা চাকার উপর আর একটা চাকা পৃথক্ নিয়মে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একটার সহিত আর একটার সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া অসামঞ্জস্য আনয়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে বাস্তবিক তাঁহার অপার মহিমা, অনন্ত শক্তিতে সন্দেহ উপস্থিত হইত।

সেই আদ্যাশক্তি অজ্ঞেয় নয় ত কি? যে শক্তি সৃষ্টি স্থিতি লয়ে বিরাজিত, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ কার্য্য করিতেছে, যাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা, সেই মহাশক্তির কণিকা হইয়া তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা, ধৃষ্টতা নয় কি? যাঁহারা সেই পরমাশক্তির পরিচয় শুনায়, যাঁহারা তাঁহার বিকাশ দেখাইয়া দেয়, তাঁহারাই ধন্য।

সংসারে যাঁহারা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। জ্ঞানবৃদ্ধি কখন আমাদের অকল্যাণকর হইতে পারে না। যাহাকে লোকে কুসংস্কার বলে, যাহাকে লোকে অন্ধবিশ্বাস বলে, তাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি লাভালাভ আশঙ্কা করিয়া জ্ঞানের প্রচার সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় নহে। যে জ্ঞান তাহাই সত্য, যে জ্ঞান তাহাই ঐশ্বর্য্য, যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার যোগকর। যে ধর্ম্ম, যে বিশ্বাস জ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে পারে না, যে সংস্কার অন্ধকার অন্বেষণ করে, তাহাদের না থাকাই ভাল। অনন্ত জ্ঞান সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, ইংলণ্ডের রাজকবির মত মানব বলিতেছে, "আমি কে? একটা শিশু অন্ধকারে পড়িয়া আলোকের জন্য ক্রন্দন করিতেছে।"

হক্সলি ঘোর অজ্ঞেয়তাবাদী হউন, তিনি ঘোর জড়বাদী হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি যে জ্ঞান-প্রভাব বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ধন্য। তিনি যে কায়মনোবাক্যে সত্যব্রত হইতে বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি ধন্য। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা আর অধিক মানুষ কি করিতে পারে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

গীতার প্রামাণ্য। (৩)

দ্বিতীয়তঃ গীতা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য

শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন যে, গীতা শুধু ভগবদ্বাক্য নহে, তাহা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য।

ন্যায়শাস্ত্র মতে শব্দ-প্রমাণ দ্বিবিধ -দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। যাহা অদৃষ্টার্থক নহে, তাহার জন্য বেদবাক্যের প্রয়োজন কি? সেই নিমিত্ত গীতার বেদত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, তাহার অদৃষ্টার্থকতা সপ্রমাণ করা চাই। যে অর্থে বেদ-বিধি-বাক্য সকল অদৃষ্টার্থক, গীতা সেই অর্থে অদৃষ্টার্থক।

E. B. Cowell সাহেবও ন্যায়ানুসারেই শাণ্ডিল্যের "অদৃষ্টার্থক" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"We however affirm that what constitutes a Veda is the fact of its being uttered by a Divine Person and relating to an *unseen object*, and this character is not wanting in the Gita."

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা মনুষ্যের সামান্য প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর নহে, তাহাই অদৃষ্টার্থক। মনুষ্যের পক্ষে যাহা অদৃষ্ট, ভগবানের পক্ষে তাহা সুদৃষ্ট। তাই পুরাণানুসারে "সুদর্শন চক্র" ভগবানের হাতে। গীতা বলিয়াছেন, জীব যখন পুরুষোত্তমকে জানেন, তখন তিনি সর্ব্ববিৎ হয়েন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মানুসারে ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়া অদৃষ্ট বিষয় প্রত্যক্ষে জানা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে। উপনিষদে আছে :—

"বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥"
প্রশ্নোপনিষৎ।

হে সৌম্য, যাঁহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

অদৃষ্টকে সুদৃষ্ট করিতে হইলে মনুষ্যকে দেবত্বে উঠিতে হয়। বেদ অদৃষ্ট বিষয় সমুদয় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বেদত্ব ঘটিয়াছে। গীতাও তদ্রূপ। গীতাও এই সমস্ত অলৌকিক এবং অদৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন :—(১) আত্মার সত্বা, নিত্যত্ব ও স্বরূপ তত্ব; (২) আত্মার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক নানাবিধ গতি; (৩) আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ; (৪) আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ; (৫) সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান; (৬) ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বা পুরুষ-প্রকৃতিজ্ঞান; (৭) জগতের স্বরূপতত্ব এবং (৮) জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের সাধনোপায় বা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ।

গীতোক্ত এই বিষয় সমুদায় যে অদৃষ্টার্থক, আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিব। প্রথমে আত্মতত্ব গ্রহণ কর।

যদি আপ্তবাক্য ছাড়িয়া দাও, তবে হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মা ও পরকালের সত্তা প্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় সম্ভব-যুক্তি। তর্ক দ্বারা আত্মা এবং পরকালের কেবল সম্ভাবনা মাত্র অনুমেয় হয়, কিন্তু তাহাদের সত্তা স্থাপন করা যায় না। গীতা সেই কথা বলিতেছেন :—

"যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥"
১৫ অ—১১।

শ্রীধর অর্থ করিতেছেন :—

ধ্যান দ্বারা প্রযতমান বিশুদ্ধ যোগিগণই

আত্মাকে দেহে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে দেখিতে পান, কিন্তু যাঁহারা অবিশুদ্ধচিত্ত সুতরাং মন্দমতি,তাঁহারা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মার দর্শন পান না।

বেদেও এই কথা :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেনলভ্যো-ন মেধয়ান বহুনা শ্রুতেন।'
কঠ, দ্বিতীয় বল্লী—২৩।

এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা (গ্রন্থার্থ-ধারণশক্তি) বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিত :।
নাশান্তোমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"
ঐ—২৪।

দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত,অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান (সামান্য জ্ঞান) দ্বারা ও ইঁহাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় না।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" ঐ—৯

তুমি যে আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নহে।

গীতা ও বেদ এই কথায় সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে নিরস্ত করিয়া দিতেছেন। এ কথা না মানিয়া যাঁহারা আত্মার সত্তা তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যান, তাঁহারা অবশেষে হতাশ হইয়া গীতা এবং বেদের উক্ত কথাই সপ্রমাণ করেন। সামান্যবুদ্ধিতে আত্মা কিছুতেই উপলব্ধি হইবার বিষয় নহে। সামান্য জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা চিত্ত হইতে পারে, বুদ্ধি হইতে পারে, দেহ বা মন হইতে পারে, কিন্তু তাহা আত্মা নহে। আত্মা প্রাণ নহে,মন নহে। যদি বল, আত্মা প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং"
কেনোপনিষৎ।

তাহা হইলেও সামান্য বুদ্ধিতে "মনের মন" বলিলে কিছুই উপলব্ধি হয় না। বাস্তবিক, ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক পরিমিত জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানিবার যো নাই। আত্মা যে কি পদার্থ, তাহা কেবল সিদ্ধ যতিগণই উপলব্ধি করিয়াছেন,উপলব্ধি করিয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব ও প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় এবং অষ্টম অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপতত্ত্ব অনেক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। মনের সহিত আত্মার বিভিন্নতা সেই স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়।

অজ্ঞান ও মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট আত্মা প্রকাশিত হন না। যাঁহারা ব্যবহারিক জ্ঞানে মহাজ্ঞানী বলিয়া অভিমানী, যাঁহারা লোকে পণ্ডিত বা মহা বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত অথচ যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরম জ্ঞানী নহেন। আত্মজ্ঞানীদের নিকট তাঁহারা পণ্ডিত-মূর্খ। তাঁহারা ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে ঘোর অন্ধ।

বেদান্ত বলিতেছেন :—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥" কঠ—দ্বি-বল্লী ৫।

যাঁহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত,অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন,সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা অতিশয় কুটিল ভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন।

এই মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট আত্মার সত্তা কিরূপ প্রতীত হয়,গীতা তাহা বলিতেছেনঃ—

"আশ্চর্য্যবচ্চেপশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি
তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন
চৈব কশ্চিৎ॥" ২অ—২৯

কেহ বা শাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা আত্মাকে অদ্ভুত দর্শন করেন। সর্ব্বগত,

নিত্য, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মার অলৌকিকত্ব হেতু তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিকবৎঘটমান্ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন। সুতরাং আত্মবাদকে আশ্চর্য্যবাদ বলিয়া প্রতীত করেন। কেহ বা ঐরূপ আশ্চর্য্যবৎ, অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া বর্ণন করেন। কেহ বা অন্যের নিকট হইতে আত্মাকে ঐরূপ আশ্চর্য্যভাবান্বিত বলিয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু ঐরূপ দেখিয়া, বলিয়া, ও শ্রবণ করিয়া কেহই আত্মার স্বরূপতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হয়েন না। শ্রীধর।

বেদেও এই কথা :—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ॥"
কঠ—দ্বি, বল্লী—৮।

ইনি (আত্মা) হীনমনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হয়েন না। যেহেতু অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারে ভাবে। শ্রেষ্ঠাচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে আত্মাকে জানা যায় না। যেহেতু আত্মা অণুপরিমাণ হইতে ও সূক্ষ্ম এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" ঐ—৭।

অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না বা পারে না (অনেকের পক্ষে যাঁহার বিষয়ে উপদেশ লাভও সুদুর্ল্লভ) যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অর্থাৎ উপদেশ লাভ করিয়াও অনেকে জানিতে পারে না, তাঁহার নিপুণ বক্তা দুর্ল্লভ, আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্ল্লভ।

"তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা আত্মতত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন নাই, যাঁহারা কেবল অনুমান বা তর্কের আশ্রয়ে আত্মতত্ত্বনির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েন, কিম্বা যাঁহারা হীনাচার্য্য কর্ত্তৃক পরকাল এবং আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েন, তাঁহারা হয় ত ঘোর জড়বাদে, না হয় আশ্চর্য্যবাদে, না হয় দেহাত্মবাদে উপনীত হয়েন। তাঁহারা গীতা এবং উপনিষৎ মতে আত্মঘাতী। গীতা বলিতেছেন :—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং॥"
১৩—২৮।

যিনি ভূতমাত্রেই পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুত ভাবে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনি আপন দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না, তজ্জন্য শ্রেষ্ঠগতি লাভ করেন।

এই শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ খুলিয়া শ্রীধর বলিতেছেন :—

"যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী
দেহেন সহাত্মনং হিনস্তি।"

যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতভাবে না দেখেন, সেই দেহাত্মদর্শী দেহের সহিত আত্মার বিনাশ দর্শন করেন।

শ্রুতি বলেন :—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ"
ঈশোপনিষৎ।

যাহারা অবিদ্যা বশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা আত্মঘাতী। তাহারা দেহান্তে আলোকহীন এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত অসুরলোকে গমন করে।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।" কঠ—২-৬

চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন বালক-সদৃশ অবিবেকীর নিকট পরলোকে প্রয়োজনীয় উপায় (ভূমা পুরুষ) প্রকাশিত হয় না; কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

বেদ মতে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন অবিবেকী,তাঁহারা হাজার বিদ্যা-বুদ্ধি(ব্যবহারিক)সম্পন্ন হউন না কেন,তাঁহারা আত্মা এবং পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে ঘোর অন্ধ। সুতরাং তাঁহাদের দেহাত্মবাদে আসিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তবে যাঁহারা না আসেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠাচার্য্য (জ্ঞানিগণের) উপদেশে আস্থাস্থাপন করিয়া ঐ দুই তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া লয়েন। বিশ্বাস করিয়া লইয়া তার পর, ইহলোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পরলোক এবং আত্ম অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করিতে যান। সেই অনুমান ও তর্ক দ্বারা কেবল সম্ভাবনা মাত্রই প্রতিপন্ন হয়। আত্মা এবং পরলোকের নিশ্চিতজ্ঞান হয় না। এ সম্ভাবনাও শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণের উপদেশমূলক। শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণ আত্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া-দেন; সেই উপদেশ মত সাধনা করিলেই আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়।

যাহাদের নিকট আত্মার নিত্যত্ব সপ্রমাণ নহে, সেই সংশয়বাদিগণ পরকালের সত্তার প্রতি নিশ্চয় সংশয়ী। কারণ, আত্মা নিত্য না হইলে, তাহার পরকাল সম্ভবে না। হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রে নিত্য আত্মা এবং পরকালের সত্তা একরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন যে, কোন যুক্তিপথে বা শাস্ত্রজ্ঞানে তাহা প্রতিপন্ন নহে। তবে তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন?

উপনিষৎ বলিতেছেন:—

"তন্দুর্দর্শংগূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

কঠ—২বল্লী—১২।

সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়,প্রতিবিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম (ইন্দ্রিয়াতীত, সূক্ষ্ম, পরম জ্ঞান মাত্র গ্রাহ্য) স্থানে অবস্থিত, পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া জ্ঞানীব্যক্তি হর্ষ শোকের অতীত হয়েন।

গীতা বলিতেছেন:—

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥"

১৫—১০।

যাঁহারা আত্মজ্ঞানবিমূঢ়,তাঁহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে পান না। আত্মা যখন এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন, তখন দেখিতে পান না; যখন তিনি সুখ দুঃখ মোহাদি গুণযুক্ত হয়েন,তখনও দেখিতে পান না। এইরূপ আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও আত্মজ্ঞানাভাবে তাঁহারা আত্মদর্শনে সমর্থ নহেন। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুঃ বিবেকিগণ আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কেবল অধ্যাত্মযোগ দ্বারা পুরাতন আত্মাকে—যিনি হিরণ্ময় হৃদয়কোষে অবস্থিত, * যিনি দিব্য-জ্যোতিতে নিজ গৃহরূপ হৃদয়কে হিরণ্ময় করিয়াছেন,—সেই দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন নির্ম্মল আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম যোগেই জ্ঞানচক্ষুঃ লাভ হয়। এই জ্ঞান চক্ষুঃ দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে। সেই জ্ঞানচক্ষুঃ যাহাদের নাই, তাহারা কাজে কাজেই জড়-বাদী, না হয় দেহাত্মবাদী হইয়া পড়েন।

* "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্।"শ্রুতি

যাঁহারা এই জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের উপদেশ বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কিয়দংশে আত্মজ্ঞান লাভ এবং পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন হয়। নহিলে সামান্য বুদ্ধিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা বিবেক লাভ হয়। বিবেক লাভেই আত্মসাক্ষাৎকার।

হিন্দুধর্ম্ম, আত্মা ও পরলোকের সত্তা এই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম বলেন, লৌকিক জ্ঞানে অলৌকিক বিষয় প্রতিপন্ন হয় না। অলৌকিক বিষয় জানিবার জন্য অলৌকিক দৃষ্টি চাই। সেই অলৌকিক দৃষ্টি প্রভাবে বৈদিক ঋষিগণ এবং সিদ্ধ যতি-গণ, আত্মা এবং সেই আত্মার পরকালের গতি সমস্ত বর্ণন করিয়াছেন। এই বৈদিক ধর্ম্ম হইতে জগতে ঐ দুই মহান্ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই মহান্ তত্ত্বই সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। যে জ্ঞান অলৌকিক বিষয়ে লইয়া যাইতে পারে, তাহাই হিন্দু জ্ঞানিগণের গণনায় প্রকৃত বিদ্যা।

এই বিদ্যা দ্বিবিধ—পরাবিদ্যা এবং অপরা-বিদ্যা। বেদ বাক্য এই :—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" মুণ্ডকোপনিষৎ

ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা,কল্প,ব্যাকরণ,নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ,এই সমস্ত অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

পরাবিদ্যা মোক্ষের হেতু, অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যাতে লইয়া যায়। অপরা বিদ্যা দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সেই জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান কেবল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই, নহিলে সে জ্ঞান কিছুই নহে। কার্য্যে পরি-ণত করিলে তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং বাসনা হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া তাহা ঈশ্বরে সংন্যস্ত করিতে পারা যায়। এরূপ করিতে পারিলে তখন আত্মা ধ্যানযোগ অব-লম্বন করিতে সমর্থ হয়। অপরাবিদ্যা এই-রূপে পরাবিদ্যাতে চিত্তকে লইয়া যায়। গীতাও বলিতেছেন যে, জ্ঞানযোগে আরো-হণ করিতে হইলে অগ্রে কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে।

"ন চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।" ৩অ—৪।

কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য নৈষ্কর্ম্ম (জ্ঞান) লাভ করিতে পারে না। সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির জন্য জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য; যেহেতু কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল সন্ন্যাসমাত্রেই(কর্ম্মত্যাগ মাত্রেই)জ্ঞানোৎপত্তি ও সিদ্ধিলাভ হয় না।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—সমস্তই অধ্যাত্ম যোগের অঙ্গ। এই অঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। যাহাতে তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকাশ হয়, যদ্দ্বারা বস্তুতত্ত্ব স্বরূপতঃ নিরূপিত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। সামান্য মানসিক জ্ঞান দ্বারা এই প্রকৃতজ্ঞান লাভ করা যায় না বলিয়া তাহা অবিদ্যা।

গীতা উপদেশ দিতেছেন, কর্ম্মযোগে জীব পরিশুদ্ধ হইয়া মায়াময় (বা অবিদ্যাময়) সংসারধাম হইতে পরমার্থধামে প্রবেশ করেন।

কর্ম্মযোগ তাহাকে জ্ঞানযোগের জন্য প্রস্তুত করে। কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানবীজ রোপণের জন্য ভূমি পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ হয়—জীবের চিত্ত হইতে সংসার অপসৃত হয়, মায়াকণ্টক ছেদিত হয় এবং তাহার হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কর্ম্মযোগের বিশুদ্ধ এবং পবিত্র পন্থা ধরিয়া যে সাংখ্য-যোগে উপনীত হন, তথায় আসিয়া তাঁহার এক দিব্যচক্ষুঃ ফুটে। সেই দিব্যচক্ষুঃ বলে তিনি অধ্যাত্মজগতের সমস্ত গূঢ় রহস্য দেখিতে পান—দেখিতে পান -আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ, পুরুষ প্রকৃতি, ইহলোক এবং পরলোক। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার যায়, আমি হর্ত্তা, আমি কর্ত্তা, এই জ্ঞান বিনষ্ট হয়। এই অহঙ্কার * গেলে প্রকৃত আমি যে আত্মা ও ব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞানে সেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞানে আত্মার নিত্যত্ব ও পরলোক প্রতিপন্ন হয়। যাঁহার প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিকট স্বয়ং ব্রহ্মও অপ্রত্যক্ষ থাকেন না। একে একে সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার জ্ঞানগোচর হয়। তাই গীতা বলিতেছেন :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"
৬অ—২৯।৩০।

যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে এবং যিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন, সেই সমাহিতচিত্ত সমদর্শীযোগী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সমস্ত ভূত দর্শন করেন। এরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি আমাকে (ভগবানকে) সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দর্শন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপা-দৃষ্টিতে তাহাকে অবলোকন করি।

এ বাক্যের শ্রুতি এই :—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥"

উপনিষদ বলিতেছেন :—

"যথাদর্শে তথাত্মনি"
কঠ—৬ষ্ঠ বল্লী—৫।

যেমন আদর্শের বোধক প্রতিবিম্বে লোক আপনাকে দর্শন করে, তেমনই জ্ঞানী আত্মাতে (আপনাতে) ব্রহ্মদর্শন করেন *।

আত্মপ্রত্যক্ষ হইলে যে স্বয়ং ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ হন, তাহার কারণ গীতা বলিতেছেনঃ—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।" ৮অ-৩।

যিনি পরম অক্ষর, তিনি পরমাত্মরূপে জগতের মূলকারণরূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মেরই যে স্বভাব বা স্বকীয় ভাব, যাহা জীবরূপে প্রকাশ, সেই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম কহে।

অন্যত্র গীতা বলিতেছেন :—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"
১০অ—২০।

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥"
১৫ অ—৭।

আমারই অংশ এই সনাতন জীব। ইনি প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জীবলোকে সংসার ভোগার্থ আকর্ষণ করেন।

* এই অহঙ্কার হইতে মত্ততা জন্মে; সেই মত্ততাই মধুদৈত্য, এজন্য পুরাণে বাসুদেবের নাম শ্রীমধুসূদন।

* ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ একথায় যে পূর্ব্বপক্ষ তুলেন, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যকৃত "শঙ্কর-বিজয়ে" সেই বিচার দৃষ্ট হইবে।

উপনিষৎ বলিতেছেন :—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।" কঠ—২বল্লী-২০।

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা প্রাণীসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত।

"ইহৈবান্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি।" প্রশ্নোপনিষৎ—৬—২।

হে সৌম্য! যাঁহাতে এই ষোড়শকলা * উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে (হৃদয়ে) বিদ্যমান আছেন। গীতা যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মেরই অংশ জীব, একথা শুদ্ধ ভেদজ্ঞানীর সুবোধার্থ। যতদিন জীবের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে, যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন সম্যগ্ জ্ঞান উদয় হয় না; সুতরাং জীবকে অনন্তের অংশরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। গীতা তাই বলিতেছেন :—

"যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যথাসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥"
৪অ—৩৫।

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ করিলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্দ্বারা ভূতগণকে আত্মাতে, অনন্তর আত্মাতে ও পরমাত্মাতে অভেদরূপে দর্শন করিবে।

* ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে এই ষোড়শকলা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বাদি চারিটি দিক্ চারিটি ব্রহ্মকলা; এই কলা-চতুষ্টয়ে ব্রহ্ম প্রকাশবান্। পৃথিবী, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও সমুদ্র এই চারিটী অন্ত চারি কলা; সেই চারি কলায় তিনি অনন্ত ব্রহ্ম। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ—এই চারি কলায় তিনি জ্যোতিষ্মান্। এবং প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্—এই চারি কলায় ব্রহ্ম আয়তবান্। এই ষোল কলায় বা পাদচতুষ্টয়ে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব। তিনি অজাত, স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি এবং সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ বা বিষ্ণু। তিনি "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম"—তৈঃ আঃ প্রং ৮ অং ১ম। তিনি সত্যরূপে প্রকাশবান্, জ্ঞানরূপে জ্যোতিষ্মান্' সর্ব্বব্যাপী অনন্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের সত্তারূপে ব্রহ্ম। তিনিই আত্মারূপে জীবশরীরে বিদ্যমান।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতজ্ঞান বিচার বা তর্ক সাপেক্ষ নহে। যত দিন মায়ামুক্ত না হওয়া যায়, যতদিন না অবিদ্যা তিরোহিত হয়, যতদিন না নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয়, ততদিন ভেদজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। এই ভেদজ্ঞান পঞ্চবিধ :—

"জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদ পঞ্চকঃ *।
ইত্যাদি—শ্রুতিঃ।

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জীবে ভেদ, এবং জড়ে জড়ে ভেদ এই পঞ্চভেদের নাম প্রপঞ্চ।

এই প্রপঞ্চ, মায়া বা অবিদ্যাজনিত। বিবেকোদয় হইলে মায়ার সহিত প্রপঞ্চজ্ঞান নষ্ট হয়। সুতরাং অদ্বৈতভাব † বিবেকসাক্ষাৎকার সাপেক্ষ।

সামান্য বুদ্ধিতে এবং ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানে পরমেশ্বর উপলব্ধ নহেন কেন, গীতা তাহার কতিপয় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথম কারণ—জীবের মায়া।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"
৭ অ—১৩।

এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ গুণময়ভাবেই সমস্ত জগৎ

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনোদ্ধৃত।

† "জগৎ ব্রহ্মময়" অন্তঃকরণের এইরূপ স্থায়ীজ্ঞানকে অদ্বৈতভাব বলে। ব্রহ্ম এক বই দুই নহে এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন, যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা এ জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু এ জ্ঞান ক্ষণিকমাত্র। ভেদজ্ঞান এ জ্ঞানকে স্থায়ীরূপে থাকিতে দেয় না। সুতরাং ভেদজ্ঞান সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে, অন্তঃকরণে স্থায়ী অদ্বৈতভাবের উদয় হয় না।

মোহিত হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং আমি যে এই ত্রিবিধ ভাবে অস্পৃষ্ট এবং তাহাদের নিয়ন্তা এজন্য নির্ব্বিকার একথা কেহই বুঝিতে পারে না।

মায়া-বিমুক্ত না হইতে পারিলে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। মায়ামোচনের একমাত্র উপায় অধ্যাত্মযোগ। মায়া দ্বিবিধ—জীবের মায়া—যদ্দ্বারা জীব ত্রিগুণাচ্ছন্ন এবং ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানে আবরিত রহিয়াছেন। অন্য-বিধ মায়া ঐশ্বরিকশক্তি—যে মায়া প্রভাবে এই জগৎ সৃষ্ট, স্থিত ও সংহৃত হইতেছে। সুতরাং মায়া দ্বিবিধ আবরণ। তাহা জীবকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঈশ্বরকেও জীবের সমক্ষে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। গীতা প্রথম প্রকার মায়ার কথা বলিয়া পরে দ্বিতীয় প্রকার মায়ার কথা বলিতেছেন। তাহাও ঈশ্বর স্বরূপজ্ঞানের মহাপ্রতিবন্ধক।

দ্বিতীয় কারণ—ঐশ্বরিক মায়া।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
৭ অ—২৫।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রকাশমান হই না। আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকি ; সুতরাং লোকে মৎস্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আমি যে অজ ও অব্যয়,তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আমার একান্ত ভক্ত, তাহারা স্বরূপ বুঝিতে পারে।

তৃতীয় কারণ—ঈশ্বর অনন্ত, অনাদি ; এজন্য ত্রিকালজ্ঞ। মানবের জ্ঞান পরিমিত ; এজন্য অনন্তকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। মানবাত্মা তখন অনন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারে, যখন তাহার মোহজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব যখন ব্রহ্ম হয়, তখন ব্রহ্মকে জানিতে পারে *। তৎপূর্ব্বে জানিতে পারে না। গীতা বলিতেছেন :—

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥"
৭অ—২৬।

হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ,এই ত্রিকালবর্ত্তী ভূত সকলকে জানি ; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।

যাঁহার জ্ঞান অনন্তকাল ব্যাপ্ত, তাঁহার কাছে ভূত ভবিষ্যৎ নাই, সকলই বর্ত্তমান। যে মানবের জ্ঞানে ভূত ভবিষ্যৎ আছে, মানব সে জ্ঞানে তাঁহাকে কখনই জানিতে পারেন না। তজ্জন্য সমাধিলব্ধ পরমজ্ঞান আবশ্যক। যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীবও সর্ব্বজ্ঞ হয়, সেই পরমজ্ঞান লাভ হইলেই মানবও সর্ব্বজ্ঞকে জানিতে পারেন। সেই পরম জ্ঞান জীবে কখন উপনীত হয়, গীতা তাহা বলিতেছেন :—

যো মামেবম সম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥
১৫ অ—১৯।

হে ভারত! যিনি নিশ্চিতমতি (সমাধি-সিদ্ধ) হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন এবং তিনিই সর্ব্ববিৎ হয়েন।

শ্রীধর।

চতুর্থ কারণ—মানব স্থূলদেহধারী ; এজন্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছা শুধু কালে আবদ্ধ এমত নহে, পরিমিত দেশেও আবদ্ধ। পরিমিত দেশাবদ্ধ জীবের জ্ঞান পরিমিত দেশেই আবদ্ধ থাকিবে। দেহভুক্ত মানবের ইচ্ছা পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ থাকাতে সে কিরূপে সর্ব্ব-ব্যাপী পরমেশ্বরকে বুঝিতে পারিবে? যিনি দেহ সম্পন্ন তিনি "অদেহ"কে কিরূপে জানিতে পারিবেন? অথবা তাঁহার যদি দেহ থাকে, সে দেহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার। পরিমিত দেহধারী অনন্ত দেহীকে জানিতে

* শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্ম জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম।

বা বুঝিতে পারেন না। দেহজাত জীব দেহানুকূল ইচ্ছাদির বশীভূত। ইচ্ছা অভাব হেতু সঞ্জাত। যেখানে অভাব নাই, সেখানে ইচ্ছা নাই। কিন্তু অভাবসম্পন্ন এবং দেহানুকূল ইচ্ছা-বিশিষ্ট মনুষ্য অভাববিরহিত পূর্ণকাম ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারিবেন? আমরা শাস্ত্রে যে পূর্ণপুরুষের ইচ্ছা শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাই, তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার ন্যায় অভাব হেতু ইচ্ছা নহে; তাহা পূর্ণকামের ইচ্ছা; পূর্ণকামের যে প্রবৃত্তি, তাহা দিব্য ইচ্ছা। সগুণ পূর্ণব্রহ্ম ইচ্ছাময়। ইচ্ছাময়ের যে ইচ্ছা, তাহাই ঈশ্বরেচ্ছা; সে ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই। দেহ এবং অভাবজাত মানসিক ইচ্ছা পূর্ণকামে আরোপ করিলে তাহা ঈশ্বরেচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা নির্গুণের সগুণত্ব; তাহা পূর্ণকামের সহিত অন্তর্লিপ্ত। সুতরাং ইচ্ছা-দ্বেষ-সমন্বিত দেহবিশিষ্ট মনুষ্য পূর্ণকামের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই দেহজাত ইচ্ছা এবং দ্বেষাদিতে মানবের মন মোহিত ও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ মোহযুক্ত মন কখন বিবেকলব্ধ বিষয়-স্বরূপ পরমপুরুষকে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। সেই নিমিত্তই শাস্ত্রে পরম পুরুষকে "অবাঙ্‌মনসগোচর" বলিয়াছে। Spencer কেবল The unknowable Absolute Being পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছেন, আর অধিক দূর যাইতে পারেন নাই। তাই গীতা বলিতেছেন :—

"ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥" ৭অ—২৭।

হে ভারত! হে পরন্তপ! জীবের স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলেই সেই দেহানুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং দেহের প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সেই ইচ্ছা দ্বেষ সমুৎপন্ন শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি নিমিত্ত যে মোহ অথবা বিবেকভ্রংশ উপস্থিত হয়, সেই মোহ দ্বারাই ভূত সকল বিমোহিত থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান অভাবে তাহারা আমাকে ভজনা করে না। শ্রীধর।

অতএব, গীতা সর্ব্বস্থলেই উপদেশ দিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে বিবেকোদয় হইবে না; বিবেকোদয় না হইলে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভবে না। এই আত্মজ্ঞান আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই প্রতীত হয় যে, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" *।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন সম্যগ্‌দর্শন। সম্যগ্দর্শনই পূর্ণপ্রত্যক্ষ †। তাহা সামান্য জ্ঞান বা বুদ্ধির উপলব্ধি নহে। তাহা আত্মার স্বপ্রকাশশক্তি। এই অধ্যাত্মদীপে আত্মা সমুজ্জ্বলিত। এই দীপ মনুষ্যের ব্যবহারিক বুদ্ধিলব্ধজ্ঞানরূপ মোহাবরণে আচ্ছন্ন থাকে। সেই মোহাবরণ নিরাকৃত হইলে সেই অধ্যাত্মজ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। মোহাবরণ কাটিয়া গেলেই সূর্য্যের স্বপ্রকাশমূর্ত্তি প্রভাসিত হয়। তাই শঙ্কর বলিতেছেন :—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥
আত্মবোধ—৪র্থ শ্লোক।

সেই জ্ঞানদীপালোকে সম্যগ্দর্শনলাভ হয়। শঙ্কর বলেনঃ।—

"সম্যগ্বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা॥ ঐ—৪৬।

* এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই বেদান্তীর অদ্বৈতবাদের প্রামাণ্য। পরে দৃষ্ট হইবে, তাহা "অপরোক্ষানুভূতি" সাপেক্ষ।

† এই "সম্যগ্‌দর্শন" কিরূপ, তাহা গীতার ১৩ অধ্যায়ের শেষভাগে দৃষ্ট হইবে।

যাঁহার সম্যক্ প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বিজ্ঞানবান যোগী আত্মাকেই সর্ব্বময় জ্ঞান করেন এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এক আত্মাকেই সর্ব্বময় দর্শন করেন। তখন তাহার আর কোন বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না।

এই জ্ঞানচক্ষুর দীপালোক ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। শঙ্কর বলিতেছেন :—

"সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে।
অজ্ঞান চক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ। ঐ—৬৪।

জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিই সচ্চিদানন্দরূপ সর্ব্বগ পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি কখন সূর্য্যদর্শন করিতে পায় না, সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে না।

এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাচ্ছন্ন বিমূঢ় ব্যক্তি হাজার চেষ্টা করিলেও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না। এই কথারই রূপক অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি এবং বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। গীতা বলিতেছেন :—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম নেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
১১ অ—৮।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ঋগ্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব। (২)

দ্বিতীয় কাল—ত্রিমাতার আবিষ্কার।

সব্য ও পরাশর ঋষি আর্য্যজগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। যত দিন ঋষিগণ ৩৩ দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং দেবগণের মধ্যে কাহারও প্রাধান্যের কথা উপস্থিত হইয়াছিল না, ততদিন আর্য্যজগতে বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ ছিলনা, কোন বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করিতে হয় নাই। এখন সব্যঋষি বলিলেন, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ স্তুতি পাইতে পারে না; এবং পরাশর বলিলেন, অগ্নি ইন্দ্রেরও পূজ্য, অতএব তাঁহারই পূজা করিতে হইবে। এইখানে দুই শক্তির সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। সব্য ও পরাশরের অনুবর্ত্তী দুই দল ঋষি যে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ করিলেন, তাহা নহে। পরাশরের পরবর্ত্তী গোতম হইতে ভরদ্বাজ পর্য্যন্ত ইন্দ্র ও অগ্নির সমীকরণের এক ব্যগ্র চেষ্টা হইতে লাগিল, এবং প্রজাপতি ঋষি যে উচ্চতম তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন ও ভরদ্বাজ যাহাকে প্রশংসিত মত বলিয়া সমর্থন করিলেন, সেই মত হইতে দার্শনিক আলোচনা ও তত্ত্বাবিষ্কারের পথ পরিষ্কার হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ের মধ্যে প্রজাপতি ঋষিই সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়।

সব্য ও পরাশরই এই আন্দোলনের মূল। তাঁহারা উভয়ে একটী মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষণ সংঘটন করিলেন। সংঘর্ষণ শক্তিবিকাশের প্রধান সহায়। জড়জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যতক্ষণ সংঘর্ষণ ও ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ শক্তির সম্যক্ বিকাশ হয় না। অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে জলরাশি অবতীর্ণ হইয়া খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে বিশেষ কোন শক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু যখনই তাহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি পতিত হইল, যখনই কোন বৃক্ষাদি তাহার সেই প্রচণ্ডবেগকে প্রতিহত করিল, অমনি সে ক্রোধে কম্পিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে গগন-

স্পর্শী ফেনরাশি বিকীর্ণ করিয়া, বিশাল প্রস্তর স্তূপ ভাসাইয়া, আপনার বিপুল শক্তির পরিচয় প্রদান করিল। আকাশে নীলমেঘ উঠিয়া বাতাস আরম্ভ হইল। পৃথিবীর অতি উচ্চ প্রদেশে যেখানে হিমালয়ের অত্যুঙ্গশৃঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না, তদপেক্ষাও উচ্চতর দেশে বাতাস আরম্ভ হইল। শব্দ নাই, ক্রিয়া নাই, কোনরূপে তাহার শক্তির পরিচয় নাই। কিন্তু যখনই একটু নীচে অবতীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, যখনই পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও বিশাল বৃক্ষরাজি তাহার গতি প্রতিরোধ করিল, অমনি যেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড শব্দে, গভীরনাদে, প্রখরতরবেগে বৃক্ষরাজি ভগ্ন করিয়া স্বীয় শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিল। বিস্তীর্ণ নীল আকাশে সূর্য্যের প্রখর কিরণরাশি দিগ্‌দিগন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, কোথাও তেজের প্রভা অবলোকিত হইতেছে না। কিন্তু যখনই কোন গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী চন্দ্র তাহার সেই কিরণরাশি প্রতিরোধ করিল, অমনি তাহাকে সম্যক্‌ আলোকিত করিয়া, প্রাণিগণের জীবন উৎপাদন করিয়া স্বীয় অতুল শক্তির অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিল। তদ্রূপ মানবমন প্রবৃত্তি বিশেষের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া অর্দ্ধ-অচেতনভাবে উন্মত্ত পশুর ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছে। অন্যবিধ কোন মহত্তর প্রবৃত্তি আসিয়া তাহার প্রতিরোধ করিলে, চরিত্রের শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজনৈতিক জগতেও শক্তির সংঘর্ষণে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের চিন্তা শক্তিরও এই নিয়ম। যতদিন ঋষিগণ ৩৩ দেবগণকে নির্ব্বিশেষে উপাসনা করিতেছিলেন, ততদিন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। এখন সব্যঋষি বলিলেন, ইন্দ্র ব্যাপকের ব্যাপক, দ্যু ও পৃথিবী তাহার ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় না; পরাশর বলিলেন, অগ্নি ব্যাপকের ব্যাপক, দ্যু ও পৃথিবী তাহার ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় না। অতএব এই বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল যে, দুইটি ব্যাপকের ব্যাপক কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্ন পরিস্ফুটরূপে উল্লিখিত দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারই উত্তর লইয়া প্রধান প্রধান ঋষিগণ ব্যস্ত। এই সময়ের প্রধান বিচার্য্য এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? বাস্তবিক এই সময় হইতেই তত্ত্বানুসন্ধান ও হিন্দুদর্শনের সূত্রপাত।

১। ইন্দ্র ও অগ্নির সমীকরণ ও ত্রিমাতার আবিষ্কার।

গোতম ঋষি অনেক দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। তিনি বিশ্বদেবগণ, বহুদেবগণ, মরুৎগণ, সোম, ঊষা ও অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশ স্তোত্রই অগ্নি অথবা ইন্দ্রের। তিনি সর্ব্বপ্রথমে অগ্নির স্তোত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন "অগ্নি যজ্ঞের কর্ত্তা, অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্ত্তা ও উৎপাদয়িতা, * * দেবাভিলাষী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় (শ্রেষ্ঠ) অগ্নির নিকট গমন করিয়া অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলিয়া স্তুতি করে।" (১।৭৭।৩)। "অগ্নি অমর ও সত্যবান্‌" (১।৭৭।১) ও "যথার্থদর্শী" (১।৭৭।২)। তিনি "সর্ব্বজ্ঞ" (১।৭৭।৫) "প্রজ্ঞাযুক্ত ও সর্ব্বদর্শী"। তিনি "সকল লোকের বন্ধু" (১।৭৫।৩) হে অগ্নি! তুমি "আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর" (১।৭৬।৪)।

গোতম ঋষি, এই প্রকারে অগ্নিকেই প্রধান করিয়া তাহাকেই "বিশ্বেশ্বর উপসংহর্ত্তা ও উৎপাদয়িতা" জানিয়া স্তব করিলেন। সেই অগ্নিকে লাভ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই পরমপুরুষকে

লাভ করিতে না পারিয়া তিনি বলিতেছেন, "হে অগ্নি! মনুষ্যের মধ্যে কে তোমার (যোগ্য) বন্ধু? কে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ? তুমি কে? তুমি কোন্ স্থানে অবস্থান কর?" (১৭৫।৩)। পরাশরের উপাস্য অগ্নিকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই গোতমের অন্তঃকরণে এই গভীর জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল।

আর কতকগুলি স্তোত্রে গোতম ইন্দ্রের স্তব করিয়াছেন। "ইন্দ্র পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল স্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই ও হইবে না,তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগত ধারণ কর" (১৮১।৫); তুমি "আমাদিগকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত কর" (১৮১।৭)। এই সকল স্তোত্র সব্যঋষির সেই ব্যাপকের ব্যাপক ইন্দ্রেরই স্তব করিতেছে। সেই সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন না বলিয়াই গোতম কহিয়াছেন—"সেই সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হইতে পারি না" (১৮০।১৫)।

পরাশরের অগ্নিকে একবার জগতের অধীশ্বর ও প্রধান বলিয়া স্তব করিয়া, আবার অখিলের পতি বলিয়া স্তব করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে কি বিশ্বের দুইজন নিয়ন্তা এবং আমরা যাহাকে ইচ্ছা স্তব করিতে পারি? এই দুই যে এক, তাহা গোতম স্পষ্ট বলিয়া যান নাই, তবে একথা বলিয়াছেন যে, অঙ্গিরাগণ (পরাশর প্রভৃতি) বাস্তবিক (অগ্নিরূপী) ইন্দ্রেরই উপাসনা করিয়াছেন। "অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অন্ন সম্পাদন করিয়াছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সুন্দর যাগ দ্বারা (সেই ইন্দ্রেরই) পূজা করিয়াছিলেন; (সেই জন্যই) যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করিয়াছিলেন।" (১৮৩।৪) গোতমের এই স্তোত্র পাঠ করিলে বোধ হয় তিনি ইন্দ্রেরই একটু পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ইন্দ্রকে অগ্নি বলিয়া না ডাকিয়া অগ্নির উপাসকগণ অগ্নিকে ইন্দ্র বলিয়া ডাকিলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন।

অঙ্গিরার বংশোদ্ভব অগ্নির উপাসক কুৎস ঋষি অধিকতর উদারতার সহিত অগ্নি ও ইন্দ্রকে এক করিয়াছেন। স্বকীয় কুলের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তিনি প্রথমে অগ্নিকে প্রধান করিয়া ইন্দ্রকে তাহার অন্তর্ভূত করিলেন। "অগ্নি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাব্যা পৃথিবীর উৎপাদক" (১৯৬।৪)। তিনি "সমুদ্রে, আকাশে ও অন্তরীক্ষে" (১৯৫।৩)। "তুমি মহৎ, তোমার সর্ব্বপরাজয়ী দীপ্যমান ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে"(১৯৫।৯)। সেই অগ্নিই ইন্দ্রের কার্য্য করেন, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ হইতে রস আকর্ষণ দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন,অতএব অগ্নিই ইন্দ্র। "তিনি সকল বস্তু হইতে রস উর্দ্ধে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদিগের (অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপ অগ্নির মাতা মেঘদিগের) নিকট হইতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন" (অর্থাৎ জগৎকে শস্য তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করেন)(১৯৫।৭)।

আবার আর্য্যোচিত উদারতার সহিত তিনি স্বকীয় পিতৃপুরুষগণের পুরাতন উপাস্য অগ্নির বিকাশকেই ইন্দ্রের বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। "হে মঘবন্! তুমি পরিমাণ রহিত" (১।১০২।৭)। "হে নরপালক (ইন্দ্র)! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণ স্বরূপ। তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ এবং এই বিশ্বভুবন

বহন করিতে সক্ষম"(১।১০২।৮)। "হে ইন্দ্র! পুরাকালে মেধাবিগণ (অর্থাৎ সব্য প্রভৃতি) তোমার এই প্রসিদ্ধ পরম বল সাক্ষাৎ ধারণ করিয়াছেন।—তাঁহার (অর্থাৎ ইন্দ্রের) এক জ্যোতি (অগ্নিরূপে) পৃথিবীতে,অন্যটি (সূর্য্য-রূপে) আকাশে। যুদ্ধে যেরূপ (উভয় পক্ষের) ধ্বজ মিলিত হয়, সেইরূপ (উক্ত উভয় জ্যোতি) পরস্পর সংযুক্ত হয়" (১।১০৩।১)।

কুৎস ঋষির চিন্তা প্রভাবে ও ঔদার্য্য গুণে ইন্দ্র অগ্নির সহিত, অগ্নি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। বজ্রের ভীষণ নিনাদে, বৃষ্টির অজস্র বর্ষণে, সূর্য্যের প্রখর কিরণে, নক্ষত্রের বিমল জ্যোতিতে আমরা যে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন পুরুষের অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, তাঁহাকে ইন্দ্রও বলিতে পার, অগ্নিও বলিতে পার। কুৎসের অন্তঃ-করণে যখনি এই অত্যুচ্চ উদার ভাবের প্রথম আবির্ভাব হইল, যখনি সব্যের ইন্দ্র ও পরা-শরের অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে মিলিত হইলেন, তখনি তিনি স্তম্ভিত অন্তরে বিমুগ্ধ হৃদয়ে বিদ্যুতের উজ্জ্বল জ্যোতির সহিত বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ মিশ্রিত করিয়া বলিয়া উঠি-লেন "হে ইন্দ্র-অগ্নি! তোমরা তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছ" (১।১০৮।৮) এবং এই একীভূত দেবদ্বয়ের কতকগুলি স্তোত্র রচনা করিলেন (১।১০৮ ও ১০৯ সূক্ত)।

দীর্ঘতমাও অগ্নির উপাসক। অগ্নি তাঁহাকে দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অগ্নি তাঁহার অন্ধত্ব দূর করিয়াছিলেন। কুৎস ঋষির পরে দীর্ঘতমাই প্রধান। তাঁহার চিন্তাশক্তির পরিচয় বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসময়ের প্রধান প্রশ্নের দ্বারা ঋষি-গণের চিন্তাশক্তি যে সবিশেষ আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘতমা বলিতেছেন "প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছিল, যখন অস্থি-রহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল? ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? আমি অপক্কমতি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সকল সন্দেহ পদ দেবতার নিকটও নিগূঢ়। * * আমি অজ্ঞান, কিছু না জানিয়াই জ্ঞানী মেধাবিগণের নিকট জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি এই ছয় লোকের স্তম্ভন করিয়াছেন,তিনি কি সেই এক, যিনি জন্মরহিতরূপে নিবাস করেন?" (১।১৬৪।৪-৬)। সেই একই সূক্তে স্বীয় উপাস্য দেব আদিত্যরূপ অগ্নিকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "(এই আদিত্যকে) মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন * * ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইঁহাকে অগ্নি যম, মাত-রিশ্বা বলে।" (১।১৬৪।৪৬) দীর্ঘতমা আদিত্য-রূপী অগ্নিকে কেবল মাত্র ইন্দ্র বলিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে বরুণ, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বলিয়াছেন, তিনি এক হইয়াও বহু-রূপে বর্ণিত।

অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রকে প্রধান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সমস্যাকে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "দ্যু ও পৃথিবী ইহাদের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হই-য়াছেন? হে কবিগণ! এ কথা কে জানে? ইহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগত ধারণ করেন" (১।১৮৫।১)। জগতাধার দিকের প্রথম অনুভব এই ঋকে পাওয়া যায়। অগস্ত্য বলেন, সমস্ত দেবগণ দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র (১।১৮৫।৪) দ্যাবা পৃথিবী তাহাদের পিতা মাতা। অগস্ত্য সমস্ত দিক্‌কে একাধারে

পরিণত করিতে পারেন নাই এবং এই আধার দিকেতে উৎপাদিকা শক্তির আরোপ করিয়াছেন। প্রজাপতি এই দুইটী ভ্রমসংশোধন করিয়া ঋষিদিগের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের গৃৎসমদ ঋষি দীর্ঘতমার পথ অনুসরণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে এক করিয়াছেন। "হে অগ্নি! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কার যোগ্য, তুমি রাজা বরুণ, তুমি মিত্র, তুমি অর্য্যমা, তুমি ত্বষ্টা" (২।১ সমস্তসূক্ত)। এই সকল স্তোত্র পাঠ করিলে সহজেই বোধ হয় যে, গৃৎসমদ ঋষিও তৎসাময়িক সমস্যা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশজাত ঋষিগণ অগ্নিকেই প্রধান করিয়াছেন। ৩৩৩৯ সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন (৩।৯।৯)। "যে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্ব্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান্, তিনি স্তবকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করাইয়া পারে লইয়া যাউন" (৩।২০।৪) অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ, চেতনবান (৩।২৫।১) ও জগৎপতি (৩।২৫।৩)।

তৃতীয় মণ্ডলের প্রজাপতি ঋষি তৎসাময়িক সমস্যার বিশদ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। প্রজাপতি অগস্ত্যের দ্যাবা পৃথিবীকে, দ্বিখণ্ডিত দিক্‌কে একাধারে পরিণত করিলেন। "সমান কর্ম্মবিশিষ্টা, বিযুক্তা, দূরসীমাযুক্তা ও বিনাশরহিতা (দ্যাবা পৃথিবী) জাগরণশীল হইয়া অবিনাশীপদে (অন্তরীক্ষে) নিত্যতরুণা ভগ্নিদ্বয়ের ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরকে মিথুন নামে ডাকিয়া থাকেন।" (৩।৫৪।৭)। "তাঁহারা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত করিয়া রাখেন এবং মহৎ দেবগণকে ধারণ করিয়াও ব্যথা প্রাপ্ত হন না। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকলই এক (আধারে) অবস্থিতি করে, সমস্ত পশু পক্ষী তথায় রহিয়াছে" (১।৫৪।৮)। এই বিস্তীর্ণ একাধারকেই পরবর্ত্তী সময়ের দর্শনকারগণ দিক্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাপক আধার যে এক, এবং ইহার দুই প্রকাণ্ড অংশ (দ্যাবা পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ) যে মিথুনের ন্যায় পরস্পর সম্বদ্ধ, এই ধারণা হইতেই এক বিশ্বেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়। কি প্রকারে ঋষিগণ ক্রমশঃ এই বিশ্বকে এক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এইখানেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই। প্রজাপতি বলেন, এই "চঞ্চল লোকত্রয় উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুইটি (স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ) গুহায় নিহিত (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য) একটি (পৃথিবী) দেখিতে পারা যায়।" (৩।৫৬।২)।

একদিকে বিশ্বের সমস্ত আধারকে যেমন এক করিলেন, তিন লোককে যেমন একাধারে অবস্থিত করিলেন, অপরদিকে তেমনি সমস্ত বিশ্বদেবগণকে এক শক্তিতে পরিণত করিলেন। তাঁহার রচিত (৩।৫৫) সূক্তে ২২টি ঋকের প্রত্যেকটির শেষে বলিয়াছেন "দেবগণের মহৎবল একই।" একই শক্তি তেজরূপে উত্তাপ দিতেছেন, জলরূপে শীতল করিতেছেন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি সৃজন করিয়াছেন। প্রজাপতি সমস্ত বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "দেবগণের মহৎবল একই"। যে শক্তি অগ্নিরূপে সূর্য্যে ও বেদিতে (৩।৫৫।১—৪); যে শক্তি ওষধিগণকে উৎপাদন করেন (৫); যাহা ইন্দ্ররূপে "অনন্ত শব্দ করেন ও জল বর্ষণ করেন" (১৭); "যিনি বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন" (১৯); তিনি মহতী পরস্পর সঙ্গত দ্যাবা

পৃথিবীকে যুক্ত করিয়াছেন" (২০); "সেই বিশ্বধাতা আমাদের রাজা, এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন" (২১)।

পরাশর স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, একই শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া এই বিশাল বিশ্ব একই আধারে অবস্থান করিতেছে। আধার এক, তিন পরস্পর সঙ্গতলোকে একই বিশ্ব, এবং উৎপাদক শক্তিও এক। সেই "ত্রি-মাতা (অর্থাৎ তিনলোকের নির্ম্মাতা) সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট" (১।৫৬।৫)। তাঁহারই যজ্ঞ ও উপাসনা কর। দেবগণ যে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সে মহৎ কর্ম্মের প্রভাবে। "হে কবি দেবগণ! তোমাদের সেই মহৎকর্ম্ম মনোহর, যে কর্ম্মের দ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্র (লোকে) দেবত্ব লাভ করিয়াছ" (৩।৫৪।১৭)। বৈদিক জগতে সকলের পূর্ব্বে, আর্য্যজগতে সকলের পূর্ব্বে, সাহিত্য জগতে সকলের পূর্ব্বে, প্রজাপতি যে মীমাংসা করিলেন, অদ্যাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাই সমর্থন করিতে ব্যস্ত।

চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব ঋষি সমস্ত পদার্থের এই একাধার অর্থাৎ দিক্ যে অসীম, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিশ্ব সংসারের আধারকে অসীম বলিয়া উপলব্ধি হইলে বিশ্বব্যাপক ত্রিমাতাও অসীম হয়েন "পূর্ব্ব প্রভৃতি দিকের সীমা কি? পদার্থজ্ঞান কি? এবং অভিলষণীয় (পদার্থ সমূহ) কি? শীঘ্রগামী (অশ্ব) যেরূপ সংগ্রামাভিমুখে গমন করে, আমরা সেইরূপ (এই সকল) অবগত হইব।" (৪।৫।১৩)। দিকের সীমা ও অনন্তদিগ্‌ব্যাপী পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান, এবং মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? ইহা জানিতে বামদেব ব্যগ্র হইয়াছেন। অনন্তদিগ্‌ব্যাপী যিনিই হউন, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন, "তোমার তেজ সমুদ্র মধ্যেই থাকুক, হৃদয় মধ্যেই থাকুক, আয়ুতেই থাকুক, জল সমূহেতেই থাকুক, সমস্ত বিশ্ব উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।" (৪।৫৮।১১)।

পঞ্চম মণ্ডলের ঋষিদিগের নিকট আমরা বিশেষ নূতন কিছুই প্রাপ্ত হই না। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রাধান্য বিচার উপস্থিত হইলে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ঋষিগণই তাহার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋষিগণ ইন্দ্র ও অগ্নির একটিকে প্রধান বলিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দেবের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। সাধারণ আর্য্যগণ কি করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে সব্য ঋষির পূর্ব্বে যেমন অনেকে ইন্দ্রের সম্বন্ধ সন্দেহ করিতেন, পরেও তদ্রূপ অনেক লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সম্বরণ ঋষি বলিয়াছেন, "হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগের হইতে বিভিন্ন এবং যাহারা তোমার সংশ্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাব হেতু তাহারা তোমার নহে" (৫।৩৩।৩)।

ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নির উপাসক। অগ্নিই "সৃষ্টিকারক ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী" (৬।১৬।৩)। অগ্নিই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষি সেই অগ্নির যজ্ঞ করিয়া আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে ব্যগ্র। "হে বৈশ্বানর অগ্নি! (ত্বদীয় গুণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত) আমার কর্ণদ্বয় ও (ত্বদীয় রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত) আমার চক্ষু বাধিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধি স্বরূপ) জ্যোতি নিহিত আছে, তাহা ত্বদীয় স্বরূপ অবগত হইবার জন্য (সমুৎসুক হইয়াছে)। দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা-ব্যাপৃত

আমার হৃদয় (তাঁহার অভিমুখে) ধাবিত হইতেছে। আমি বৈশ্বানরের স্বরূপ কিরূপে বর্ণনা করিব? কিরূপেই বা তাহা হৃদয়ে ধারণ করিব?” (৬।৯।৬)।

ইন্দ্রের স্তবও তিনি অনেক রচনা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের মনে ইন্দ্রের প্রতি যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন “হে ইন্দ্র! তোমার তাদৃশ বীর্য্য আছে কি?” (৬।১৮।৩) এবং নিজের মত স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—“তোমার তাদৃশ প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি।” (৬।১৮।৪)।

পরে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কে একত্র স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন “হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্ম-মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়, তৎসমুদয় যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদিগের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভয়ে জমজভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।” (৬।৫৯।২)। এই প্রচলিত মত কে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয়, তিনি প্রজাপতির মতই উল্লেখ করিতেছেন। যাহা হউক, এই প্রশংসনীয় মতের গুরুত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। ইহার প্রচলন হইতে অগ্নি প্রধান, কি ইন্দ্র প্রধান, প্রতিভাসম্পন্ন ঋষিদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন আর থাকিল না। অগ্নিকে প্রধান করিয়া ইন্দ্রকে তাহার অন্তর্ভূত করিলে, কিম্বা ইন্দ্রকে প্রধান করিয়া অগ্নিকে তাহার অন্তর্ভূত করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের ঋষি তত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারিতেন না। যখন ইন্দ্র ও অগ্নির উপরে এক পরমপুরুষকে অবগত হইলেন, তখন তাহাদের বিবাদ মীমাংসা হইয়া গেল। এই “সর্ব্বত্র বিদ্যমান” “ত্রিমাতা” কে? প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রশংসনীয় প্রচলিত মতের তাৎপর্য্য এই যে, সেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান পুরুষকে প্রচলিত কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যদেব বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার প্রকৃত প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কর। কি প্রকারে তাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত দেবমানব উৎপন্ন হইল, তাহাই চিন্তা কর। উপাস্যের নাম কি হইবে, তাহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন কি? আইস আমরা, উভয় সম্প্রদায়ের ঋষিগণ একত্র হইয়া, সেই ইন্দ্র ও অগ্নির, তেজ ও জলের পরস্পর সম্বন্ধ তিনলোকের নির্ম্মাতার, প্রজাপতির সেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান ত্রি-মাতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী সময়ের জন্য, সমস্ত আর্য্যজগতের জন্য, সমস্ত মানব জগতের জন্য এই গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইল—এই অসীম বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান পুরুষ কে?

২। প্রার্থনার বিষয়, স্বর্গ, পাপবোধ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

গোতম প্রার্থনা করিতেছেন—“সোম! আমাদিগকে অভিশাপ হইতে রক্ষা কর ও পাপ হইতে রক্ষা কর।” (১।৯১।১৫)। এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে, গোতমের সময় হইতেই লোক সোমের বশীভূত হইয়া অভিশাপ ও পাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি দেবতাদিগকে অমর ও মনুষ্যদিগকে মরণশীল বলিয়াছেন।

কুৎস ঋষি, অগ্নির স্তোত্র সমূহের মধ্যে পাপ বিনাশের প্রার্থনার জন্য একটি সূক্ত (১।৯৭) রচনা করিয়াছেন। এই সূক্তে আটটি ঋক্ আছে, তন্মধ্যে নয়বার এই প্রার্থনা করা হইয়াছে “আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক”।

কশ্যপ ঋষি বলিতেছেন, "যেরূপ নৌকা-দ্বারা নদী পার করা হয়, সেইরূপ তিনি (সর্ব্ব ভূতজ্ঞ অগ্নি) আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ পার করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপসমূহ পার করাইয়া দিন।" (১৷৯৯৷১)।

অগস্ত্যঋষি দ্যাবা পৃথিবীকে সমস্ত দেবগণের উৎপাদক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; অতএব তিনি তাহাদের নিকট ৬বার প্রার্থনা করিয়াছেন—"আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর" (১৷১৮৫৷২—৮)

দ্বিতীয় মণ্ডলের গৃৎসমদ বলিতেছেন—"হে বরুণ, আমার পাপ রজ্জু (আমাকে বান্ধিয়াছে) তাহা মোচন কর।" (২৷২৮৷৫)। "বৎস হইতে রজ্জুর ন্যায় আমাদিগের হইতে পাপ মোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক্ হইয়া কেহ নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারে না" অর্থাৎ মনের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। (২৷২৮৷৬)

তৃতীয় মণ্ডলের গাথী ঋষি বলিতেছেন-"যে অগ্নি মনুষ্যও দেবগণের নিয়ামক, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করাইয়া পারে লইয়া যাউন।" (৩৷২০৷৪)। বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা দুই জনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর, অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গীয় মঙ্গলরূপ(শ্রেয়ঃ)প্রদান কর"। (৩৷৩৮৷৯)।

প্রজাপতি বলিতেছেন—"হে কবি দেবগণ, তোমাদের সেই মহৎ কর্ম্ম মনোহর, যে কর্ম্মের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রলোকে) দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।" (৩৷৮৪৷১৭)।

চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব ঋষি বলিতেছেন, "উষা আমাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করুন।" (৪৷৩৯৷১) "অদিতি, মিত্র ও বরুণের সহিত, স্তোতাকে নিষ্পাপ করুন।" (৪৷৩৯৷৩)। আরো বলিতেছেন—"হে সবিতা দেব! আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ অথবা দুর্ব্বল বা বলশালী লোকদিগের (প্রমাদ) বশতঃ, অথবা ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব বা পরিজনের গর্ব্ববশতঃ, তোমারপ্রতি—দেব ও মনুষ্যগণের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছি, (তুমি তাহা হইতে) এই যজ্ঞে আমাদিগকে নিষ্পাপ কর"।" (৪৷৫৪৷৩)।

পঞ্চম মণ্ডলের সময় হইতেই আর্য্য সমাজ বোধ হয় পাপের বিষময় ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গয়ঋষি বলিতেছেন, "হে অগ্নি! তুমি সকলের মিত্রস্বরূপ, তোমার রক্ষা দ্বারা এবং তোমাকে স্তব করিয়া মর্ত্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইব।" (৫৷৯৷৬)। দ্বিতঋষি যজ্ঞকে স্বর্গ সাধনের উপায়ভূত বলিয়াছেন। (৫৷১৮৷৪)। অবস্যু ঋষি বলিয়াছেন—"হে অমর ইন্দ্র! যে সকল লোক ধনলাভার্থ ব্যগ্রতার সহিত তোমাকে কামনা করে, তাহারা যেন পাপে পতিত না হয়।" (৫৷৩১৷১৩)। বাতহব্য বলিতেছেন—"হে মিত্র ও বরুণ! আমরা যেন তোমাদের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে (অর্থাৎ স্বর্গে) গমন করিতে পারি।"(৫৷৬৬৷৬)। যজত বলিতেছেন, মিত্র ও বরুণ "প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন। এমন কি তাহারা পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও প্রভূত দান করেন।" (৫৷৬৭৷৪)।

অত্রিঋষি বলিতেছেন "হে বরুণ! যদি আমরা কখনও কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য ভ্রাতার নিকট, প্রতিবেশী বা মূকের(অনার্য্য) প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে পাপ বিনষ্ট কর"।" (৫৷৮৫৷৭) "হে দেব বরুণ! দ্যুতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশ ক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞান পূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতঃ (অপরাধ করি) তাহা হইলে

তুমি শিথিল (বন্ধনের) ন্যায় তৎসমুদয় হইতে মুক্ত কর; তাহা হইলে আমরা তোমার স্নেহ-ভাজন হইব।” (৫।৮৫।৮)। ভরদ্বাজ ঋষিও বলিয়াছেন “হে অগ্নি! আমরা যেন শত্রুবৎ পাপ হইতে মুক্ত হই” (৬।১১।৬)।

ঋজিশ্বা ঋষি বলিতেছেন “যিনি তিনটি জ্ঞাতব্য (ভুবন) অবগত আছেন; যিনি জ্ঞান-শালী ও দেবগণের দুর্জ্ঞেয় জন্ম বিদিত আছেন, সেই সূর্য্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের পরিদর্শন করিতেছেন এবং প্রভু হইয়া মনুষ্যগণের সঙ্গত মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন। (৬।৫১।২)। সমাজের অবস্থা বোধ হয় এতই শোচনীয় হইতেছিল যে, ঋষিদিগেরও ভয় হইয়াছিল পাছে তাহারা অন্যের পাপের জন্য কষ্টভোগ করেন। “হে দেবগণ! আমরা তোমাদেরই। আমরা যেন অন্যকৃত পাপ নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বসুগণ! তোমরা যাহা নিষেধ কর, আমরা যেন তাহার অনুষ্ঠান না করি” (৬।৫১।৭)। “হে বিশ্ব দেবগণ! নমস্কারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করিতেছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এজন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করিতেছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত; আমি নমস্কারের দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি” (৬।৫১।৮)। “হে যজ্ঞার্হ দেবগণ! আমি নমস্কার সহকারে সকলের নিকট প্রণত হইতেছি” (৬।৫১।৯) “তোমরা আমাদিগের দেহ বল ও বাক্যের চালকস্বরূপ” (৬।৫১।৬)। “হে দেবগণ! ভর-দ্বাজ গোত্রজ (এই ব্যক্তি) যেন সত্ব একটি বসতি লাভ করে, কারণ সে ব্যক্তি তোমাদের অনুগ্রহার্থী” (৬।৫১।১১)।

এই প্রকরণে উদ্ধৃত স্তোত্রগুলি আলো-চনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, (১) স্বকৃত ও অন্যকৃত পাপের জন্য ঋষিদের হৃদয়ে ক্লেশ অনুভূত হইয়াছিল। (২) মনুষ্যের পুণ্য পথ অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পথ বরুণ অথবা অন্য দেব কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা যে এক, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হই-তেছিল। (৩) পাপ আমাদের শত্রু, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (৪) দেবগণের নমস্কার অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। (৫) মনুষ্যের গন্তব্যস্থান স্বর্গ, দেবগণের অনুগ্রহ হইলে আমরা স্বর্গে যাইতে পারি। পাপমুক্ত হইলে আমরা দেবগণের স্নেহভাজন হই। দেবগণই আমাদিগকে পাপমুক্ত করিতে পারেন। ঋগ্বে-দের প্রথম হইতে ষষ্ঠ মণ্ডল পর্য্যন্ত ভরদ্বাজ-গোত্রজ ঋজিশ্বা ঋষিই পাপ, পাপের প্রায়-শ্চিত্ত এবং স্বর্গলাভের উপায় সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাষায় বলিতে গেলে, ঋজিশ্বাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি-বিজ্ঞানবিদ্।

৩। জীবাত্মা।

দীর্ঘতমা ঋষি প্রথম জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করেন, অতএব এপর্য্যন্ত তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আত্মতত্ত্ববিদ্। “ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত। কিন্তু আত্মা কোথা হইতে?” (১।১৬৪।৪)। “দুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে। তাহাদিগের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অন্য ভক্ষণ করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে।”(১।১৬৪।২০)। সায়নাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন যে, এই দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল মাত্র অবলোকন করেন। জীবাত্মা সম্বন্ধে দীর্ঘতমা আরো বলিতেছেন “আমি এই কি না, তাহা আমি জানি না। কারণ আমি মূঢ়চিত্ত, সম্যক্ বদ্ধ

হইয়া (বিক্ষিপ্ত) মনে বিচরণ করি। জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই আমি বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি। নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করে, অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া উহা কখন অধোদেশে কখন ঊর্দ্ধ-দেশে গমন করিতেছে। উহারা সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, (ইহলোকে) সর্ব্বত্র একত্র গমন করে, (পরলোকেও) সর্ব্বত্র একত্র গমন করে। লোকে ইহাদিগের এক-টিকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না।” (১।১৬৪।৩৭-৩৮)

তৃতীয় কাল।

পাপের প্রবলতা ও চিন্তার মলিনতা।

সপ্তম মণ্ডল হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত আমরা দুই একবার এই গুরুতর প্রশ্নের উল্লেখ পাই বটে, কিন্তু কোন বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার দেখিতে পাই না। সপ্তম মণ্ডলের বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, দেবগণ “জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন” (৭।৩৪।২) অর্থাৎ মনুষ্যের সেই জ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা। “কেহই মরুৎগণের জন্ম জানেন না। তাহারাই পরস্পর আপনাদের জন্মকথা জানেন।” (৭।৫৬।২)। “হে দেব (বিষ্ণু)! তুমিই কেবল পরলোক অবগত আছ।” (৭।৯৯।১)। অষ্টম মণ্ডলের নাভাকঋষি বলিতেছেন “অগ্নি দেবগণের জন্ম কথা জানেন, অগ্নি মনুষ্যের গুহ্য বিষয় জানেন।” (৮।৩৯।৬)। দেবগণের জন্মকথা, বিশ্বের উৎপত্তিতত্ত্ব যে অতীব নিগূঢ়, তাহাই ইঁহারা বলিয়া গিয়াছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রবল পাপের বিস্তার দেখিয়া ঋষিগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, হয়ত কোন মহাপাপে সেই দেবাদিদেব সর্ব্বত্র বিদ্যমান পুরুষকে অবগত হইতে পারিতেছেন না। সমস্ত ৭ম মণ্ডলে আমরা বারম্বার পাপ হইতে আমাদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা শুনিতে পাই। এবং ২টী সম্পূর্ণ সূক্ত তদ্রূপ প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। বশিষ্ঠ ঋষি পাপের অনুতাপে বিদগ্ধ হইয়া বলি-তেছেন “আমি সুমনা হইয়া কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখিতে পাইব? হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান্‌জনগণের নিকট গিয়াছি। তাঁহারা সকলেই আমাকে এক রূপ বলিয়াছেন— এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। হে বরুণ! আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? হে দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বিন্! আমাকে তাহা বল, যাহাতে আমি ত্বরাবান্ হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করিতে পারি।” (৭।৮৬।২-৪)। ঋষি বুঝিতে পারেন না, তিনি কোন্ পাপ করিয়াছেন। সমাজের পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, কি প্রকারে বুঝি-বেন? যখন সমস্ত সমাজে কোন পাপের প্রভুত্ব প্রবল থাকে, তখন সহজে তাহাকে পাপ বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু ঋষির চক্ষু আর কত দিন মুদ্রিত থাকিতে পারে? হঠাৎ তাহার হৃদয়ে আলোক প্রবেশ করিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন “হে বরুণ! সে পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম বা সুরা, বা মন্যু, বা দ্যূতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটি-য়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়।” (৭।৮৬।৬)। সমাজের পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবেই, “সে নিজের দোষ নহে, অতএব হে বরুণ! দয়া কর, দয়া কর।” (৭।৮৯।১—৪)। “অপ-রাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন, * * আম-রা যেন তাঁহার নিকট অনপরাধী হই।” (৭।

৮৭।৭) "হে বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন ভোগ না করি" (৭।৮৮।৬)এই বশিষ্ঠ ঋষি অহিংসা ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। হে বাস্তোস্পতি "তুমি দ্বিপদজনের ও চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও" (৭।৫৪। ১)। "হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা মনোরথ পূর্ণকরতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।" (৭।৩৪।৮)।

অষ্টম মণ্ডলে বিশেষ কিছু সত্য পাওয়া যায় না এবং নবম মণ্ডলে কিছু না পাওয়ারই কথা।

নবম মণ্ডল যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত,তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে সোমরসের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু সোমপানে ঋষিগণের কিম্বা সাধারণের তদ্রূপ প্রমত্ততার উল্লেখ দেখা যায় না। মুসলমান রাজত্বের পরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য মদিরা আনীত হইয়া, পরে সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইলে, এতদ্দেশের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, বৈদিক সমাজে সুমধুর সোমরসের প্রভূত প্রচলন হইয়া তাহার অবস্থা কি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া মাতালগণ যেরূপ মদের মহিমা সঙ্গীত করেন, তখনও কবিগণ তদ্রূপ সোমপানে প্রমত্ত হইয়া তাহারই গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সমস্ত নবম মণ্ডলই শুদ্ধ সোম-উপাসনা। সোমরসের "তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই।" (৯।৬৭।১৮)। সোমরসের যে সামান্য মাদকতা ছিল,তাহা মনে করিবেন না; "যে তোমাকে পান করে,তাহার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয়, তাহা হইলে সাধ্য নাই যে তোমাকে ধারণ করে।" ৯।৮৩।১)। এমন কি "ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন।" (৯।১০৪।২)। তবে দেবতারা বিশেষ বলশালী বলিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সন্তানদিগকেও পান করিতে দেন। (৯।৮৬।৪)।

মদ্যপানে সমাজে যে সমস্ত দুর্নীতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমরা এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিতেছি। বৈদিক সমাজেও সোমপানে তদ্রূপ জঘন্য দুর্নীতি সকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বহুবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। (৯।৮৯।৪)। এমন কি কবি সপত্নী বশীভূত করিবার মন্ত্রের জন্য সূক্ত রচনা করিয়াছেন। (১০।১৪৫ ও ১০।১৫৯)। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায় (৯।৯৬। ২২-২৩) এবং কবি স্বয়ং সোমের নিকট সুশ্রী স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন (৯।৬৭।১১-১২)। ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ অশ্লীল উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন এবং অনেকে অশ্লীল অপাঠ্য ঋক্ রচনা করিয়াছেন (৯।১১২।৪; ১০।১১; ১০।৩০।৬; ১০।৩৪।৫; ১০।৮৬।৬ ও ১৬)। অনেক আর্য্যজাতীয় লোকও দেবরহিত হইয়া পড়িয়াছেন (১০।৩৮।৩)। বাস্তবিক সমাজের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, কবি প্রসিদ্ধ যম যমীর কথোপকথনচ্ছলে ভগ্নী সহবাসের জঘন্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ভ্রাতাগণের সম্মুখে একটি প্রবল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন (১০।১০। সমস্ত)।

অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে দুই এক বার পাওয়া যায় সত্য,কিন্তু সোমপানের সহচর হইয়া দ্যূতক্রীড়া কি বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার সুন্দর বর্ণনা আমরা ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে প্রাপ্ত হই। "সোমরস

যেমন প্রীতিকর, অক্ষও তেমনি প্রীতিকর" (১০।৩৪।১)। "কেবল মাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম" (১০।৩৪।২)। যখন ঋষিরই এই অবস্থা,তখন সাধারণ লোকের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। "পাশক্রীড়ায় পত্নী ব্যভিচারিণী হন" (১০।৩৪।৪)। "দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে; পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে ভাবিয়া তাহার মাতা ব্যাকুল" (১০।৩৪।১০)। "সে হয় ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনা পূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচ লোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নিসেবা করিতে হয়, (অর্থাৎ গাত্রের বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে না)।" (১০।৩৪।১১) "যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোকও কেহ নাই" (১০।৩৪।৩)। "পাশা কখনও খেলিও না, বরং কৃষিকার্য্য কর, তাহাতে যে লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও, ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর" (১০।৩৪।১৩)।

নবম মণ্ডল ও দশম মণ্ডলের প্রথমাংশে বর্ণিত বৈদিক সমাজের এই অবস্থা যে এক দিনে হইয়াছিল,তাহা নহে। সোমপান, দ্যূতক্রীড়া ও ইন্দ্রিয়াসক্তি একদিনে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয় নাই। ক্রমশঃ আর্য্যগণের রাজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। পঞ্চনদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে পঞ্চ জনপদ স্থাপিত হইল। আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতে লাগিল। অনার্য্যদিগের রাজ্য জয় করিয়া আর্য্যগণ তাহাদের গো,অশ্ব,শস্যক্ষেত্রাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে ইন্দ্রের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "শত্রু জয় কর" "শত্রুর ধন আমাদিগকে আনিয়া দাও"। অর্থজনিত সুখভোগ করিয়া ক্রমশঃ অর্থলালসা প্রবল হইতে লাগিল এবং অর্থের সহচর পাপ সকল আসিয়া দেখা দিল। ঋষিগণ যে আর্য্য সমাজের ভবিষ্যৎ দুর্গতি অনুমান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন,তাহা নহে। পঞ্চম মণ্ডলের অবস্যু ঋষি ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে অমর ইন্দ্র! যে সকল লোক ব্যগ্রতার সহিত ধনলাভার্থ তোমাকে কামনা করে, তাহারা যেন পাপে পতিত না হয়।" (৫।৩১।৩)।

নবম মণ্ডল ও দশম মণ্ডল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমূহ অপেক্ষা অনেক পরবর্ত্তী সময় সম্বন্ধীয়। দশম মণ্ডলে আমরা আর পঞ্চনদীর কথা শুনিতে পাই না,এখন ঋষিগণ "প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যক প্রকাণ্ড নদী" দেখিতেছেন (১০।৬৪।৮; ৭৫।১; ৭৫।৫)। "হে ইন্দ্র তুমি দেব ও মনুষ্যের উপকারার্থে নবনবতী নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ।" (১০।১০৪।৮)। দস্যু ও অনার্য্যদিগের সহিত বহুসংখ্যক যুদ্ধের কথা আমরা শুনিতে পাই (১০।৪৯)। ইন্দ্র বলিতেছেন "নবনবতীনগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি"(১০।৪৯।৮)। পূর্ব্বে গো বৃষ ইত্যাদির সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত আর্য্যদের অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং সকল দেবতার নিকট আমাদিগকে "গাভী দাও, গাভী দাও" বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। এখন গো বৃষের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আমরা মধ্যে মধ্যে আহারের জন্য গো-হত্যার কথা শুনিতে পাই। বিংশতি বৃষ পাক করিয়া ইন্দ্রাণীর পূজা হইয়া থাকে এবং গোহত্যার জন্য পৃথক্ স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১০।৮৯।১৪)। হরিণ, বরাহ, শৃগাল, গাধা, সর্প ইত্যাদি জন্তুর সঙ্গে আর্য্যদের পরিচয় হইয়াছে। এমন কি,

সিংহ "পিঞ্জর বদ্ধ" হইয়া লোকের আনন্দ প্রদান করিতেছে (১০।২৮।১০) এবং "মত্ত হস্তী" পর্য্যন্ত "অঙ্কুশতাড়িত" হইয়া শত্রুবধ করিতেছে। (১০।১০৬।৬)। ভাবী আধ্যাত্মিক অবনতির মূলস্বরূপ দেবমূর্ত্তির উল্লেখ (১০।১৩০।৩) ও বিচিত্র দেবমন্দিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১০।১০৭।১০)।

সমাজের ঈদৃশ দুরবস্থার সময়ে বিশেষ কোন গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার হইবে আশা করা যায় না। যখন ঋষিগণ স্বয়ংই সোমগুণগানে রত এবং দ্যূতক্রীড়ায় আত্মবিস্মৃত, তখন সত্য আর কে আবিষ্কার করিবে? নবম মণ্ডলের একেবারে শেষ অংশে আমরা স্বর্গের একটি সংক্ষেপ বর্ণনা প্রাপ্ত হই। তাহাও ঋষিদের আধ্যাত্মিক অবনতির বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। ঋষিগণ ইহসংসারে বহুবিধ ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া স্বর্গে সমস্ত বাসনা ও কল্পনা চরিতার্থ হইবে, আশা করিতেছেন। "যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক যেস্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল (সোম)! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যে স্থানে বৈবস্বত (যম) রাজা আছে, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যেস্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ননামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।" (৯। ১১৩।৭-১১)।

চতুর্থ কাল।

প্রতিক্রিয়া ও আধ্যাত্মিকতার পুনরুদ্ভব।

এই সময়ে আমরা বহুবিধ উচ্চতর তত্ত্বের আবিষ্কার দেখিতে পাই। এই সময় হইতে ঋষিদিগের চিন্তা-প্রভা পুনরায় স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছিলেন, অগ্নি ও ইন্দ্রের একই জনক, যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সপ্তম মণ্ডলের নাভাক ঋষি এই একই প্রশ্ন একটু ভাষান্তরিত করিয়া তাহাকে দেবগণের জন্মকথা ও মনুষ্যের গুহ্য বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাশালী ঋষিগণ এই প্রশ্নের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে শুদ্ধ দেবগণের জন্মকথা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন এবং দেবগণের জন্ম সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা প্রচার করিলেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তদ্রূপ কল্পনাকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার শ্রেণীভুক্ত করা গেল। সুতরাং সেইগুলি সমুদায় উল্লেখ না করিয়া দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করা গেল।

দেবগণের জন্মকথা।—(ক) একজন ঋষি স্পষ্টই এই বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন, "দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট কহা যাইতেছে। * * দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমান উৎপন্ন হইল। দেবোৎপত্তির পূর্ব্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ হইতে দিক্ সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন * * * অদিতির পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন।

ইহারা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী। * * দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্র তুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য্য নিগূঢ় ছিলেন। দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন। অদিতির দেহ হইতে ৮ পুত্র জন্মিয়াছিলেন, সূর্য্য তন্মধ্যে সাতটি লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্ত্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্ত্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।" (১০।৭২)।

(খ) আমরা পূর্ব্বে আর একটি কল্পনার উল্লেখ করিয়াছি। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, দেবগণ সৎকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মতটী একেবারে অগ্রাহ্য হইয়াছিল না। "এই মরুৎগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্য দ্বারা দেবতা হইয়াছেন।" (১০।৭৭।২)। কোন কোন ঋষি নিজেও দেবতা হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন "আমরা যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই।"(১০।৬৩।১০)। "পিতৃলোক সৎকর্ম্ম প্রভাবে এখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" (১০।১৫।১০)। দেবতারা "লোকের নিকট পূজা পাইবার জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদিগকে দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন * * তাঁহারা নিষ্পাপ; তাঁহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।" (১০।৬৩।৪)।

(গ) আর এক কল্পনা বিখ্যাত পুরুষ সূক্তে দেওয়া আছে (১০।৯০)।"পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ।* যাহা হইয়াছে,অথবা যাহা হইবেক,সকলই সেই পুরুষ। * * তাহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, সেই বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন।" এই পুরুষ হইতে জাতি সকল, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, ভূমি, দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল।

(ঘ) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছিলেন, এক আদিত্যকেই মেধাবিগণ ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বহু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছিলেন, এক অগ্নিকেই লোকে ইন্দ্র বরুণ বায়ু প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করে। এই কল্পনাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল না। দশম মণ্ডলের একঋষি বলিতেছেন"এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে, * * পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে কল্পনা পূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।" (১০।১১৪।৪-৫)

দীর্ঘতমা, প্রজাপতি, ভরদ্বাজ ও নাভাক প্রভৃতি ঋষিগণের গূঢ় প্রশ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য যাহারা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। দশম মণ্ডলের এই প্রতিভাশালী ঋষিগণের নাম পাওয়া দুষ্কর, কারণ প্রায়শঃ তাহারা সূক্তের দেবতার নাম ও ঋষির নাম এক করিয়াছেন।

১। বিশ্বের আদিকারণ ও বিশ্বের উৎপত্তি।

দশম মণ্ডলের প্রথমভাগস্থ কবয় ঋষি প্রথমতঃ প্রশ্নটি পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

(ক) "সেই বনই বা কি, সেই বৃক্ষ (অর্থাৎ সমবায় অথবা উপাদান কারণ)ই বা কি,যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে?" (১০।৩১।৭)। তাঁহার পরবর্ত্তী বিশ্বকর্ম্মা নামধারী এক ঋষিও প্রশ্নটি এই ভাষায় পুন-

রুল্লেখ করিয়াছেন "সে কোন্ বন,সে কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ, যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে?" (১০।৮১।৪)।

কবয় ঋষি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ইহারাই শেষ নহেন, ইহাদের উপর আরো এক আছেন, তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই,সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র শরীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। "অর্থাৎ তিনি অনাদি স্বয়ম্ভূ এবং পবিত্র (১০। ৩১।৮)। তাঁহার পরবর্ত্তী এক ঋষি বলিয়াছেন, হিরণ্য গর্ভ অথবা প্রজাপতি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন,তিনিই আদি (১০।১২১)।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,এই অনাদি পুরুষ কি প্রকারে এই দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিলেন। ইহারা কোন বৃক্ষে অর্থাৎ কোন্ উপাদানে সৃষ্টি হইল?

বিশ্বকর্ম্মা নামধারী ঋষি বলিয়াছেন "সেই সুধীর পিতা (বিশ্বকর্ম্মা) উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি (অর্থাৎ আকাশাকৃতি—আকাশকে ঋগ্বেদের অনেক স্থলে জল ও সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে) পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন। * * বিশ্বকর্ম্মা যিনি তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকল অবলোকন করেন। ** যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।" (১০।৮২।১-৩)। এই ঋষি আরো বলিতেছেন যে "স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর ঋষিগণ (অর্থাৎ যাঁহারা শেষে দেবতা হইয়াছেন) এই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন" (১০।৮২।৪)। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে,বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে আলোচনা করিয়া অর্থাৎ স্বীয় চিন্তা হইতে বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী প্রজাপতি নামধারী এক ঋষি "পরমাত্মাকে" উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। "তৎকালে, যাহা নাই তাহাও ছিল না,যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না। অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ শক্তি সহকারে) জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় (অর্থাৎ শূন্য) ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব্ব প্রথম মনের উপর কামের (ইচ্ছার) আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল।" (১০।১২৯।১-৫)। কিন্তু প্রজাপতি ঋষির ধারণা ছিল যে, এই সকল প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর প্রদান করা যায় না। এই পরমাত্মার ইচ্ছাই কেন হইল, তৎপূর্ব্বে কেন হয় নাই, এক পরমাত্মা হইতে সৃষ্টির বৈচিত্র্য কি প্রকারে

হইল ?—এই সকল জিজ্ঞাস্য আবার উপস্থিত হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে উত্তর, উত্তর হইতে প্রশ্ন ক্রমশঃ উত্থিত হইবে, শেষ হইবার নহে। এই জন্যই এই ঋষি বলিলেন "কেই বা প্রকৃত জানে, কেই বা বর্ণন করিবে? কোথা হইতে জন্মিল ? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল ? দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন (সুতরাং তাঁহারাও কিছু জানেন না)। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে ? এই নানাসৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।" (১০।১২৯।৬-৭)।

খ। বিশ্বসমস্যার আর একটী গুরুতর অংশ বিশ্বকর্ম্মা নামক ঋষি প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি সেই আদি পুরুষ হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি তিনি জগতাধার দিক্‌কেও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে দিক্ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি কোন স্থানে ছিলেন ? ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে, আমরা সেই পরমাত্মাকে কোন দিক্ কি দেশের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া ধারণা করিতে সক্ষম কি না ? প্রশ্নটি ঋষি এই ভাবে লিখিয়াছেন "সৃষ্টিকালে তাঁহার (বিশ্বকর্ম্মার) অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থল কি ছিল ? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন ? সেই বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশকে উপরে বিস্তার করিয়া দিলেন" (১০।৮১।২) "হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ-দেখি তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন ?" (১০।৮১।৪)। ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন "সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে।" (১০।৮২।৬)। তিনিই আদি, তাঁহাকে নাভি অর্থাৎ কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, দ্যুলোক, ভূলোক, দিক্, দেশ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিশ্লিষ্ট করিয়া সেই পূর্ণ পরমাত্মাকে তোমরা ধারণা করিতে পার না বলিয়াই এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর "যিনি ইহা (ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে" (১০।৮২।৭)।

২। জীবাত্মা।

দীর্ঘতমার নিকট আমরা ইতিপূর্ব্বে জীবাত্মা সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছি। জীবাত্মা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আমরা এই মণ্ডলে প্রাপ্ত হই।

(ক) শরীর ও জীবাত্মার বিভেদ। দমন ঋষি কোন মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন "হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক (ভবিষ্যৎদর্শনকারগণ চক্ষুকে তেজপদার্থ বলিয়াছেন); তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক। এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ (অর্থাৎ জন্মরহিত) চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য

তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি, তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।" (১০।১৬।৩-৪)।

বৃহদুক্থ ঋষি আপনার মৃত পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন "হে বাজিন্ (পুত্রের নাম)! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন; * * তুমি দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মা মিলাইয়া দাও। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত মিলিত হও।" (১০।৫৬।২-৩)। দশম মণ্ডলে আমরা এই মত প্রাপ্ত হই যে, জীবাত্মা জন্মরহিত, চিরকালই আছেন, মৃত্যুর পরে শরীর নানা পদার্থে মিলিত হয়, কিন্তু আত্মা পুণ্যবলে স্বর্গে যায়।

(খ) পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ। দীর্ঘতমা বলিয়াছেন, নিত্য অনিত্যের সহিত সর্ব্বদা একত্রে অবস্থিতি করে। একজন কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি দর্শন করেন। পতঙ্গ নামধারী ঋষি মায়াকে দেবতা করিয়া কয়েকটি ঋক্ রচনা করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য তাহার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্ম মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন, পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি।" (১০।১৭৭।১) অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি।

(গ) কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়?— বৃহস্পতি নামধারী ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানকে দেবতা করিয়া বলিতেছেন "বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে। ইহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান; তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ়স্থানে সঞ্চিত ছিল, বাক্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয়" (১০।৭১।১); অর্থাৎ ভাষার সাহায্যে পরস্পরের সহিত আলোচনা দ্বারা বিকাশিত হয়। "এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিয়া অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।" (১০।৭১।৯)। প্রকৃত উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান নিগূঢ়ভাবে অন্তরে নিহিত থাকে, উত্তম ভাষার সহায়তায় পরস্পর আলোচনা দ্বারা প্রকাশিত হয়। পতঙ্গ নামধারী ঋষি ও বলিয়াছেন "জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ দেবতা তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান করিয়া রাখেন" (১০।১৭৮।২)।

(ঘ) জীবাত্মা মৃত্যুর পর কোথায় যায়?— "যম সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান। * * তাহার নিকটই সকল লোক গমন করে।" (১০।১৪।১)। "হে মৃত! সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও। যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর" (১০।১৪।৮)। দমন ঋষি বলিতেছেন "হে অগ্নি! ইনি (মৃত ব্যক্তি)

পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন" (১০।১৬।২)। বৃহদুক্থ ঋষি বলিতেছেন, পিতৃপুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া (১০।৫৬।৪) "নিজ ক্ষমতাবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন। যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন।"(১০।৫৬।৫) ঋগ্বেদের শেষ মত পতঙ্গ নামধারী ঋষি ব্যক্ত করিয়াছেন "জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন; কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুই একটি গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ প্রদর্শন করা হয়।" (১০।১৭৭।৬)।

দশম মণ্ডলের মত এই বলিয়া প্রতীত হয় যে, জীবাত্মা জন্মরহিত ও অমর, এক শরীরের মৃত্যুর পরে অন্য শরীর অবলম্বন করেন। যাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহাদের আত্মা পুণ্যফলদাতা যমের নিকট উপস্থিত হয় এবং দেব শরীর ধারণ করিয়া অস্তে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুণ্যফল ভোগ করেন। স্বর্গকে অস্ত অর্থাৎ সূর্য্যের লোক বলা হইয়াছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বর্গে যাওয়া ঘটে না। নরকের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্পষ্ট নাই। অতএব বোধ হয়, অন্যান্য আত্মাকে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হয়। যদিও স্পষ্ট নরকের উল্লেখ দেখা যায় না, যমের অধীনে স্বর্গ ব্যতীত আর একটী রাজ্য আছে, সকলকে তাহা অতিক্রম করিতে বলা হইয়াছে। "হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদের নিকট গমন কর। হে যম! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর।"(১০।১৪।১০,১১)। ইহার অর্থ এই বোধ হয় যে, সকল মনুষ্যকেই স্বর্গসুখ ভোগ করিবার পূর্ব্বে পাপের জন্য দণ্ড পাইতে হয়। পাপের জন্য মৃত্যুর পর যমরাজ্যে দণ্ডের বিশ্বাস হইয়াছিল বলিয়াই যমের নাম ক্রমশঃ এত ভয়ানক হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে মাত্র পুণ্যফলদাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। দশম মণ্ডলেও সেই ভাবই প্রবল দেখা যায়।

কিন্তু পিতৃলোক ও দেবতাগণ স্বর্গে শরীর ধারণ করেন, জীবাত্মাগণ কি কখনও শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন না? মূর্দ্ধন্বান্ ঋষি বলিতেছেন "কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইহাদের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি।" (১০।৮৮।১৫)। সায়ন কহেন, এই দুই গতির একটি সংসার অন্যটি মোক্ষ। যে জীবাত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি সংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিবেন।

(৬) পাপ হইতে রক্ষার প্রার্থনা।—মৃত্যুর পরে পাপের দণ্ডভোগ করিতে হয়, এই বিশ্বাস হওয়াতে নির্ঋতি, যিনি প্রথমতঃ মাত্র পাপদেবতা ছিলেন, তাহার বিষয় চিন্তা আরো ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি মৃত্যু দেবতাও হইয়াছেন এবং ঋষিগণ বারম্বার পাপ ও নির্ঋতি হইতে রক্ষার জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন (১০।১৮।১০; ৫৯। ১-৪; ৭৬।৫; ১৬১।২; ১৬৪।১)। পণ্ডিতেরা

সাত মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা অর্থাৎ অকর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন,যে কেহ তাহার একটীও করে সেই পাপী।" (১০।৫।৬)। ঋগ্বেদের প্রায় সকল মণ্ডলেই দক্ষিণা অর্থাৎ দানের প্রশংসা এবং কৃপণের বিশেষ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। সাতটি পাপ যে কি,তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর, কোথাও সবিশেষ উল্লেখ নাই।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দেশহিতৈষিতা।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে, দেশহিতৈষিতা আত্মহিতৈষিতার বিস্তৃতি মাত্র। আমি আমাকে ভালবাসি। এই ভালবাসাটীর আয়তন কিছু বড় হইলেই দেশহিতৈষিতা হইয়া দাঁড়াইল। স্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম, একই প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা।

স্বপ্রেম ও স্বার্থপরতা এক কথা নহে। যেমন স্ত্রৈণতা পত্নীপ্রেমের বিকৃতি, স্বার্থপরতাও সেইরূপ স্বপ্রেমের বিকৃতি বা নিম্ন অবস্থা মাত্র। দার্শনিক বলেন,মনুষ্যের কর্ত্তব্য তিন প্রকার। ১। আপনার প্রতি। ২। অন্যের প্রতি। ৩। ঈশ্বরের প্রতি। তাঁহারা এই তিন প্রকার কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে বলেন। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার কর্ত্তব্যের অবমাননা করিয়া কেবল আত্মোদর পোষণেই রত,সে-ই স্বার্থপর। এরূপ স্বার্থপরতার বিস্তৃতিকে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা বলা যায় না। ইহা দেশহিতৈষিতার বিকৃত বা নিম্ন অবস্থা মাত্র। ইহা স্বদেশার্থপরতা। স্বপ্রেম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার কর্ত্তব্যের অবমাননা না করিয়া মনুষ্যকে প্রথম কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইতে পারে।

যদি দেশহিতৈষিতা স্বপ্রেমের বিস্তৃতি মাত্র হয়, তবে ইহাকে কি প্রকারে উচ্চ অঙ্গের কর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি আত্মোপকার সাধন করে, তাহাকে যতদূর সম্মান করা যাইতে পারে, দেশহিতৈষী কি প্রকারে তাহা অপেক্ষা অধিক সম্মানের যোগ্য? আর যদি দেশহিতৈষিতার অবস্থা বিশেষ,যাহাকে আমরা স্বদেশার্থপরতা বলিয়াছি, স্বার্থপরতারূপ জঘন্য প্রবৃত্তির বিস্তৃতি মাত্র হয়, তবে দেশহিতৈষিতা সমাজে এত আদরণীয় কেন?

আমরা বলি,সমাজে স্বার্থপরতা ও স্বদেশার্থপরতার আদর প্রায় সমান। যে ব্যক্তি অন্যের সুখ দুঃখ গ্রাহ্য করে না, কেবল আত্মোদর পোষণেই বিব্রত, সমাজ তাহাকে যেমন ঘৃণা করে, যে ব্যক্তি অন্য দেশের সুখ দুঃখ গ্রাহ্য করে না, কেবল স্বদেশের উদর পোষণেই বিব্রত, তাহাকেও প্রায় তদ্রূপ ঘৃণা করিয়া থাকে। স্বার্থপরতা মনুষ্যের হৃদয়ের একটী দুর্ব্বলতা, স্বদেশার্থপরতাও তদ্রূপ। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়, স্বদেশার্থের দিকেও তদ্রূপ। স্বার্থের আবেশ মনুষ্যের বিবেচনা শক্তিকে দুর্ব্বল করে,স্বদেশার্থের আবেশও তদ্রূপ। যে ব্যক্তির নিজের কোনও বিষয়ে স্বার্থ আছে, সে সেই স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া কখন কখন সে বিষয়ে অন্যায় কার্য্যও ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করে। যে ব্যক্তির কোনও বিষয়ে স্বদেশের স্বার্থ আছে, সেও যে কখন কখন তদ্রূপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু নিরপেক্ষদর্শী বাহ্য জগৎ উভয় প্রকার কার্য্যকেই প্রায় সমান অন্যায় জ্ঞান করে। লোকে অনেক সময়ে

নিজের স্বার্থসংরক্ষক কার্য্যেও অন্যায় বুঝিতে পারে,স্বদেশার্থসংরক্ষক কার্য্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইউরোপে পোল্যাণ্ড-গ্রাস এক্ষণে গ্রাসকারী রাজ্যের লোকেও একবাক্যে অন্যায় বলিতেছে।

তাহার পর দেখা যায়, উন্নত স্বপ্রেমের নিকট পরপ্রেম পরপ্রেম নহে। দার্শনিকদিগের তিন প্রকার কর্ত্তব্য রেখা দ্বারা বিভাগ করা অসম্ভব। সেক্সপিয়রের পলোনিয়স বলিয়াছেন "আপনার প্রতি প্রকৃত ব্যবহার কর ; যেমন দিনের পর রাত্রি অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ অন্যের প্রতি অপ্রকৃত ব্যবহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।" আমরা আরও একটু উপরে উঠিতে চাই। আমরা বলি, অন্যের ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যাদি বৃত্তি চালিত না করিলে, ঈশ্বরের প্রতি সমুচিত ভক্তি না করিলে,আপনার সম্যক্ উন্নতি অসম্ভব। উক্ত দুই প্রকার কর্ত্তব্য আত্মকর্ত্তব্য সাধনের অনুল্লঙ্ঘনীয় সোপান। প্রকৃত আত্মোন্নতি সর্ব্বোন্নতির শেষ। উন্নত স্বপ্রেম এইরূপ আত্মোন্নতিরই প্রণোদক এবং উন্নত দেশহিতৈষিতা এইরূপে স্বপ্রেমেরই বিস্তৃতি। স্বপ্রেম চরমোন্নতি প্রাপ্ত হইলে ইহাকে বিস্তৃতি না বলিয়া বরং অঙ্গ বলিতে হয়।

এই প্রকার দেশহিতৈষিতার সহিত পরদেশহিতৈষিতা অবশ্যই মিশ্রিত থাকিবে। যেমন অন্যের প্রতি মহৎব্যবহার উন্নত আত্মপ্রেমের অন্তর্ব্বর্ত্তী,সেইরূপ অন্য দেশের প্রতি মহৎ ব্যবহারও উন্নত আত্মদেশহিতৈষিতার অন্তর্ব্বর্ত্তী। বিশ্বপ্রেমিক ব্যক্তিই এরূপ দেশহিতৈষী হইতে পারেন। ইউরোপে ম্যাট্সিনি এইরূপ দেশহিতৈষী। তিনি ইটালির উদ্ধারকর্ত্তা হইলেও, তাঁহার প্রেম আল্পস্পর্ব্বতের সীমায় আবদ্ধ নহে। সমস্ত জগতের শাসন প্রণালী উন্নত করিবেন, পৃথিবীর সকলকে সুখী করিবেন,এই তাঁহার চিন্তা। ভ্রান্ত ইউরোপ এই জন্যই তাঁহাকে স্বপ্নাবিষ্ট(Dreamer) বলিত।

অবশ্য এতদূর উচ্চ অঙ্গের স্বদেশ-প্রেম বিরল। আমরা স্বদেশপ্রেমের চরমাবস্থার কথাই বলিতেছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়ও স্বদেশপ্রেম একটী মহার্ঘ পদার্থ। 'স্ব' শব্দটী আপেক্ষিক। একের সহিত তুলনায় যাহাকে আপন বলা যায়,অন্যের সহিত তুলনায় তাহাকেই পর বলা হইয়া থাকে। ভিন্ন দেশের সহিত তুলনায় সমস্ত জন্মদেশ আপন হইলেও নিজের সহিত তুলনায় ইহার অধিবাসিগণ পর। সুতরাং সাধারণ স্বদেশপ্রেমও পরপ্রেম মিশ্রিত। সেই পরপ্রেমকে আত্মপ্রেম জ্ঞান করিয়া লওয়াই ইহার মাহাত্ম্য। স্বদেশপ্রেমের নিম্নতম অবস্থা স্বদেশার্থপরতাও এইরূপ কিঞ্চিৎ পরপ্রেম মিশ্রিত। সুতরাং স্বার্থপতার সহিত তুলনায় স্বদেশার্থপরতাও একেবারে অশ্রদ্ধেয় নহে।

স্বদেশপ্রেম প্রাগুক্তরূপ উচ্চশ্রেণীর না হইলে তাহাকে নীতি-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেমের উপরে বিভিন্ন নৈতিক স্তর আছে। শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব বাবু দেখাইয়াছেন,সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রথম স্তর,সমগ্র জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি দ্বিতীয় স্তর, সমগ্র জীবজন্তু বৃক্ষলতাদির প্রতি প্রীতি তৃতীয় স্তর।

নৈতিক বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান না পাইলেও স্বাভাবিক দেশহিতৈষিতা পূর্ব্বোলিখিত কারণে দুর্লভ। আত্মত্যাগ একটী মহৎ পদার্থ ; স্বার্থের অংশ থাকিলেও, সাধারণ দেশহিতৈষিতার

মধ্যে আত্মত্যাগ যথেষ্ট আছে। এই আত্মত্যাগের জন্যই দেশহিতৈষী পূজনীয়।

দেশহিতৈষীর পূজা পাইবার অপর একটী প্রধান কারণ এই যে, মনুষ্য মাত্রেরই শক্তি সীমাবদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম বা কোন ও একপ্রকার সৎকর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। কর্ত্তব্য-বিভাগ কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বদেশের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন। কর্ত্তব্য বিভাগ করিতে হইলেই স্বদেশের দাওয়া সর্ব্বাগ্রে। কেবল যে স্বদেশের দাওয়া সর্ব্বাগ্রে, তাহা নহে,অন্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশের কল্যাণ সাধনের সুযোগ অধিক,কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনাও অধিক। অন্যদেশের সহিত শত্রুতা ভাব ত্যাগ করিয়া,এরূপ কর্ত্তব্য-বিভাগ-বোধদ্বারা প্রণোদিত হইয়া যিনি স্বদেশ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হন,তাঁহার স্বদেশপ্রেম কলঙ্ক-শূন্য এবং উচ্চ শ্রেণীভুক্ত।

তর্কচ্ছলেই স্বদেশ প্রেমের উন্নত, স্বাভাবিক ও অবনত তিনটী অবস্থা ধরিয়া লওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমণ্ডলে যত দেশহিতৈষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কেহই পরদেশের অনিষ্টকারী ছিলেন না। অন্য দেশের অনিষ্টচিন্তা ও স্বদেশ প্রেম,এই দুইটী বৃত্তির একাধারে সম্মিলন যেন বিস্ময়জনক বলিয়াই মনে হয়। দেশহিতৈষিতার মধ্যে অনেকটা আত্মত্যাগ থাকিবেই থাকিবে। যাহার মন একটী দেশের জন্য কাঁদিতে জানে, তাহার মনটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এই মনে উদারতা বৃত্তি যথেষ্ট আছে। অন্য দেশের অনিষ্ট চিন্তারূপে সঙ্কীর্ণতা এই মনের পার্শ্বে স্থান না পাইতে পারে, এমন নহে। কিন্তু তাহার এইরূপ স্থান না পাইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা বলিনা যে উন্নত স্বদেশ প্রেমিক কোন অবস্থাতেই কোনও ভিন্ন দেশের অনিষ্টোৎপাদন করেন না। অথবা এরূপ অনিষ্টোৎপাদন তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে,অন্যান্য অবস্থা সমান হইলেই সেই সমস্ত প্রযোজ্য। যেথানে সামান্য অনিষ্ট দ্বারা বহুল উপকার লাভ হয়,সেথানে ঐ উপকারের জন্য ঐ অনিষ্টোৎপাদন কর্ত্তব্য। অনিষ্টের জন্য অনিষ্টোৎপাদন অবশ্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। ব্যক্তিগত নীতি যেরূপ মনুষ্য মাত্রকেই আত্মরক্ষার অধিকার দিয়াছে, এই রূপ অধিকার যেমন ব্যক্তি বিশেষের অনিষ্টোৎপাদক হইলেও মনুষ্য সমষ্টির উপকার-জনক, দেশগত নীতিও সেইরূপ দেশ মাত্রকেই আত্মরক্ষার অধিকার দিয়াছে ; এরূপ অধিকার দেশসমষ্টির উপকারজনক এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই অধিকার সঞ্চালনে আপাততঃ যে দেশের অনিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়,পরিণামে হয়ত সে দেশেরও উপকার সংসাধিত হয়। বিপুল ধন সম্পত্তি বা প্রভুত্ব লাভ বিশেষতঃ অন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া এরূপ লাভ উন্নতির পরাকাষ্ঠা নহে। দেশের অধিবাসিবর্গের উন্নতিই দেশের উন্নতি। এরূপ ভাবে ধন সম্পত্তি বা প্রভুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক বিষয়ে দেশের অবনতি দৃষ্ট হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই,যদি অন্য দেশের সর্ব্বনাশ নিবারিত করিয়া দেশ বিশেষকে এরূপ ধন সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়,এবং তদ্দারা ঐ দেশ বিশেষের মোটের উপর অনিষ্ট সাধিত হয়,তাহা হইলেও ঐ সর্ব্বনাশ নিবারণ নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত, মনুষ্য সমাজের উপকারজনক এবং মনুষ্য-নাম-

ধেয় ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সকল দেশ সম্বন্ধেই এই কথা প্রয়োজ্য; স্বদেশ সম্বন্ধে কেন না হইবে? পরন্তু যে স্থলে এরূপ সর্ব্বনাশ-চেষ্টা বিদ্যমান্, সেই স্থলেই দেশহিতৈষীর কার্য্য-ক্ষেত্র কঠিন ও বিস্তীর্ণ। সর্ব্বনাশ সমন্ধে যে কথা বলা হইল, আংশিক নাশ সমন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে।

কার্য্যকুশল দেশহিতৈষী বিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত। এই সকল উপাদানের দুই একটীর আশ্রয় লইয়া অনেকে দেশহিতৈষিতা নামের অপব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল অপব্যবহার এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

স্তব।

থেকোনা মোরে ভুলে,
চাহ গো মুখ তুলে,
দয়াল হরি!
ডাকিতে শক্তি দাও,
হৃদয়ে ভক্তি দাও,
করুণা করি।
বলেছ তুমি স্বামি!
"সহজে মিলি আমি
পাপীর সনে"।
সে কথা রক্ষা কর,
ধরগো ধর ধর;
পতিত জনে।
গরব চূর্ণ কর,
পরাণ পূর্ণ কর,
প্রেমে তোমার।
করহে পাপ শূন্য;
বিতর পূত পুণ্য,
চিত্তে আমার।
যেমন গঙ্গা বারি

তেমনি কর।
পবিত্র অগ্নি যথা,
উজলে ম্লানে সদা,
তেমনি কর।
বিমল পুষ্প চয়,
যথা সৌরভ ময়,
তেমনি কর।
এ হৃদি উপচারে,
পূজিব হে তোমারে,
বাসনা মনে।
করহে আশ পূর্ণ,
করহে দয়া তূর্ণ,
এ অভাজনে।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

ঊষা।

আমি সকলের আগে
উঠি দেখিলাম চেয়ে,
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি
নামিছে একটী মেয়ে।
সারা রাত ছিল সেকি
নন্দন কানন মাঝে?
স্বরগের গন্ধ তাই
এখনো লাগিয়া আছে।
বরাঙ্গে কিরণ ভূষা,
অপাঙ্গে উথলে মধু,
সোণার আঁচলে ঢাকা
রয়েছে সোণার বিধু।
উঠিছে রূপের উৎস,
এলায়ে পরেছে চুল,

সে কম শরীর বাসে
ফুটিছে অযুত ফুল।
কচি কচি মুখ খানি
হাসি ভরে ম্রিয়মাণ,
সরল পরাণ খানি
জগতে করিছে দান।
ভাসায়ে অধর গ্রীবা
বহিছে প্রেমাশ্রু নব,
হৃদয়-কমল হতে
ঝরিছে কুসুমাসব।
সরল মূরতি খানি
স্বরগ পুরের গড়া,
পবিত্র হৃদয় খানি
অনন্ত আলোকে ভরা।
ত্যজিয়ে স্বরগ তল
কে তুমি এমন মেয়ে,
নাশিতে আঁধার পাশ
অবনীতে এলে ধেয়ে?
কুস্বপ্নে জ্বলিতেছিল
যে সকল দগ্ধ প্রাণ,
তুমি মা মহিমাময়ী
সান্ত্বনা করিলে দান।
তুমি কি করুণাময়ী
কেবলি পরের তরে,
স্বরগের মেয়ে হয়ে
তুষিতে আসিলে নরে?
মহান্ আঁধারে মগ্ন
নিরখিয়ে ধারতল,
আঁচলে আবরি মুখ
ফেলেছিলে অশ্রুজল?
মহা মূর্খ এ জগৎ
অমূল্য সে 'অশ্রুহারে'
নিশির শিশির বলি
ফেলিছে পথের ধারে।
তবুও এ পৃথিবীরে
কত ভালবাস তুমি,
ফুলের উৎসব করি
সাজাও কানন-ভূমি।
মঙ্গল আরতি করি
জাগাও জগৎজনে,
অজস্র শান্তির বারি
বিতর মানব প্রাণে।
এত দয়া উষা তোমা
কে শিখা'ল বল বল,
আমিও চরণে তাঁর
ঢালিব আঁখির জল।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস

ছবি।

ল'য়ে ক'টী প্রেতমুখ আমার সুখের ঘর
রচেছি বিজনহৃদে, আঁখিজলে মনোহর!
আমার মোহিনী আসে ছায়াময় হাসি ল'য়ে,
আবেশে মনের মাঝে যায় কত গান গেয়ে,।
চোখ দুটী বুজে বুজে দেখি তার চারু মুখ!
ছায়ারে চুমিয়া প্রাণে কতই যে পাই সুখ!
তারে বড় ভালবাসি, সে বড় মধুর হাসে,
হাসিলে জোছনা খেলে, কাঁদিলে মুকুতা খসে।
বিধাতা কি দিয়া, হায়, নিরমিল মুখ তার,
ছায়াতেও এত শোভা দেখিনি কোথাও আর!
প্রাণে যবে আঁখিজলে জোয়ার বহিয়া যায়,
শ্বাসের ঝটিকা যবে হিয়া বিলোড়িয়া ধায়,
তখন সে মায়াময়ী কোথা হতে কাছে আসে;
আমি কাঁদি, কাঁদেনা সে, শুধুই মধুর হাসে!!

যদিরে দেহের চোখে সে মোহিনী দেখা দিত,
তবে কি বিষের শ্বাসে পরাণ পুড়িয়া যেত!
যৌবনের উষাকালে যবে দেখেছিনু তারে,
কি যে বিম্বাধরী বেশে দেখা সে দেছিল মোরে!
আজ সে গিয়াছে চলে কোন অজানিত দেশে,

অথবা মিশেছে ভস্ম শ্মশানের ধূলিবাসে!
তবুও সে ছবিখানি—শশী হতে সুকুমার—
সেই বিদ্যাধরী বেশে হৃদয়ে আসে আমার!

শ্রীরেবতি নাথ মাহান্তি।

টুটিল আঁধার ঘোর।

সজনি লো এতদিনে,
টুটিল আঁধার ঘোর,
মনোমত পতি-মুখ,
নেহারি নয়নে মোর॥
পঙ্ক অঙ্কে জন্ম লভি,
ভাবিনি স্বপনে যাঁরে।
কি জানি কি ভাবি বিধি,
দেছেন মিলা'য়ে তাঁরে॥
'মৃণাল' এ কণ্টকিত,
জানিয়া প্রাণেশ মোর।
শত সাধে প্রাণে প্রাণে
বেঁধেছেন প্রেমডোর॥
তাঁহার সে রূপরাশি
আদরে সতত মাখা।
আঁখি দুটি ঢল ঢল,
সাদা প্রাণ, সদা ফাঁকা॥
অধরে 'পলাশ' ফুটে,
কপোলে 'গোলাপ' ফুল।
সুকোমল দেহখানি
'শিরীষে' না হয় তুল॥
সুধাংশুর অংশু জিনি
'সুধার' সে সুধামুখ;
হেরিলে নয়নে ক্ষণে,
হৃদয়ে উথলে সুখ॥
স্বপনে ভাবিনি যাঁরে,
তাঁর আজি হৃদিহার।
আমা মত সুখী সখি,
এ ধরায় কেবা আর?
অভাগিনী রাজরাণী
যাঁহার কৃপায় আজ।
পতিসনে, এক মনে,
করিব তাঁহার কাজ॥
দয়া, স্নেহ, ভক্তি দিয়ে,
সাজাব হৃদয় খানি।
মাতৃ-স্নেহ হৃদে ধরি,
হেরিব ধরার প্রাণী॥
জগৎ, আশীষ এই—
আশা যেন মেটে মোর,
সজনি লো এতদিনে,
টুটিল আঁধার ঘোর॥

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

হেথা আর নয়।

নয়নে নয়নে দেখা, ভাল বাসাবাসি,
চিরদিন অতৃপ্তি মাখান!
দাঁড়ায়ে সরসী-কূলে মিটেনা পিপাসা,
শুষ্ককণ্ঠ আকুল পরাণ!
অব্যক্ত কি এক জ্বালা মরমের মাঝে
নিশিদিন করে ছুটাছুটি!
আশা-পথ চেয়ে কার কাটে সারাদিন,
বলিতে পারে না মুখ ফুটি!
দূর আকাশের কোলে তারকার আলো,
বাড়ায় সে আঁধার কেবল।
চেয়ে চেয়ে তার পানে অবসন্ন বুক,
নয়নেতে বহে অশ্রুজল।
শুধু ভাসি আঁখি-নীরে, শুধু ভাবনায়
প্রেম-তৃষ্ণা মিটেছে কাহার?
তাই চির কলঙ্কিনী শৈবলিনী হায়!
তাই কুন্দ ত্যজিল সংসার।
মাটির ধরণী হেথা সকলি কঠিন,
বাল-খেলা হৃদয় লইয়া!

হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়ে যাবে, চৌদিকে সকলে
হাসিবে লো করতালি দিয়া।
কি অপূর্ণ সাধ বুকে রহিল তোমার
দেখিবে না বারেক চাহিয়া!
মরম-মরম মাঝে লুকায়ে যতনে
নীরবেতে যাওলো চলিয়া।
এই পৃথিবীর পর থাকে কোন স্থান
ভালবাসা বিলাইও সেথা।
কি ভাবনা, কি আশঙ্কা, কি নৈরাশ্য দুঃখ
বুঝিলেত ভালবেসে হেথা!
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যো।

প্রমীলা *।

১

কুসুম-কাননে নব পারিজাত,
এ মর জগতে ত্রিদিব-ছবি,
কত পুণ্য-ফলে কত যোগ-বলে,
ও দেবী-মূরতি গড়িলা কবি!

২

এই দেখি তুমি সুখের প্রতিমা,
গাঁথিয়া সুরভি ফুলের মালা,
সলাজ সোহাগে পতির গলায়
দিতেছ মিলিয়া সঙ্গিনী বালা।

৩

মধুর বীণায় করিয়া ঝঙ্কার,
আনন্দে দিতেছ পরাণ ভরি,
আনন্দে মগন, ও কম্য জীবন,
হাসিছ, খেলিছ, আমরি! মরি!

৪

কভু দেখি, তুমি বিরাম-ভবনে,
প্রিয় পতি পাশে রয়েছ শুয়ে,
ঘুমে ঢল ঢল, অলস, বিভল,
সোণার কমল ফুটেছে ভুঁয়ে!

৫

পুনঃ একি রঙ্গ, সমর-রঙ্গিনী!
ফণী হেন বেণী "নিষঙ্গে" দোলে।
করে শেল, শূল, অসি, শরাসন,
বাণভরা তূণ রয়েছে কোলে।

৬

মহা বাহুবলে বীরবালাগণ,
টঙ্কারিছে ধনু, ভীষণ রবে,
নাচিছে "বড়বা" ও পদ পরশি,
মানব, দেবতা, অবাক্ সবে!

৭

আবার বুঝিবা দানব নাশিতে,
ডাকিনী যোগিনী সখীর সনে,
অশিবনাশিনী, কলুষহারিণী,
অভয়া জননী, পশিছে রণে!

৮

চমকি চাহিছে বানর-বাহিনী,
চমকি ভাবিছে জানকীপতি,
"ধন্য বীরপণা! ধন্য বীরাঙ্গনা!
সাবাসি সাবাসি প্রমীলা সতী!"

৯

পুনঃ বিধুমুখি! অপরূপ একি—
লজ্জাবতী লতা শ্বাশুড়ী-পাশে,
সরমের ভরে আঁখি লুটি পড়ে,
চাঁদ মুখ ঢাকা রয়েছে বাসে!

১০

ও কর-কমলে ধরি পতি কর,
কহিছ বালিকা করুণ স্বরে,
"শ্বশ্রূ তব সাথে না দিলেন যেতে,
তাই দাসী একা রহিল ঘরে!"

১১

আবার সরলা কৃতাঞ্জলি পুটে,
ইষ্টদেবী-পদে ভকতি ভরে,
মঙ্গল কামনা করিছ ললনা,
রমণীসর্ব্বস্ব পতির তরে!

১২

শেষে—একি হায়! সহা নাহি যায়,
শ্বেত শতদল প্রমীলা বালা,
মৃত পতি সনে মরিতে চলেছ,
অনলে পুড়িবে কমল-মালা!

১৩

সে অমল হাসি গিয়াছে নিবিয়া
গিয়াছে নিবিয়া আঁখির জ্যোতি,
প্রাণ বুঝি সেথা গিয়াছে চলিয়া,
যেখানে গিয়াছে প্রাণের পতি!

১৪

আলোক-পুরের সাধের কুসুম
কনক-লঙ্কার পূজিতা রাণী
জ্বলন্ত আগুনে দিতেছে ঢালিয়া
নবনীত-গড়া বরাঙ্গখানি!

* মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা।

১৫
দেখ চেয়ে, নর! অসুর! অমর!
যুগান্তের বহ্নি গরজি ছুটে,
তার মাঝে শুয়ে বীর ইন্দ্রজিত,
বাসন্তী-মল্লিকা কোলেতে ফুটে!

১৬
নব সূর্য্য তার সূর্য্যমুখীটীরে
দিগন্তে—অনন্তে চলিল লয়ে,
এ মহা মরণ, দেখিবে যে জন,
সে রবে মরতে অমর হয়ে!

১৭
ধন্য মেঘনাদ! যার কণ্ঠহার,
দেবের দুর্লভ এ মণিমালা,
ধন্য কবিবর! তপোবলে যার,
মরতে দেখিনু স্বরগ-বালা!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দুর্দ্দিনের বন্ধু।

পৃথিবীর বহুদর্শী লোকেরা বলিয়াছেন, বিপদ উপস্থিত না হইলে,কে বন্ধু,কে বা শত্রু, বুঝিবার উপায় নাই। কথাটা সকল দিক্ দিয়াই ঠিক। বিপদ যেমন বন্ধুত্বের পরিমাণ-যন্ত্র,এমন আর কিছুই নয়। স্বর্ণের খাটিত্ব যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় প্রকাশ হয়, বন্ধুর খাটিত্ব তেমনই বিপদ-পরীক্ষায় জানা যায়। বিপদে যে বন্ধু অটল,অচল,তিনিই ভালবাসার স্বর্গীয় প্রভায় প্রদীপ্ত—তিনি স্বার্থের অতীত ধামে, পরার্থ-পরতার বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত। তিনি পূজা পাইবার, প্রশংসা পাইবার সর্ব্বথা যোগ্য। কিন্তু সেরূপ বন্ধু এ পৃথিবীতে বড়ই বিরল।

হিতোপদেশ বলেন, রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে যে ব্যক্তি বন্ধু,সে-ই প্রকৃত বন্ধু। রাজদ্বারে যখন মানুষ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়,সকলেই একে একে তখন পরিত্যাগ করে। শ্মশানে,অর্থাৎ মৃত্যুর দিনে,যখন সকলেই মায়া পরিত্যাগ করে, প্রকৃত বন্ধু কেবল নিকটে থাকেন। আর দুঃখ দারিদ্র্যে, এ পৃথিবীর প্রায় কোন লোকই দুঃখের অংশী হইতে চায় না। যে ব্যক্তি এ হেন অবস্থাতেও নিকটে থাকে, তাহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জানিবে।

বসন্তে কোকিল মধুর স্বরে ডাকে, শীতের দুর্দ্দিনে কোকিল নীরব। সম্পদ-বসন্তের মধুর বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তোমার চতুর্দ্দিকে সদানন্দে বিভোর তোষামোদপ্রিয় কত শত আত্মীয়কে ও বন্ধুকে কাছে পাইবে; কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ বিষম বিপদ যখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—দেখিবে, তখন এই পৃথিবীতে তুমি একা! কেহ কাছে নাই, কেহ আর তোমাকে দেখিবার নাই। সংসার-পরীক্ষায় পড়িয়া সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ সভার সম্মান রক্ষা করিতে পৃথিবীতে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, অনাহার-ক্লেশের ভাগী হইতে অতি অল্পই সুহৃদ্ মিলে। কেবল স্বার্থ, কেবল স্বার্থ, কেবল স্বার্থ দিয়া মানুষের আগাগোড়া গঠিত!! তুমি কাহাকে বল বন্ধুত্ব, কাহাকে বল ভালবাসা!!

কেবল ইহাই নহে। সম্পদের দিনে, ঐশ্বর্য্যের দিনে যে তোমার তোষামোদ করিবার অবসর পাইলে কৃতার্থ হইত, আজ তুমি বিপদে পড়িলে,সে-ই তোমাকে আঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিবে। প্রাণ দিয়া যাহার উপকার করিয়াছ, তোমার বিপদের দিনে সে তোমাকে আঘাত করিয়া উল্লাসে প্রত্যুপকার সাধন করিবে! দুধ কলা দিয়া পোষণ করিলেও, অবসর পাইলেই, বিষধর তোমাকে দংশন করিবে! কৃতজ্ঞতা,এ জগতে যেন স্বার্থ-সমুদ্রে বিসর্জ্জিত; পৃথিবীর মানুষ, অবসর পাইলেই তোমার বুকের রক্ত শোষণ করিবে। মানুষ! তুমি কাহাকে বল আত্মীয়, কাহাকে বল বন্ধু? শত্রুর তীক্ষ্ণ ছুরিকা এড়া-

হলে এড়াইতে পার, কিন্তু তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না কেন, বন্ধুর গুপ্ত শাণিত অস্ত্রের হাত এড়ান কখনই তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। খ্রীষ্ট যাহাদের জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেই জুডাস স্কেরিয়ট ছিলেন। সিজর যাঁহাদিগকে লইয়া গৌরব করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেই ব্রুটাস ছিলেন। পৃথিবী কলঙ্কের পণ্যবীথিকা, তুমি কাহাকে বল ভালবাসা, কাহাকে বল বন্ধুত্ব!!

ইতিহাসের বর্ণিত কথা ছাড়িয়া সংসারের ৪টীপ্রত্যক্ষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেই। যেরূপ চিত্র সর্ব্বদা দেখিতেছি, তাহার দৃষ্টান্ত দেই। মানুষ কেমন প্রতারক, বুঝিতে পারিবে। বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া মানুষ কিরূপ সর্ব্বনাশ করে, বুঝা যাইবে।

এক জন প্রবীণ ব্যক্তি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। ৪০০। ৫০০ টাকা বেতন পাইতেন। সেই সময়ে কলিকাতার উকীল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, ডাক্তারগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মানিতেন; আদর করিতেন, সম্মান করিতেন, তাঁহাকে লইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেন। অথবা কি যে করিতেন না, জানি না। বড় বড় লোকের মুখে তাঁহার সদাশয়তা, প্রশংসা আর ধরিত না। ঘটনাক্রমে তিনি,সকলের উত্তেজনায়, চাকরি পরিত্যাগ করিলেন। সকলে তাহাকে বড় মানুষ করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু চাকরি পরিত্যাগের পর, ক্রমে ক্রমে, একে একে বন্ধুদের প্রফুল্ল বদনশোভা বিরল হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইল, আর কাহাকেও সে গৃহে দেখা যায় না। ক্রমে তাঁহার একটী পুত্রের মৃত্যু হইল, আর একটী পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে তাহারও জীবনের আশা নির্ব্বাণ হইল। তিনি এই ঘোর বিপদে এক ব্যক্তিকে এই সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"কলিকাতার বড় বড় বন্ধু আমার কত ছিল, আমার সম্পদের দিনে তাঁহাদের গাড়ী আমার দরজায় ধরিত না, আর আজ এই দুর্দ্দিনে, দুঃখী ভাই, তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না; অবসর পাইলে তাঁহারা এখন আমার অনিষ্ট করিতে ছাড়েন না! কি আর বলিব, তোমাকে তখনও দেখিয়াছি, আজ এই দুর্দ্দিনেও দেখিতেছি, তুমি আমার পিতা, ভাই, বন্ধু, সকলই!" এই কথা বলিবার সময় প্রবীণ ব্যক্তির দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুপতিত হইতেছিল! যিনি এই হৃদয়-বিদারক দুঃখপূর্ণ বিলাপ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারও অশ্রু পতন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গল্পটী এই। এক ব্যক্তির একজন বন্ধু ছিল। নিজের অধীনে কাজ দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি পীড়িত হন। উপকার-প্রাপ্ত বন্ধু তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই—ক্রমাগত রোগীর জন্য খাটিতেছন, রোগীর মল মূত্র পর্য্যন্ত মুক্ত করিতেছেন! সে দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইল। রোগী যথাসময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। রোগীর অর্থসঙ্গতি প্রচুর ছিল। সময় পাইয়া শুশ্রূষাকারী বন্ধু মৃতব্যক্তির ধন ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিবার জন্য মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নীকে আপনার করিয়া লইলেন। সকল আত্মীয়ের কথা তুচ্ছ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বুড়া বুড়ীর মিলনে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইল,লজ্জাশরম ভয়ে মাথা নোয়াইল! এ জগতে বিশ্বাসী বন্ধু কোথায় মিলে, ভাবিয়া নরনারী আকুল হইল!

তৃতীয় গল্পটী এই—এক সদাশয় ব্যক্তি এক জন মহাজনের নিকট হইতে ১০৲টী টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ঐ মহাজনের এক সময়ে অনেক উপকার করিয়াছিলেন। টাকা কড়ি দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন বলিলেও হয়। এই ব্যক্তি যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন মহাজন,১০৲টী টাকা যায় দেখিয়া,এই ঘোর দুর্দ্দিনে,উপকারী বন্ধুর মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ঐ টাকা চাহিলেন। বৃদ্ধ খাতক আসন্ন বিপদে আর উপায় নাই দেখিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন "অদৃষ্ট, তাই ঋণ লইয়া মরিলাম!" এই বিষাদের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কোন গৃহস্থ ব্যক্তি ১০৲টী টাকা ঐ আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পুত্রকে দিয়া বৃদ্ধকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন।

আর একটী গল্প এই। একব্যক্তি অবসর পাইলেই পরের উপকার করিতেন। অনেক লোককে অর্থসাহায্য করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখন কেহ কেহ খুব পসারশালী লোক হইয়াছেন। এক ব্যক্তিকে তিনি ১০০৲, ২০০৲ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০০৲, ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া উপকার করিয়াছিলেন। এই টাকার জোরে তিনি বড় ব্যবসা চালাইতেছিলেন। এই উপকারী ব্যক্তি এক সময়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আরোগ্য না হওয়াতে শেষে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যান। এই সময়ে, হঠাৎ ঐ পশারশালী বন্ধু, কোন নিজ ইষ্ট সাধনের জন্য, একখানি উকীলের চিটী দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিলেন! উপকারী বন্ধু সংসারের গতি দেখিয়া অবাক্। এই সময়ে আর সকল বন্ধুর কথা আর ব্যক্ত করিয়া কাজ নাই। কেহ এই দারুণ বিপদের সময় হাসি উল্লাস করিতে লাগিলেন, কেহ সময় পাইয়া অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। যে সকল বন্ধুদিগকে আজীবন উপকার করিয়াছেন, ভ্রমেও তাঁহারা দেখিতে আসিলেন না—কেহ সময় বুঝিয়া ছল-চক্রে টাকা আদায় করিতে উদ্যোগী হইল; কেহ কোন্ স্থানে কোন্ কাজে ক্রটী হইয়াছে, ছল ধরিয়া নির্য্যাতন করিতে লাগিল! দুই দশটী টাকা গচ্ছিত ছিল, কেহবা সে টাকা যায় বুঝিয়া, হিসাব চাহিতে লাগিল! কেহবা, সর্ব্বাবয়বে মূর্ত্তিমান হইয়া রক্ত শোষণে লালায়িত হইল! উপকার করিবার ভাণ করিয়া গরল বিষ পান করাইতে চেষ্টিত হইল!! রোগী দেখিয়া শুনিয়া অবাক্!

ঘটনাচক্রে পড়িলে মানুষ শিক্ষা পায়। একজন লোক এক দিবস বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"অমুক লোক আপনার নিন্দা করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "কই আমি তাহার কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই, সে কেন আমার নিন্দা করিল!" কাহারও উপকার করিলেই সে অপকার করিবে বা নিন্দা করিবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথার শেষ সিদ্ধান্ত ইহা। এ সিদ্ধান্ত অতি কঠোর সিদ্ধান্ত। মানব-ঘৃণার ইহা অপেক্ষা উচ্চ দৃষ্টান্ত আর নাই। কিন্তু সংসারের অবস্থা পীড়নে প্রপীড়িত ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করেন, কৃতজ্ঞতা নামক স্বর্গীয় গুণটা এখন মহা স্বার্থ-সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। বিশ্বাস করিবে কাহাকে, মানুষ স্বার্থপরতার কদর্য্য কালিমার চির-আঁধারে মগ্ন!!

যদি কাহাকেও বিশ্বাস না করা যায়,তবে এই পৃথিবী কিরূপে বাসের যোগ্য হইবে? বিশ্বাস ভিন্ন এক দিন, এক মুহূর্ত্ত চলে না, অথচ বহুদর্শী লোকেরা বলেন, কাহাকেও

বিশ্বাস করবে না; যে তোমাকে আজ সুখ-শয্যায় বীজন করিতেছে, কাল সেও তোমার বুকে ছুরী মারিতে পারে। ঘটনাতেও, প্রতি-নিয়ত, একথা প্রমাণিত হইতেছে। যাহার প্রশংসায় জগৎ প্লাবিত, তাহার দৈনিক জীব-নের ব্যবহার, চতুর্দ্দিকের ঘটনারাশি পর্য্যা-লোচনা করিলে, আর কাহাকেও আদর করি-তে ইচ্ছা হয় না। স্বার্থপরতার মায়ায় মানুষ না সাধন করিতে পারে, এমন কাজ নাই। এই স্বার্থদাস-মানুষের সহিতই প্রতিনিয়ত ঘর-কন্না করিতে হইতেছে। বিশ্বাস না করিলে চলে কই? তুমি বিজ্ঞ, বাছিয়া বাছিয়া, কেবল লোক বাছিয়া বাছিয়া চলিতে বলি-তেছ। আমি দেখিতেছি, বাছিতে বাছিতেই যদি সময় গেল, তবে কাজ করিব কখন? তুমি বল, স্ত্রীকে বিশ্বাস নাই, স্বামীকে নাই, ভাইকে নাই, বন্ধুকে নাই, পুত্রকে নাই, কন্যাকে নাই;—নাই, নাই, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি বল, যাহাকে দান করিবে, তাহাকেও বিশ্বাস নাই; যাহার উপকার করি-বার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেছ, তাহাকেও বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস না থাকিলে এক মুহূর্ত্ত সংসার চলেনা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আমি লোক চিনি না, তুমি বিজ্ঞ, তুমি নিয়ত একথা বলিতেছ; তুমি চিনিয়া বুঝিয়া ত এখন কার্য্য-জগত হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া, কাহারও কিছু হইবে না, এই মানব-ঘৃণা (misanthropy) মন্ত্রকে জীবনের সার করি-য়া, বৃদ্ধ মন্ত্রীর সিদ্ধ-আসনে বসিয়া রহিয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া চলিলে, এই সংসার-কার্যালয়ের পাট তুলিয়া গহন বনে চলিয়া যাইতে হয়। ঠকিতেছি, ভাই, তবুও সংসার মায়া ছাড়িতে পারিতেছি না। দশবার প্রতা-রিত হইয়া, শতবার প্রতারিত হওয়ার জন্যই প্রস্তুত হইতেছি। আপন সৃষ্ট চক্রান্ত কৌশলে আপনিই পড়িয়া মজিতেছি। আগুনে পড়িয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,—অন্যে শত চেষ্টা করি-লেও তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। তুমিও, সেই রূপ, শত চেষ্টা করিয়াও, আমাকে বাঁচা-ইতে পারিতেছ না। শত উপদেশ, শত হিত-কথা পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বহুদর্শিতাও বহু-দর্শীর ন্যায় বুঝাইতেছে, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই; কিন্তু মায়া ছাড়িয়া, পরোপ-কার-ব্রত কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। আমি ত পারিলাম না, অন্যান্য সকলের মধ্যে সংসারমায়া ছাড়িতে পারিল কয় ব্যক্তি? মহামায়ার মহালীলা, মহাচক্রীর মহাচক্র। ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার কাহারও উপায় নাই।

ভালবাসা, মানুষের প্রকৃতি। ভাল না বাসিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি মানুষের মুখে প্রতিভাত, মানুষ, অগ্নি-প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, ঐ জ্যোতিতে প্রলুব্ধ। উহার সংস্পর্শে না যাইয়া মানুষ থাকি-তে পারে না। মানুষের সেবা করা, মানুষকে ভালবাসা মানুষের যেন স্বভাব। ভালবাসার মূলে বিশ্বাস। বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে মানুষ পারে না। মানুষের ভালবাসা যেন পতঙ্গের আগুন। ভালবাসার সৌন্দর্য্যে জগৎ আত্মহারা। মানুষ আর কোন স্থলে সংযম অভ্যাস করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ভাল-বাসার কুহকে যখন মানুষ পড়ে ও মজে, তখন সংযম বৃথা, ব্রত, নিষ্ঠা সবই পরাস্ত। যে বন্ধু বুকে মারিবার জন্য ছুরী শাণিত করি-তেছে, মানুষ তাহাকেই ভালবাসিয়া কোল দিবে; যে রমণী মানুষকে পুণ্যহারা করিয়া, কু-পথের ঘোর মায়াজালে জড়িত করিয়া পাপে মজাইতে চেষ্টিতা, তাহাকেই মানুষপ্রাণ সঁপিয়া

দিবে! মানুষ নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, পুণ্য-মমতা ভুলিয়া যায়—ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধন ভজন, উপদেশাদি সকলই ভালবাসার কুহকে ভুলিয়া যায়। ভালবাসার কুহকে মজে নাই, পৃথিবীতে এমন লোক বড় দেখা যায় না। মজিবার সময়, সকলের কথা,সকলের উপদেশকে মানুষ তুচ্ছ করে। সৎ অসৎ, সকল লোকই ভালবাসায় মজে। ভালবাসার কুহকে প্রতারিত, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, পার্কার। যাহারা আত্মীয়, তাহারাই সময়ান্তরে মহা অনিষ্টকারী সয়তান। এই সয়তানরূপী লোকের ভালবাসায় প্রতারিত কে নয়, জানি না। ভালবাসায় প্রতারিত গ্লাডষ্টোন, বিদ্যাসাগর—অপর দিকে পার্ণেল,ডিল্কে,বুলেঞ্জার। ভাল যে, মহৎ যে, জ্ঞানী যে, মানবদেবতা যে, সেও প্রতারিত; মূর্খ যে, মন্দ যে, অসৎ যে, সেও প্রতারিত। মানব-সাধারণকে ডুবাইতে এমন জিনিস পৃথিবীতে আর নাই! অন্যদিকে মানুষকে স্বর্গে উত্থিত করিতেও এমন আর কিছু নাই। ভালবাসিয়া লোক স্বর্গে যায়—ভালবাসিয়া লোক নরকেও যায়! ভালবাসা, বলিহারি তোর মোহিনী শক্তি! তোর কুহকে জগৎ মুগ্ধ, স্তম্ভিত,আত্মহারা!!

বিধাতার লীলা কেন এরূপ বিরোধী চক্রান্তে পূর্ণ,একথার মীমাংসা কেহই করিতে পারে না। কেন পাপ পুণ্যের অধিষ্ঠান, কেন পৃথিবীতে দেবাসুর-সংগ্রাম, কেহই বলিতে পারে না। বৈচিত্র্যের জটিল কথায় সকল সমস্যা মীমাংসিত হয় না। আলোকের ধারে অন্ধকার,পুণ্যের ধারে পাপ, সত্ত্বের ধারে রজঃ, সুবুদ্ধির ধারে কুবুদ্ধি,শ্রেয়ের ধারে প্রেয়ঃ, কুসুমের ধারে কণ্টক,ঝরণার ধারে পাষাণ,সাগরের স্নিগ্ধ বারিতে লবণ, চাঁদে কলঙ্ক,সম্পদের ধারে বিপদ,স্বাস্থ্যের ধারে রোগ, সংসারের কোলে শ্মশান,জীবনের কোলে মৃত্যু,সুদিনের ধারে দুর্দ্দিন—এ বিরোধী বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি কেন,কোন দার্শনিক,কোন বৈজ্ঞানিক আজ পর্য্যন্ত সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আধিব্যাধি, জরামরণ, পাপ প্রলোভন কেন মানুষকে অস্থির করে। নিরঞ্জনা-তটে বহুবর্ষব্যাপী সাধনায়ও বুদ্ধ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, উত্তেজনা, বীর্য্য, সাহসের অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট মহম্মদও তরবারীর সাহায্যে ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জ্ঞানীর জ্ঞান, দার্শনিকের দর্শন, ধার্ম্মিকের তপস্যা, কর্ম্মীর কৃতিত্ব—এই গভীর ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় সকল অকৃতকার্য্য!! কেন জগৎ এরূপ হইল,কেন প্রকৃতি কাঠিন্য-কোমলতায়, পাপ-পুণ্যে, ধর্ম্ম-অধর্ম্মে পূর্ণ হইল,কোথাও ইহার মীমাংসা নাই। আত্মার স্বাধীনতা প্রশ্নের মীমাংসায় ইহার মীমাংসা নাই,আত্মার পরাধীনতার কথাতেও ইহার মীমাংসা নাই। আত্মা স্বাধীন হউক আর পরাধীন হউক, কি আসিয়া যায়? বিধাতার রাজ্যে প্রতারণা কেন, পাপ কেন, অত্যাচার কেন, অন্ধকার কেন, অবিশ্বাস কেন? কেন, কে বলিতে পারে? অন্যদিকে লোক বুঝিয়াও ভুলে কেন, মজে কেন, পড়ে কেন, ডুবে কেন? কেন, কে বলিতে পারে? সকল শাস্ত্র এখানে নীরব। সকল শাস্ত্র, মহামায়ার মহাখেলা বলিয়া, নিরস্ত। তুমিও জান না, আমিও জানিনা—প্রকৃতি এরূপ কেন, মানুষই বা এরূপ কেন? মায়াবাদী না হইতে পারিলে বুঝি বা জগতে সুখ শান্তি কোথাও নাই!!

মায়াবাদীরা বলেন, সকলই খেলা। জড়, জড় নয়, মানুষ মানুষ নয়—সকলই নয়নের ধান্দা। অথবা বিশ্বের অন্তঃরালে যে শক্তি

বিদ্যমান,তাহারই বুদ্‌বুদ্‌, তাহারই প্রকাশ। শঙ্করই হউন, আর বার্কলীই হউন, হক্সলীই হউন, আর হিউমই হউন, যত তর্ক বিতর্ক করুন,জড়কে উড়াইতে কেহ সক্ষম নহেন; মায়াকে, অবিদ্যাকেও কেহ জগৎ হইতে তিরোহিত করিতে সমর্থ নহেন। জড় ও মায়া —একেরই কায়া, একেরই ছায়া। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সামঞ্জস্যেই এক চিন্ময় শক্তির প্রকাশ। সেই এক চিন্ময় শক্তি কোথায় কিরূপে আছেন,মানুষ তাহা জানে না। এই খানেই অজ্ঞেয়তাবাদের উদয়। মানুষের শক্তি নগণ্য,অতি সামান্য; মানুষ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝেনা। মানুষ একটী পরমাণুও বুঝে না, একটী অণুও ধারণা করিতে পারে না। এতই সামান্য জীব মানুষ! বুঝেনা-বলিয়াই কি অণু পরমাণু নাই? না, এ সিদ্ধান্ত হয় না। জগৎ আছে যখন,তখন স্রষ্টাও আছেন। আমি তুমি জানি না বলিয়াই যে তিনি নাই, একথা প্রতিপন্ন হয় না। সৃষ্টি আছে, সৃষ্ট মানুষ কেহই ইহা অস্বীকার করেন না; সৃষ্টির পশ্চাতে যতদূর সম্ভব ধাবিত হও,আদি কারণে, কারণের কারণে যাইতে যাইতে আদি কারণে তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি মহাজ্ঞানী স্পেন্সারই হও,আর মহা তর্কী মিলই হও,আদি কারণে তামাকে পৌছিতেই হইবে। অপর দিকে,জান না যাঁহাকে বলিতেছ, তাঁহার জন্য জগৎ ব্যতিব্যস্ত কেন, বলিতে পার কি? সৃষ্টির আদি হইতে সকল সভ্য এবং অসভ্য জাতি স্রষ্টার জন্য এত অশ্রু কেন ফেলিতেছে, উত্তর করিতে পার কি? আদিকারণকে মানুষ পূর্ণরূপে জানে না, তবুও মানুষ তাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগী। মানুষেরা ধর্ম্মের জন্য না করিয়াছে, এমন কাজ নাই। মন্দিরের ধারে মন্দির, গির্জ্জার ধারে গির্জ্জা মস্‌জীদের ধারে মস্‌জীদ তুলিয়া মানুষ ধর্ম্মের জন্য কত অর্থই ঢালিয়াছে! অন্যদিকে ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িয়াছে,আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়াছে, সুখ বিলাস ভুলিয়াছে, শেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই যে এত কীর্ত্তি, ইহা কেন? এই যে এত আত্মত্যাগ—ইহা কেন? কোন অদৃষ্ট বস্তুর জন্য,কেবল মিথ্যা বা নিরেট শূন্যের জন্য,মানুষ এতটা করিতে পারে না। মানুষ কিছু দেখিয়াছে,তাই মজিয়াছে। মানুষ কোন সত্যের উপকূলে পৌছিয়াছে, তাই এরূপ করিয়া থাকে। দুঃখ কষ্ট মানুষ তাই সহ্য করিতেছে। কোন সত্য বস্তুর আস্বাদন না পাইলে, মানুষ, এমন করিয়া কেবল গরল পান করিবার জন্য সংসারে থাকিত না। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে দেখাইয়াছি,সংসারে কোন সুখ,কোন শান্তি নাই। চতুর্দ্দিকে যখন কেবল স্বার্থ, কেবল অবিশ্বাস, তখন আর সুখ কোথায়? স্বার্থ-সাধনে সুখ নাই, কেবল পিপাসার বৃদ্ধি আছে; অবিশ্বাসে শান্তি নাই, কেবল মানব-ঘৃণার অসংযত অন্তর্দাহ আছে। এই মহাস্বার্থ-পূর্ণ, অবিশ্বাসপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ, অসুখপূর্ণ সংসার-রাজ্যে কিসের মায়ায় মানুষ জীবন ধারণ করিতেছে? যে ব্যক্তি ভালবাসার কুহকে বারম্বার প্রতারিত হইতেছে, সেই ভালবাসাতেই আবার সে ব্যক্তি জড়িত হইতে ছুটিতেছে। একজন বন্ধু প্রতারণা করিয়া পলায়ন করিতে না করিতে, আর একজনকে মানুষ বুকে তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। একটী পুত্রকে শ্মশানে পোড়াইয়া আর একটী পুত্রের মুখ-দর্শনের জন্য উৎফুল্ল হইতেছে? কোন আশা, কোন পরিণাম-চিন্তা না থাকিলে মানুষ ভীষণ বিপদ-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসারের কূলে ঘর বাঁধিত না। জন্মিয়া, জ্ঞানলাভের পরই

মরিত;—মৃত্যু আপনি না আসিলে আত্ম-হত্যা করিয়া মরিত। কি যেন একটা মহা-জ্ঞান, মহাচিন্তা, মহালক্ষ্য মানুষের প্রাণে চিরমুদ্রিত,চিরজাগ্রত,চিরসহায় হইয়া আছে, যাহার জন্য মানুষ প্রতারিত হইয়াও এই সংসারে থাকিতেই ভালবাসে; অথবা যাহার প্রতিকূলে চলিতে মানুষের সাধ্য নাই। সেই জ্ঞান,সেই চিন্তা,সেই লক্ষ্য,ঈশ্বর;—অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয়, অমীমাংসিত,জটিল, অশেষ,অলিখিত সেই এক আদি শক্তি। মানুষ বিজ্ঞানে দর্শনে ঈশ্বরকে পায় না, সত্য; কিন্তু প্রাণের মূলে, তাঁহার স্পষ্ট আদেশে, তাঁহার বাণীতে তাঁহাকে পায়। তুমি যদি আমাকে বল, আছ কেন,এতবার প্রতারিত হইয়াও আছ কেন? আমি বলি,তাঁহারই ইচ্ছাতে আছি,দেখিয়াও যাঁহাকে দেখি না, পাইয়াও যাঁহাকে পাই না, বুঝিয়াও যাঁহাকে বুঝি না। তাঁহার জন্যই আছি,যিনি দেখা না দিয়াও আমাকে মাতা-ইতেছেন, যিনি অনন্ত অশেষ স্বরূপের বিন্দু আভাস দিয়াই আমাকে বাঁচাইতেছেন; যিনি প্রতি মুহূর্ত্ত প্রাণে কথা বলিয়া আমাকেআশ্বস্ত করিতেছেন। তিনি সুদিনেও বন্ধু, দুর্দ্দিনেও বন্ধু। তিনি স্বাস্থ্যেও বন্ধু, রোগেও বন্ধু। তিনি জীবনেও বন্ধু, তিনি মরণেও বন্ধু। প্রতারিত হই, নিন্দিত হই,নির্যিত হই,পাপী হই, পরিত্যক্ত হই,— সব হইয়াও যে থাকি, কেবল তাঁহারই কথায়, তাঁহারই মায়ায়। অদেখা-দর্শন,অচেনা-মিলন, অকথিত-রূপ ও সেই অলিখিত-সৌন্দর্য্যের জন্য আমার প্রাণ সদা বিভোর। আমি সংসার করি, তাঁহারই জন্য। তুমি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সকল বিশ্বাসীই তোমাকে এই রূপ উত্তর দিবে। দুর্দ্দিন, সুদিন, রোগ শোক, জীবন মরণ, আলোক আঁধার—সব অবস্থাতেই তিনি। তিনি, তিনি,তিনি,—নিত্যই তিনি। রাখেন তিনি, মারেনও তিনি,আমরা কেবল কলের পুতুল মাত্র। এই তন্ময় জ্ঞান লাভ না হইলে, এই বিপদপূর্ণ, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও এই প্রতা-রণাময় সংসার উপকূলে কেহই সুখে, কেহই আরামে,কেহই শান্তিতে তিষ্ঠিতে পারিত না।

শেষ সিদ্ধান্ত এই,মানুষের প্রতারণা, মানু-ষকে সতর্ক করিবার জন্য; বন্ধুর কৃতঘ্নতা, দুর্দ্দিনের প্রকৃত বন্ধুকে চিনিবার জন্য; মানু-ষের রোগ, মানুষকে স্বাস্থ্যের পথে চির-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; পাপ প্রলোভন, মানুষকে ধর্ম্মে অটল করিবার জন্য; মৃত্যু, অনন্ত জীবনলাভের জন্য; অন্ধকার, মহা-জ্যোতি দর্শনের জন্য। এই বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যপূর্ণ প্রকৃতি মানুষকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে, ভাল হইতে ভালতে, সৎ হইতে আরো সতে লইয়া যাইবার জন্য। এ সকল অবস্থা, ঘটনা,বৈচিত্র্য, উন্নতির সিঁড়ি মাত্র; যাত্রীদিগকে অগ্রসর করিবার জন্য। যাঁহারা এইরূপ অর্থ না বুঝিয়া চলেন,এবং প্রতিকূল-অনুকূল-ঘটনা-নিরপেক্ষ হইয়া,সারকে চিনি-য়া, সারধনকে অবলম্বন ও লক্ষ্য করিয়া না চলেন, বৃথা তর্ক জালে তাঁহারা জড়িত হন, শেষে হয় অবিশ্বাসী, না হয় মহা নারকী হইয়া, বিষম দুঃখে কষ্টে সংসার-লীলা শেষ করেন। সংসার-বাদী, অবিশ্বাস-বাদী মানু-ষকে হইতেই হইবে, প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের যদি এইরূপ মীমাংসা না করেন। মানব-ঘৃণা (misanthropy) এ হেন লোকের পরিণতি, মানব বিদ্বেষ, এহেন লোকের অস্থিমাংস, মানব-নিন্দা পান আহার। মানুষ যতই কৃতঘ্ন হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মানুষের প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া, কেবল বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে

হইবে, খাটিতে হইবে, নরসেবা করিতে হইবে। মানুষের অস্থির প্রকৃতির ভিতরে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতরে, নানা বিচিত্র ঘটনার ভিতরে এক অদ্বিতীয় চিন্ময় শক্তি হাসিতেছেন, এক অপরূপ জ্যোতি ফুটিতেছেন। যাহারা তাহা না দেখিল, সংশয়, অবিশ্বাস, অপ্রেম, কুজ্ঞান, পরনিন্দা-গরলে তাহারা যে মজিবে, কিছুই বিচিত্র নয়। মানুষের দুর্দ্দিনে এক মাত্র বন্ধু তিনি,—চির-অবিচলিত, চির-অপরিবর্ত্তিত তিনি। চিরদিন উপেক্ষিত হইয়াও তিনি মানুষের নিকটে প্রতিনিয়ত সত্যে, ন্যায়ে, জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে প্রতিভাত। তিনি, মানুষকে অসারের সার এবং প্রকৃত বন্ধুত্ব বুঝাইয়া, দুর্দ্দিনের মধ্যে সুদিনের অভ্যুদয়ের মর্ম্ম প্রতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জগৎকে ও তৎসহ আমাদিগকে ঘৃণা হইতে, মানব অবিশ্বাস ও সন্দেহবাদ হইতে চিরকালের জন্য রক্ষা করুন। তাঁহারই মঙ্গলইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রতিবাদ।

গত আষাঢ়ের "সাহিত্যে" "কুরুক্ষেত্র" সমলোচনা প্রবন্ধে লেখকের অদ্ভুত মীমাংসা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সাহিত্য-সম্পাদক জানিয়া শুনিয়া একটি প্রমাণিত সত্যের অপলাপ করিতেছেন।

চতুর্থ বৎসরের একাদশ সংখ্যা "সাহিত্যে" বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, কৃষ্ণচরিত্র আবির্ভাবের মৌলিকতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন, ঐ বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যায় শ্রীমান কামাখ্যা মোহন তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদে দেখান হয় যে, কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার আবিষ্কৃত কৃষ্ণচরিত্র লইয়া, অন্য লেখকেরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়াছেন। কামাখ্যা বাবু সকল কথা স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু তিনি এমন কথাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে, বঙ্কিম বাবু ও নবীন বাবু সমসাময়িক কবি, এ চিন্তা কি এক সময়ে বা এক ভাবে উভয়ের মনে আসিতে পারে না? পারে,—কিন্তু যেখানে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সেরূপ চিন্তা বঙ্কিম বাবুই অগ্রে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে অন্য লেখদিগকে এবং স্বয়ং নবীন বাবুকেও বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী না বলিব কেন? বেদান্তের পর যে কেহ যে কোন দেশে "বেদান্তবাদ" (নির্গুণ ব্রহ্মবাদ) প্রচার করিয়াছেন, সকলকেই বেদান্তের নিকট ঋণী বলিতে হইবে,—আশ্চর্য্য নয় যে, বেদান্তের মত ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং স্পিনোজা, কাণ্ট বা হার্বার্ট স্পেন্সর তাহা হইতে আপনাদের মত গঠন করিয়া লইয়াছেন, সংস্কার পরের কথা। বাল্মিকীর সীতার পর যে সব সতী-চরিত্র রচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে, তাহারা সকলই বাল্মীকির আদর্শে গঠিত। পৃথিবীর সকল লেখকই এরূপ পূর্ব্বগামীদিগের নিকট ঋণী,—কেবল নহে এক বেদ!! এখন যে দিক্ দিয়া দেখি না কেন, বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা, নবীন বাবুর কৃষ্ণচরিত্র-চিন্তার প্রবর্ত্তক, উভয়ের মোট কথাও একই,—কৃষ্ণের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন, ব্রজলীলা প্রভৃতি ইহার মধ্যগত অবান্তর কথামাত্র। চতুর্থ বৎসরের "সাহিত্যে" কামাখ্যা বাবুর এই প্রতিবাদ পড়িয়া হীরেন্দ্র বাবু একটু ভাসা রকম জবাব দেন; শুনিয়াছি, কামা-

খ্যাবাবু তাহারও প্রতিবাদ করেন; কিন্তু সেই সময়ে সাহিত্য-পতি বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু হওয়াতে, কামাখ্যা বাবুর প্রস্তাবানুসারে, "সাহিত্য-সম্পাদক" মহাশয় ও কামাখ্যা বাবু একমত হইয়া, সে প্রতিবাদ পত্রস্থ করেন নাই। এখন এত দিন পরে, হীরেন্দ্র বাবু সেই কথা পুনরুত্থাপন করিয়া, একেবারে "মোসাহেবি" ধরণের মীমাংসা সমেত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন, অথচ "সাহিত্য-সম্পাদক" মহাশয় জানিয়া শুনিয়া কামখ্যা বাবুর প্রতিবাদের নামটি পর্য্যন্ত লন নাই; বাঙ্গালা-সাহিত্যে এ রকম চলে নাকি?

"সকলকে যে উপদেশ দাও, নিজেও তাহা প্রতিপালন করিও।"

শ্রীবোধানন্দ স্বামী সরস্বতী।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়নগর। (১)

পৌণ্ড্র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কখন কখন সমস্ত রাজ্যও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে অভিহিত হইত (১)। বর্ত্তমান সময়ে মালদহের অন্তর্গত যে স্থান পাড়ুয়ার জঙ্গল-নামে খ্যাত, তাহাই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাচীন গৌড়। ওয়েষ্টমেকট সাহেব বলেন যে, রঙ্গপুরের অন্তর্গত গোবিন্দ-গঞ্জের সন্নিকট বর্দ্ধনকোটী গ্রামই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (২)। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ক্যানিংহাম বলেন যে, বগুড়ার অনতিদূরবর্ত্তী মহাস্থান নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। ফলতঃ ইহার কোন অনুমানই সুসঙ্গত বোধ হয় না। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে "(কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী) গৌড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং জয়ন্ত নামক গৌড় রাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কার্ত্তিকেয় দেবের মন্দিরে নৃত্যদর্শন মানসে প্রবেশ করিলেন (৩)।" ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গঙ্গাতীরে বা গঙ্গার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন পাণ্ডুয়া নগর, দক্ষিণদিকে বর্ত্তমান মালদহ নগর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে প্রায় বর্ত্তমান মহানন্দাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কালিন্দ্রী নদী উত্তরদিকে পিরগঞ্জের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত ছিল। পিরগঞ্জ হইতে একটি নদীর শুষ্ক খাত পশ্চিম দিকে আড়াইডাঙ্গার নিকট বর্ত্তমান কালিন্দ্রীর স্রোতের সহিত মিলিত দেখা যায়। এই শুষ্ক খাতই কালীন্দ্রীর পুরাতন খাত। এক্ষণে নদী সরিতে সরিতে অনেক দক্ষিণে আসিয়া পড়িয়াছে। কালিন্দ্রীর উত্তর তীরের জলাভূমি ও মৃত্তিকা দেখিলে এই উক্তির সমর্থন হইবে। অদ্যাপিও বর্ষাকালে কালিন্দ্রীনদীর উত্তর তীরের অনেক অংশ জলমগ্ন হইয়া বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করে। এই নদী গঙ্গা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গঙ্গাস্রোত এই কালিন্দ্রী দিয়াই প্রবাহিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানের কালিন্দ্রী নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ইহা আধু-

(১) লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

(২) Traces of Buddhism in Dinajpur.

(৩) রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৫ - ৪ বিশ্বকোষকৃত অনুবাদ।

নিক নাম। বোধ হয়,গঙ্গাস্রোত পরিবর্ত্তনের পরে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার মতের সমর্থনার্থ বলেন যে, হোয়েনসাংয়ের বর্ণনানুসারে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন নগর রাজমহলের নিকটস্থ গঙ্গানদী হইতে ৬০০লি অর্থাৎ প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

মহাস্থানও রাজমহল হইতে এইরূপ দূরবর্ত্তী হইবে। কিন্তু হোয়েনসাং চম্পানগর হইতে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন নগরে গমন করেন। চম্পানগর ভাগলপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। তৎকালে গঙ্গাস্রোত রাজমহলের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিলনা (১); কালিন্দ্রী দিয়া প্রবাহিত ছিল। ভাগলপুরের নিম্নস্থ গঙ্গানদী হইতে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের দূরত্ব ১০০ মাইল, ইহাই হোয়েনসাংয়ের লিখার উদ্দেশ্য বোধহয়। আর ভাগলপুর হইতে বর্ত্তমান পাঁড়ুয়ার জঙ্গল ও ন্যূনাধিক ১০০ মাইল হইবে। পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন নগর হিন্দু রাজত্ব-সময়ে স্থাপিত হয়। হিন্দু-রাজগণ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া করতোয়া তীরে রাজধানী করিবেন,ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না।

মালদহ জিলায় অদ্যাপিও অনেক পুণ্ড্র (পুণ্ডরী বা পুঁড়ো) জাতি বাস করে (২)। বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলে এই জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না। ইহাতেও বোধহয় যে,মালদহেই পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন নগর অবস্থিত ছিল। পাণ্ডুয়া এই নামটীও পৌণ্ড্রনামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় (৩)। পাণ্ডুয়ার ২২ হাজারী ও ৬ হাজারী দর্গার মুসলমান কর্ম্মচারিগণ বলেন যে, মুসলমানদিগের আগমনের অনেক পূর্ব্বে পাণ্ডুয়াতে পণ্ডুদের রাজধানী ছিল,এই উক্তি যে পরম্পরা কিম্বদন্তী হইতে আগত এবং এই "পণ্ডু" যে পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ, তাহার সন্দেহ নাই। পাণ্ডুয়ার বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষাদিতে অনেক হিন্দু দেব দেবী ও কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন যে, "যে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ এখনও কিয়ৎ পরিমাণে দণ্ডায়মান, তাহা পাণ্ডুয়ার প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের মালমসলায় নির্ম্মিত হইয়াছিল" (৪)। কেহ কেহ বলেন যে, গৌড়ের হিন্দু দেবালয়াদি ভগ্ন করিয়া তাহার মালমসলায় পাণ্ডুয়ার মসজিদাদি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু মুসলমানেরা যে সময়ে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থাপন করেন,সেই সময়ে পাণ্ডুয়া নদী হইতে অনেক দূরে ছিল। যে সকল প্রস্তরে আদিনা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আকৃতি ও পরিমাণ দেখিলে এই সকল প্রস্তর নৌকা ব্যতীত শকটে গৌড় হইতে নীত হইয়াছিল, এমত বোধ হয় না। প্রাচীন পাণ্ডুয়ার দেবালয়াদি ভগ্ন করিয়াই যে মুসলমান পাণ্ডুয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই উপলব্ধি হয়।

(১) ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে সাহ্‌সুজার শাসন সময়ে গঙ্গাস্রোত গৌড়ের নিকট হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজমহলের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। Stewarts' History of Bengal, Calcutta Edition, page 158.

(২) ইংরেজ বাজারের এক অংশের নাম পুঁড়োটুলী। এই স্থানে অধিকাংশই পুণ্ডরী জাতি বাস করে। গত লোক সংখ্যা-গণনায় এই জিলার পুণ্ড্রাজাতির সংখ্যা ৯১৭৩।

(৩) ক্যানিংহাম সাহেব বলেন যে,ইহার প্রাচীন নাম পাণ্ডুবীয় ছিল। এক্ষণে সংক্ষিপ্ত ও অপভ্রষ্ট হইয়া পাণ্ডুয়া হইয়াছে। তিনি অনুমান করেন যে, পাণ্ডুবীনামে এক প্রকার জলচর পক্ষী এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুবী পক্ষীর নামানুসারেই পাণ্ডুবীয় বা পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। কিন্তু এই পক্ষীর পাণ্ডুবী নাম যে পাণ্ডুয়া হইতে উৎপন্ন হয় নাই,তাহা কে বলিতে পারে?

(৪) সাহিত্য,তৃতীয় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র,১২৯৯।

পৌণ্ড্র ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন উভয়ই প্রাচীন নাম। গৌড় নাম তৎপরে প্রদত্ত হইয়াছিল। গৌড় ও পৌণ্ড্র নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ নানারূপ অদ্ভুত কল্পনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক হুইলার সাহেব অনুমান করেন যে,আফগানিস্থানের অন্তর্গত হিরাট ও গজনী নগরের মধ্যে যে গোর নামক দুর্গ আছে (যাহা হইতে গোরী বংশের নাম হইয়াছে),তাহারই নামানুসারে আফগানেরা ইহার নাম গৌড় রাখিয়াছিলেন (১)। বলা বাহুল্য যে, এই অনুমান সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কারণ,দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোরীবংশের আধিপত্য ভারতবর্ষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমান আধিপত্য বঙ্গে বিস্তৃত হয়। আর ইহার অনেক পূর্ব্বে পাল ও সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ও প্রস্তরফলকে এবং কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে ও শ্রীহর্ষচরিতে গৌড়েশ্বর, গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র, গৌড়রাজ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ক্যানিংহাম সাহেব বলেন যে, পূর্ব্বকালে এ প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত গুড় উৎপন্ন হইত, এজন্য এদেশ গৌড় নামে খ্যাত হয়।

পুণ্ড্র শব্দের এক অর্থ ইক্ষু বিশেষ। এজন্য মনিয়র উইলিয়ামস্ সাহেব স্বপ্রণীত সংস্কৃত অভিধানে গৌড় ও পৌণ্ড্রদেশের অর্থ ইক্ষুর দেশ (Country of the sugar-cane) বলিয়াছেন (২)। বোধ হয় এই জন্যই ক্যানিংহাম সাহেব ঐরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পুণ্ড্র অতি প্রাচীন দেশ। রামায়ণ, মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহৎসংহিতা,এমন কি ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদেশের নাম দৃষ্ট হয় (৩)। হরিবংশে লিখিত আছে যে,পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশ সমুদ্ভূত যযাতির পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে বলি নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও পুণ্ড্র নামে তাঁহার ৫ পুত্র ছিল। তাঁহারা আপন আপন অংশে যে যে দেশ প্রাপ্ত হন,সেই সকল দেশ তাঁহাদের নামানুসারে কথিত হইতে থাকে। পুণ্ড্রের নামানুসারে এদেশের নাম পুণ্ড্র হয় (৪)।

আইন আকবরীমতে ভোজ-গৌড় নামা নৃপতি গৌড়ের প্রথম রাজা। তাঁহার নামানুসারেই, বোধ হয়, গৌড় নাম হয়। আইন আকবরী অনুসারে খ্রীষ্টীয় শকের ৮০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ভোজ-গৌড় রাজত্ব করেন, এবং সেই সময় হইতেই গৌড় নাম আরম্ভ হয়। সুতরাং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ইহারও পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থা দর্শন করিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা প্রাচীন গৌড় নগর একই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিত ছিল, এমত বোধ হয় না। ইংরেজবাজারের ৭।৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে পিছলীগঙ্গারামপুর নামক স্থানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে পালবংশীয় রাজাদিগের ও আদিশূরের রাজধানী ছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ আছে। ইংরেজবাজারের কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিমে অমৃতিনালা নামে একটি ক্ষুদ্র খাল

(১) Wheeler's short History of India, Page 122 (note.)

(২) এই অর্থ অন্য কোন অভিধানে দৃষ্ট হয় না।

(৩) রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ, ২৩ শ্লোক। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায়। অগ্নিপুরাণ ২৭৬ অধ্যায় ১১ শ্লোক। স্কন্দপুরাণ পৌণ্ড্রখণ্ড। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অধ্যায় ১২ শ্লোক। বৃহৎসংহিতা ১৪ অধ্যায় ৭ শ্লোক।

(৪) হরিবংশ ৩১ অধ্যায়।

আছে। এই খাল কালিন্দ্রী নদী হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় উত্তর দক্ষিণ বাহিনী হইয়া দ্বারবাসিনীর নিম্ন দিয়া গৌড়ের বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষের পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাচীন সময়ে গঙ্গানদী এই খাত দিয়া প্রবাহিত ছিল। পিছলীগঙ্গারামপুর গঙ্গা ও কালিন্দ্রীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত ছিল। তথাকার এবং অমৃতিনালাতীরস্থ অসংখ্য ইষ্টক প্রস্তরাদি ও ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এক সময়ে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

গঙ্গাস্রোত কালিন্দ্রী হইতে অমৃতিনালা দিয়া প্রবাহিত হইবার পরে, বোধ হয়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাণ্ডুয়া হইতে রাজধানী এই স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তদবধি রাজধানী গৌড় নামেই খ্যাত ছিল। মহারাজ আদিশূর বৌদ্ধ পাল-রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়াধিকার করেন। তদবধি বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত এই স্থানেই রাজধানী ছিল। পরে গঙ্গাপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ক্রমে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হয়।

ইংরেজ বাজারের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে রাজমহাল রাস্তার পার্শ্বে বাঘবাড়ী নামে একটি স্থান আছে। ইহা বল্লালবাড়ী নামে কথিত হয়। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা, গড় ও পরিখা ব্যতীত আর কোন চিহ্নই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। পিছলীগঙ্গারামপুরে গঙ্গাপ্রবাহ শুষ্ক হওয়ার পর, বোধ হয়, বল্লাল সেন এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানীও ঠিক গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল না। রাজবাটী হইতে অনতিদূরে গঙ্গাতীরে দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত একটি উচ্চ রাস্তা ছিল, এই রাস্তা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ সেনের সময় রাজধানী বাঘবাড়ী ছিল না। তাঁহার সময়ে গঙ্গাপ্রবাহ, বোধ হয়, আরও দক্ষিণ দিকে সরিয়া পড়িয়াছিল; এজন্য তিনি বাঘবাড়ীর আরও দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান রামকেলী গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে রাজধানী স্থাপন করতঃ তাহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। মুসলমানেরা ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে রাজধানী করেন। তদবধি এই নগরের আর স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বস্তুতঃ পিছলীগঙ্গারামপুর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান মহদীপুর পর্য্যন্ত অমৃতিনালা ও ভাগীরথী তীরস্থ ভগ্নাবশেষ, সরোবরাদি ও মৃত্তিকা প্রোথিত ইষ্টকাদি দৃষ্টি করিলে এবং গঙ্গানদী যে কালিন্দ্রী হইতে সরিতে সরিতে প্রথমে অমৃতনালা, তৎপরে ভাগীরথী ও তৎপরে পাগলা নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক্ষণে তাহারও ৬।৭ মাইল পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, গঙ্গার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়নগরেরও উল্লিখিত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব নাম লুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায় যে, গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরস্থ অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও নগর অনেক দিন হইতে নদীশায়ী হইয়াছে, কিন্তু তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণ যে যে স্থানে একত্রে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল স্থানই পূর্ব্বনামে অভিহিত হইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, গঙ্গাতীরস্থ পূর্ব্বতন নবদ্বীপ, পদ্মাতীরস্থ পূর্ব্বতন রাজনগর, ভাগ্যকুল, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান, অনেক দিন হইল, নদীগর্ভস্থ হইয়া এক্ষণে অপর তীরে নীত হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ একত্র হইয়া যে যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই সকল স্থানই এখনও পূর্ব্বনামে

কথিত হইতেছে। গৌড়নগর সম্বন্ধেও যে তদ্রূপ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু রাজত্ব সময়ের এই নগরের কোন বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাগরদীঘী ও দ্বারবাসিনীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত হিন্দু রাজত্বের কোন চিহ্নই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। কমলাবাড়ী, দ্বারবাসিনী, ফুলবাড়ী, ব্যাসপুর, ধর্ম্মপুর, পাতালচণ্ডী, রামকেলী প্রভৃতি হিন্দু নাম দেখিয়া বোধ হয় যে,কমলাবাড়ী হইতে রামকেলী পর্য্যন্ত হিন্দুগৌড় বিস্তৃত ছিল। ক্যানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে,ফুলবাড়ীর পুরাতন দুর্গ হিন্দু রাজপ্রাসাদ ছিল।

মুসলমানদিগের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজ ইতিহাস-লেখক ফেরিয়া সৌজা এই নগর দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ ছিল (১) এবং পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এত জনতা হইত যে, অনেক লোক পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। রাস্তাগুলি বিলক্ষণ প্রশস্ত ছিল এবং সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষার জন্য পথের দুই পার্শ্ব বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত ছিল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন্ হামিল্টন সাহেব গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া এক বিস্তৃত বিবরণ লিখেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ সকল স্বয়ং দর্শন করিয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

এই নগর উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ২ মাইল প্রশস্ত ছিল। নগরের পরিমাণ ফল প্রায় ১৩ বর্গমাইল এবং উপনগর অর্থাৎ সহরতলীসহ প্রায় ২০।৩০ বর্গ মাইল ছিল। নগরের পশ্চিমভাগ ভাগীরথী নদী প্রবাহিত ছিল। পূর্ব্বভাগে কতক মহানন্দা নদী দ্বারা,কতক কতকগুলি বিলের দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। এই দিকে বিলের পার্শ্ব দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দুই শ্রেণী গড় ছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া একটী পরিখা ছিল। জলপ্লাবন হইতে রক্ষার জন্য, বোধ হয়, এই দিকে দুই শ্রেণী গড় ছিল। উত্তর দিকে সোণাতলা হইতে মহানন্দাতীরে ভোলাহাটের অপর পার পর্য্যন্ত প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ একটী মৃত্তিকা গড় ছিল। ইহার পরে নগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত আরও দুইটী গড় ছিল। ইহার একটী সাদুল্লাপুর হইতে অপরটী পাতালচণ্ডী হইতে পরস্পর সমান্তরালভাবে পূর্ব্বদিকের গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাতালচণ্ডী হইতে বিস্তৃত এই গড় অর্থাৎ উত্তরদিকের তৃতীয় গড় লোহাগড় নামে খ্যাত। পশ্চিমদিকে সোণাতলা হইতে নগরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভাগীরথীর তীর দিয়া বিস্তৃত একটী গড় ছিল। ভাগীরথীর সহিত সংলগ্ন একটী পরিখা বা ক্ষুদ্র খাল পূর্ব্বদিকের বিলের সহিত সংযুক্ত ছিল,এই খালও উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটী গড় নগরের দক্ষিণ সীমা ছিল। ইহার মধ্য দিয়া কোতওয়ারী দ্বার নামে একটী অত্যুচ্চ সুরক্ষিত দ্বার ছিল। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই সকল গড় ও পরিখার প্রায় অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে; কেবল মাত্র স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। গড় গুলি জলপ্লাবন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত এবং রাস্তারও কার্য্য করিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

(১) ডাক্তার বুকানন হামিল্টন অনুমান করেন যে, ইহার লোকসংখ্যা ৬।৭ লক্ষের অধিক ছিল না।

ভগবদ্গীতা।

৪র্থ অধ্যায়।

জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগ।

জন্ম আর কর্ম্ম মম দিব্য এইরূপ
স্বরূপেতে জানে যেই—দেহ ত্যজি আর
না লভে জনম, পার্থ, পায় সে আমারে। ৯
ত্যজি রাগ ভয় ক্রোধ, হয়ে আমাময়
আমারে আশ্রয় করি, বহু জ্ঞান তপে
হয়ে পূত—পায় তারা আমার স্বভাব। ১০

যে যেরূপ করে পার্থ ভজনা আমার,
সেই মত অনুগ্রহ করি আমি তারে,—
নরে সবে সর্ব্বরূপে চলে মম পথে। ১১

(৯) দিব্য—অপ্রাকৃত (শঙ্কর, রামানুজ, মধু)। অলৌকিক (গিরি, স্বামী)। ঐশ্বরীয় (শঙ্কর)। নিত্য ত্রিকাল ব্যাপী লীলাময় (বলদেব)।

যে জানে স্বরূপে—ঈশ্বরের এই অবতার মায়া-রূপ (শঙ্কর); অর্থাৎ কল্পিত, বাস্তব নহে (গিরি)। মায়া বলে ভগবান জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য লৌকিক জন্ম ও কর্ম্মের অনুকরণ করেন, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার স্ফূর্ত্তি হয় (মধু)।

(১০) ত্যজি রাগ ভয় ক্রোধ—শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বা জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে ভয় ও ক্রোধ এবং তৃষ্ণা দূর করিয়া (মধু) পরম কারুণিক ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্বাবতারের দ্বারা ধর্ম্ম পালন করেন, এইরূপ জ্ঞানে চিত্তবিক্ষেপের কারণ দূর করিয়া (স্বামী)।

আমাময়—(মূলে আছে মন্ময়) ব্রহ্মবিদ্, আত্মাতে ও ঈশ্বরে অভেদদর্শী (শঙ্কর, গিরি) মদেকচিত্ত (স্বামী, বলদেব) তৎপদার্থ ও ত্বং পদার্থ অভেদে সাক্ষাৎ-কারী (মধু)।

আমাকে আশ্রয়—একান্ত প্রেমভক্তি দ্বারা আমার (ঈশ্বরে) শরণাগত হইয়া (মধু)।

জ্ঞানতপে—জ্ঞানই পরমাত্মবিষয়ক তপ (শঙ্কর) আত্মজ্ঞান ও তৎপর পরিপাক হেতু স্বধর্ম্ম (স্বামী)। সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হেতু বলিয়া জ্ঞানকেই তপ বলা হইয়াছে (মধু)। ঈশ্বরের জন্মাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ কঠিন সাধনা-সাধ্য বলিয়া তপ, অথবা যে বিষয়ে সংশয় নির-সনরূপ তপ (বলদেব)। আমার (ঈশ্বরের) জন্মকর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানাখ্য তপ (রামানুজ)।

পায় তারা—পুরাকাল হইতে অনেকে এইরূপে পাইয়াছেন (বলদেব স্বামী)। অজ্ঞান নাশ হেতু পায় (মধু)।

আমার স্বভাব—(মূলে আছে আমার ভাব) আমার বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ভাব (বলদেব)। ঈশ্বর ভাব বা মোক্ষ (শঙ্কর)। আমার রূপ বা বিশুদ্ধ সচ্চিদা-নন্দঘন মোক্ষ, জীবন্মুক্তাবস্থা (মধু)। আমার সাযুজ্য, ঈশ্বর প্রসাদে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ হইলে চিদংশে জীব ঈশ্বরে এক হয় (স্বামী)।

এই নবম ও দশম শ্লোক সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। নবম শ্লোকে আছে, ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ জানিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কিরূপে এই পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়, তাহাই পর শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ (ভক্তিবাদীরা) বলেন যে, অবতার তত্ত্ব হইতে ঈশ্বরের করুণা বুঝিয়া যে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে পারে ও তাঁহার কর্ম্ম অনুকরণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস পূর্ব্বক রাগ দ্বেষ ভয় প্রভৃতি বিক্ষেপ কারণ দূর করতঃ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই ক্রমে মুক্ত হয়, বা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ লাভ করে। কেহ (অদ্বৈতবাদীরা) বলেন, অবতারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা যায়। ঈশ্বরের অবতার বা কর্ম্ম যে কাল্পনিক মায়াময়, ইহা বুঝিলে জ্ঞান লাভ হয় ও মুক্ত হওয়া যায়। শঙ্কর ও গিরি বলিয়াছেন, এই দশম শ্লোকে যে মোক্ষমার্গ বিবৃত হইল, তাহা নূতন নহে, বহুকাল প্রবর্ত্তিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, নবম শ্লোকে যে অবতার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য মুক্তি পথও আছে। সেই পথ দশম শ্লোকে বিবৃত হই-য়াছে। শঙ্কর ও গিরি বলেন, এই দুই শ্লোকে পূর্ব্বাপর প্রচলিত মুক্তিমার্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামী বলেন, ইহাই ভক্তিমার্গ। কিন্তু এই শ্লোকে বোধ হয় কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান এই তিন মার্গেরই সামঞ্জস্য—বা একত্র-সাধ্য ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(১১) যে যেরূপে—যে যে প্রকারে, বা যে প্রয়োজনে অথবা যে ফল অভিলাষ করিয়া আমায় প্রপন্ন হয়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, ইহারাই

কর্ম্মসিদ্ধি লাভ তরে আকাঙ্ক্ষা যাদের
এই লোকে করে তারা দেবতার পূজা—
কর্ম্ম জাত সিদ্ধি হেথা আশু হয় লাভ। ১২

ঈশ্বর ভজনা করে (১।১৬) তন্মধ্যে আর্ত্তের আর্ত্তিহরণ করিয়া,অর্থার্থীকে অর্থ দিয়া,জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান-কারীকে জ্ঞান দিয়া ও জ্ঞানীকে মোক্ষফল দিয়া ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন (শঙ্কর মধু)। যে যে প্রকার নিজ প্রয়োজন অনুরূপ সংকল্প করিয়া আমাকে আশ্রয় লয়,তাহার বাঞ্ছামত আমি তাহাকে ভজনা করি বা আমার দর্শন দিই (রামানুজ)। সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবে যেরূপে আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে তদপেক্ষিত ফল দান করি (স্বামী)।

অনুগ্রহ করি—(মুলে আছে "ভজাম") ভজনা করি,অর্থাৎ অনুগ্রহ করি, (শঙ্কর, স্বামী)। রামানুজ অর্থ করেন, তাহার মনোমত আমার যে স্বরূপ, তাহাই দেখাই।

মম পথে—কর্ম্ম ও জ্ঞান লক্ষণযুক্ত আমার ভজনমার্গে চলে (স্বামী, মধু, গিরি)। যে যেরূপ ফলার্থী হইয়া ও যে কর্ম্মের অধিকারী হইয়া চেষ্টা করে, তাহারা সকলেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথে চলে (শঙ্কর)। শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে,সৃষ্টিকালে ঈশ্বর দুই রূপ মার্গ মাত্র নির্দ্ধারিত করেন —প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। ইহা ব্যতীত আর অন্য মার্গ নাই।

সর্ব্বরূপে চলে—ইন্দ্রাদি পূজা করিলেও তাহাই আমার ভজন মার্গ (মধু, স্বামী, গিরি)। যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গ আছে, সকলই আমার উপাসনা মার্গ (বলদেব)। আমার স্বরূপ অবাঙ্মনসগোচর হইলেও সকল লোকেই সকল প্রকারে আমারই স্বভাব আপন অধিকার অনুসারে অনুভব করিয়া আমার অনুসরণ করে। (রামানুজ)। (গীতায় ৩।২৩, ৭।২১ ও ৯।২৩ শ্লোক দৃষ্টব্য।)

(১২) কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ তরে—কর্ম্মফল লাভ জন্য (রামানুজ), পশু পুত্রাদি ফললাভ জন্য (বলদেব), ফলনিষ্পত্তি (স্বামী, শঙ্কর, মধু)।

স্বামী, শঙ্কর ও মধু বলেন, কেবল মোক্ষলাভ জন্য কোন লোকে ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় না, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। রামানুজ ও বলদেব বলেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগও দুর্লভ; লোকে সাধরণতঃ সকাম কর্ম্মমার্গ-গামী হয়, ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

গুণ আর করমের বিভাগ করিয়া
সৃজিয়াছি বর্ণ চারি—কর্ত্তা আমি তার,
তথাপি জানিও মোরে অকর্ত্তা অব্যয়। ১৩

দেবতার পূজা—ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা (শঙ্কর, স্বামী, মধু) অজ্ঞান বশতঃ তাহারা নিষ্কামভাবে ভগবান বাসুদেবের পূজা করেনা (মধু)। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে আছে, "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সম্বেদ,যথা পশুরেবং স দেবানাম্"। গিরি ইহার ব্যাখ্যাকালে বলেন, আমাদের হলবহনাদি দ্বারা পশু যেরূপ আমাদের উপকার করে, অথচ তাহা তাহাদের জ্ঞানকৃত নহে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা যাগাদি দ্বারা দেবতার উপকার করে। রামানুজ বলেন, ভগবানই দেবতা-আত্মভূত ও সকল যজ্ঞের ভোক্তা।

এই লোকে হেথা—(মূলে আছে "মানুষে লোকে") অর্থাৎ এই মনুষ্য লোকে। কেননা কেবল এই মনুষ্য লোকেই শাস্ত্রাধিকার আছে (শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন,মনুষ্যলোকে শীঘ্র কর্ম্মফল সিদ্ধি হয়,—ইহা বলাতে এই বুঝায় যে অন্য লোকেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কর্ম্মফল সিদ্ধি হয়। রামানুজ বলেন, মনুষ্যলোক ব্যতীত অন্য লোকও আছে, ইহাতে কেবল তাহাই সূচিত হইয়াছে।

আশু হয় নাই—মনুষ্য লোকের বিশেষত্ব এই যে, এখানে বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্ম বিভাগ আছে। এই বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্ম অধিকারীদের সেই কর্ম্মজ সিদ্ধি শীঘ্র লাভ হয় (শঙ্কর)। সকাম কর্ম্মফল লাভ সহজ। কেবল জ্ঞানফল কৈবল্য দুষ্প্রাপ্য (স্বামী)। রামানুজ বলেন, অনাদিকাল প্রবৃত্ত অনন্ত বাসনা হেতু সঞ্চিত পাপ যাহার ক্ষীণ হয় নাই,যে অবিবেকী, সে পুত্র পতি অন্ন প্রভৃতি ফল আশু লাভ করিতে অভিলাষী অথবা স্বর্গার্থী; এই ফল লাভ জন্য তাহারা সেই রূপ ফলদাতা ইন্দ্র প্রভৃতি আরাধনা জন্য সকল কর্ম্ম করে। এই সকল দেব-যজ্ঞ হইতে যে ধর্ম্মাখ্য সুসংস্কার উৎপন্ন হয়,তাহাই স্বর্গ ফল প্রাপ্তির কারণ।

কেবল যে সংসার দুঃখ-বিত্রস্ত, উদ্বিগ্ন-হৃদয়, সে-ই এই দুঃখ নিবৃত্তি জন্য বা মোক্ষ জন্য আমার আরাধনা রূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল (রামানুজ, বলদেব)।

(১৩) গুণ আর করমের বিভাগ—সত্ত্ব,

রজ ও তম এই প্রকৃতির গুণের বিভাগ এবং তদনুসারে কর্ম্ম বিভাগ। গুণ ভেদ অনুসারে কর্ম্মও ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে লোকের প্রকৃতি সাত্ত্বিক, তাহারা সাত্ত্বিক কর্ম্ম করে; যে রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সে রাজসিক কর্ম্ম করে; যাহার স্বভাব তামসিক, সে তামসিক কর্ম্ম করে। সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোকেরা ব্রাহ্মণ জাতি বা বর্ণ; তাহাদের কর্ম্ম—শম দম তপ ইত্যাদি। সত্ত্ব ও রজঃ সংসৃষ্ট প্রকৃতির লোক ক্ষত্রিয়—তাহাদের কার্য্য সৌর্য্য যুদ্ধাদি। রজঃ তম প্রকৃতির লোকেরা বৈশ্য—তাহাদের কর্ম্ম কৃষি গোরক্ষণ আর তমঃ প্রকৃতির লোক শূদ্র—তাহাদের কর্ম্ম তামসিক—অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা। (স্বামী, শঙ্কর, মধু; ১৮ অধ্যায়ের ৪১ হইতে ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

সৃজিয়াছি বর্ণ চারি—কেবল মনুষ্য লোকেই বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মাধিকার—অন্য লোকে এরূপ নাই (শঙ্কর)। চতুর্ব্বর্ণপ্রমুখ ব্রহ্মাদি স্তব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ, সত্ত্বাদি বর্ণ বিভাগের দ্বারা ও তদনুরূপ শম প্রভৃতি কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা বিভক্ত করিয়া বা বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি (রামানুজ) এই জন্যই জগতে বৈষম্য (মধু)।

কর্ত্তা আমি···অকর্ত্তা অব্যয়—যদিও মায়া ব্যবহারে আমি ইহার কর্ত্তা (জন্মাদ্যস্য যতঃ ইতি বেদান্ত দর্শন, এবং "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ···ইত্যাদি শ্রুতি বচন দৃষ্টব্য। এবং এ জগতের কর্ত্তা, তথাপি আমি পরমার্থতঃ অকর্ত্তা অব্যয় সুতরাং অসংসারী (শঙ্কর)। আমি আসক্তিরহিত বলিয়া অকর্ত্তা (স্বামী)। আমি অহঙ্কারহীন বলিয়া অকর্ত্তা (মধু)। জগতে বৈষম্য থাকিলেও আমাতে বৈষম্য নাই (বলদেব)।

[এই শ্লোক সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, কেবল এই লোকেই বর্ণাশ্রম বিভাগ আছে কেন এবং মনুষ্য সর্ব্বরূপে ঈশ্বরের বর্ত্ম অনুসরণ করে কেন, তাহা বুঝান হইয়াছে। স্বামী বলেন, যদিও লোকের ও কর্ম্মের এত বৈচিত্র্য কিন্তু তৎস্রষ্টা ঈশ্বরে বৈচিত্র্য নাই কেন—তাহাই দেখান হইয়াছে। রামানুজ ও বলদেব বলেন, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান-বিরোধী ভোগ বাসনাই বিনাশের হেতু, তাহা এই শ্লোকে ও পর শ্লোকে কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ অর্থ করেন, পূর্ব্ব শ্লোকে সকাম

কর্ম্ম মোরে নাহি লিপ্ত করে, কর্ম্মফলে
নাহি স্পৃহা মম কভু—এরূপে আমায়
জানে যেই, কর্ম্মে সে ত বদ্ধ নাহি হয়। ১৪

নিষ্কাম কর্ম্মাধিকার ও তৎহেতু উপাসনার পার্থক্য দেখাইয়া এই শ্লোকে গুণভেদে ও কর্ম্মভেদে যে অধিকার ভেদ হয়, তাহা বুঝান হইয়াছে।

এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, মানুষ কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে কর্ম্মহীন থাকিতে পারে, তাহা এখানে দেখান হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বর কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে অকর্ত্তা অব্যয় থাকেন, তাহা জানিয়া সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, মানুষ যেরূপ প্রকৃতি বা গুণ ঈশ্বর হইতে পাইয়াছে, সে সেইরূপ কার্য্য নিজ প্রকৃতি বশে করিতে বাধ্য, সুতরাং মানুষের নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার কৃত কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিজ গুণের ও সেই গুণ বিভাগ স্রষ্টা ঈশ্বরের। এইরূপ ভাবনায় অহঙ্কার লোপ করিতে হইবে, এবং নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে।]

(১৪) কর্ম্ম মোরে নাহি লিপ্ত করে—যে সংসারী, তাহার আমি কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান আছে—এবং কর্ম্ম ফলে তাহার স্পৃহা আছে, এজন্য সে কর্ম্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বরে অহঙ্কার নাই, এজন্য তিনি কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, (শঙ্কর)। সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মে ভগবানের কর্তৃত্ব অভিমান নাই, কেননা তাঁহার অহঙ্কার নাই। কর্ম্ম যাহাকে লিপ্ত করে, তাহার দেহ বন্ধন হয়। ভগবানের যেমন কর্ত্তৃত্ব নাই, সেইরূপ ভোক্তৃত্বও নাই বা কর্ম্ম ফলে স্পৃহা নাই (মধু)। রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন। তাঁহার ভিন্নমত সমর্থন করিয়া বলেন যে, প্রকৃতি নিত্য। প্রলয় অবস্থায় এই সৃষ্টির দেবাদি ভাব বৈচিত্র্য, তাহার কারণ প্রাচীন কর্ম্ম শক্তিতে অথবা প্রকৃতিতে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের বাসনা-বীজে লীন থাকে। সৃষ্টিকালে ভগবান সেই শক্তি বিকাশের কেবল নিমিত্ত কারণ হন। রামানুজ আরও বলেন, ক্ষেত্রজ্ঞ নিজ শক্তিতেই অবস্তুকে বস্তুর ন্যায় সৃজন করে। এই সব ক্ষেত্রজ্ঞের সৃষ্টির নিমিত্তকারণ পরম পুরুষ হইলেও তাহার প্রধান কারণ এই ক্ষেত্রজ্ঞ-দিগের প্রাচীন কর্ম্মশক্তি। এই জন্যই ভগবান এই

জানি ইহা করেছিলা কর্ম্ম পুরাকালে
মোক্ষার্থী সকলে ; তবে তুমিও তেমতি
কর কর্ম্ম—যথা পূর্ব্বে করিত তাহারা। ১৫
কর্ম্ম কিবা, কি অকর্ম্ম,—হয় ভ্রান্ত ইথে
জ্ঞানী যারা ; কর্ম্ম তাই কহিব তোমারে
জানি যাহা হবে মুক্ত অশুভ হইতে। ১৬
সেইরূপ কর্ম্ম কিবা হইবে বুঝিতে,
বিকর্ম্ম কি বুঝা চাই, হইবে জানিতে
কি অকর্ম্ম,—কর্ম্ম গতি বড়ই গহন। ১৭
কর্ম্মে যে অকর্ম্ম হেরে, অকর্ম্মে যে পুন
হেরে কর্ম্ম—নর মাঝে সেই বুদ্ধিমান,
হয় সেই যোগযুক্ত সর্ব্ব কর্ম্মকারী। ১৮

সৃষ্টির কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। সূত্রকার বলিয়াছেন, বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ। (বেদান্ত দর্শন ২।১।৩৪) পরাশর সংহিতায় আছে—

"নিমিত্ত মাত্র মেবায়ং সৃজ্যানাং সর্গ কর্ম্মনি।
প্রধান কারণীভূতা যতো বৈসৃজ্যশক্তয়ঃ॥"

এরূপে আমায়……—আমি সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা ও অভোক্তা ইহা জানিয়া (শঙ্কর, মধু)।

বদ্ধ নাই হয়—দেহাদি দ্বারা কৃত কর্ম্মে বদ্ধ হয়,না(শঙ্কর)। এইরূপ জানিয়া তাহার অহঙ্কর শৈথিল্য হয় এজন্য কর্ম্মে বদ্ধ বদ্ধ হয় না (স্বামী)। আত্মজ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া মুক্ত হয় (মধু)। সে কর্ম্মযোগ বিরোধী ফলাসক্তির কারণ প্রাচীন কর্ম্মে বদ্ধ হয় না। (রামানুজ)।

(১৫) জানি ইহা—অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধন কারণ হয় না, ইহা জানিয়া (স্বামী)। আত্মার অকর্ত্তৃত্ব (মধু) বা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই (শঙ্কর) ইহা জানিয়া। এইরূপে আমাকে জানিয়া (রামানুজ, বলদেব)।

কর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্ম (বলদেব), উক্ত লক্ষণযুক্ত কর্ম্ম (রামানুজ)।

পুরাকালে মোক্ষার্থী সকলে—বিবস্বত, মনু প্রভৃতি (বলদেব, রামানুজ)। জনকাদি (স্বামী, শঙ্কর)। যযাতি, যদু প্রভৃতি (মধু)।

কর কর্ম্ম—অর্থাৎ যদি অনাত্মজ্ঞ হও, তবে আত্ম শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে ; আর যদি তত্ত্বজ্ঞানী হও, তবে লোক সংগ্রহার্থ পূর্ব্বে জনকাদি যেরূপ কর্ম্ম করিতেন, সেইরূপ তোমারও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য (শঙ্কর,বলদেব ও মধুসূদন)। স্বামী বলেন,জনকাদি চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতেন। এ অর্থ সংকীর্ণ। এস্থলে শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন যে,কর্ম্মযোগ জ্ঞানীরও লোক সংগ্রহার্থ কর্ত্তব্য। এই স্থানে তাঁহার অর্থ—৩ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত।

(১৬) কিবা কর্ম্ম কি অকর্ম্ম—দেহাদি চেষ্টাকে কর্ম্ম ও সেই ক্রিয়াহীন তুষ্টিস্থাবকে অকর্ম্ম বলে, ইহাই লোক প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহার প্রকৃততত্ত্ব বুঝা কঠিন (শঙ্কর)। কিরূপ কর্ম্ম করণীয় ও কি কর্ম্ম অকরণীয় (স্বামী)। ফলাভিসন্ধি রহিত ভগবদারাধনাকে কর্ম্ম, আর কর্ম্মকর্ত্তার আত্মস্বরূপজ্ঞানকে অকর্ম্ম বলে (রামানুজ)। মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিরূপ এবং কর্ম্ম হইতে ভিন্ন তদন্তর্গত জ্ঞান কিরূপ (বলদেব)। পরমার্থতঃ কি কর্ম্ম ও কি অকর্ম্ম (মধু)।

মুগ্ধ এ বিষয়ে জ্ঞানী যারা—(জ্ঞানী, মূলে আছে "কবিগণ") এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকদেরও যে ভিন্ন মত, তাহা উল্লিখিত অর্থভেদ হইতে বুঝা যায়। মধুসূদন বলেন, নৌকারোহী যেমন স্থির তটবৃক্ষগণকে গমনশীল মনে করে, সেইরূপ কর্ম্ম স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরও ভ্রম হয়।

অশুভ—সংসার (স্বামী, গিরি, রামানুজ)।

(১৭) কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম—অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম = কর্ম্ম,প্রতিসিদ্ধ কর্ম্ম = বিকর্ম্ম,ও কর্ম্মহীন বা তুষ্টিভাব = অকর্ম্ম, ইহা লোক-প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার স্বরূপ বুঝা কঠিন (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। কর্ম্ম—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম, বিকর্ম্ম—অর্থাৎ জ্ঞান-বিরোধী কাম্য কর্ম্ম ; আর অকর্ম্ম,—অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান (রামানুজ বলদেব)।

গহন—দুর্জ্ঞেয় (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ)।

(১৮) কর্ম্মে যে অকর্ম্ম হেরে, অকর্ম্মে যে হেরে কর্ম্ম—ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। [১] অনেকে অর্থ করেন—যাহা বন্ধনকারণ তাহাই কর্ম্ম, আর যাহা মোক্ষের কারণ, তাহা অকর্ম্ম। কর্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধন স্বভাব হইলেও, যে কর্ম্ম (যোগরূপ কৌশলে সম্পাদন

হেতু) মোক্ষের বা আত্মজ্ঞান লাভের কারণ হয়, সেই অকর্ম্ম স্বভাব কর্ম্মের স্বরূপ যে বুঝিতে পারে; আর অকর্ম্ম সাধারণতঃ মোক্ষের হেতু হইলেও যে অকর্ম্ম (বা কর্ম্মহীন ভাব) প্রকৃত জ্ঞানলাভ বিনা বন্ধন কারণ হয়, সেই কর্ম্ম স্বভাব অকর্ম্মের যে স্বরূপ বুঝিতে পারে—সেই যোগী।

মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত যে সকল কর্ম্মে বন্ধন হয় না, যাহা পরে জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায় (৪।৩৭) তাহা এই;—(১) নিষ্কাম কর্ম্ম (বলদেব, রামানুজ) (২) ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম ও (৩) বিহিত বা নিত্য কর্ম্ম (স্বামী)। এবং(৪)এই অধ্যায়োক্ত যজ্ঞ কর্ম্ম প্রভৃতি। আর যে অকর্ম্ম বা কর্ম্মহীন ভাব বন্ধনের হেতু, তাহা এই (১) নিত্য বা বিহিত কর্ম্ম না করা ও (২) অজ্ঞান বশে অভিমান হেতু আত্ম সুখ কামনায় মিথ্যাচারী হইয়া কর্ম্মত্যাগ করা (স্বামী)

রামানুজ ও বলদেব বলেন, যে এস্থলে "অকর্ম্ম" অর্থে—আত্মজ্ঞান। যে কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) দ্বারা আত্ম জ্ঞান লাভ হয়, তাহা "জ্ঞানাকার,"আর জ্ঞান এই কর্ম্ম রূপ উপায়ে লাভ হয় বলিয়া ইহা "কর্ম্মাকার"।

স্বামী বলেন, ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না বলিয়া যেমন তাহাকে অকর্ম্ম বলা যায়, তেমনি নিত্য,বিহিত বা ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম না করিলে,তাহাতে প্রত্যবায় বা বন্ধন হয় বলিয়া তাহাকে কর্ম্ম বলা যায়। (কিন্তু এইরূপ অর্থ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম বিহিতই হউক আর অবিহিতই হউক, তাহা না করিলে সে জন্য প্রত্যবায় হইতে পারে না। কেননা অসৎ হইতে সৎ হয় না। তবে এরূপ কর্ম্ম যদি অভিমান হেতু বা কর্ম্ম না করিলে আমি সুখী বা মুক্ত হইব,এইরূপ অহঙ্কার হেতু না করা হয়, অথবা যদি বিহিত কর্ম্ম না করিয়া অহঙ্কার বশে অবিহিত কর্ম্ম করা হয়, তবেই তাহা হইতে গৌণভাবে প্রত্যবায় হইতে পারে।

[২] স্বামী আরও বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী তিনি যদি দেহ ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, তথাপি তিনি আপনাকে দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন অনুভব করিয়া, নিজের নিষ্ক্রিয় স্বভাব দেখিতে পান; কিন্তু যে জ্ঞানী নহে, সে যদি দুঃখজনক মনে করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে মিথ্যাচারী। সে আত্মাতে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করে।

শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ অনেকটা এই শেষোক্তরূপ অর্থ করেন। ইহাঁরা বলেন, এস্থলে কর্ম্ম অর্থে বিহিত অবিহিত (শঙ্কর) বা কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম (মধু) সকল প্রকার ক্রিয়াই বুঝাইতেছে। আর অকর্ম্ম বলিতে কর্ম্মের বিপরীত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা বুঝাইতেছে। সকল প্রকার কর্ম্মই 'গুণজ' বা দেহাদি চেষ্টা জাত। আত্মা কর্ম্ম করে না—আত্মার প্রবৃত্তি ধর্ম্ম নাই। সুতরাং আত্মাতে কর্ম্মের আরোপ অধ্যাস মাত্র; তাহা প্রকৃত নহে। নৌকাযাত্রী তীরস্থ বৃক্ষে যেরূপ গতি আরোপ করে, সেই প্রকার। তত্ত্বদর্শী বুঝেন যে, কর্ম্ম দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতিজ গুণের কার্য্য। যে তত্ত্বদর্শী নহে, সে "গুণজ" কর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাস করিয়া "আমি কর্ত্তা" আমি কর্ম্ম না করিয়া নিরায়াস ও সুখী হইব, এইরূপ অভিমান বশে আত্মাতে সুখ দুঃখ আরোপ করে। ইহাদের কর্ম্মত্যাগ মিথ্যাচার, ইহা অকর্ম্ম নহে, ও ইহাদের কর্ম্মের অনারম্ভ নৈষ্কর্ম্ম নহে (৩।৪)। দূরস্থ গতিশীল নক্ষত্রাদি চক্ষুর সন্নিকটে যেমন গতিহীন বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, সেইরূপ ইহাদের অভিমান বশে কর্ম্মত্যাগও তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট কর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়। আর এই কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি চেষ্টা যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করিতে যে আয়াস, তাহাও কর্ম্ম (মধু)। সুতরাং এইরূপ অর্থ হইতে এই বুঝা যায় যে, কর্ম্মে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আরোপিত না হইলে তাহা অকর্ম্ম, আর অকর্ম্মেও এরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আরোপিত হইলে বা অভিমান থাকিলে তাহা কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন বা অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন বিরুদ্ধ দর্শন নহে। ইহা কর্ম্মের ও অকর্ম্মের স্বরূপ দর্শন মাত্র।

[৩] ইহা ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য, গিরি ও মধুসূদন প্রকৃত অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্যবহারিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক ভাবে আরও একরূপ করিয়াছেন। আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস ও দেহ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারভূত কর্ম্মের অধ্যাস অবিদ্যাহেতু বা কাল্পনিক। এই আত্মা ব্রহ্ম। আর কর্ম্মাত্মক জগতও মায়া হেতু ব্রহ্মে কল্পিত। জ্ঞানে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট ভাব, অহং ও ইদং ভাব—এই দ্বৈতভাব অজ্ঞানাবরণ হইতে

জাত। সুতরাং এই দেশকাল পরিচ্ছিন্ন কর্ম্মময় জগৎ ও জীব ও এই অভেদ্য মায়া কল্পনা প্রসূত। এই অসৎ কর্ম্মময় জগতের যে আধার যাহা প্রকৃত সম্বস্ত তাহাই আত্মা। এ আত্মা অবিকৃত নিষ্ক্রিয় ও নিত্য। তাহা দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন। সুতরাং জ্ঞানী আপনার ও জগতের সমুদায় কর্ম্মমধ্যে কেবল অকর্ম্ম-স্বভাব আত্মসত্তাই দর্শন করেন; আর এই নিষ্ক্রিয় আত্মাতে এই কর্ম্মময় জগতের অধ্যাস হইয়াছে,ইহা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মহীন আত্মাতেই সর্ব্বকর্ম্ম আরোপিত হইয়া আছে দেখেন, ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন।

[৪] ইহা ব্যতীত আরও একরূপ অর্থ হইতে পারে। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম দুই স্বরূপতঃ এক পদার্থ। কর্ম্মেরই এক অবস্থা অকর্ম্ম। আর অকর্ম্মের এক অবস্থা কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে অকর্ম্মের উৎপত্তি ও অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। সৃষ্টিতে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ভাব পৃথক্‌রূপে অনুমিত হইলেও---অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গতি (Motion) ও স্থিতি (Rest), জাগরণ ও নিদ্রা, আলোক ও অন্ধকার,শক্তি ও জড় ইত্যাদি রূপ পৃথক্ ভাবে অনুমিত হইলেও তাহারা উভয়ে ওতঃপ্রোত হইয়া একটীর উপর আর একটী সংস্থাপিত হইয়া আছে। আত্মাতে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম কোন ভাবই নাই। আত্মাতে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম,কোন অভিমান নাই। আত্মাতে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম দুইই অধ্যাস হয়। এই কর্ম্ম (thesis) ও অকর্ম্ম (antithesis), এই দুয়ের সমবায়ে যে ভাব (synthesis) তাহাকেই আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাব বলা যায়। মানুষের জ্ঞান যতক্ষণ মায়াবৃত থাকে, তখন তাহার কর্ম্ম ও অকর্ম্ম জ্ঞান বা দ্বা তাহাদের পার্থক্য জ্ঞান ও তৎসম্বন্ধে আত্মার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে। মায়া আবরণ দূর হইলে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম অধ্যাসের বাহিরে গিয়া আত্মার প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা অনুভব হয়। সে নৈষ্কর্ম্মে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই একীভূত হইয়া যায়। [জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের যুক্তি অনুসরণ করিয়া এই শেষোক্ত অর্থ করা হইল, ইহা উল্লেখ করা উচিত]

যাহা হউক, এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে মিলাইয়া দেখিলে প্রথম অর্থ সহজ ও সুসঙ্গত বোধ হয়। তবে স্বামী এই আভাস দিয়াছেন যে, যে বুদ্ধিমান বা ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিযুক্ত, যে যোগলাভ অভিলাষী তাহার নিকট [১] প্রথম অর্থ সঙ্গত বোধ হয়।

কামনা-সঙ্কল্পহীন সর্ব্ব অনুষ্ঠান
হয় যার, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম্মতার—
পণ্ডিত তাহারে কহে যত বুধগণ। ১৯

আর যে যোগী বা যোগারূঢ় হইয়াছে, যে সর্ব্বকর্ম্মকারী তাহার নিকট [২] দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত। মধুসূদন বলিয়াছেন যে, কেবল যে পরমার্থদর্শী বা অদ্বৈতবাদী তাহার নিকট তৃতীয় ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

বুদ্ধিমান, যোগযুক্ত—পণ্ডিত, যোগী (শঙ্কর)। যোগী যে সে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহারাদি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয় আত্মজ্ঞানে সমাধিস্থ (স্বামী)। সে বুদ্ধি সাধন-যোগযুক্ত (মধু)। সে শাস্ত্রজ্ঞানী ও মোক্ষার্হ (বলদেব, রামানুজ)। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত, যোগী (স্বামী)।

সর্ব্বকর্ম্মকারী—কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে সে সর্ব্বকর্ম্মের ফল জ্ঞানেই প্রাপ্ত হয় (২।৪৫) কেননা সকল কর্ম্মফলই আত্মজ্ঞানরূপ সুখের অন্তর্ভূত হয়, (বলদেব)। সে অন্তঃকরণ শুদ্ধি সাধক সর্ব্বকর্ম্মকারী (মধু)।

(১৯) সংকল্প—কামনার কারণ সংকল্প (শঙ্কর)। আমি করি, এই কর্ত্তৃত্বাভিমান (মধু)। প্রকৃতির গুণ হইতে উৎপন্ন কর্ম্মের "আমি কর্ত্তা" এই সিদ্ধান্ত হইতে কর্ম্ম চেষ্টা (রামানুজ)। সংকল্প বা চেষ্টার সহিত কামনা বর্জ্জন করিতে হয়, সুতরাং সংকল্প অর্থে—চেষ্টা (স্বামী বলদেব) কোন বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হইলে, মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে অনুরাগ বা বিরাগ উপস্থিত হয়। তদনুসারে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইতে বা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। এবং সেইরূপ কর্ম্ম চেষ্টা হয়। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক। ৬ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে আছে "সংকল্প প্রভবান্ কামান্"। কামনা —সংকল্প বা শোভন অধ্যাস হইতে জাত। সুখজ বিষয়ে আকর্ষণ বা অনুরাগই সংকল্প। আর সেই অনুরাগ হইতে কামনার উৎপত্তি।

অনুষ্ঠান—কর্ম্ম; শুধু লোকসংগ্রাহার্থ কর্ম্মচেষ্টা প্রবৃত্তি, অথবা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্ম চেষ্টা (শঙ্কর, মধুসূদন)। দ্রব্যার্জ্জনাদি লৌকিক কর্ম্ম পূর্ব্বক, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যরূপ সকল কর্ম্ম (রামানুজ)।

জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ—কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শনরূপ জ্ঞান। ইহাতেই শুভাশুভ লক্ষণযুক্ত

নিত্যতৃপ্ত যেই আর আশ্রয় বিহীন,
ত্যজি কর্ম্মফলাসক্তি—হয় যদি সেই
কর্ম্মে রত, তবু কিছু না করে সেজন। ২০

বন্ধনস্বভাব কর্ম্ম দূর হয় (শঙ্কর, মধু)। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় কর্ম্ম অকর্ম্মরূপে পরিণত হয় (স্বামী)। আত্মযাথাত্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে প্রাচীন সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় বা কর্ম্মবীজ নষ্ট হয় (রামানুজ, বলদেব)। তত্ত্বজ্ঞান হইতেই কর্ম্ম জ্ঞানাকার হয় (রামানুজ)।

(২০) নিত্যতৃপ্ত আশ্রয়বিহীন—বিষয়ে আকাঙ্ক্ষারহিত আর দ্রষ্ট অদৃষ্ট ফল সাধনভূত যে বিষয়ের আশ্রয়ে পুরুষার্থ সাধন করিতে হয়,তাহা রহিত(শঙ্কর)। পরমানন্দস্বরূপ লাভে নিরাকাঙ্ক্ষ ও দেহ ইন্দ্রাদিতে অদ্বৈতদর্শনে আশ্রয় বা আত্ম-অভিমানশূন্য (মধু)। আনন্দতৃপ্ত ও যোগক্ষেম আশ্রয় রহিত (স্বামী)। আত্ম-তৃপ্ত ও অস্থির প্রকৃতিতে আশ্রয় বুদ্ধি রহিত (রামানুজ)।

কর্ম্মফলাসক্তি—কর্ম্মাসক্তি ও তৎফলাশক্তি। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমানই কর্ম্মাসক্তি, আর কর্ম্মফল স্বর্গাদিতে ভোগাভিলাষ বা কামনাই ফলাসক্তি। (মধু)।

কর্ম্মে রত—যিনি নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী, তিনি জীবন রক্ষামাত্র চেষ্ট ভিন্ন অন্ন কর্ম্ম করেন না। আর যিনি কর্ম্মযোগী, জ্ঞানলাভে তাঁহার নিজ প্রয়োজন জন্য কর্ম্মের আবশ্যক না থাকিলেও তিনি লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন (শঙ্কর)। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যুত্থিত অবস্থায় বৈদিক বা লৌকিক কার্য্যে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে প্রবৃত্ত হইলে (মধু), বা স্বাভাবিক বা বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে (স্বামী)।

না করে—আত্মার নিষ্ক্রিয় স্বভাব উপলব্ধি জন্য (শঙ্কর)। অথবা কর্ম্মরূপ উপায়ে জ্ঞানাভ্যাস হয়, এজন্য বন্ধন-স্বভাব কোন কর্ম্ম করে না (রামানুজ)।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৫)

গো-বসন্তের লক্ষণ।

গো-বসন্ত রোগ প্রধানতঃ জ্বর ও আমাশয় লক্ষণাক্রান্ত,এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা যে"গলা-ফুলা রোগ" হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু স্থল বিশেষে গো-বসন্ত গলাফুলা লক্ষণাক্রান্ত হয় বলিয়া এই দুই রোগের মধ্যে প্রভেদ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। স্থল বিশেষে গো-বসন্ত গলা-ফুলা লক্ষণাক্রান্ত হইবার কারণ এই যে,গো-বসন্তের অণুমিশ্রিত তীক্ষাগ্র বিশিষ্ট কোন দ্রব্য আহারের সহিত গলাধঃ হইবার সময় গলার অন্তঃত্বককে ক্ষত করে। এই ক্ষত স্থল স্ফীত হইয়া বাহির হইতেও গলাটী ফুলিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গাত্রের যেসে স্থলে গো-বসন্তের অণু পিচকারি অথবা ছুরী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে, গাত্রের ঐ স্থলটী স্ফীত হয়। সাধারণতঃ আহার দ্রব্যের সহিত গো-বসন্তের অণু পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আহার-রস-শোধন-যন্ত্র (lymphatic vessels) পেয়ার-পথ (Peyer's patches) ও কৈশিক শিরা (capillaries) দ্বারা, শোণিত মধ্যে মিশ্রিত হওয়াতে স্থল বিশেষ স্ফীত না হইয়া, জ্বর ও আমাশয়রূপে এই রোগ পরিণত হয়। স্থলবিশেষ স্ফীত হওয়া শার্ব সিম্‌টোমাটিক্ (charbon symptomatique) রোগেরই প্রধান লক্ষণ। এই রোগে স্ফীত স্থলটী যে গলদেশেই হইতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই; এ কারণ, এই রোগকে "গলাফুলা রোগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা ভ্রম। ইংরাজীতে ইহার যে নাম আছে (Quarter ill অথবা একদৈশিক রোগ) তাহা অধিকতর সঙ্গত। কোয়ার্টার ইল বা একদৈশিক রোগের একদৈশিক স্ফীতত্ব অথবা অঙ্গবিশেষের বিকলত্বই প্রধান লক্ষণ। গো-বসন্তে প্রায় বাহ্যিক কোন অঙ্গবিশেষের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না। তবে যে স্থলে গোবসন্ত গলা-ফুলা লক্ষণাক্রান্ত হয়, সে স্থলে দুই রোগের প্রভেদ কিরূপে সংস্থাপিত করিতে হইবে? প্রথমতঃ, স্ফীত স্থলটী জন্তুর জীবদ্দশাতেই টিপিয়া। একদৈশিক রোগে এরূপ টিপিবার কারণ

স্ফীত স্থলটীতে মরমর শব্দ হয়। ত্বকের নিম্নে মরমর শব্দ হইবার কারণ, দূষিত বায়ু বা গ্যাসের অবস্থান। এই রোগ হইলে জন্তুটী স্ফীত স্থল টিপিবার সময় যন্ত্রণা অনুভবও করে না, অর্থাৎ স্ফীত স্থলটী এই রোগে অসাড় হয়। গো-বসন্তরোগে স্ফীত স্থল টিপিলে, জন্তুটী যন্ত্রণায় আর্ত্তস্বর করে; এবং টিপিবার সময় উহার মধ্যে মরমর শব্দও অনুভূত হয় না। আর একটী প্রধান প্রভেদ-লক্ষণ,স্ফীত স্থলটী ছুরিকা দ্বারা কাটিলেই জানিতে পারা যায়। একদৈশিক রোগে স্ফীত স্থলটী কাটিলে উহার অভ্যন্তরস্থ মাংসপিণ্ড এককালীন কৃষ্ণবর্ণের দেখা যাইবে। গো-বসন্ত রোগে স্ফীত স্থলটীর অভ্যন্তরস্থ মাংসপিণ্ড লোহিতের আভাযুক্ত,ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের (citron colour) দেখা যাইবে। এই মাংসপিণ্ড চাকৃচিক্যাতিশয় দ্বারা গঁদ অথবা জিলেটিনের আঠা মিশ্রিত বলিয়াও বোধ হইবে।

স্থলবিশেষের স্ফীততা গো-বসন্ত রোগে প্রায়ই হয় না বলিয়া এ রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার প্রধান উপায় সদ্যঃ মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ। ব্যবচ্ছেদ করিবার নিয়ম প্রথমতঃ উদরের মধ্যস্থল হইতে অধরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত সরলভাবে কাটিয়া,পরে উদরের মধ্যভাগে পূর্ব্বকথিত ব্যবচ্ছেদ রেখার সহিত সমকোণ করিয়া আর একটী সরলছেদ করিয়া দেওয়া। এখন চর্ম্মের দুই খণ্ড অনায়াসে পৃথক্ করিয়া দিয়া,প্লীহা,যকৃৎ ও অন্ত্র পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অধরের চর্ম্ম কাটিয়া বিভক্ত করিয়া দন্ত-পট (মাড়ি), জিহ্বা ও তালু পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্ত্র পরীক্ষা করিতে হইলে গুহ্যদ্বারের অন্ত হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধভাগে কাটিয়া গিয়া অন্ত্রের ভিতর দিক্ পরীক্ষা করিতে হইবে। রোগটী গো-বসন্ত হইলে, অন্ত্রের মধ্যে স্থলে স্থলে (অর্থাৎ, অণু প্রবেশ দ্বারগুলিতে) ক্ষত দেখা যাইবে,মুখের মধ্যে অন্তঃত্বকের স্থানে স্থানেও ঘা দেখা যাইতে পারে। উদরের মধ্য হইতে অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিলে নিম্নদেশে যে লোল চর্ব্বি ও চর্ম্মবৎ পদার্থ (sublumbar areolar tissue) বাহির হয়, উহাতে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে দেখা যাইবে। প্লীহাটী উঠাইয়া ধরিলে বোধ হইবে,উহার মধ্যে রক্ত গড়াইয়া নিম্ন স্থলে একত্রিত হইল। প্লীহার মধ্যে ফাঁপা স্থান হইয়া, ঐ ফাঁপা স্থানে গাঢ় শোণিত তরল অবস্থাতেই থাকিয়া, শোণিত অনায়াসে একদিক হইতে অপর দিকে গড়াইয়া যায়। প্লীহা কাটিলে দেখা যাইবে, গাঢ় অথচ তরল শোণিত উহার মধ্যে রহিয়াছে। এই শোণিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে ব্যাসিলাস্ এস্থ্রেসিস্এর শত শত দণ্ড(batons) দৃষ্টিগোচর হইবে। হৃদয়, ফুস্ফুস্, যকৃত বা মূত্রপিণ্ড হইতে শোণিত লইয়া পরীক্ষা করিলে এই ব্যাসিলাস্ দেখা যাইতেও পারে, না যাইতেও পারে, কিন্তু রোগে মৃত জন্তুর প্লীহার রক্তে যদি এই ব্যাসিলাস্ না দেখা যায়, তবে রোগটী কখনই গো-বসন্ত অর্থাৎ এস্থ্রাক্স্ নহে, ইহা স্থির করিতে হইবে। গো-বসন্তে ভুগিতেছে, এমন কোন জন্তুকে জীবদ্দশাতেই মারিয়া ফেলিয়া তাহার প্লীহা বা অন্য কোন যন্ত্র হইতে শোণিত লইয়া যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ব্যাসিলাস এস্থ্রেসিসের দণ্ড দেখা যাইতেও পারে, না যাইতেও পারে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই ব্যাসিলাস্ এস্থ্রেসিসের প্রভূত বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এ কারণ জীবিত জন্তুর শোণিত অথবা উহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিয়া ফেলিয়া উহার শোণিত অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করা বৃথা। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জীবিত অথচ গো-বসন্ত-গ্রস্ত জন্তুর শোণিতে ব্যাসিলাস্ প্রায় দেখা যায় না বলিয়া যে ব্যাসিলাস্ শোণিত মধ্যে জন্মে নাই,এরূপ হইতে পারে না। উহার সংখ্যা তখন এত অল্প থাকে, যে পরীক্ষা-ভুক্ত রক্তকণার মধ্যে দুই একটী ব্যাসিলাস্ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। রোগটী গো-বসন্ত কিনা, ইহা স্থির করিতে হইলে সদ্য মৃত জন্তুর প্লীহার রক্ত অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করাই বিধেয়। যদি এরূপ পরীক্ষার সুবিধা না ঘটে, অর্থাৎ মৃত গোরুর শরীরটা কাটিবার সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে, জীবিত অবস্থাতেই গোরুর গুহ্যদেশ হইতে যে শোণিত নির্গত হয়, উহা লইয়া একটী ছাগলের ত্বকের

মধ্যে ছুরি অথবা পিচ্‌কারি দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত। একটি ছাগলের উপর নির্ভর না করিয়া দুই তিনটী ছাগলের উপর পরীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। ব্যাসিলাসের সংখ্যা তখন কম থাকে বলিয়া যে এক বিন্দু শোণিত একটী ছাগলের রক্তের সহিত মিশ্রিত করাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে একটীও ব্যাসিলাস্ না থাকিতে পারে। এ কারণ, জীবিত অথচ রোগগ্রস্ত জন্তুর শোণিত লইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে অন্ততঃ দুই তিনটী ছাগলের আবশ্যক। রোগটী গো-বসন্ত হইলে ছাগলগুলি (অথবা উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটী) দুই দিনের মধ্যেই মরিয়া যাইবে। এই মৃত ছাগলের প্লীহার রক্ত, কাল বিলম্ব না করিয়া, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, যদি রোগটী গো-বসন্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্যাসিলাস এন্থ্রেসিস্ দণ্ড দেখা যাইবে।

গো-বসন্ত নির্ণয় করিতে হইলে আনুবীক্ষণিক নিদর্শনের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়। আনুবীক্ষণিক রূপ দেখিয়া এই রোগ স্থির করা অতি সহজ। ৫০০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া, দণ্ডগুলি $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা দেখা যাইবে। দণ্ডগুলি বেশ স্থূল, অর্থাৎ $\frac{১}{২০}$ বা $\frac{১}{২৫}$ ইঞ্চি পরিমাণ স্থূল। কোন দণ্ডটী সোজা, কোনটী বা বক্র, কোনটী বা যুক্তদণ্ড সদৃশ। দণ্ডগুলি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে স্থিরভাবে কাচে সংলগ্ন হইয়া আছে, এরূপ বোধ হয়। সদ্যমৃত জন্তুর রক্ত পরীক্ষা করিলে দণ্ড বা কৈশিকাণু ভিন্ন বীজাণু (অর্থাৎ বীজযুক্ত দণ্ড) দেখা যায় না। এই সকল লক্ষণ দ্বারা গো-বসন্তের অণু ঠিক করা অতি সহজ।

সদ্যমৃত জন্তুর প্লীহার রক্ত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়াও, রোগনির্ণয় সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া, ঐ রক্ত কয়েকটী কাচের আধারস্থিত কুক্কুটের মাংসের ক্বাথের মধ্যে পাতিত করিয়া, আধারগুলি তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কয়েক দিবসের মধ্যে এই সকল আধারের মধ্যে কোন কোনটীতে অথবা প্রত্যেকটীতে যদি ব্যাসিলাস্ এন্থ্রেসিস্ জন্মিতেছে দেখা যায় এবং এই ক্বাথ পিচ্‌কারি দ্বারা ছাগ অথবা মেষের শোণিতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে যদি দুই দিবসের মধ্যে ঐ ছাগ বা মেষগুলি মরিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, রোগটী গো-বসন্ত। কৃত্রিম উপায়ে কিরূপে গো-বসন্তের বীজ রক্ষা করিতে ও জন্মাইতে হয়, ইহা ভবিষ্যতে বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত। (১)

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারতে "আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব" শীর্ষকপ্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, জীবাত্মা অদৃষ্টপরতন্ত্র, শরীরাদির অধিষ্ঠাতা, ইচ্ছা প্রযত্ন জ্ঞানাদির আশ্রয়, সুখ দুঃখের ভোক্তা, সংসারী (দেহত্যাগী ও দেহান্তর আশ্রয়ী) বিভু, অনেক এবং নিত্য। অবিনাশী আত্মা অদৃষ্টের অধীন হইয়া কিরূপে অনন্ত সংসার পরিগ্রহ করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

আত্মা অনন্তকাল হইতে বিদ্যমান থাকিয়া সংসারচক্রের মধ্যে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তি না হয়, ততকাল তাঁহাকে আরও বহু জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সূত্রগ্রথিত পুষ্পনিচয়ের একে একে স্খলন হইলেও সূত্রটী যেরূপ অক্ষত থাকে, সেইরূপ আত্মপরিগৃহীত দেহ সমূহের একে একে ক্ষয় হইলেও আত্মা অবিকৃত থাকেন। সংসারে এমন কোন কারণ নাই, যাহা হইতে আত্মার ধ্বংস উৎপন্ন হইতে পারে; মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। পরন্তু তখন তিনি পরম পবিত্র ও জ্ঞানালোকে অবস্থান করেন। কুম্ভকারের চক্র যেমন অন্তর্গতশক্তি প্রভাবে অনবরত ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, সেইরূপ

সংসারচক্রও কর্ম্মফলরূপ অন্তর্নিহিতশক্তি-প্রভাবে অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। যেমন কোন বোতলের মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিলে মধুকরগুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ,কেহ অধোদেশে গমন, কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু কেহই বোতল হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, জীব সকল শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া কেহ বা সুরলোকে, কেহ বা নরলোকে, কেহ বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই সংসরণশীল জীবসকল, পরস্পর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী,পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সতত বিচরণ করিতেছেন এবং কেহই সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন না, ইনিই আমার পিতা,ইনি আমার মাতা, অপর যে সকল জীব আছে তাহার সহিত আমার পিতৃসম্বন্ধ বা মাতৃসম্বন্ধ নাই ; কেননা একটী সামান্য জীবও কোটি কোটি জন্মে অপর উন্নত জীবের পিতা মাতা হইতে পারে ; বর্ত্তমান জন্মের সম্বন্ধই চরম সম্বন্ধ নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুমতি পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যে সুমধুর বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলেই উপরিলিখিত বিষয় সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইবে।

শত্রুমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
মাতরো বিবিধাদৃষ্টাঃ পিতরো বিবিধাস্তথা॥
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
ভৃত্যত্বং দাসতাঞ্চৈব গতোঽস্মি বহুশোনৃণাম্।
স্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্বং তথাগতঃ॥
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃকলত্রাদিকৃতেন চ।
তুষ্টোঽসকৃত্তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননোগতঃ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে।
জ্ঞানমেতন্ময়াপ্রাপ্তং মোক্ষসংপ্রাপ্তিকারকম্॥

"আমি বহুবার শত্রু, মিত্র ও কলত্রের সহিত মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, বিবিধ প্রকার মাতা ও বিবিধপ্রকার পিতা দর্শন করিয়াছি। সহস্র সহস্র সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়াছি, বান্ধব বহুপ্রকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পিতাও অনেক প্রকার দেখিয়াছি। আমি বহুবার মনুষ্যদিগের ভৃত্য ও দাস হইয়াছি, অনেক বার অনেক লোকের প্রভু হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছি এবং বহুবার দরিদ্রতাও ভোগ করিয়াছি। পিতা, মাতা, সুহৃদ্, ভ্রাতা ও কলত্রাদি দ্বারা আমি বহুবার পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং অনেক বার দৈন্য প্রাপ্ত হইয়া অশ্রু দ্বারা বদনমণ্ডল ধৌত করিয়াছি। হে পিতঃ! আমি এইরূপে ভয়সঙ্কুল সংসারচক্রে বহু পরিভ্রমণ করতঃ মোক্ষপ্রাপ্তি কারক জ্ঞানলাভ করিয়াছি।" এইরূপে আত্মা নানা প্রকার দেহ আশ্রয় করিয়া স্বীয় মোহ বশতঃ নানা প্রকার সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছেন। জন্ম মরণপ্রবাহ অবিশ্রান্তভাবে বিদ্যমান থাকিলেও এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মার সত্তার ধ্বংস হয় না।

প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির অতিরিক্ত আত্মা আছেন। এরূপ আত্মা কোন ক্রমেই অনিত্য হইতে পারেন না। অনিত্য বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তির ও ধ্বংসের কারণ আছে। আত্মার উৎপত্তির কারণ কি? কি উপাদানে আত্মা গঠিত হইয়াছে? সে সকল উপাদান আত্মোৎপত্তির পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং আত্মধ্বংসের পরেই বা কোথায় থাকিবে? শরীরের সহিত কি প্রকারে আত্মার সম্বন্ধ ঘটিল? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অনিত্য আত্মার নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে না। যদি বল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে, আত্মা শরীর-অতিরিক্ত বিশেষ কিছু নহেন, তাহা হইলে দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে। দেহ যে আত্মা নহে, তাহা আমি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যদি বল শরীরোৎপত্তির সময়ে আত্মা উদ্ভূত হইয়াছেন, শরীরের ধ্বংস হইলেও তাঁহার ধ্বংস হইবে না, তিনি পরমেশ্বরের শেষবিচারের দিন পর্য্যন্ত শরীরান্তর পরিগ্রহ না করিয়া বিদ্যমান থাকিবেন, তাহা হইলে আপত্তি এই;—জন্যপদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস আছে, আত্মা জন্য (উৎপন্ন) পদার্থ, সুতরাং তাহার ধ্বংস হইবে, তিনি বিচার কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে পারিবেন না। আর এরূপ উৎপাদিত্ব ও বিনাশিত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সমূহেরও মীমাংসা হয় না। যদি বল, আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত

নহেন, আত্মা চিরকালই বিদ্যমান আছেন, কিছু কালের নিমিত্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে আপত্তি এই, আত্মসমূহের এরূপ বিনাশ হইলে জগৎ অচিরকাল মধ্যে আত্মবিহীন হইয়া পড়িবে, সজীব পদার্থের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। যদি বল, আত্মা কি বলিতে পারি না, তবে দেহের সহিত ইহার কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বলিতে পারি না। ইহার উত্তর এই— আকাশকুসুমের ন্যায় এরূপ আত্মস্বীকারের কি প্রয়োজন? অথচ আত্মা না স্বীকার করিয়াও জগতের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করিতে পার না। আত্মা স্বীকার করিলেই নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। আত্মার নিত্যত্ব ও জন্মান্তর-পরিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী মত উদ্ধৃত হইতেছে।

দৃষ্টান্তাশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক বলেন, পূর্ব্বজন্ম ও পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দৈহিক পরমাণু নিচয়ের প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, শৈশবের পর যৌবন ও বার্দ্ধক্য সমুপস্থিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রতি সপ্তবর্ষে দেহাবয়বের সম্পূর্ণ নবীকরণ হইয়া থাকে। সপ্তবর্ষাভ্যন্তরে প্রত্যেক পরমাণুর বিচ্যুতি হইয়া দেহাবয়বে নূতন পরমাণু সংস্থাপিত হয়, অথচ দেহধারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না। এখন যদি দেহের শত পরিবর্ত্তনেও জীবের আত্মত্ব লুপ্ত না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুরূপ দৈহিক বিবর্ত্তনেই বা আত্মার অত্যন্তধ্বংস কিরূপে হইবে? আমি সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই আছি, অথচ শরীরের ও মনের কত বিবর্ত্তন হইয়াছে! অতএব দৃষ্ট হইতেছে, ইহজন্মে শারীরিক ও মানসিক শত পরিবর্ত্তনেও আমির আমিত্ব লুপ্ত হয় না, তবে মৃত্যুরূপ শারীরিক বিবর্ত্তনেই বা আমিত্বের একান্ত বিনাশ কিরূপে সম্ভাবিত হয়? মৃত্যু শব্দের অর্থ আত্মার ধ্বংস নহে, দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদমাত্র। আমার এক দেহের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। অতএব পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হইল, পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিলে পূর্ব্বজন্মও স্বীকার করিতে হইবে। [ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

১। ভারত-মঙ্গল।—পূর্ব্ব খণ্ড, সটীক; আনন্দচন্দ্র মিত্র-বিরচিত। প্রথম সংস্করণ। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্মমিসন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ২৲ টাকা।

বাল্মীকি, ব্যাস এবং অন্যান্য পুরাণকারদিগের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ ভিন্ন বঙ্গভাষাতে মৌলিক মহাকাব্য আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যম এই ভারত-মঙ্গল। ইহার কেবল পূর্ব্বখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং সমগ্র ভারত-মঙ্গল মহাকাব্যের যাবতীয় লক্ষণান্বিত হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার এখন হইতে পারে না। তথাপি যেরূপে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ১ম খণ্ডকেই একখান স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ মহাকাব্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ আরম্ভ দেখিয়া যদি পরিণতির অনুমান সঙ্গত এবং মার্জ্জনীয় হয়, যদি "Childhood shows the man as morning shows the day" এই প্রবাদবাক্য গ্রহণ-যোগ্য হয়, তবে বলিতে পারি, পূর্ব্বখণ্ড ভারত-মঙ্গল দেখিয়া, ইহার উত্তর খণ্ডের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের অক্ষুন্নতা বিষয়ে একটু আশান্বিত হইয়াছি। একথা বলিবার বিশেষ কারণ এই যে, এই পূর্ব্বখণ্ডেই কবি কল্পনাকে দেশকালবন্ধন মুক্ত করিয়া, অজড় অমর সুখ দুঃখ পাপপুণ্যাতীত অতি মহান্, অতি উচ্চ মহা স্বর্গে এবং দুরবগাহ অন্ধকারময় নরকের গভীর-

তম প্রদেশে লইয়া গিয়াছেন; স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোক ঘুরাইয়াছেন। সুতরাং কাব্যাংশে এই ১ম খণ্ডকেই আমরা প্রকৃত কঠিন ভাগ মনে করি। উত্তরখণ্ডে যাহা বিবৃত হইবার কথা, তাহা প্রধানতর ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হইবে। এরূপ স্থানে কবি আনন্দচন্দ্রের বিচিত্র কল্পনা কিরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, কি মহারত্ন প্রসব করিতে সক্ষম, তাহা "হেলেনা-কাব্যের" পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু এখানে একটী কথা বলিতে হইতেছে—মহাকাব্যে বীররস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি যাবতীয় রসেরই সমাবেশ আবশ্যক। ১ম খণ্ড ভারত-মঙ্গলে ইহার কোন কোনটীর অভাব আমরা বড়ই অনুভব করিয়াছি।

আমরা পূর্ব্বখণ্ড ভারতমঙ্গলের সংক্ষেপে চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিব;—(১) উদ্দেশ্য এবং বিষয়-নির্ব্বাচন, (২) কাব্যসংগঠনপ্রণালী (৩) রচনাচাতুর্য্য, চরিত্র, দৃশ্য প্রভৃতি (৪) ভাষা এবং ছন্দোমিলন।

১ম। উদ্দেশ্য ও বিষয়-নির্ব্বাচন:—

কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ইংরেজাধিকৃত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে, প্রাচীন ভারতের ভক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে, আধুনিক ইয়োরোপের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মশীলতার সংযোগ হইয়া নিঃশব্দে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে" (৫পৃ)। "রামমোহন একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত এবং কর্ম্মী, এক কথায় মানবের সমঞ্জসীভূত উন্নতির সুন্দর নিদর্শন স্বরূপ। যিনি সভ্য জগতের সদ্‌গুণরাশির প্রতিনিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বগ্রাসী মহা বিপ্লবের প্রবর্ত্তকরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার অভ্যুদয়, মহাকীর্ত্তি ও সেই মহাকীর্ত্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইলে, সত্য সত্যই শত মহাকবির প্রয়োজন" (৬পৃ)। এই মহাবিপ্লব এবং এই মহাপুরুষ লইয়া ভারতমঙ্গল লিখিত। "রামমোহনের অভ্যুদয়ে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবযুগে, যে সকল চিন্তা ও ভাব মানুষের অন্তঃকরণে উদিত হইয়া, জনসমাজকে অভিনব মূর্ত্তি প্রদান করিতেছে, তাহা জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিবার ইচ্ছায়" ভারত-মঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি। সংক্ষেপে ভারতমঙ্গলের উদ্দেশ্য—বঙ্গসাহিত্যে একখানি মৌলিক (Original) মহাকাব্য রচনা করা এবং বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভাবে যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতিতে বিপ্লব উৎপাদন করিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা এবং প্রচার করা। বাস্তবিকই বর্ত্তমান ভারতের এই মহাবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিবরণ জাতীয় সাহিত্যগত করিতে "শত মহাকবির প্রয়োজন"। রাজা রামমোহন রায় এই মহাবিপ্লবের অধিনায়ক এবং কেন্দ্রস্বরূপ। তিনি প্রাচীন এবং নব্যবঙ্গের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, উভয়ের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন আবিষ্কার করিয়া, কীর্ত্তিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অশেষ কীর্ত্তিকাহিনী এবং এই মহাবিপ্লবের ইতিহাস মহাকাব্যেরই বর্ণনীয় বিষয়। উদ্দেশ্য এবং বিষয়ের উচ্চতা এবং মহত্ত্বে "ভারত-মঙ্গল" বিশেষ সৌভাগ্যবান্।

গ্রন্থারম্ভ—বন্দনাতেও ইহার পরিষ্কার আভাস আছে;—

বিষয়—"লীলাসিন্ধু, লীলা তব কার সাধ্য বুঝে?
লীলার তরঙ্গ এক উঠি বঙ্গভূমে
ছাইল ভারতভূমি, কাঁপাইল ধরা;
হইবে সত্যের জয়, ডুবিবে সত্বরে
জগতের পাপতাপ শান্তি সিন্ধুনীরে।
স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে কিরূপে
পৃথিবীতে, পুণ্যকথা কহিব হে আমি;"

উদ্দেশ্য —"গাইব পুণ্যের জয়—শান্তির সঙ্গীত অধর্ম্মের পরাভূতি—"

২য়। কাব্যগঠন-প্রণালী:—

প্রথমেই অতুল-শোভায় পরিপূর্ণ মহাশান্তিময় চির-বসন্ত-সেবিত জরামরণাতীত পবিত্র স্বর্গধামের পুণ্যময় দৃশ্য:—

"সৌরজগতের পরে সুদূর অম্বরে
রম্যদেশ, সোমসূর্য্য অদৃশ্য সেখানে।
দিব্য দীপ্তিময় সেই দ্যুলোক নিয়ত,
নাহি দিবা বিভাবরী, অন্ধকার কিবা
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-জ্বালা ভূলোকে যেমতি।
প্রহরে প্রহরে কিবা নব বেশধরে
নভোস্থল, সমুজ্জ্বল শত সৌরকরে;
কভুবা, অমৃত-কণা কভু অঙ্গেমাখা।

কভুবা সুবর্ণ বর্ণ নব ঘনদল
সজ্জিত, চিত্রিত যথা স্ফটিক-প্রাচীরে
ইন্দ্রধনু, তন্দ্রা-পটে সুখস্বপ্ন কিবা!

এই শান্তিরসপূর্ণ অভিরাম নিত্যধামে বিচিত্র মণিদাম-মণ্ডিত, সুরম্য পুরীতে ধর্ম্ম-রাজ সমাসীন :—

"ধর্ম্মের প্রবীণমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তির আধার
সৌম্যকান্তি, স্নেহময় বীর্য্যভাতি মাখা ;
নাহি ঔদাসীন্য মুখে, তামসিক ভাব,
উৎকট সংগ্রামসাজ, বিলাসের বেশ ;
ভক্তিতে আপ্লুত আঁখি, সানন্দ সতত।"

সাধনা ভিন্ন ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রদীপ্ত কান্তি মলিন এবং বিশুষ্ক হইয়া যায় ; তাই ধর্ম্মের

"——সাধনা রাণী সতত সঙ্গিনী
মহাপ্রেমে মত্ত দোঁহে, যেন দোঁহাকার
এক প্রাণ দুই কায়া, বস্তুছায়া সম।"

ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন এবং সহায় সত্য, প্রীতি, ন্যায় ও পবিত্রতা ; তাই ইহারা যুগ্ম দম্পতিরূপে ধর্ম্মের সেবা এবং রক্ষায় নিযুক্ত। তদ্ভিন্ন—

"সাধুসঙ্গ, সদালাপ! নিত্য সহচর ধর্ম্মের ;" "পত্নী
দোঁহাকার সুমতি, সুরুচি—দেবরাণীর সঙ্গিনী"
"ধর্ম্মের কুমার দুই অযোনি-সম্ভব
জ্ঞান, ভাব, কন্যা এক ইচ্ছাময়ী নামে।"

একদিন কৌতূহলবশে জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা, ধর্ম্মের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, দেবদূত এবং দেবদূতী সমভিব্যাহারে পৃথিবীমণ্ডল পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। এই ভ্রমণ-পথের অপূর্ব্ব বর্ণনায় কবি যে সকল দৃশ্য এবং চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাদের গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য, কল্পনার দূরপ্রসারিতা এবং উচ্চতায় পাঠকের মন চমৎকৃত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ে। স্বর্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণ প্রথমতঃ মহা সন্ধিস্থলে উপস্থিত :—

"ঊর্দ্ধে শোভে নিত্য দীপ্তি, খেলে পদতলে
আলো আর অন্ধকার পর্য্যায় ধরিয়া ;
দক্ষিণে গোধূলি আলো, বামভাগে ঘোর
ঘনঘটাচ্ছন্ন যেন গভীর তামসী
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, মধ্যলোক আর প্রেতপুরী
সম্মিলিত এই স্থানে, বিধির বিধানে ;"
"চাহি নিম্নে সুরগণ দেখিলা হরষে
সৌর জগতের শোভা, গ্রহ উপগ্রহ
ভ্রমিতেছে অবিরাম অভিরাম কিবা!"

ক্রমে ক্রমে—

"অতি দূরে ক্ষুদ্র এক বর্ত্তুল আকার
পৃথিবী ; অর্দ্ধেক তার ভানুর কিরণে
ভাস্বর, আবৃত অর্দ্ধ ঘোর অন্ধকারে।
ঠিক যেন শ্বেতকৃষ্ণে রঞ্জিত গোলক
ব্যোমবর্ত্তে আবর্ত্তিত পলকে পলকে"

দেবদৃষ্টির গোচরীভূত হইল। কি প্রকাণ্ড বিশাল বিশ্বগ্রাসী কল্পনা! ইহার উচ্চতা এবং ক্ষিপ্রতা অনুধাবন করিতে মস্তক ঘুরিয়া যায় ; ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক-শক্তি বিস্তারিত হইয়া দীপ্তিময় অসীমতার অনন্ত আবর্ত্তে পথ হারাইয়া ফেলে, —আত্মবিসর্জ্জন করে।

"সৃষ্টির আরম্ভ মর্ত্ত্যভূমে" ; জীব কর্ম্মানু-সারে এখান হইতে প্রেতপুরী গিয়া মধ্য-লোক গামী হয়। তাই দেবগণ সর্ব্বাগ্রে মর্ত্ত্যধামের :—

"মহোন্নত মহাগিরি, মেঘমালা-ভেদী
উচ্চশির সুশোভিত সুবর্ণ-কিরীটে,
পিন্ধন হরিৎবাস, শুভ্র উত্তরীয়
স্কন্ধোপরে, বক্ষে বহে স্বেদধারা-সম
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর সিন্ধু ইরাবতী।"

হিমালয়ের অভ্রভেদী কাঞ্চনশৃঙ্গে অবতরণ করিলেন। কাঞ্চনশৃঙ্গ হইতে দেবগণ দিব্য-রথ সাহায্যে পৃথিবীর চারি মহাদেশ পর্য্য-টন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত। ভারত-ভ্রমণ এইখান হইতে আরম্ভ ; ক্রমে, পর্য্যায়ক্রমে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সকল পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে গন্ধর্ব্বদেশ অর্থাৎ কাশ্মীরে উপনীত হইলেন। অন্যদিকে দেবগণের মর্ত্ত্যে গমনবার্ত্তা শ্রবণে অধর্ম্মরাজ স্বীয় একাধিপত্যের বিঘ্ন ভয়ে মন্ত্রণা করিয়া, দেবগণের বিরুদ্ধে ভণ্ডাসুরকে প্রেরণ করি-লেন। ভণ্ড গান্ধর্ব্বদেশে গিয়া নানা কৌশলে জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছাকে অপহরণ করিল। ইহাদের উদ্ধারার্থ সসৈন্যে সত্যসেনাপতি মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন এবং পাতালপুরনীতা ইচ্ছাদেবীর উদ্ধারার্থ দানবযুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দানব-পরাজয় নিমিত্ত দেবগণের ব্রহ্মপূজা এবং প্রত্যাদেশ লাভের ফলস্বরূপ দেবনারীগণের সহাচর্য্যে দ্বিতীয় যুদ্ধে দানবের পরাজয় হইল। জ্ঞান এবং ভাবদেবের উদ্ধার পূর্ব্বেই সংসাধিত হইয়াছিল ; এক্ষণে

ইচ্ছাকে উদ্ধার করিয়া, সমবেত দেবদেবী-গণ প্রেতপুরী এবং মধ্যলোক পরিদর্শন করত পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। ইহার পর ব্রহ্মবাণীর নির্দ্দেশানুসারে নরদেবগণ ভারতমাতার সহিত বঙ্গে আগমন করিলেন, এবং শ্রীরামমোহনের জন্ম এবং অভিষেক সম্পন্ন হইল।

পূর্ব্বখণ্ড ভারতমঙ্গলের আখ্যায়িকা ভাগ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার স্থানে ২ সুন্দর উপাখ্যান দ্বারা, কোথাও পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বপূর্ণ আলোচনা এবং কথোপকথন দ্বারা, কোথায়ও ভাষার বর্ণনাতীত অমূল্য উপদেশপূর্ণ অতি রমণীয় চিত্র এবং দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করিয়া, আবার কোথায়ও বা কেবল মাত্র দুই একটী উপমান উপমেয়ের চমৎকার প্রয়োগ দ্বারা, এই মূল বর্ণনীয় বিষয়টীকে কবি অতি নিপুণতার সহিত সুরঞ্জিত এবং পরিস্ফুট করিয়াছেন। পাঠকের সুবিধার্থ নিম্নে দুই একটী উদ্ধৃত হইল।

পতিত সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য, বিন্ধ্যাচলাশ্রমে, অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণদেহা এবং রুক্ষকেশা ভারতমাতা যুগান্তব্যাপী মহা তপস্যায় নিমগ্না ; মাতার বাৎসল্য ভরা বিশাল হৃদয় বিক্ষোভিত করিয়া, সন্তানের দুর্গতি স্মরণে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রু-ধারা পতিত হইয়া পদতলের শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমবৎ হইয়াছে। কবির নিপুণতা দেখুন ; এই একটী মাত্র নীরব দৃশ্য দ্বারাই কবি বর্ত্তমান ভারতের রাশি রাশি দুর্গতির কালিমাময় ছবি, সুন্দর এবং সতেজ ভাবে, পাঠকের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিয়াছেন। যেমন গাম্ভীর্য্যময় প্রশান্ত তপোবন, তেমনি মূর্ত্তিমতী প্রশান্তিরূপিণী তপস্বিনী! চিন্তা করিলে, হৃদয় প্রেম এবং ভক্তিভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে ;—

"বিন্ধ্যাচলে পুণ্যতোয়া গোদাবরী যথা
মৃদুমন্দ প্রবাহিত, সুন্দর কন্দরে
সুনির্জ্জন তপোবন ; তরুগুল্মলতা
নিভৃতে নিদ্রিত তথা স্বভাবের কোলে।
বিস্তারি সুগন্ধরাশি নিত্য বিকশিত
পুষ্পদাম, গন্ধময় দেবগৃহ সম
তপোবন, পূর্ণ শান্তি বিরাজিত সেথা।
সেই তপোবন-মাঝে মগ্ন মহাতপে
আছেন ভারতমাতা বর্ষ শত শত।
অহো কি অপূর্ব্ব-কান্তি ভারতজননী
পুণ্যময়ী!—সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে
ভক্তির চন্দন চর্চ্চা, স্তিমিত নয়নে
বিস্ফুরিত জ্ঞানজ্যোতি, পশ্চিম আকাশে
অর্দ্ধনিমজ্জিত প্রভাকর-প্রভা-সম।
মায়ের উন্নতশিরে শুভ্র কেশরাজি
শোভিত, শোভিত দুই ভুজ বক্রবেশে—
দুইদিকে, পদতলে মণিমুক্তা হাসে।
কৃতাঞ্জলিপুটে মাতা আছেন দাঁড়ায়ে
ভক্তিযোগে, বেগে বহে শ্রীঅঙ্গ ব্যাপিয়া
প্রেমের পবিত্র অশ্রু নদনদীরূপে।"

একদিন এই তপোবনে বিষাদবিশীর্ণ দেহে গভীর শোকান্বিত নয়নে বঙ্গলক্ষ্মী মাতার নিকট স্বীয় মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত—

"শোন মা দুঃখের বার্ত্তা কহি সবিস্তারে।"
(৯১-৯৫ পৃঃ)।

"আবরিলে অমানিশা ঘোর অন্ধকারে
বিশাল শ্মশান-মাঝে মহামারিকালে
মুহুর্মুহু চিতানল জ্বলে যথা মাতঃ,
তেমতি দুঃখের বহ্নি জ্বলিছে নিয়ত
বঙ্গভূমে ;"

ভারত-সন্তান, একবার ক্ষুদ্রতাময় স্বার্থ-কোলাহলে ভুলিয়া, "দূরশঙ্খধ্বনিসম" ভারতজননীর মর্ম্মভেদী মহাবিলাপধ্বনি শ্রবণ কর। মায়ের এমন কোন্ পাষণ্ড সন্তান আছে, যাহার ধমনীর রক্তবিন্দুসকল, ইহার অক্ষরে অক্ষরে উদ্বেলিত হইয়া না উঠিবে? মাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—

"জানি আমি বঙ্গলক্ষ্মি, দুঃখরাশি তব
দুর্নিবার, অনিবার অভাগী জননী
অশ্রুজলে ভাসে তোর দিবস-যামিনী।
নহে বৎসে এ দুর্দ্দশা তোমার কেবলি,
মগধ মালব সিন্ধু পঞ্চনদ কিবা
কলিঙ্গ কর্ণাট আদি বিদগ্ধ সকলি
দুঃখ-হুতাশনে ঘোর, ভারত-শ্মশানে।"
"অন্ধকার, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে
অবারিত দিক্‌দশ ; গরজে অশনি
বিনামেঘে, বিভীষিকা দেখায় বিজলী!
জ্বলিছে অনন্ত চিতা ভারত-শ্মশানে ;
ভারত-সৌভাগ্য পুড়ি, ভস্মরাশি মাখি
ভণ্ড পাষণ্ডের দল ভূতপ্রেত-সম
করিছে বিকট কেলি, সমগ্র ভারতে!
সাধে কি জননী তোর আছে লুকাইয়া
নিভৃত কন্দর-তলে বিন্ধ্যাচলাশ্রমে!"

কাব্যের মূলভাবের (Plot) বিকাশ প্রণালী দেখিলেন। ভারতমাতার সুদীর্ঘ বিলাপ (৯৬-৯৯ পৃ) দ্বারা কবি কতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন? এইরূপে, প্রয়াগধামে পিণ্ডদান উপলক্ষে প্রার্থনা তত্ত্বের, বৃন্দাবন প্রসঙ্গে অবতারবাদের, হরিদ্বার বর্ণন কালে তীর্থ-মহিমার এবং ষোড়শ সর্গে রাজা-প্রজা-সম্বন্ধের বিষয়ের বিশেষ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা-পূর্ণ ব্যাবৃতি সকলের সন্নিবেশ দ্বারা, কবি, বর্ত্তমান জগতের দর্শনবিজ্ঞান-সম্ভূত উন্নত জ্ঞানের দীপ্তিমান প্রসূনসমূহকে ভারত-মঙ্গলের স্থানে স্থানে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

একবার নরকের চিত্র দেখুন। দেবদেবীগণ স্বর্গে প্রত্যাগমনকালে ঃ——

"পশিলেন প্রেতপুরে সঙ্গীগণসহ।
ভয়ঙ্কর প্রেতপুরী গভীর আঁধারে
সমাচ্ছন্ন ; ফিরে তাহে নিশাচরসম
কৃতান্ত কিঙ্কর যত ভীম দণ্ড করে।
সে গভীর অন্ধকারে প্রবাহিত সদা
উষ্ণ বায়ু, মুহুর্মুহু উঠিছে অম্বরে
"উহুঃ উহুঃ!" আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে তায়
হুহুঙ্কার "মার মার!" মহাশব্দসহ।"

প্রেতপুরী এবং পূর্ব্বপাপের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্তের যে লোমহর্ষ, হৃদয়-বিশুষ্ককারী, অতি বীভৎস, অতি উৎকট মৌলিক (original) চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ইহার পাঠকালে দান্তের (Inferno র) ভীষণ চিত্র সকল মানস-পথে উদিত হয়। পরনিন্দা-পরায়ণের কি ভয়ঙ্কর শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত!—

"নিষ্ঠুর ধীবর যথা রাখে শৃঙ্খলিয়া
মৎস্যগণে কর্ণপথে, ঝুলিছে তেমতি
উন্নত পর্ব্বত-অঙ্গে পাপী কোটি কোটি!
রসনায় বিঁধাইয়া লৌহের শৃঙ্খল
রাখিয়াছে পাপীগণে ; করিছে বিকট
বদন ব্যাদান পাপী, নির্গত রসনা
হস্তমিত, ক্ষরিছে শোণিত মুহুর্মুহু!
গোঁ গোঁ শব্দে কাঁদে পাপী নাহি সাধ্য কথা
কহিতে, সহিতে নারে বিষম যাতনা!
* * * *
ঝুলিয়া" অনেক দিন এইরূপে পাপী,
পচিয়া রসনা, শেষে পড়িয়া ভূতলে
মরিবে, তরিবে পাপে, প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

এইরূপে নানাস্থানের তত্ত্বকথা কথোপকথন, উপাখ্যান, দৃশ্যাবলী প্রভৃতির সাহায্যে কবি নানারকমে পাঠককে অজ্ঞাতসারে স্বীয় অভীষ্ট স্থানে লইয়া গিয়াছেন।

দেবগণের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ভারতমাতার তপস্যা, বঙ্গলক্ষ্মীর মনস্তাপ, দেববালাগণের প্রার্থনা, দৈত্যনীতি দ্বারা দেবভাবের সাময়িক পরাভব এবং দৈত্যবিজয়, পরলোকগত মহাজনগণের আন্তরিক শুভকামনা প্রভৃতিই কবির কাব্য-লক্ষ্য সংসাধনের প্রধান অবলম্বন এবং সহায়। এই সমবেত অপ্রত্যক্ষ শক্তি-সমূহের ফলস্বরূপ উনবিংশ সর্গে রামমোহনের জন্ম। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনা-শ্রেণীর সহিত রামমোহনের জন্মের যে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন—অর্থাৎ—

"জয়ন্ত জাহ্নবী দোঁহে দেবত্ব লভিলা
যে মুহূর্ত্তে, সে মুহূর্ত্তে মানব কুলে
জনমিলা শিশু এক দামোদর তীরে
বঙ্গভূমে, ভারতের পবিত্র উরসে।"

এই সম্বন্ধ সংস্থাপন, ভারতমঙ্গল কাব্যের একটী কঠিন কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা হইলেও, ভারতমঙ্গলের কবির যোগ্য হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর কবিত্বপূর্ণ এবং বিচক্ষণ মীমাংসা আমরা আশা করিয়াছিলাম। এই সঙ্কটে কবি ব্রহ্মবাণী বা অতি পুরাতন "দৈববাণীর" আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবাণীর গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সময়েই অসম্ভব, সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি কেন যে এই দুর্ব্বোধ্য গূঢ়ত্বের আশ্রয় নিতে গেলেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না।

তারপর কবির সর্গযোজনা প্রণালী। ভারতমঙ্গল পূর্ব্বখণ্ডের সম্পূর্ণ ছয়টী সর্গ কেবল উপাখ্যান-মালায় (episodes) পরিপূর্ণ। ইহাদের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে কাব্যের মূলসূত্র অনেক সময়ে হারাইয়া ফেলিতে হয়। এই উপাখ্যান ভাগের সন্নিবেশেও বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না ; কাজেই অনেক স্থান, এমন কি, দুই একটী সম্পূর্ণ সর্গই, সংযোজনায় ত্রুটীতে, পূর্ব্বাপরে অসঙ্গতি-দুষ্ট, নিরর্থক এবং প্রতিবন্ধক স্বরূপ মনে হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথার সমর্থন করা সুকঠিন

নহে;—বিন্ধ্যাচলে ভারতমাতার ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ সর্গের মধ্যভাগে বর্ণিত হওয়াতে, পাঠককে সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে একবার বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পুনরায় ৬ষ্ঠ সর্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হয়; এই "দ্বিরাগমনের" ফল বড় প্রীতিকর নহে। সপ্তম সর্গের বর্ণিত বিষয়ের সহিত ষষ্ঠ এবং অষ্টম সর্গের তিলমাত্রও সম্বন্ধ না থাকাতে, সপ্তম সর্গটীকে আকস্মিক এবং প্রতিবন্ধক স্বরূপ বোধ হয়। ইচ্ছাদেবীর উদ্ধারার্থ বিপুল সমরায়োজনের মধ্যে হটাৎ ত্রয়োদশ সর্গের ন্যায় একটা নিঃসম্পর্ক ও অপ্রাসঙ্গিক বিস্তৃত বৃত্তান্তের অবতারণা করা, উপন্যাস-প্রণয়নের সমর্থন-যোগ্য কিম্বা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইলেও, মহাকাব্যে নিতান্ত বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয়। একাদশ এবং ষোড়শ সর্গদ্বয়, অতি সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর সূত্রে এই মহাকাব্যের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। সহজেই কবি এই সূত্রকে অধিকতর আবশ্যকীয় এবং দৃঢ় করিতে পারিতেন। পঞ্চম, সপ্তম, এবং ত্রয়োদশ সর্গত্রয়কে মূলভাব বিকাশের (Development of the plot) স্বতন্ত্র উপায় স্বরূপ একটী পৃথক্ বিভাগে স্থাপন করিলে কাব্যাধ্যয়ন সমধিক সুখকর হইত; অথচ মূল উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। যেরূপ স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এই তিনটী সর্গই কাব্যস্রোতের অন্তরায় এবং প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কবি প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধীয় যে সকল অতি কঠিন এবং জটিল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে একখানি দ্বিতীয় ভারত-মঙ্গল লিখিতে হয়। ইহাদের মীমাংসাতে কবি অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিলক্ষণ সূক্ষ্মানুসন্ধান দেখাইয়াছেন। এই সকল গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নহে; আমরা কবির সহিত সকল স্থানে একমত হইতে পারি নাই। নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, বাহুল্য ভয়ে, এই সমস্ত অতি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ স্থান সমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

এই খানে আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ভারত-মঙ্গল পূর্ব্ব খণ্ডকে দাম্পত্য ধর্ম্মের মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। এক স্থানে দাম্পত্য ধর্ম্মের এমন সুবিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক মীমাংসাপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা, আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব, নর-নারীর একত্ব সাধনেই সমুদ্ভূত হয়। পুরুষ জ্ঞানী, সাহস-সামর্থ্যশীল; রমণী প্রেম, স্নেহ এবং সহিষ্ণুতার আধার:—

> "বিধাতার পিতৃভাব পরিব্যক্ত যথা
> পুরুষে, প্রকৃতি মধ্যে মাতৃভাব তথা;
> সাহস সামর্থ্যে বটে শ্রেষ্ঠতর এক,
> অন্য শ্রেষ্ঠ কোমলতা-সহিষ্ণুতা গুণে,
> জলস্থলে বিরচিত ধরাতল যথা,
> রমণী পুরুষ দোঁহে মানব তেমতি। *

পুরুষ আশ্রয়, রমণী আশ্রিতা, কিন্তু "শান্তির চেতনারূপা।"—"তুমি তরু আমি লতা, প্রেম আলিঙ্গনে বেষ্টিয়া রয়েছি তোমা, অবলম্ব তুমি জীবনের; তব অঙ্গে করে যদি কেহ অস্ত্রাঘাত, অগ্রে তাহা লাগে এ শরীরে।" রমণী পুরুষের প্রকৃত প্রণয়সূত্রে মিলনেই পূর্ণ মানবাত্মার আবির্ভাব:—

> "মিলনে প্রেমের সৃষ্টি, বিরহে তাহার
> হয় পুষ্টি; প্রকৃত প্রণয় মহাদেবি,
> সুখদুঃখাতীত সদা, পবিত্র অক্ষয়
> অচ্ছেদ্য অমৃতধারা বরষে অন্তরে।
> প্রেমিকের প্রিয়ধন পাইলে নিকটে
> বহিরঙ্গ করে ক্রিয়া সমধিকরূপে;
> হইলে অন্তর সেহ, অন্তরঙ্গ করে
> সেইরূপ। অপরূপ বিধাতার বিধি—
> দেখিলে নয়ন হাসে, তাতেও উপজে
> যে অপূর্ব্ব সুখরাশি প্রেমিকের প্রাণে;
> না দেখি নয়ন কাঁদে তাতেও তেমনি

---

*এই সকল স্থল পাঠকালে মহা কবি মিণ্টনকে স্মরণ হয়।

"For contemplation he, and valour formed
For softness she, and sweet attractive grace;
He for God only, she for God in him."
"God is thy Law, thou mine;—to know no more
Is woman's happiest knowledge and her praise."
Paradise Lost, Book IV.

সঞ্চরে অতুল সুখ হৃদয়ের স্তরে।
অন্তরে বাহিরে হবে নিত্য সমসুখী
দেবনর, এই হেতু সৃজিলা বিধাতা
রমণী পুরুষ দুই, দ্বিখণ্ডিত করি—
এক আত্মা ; ———"

"দাম্পত্যই মানবের একমাত্র পালনীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, দাম্পত্য ধর্ম্মাচরণ না করিলে মানবের প্রবৃত্তির শিক্ষা, নিবৃত্তির পরীক্ষা, প্রেম সাধন ও প্রকৃত চরিত্র গঠন হয় না।"

"* * দাম্পত্যই সার ধর্ম্ম ভবে।
হৃদয়ের প্রেম যবে হয় ঘনীভূত,
কেন্দ্রগত এক পাত্রে, অতীন্দ্রিয় রূপ
ধরে তাহা ; ঘুচে তাহে ইন্দ্রিয়-পিপাসা,
পশুভাব যায় দূরে ; দেবদৃষ্টি লভি,—
দেবের দুর্লভধন—প্রেমময়রূপ
হেরে নর ; দূর দৃশ্য মুকুরে যেমতি।
পরস্পর-প্রেমমুখে নিরখি দম্পতি
সে অনন্ত প্রেমরূপ অঙ্কিত নিয়ত
সে মুখের অন্তরালে, অন্তরে বাহিরে
করে সে প্রেমের পূজা পবিত্র মানসে।
* * * *
প্রেমের চরমাদর্শ, পরম বিকাশ—
দাম্পত্য সম্বন্ধে শুধু জগৎমাঝারে।"
"পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মে চরিত্রগঠন
ঘটে মানবের জেনো, বিধির বিধানে।
আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপালন
শিখায় দাম্পত্য ধর্ম্ম মানব মণ্ডলে।
* * * *
সেচ্ছায় প্রবৃত্ত সাধু পর উপকারে,
কর্ত্তব্য স্বায়ত্ত তাঁর ; ইচ্ছা-অনিচ্ছায়
সতত দম্পতি রত কর্ত্তব্য-সাধনে ;
রোগ, শোক, দরিদ্রতা, আলস্য, উদাস
কখনো পারে না দিতে সে কর্ত্তব্যে বাধা।"

প্রবৃত্তির বিকাশ—সম্ভোগ এবং সেবায় ; নিবৃত্তি বৈরাগ্য এবং নির্ভরের প্রসবিত্রী। উভয়ের সম্মিলনে অনাসক্ত কর্ত্তব্যসাধন অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্ম্মের উৎপত্তি। দাম্পত্যধর্ম্মে এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একত্র সাধন হয় :——

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভিন্ন পুণ্যপথে কেহ
নাহি রহে প্রতিষ্ঠিত, কহিনু তোমারে।
প্রবৃত্তি সে কর্ম্মশীলা, নিবৃত্তি নিশ্চলা,
অনাসক্ত প্রেম ফলে দোঁহার মিলনে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই একত্র সাধন
করে নর, পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম-পথে।
* * * *
প্রকৃত প্রেমের বশে আত্মসুখে রতি
ঘুচে যবে, নিবৃত্তির আরম্ভ তখনি।
* * *
প্রবৃত্তি সে বহির্ম্মুখী, হয় পরিণত
লোকপ্রেমে, নিবৃত্তি অন্তরমুখী সদা
নিষ্কাম নির্ভর শিক্ষা দেয় দম্পতীরে।"

পতি পত্নীর পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম এবং ভক্তির নির্যাস স্বরূপ যে স্বর্গীয় আনন্দাশ্রু বিনির্গত হয়,

"সেই অশ্রুবিন্দু মধ্যে দেখিলা উভয়ে
অনন্ত শান্তির রাজ্য বিস্তৃত সম্মুখে।"

স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সান্ত্বনা, উৎসাহ এবং সংস্পর্শে, উভয়েরই সকল শ্রান্তি, দুর্ব্বলতা এবং নীচতা বিদূরিত হইয়া যায়, হৃদয়ে তাড়িৎ প্রবাহের ন্যায় নববল সঞ্চারিত হয়, দিব্য নবজীবন লাভ হয় ;—

"তাপিত মস্তক রাখি পত্নীস্কন্ধোপরে
* * * *
পত্নীর পরশ লভি ঘুচিল সকলি
পথশ্রান্তি, দানবের প্রহরণ ব্যথা।"
"পত্নীর পরশে পতি লভিবে জীবন
পুণ্যপরাক্রমে, হবে বিজয়ী সমরে।"
"লভিয়া নবজীবন প্রীতির পরশে
শতগুণ বলে বলী সত্য-সেনাপতি।"
"এত কহি মহাপ্রেমে মত্ত মহাদেবী
ধরি বক্ষে পতিরত্নে দিলেন বিদায়
সুতপ্ত নিশ্বাস-সহ ; সুপ্তোত্থিত-সম
লভি বল সত্যশূর চলিলা সমরে।"
"রমণীর প্রাণধন, প্রাণের আরাম
পতিরত্ন ; * *
* * *
হস্ত চাহে সেই পদ, চাহে দুনয়ন
সেইরূপ ; শ্রান্ত পদ চালায় বিপথে,
স্মৃতিপটে সে মূরতি সম্মুখে নিরখি !
প্রস্ফুট-কমল-কোলে করে যবে অলি
মধুপান, নবপ্রাণ পায় সে নলিনী ;
* * *
—কি করিয়া কহলো স্বজনি,
বাঁচিবে ব্রততী হলে তরুশাখাচ্যুত ?
আকুল, আকুল আমি, অকূল পাথারে
পতিত পতঙ্গসম !———"

পরিশেষে কবি আনন্দচন্দ্রের জীবন্ত বিশ্বাসজাত শান্তিময় Optimism দেখুন ; ইনিও টেনিসনের ন্যায় বিবর্ত্তন এবং উন্নতিবাদী ;—

"জরামৃত্যু রোগশোক—বিধাতার বিধি—
অনিবার্য্য, কিন্তু কভু অমঙ্গল নহে।"
* * * *
দুঃখ পরিহরি তেঁই সুখের পশ্চাতে

মঙ্গলের পথে জীব যায় নিরবধি।"
"সকলি উন্নতিশীল কালক্রমে ভবে
* * *
একরূপ সমভাবে নাহি রহে কিছু
এ অনন্ত বিশ্বধামে স্থাবর জঙ্গমে;
মঙ্গল চরম লক্ষ্য, বিবর্ত্তন তার
প্রক্রিয়া; পরম জ্ঞানী প্রেমময় ধাতা
এইরূপে যান লয়ে পূর্ণশান্তিধামে।
"————————বিপদ তোমার
ক্ষণস্থায়ী—ঘটে শুধু বাড়াইতে ভবে
অটল-মহিমা তব; কুজ্ঝটিকা যথা
প্রভাকর-প্রভা দেব করে দ্বিগুণিত।"
"দেবের বিপদে নাথ, সুমঙ্গল লভে
পরিণামে দেবদল ————"

ইহা পড়িলে টেনিসনের সেই অননুকরণীয় অতি মহান্ লাইন কয়টী মনে পড়ে;—

One increasing purpose through all the creation runs;
And the Earth is widened through the process of the Suns."
"One God, one Law, one element,
One far-off Divine event,
To which all the creation moves."

এবং পোপের—

"All discord, harmony not understood,
All partial evil, universal good."

ভারতমঙ্গলের রচনাচাতুর্য্য অর্থাৎ চরিত্র-দৃশ্য প্রভৃতি এবং ভাষা ও ছন্দোমিলন সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

২। নারী-মঙ্গল।—শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৵০; মৈনা (শ্রীহট্ট) হইতে প্রকাশিত। নারীমঙ্গল বৈষ্ণব ভাবে, বৈষ্ণব ভাষায় লিখিত। নারী জাতির কিসে দুর্গতি দূর হইতে পারে, একজন মহিলা সেই চিন্তা করিতেছেন; ইহা ভাবিতেও সুখ।

৩। প্রবেশিকাসারঃ।—নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেডপণ্ডিত বাবু দীন নাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য ।৵০। ১৮৯৬-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এণ্ট্রান্সের সংস্কৃত পাঠ্যের বিবৃতি। অন্যান্য বিবৃতি বড় বিস্তৃত, সকল ছাত্রের পড়িয়া উঠার সময় হয় না; কিন্তু এই পুস্তকখানি অতি সংক্ষেপে নূতন প্রণালীতে লিখিত। মূল্যও অতি সুলভ। প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের বিশেষ উপকারে আসিবে।

৪। বিদ্যাসাগর।—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য কাপড়ের মলাট ৩৲, কাগজের মলাট ২॥০। সংস্কৃত ডিপজিটারি হইতে প্রকাশিত।

বহুদিনের কথা নয়, বঙ্গের চতুর্দ্দিক যখন স্বার্থপরতার ঘোরান্ধকারে নিমজ্জিত, সেই সময়ে, মহা দয়া-উষা রূপে-যখন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বিদ্যাসাগর প্রভাবান্বিত হইলেন,তখন, নিরাশা-আঁধার-মগ্ন, দারিদ্র্য-পীড়িত নরনারী মহা আশায় মাতিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে নব হাসি চমকিল। মানুষের দেবত্ব কোথায়? আমরা চিরকাল বিশ্বাস করি, দয়ায় এবং চরিত্রে। দয়া এবং চরিত্রের উপযুক্ত সম্মিলন দেখিতে চাও যদি, তবে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-চরিত্র অধ্যয়ন কর। বিদ্যাসাগর জীবনী, দয়া এবং চরিত্রের পূর্ণ আদর্শ, একথা বলিলে কিছুই অতিরিক্ত বলা হয় না। খ্রীষ্ট জীবনী, দয়া ও চরিত্রের সমাবেশে সকলের পূজ্য। এই পৃথিবীর কত নরনারী আকুল প্রাণে খ্রীষ্ট-জীবন-পুণ্য-সরসিতে নিমগ্ন হইয়া পবিত্রচিত্ত হইয়াছেন, কে সংখ্যা করিতে পারে? যে সকল কারণে খ্রীষ্টের জীবনী আদরের, সেই সকল কারণেই ম্যাট্‌সিনি ও বিদ্যাসাগরের জীবনীও আদরের। পুণ্যবানের পুণ্যকাহিনী পাঠে জীবন লাভ, স্মরণে চরিত্রলাভ, অনুধাবনে দয়ার স্ফূর্ত্তি। আজ না হউক, এমন দিন আসিবে, যে দিন এই পুণ্যবানের পুণ্য-জীবন কাহিনী শুনিবার জন্য এ দেশের নরনারী উৎকণ্ঠিত হইবে, ব্যাকুল হইবে।

এই মহাত্মার স্বর্গারোহণের পরে অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই আদর করিয়া পড়িয়াছি, একস্থানে সকল সমাবিষ্ট দেখিতে বড়ই ইচ্ছা ছিল। আমাদের যে ইচ্ছা বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বন্ধু, অধিক আর কি বলিব, তাঁহার এই কাজের জন্য আমারা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। এই পুণ্য-সরসিতে নিমগ্ন করিতে তিনিই আমাদিগের প্রথম সহায়। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক। ইহাতে অবগাহন করিয়া কি পাইলাম, ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

রামপ্রসাদ। (২)

রামপ্রসাদ অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। পিতৃহীন হওয়ার পর পৈতৃক সম্পত্তিতেও বঞ্চিত হন। রামপ্রসাদের একটী গান হইতে বেশ্ বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতার জমিদারী ছিল। রামপ্রসাদকে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া অপরে তাহা অধিকার করে। পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া প্রসাদ বড় কষ্টে পতিত হন। সাহায্যের আশায় অনেকের নিকট উপস্থিত হন, সকলেই আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে,কিন্তু কেহই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন নাই। গানটী এই—

আমার কপাল ভাল নয়গো তারা,
ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো মাগো
রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্প মতি ভাসালে সায়রের জলে।
সোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর কেউ নামেনা অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা,মাগো,আর দিব আমার মাথা
রক্ত চন্দন রক্ত জবা দিব মায়ের চরণ তলে।
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শুন মা নারায়ণী
তমু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে।

এই বিপদের সময় ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রসাদকে আশ্রয় দেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভবানী, ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এবং ভাগিনেয় জগন্নাথ ও কৃপারামের প্রতি প্রার্থনা বাক্য [illegible] হয়। সর্ব্বাগ্রজা ভগিনী অম্বিকা বড় দরিদ্রা ছিলেন, তাঁহার সন্তানও হয় নাই। (১)

রামপ্রসাদ বাল্যেই পিতৃহীন হন বলিয়াছি। পিতৃহীন হওয়ার অল্পপরেই মাতৃহীনও হইয়াছিলেন। যখন প্রসাদ গান ও কীর্ত্তন রচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন না। থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন স্থলে তাঁহার উল্লেখ থাকিত। যেখানে ভাই ভগিনী,ভগিনীপতি, পুত্রকন্যা, ভাগিনেয়, সহোদর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা আছে,মাতা জীবিতা থাকিলে,সেখানে মাতার সম্বন্ধে কোন কথা না থাকা একবারেই অসম্ভব। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয় কিন্তু রামপ্রসাদের মাতাকে প্রসাদের শেষ অবস্থাতেও জীবিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৫২ পৃষ্ঠা, —১ম সংস্করণ)।

লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়েই রামপ্রসাদ বিদ্যাশিক্ষা করেন। রচনার ভাষা দর্শনে তিনি যে সংস্কৃত ও পারসী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,তাহা বুঝা যায়। (২)

* এই প্রবন্ধ শেষ না হইতেই "দাসীতে" ইহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিতে ভাল দেখায় না—সম্পাদকীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। যে পত্রিকার প্রতিবাদ সেই পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হওয়াই নিয়ম। সেই পত্রিকার সম্পাদক না ছাপাইলে অন্য কাগজে বাহির হইতে পারে। "দাসীর" প্রবন্ধের প্রতিবাদ আমরা দাসীতে প্রকাশ করিতে রসিক বাবুকে অনুরোধ করিয়াছি।

(১) "সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নীবটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥"
এই কবিতা হইতে দারিদ্র্যের উপলব্ধি হয়। অম্বিকার সন্তান থাকিলে, রামপ্রসাদ তাহাকে অবশ্যই অন্যের মত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

(২) রামপ্রসাদের অধ্যয়ন ও চাকরী হইতেও তিনি যে বৈদ্য নহেন, তাহা বুঝা যায়। বৈদ্য হইলে সংস্কৃত পড়িয়া বৈদ্যশাস্ত্র পড়িতেন, পারসী পড়িবার আবশ্যকতা ছিল না। আর জমিদারের চাকরীও করিতে যাইতেন না,চিকিৎসাই করিতেন। সেকালে কায়স্থগণ প্রায়শঃ জমিদারের চাকরী করিতেন। অন্যে,বিশেষতঃ বৈদ্যগণ এ পথে আসিতেন না।

মঙ্গলে যৌবন।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সাহায্যেই রামপ্রসাদ কোন জমিদারের সেরেস্তায় চাকরী পাইয়াছিলেন। শক্তির প্রতি অচলা ভক্তি তাঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম, প্রথমাবধিই তাঁহার সে ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। সুতরাং জগজ্জননীর দাস্য ছাড়া, এ ভূতের বেগার খাটা আর তাঁহার ভাল লাগে নাই। একটী গানে তাঁহার এই সময়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—

কার বা চাকরী কর।
মন, তুই বা কেরে, তোর মনিব কেরে,
হলিরে তুই কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি কর্জ্জ জমা ধর॥
রামপ্রসাদ বলে, মনরে, তারার নামটী সার কর।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর॥

পুরুষ পরম্পরাগত সাধন পরিত্যাগ করিয়া চাকরীতে বদ্ধ হওয়াতে তাহার মনে একটু নির্ব্বেদও উপস্থিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত গানে তাহার আভাস পাওয়া যায়—

মনরে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস ক'রে বেড়াস ফাঁকি।
ব্যাধের ছেলে পক্ষীমারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মনরে ওঝার ছেলে গরু হ'লে গোসাপে তায় কাটেনাকি!
জাতি ধর্ম্ম সর্পখেলা, সেই মন্ত্রে করোনা হেলা,
মনরে যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে তখন হবি অধোমুখী।
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়,
প্রসাদ বলে, হারাব না, সময় থাক্‌তে শিখে রাখি।

যাহা হউক, ইহার অল্প পরেই বোধ হয় রামপ্রসাদ মনুষ্যের দাসত্বে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া জগদীশ্বরীকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ পৈতৃক সম্পদ কিছু পান নাই। উপজীবিকার মধ্যে চাকরী, তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং বড় কষ্টে দিন কাটাইতে হইত। কিন্তু জগদম্বার করুণামৃতে এত দারিদ্র্যবিষেও সাধকের হৃদয় অজর। তবে সময় সময় যখন বড় উত্ত্যক্ত হইতেন, তখন অভিমানভরে জগজ্জনীকে দু'কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। সে সময়ের গানগুলি বড়ই চিত্তদ্রবকর—

১। আমি তাই অভিমান করি,
আমায় যে করেছ মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি,
ওমা তুমিও কোঁদল করেছ বলিয়া শিব ভিখারী।
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দানধর্ম্ম তদুপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরাপার যান নি সে ব্রজেশ্বরী।

২। আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই!
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই।

৩। দুটো দুঃখের কথা কই,
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী।
কারে দিলে ধন জন মা হয় হস্তী জয়ী,
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মিলে কই,
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেমি রই,
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেউ নই।

কারো অঙ্গে শাল দোশালা ভাতে চিনি দই,
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই।
কেউ বা বেড়ায় পালকী চড়ে আমি বোঝা বই,
মাগো আমি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই।

রামপ্রসাদ চাকরী ছাড়িয়া কিছু জোত-জমা লইয়া কোন মতে দিন কাটাইতে ছিলেন। কষ্ট এত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে নিজ হাতে ঘরের বেড়া বাঁধিতে ও নিজের মাথায় বোঝা বহিতে হইত। এত দুঃখেও ভক্তিরসে তাঁহার মন সদা আনন্দ উপভোগ করিত। এই সময়েই তিনি কুমারহট্টে আসিয়া সিদ্ধ হন। কুমারহট্টে আসিবার কারণ, তাঁহার পত্নীর প্রতি স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, কুমারহট্টের রামকৃষ্ণের মণ্ডপে সাধন করিলে রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইবেন। রামকৃষ্ণের মণ্ডপ তৎকালে সিদ্ধপীঠ (১) বলিয়া খ্যাত ছিল। তত্রত্য কালিকামূর্ত্তিও জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং পত্নীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কুমারহট্টে আগমন করিয়া প্রসাদ সাধনা করিয়াছিলেন। পত্নী কালিকার প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসাদ আপনার অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাগ্যবতী মনে করিতেন—

"ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ যাঁরে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥"

সাধনায় রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কালিকা তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক ক্ষণ রহেন নাই, এজন্য প্রসাদ সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন।

সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার এই গান রচনার বিরাম হয় নাই। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ের ভাব সঙ্গীতরূপে প্রকাশ পাইত। তাঁহার এই গান রচনার ক্ষমতা দর্শনে রাজকিশোর নামক কোন ধনী মহোদয়, স্বকীয় আলয়ে শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী পূজা উপলক্ষে গীত হইবার জন্য প্রসাদকে কালীকীর্ত্তন রচনা করিতে আদেশ করেন। প্রসাদের কবিরঞ্জন উপাধিও বোধ হয় ইনিই প্রদান করেন। যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় চাকরী ছাড়িবার পর, এই রাজকিশোরই প্রসাদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। প্রসাদ সিদ্ধ হইবার পর কালীকীর্ত্তন রচনা করেন। কালীকীর্ত্তনে প্রসাদের সাধারণ বিবরণ পাওয়া যায়।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক কবিরঞ্জন উপাধি ও ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি দানের কথা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব কল্পনামূলক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যে রামপ্রসাদের কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে, এমন প্রসঙ্গও কিছুতে নাই। দান দক্ষিণা ত দূরের কথা! প্রতিদানস্বরূপে বিদ্যাসুন্দর রচনার গল্প পাঠে ঠাকুরমার উপকথার স্মরণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান কালীকীর্ত্তনের এক অংশ মাত্র। উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। রামপ্রসাদ রাজকিশোরাদেশে এই কীর্ত্তন রচনা করেন। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া যেমন ভণিতাতে(১)

(১) জাতো অক্ষবলির্যত্র হোমোবা কোটিসংখ্যকঃ।
মহাবিদ্যা স্বপাঃ কোট্যঃ সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(১) আজ্ঞাদিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর;
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ইত্যাদি।

তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাম-প্রসাদও ভণিতাতে সেইরূপ একথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১। প্রভাতে নূতন গানে শুন স্মেরযুতা।
উষাকালে উক্তি উল্লসিত শৈলসুতা।
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুত জ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে।
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে।
শ্রীরাজ কিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন,
রচে গান মোহ অন্ধের ঔষধ অঞ্জন।

২। কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে বাঞ্ছাফল ফললনা,
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা।

৩। শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী,
কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি।
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে,
তব কৃপালোকে বাণী নিবসতি মুখে।
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণদয়া,
অকাল-মরণহরা অচল তনয়া।
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভব-নিতম্বিনী,
চিদাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাটীতে অন্নপূর্ণার পূজায় গাইবার জন্য যেমন অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি, সেইরূপ রাজকিশোরের আলয়ে রাজ-রাজেশ্বরী পূজায় গাইবার জন্য রাজকিশোরা-দেশে রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের ন্যায় কালীকীর্ত্তনও গান। তদন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরও গীতমাত্র। উহার তাল ও রাগিণী লিখিত আছে। (১)

এক্ষণে এই শ্রীরাজকিশোর যে কে, রাম প্রসাদ তাহা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইনি একজন ধনী শক্তিভক্ত। ইনিই শেষ অবস্থায় (চাকরী ছাড়িবার পর) রামপ্রসা-দের আশ্রয়দাতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

কালীকীর্ত্তন রচনার পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ অনেক গান রচনা করেন। যখন যে ভাব মনে আসিত, তাহাই স্বরতাল যোগে জগ-ন্মাতাকে জানান, তাঁহার প্রকৃতির ধর্ম্ম। বোধ হয়, তদীয় এই গান রচনাশক্তি দর্শনে সাধা-রণে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি তাঁহাকে কবি-রঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, যে শ্রীরাজকিশোরাদেশে তিনি কালীকীর্ত্তন রচনা করেন, সেই রাজকিশোরই এই উপা-ধিটি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপাধি কালীকীর্ত্তন রচনার পূর্ব্বেই প্রদত্ত হয়।

কালীকীর্ত্তনই রামপ্রসাদের প্রধান গ্রন্থ। কালীকীর্ত্তন ব্যতীত তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ভক্ত রামপ্রসাদ শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত ছিলেন না। তিনি অভেদ ভাবে উপাসনা করিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তনের ২।১টী গান ব্যতীত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের লেখার ভঙ্গীতে তিনি যে শবসাধন করিয়া-ছিলেন, তাহাও জানা যায়।

সাধারণের নিকট তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া পরিচিত হওয়া রামপ্রসাদের ইচ্ছা না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ তন্ত্রশাস্ত্রে অপারদর্শী মনে করে, ইহা তিনি কখনও ইচ্ছা করিতেন না। এইজন্য বিদ্যাসুন্দরের শবসাধন প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত,
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।

(১) বকুল তলায় সুন্দরদর্শনে নাগরীদিগের উক্তিটি বাহার রাগিণী, বৎ তালে গেয়।

জ্ঞাত নহি বলি কেহ না করিবা হেলা,
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা।
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই,
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই।
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে,
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে।

রামপ্রসাদ কীর্ত্তন রচনা অপেক্ষা গান রচনাতেই অধিক আমোদ পাইতেন। কীর্ত্তন রচনা কেবল আদেশ পালন, গান তাঁহার নিজের হৃদয়ের কথা। যখন যে ভাব মনে হইত, অমনি তাহা গানে প্রকাশ করিতেন, সুতরাং তিনি যে বহুসংখ্য গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই উক্তি হইতে তিনি লক্ষ গান রচনা করিয়াছিলেন, এমত বলা যায়। তৎসময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় তদীয় সঙ্গীতের অধিকাংশই বিস্মৃতিসাগরে চিরলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি এখনও যাহা বাকী আছে, তাহাও কম নয়।

রামপ্রসাদ বীরাচারী শাক্ত ছিলেন। সুতরাং সাধনার জন্য মদ্যপান করিতেন। লোকে বোধ হয় তজ্জন্য তাঁহাকে মাতাল বলিতে ছাড়িত না। রামপ্রসাদ লোক-গঞ্জনার দায়ে

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমার মনমাতাল মেতেছে আজি মদমাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে,
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুঁয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ ফলে।"

বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যৌবনেই রামপ্রসাদ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। গীতেরও অধিকাংশ এই সময়েই রচিত হয়। এই সময়েই তিনি সিদ্ধ হন। পরমেশ্বরী, জগদীশ্বরী ও রামদুলালের জন্মও এই সময়েই হইয়াছিল।

বার্দ্ধক্য।

বার্দ্ধক্যে শাক্তগণ শিবত্ব প্রাপ্তির আশায় কাশী যাইয়া থাকেন। রামপ্রসাদ কালীর চরণে কোটিতীর্থ দর্শন করিয়া আর কাশী যাইতে চান নাই। কাশী যাওয়া তিনি আবশ্যক মনে করিতেন না—

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী,
কালী চরণ কৈবল্য রাশি।
যদি সন্ধ্যা জ্ঞান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশী বাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবানিশি।

রামপ্রসাদ ঘরে বসিয়াই আমরণ কালিকার ভজন করিয়াছেন।

শেষ দশায় রামপ্রসাদকে সাংসারিক নানা জ্বালায় বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। স্ত্রী লইয়াই বোধ হয় বেশী কিছু ফাঁফরে পড়িয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গীতাংশে এই ভাব বুঝা যায়।

রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছাসুখে পান করিয়া বিষের জ্বালায় ছটফটি।

শেষ দশায় রামপ্রসাদ সন্ন্যাসী না হইলেও যে, দারিদ্রের নিষ্পেষণে ও পত্নী-বিয়োগে সন্ন্যাসীবৎ হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত তিনটী গানে তাহা জানা যায়—

১। মা মা বলে আর ডাকব না,
ওমা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না।

২। তারা নামে সকলি ঘুচায়,
রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা তাহাও নিত্য নয়।
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণহরে জ্বালে স্বর্ণ খাদে উড়ায়,
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা তেমনিত দেখায়।
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে তরুতলে রয়,
ওমা তার তনয়ের ভিটায় টিকা এ বড় সংশয়।
প্রমাদ ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়,
ওরে ভাইবন্ধু থেকনা কেহ প্রসাদের আশায়।

৩। কালী সব ঘুচালে লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মানবি কিনা মানবি সেটা।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা,
তুচ্ছ কর মণি কোঠা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন
ঘুচলনা আর সিদ্ধি ঘোটা।
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা তারা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা,
তার কটিতে কৌপিন মেলে না,
গায় ছাই আর মাথায় জটা।
ভূতলে আনিয়ে মাগো,
করলে আমায় লোহাপিটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা।
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এযে মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা।

এই সময় রামপ্রসাদ বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন। শৈশব হইতে যে দুঃখের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, প্রসাদের জীবনে সে স্রোত কখনই থামে নাই। বরং ক্রমে বাড়িতেছিল। পৃথিবীতে বস্তুতঃই তিনি লোহাপিটা হইয়াছিলেন। দুঃখের হাফর কখনও তাঁহার নিভে নাই। এত দুঃখেও প্রসাদের একটু সুখ ছিল, সে সুখ লোকে বলিত, তিনি কালীর পুত্র। রামপ্রসাদ এই এক আনন্দে সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রসাদ সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিলেন। যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় কৌপিনি ও জটা ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সংসারের সর্ব্বসম্পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াও "কালী লেঠা ঘুচাইলেন" বলিয়া প্রসাদ তাহাতে দুঃখিত হইতেন না। ধন্য ভক্তি! ধন্য নির্ভর!

মৃত্যু।

মহাপুরুষ মাত্রেরই জন্ম মৃত্যু অলৌকিক ঘটনা সম্পৃক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। রাম প্রসাদের জন্ম সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কোন ঘটনা শুনিতে পাই না বটে, কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রবাদ প্রচারিত আছে। কথিত আছে, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিয়া রামপ্রসাদ কালীপূজা করেন। পূজার পরদিবস প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় গলাজলে দাঁড়াইয়া চারিটী গান করেন। শেষ গানটীর শেষ চরণ—"মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে'' গাহিবা মাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়।

এস্থলে কথা এই যে, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদারণে মৃত্যু তান্ত্রিক সাধকগণের চির প্রার্থিত। রামপ্রসাদও "মরণ কালে যেন মাগো ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটে" প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শুনা যায়, যাঁহারা তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র ভেদ জানেন, তাঁহারা নাকি প্রাণবায়ুর চালন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদারণ করিয়া মরিতে পারেন। সুতরাং যাঁহারা তন্ত্রের সাধনায় শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা এ প্রবাদ বিশ্বাস করিতে পারেন।

রামপ্রসাদের জীবন বর্ণনা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অতি অল্প কথাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং দুঃখের সহিত আমাদিগকে এ প্রস্তাব সমাপ্ত

করিতে হইতেছে। সমাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল উপকথা চলিত আছে, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রসাদের গানে বা কীর্ত্তনে যে সকল গল্পের আভাস পাওয়া যায় না, সেই সকল গল্প পরবর্ত্তী লোকের কপোলকল্পিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। যে সকল গল্পের আভাস তাঁহার গানে পাওয়া যায়, অসম্ভব হইলেও তাহা আমরা উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিনা। সুতরাং প্রসাদের জীবনে সে গুলির বর্ণনা আবশ্যক বলিয়া লিখিত হইল।

১। একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধিতে ছিলেন, কন্যা জগদীশ্বরী দড়ী ফিরাইয়া দিতে ছিলেন, এমন সময় কার্য্যবশতঃ জগদীশ্বরী স্থানান্তরে গমন করিলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতে পারিলেন না, তাঁহার দড়ী বরাবর ফিরিয়া আসিতেছিল। কিছু কাল পরে কন্যা দেখিলেন, বেড়া অনেক দূর বাঁধা হইয়াছে, কে বাঁধ ফিরাইয়া দিল, জিজ্ঞাসা করাতে প্রসাদ কহিলেন, কেন মা, তুমিইত বরাবর ফিরাইয়া দিতেছ। জগদীশ্বরী তখন আপনার কার্য্যান্তরে গমনের কথা বলিলেন; রামপ্রসাদ বুঝিলেন, এ দেবী জগদীশ্বরীর কার্য্য। নিম্নলিখিত গীতটীতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। (১)

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাক্‌তে দেখিলি না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া,
মা ভক্ত ছলিতে নেমে এলেন,
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

(১) বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী সম্বন্ধেও এইরূপ বাঁধ ফিরাইয়া দিবার গল্প প্রচারিত আছে।

মায়ে যত ভালবাসে বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দু' চার দণ্ড কান্নাকাটি, পাছে দিবে গোময়ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে এত আভরণ, সকলি করিবে হরণ,
দোনর বস্ত্র পরাইবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।
যেই ধ্যানে এক মনে সেই পাবে মা তোমায় তারা,
তখন একবার এসে কন্যাভাবে রামপ্রসাদের বেঁধো বেড়া।

ধর্ম্ম।

রামপ্রসাদ পুরুষানুক্রমে শাক্ত। তদীয় পিতামহ রামেশ্বর, পিতা রামরাম, বংশমূল কৃত্তিবাস সকলেই দেবীর বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। সুতরাং শৈশব হইতেই যে রামপ্রসাদের শক্তির উপর ভক্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যৌবনারম্ভেই তিনি তন্ত্রানুমোদিত সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বীরাচারী শাক্ত ছিলেন, সুতরাং মদ্য মাংসাদি যোগে উপাসনা করিতেন। এজন্য লোকে মাতাল বলিলেও তাহাতে দৃক্‌পাত করেন নাই। রামপ্রসাদ শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত ছিলেন না, শ্যাম ও শ্যামাকে তিনি অভেদ জানিতেন। জানিয়া সেই অভেদ ভাবেই উপাসনা করিতেন। মূর্ত্তিপূজা করিলেও তিনি জগৎজননীর ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তির কথা ভুলেন নাই। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনে কি মন তা জান না" একথা তিনি নিজেই গাইয়াছেন। নৈবেদ্যাদি উপচার বৃথা, একমাত্র ভক্তিই মুক্তির সোপান, এ কথা তাঁহার ধারণা ছিল। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ তিনি প্রার্থনা করেন নাই। "নির্ব্বাণে কি ফল, জলেতে মিশায় জল, চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি" এই কথা হইতে জানা যায় যে, নির্ব্বাণে সুখ নাই, সাধ-

নাতেই তিনি সুখ মনে করিতেন। মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিই তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল (১)। এই বিশ্বসংসারকে তিনি মায়ের খেলা মনে করিতেন। জগৎজননীতে সকল সমর্পণ করিয়া আত্ম-স্বাতন্ত্র্য একবারে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাই জীবনে যখন যে ঘটনা উপস্থিত হইত, তাহাই তিনি দেবীর কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।

ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

এ ভাব তাঁহাতে সর্ব্বদা ছিল। তন্ত্রে—শিববাক্যে—তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। সুতরাং জোর করিয়া আপনার প্রাপ্য আদায় করিতে চাহিয়াছেন। পুত্রে মায়ের সঙ্গে যেমন পরিহাস করে, জগদম্বার সহিত রামপ্রসাদ সেই প্রকার বা ততোধিক পরিহাস করিতে ছাড়েন নাই। অভিমান করা, লজ্জা দেওয়া, কটু বলা, কিছুতেই তিনি কম করেন নাই। এমন জোর জুলুমে এমন একান্ত আপন ভাবের সাধনা ব্রজলীলা ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু বোধহয় ব্রজলীলাতেও বা রামপ্রসাদের মত জোর-জবরদস্তি প্রকাশ পায় নাই। নন্দ, যশোদা, শ্রীদাম, সুবল, বৃন্দা, রাধিকাও জোর করিয়াছেন, কিন্তু এত নহে। দীনহীন ভাব তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত ছিল। একবার জোর করিয়া পরক্ষণেই আবার হারাই হারাই বলিয়া তাহারা অধীর হইয়াছেন। এই হারাণের ভয়েই মানিনী রাধার দুর্জ্জয় মানের বাঁধ একটা নাপিতানীর সংয়ে বা এক ফোটা চক্ষুর জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রসাদের হৃদয় শাক্ত--হৃদয়। বৈষ্ণবের বুকের মত কুসুম-কোমল নহে। তিনি ভক্তি দড়ী দিয়া মায়ের চরণ দৃঢ় বাঁধিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। মায়ের যে সে বাঁধ ছিড়িতে সাধ্য নাই, তাহা প্রসাদের বেশ জানা ছিল। সুতরাং তিনি আর খোসামুদীর দিকে বড় একটা ঘেঁসেন নাই। বিশেষ শিববাক্য রূপ মহানজীর তাহার বগলে, তাহার পক্ষে সওয়াল জবাবের জন্য লক্ষ উকীল খাড়া (১) সুতরাং মা সহজে চরণ না দিলে বিচারে অবশ্যই দিবেন, এই বিশ্বাসে তিনি মাকে শাসাইতেও ছাড়েন নাই। এমন ভয় দেখাইয়া শাসন করিয়া চরণ নিতে প্রসাদ বই আর কেহ পারে নাই।

রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার যে এত দারিদ্র্য, তাহাও মায়েরই কার্য্য। আক্রোশ করিয়াই মা তাঁহাকে এত কষ্ট দিতেছেন। যদি অন্য সাধকের মনে এভাব হইত, তাহা হইলে তিনি হয়ত গলায় কাপড় জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সহকারে বলিতেন—মা আমি দন্তে তৃণ লইলাম, তুমি আমার উপর প্রসন্না হও, এত যাতনা আর সহ্য হয়না মা। কিন্তু রামপ্রসাদ ত তেমন আটাসে ছেলে নন যে, মায়ের সেই চোখ-রাঙ্গানিতেই একবারে অস্থির হইয়া পড়িবেন। তাঁহার বীরহৃদয় জগদম্বার সকল নির্যাতন সহিয়া আবার ফিরিয়া বলে—মা

ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি!

আর কি করিতে পারেন, প্রসাদ তাহাই দেখিতে চান। এমন ছেলেকে কে পারে?

(১) সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী।

(১) লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কিবা ইহার বাড়া,

তাই মা-ই শেষে হারিয়াছেন। প্রসাদের জেদই বহাল রহিয়াছে।

প্রসাদ যে মায়ের প্রদত্ত কষ্ট গুলা নীরবে সহিয়াছেন, তাহা নয়। প্রসাদ নীরবে সহিবার ছেলে ছিলেন না। মা যে এত কষ্ট দিলেন, তাহার জন্য মায়েরও শাস্তি বিধান করিয়াছেন, সে শাস্তি বড় কঠোর, মায়ের পরাণ—তা দানবী মা-ই হউকনা কেন—তথাপি তাহা সহিতে পারে না। সে শাস্তি

মা মা বলে আর ডাকিব না।
ওমা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী—করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশি ?
দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাবনা।

মা মা বলে আর ডাকবনা, মা বলে আর কোলে যাবনা, ইহা অপেক্ষা মায়ের শাস্তি আর কি আছে? মা সকল সহিতে পারেন, কিন্তু "মা বলে আর কোলে যাবনা,' ইহা সহিতে পারেন না। প্রসাদ অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রে মাকে পরাজিত করিয়াছেন।

প্রসাদ এইরূপে এমনি জোর জুলুমে এমনি শাস্তি দিয়া, শাসন করিয়া, অভিমান গর্ব্ব ভয় প্রদর্শন করিয়া চরণ-রত্ন অধিকার করিয়াছিলেন। জগজ্জননীকে এমন করিয়া মাতৃভাবে কেহ ভজন করিতে পারে নাই। প্রসাদের মত মা বলিয়া কেহ ডাকিতে পারে নাই।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে প্রসাদের মত এই—

বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য,
সে কথা না শুনি ভাল বুদ্ধির তারল্য।
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমন কর নির্ব্বাণ কে চায়।

তারা যে নিরাকার, তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি কালরূপেই তাঁহার মন বান্ধা ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রসাদ অভেদ ভাবে উপাসনা করিতেন। সম্প্রদায়গত দ্বেষাদ্বেষি তাঁহার ছিল না। তিনি কালীকেই সকল বলিয়া জানিতেন। নিম্নলিখিত গানে তাঁহার সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদ আগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তল্লাসি,
কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী;
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চির বিলাসী,
শ্মশান বাসিনী বাসী অযোধ্যা গোকুল নিবাসী।
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী,
অনুজ ধানুকী সঙ্গে, সঙ্গেতে সীতা রূপসী।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি,
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতিতে তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। স্বয়ং সে সকল সাধন করিতেন। বহু সঙ্গীতে তাঁহার সে সকল বিষয় ব্যক্ত আছে।

১। ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না মেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।

২। কে জানে কালী কেমন,
ষড়্‌দরশনে না পায় দর্শন।
কালীপদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ,
তারে মুলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন।

৩। কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্ররথ মধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মুলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায়, রথ চলে দেশ দেশান্তরে।

বুড়ি ঘোড়া দৌড় করচে, দিনেতে দশকুম্ভী মারে,
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে।
তীর্থে গমন মিথ্যে ভ্রমণ, মন উচাটন করোনারে,
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে।
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, কোলে রাখবে প্রসাদেরে,
ও মন এই ত সময় মিছে কাল যায়, যত ডাক্‌তে পার
দু অক্ষরে।

৪। কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী,
তারা তুমি আছগো অন্তরে।
একস্থানে মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থানে চিন্তামণিপুর।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে।
বর্ণরূপা তুমি বট, ব স ব ল ত ক ক ঠ,
ষোলস্বর কণ্ঠায় বিহরে। ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ শবসাধনও করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গানে তাহা বুঝা যায়—

জগদম্বার কোটাল,
বড় ঘোর নিশায় বেরলো, জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি,
বম বম বাজাইয়া গাল।
ভক্তে ভয় দর্শাবারে,
চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে,
ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল।
ইত্যাদি।

বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রেও রামপ্রসাদের ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি তৎপ্রতিপাদিত তত্ত্ব সকল অবগত ছিলেন, তবে কখন বা তাহাতে আস্থা, কখনও বা উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

১। মায়ার এ পরম কৌতুক, (১)
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, আবদ্ধজনে লুটে সুখ।
আমি এই, আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ যেই,
মনরে ওরে মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক।
আমি কেবা, আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখসুখ।
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক।
প্রজ্ঞা অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপনার মুখ।

২। এই সংসার ধোঁকার টাটী,
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু,
শূন্যেতে পাঁচ পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি।

৩। ভাবনা কালী ভাবনা কিরে;
ওরে মোহময়ী রাত্রিগতা,
সম্প্রতি প্রকাশে দিবে।
অরুণ উদয়কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমলে ভাল,
প্রকাশ করেছে শিবে।
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা,
যড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,
খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিবে।
ইত্যাদি।

দর্শনের ঘটপটতত্ত্বকে তিনি বাদার্থ মনে করিয়া উপেক্ষা দেখাইতেন (২)। 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান অপেক্ষা মহেশ-মহিষীর আরাধনাই তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল।

সিদ্ধির পরে প্রসাদ সমস্ত বেদাচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শুচি অশুচি পাপপুণ্য সমান হইয়াছিল। সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা

(১) অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণারজ্জুরূপিণী
যথা মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি।
(২) কেবল বাদার্থ মাত্র ঘটপট রে।

করিয়াছিলেন। এই সকল আচার ব্যবহার তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই।

১। মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ
সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।

২। ছি মন তুই বিষয় লোভা।
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবা,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজা, তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থোবা,
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান
করিলে, কৈবল্য পাবা।

প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করা প্রসাদ আবশ্যক মনে করেন নাই। জাঁক জমকের পূজায় যে মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। মেষ মহিষাদি বলিদান তিনি অন্যায় মনে করিতেন। ষড়রিপুর বলিদানই যে প্রকৃত বলিদান, তাহা তিনি জানিতেন। নিম্নলিখিত দুইটী গানে তাঁহার এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—

মনরে তোর এত ভাবনা কেনে,
একবার কালী ব'লে বসরে ধ্যানে।
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুমি লুকিয়ে তারে কররে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে
ধাতু পাষাণ মাটীর মুর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে,
তুমি মনোময় মাণিক জ্বেলে, দেওনা জলুক রাত্রিদিনে।
মেষ মহিষ ছাগলাদি, কাজ কি তোর সে বলিদানে,
তুমি জয়কালী জয়কালী বলে, বলি দেও ষড়রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে কাজ কি রে তোর সে বাজনে
তুমি জয়কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

২। মন কেন তোর ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই দেখলি না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মুর্ত্তি,
জেনেও কি মন তা জান না,
মাটীর মুর্ত্তি গড়ায়ে তুমি,
কর্ত্তে চাও তাঁর উপাসনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোণা,
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তায়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধে প্রসাদের মত নিম্নলিখিত গীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভুত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য
মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে,
পঞ্চজনে মিলে ঝিলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই,
তাই হবিরে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে।

ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, আবার ব্রহ্মে লয়, ইহাই প্রসাদের মত। যতক্ষণ পৃথক্ অস্তিত্ব, ততক্ষণই লীলা, ততক্ষণই আনন্দভোগ। লয় হইলেই এই রসোপভোগের বিরাম হয়, এই জন্যই প্রসাদ মুক্তি বা নির্ব্বাণ চান নাই। রসস্বরূপ ভগবানের উপভোগেই জীব কৃতকৃতার্থ হয়, লয়ে বা নির্ব্বাণে সুখ নাই। এই জন্য প্রসাদ বলিয়াছেন—

নির্ব্বাণে কি ফল,
জলেতে মিশায় জল,

চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভাল বাসি।

আবির্ভাব কাল।

ভক্ত কবি রামপ্রসাদ দাস কোন্ সময় বিদ্যমান ছিলেন, কোন্ সময় তাঁহার অমৃতময় কণ্ঠ হইতে অমৃত হইতেও মধুর মা মা ধ্বনি উত্থিত হইয়া জগজ্জননীরও চাঞ্চল্য জন্মাইত, কোন্ সময় তিনি অসীম ভক্তি-ডোরে মায়ের চরণ বাঁধিয়া অক্ষয় মাতৃধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণের বিষয় বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে নির্ণীত হইবার উপায় নাই। যদি রাম প্রসাদের কালীকীর্ত্তন পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাইত,তাহা হইলে সময় সম্পর্কে কোন কথা তাহার মধ্যে পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কালীকীর্ত্তনের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সময় সম্বন্ধে কোন কথা নাই। রামপ্রসাদের কবিতা নিচয়ে সমকালের এমন কোন ঘটনা বা ব্যক্তির নির্দ্দেশ নাই যে, যাহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি। তিনি যে কয়েক ব্যক্তির নাম লিখিয়াছেন, সে সকলেই আমাদের অপরিচিত। ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাসস্থান কলিকাতায় লিখিয়াছেন, ইহাতে অনুমান হয় যে, কলিকাতা তখন সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালিকামঙ্গল রচয়িতা প্রাণরামের নির্দ্দেশ অনুসারে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া জানা যায়—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ,
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস।
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই,
রাম প্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে,
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।"

সুতরাং কলিকাতাতে ইংরেজ অধিকার হওয়ার পর ও ভারতচন্দ্ররায়ের অন্নদামঙ্গল রচিত হওয়ার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন আদি রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে পূর্ণ হয়। সুতরাং ইহার কিছু পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন রচনা করেন। তাঁহার কীর্ত্তনের ভাষা দর্শনে ও অন্নদামঙ্গলের পূর্ব্বের রচনা বলিয়াই বোধ হয়।

১৬৭৪ শক অন্নদামঙ্গলের সমাপ্তির কাল। ইহার ১০ বৎসর পূর্ব্বে কালীকীর্ত্তন রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরিলে কালীকীর্ত্তন ১৬৬৪ শকে রচিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণীত হয়। কালীকীর্ত্তনের ভাষাতে বিস্তর সংস্কৃত ও পারসী শব্দ পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকই রচিত হইয়াছে। সুতরাং কালীকীর্ত্তন রচনার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ন্যূনপক্ষে ২৫ বৎসর ধরিলে ১৬৩৯ শকে রামপ্রসাদের জন্ম হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি যাবৎ অন্য প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, তাবৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব থাকিতে হইতেছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

হিন্দুসমাজের নিকট নিবেদন।

ভারত, বর্ত্তমানে যেরূপ এক-শাসন-ছত্রের শীতল ছায়ায় অবস্থিত, এক ব্যবহার-শাস্ত্রে নিয়ন্ত্রিত, পুরাকালে ভারতে এমন দীর্ঘকাল-স্থায়ি একচ্ছত্রত্ব ঘটিয়াছিল কি না, সন্দেহ। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্নপ্রকৃতিক রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইত এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী গৌরবেচ্ছু রাজপণ্ডিত-বিরচিত বিধি অনুসারে পরিচালিত হইত। এক রাজার আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা, অন্য রাজার রাজ্যে প্রায়শঃ গৃহীত হইত না। এজন্য, এক হিন্দুর সামাজিক বিধিতেও বহু অনৈক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই অসামঞ্জস্যে এইরূপ খণ্ড রাজত্বের প্রবাদে হিন্দুসমাজের ক্ষতি না হইয়াছে, এমন নহে। কনোজে গুজরাটে, দ্রাবিড়ে বাঙ্গালায় এক সম্প্রদায় মধ্যেও পক্কান্নের, আদান প্রদানের প্রচলন নাই, হাড়ে মাংসে এক হইবার যো নাই। তখন আবার স্বর্ণভূমি ভারতে লোকের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিরও অভাব অনুভূতি অধিক ছিল না, এখনকার ন্যায় হা-হা খা-খা করিয়া লোকের দেশে দেশে বেড়াইবারও দরকার পড়িত না। পক্ষান্তরে একধর্ম্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ পঠন পাঠনে, শ্রবণ শ্রাবণে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিধি-লঙ্ঘনে কঠিন দণ্ড হইত।

অভাব অনুভূতির ন্যূনতায়, খণ্ডরাজনীতির প্রবলতায়, সামাজিক আচরণবিধির অনুদারতায়, শাস্তির ভয়ে নিজের পণগণ্ডায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, আগেকার দিনে, লোকে রক্ষণশীল হইয়া পড়িত। দিগ্‌দর্শনের পথ নানা কারণে স্বতঃ পরতঃ অবরুদ্ধ ছিল। এখন কিন্তু ভারতের সে অবস্থা, দিন দিনই অপগত হইতেছে। লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত, দেশ লুপ্তশিল্প, সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যেই বল, অভাব-অনুভূতি দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে, ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি কমিতেছে, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে, লোকসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে, রপ্তানির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে; এখন আর প্রতি প্রদেশ তদধিবাসীদিগকে পোষণে সম্যক্ সমর্থ হইতেছে না। কাজেই লোকের ভিন্ন প্রদেশে যাইবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে।

নানা শাস্ত্র দর্শনে, সর্ব্বত্র গমনে, এখন আর আগেকার ন্যায় কঠোরতা নাই। স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে বিরত রাখিবার কাহারও সাধ্য নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র, চূড়ামণি, বিদ্যানিধি, মৌলবী, মুন্সী, পোপ, পাদরী অথবা সম্প্রদায় বিশেষের মুষ্টিগত, এ বিশ্বাসও প্রতিপাল্য নহে। অহরহঃ নানা ভাষায় এক দেশের ধর্ম্ম, আচার, অন্যদেশে প্রচার হইতেছে। ধর্ম্মগ্রন্থ, লোক বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, আস্‌মানি—স্বর্গ হইতে আগত, নিত্য, অভ্রান্ত; কালানুসারেও তাহা হইতে পদমেকং গন্তং অসমর্থ, দুর্ভাগ্যে বা সৌভাগ্যে পূর্ব্বের ন্যায় লোকে এখন আর মানিতেছে না বা অধিককাল মানিবে, সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা। টানা হেস্‌কা করিয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখার দিন যেন অপগত হইয়া গিয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্রের বহুলবিস্তারে সমস্ত পৃথিবী, জ্ঞানপিপাসু লোকের নিকট, করতলস্থিত আমলকীবৎ দেখাইতেছে। এখন কোরাণে পুরাণে বাইবলে তুলনা করিয়া দেখিতে কাহারও বিঘ্ন বাধা ঘটিতেছে না। যথায়

যাহা উৎকৃষ্ট পাইতেছে, সমাজের উপকারী বোধ করিতেছে, লোকে তাহারই পক্ষপাতী হইতেছে। শাসন শান্তির প্রভাবে লোকের আর সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিবার বিষয় নাই; বুঝিতেছে, ধর্ম্ম, ধন, বিদ্যার্জ্জনে সর্ব্ব জাতির সম অধিকার। মূলতঃ ইংরেজ শাসনে, কাল-মাহাত্ম্যে লোক অবাধ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে।

আবার চলন চালনে, আচার ব্যবহারে হিন্দু, হিন্দুয়ানি সম্যক্ বজায় রাখিতে পারিতেছে না। সত্যযুগে যে সকল আচরণ সমাজে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা আজিও সমাজের সম্যক্ উপযোগী, বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তনীয় নহে, ইহা মুখে মানিলেও অন্তরে বা কাজে মানিতেছে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ মানিবে না। ইহা দিগ্‌দর্শনের ফল, ভিন্ন দেশীয় যা কিছু আমদানির ফল, শাসন শান্তির গুণ, মানুষের দোষ নহে। যে জাতিতে বা যে সম্প্রদায়ে দিগ্‌দর্শনজনিত জ্ঞানের অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃতি, তাহাতেই অন্ধবিশ্বাসের অধিক প্রবলতা।

বাইবল, কোরাণ, এক এক খানা গ্রন্থ; তত্তৎ সম্প্রদায়ের বিধি ব্যবস্থা তাহাতেই লিখিত; মানুষ ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ একবার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিয়া দেখিতে পারে; দুঃখের কথা বলিব কি, হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপ আচরণ-বিধি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র ভোজরাজার থ'লে। কোনও ভোজবিদ্যাবিশারদ, ভানুমতীর ভণিতা দিয়া ঐ থলিয়া হইতে দর্শকদিগকে যাহা দেখাইবে বলিয়া ইচ্ছা করে, তাহাই যেমন দেখাইতে পারে, আমাদের পণ্ডিতগণও সেইরূপ হিন্দু শাস্ত্র হইতে সাধারণকে যে ভাবের অনুষ্টুপ্ শুনাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেই সফল-মনোরথ হন, সন্দেহ নাই।

হিন্দুর জীবিতকাল, গড়পরতা পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিলে হিন্দুশাস্ত্রের সকলখানা পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইয়া যাইতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে আবার বাল্যে কতক কাটিয়া যায়, বাকী যাহা, তাহাতে শিক্ষাদীক্ষা, পেটের দায়ে কেরাণিগিরি, মাষ্টারি, পত্রিকা পরিচালন, পুস্তক লিখন, বক্তৃতা প্রদানে অর্থ-সংগ্রহ-করণ, ব্যাপার বাণিজ্য কত কিছু করিতে হয়। একখানা পুস্তক পড়িয়া হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার জানিবার উপায় নাই। মানুষ, পার্থিব কার্য্যের সহিত ধর্ম্ম, ধর্ম্মসংমিশ্র সামাজিক আচরণ শিক্ষা করিবে, ইহাই বোধ হয় সুসঙ্গত। শুকদেব হইয়া জন্মগ্রহণ, অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। লোক, অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার অভাব অনুভূতিতে অস্থির, পারে না,—অনেকে—বিষয়ী লোকে, তাই বর্ত্তমানে ধর্ম্মচর্চ্চায় ও ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আচরণ বিধি পরিপালনে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছেন। লাভ এই হইতেছে যে, চূড়ামণি বিদ্যানিধির নিকট একরূপ, নগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট অন্যরূপ, সহরে একরূপ, বাড়ীতে অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়া লোক, অস্তিত্ব-বিরহিত, ঘোর কপটাচারী হইয়া যাইতেছে। সমাজ, অধঃপাতের অন্তিমসীমায় উপস্থিত হইতেছে।

প্রকৃত হিন্দুয়ানি রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কুলাইয়া উঠা যায় না। নমুনা স্বরূপে একটী আচরণের উল্লেখ করিলেই বোধ হয়, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। শাস্ত্রে আছে, অরুণোদয় বেলায় শয্যা ত্যাগ করিবে এবং অপ্রচ্ছাদিত, ফালকৃষ্ট ভূমিতে,

তৃণে, সসত্ত্বগর্ত্তে, বল্মীকে, পথে, রথ্যায়, অশুচিস্থানে, উদ্যানে, জলে, উদ্যান ও জলের নিকটে, অঙ্গারে, ভস্মে, গোময়ে, গোচারণ স্থানে, আকাশে, এবং অনিল, অনল, ইন্দু, অর্ক, স্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণাভিমুখে ব্যতীত পুরীষ ত্যাগ করিবে। কষ্টে স্বষ্টে বৈধস্থানে পুরীষত্যাগ করিয়া আর এক বচনের অনুবলে "একালিঙ্গে গুদে তিস্রঃ, তথা বামকরে দশ, উভাভ্যাম্ সপ্তবারঞ্চ, তিস্রঃ তিস্রঃ পদে পদে॥"এই নিয়মে স্থান-গুলির পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। অভাব-অনুভূতির পীড়নে এ সকল বর্ত্তমানে কাহারও কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার নহে। এক সময়ে যাহা সম্ভাব্য, অন্য সময়ে তাহা অসম্ভবনীয় হইয়া উঠে।

আর এক আলেখ্যের প্রতি পাঠক মনোযোগ করুন্। একটী লোক যদি আমরণ আপন মাতাপিতা ভ্রাতা সমন্বিত এক আচার বিশিষ্ট, এক ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারে চির-দিন অবরুদ্ধ থাকে, ঐ পরিবারের আচার আচরণ, রীতি নীতি ভিন্ন, অন্য কাহারও কিছু দেখিতে শুনিতে জানিতে না পারে, তবে কি তাহার শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ করা হয় না? যেমন বট বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ, অনাবৃত প্রশস্তভূমি এবং উপযুক্ত জলাতপ পাইলে প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মায়, সেইরূপ মানুষও প্রশস্ত ক্ষেত্রে সুবিধায় বিচরণ করিতে পারিলে, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে। যেমন লতাজাতীয় উদ্ভিদ্, বাড়িবার উপায়-ভূত আশ্রয় না পাইলে মুখে রক্ত উঠিয়া কোঁকড়া হইয়া যায়, বাড়িতে পারে না; মানুষও ঠিক্ সেইরূপ, ইহা সকলেরই বুঝা কর্ত্তব্য। আমাদের জন্মভূমি ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তর গমনে নিষেধ থাকা প্রযুক্ত, প্রকৃতই কার্য্য ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা সম্পাদিত হই-য়াছে, দিগ্দর্শনের পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

ভিন্ন দেশীয়েরা আমাদের জন্মভূমিতে আগমন করিয়া আমাদের জ্ঞান, ধন, অভীপ্সিত যাহা কিছু, অহরহঃ লইয়া যাই-তেছে, আমরা কিন্তু ভিটামাটি উচ্ছিন্ন হইলেও, দুর্ভিক্ষে মরিলেও কূপমণ্ডূকের ন্যায় বিদেশ গমনের পথ বিধি পাই না। যাহা ভিন্ন দেশে নীত হইতেছে, তাহার পূরণ হইতেছে না। বহির্বাণিজ্যের, শিল্প সাহিত্যাদি জ্ঞানা-নয়নের পথে প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত রহি-য়াছে, উন্নতি হইবে কিসে?

বর্ত্তমানে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের শাস্য-শাসক সম্বন্ধ। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বল-বীর্য্যে, ইংলণ্ড পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এতদ্-ভিন্ন পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য উন্নত দেশেও ভারতবাসীর গমনাগমন অনিবার্য্য ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এ স্রোতঃ কাহা-রও বন্ধ করিবার শক্তি নাই। ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত সামাজিক আচরণ-বিধি, কোনওকালে রদ্ না হইয়াছে, এমনও নহে। শাস্ত্রে আছে "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ" ইত্যাদি বচনোক্ত বিধি অনেক কাল হইতেই সমাজে উপেক্ষিত হইয়াছে। তবে এখন কেন সামাজিক বিধিব্যবস্থার সংশোধন,পরিবর্ত্তনাদি করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে করা যাইতে পারিবে না?

ধর্ম্ম যাহা, তাহা চিরদিনই থাকিবে; আস্তিক মাত্রেরই ঈশ্বরে আস্থা আছে, তাহা যাইবার নহে। সামাজিক আচরণ, দেশ ও কালানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে।

অতএব যাহাতে সমস্ত হিন্দু সমাজ, উন্নতি ও ঐক্যের দিকে ধাবিত হইতে পারে, যাহাতে বাঙ্গালা, কনোজ, গুজরাট, পুনার

সামাজিক আচরণ-বিধির বিভিন্নতা বিনাশিত হয়, যাহাতে অসংখ্য গ্রন্থের পরিবর্ত্তে চলিত ভাষায় "কলির ধর্ম্ম" নামক একখানা গ্রন্থে হিন্দুর ধর্ম্ম,হিন্দুর আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যায়, বিষয়ী-সাংসারিক লোকে,যাহাতে পিতৃপৈতামহীয় স্বধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া পর ধর্ম্মের পক্ষপাতী না হয়, যাহাতে সমাজ সংকীর্ণতার দিকে ধাবিত না হয় বা গণ্ডীতে নিবদ্ধ না থাকে, হিন্দু সমাজ হইতে এরূপ অনুষ্ঠান হইতে পারে কিনা, সমাজের নেতৃগণ একবার চিন্তা করেন, এই আমাদের নিবেদন।

শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায়।

জাতীয় একতা। (৯ম)

অব্রাহম্ ও সারা—ব্রহ্মা ও সরস্বতী

ইহুদীদিগের মধ্যে আদি সত্যধর্ম্ম প্রচারক অব্রাহম বা অব্রাম। পৌরাণিক মতে হিন্দুদিগের সত্য ধর্ম্মপ্রচারক অর্থাৎ বেদবক্তা ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মা ও অব্রাহম কি এক নহে? অ উপসর্গ (আল্লহের আল্ উপসর্গের ন্যায়, বিযুক্ত করিলে ব্রাহম ও ব্রহ্মা (ব্রহমা) কি উচ্চারণে সদৃশ বোধ হয় না?

কেবল উচ্চারণ নহে, অর্থগত সাদৃশ্যও আছে। অব্রাহম শব্দের অর্থ "ঐ লোক পিতামহ"। ব্রহ্মাকে যে পিতামহ বলা হয়, এই পুরাণ-প্লাবিত দেশে সকলেই জানে (১)। সুতরাং বিব্লিক ও পৌরাণিক মতে এই দুটী শব্দ অর্থে ও উচ্চারণে এক।

ব্রহ্মা ও সরস্বতীর দাম্পত্য বিষয়ে পৌরাণিক গল্প আছে (২)। সরস্বতী ব্রহ্মার দুহিতা বটে, তথাচ ব্রহ্মা তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই পৌরাণিক গল্পের মূল কোথায়, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট, ব্রহ্মা ও সরস্বতীতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য মিথুনভাব বিদ্যমান ছিল। অব্রাহমের স্ত্রী সারা। তবে অব্রাহম তাঁহাকে একদা ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অব্রাহম যখন মিশরদেশে গিয়াছিলেন, তখন মিশর রাজ ফরোণ (Pharaoh) পাছে অন্তঃপুরিকা করেন, এই ভয়ে সারাকে ভগিনী বলিয়া পরিচয় দেন (৩)। এক টুকু অস্বাভাবিক দাম্পত্যের গন্ধ ব্রহ্মা ও সরস্বতীতে এবং অব্রাহম ও সারায় উভয়ত্র বিদ্যমান আছে।

সারা শব্দে "রাজ্ঞী" (৪)। সরস্বতী শব্দে এমন কোন অর্থ পাইতেছি না। তবে ব্রহ্মা শব্দে প্রজাপতি বুঝায়,ইহা জানি; প্রজাপতি বুঝায় বলিয়াই ব্রহ্মা বাঅব্রাহম"লোকপিতামহ"। প্রজাপতি শব্দের ভাবগত অর্থে ও রাজ্ঞী শব্দের ভাগবত অর্থে লিঙ্গের বিভিন্নতা ভিন্ন আর বিভিন্নতা কি? সুতরাং ব্রহ্মাণী, সরস্বতী ও অব্রাহম-জায়া সারা অর্থেও এক দেবী সন্দেহ নাই।

পৌরাণিক সরস্বতী শব্দের বর্ণবিন্যাসে আদ্য স ব-যুক্ত কিন্তু বৈদিক সরস্বতী শব্দের

(১) "Abraham (H. the father of a multitude)". Pictorial Bible Dictionary by Rev. J. A. Wylie L. L. D. Page 9.

(২) "Saraswati was mated with Brahma." Ancient India by R. C. Dutt.

(৩) আদি পুস্তক ১২, ১৪।

(৪) তদনন্তর ঈশ্বর অব্রাহমকে কহিলেন, তুমি আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী (কুলীনা) বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা (রাজ্ঞী) হইল। আদি পুস্তক ১৮ অধ্যায় ১৫ পদ।

আদ্য স ব-যুক্ত নহে।* বৈদিক সরস্বতী শব্দের সংস্কৃত বিভক্তি পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সরঃ ও পৌরাণিক বা বিব্লিক সারা শব্দের উচ্চারণে কি বিভিন্নতা থাকে?

কেবল অর্থগত ও উচ্চারণগত সাদৃশ্য আছে, এমত নহে, সারা ও সরস্বতীতে উপাখ্যানগতও একটি সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতেছে।

"Abraham is said to have been jealous of his wives and built an enchanted city for them. He built an *iron city* and put them in.
Curiosities of Literature
by D. Israili. P. 123, 124.

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্‌স্‌-ফিল্‌ডের পিতা উপরোক্ত D. Israili সাহেব ইহুদীবংশজাত। তিনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইহুদীদিগের বিশ্বাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে একটি প্রকৃত বিশ্বাস, সে বিষয়ে অল্প সন্দেহই আছে। ঠিক সেই লৌহ-নির্ম্মিত পুরীর কথা আমাদের ঋক্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ১ম ঋকে আছে।

"এই সরস্বতী অয়োনির্ম্মিত পুরীর ন্যায় ধারয়িত্রী হইয়া ধারক উদকের সহিত প্রধাবিতা হইতেছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্পন্দনশীল জলকে মহিমা দ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন।"

ঋক্‌বেদ ৭।৯৫।১

নব্যভারতের পাঠকেরা অবগত আছেন যে, ঋক্‌বেদে এমন সূক্ত আছে,যাহাতে সরস্বতীকে নদীদেবী ও বাক্‌দেবী উভয়ই বলা হইয়াছে। সরস্বতী অতিপূর্ব্বে নদীদেবীই ছিলেন। সর শব্দের অর্থ জল; সুতরাং জলদেবীই সরস্বতী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সরস্বতী তীরে বেদপাঠ হইত বলিয়া সেই নদীদেবীই ক্রমে বাক্‌দেবী হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঋকে নদীর কথাই বলা হইতেছে। যে অয়ো-পুরীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, রমেশ বাবু টীকায় বলেন, উহার অর্থ "নিরাপদ" মাত্র। সারার উপাখ্যানেও ঐ কথা প্রকাশ পায়। সারাকে ও হাগারকে নিরাপদ করিবার জন্য অয়োপুরীর নির্ম্মাণ হইয়াছিল। সারা সম্বন্ধে এরূপ গল্পও আছে যে,অব্রাম তাহাকে লৌহময় সিন্দুকে পুরিয়া মিশর দেশে নিয়াছিলেন; সিন্দুক খোলা গেলে দেখা গেল, তন্মধ্যে অতি রূপবতী সারা সুন্দরী।

"Abraham in travelling to Egypt brought with him a chest * * * Lo! Serah was in it.'
Curiousities of Literature
P. 124. D. Israili.

এখন বোধ হয় ইহা বলা যাইতে পারে যে, সারা ও সরস্বতী মূলতঃ একই দেবী। তবে হিব্রু সাহিত্যে সারা মানবী, বৈদিক সাহিত্যে নদীদেবী ও বাগ্দেবী। প্রকৃতিবাদই উপাখ্যানগত হইয়া মহাপুরুষবাদ ও দেববাদ হইয়াছে, ইহা তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত।

কোরাণিক হিন্দুরা বোধ হয় অবগত আছেন যে, "মিস্রীয়া হাগার" সারার দাসী ছিলেন। ইনি ক্রমশঃ সারার সতিনী হইয়া উঠেন এবং অব্রাহমের ঔরসে ও হাগারের গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ঈশ্মায়েল। ঈশ্মায়েল হইতে আরবিক জাতির উৎপত্তি। সারার গর্ভস্থ ঈশ্‌হাকের বংশই ইহুদীজাতি।

একটুক চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এই হাগার শব্দ ও সংস্কৃত গীঃ বা গীর্ শব্দ একই গীর্বাণি, বাক্য। সরস্বতীও বাক্যদেবী। হাগারও তবে বাক্যদেবী। এই দুটি শব্দের মধ্যে যে সতিনীত্ব, সারা ও হাগারের ভিতর সেই সতিনীত্ব দেখিতে পাই। এই সতিনীত্বের একটুক বৈদিক মূল পাওয়া যাইতেছে।

---

* বশিষ্ঠঃ ॥ ১, ২, ৪ ৬ সরস্বতী। ৩ সরস্বান ॥ ত্রিষ্টুপ ॥ রমেশ বাবুর মূল ঋক্‌বেদ।

"তিনি (সরস্বতী) অন্য সমস্ত স্রবনশীল জলকে মহিমা দ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন।" সেই ৭।৯৫।১ ঋগ্বেদ।

এস্থলে নদীতে নদীতে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে, তাহাই উপাখ্যানে গিয়া সতিনীত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রহ্মা ও সরস্বতীর দাম্পত্য ভাবের কারণ ঋক্‌বেদ পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঋক্‌বেদে সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে ব্রহ্মা শব্দের ব্যবহার নাই। অর্থাৎ পুরাণ যে অর্থে ব্রহ্মা ব্যবহার করিয়াছে, বেদ তাহা করে নাই। বেদে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি দেবের প্রার্থনা আছে। ব্রহ্মণস্পতি বাক্যদেব। (১) এই ব্রহ্মণস্পতিই পুরাণে গিয়া ব্রহ্মা হইয়াছেন। সরস্বতী ও নদীদেবী হইতে ক্রমে বাক্যদেবী হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং বাক্‌দেব ও বাক্যদেবীর মিথুনভাবের কল্পনা অসঙ্গত কি?

এতদ্ভিন্নও এই মিথুন ভাবের আর একটী কারণ বিদ্যমান আছে। সায়ণ ব্রহ্ম শব্দের "যজ্ঞ, মহত্ব" দুটি অর্থ করিয়াছেন। মোক্ষমূলর সাহেব বিবেচনা করেন, বৃহ ধাতুর দুটি দুটি অর্থ; একটি 'বর্দ্ধন' অপরটি 'বাক্য'। বাক্য অর্থ হইতে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি বাক্যদেব বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু বৃহ ধাতুর যে "বর্দ্ধন" বা "মহত্ব" অর্থ আছে, তাহা হইতে কি বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতিকে এই মহাবিশ্বব্যাপক ও সর্ব্ব জগতের উৎপাদক আকাশকে লক্ষ্য করা যায় না? উপনিষদে যে অর্থে ব্রহ্ম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ভিতরে আকাশভাব বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আকাশকে জলীয় পদার্থ বলিয়া প্রাচীন বিশ্বাস ছিল। সরস্বতীর সর শব্দও জলার্থক। সুতরাং উর্দ্ধস্থিত জল, ধরাস্থ জল (ব্রহ্ম ও সর) পরস্পর দম্পতীভাবে বা ভ্রাতা ভগিনীভাবে কল্পিত হওয়া অসম্ভব কি? যেরূপভাবে আকাশ দেব বরুণ, জলদেবও বটেন, সেইরূপ ভাবে ব্রহ্মণস্পতি ও সরস্বতী অতি প্রাচীনকালে আকাশ দেবও জল-দেবী ছিলেন। যাঁহারা সমুদ্রপথে আকাশ ও সমুদ্রের (ব্রহ্ম ও সরের) সম্মিলিত অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর বা অব্রাহম ও সারার সঙ্গতভাব কি মহৎ ও মধুর!

হাগার শব্দের ভিতরে একটু জলত্বের আভাস কোরাণ হইতে পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, অব্রাহম কর্ত্তৃক হাগার নির্ব্বাসিত হইলে, হাগার সদ্য-প্রসূত সন্তান লইয়া যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেখানে জেম জেম (Zem Zem) নামক একটি উৎস জন্মিল। এই জেম জেম উৎস মক্কার অদূরে। মক্কা তীর্থযাত্রীরা জেম জেম কুণ্ডের জল তীর্থোদক স্বরূপ ব্যবহার করেন। ইহা হইতেই হাগারের জলদেবতার সহিত সংশ্রব কতক উপলব্ধি হইতেছে। (১)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অব্রাহম মিশর দেশে স্বীয়পত্নী সারাকে "ভগিনী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পুনশ্চ তিনি গরারের রাজা অবীমেলক্‌কেও বলিয়াছিলেন, সারা তাঁহার ভগিনী। কিন্তু সারা তাঁহার দুহিতা

---

(১) বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি যে একই দেব, তাহা আমরা ঋকবেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৩ সূক্ত পাঠে ও অন্যান্য পাঠেও জানিতে পারি; একই দেবকে এক বার বৃহস্পতি ও একবার ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বাক্যদেব বা স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা।"

ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল ১৮ সূক্ত ১ ঋকের টীকা (রমেশ বাবুর অনুবাদ)

(১) "Vide note on Alkoran, Chapter XIV page 189 by Rev. Sale."

এমন কথা আদি পুস্তকে নাই। পুরাণে কিন্তু সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা বলিয়াই কল্পিত। ইহার একটি কারণ আছে।

অব্রাহমের পিতা তারার তিন পুত্র (১) অব্রাহম (২) নহর (৩) হরণ। ইহারাই বোধ-হয়, ভারতীয় পুরাণে হরিহরব্রহ্মারূপ ধারণ করিয়াছে। সে যাহা হউক, হরণের এক পুত্র ছিল লৎ। লতের স্ত্রী "লবণস্তম্ভ" হইয়াছিল।* ইনিই ল্যাহৎ বা অহল্যা নৈশাকাশ-রূপিণী দেবী। পূর্ব্ব এক প্রস্তাবে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে নহ, আল্লহ, ইন্দ্র বা রুদ্র একই দেব। অর্থাৎ আকাশ দেবের নামান্তর মাত্র। এই রুদ্রদেবের দুহিতাভি-গমনের এক উপাখ্যান ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৫, ৬ ও ৭ ঋকে আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

৫। "যে শুক্র বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উন্মুখ হইল; তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিক্ষেপ করিয়া ত্যাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র সেক করিলেন।"

"৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর পূর্ব্বোক্ত রূপ রতিকামনা পরবশ হইলেন এবং উভয়ে সম্মিলন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।"

"৭। যখন পিতা কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি সৃষ্টির সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। সুচারু ধীশক্তি সম্পন্ন দেবতারা তাহা হইতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোপতিকে নির্ম্মাণ করিলেন।" (রমেশ বাবুর অনুবাদ)

ইহার ৭ম ঋক্ অবলম্বন করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প উঠিয়াছে "আক্রমণকালে উক্ত কন্যা ভীত হইয়া শীঘ্র পলায়ন করিবার মানসে ঋষ্য নামক মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন" (হিন্দুপত্রিকা)। এবং ঐ যে স্থলে "পিতা" শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্মা, ইহাও উক্ত পত্রিকার মত। পাঠকেরা দেখিবেন, ঐ তিনটী ঋকের কোথায়ও ব্রহ্মা সরস্বতী শব্দের ব্যবহার নাই। টীকাকার মহাশয়গণই পিতার অর্থ ব্রহ্মা করিয়াছেন এবং পুরাণে কন্যাকেও সরস্বতী করিয়াছে।

রমেশ বাবু সায়ণের টীকানুসারে বলেন যে, ৬ষ্ঠ ঋকে "পিতা রুদ্র, কন্যা উষা।" সে যাহা হউক, এ বিবাদ মীমাংসা আমাদের উদ্দেশ্যও নহে, সাধ্যও নহে। আমরা দেখাইব, ঠিক এইরূপ উপাখ্যান লতের গল্পে আদিপুস্তকে আছে।

"তদনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত প্রযুক্ত লোট (Lot—আমরা অনুবাদ করিতেছি লৎ) ও তাহার দুই কন্যা সোয়র হইতে পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিল; ফলতঃ সে ও তাহার দুই কন্যা গুহা মধ্যে বসতি করিল। অপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারে ব্যবস্থানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এদেশে কোন পুরুষ নাই। আইস আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি। তাহাতে পিতার বংশ রক্ষা করিব। অতএব তাঁহারা সেই রাত্রিতে পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে জ্যেষ্ঠাকন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট টের পাইল না।"

বলা বাহুল্য, কনিষ্ঠাও এই প্রকারে পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে এই দুই কন্যার গর্ভে মোয়াব ও বিন-অম্মি নামে যে দুই পুত্র জন্মে, তাহা হইতে দুটি পৃথক্ জাতি হয়। আদি, ২০, ৩০-৩৮।

পিতার দুহিতায় উপগমন ঋক্‌বেদে একটী প্রাকৃতিক চিত্র। "হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল"

* ঐ সময়ে লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল। আদি-পুস্তক ১৯, ২৬।

রুদ্র অর্থাৎ সূর্য্য উষার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবতঃ ইহার বৈদিক অর্থ। আবার ইহা হইতেই পুরাণে ব্রহ্মা সরস্বতীতে উপগত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবও প্রকটিত হইয়াছে। কে পিতা, কে দুহিতা, একথা অস্পষ্ট থাকায় উপরোক্ত দ্বিবিধ কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। হিব্রু সাহিত্যেও প্রায় সেইরূপ। ব্রহ্মা সরস্বতীর উপগমনের সাদৃশ্য লত্‌ ও তদীয় দুহিতাদ্বয়ে সম্যক্ পরিপুষ্ট দেখা যায়; এজন্যই উহা অব্রাহম ও সারায় সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় নাই। সেখানে অব্রাহম ও সারায় ভ্রাতা ভগিনী সম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে। *

যাহারা বিবেচনা করেন, বেদশাস্ত্রগুলি হিন্দুর একচেটিয়া সম্পত্তি, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন, ঐ অপৌরুষেয় সম্পত্তিতে কোরাণিক ও বিব্লিকগণের অধিকার আছে কি না? একই মূল হইতে যে সর্ব্বজাতি ধর্ম্মেতিহাস দোহন করিয়াছেন, এ সকল প্রবন্ধ পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয় কিনা?

শ্রীমধুসূদন সরকার।

তেত্রিশ কোটির স্বর্গারোহণ।

একদা দেবর্ষি নারদ, হরিগুণ গানে মত্ত হইয়া, ত্রিদিববাসী সুরাসুর নরগণকে মুগ্ধ করিতে করিতে ধরণীধামে উপনীত হইলেন। যদিও এই অনন্ত সৌরজগৎ মধ্যে সূর্য্য, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ মধ্যে বিশ্বপতির অধিকতর অদ্ভুত লীলা দেখিতে হৃদয় আকৃষ্ট হইল, কিন্তু পৃথিবী নামক ক্ষুদ্র গ্রহ পূর্ব্বে তাঁহার পরিচিত ছিল, যেথানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে শত শত সাধু মহর্ষি, দেবর্ষি, জ্ঞানী ও বুদ্ধগণ কতবার তাঁহার মধুর বীণাধ্বনিতে অপরিমিত সুখসম্ভোগ করিয়াছিলেন, অনেকবার যাঁহাদিগকে লইয়া হরির অপার লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, আজি এই ঘোর কলিযুগে তাহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সে সমস্ত ঋষি মহর্ষিগণের বংশধরগণ এ যুগেই বা কি করিতেছেন, দেখিবার জন্য বহুকাল পরে এই ক্ষুদ্র ধরায় উপনীত হইলেন।

নারদের মধুরবীণা ঝঙ্কার করিল, সুরাসুর নর বিমোহিত হইল, পশু পক্ষিগণ উৎকর্ণ হইল এবং আপনাকে ভুলিয়া গেল, স্রোতস্বতিগণ উজান বহিল, মানবের মনোবৃত্তিগণ উর্দ্ধমুখে ছুটিল, সমস্ত পৃথিবী কি যেন এক মধুরভাব ধারণ করিল।

শত শত মানব ভক্তি সহকারে পুষ্প পত্র অর্ঘ্য লইয়া পূজা করিতে ধাবিত হইল, এবং প্রস্তররাশিপূর্ণ উত্তুঙ্গ অচল শৃঙ্গের পাদদেশে ও কল কল নাদিনী স্রোতঃস্বতী-বক্ষে আপনাদের কুসুমাদি প্রদান করিয়া গলবস্ত্রে দণ্ডায়মান হইল। পর্ব্বত নড়িল না, প্রসন্নতাও

* আবার লত্‌ ও তদীয় কন্যাভিগমনের গল্প ভারতীয় পুরাণে রুদ্র ও উষার তেমন স্পষ্ট হয় নাই। একটুক পাল্টাপাল্টিভাবে এই কন্যাভিগমনের কথা হিন্দু ও ইহুদী সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। উভয়েরই মূল কিন্তু প্রাকৃতিক চিত্রে।

দেখাইল না, অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল, নদী কুল কুল করিয়া বহিয়া চলিল, একবারও ফিরিল না।

নারদের বীণার ঝঙ্কার হইল, দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, অচল পৃষ্ঠে নানা উদ্ভিজ্জ ফুলদলে শোভিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল, আবার শত শত নরনারী স্তবপাঠ করিতে করিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষগণের পাদদেশে পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিয়া প্রসন্নতা চাহিল, বৃক্ষগণ কিছুই বলিল না, বায়ুতে তাহাদের পত্র নড়িল, ছায়া প্রসারণ করিয়া সৌরকররাশি হইতে মানবকে রক্ষা করিল। কিন্তু আর কোন প্রসন্নতার চিহ্ন মানব দেখিল না, আবার বীণাধ্বনি হইল।

তখন অগণ্য জীবিত প্রাণী পুঞ্জের আবির্ভাব হইল, আবার কতকগুলি মানব, কেহ বা জলমধ্যবিহারী মৎস্য কুর্ম্মকে, কেহবা ধরণী পৃষ্ঠে স্বচ্ছন্দবিহারী শ্বাপদগণের পদে অঞ্জলি প্রদান করিল। শ্বাপদ ও জলচরগণ পুষ্পাদি গ্রাস করিয়া ফেলিল, ইতস্ততঃ বিচরণ করিল, সুখে নৃত্য করিল, কেহ কেহ মানবের বশবর্ত্তী হইল, ও তাহার দাসত্বে নিয়োজিত হইল, কিন্তু মানবের কামনা পূরিল না।

আবার বীণা বাজিয়া উঠিল, মানবের দৃষ্টি উর্দ্ধে আকাশে পরিচালিত হইল, শত শত গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য্য চন্দ্র অতুল শোভায় আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল, কাহারও মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতি, কাহারও প্রখর উত্তপ্ত কিরণ, আবার কাহারও অতি দূরস্থ মিটি মিটি আলোকভাতি মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করিল, অমনি নানা ভাষায় গ্রন্থিত শত শত কবিতা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্তুতি করিল, কিন্তু ততদূর সে স্বর উঠিল না, জ্যোতিষ্কগণের কিরণ সেই রূপই রহিল, বাড়িলও না, কমিলও না, মানবের আশা অপূর্ণ রহিল, নারদের বীণা বাজিয়া উঠিল।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত করিয়া কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। কেহ মানব, দেব দৈত্য, অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশু প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিল। কত সুন্দর মধুর স্তব স্তুতিতে সেই মূর্ত্তি সকলের প্রশংসা গীত হইল, কিন্তু মূর্ত্তিগণ কিছুই বলিল না, বুঝিল কিনা, তাহাও জানা গেল না। মানবের শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইল না। আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল, নারদের বীণা ঝঙ্কার দিল।

এবার কতকগুলি তেজঃপুঞ্জ দেবসদৃশ মানব মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল—কেহ বীর, কেহ কর্ম্মের অবতার, কেহ ভক্ত, কেহ যোগাচার্য্য, কেহ দার্শনিক, কেহ জ্ঞানাবতার, কেহ কবি, কেহ বিজ্ঞানবিৎ। এই সকল অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন পুরুষগণের পদে আবার নরনারী ভক্তিপুষ্প প্রদান করিল ও তাহাদের স্তবে গগন পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু অনেকে সে ফুল ফিরাইয়া দিলেন, অনেকে গ্রহণ করিয়াও ভবব্যাধির খণ্ডন করিতে পারিলেন না। অনেকের দুর্ব্বলতায় মানব বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না, কাম্য বস্তু মিলিল না।

নারদের বীণা বাজিয়া উঠিল। তিন তেজঃপুঞ্জ সুন্দর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। মানব একজনকে স্রষ্টা, একজনকে পাতা ও এক জনকে সংহার কর্ত্তা বলিয়া স্তুতি করিল; হাসিতে হাসিতে ত্রিমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধত হইল। এবং তাহার স্থলে দ্বিমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, একজন পুরুষ, অপর রমণী। শেষ মূর্ত্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জড়জীব, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদ নদী সকলই আসিয়া মিলিল। মানব ভক্তি-

রসে বিগলিত হইয়া স্তুতি আরম্ভ করিল। নারদের বীণার ঝঙ্কার আবার উঠিল।

অকস্মাৎ মহাতেজ আবির্ভূত হইল। শত শত মূর্ত্তি তাহাতে আকৃষ্ট হইল। জড়, জীব, মানব, বৃক্ষ প্রভৃতি তিরোহিত হইল, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মানবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহা অপ্রকাশ্য, মানববুদ্ধির অগোচর। গ্রহগণ তাঁহার দাসত্ব করিতে লাগিল, জীবগণ তাঁহার স্তুতি করিল, জড়গণ তাঁহার পদানত ও আজ্ঞাবহ হইয়া রহিল, অপার কোলাহলে ব্রহ্মাণ্ড ওঁকার ধ্বনিতে তাঁহার পূজা করিল, মূর্ত্তি অমূর্ত্ত হইল,"আমি আছি, আমি আছি" রবে পৃথিবী ও অনন্ত বিশ্ব ধ্বনিত হইল।

নারদের বীণা বাজিয়া উঠিল,আর থামিল না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনাহত শব্দে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিল। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী শূন্যে বিলম্বিত হইয়া তাঁহার আরতি করিল। মলয় পবন চামর ব্যজন করিল। জড় জীব মধুর তানে সেই মহিমা গাইতে লাগিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ, যাহার যে সম্বল, তাঁহার পূজায় নিয়োজিত হইল। এবার কেহ নিরাশ হইল না। সে চিন্ময়-মূর্ত্তি সকল ঘটে বিরাজ করিতে লাগিল। যে বুঝিতে পারিল,সে জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহার বাক্য শুনিতে পাইল, সে অনন্তমূর্ত্তির অপার ঐশ্বর্য্য বিশ্ববাসীকে পরিতৃপ্ত করিল। আনন্দসাগরে সকল জগৎ পরিপ্লুত হইল, শান্তিসুধায় সকলকে অভিষিক্ত করিল। মানব গেল আর ফিরিল না, অনন্তকাল সেই চিন্ময়মূর্ত্তির ধ্যানে, সাহচর্য্যে, সম্ভোগে,দাসত্বে, প্রেমে ও মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য আবির্ভূত হইল। নারদের বীণার ধ্বনি হইল, বিশ্বনাথ, তোমার লীলা পূর্ণ হইল, তোমার ইচ্ছার জয় হইল, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হইল।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

গীতা-সমালোচনার প্রতিবাদ।

গত পৌষ মাসের নব্যভারতে গীতা সমালোচনা প্রবন্ধে "শ্রীকৃষ্ণ, কুরুসভা এবং অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় বলিয়াছিলেন যে, আমার বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখে নাই" এই অসংলগ্নতা ও অনৈক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বিবিধ উক্তি সম্বন্ধে অতি তীব্রভাবে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। এ সংসারে সরল ও কুটিল উভয়বিধ মনুষ্যই বিদ্যমান। কুটিল ভাবে দেখিলে যাহা ঘৃণাজনক বলিয়া বোধ হয়, সরলভাবে দেখিলে সেই পদার্থই আদরণীয় হয়। প্রতিবাদক অতি ঘৃণার চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার নিকট দোষাবহ অথবা অসংলগ্ন এবং অন্য যে কোন বিশেষণ দ্বারা তাহাকে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিবেন,তাঁহার নিকট তদ্রূপ ভাবেই প্রতীয়মান হইবে। গীতা-সমালোচক গীতার বিবিধ অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বতনকালে মুনিঋষিগণ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যাহার ভাষ্যকারক,অধুনা সেই সকল গ্রন্থের দোষ অন্বেষণ করিতে অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন। যাঁহার যেরূপ মনে উদয় হইতেছে, তিনি তাহাই অসঙ্কুচিত-চিত্তে সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া

আপন আপন উন্নত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বিষয়টী অতি গুরুতর। তাহার প্রকৃত অর্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ ও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকের বৃথা প্রয়াস মাত্র। ভাবিয়াছিলাম,এরূপ বিষয় সম্বন্ধে অনেকেই প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন না। আমি শাস্ত্রানভিজ্ঞ। সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভব নাই। এক দিবস চিন্তা করিতেছি যে, বেদব্যাস কি এরূপ গুরুতর ভ্রমে তাঁহার পবিত্র গ্রন্থকে কলুষিত করিলেন যে,সর্ব্বসাধারণেই তাহার দোষ অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন দুঃখ ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল। গীতার ১১শ অধ্যায় ও উদ্যোগ পর্ব্বের ১৩১ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিলাম, গীতাসমালোচক অতি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি যে অনৈক্যতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উক্তি সম্বন্ধে অতি কঠিন ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে বেদব্যাসের লেখনীতে তদ্রূপ কোন ভ্রম সংঘটিত হয় নাই। গীতা-সমালোচকের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতিবাদ করা আমার বৃথা প্রয়াস মাত্র। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও কুরুসভার বিশ্বমূর্ত্তি একরূপ বিবেচনা করিয়া গীতা-সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। উক্ত উভয় স্থলের বিশ্বমূর্ত্তি যে একরূপ নহে, তাহা বেদব্যাসের লেখনীতে জলন্ত অক্ষরে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা গীতা ১১শ অধ্যায়—

অর্জ্জুন উবাচ।—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্য মপিচাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্‌যথাত্থত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মা নমব্যয়ম্ ॥ ৪

অর্জ্জুন কহিলেন,হে ভগবন্ তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণন করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল। হে কমল পত্রাক্ষ, তুমি যে ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়কারী, তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম। তুমি যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সমস্তই যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম, তোমার সেই ঐশরূপ দর্শনে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। হে প্রভো! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তোমার সেই অবিনাশী নিত্যরূপ আমাকে প্রদর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততোরাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এই রূপ কহিয়া অর্জ্জুনকে নিজ দিব্য ঐশরূপ দেখাইলেন।৯।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়াপ্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপংপরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বং॥৪৭॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্ম যোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময়রূপ দেখাইলাম; আমার এরূপ তুমি ভিন্ন এপর্য্যন্তআর কেহ দেখিতেপায় নাই।

একাদশ অধ্যায়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের মোহ বিদূরিত হইল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিলেন। তাঁহার ঐশরূপ দেখিতে ইচ্ছা হইল। ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। অর্জ্জুন ভগবানের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভীত হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই তোমাকে আত্ম যোগবলে এই অনাদি, অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম।

এইক্ষণে কুরুসভায় কি প্রকার রূপ দেখাইলেন, তাহার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলেই উভয় রূপের তারতম্য অতি সহজে উপলব্ধি হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন উবাচ,—

বিদুরেণৈবমুক্তস্তু কেশবঃ শত্রুপূগহা।
দুর্য্যোধনং ধার্ত্তরাষ্ট্র মভ্যভাষত বীর্য্যবান্ ॥১॥
একোহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুযোধন।
পরিভূয় সুদুর্ব্বুদ্ধে গৃহীতুং মাং চিকীর্ষসি ॥২॥
ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বেতথৈবান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥৩॥
এবমুক্ত্বা জহাসোচ্চৈঃ কেশবঃ পরবীরহা।
তস্য সংস্ময়তঃ শৌরে র্বিদ্যুদ্রূপা মহাত্মনঃ ॥৪॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাস্ত্রিদশা মুমুচুঃ পাবকার্চ্চিষঃ।
অস্য ব্রহ্মললাটস্থো রুদ্রো বক্ষসিচাভবৎ ॥৫॥
লোকপালা ভুজেষাসন্নগ্নি রাস্যাদজায়ত।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥৬॥
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ বিশ্বেদেবাস্তথৈবচ।
বভূবুশ্চৈকরূপাণি যক্ষ গন্ধর্ব্বরক্ষসাম্ ॥ ৭ ॥
প্রাদুরাস্তাং তথাদোর্ভ্যাং সঙ্কর্ষণ ধনঞ্জয়ৌ।
দক্ষিণেঽথার্জ্জুনোধন্বীহলী রামশ্চ সব্যতঃ ॥৮॥
ভীমোযুধিষ্ঠিরশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌচ পৃষ্ঠতঃ।
অন্ধকাবৃষ্ণয়শ্চৈব প্রদ্যুম্ন প্রমুখাস্ততঃ ॥৯॥
অগ্রে বভূবুঃ কৃষ্ণস্য সমুদ্যত মহায়ুধাঃ।
শঙ্খচক্রগদাশক্তি শার্ঙ্গলাঙ্গলনন্দকাঃ ॥১০॥
অদৃশ্যন্তোদ্যতান্যেব সর্ব্বপ্রহরণা নিচ।
নানাবাহুষু কৃষ্ণস্য দীপ্যমানানি সর্ব্বশঃ ॥১১॥
নেত্রাভ্যাং নস্ততশ্চৈব শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্মহারৌদ্রাঃ সধূমাঃ পাবকার্চ্চিষঃ ॥১২॥
রোমকূপেষুচ তথা সূর্য্যস্যেব মরীচয়ঃ।
তংদৃষ্ট্বা ঘোরমাত্মানং কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥১৩॥
ন্যমীলয়ন্তনেত্রাণি রাজানস্ত্রস্তচেতসঃ।
ঋতে দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ বিদুরঞ্চ মহামতিম্ ॥১৪॥
সঞ্জয়ঞ্চ মহাভাগমৃষীংশ্চৈব তপোধনান্।
প্রাদাত্তেষাং স ভগবান্ দিব্যং চক্ষু র্জ্জনার্দ্দনঃ ॥১৫॥
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং মাধবস্য সভাতলে।
দেবদুন্দুভয়োনেদুঃ পুষ্পবর্ষং পপাতচ ॥১৬॥
চচালচমহী কৃৎস্না সাগরশ্চাপি চুক্ষুভে।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ পার্থিবাভরতর্ষভ ॥১৭॥
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ সংজহারবপুঃ স্বকম্।
তাং দিব্যামদ্ভুতাং চিত্রা মৃদ্ধিমত্তামরিন্দমঃ ॥১৮॥
ততঃ সাত্যকি মাদায় পাণৌহার্দ্দিক্যমেবচ।
ঋষিভিস্তৈরনুজ্ঞাতো নির্যয়ৌমধুসূদনঃ ॥১৯॥ *

মহাভারত। উদ্যোগপর্ব্ব। ১৩১ অঃ।

বর্দ্ধমানের সংস্কৃত মহাভারত।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ত্বমেব পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বস্যজগতোহিতঃ।
তস্মাত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ প্রসাদং কর্ত্তু মর্হসি ॥১৭॥
ভগবনমমনেত্রাণামন্তর্ধানং বৃণে পুনঃ।
ভবন্তংদ্রষ্টু মিচ্ছামি নান্যং দ্রষ্টুমিহোৎসহে ॥১৮॥
ততোব্রবীন্মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রং জনার্দ্দনঃ।
অদৃশ্যমানে নেত্রেদ্বে ভবেতং কুরুনন্দন ॥১৯॥
তত্রাদ্ভুতং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রশ্চচক্ষুষী।
লব্ধবান্ বাসুদেবস্য বিশ্বরূপ দিদৃক্ষয়া ॥২০॥

প্রতাপচন্দ্র রায়ের কৃত সংস্কৃত মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব। ১৩১ অধ্যায়।

'বৈশম্পায়ন বলিলেন, বিদুরবাক্য শ্রবণে শত্রুনিহন্তা অপ্রতিমপ্রভাব বাসুদেব ধৃত-

* শেষের এই ৬ লাইন, মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যে সংস্কৃত মহাভারত ১৮৭৮ খ্রীঃ ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে "ধৃতরাষ্ট্র উবাচ" শ্লোক সমূহে সন্নিবিষ্ট আছে। ন, স।

রাষ্ট্র তনয় দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ সহকারে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, সেই জন্যই আমাকে একাকী বোধ করতঃ পরাজয় পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, আমি একাকী নই। যাবতীয় পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং আদিত্য, রুদ্র ও ঋষিগণ এই স্থানেই আমার সন্নিহিত আছেন। এই বলিয়া পরবীরহা বাসুদেব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। তখন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর হইতে বিদ্যুৎসন্নিভ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেবতাগণ বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাট হইতে ব্রহ্মা, হৃদয় হইতে রুদ্রগণ, ভুজবলয় হইতে লোকপালবর্গ এবং বদন হইতে অগ্নি, আদিত্যগণ, বিশ্বদেব সকল, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গ, সাধ্যগণ এবং বহুসংখ্যক যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব প্রাদুর্ভূত হইলেন। হস্তদ্বয় হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পশ্চাৎভাগে যুধিষ্ঠির, ভীম ও মাদ্রীর পুত্রদ্বয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রচণ্ড আয়ুধ সমুদ্যত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দক প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ সমস্ত তদীয় ভুজ পরম্পরায় শোভা পাইতে লাগিল, এবং শ্রোত্র, নেত্র, নাসারন্ধ্র ও রোমকূপ হইতে প্রখর কিরণের প্রখর কিরণ সমূহের ন্যায় সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল। বিশ্বমূর্ত্তি বাসুদেবের সেই ঘোররূপ নিরীক্ষণে দ্রোণ, ভীষ্ম, সঞ্জয়, বিদুর ও তপোধন ঋষিগণ ব্যতিরেকে আর সকলেই শঙ্কাকুলহৃদয়ে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তৎকালে দ্রোণ প্রভৃতিকে দিব্যচক্ষু প্রদান করাতে তাঁহারা ভয়রহিত হইয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ, দেবগণ কুরুসভা মধ্যে বাসুদেবের সেই আশ্চর্য্য কাণ্ড সন্দর্শন করিয়া দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

* * * * *

বাসুদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনার নেত্রদ্বয় সমুৎপন্ন হউক। অন্যে উহা দেখিতে পাইবে না। হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বাসুদেবের বিশ্বরূপ দর্শন বাসনায় নয়নদ্বয় লাভ করিলেন। রাজা ও ঋষিগণ বাসুদেবের বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব আরম্ভ করিলেন।" প্রতাপচন্দ্র রায়ের বঙ্গানুবাদ।

উদ্যোগ পর্ব্ব। ১৩১ অধ্যায়।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শানুসারে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যাংশের প্রার্থী হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তৎকালে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ ব্যতীত সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। সন্ধির প্রস্তাব ও যুদ্ধোদ্যোগ হইতে লাগিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ, কুরু ও পাণ্ডব উভয় দলে সন্ধি স্থাপনার্থ স্বয়ং কুরুসভায় আগমন করিলেন, কিন্তু পাপমতি দুর্য্যোধন কিছুতেই সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণকে একাকী অসহায় মনে করিয়া বন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে ভয় প্রদর্শনার্থ এবং তিনি যে একাকী আইসেন নাই, তাহা দেখাইবার জন্য বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইলেন। এ বিশ্বমূর্ত্তিতে ১১শ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপের কিছুমাত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কুরুসভায় যে রূপের বর্ণনা

আছে, তাহাতে অনাদি, অনন্ত ও তেজোময় রূপের কোন উল্লেখ নাই। কুরুসভার রূপ কেবল দুর্য্যোধনকে ভয় প্রদর্শনার্থ এবং গীতার ১১শ অধ্যায়োক্ত রূপ ঈশরূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ঈশরূপ যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কোন স্থানে কখনও প্রদর্শিত হয় নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজার এবং প্রতাপচন্দ্র রায়ের সংস্কৃত মহাভারতের মধ্যে প্রথমোক্ত মহাভারতে বিশ্বরূপের কোন উল্লেখ নাই। শেষোক্ত মহাভারতে কুরুসভায় বিশ্বরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তজ্জন্যই বঙ্কিম বাবু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। তৎ-সম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

আসামী ভাষা

যে সময় হইতে আসাম প্রদেশ বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক্ হইয়াছে, সেই সময় হইতেই অর্থাৎ প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে চলিল, আসামী ও বাঙ্গলা ভাষা পৃথক্ কি না, তাহার তর্ক চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার কিছুই ঠিক হইল না। এবং কোন্ কালে যে ঠিক হইবে, তাহাও বলা যায় না। যতদিন ভারতবাসীরা একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে না পারিতেছেন, যতদিন না স্বদেশবাসীরা সামান্য রাজপ্রসাদলাভের জন্য নিজকে বলি দিতে বা স্বদেশের অনিষ্ট সাধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইবেন, ততদিন এ মীমাংসা স্থির হইবে না। আজ কাল ভেদনীতির যেরূপ বহুল প্রচার দেখা যায়, তাহাতে মিলন এক প্রকার দুঃসাধ্য। গত সাতশত বৎসর হইতে ভারতবাসিগণ বিদেশীর নিকট গৃহ বিচ্ছেদের যে সূত্রপাত দেখাইয়াছেন, তাহার শেষ অঙ্ক যে কবে অভিনীত হইবে, তাহা কে বলিবে?

যিনি যতই বলুন, স্থির চিত্তে উভয় ভাষা গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এই বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দুই ভাষা এক ছিল, প্রভেদ যে কিছু ছিল না, তাহা নহে, তবে সে সামান্য মাত্র। উভয় ভাষার স্বতন্ত্র ইতিহাস আলোচনা করিলেই উভয়ের নৈকট্য ও পার্থক্য সুন্দর রূপে দেখা যাইবে।

আসাম প্রদেশ, এখন যাহাকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলে, তাহা বহুদিন হইতে প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। কালীঘাটের ন্যায় কামরূপেও সতীর অঙ্গ লইয়া তীর্থ স্থান হইয়াছে এবং মহাবীর কর্ণের ন্যায় ভগদত্তও পাণ্ডবের বিপক্ষে প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সহায়তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসাম নাম ছিল না, আহম রাজাদের দ্বারা এই দেশ অধিকৃত হওয়ার পর হইতে রাজবংশের নামানুসারে ইহার আসাম নাম হইয়াছে। পুরাকালে ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল, পরে কামরূপ হয়। এই কামরূপ কেবল আধুনিক গৌহাটী জেলাকে বলিত না। ইহা এক সময়ে পশ্চিমদিকে কোচবেহার রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জিতারী নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে রাজত্ব স্থাপন করেন এবং কামরূপে তাঁহার রাজ-

ধানী স্থাপন না করিয়া জলপাইগুড়ী গিয়া তাঁহার রাজধানী নির্ম্মিত করেন। *

তাঁহার বংশীয় চতুর্দ্দশ জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। হ্যানে নামক ঐতিহাসিক বলেন,এই জিতারী ও রাজা ধর্ম্মপাল একই; এবং এই বংশের রাজত্ব ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়। এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসামের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক শঙ্কর দেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও বঙ্গদেশে বিশেষতঃ নবদ্বীপে অনেক দিন বাস করেন ও চৈতন্যদেবের নিকট হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া আসিয়া আসামে সেই মত প্রচার করেন। তখনকার উভয় ভাষা প্রায় একরূপই ছিল। তবে বঙ্গদেশে সে সময়ের আদিম অসভ্যদিগের সংশ্রবে কতকগুলি চলিতশব্দ যেমন ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে, সেইরূপ আসামের নিকটস্থ বহু পার্ব্বত্য ও আদিম অধিবাসীদিগের † সংশ্রবে অনেক শব্দ আসামে তখনকার কথোপকথনে চলিত ছিল।

শঙ্করদেবের প্রপিতামহ চণ্ডীবর নামধারী কায়স্থ সন্তান গৌড়দেশ হইতে আসেন। তিনি ও অপর একাদশ জন ভূঁইয়া কমতাপুরের রাজা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গৌড়দেশের রাজা কর্ত্তৃক এ প্রদেশে প্রেরিত হয়েন। চণ্ডীবর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভূঁইয়ারা আসামে আসিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষিত ভাষা এ দেশে প্রচলিত করেন। এ প্রদেশের পূর্ব্বকার প্রাকৃত ভাষার সহিত এই পণ্ডিতদিগের ভাষা মিশ্রিত হইল। শঙ্কর দেব যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বাঙ্গলা ভাষা, তবে তাহার সহিত, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্যান্য ভাষারও শব্দ চলিত আছে। এই স্থলে শঙ্করদেবের রচিত দুই একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সার্থকতা করিব।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

"প্রথমে প্রণামো ব্রহ্মরূপী সনাতন,
সর্ব্ব অবতারর কারণ নারায়ন,
তজু নাভি কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত,
যুগেযুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত।
মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমতঃ
উদ্ধারিলা চারিবেদ প্রলয় জগত।
সত্যব্রত রাজাক দেখাইলা নিজমায়া,
ন ধরিলা সাগরে তোমার মৎস্যকায়া।"

কীর্ত্তন, ১ম পৃষ্ঠা।

কম্বুকণ্ঠে শোভে কৌস্তুকমণি
প্রভাতে উদিত আদিত্যজিনি,
পূর্ণচন্দ্র রুচি মুখমণ্ডল,
কর্ণত মকর দোলে কুণ্ডল।
তার রশ্মি জালে গণ্ডপাণ্ডুর,
রুচির চিবুক চারু অধর।
প্রবাল রত্নে যেন করে কান্তি,
সুন্দর দন্ত মুকুতার পান্তি।

ঐ ২৪ পৃষ্ঠা।

বোধ করি, ইহা দ্বারা উভয় ভাষার যে কি প্রভেদ আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাকে বাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে কি না, তাহা সকলেই বুঝিবেন। এবং সেই জন্যই ইহার টীকার আবশ্যক নাই। এইরূপই সমস্ত। যে স্থান হইতেই উদ্ধৃত করা হউক না কেন, সর্ব্বত্রই অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। আধুনিক ভাষার সৃষ্টি ভূঁইয়াদিগের দ্বারা হইয়াছিল ও ইহার শ্রীবৃদ্ধি শঙ্কর দেব ও

* Notes on "The Kock kings of Kamrup" by E. A. Gait Esq. C. S.

† হুটিয়া, কোচ, কাছারি, মিকির, আকা, মুরুং প্রভৃতি।

তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা হইয়াছিল *। এবং তাঁহারা যে ভাষায় তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তখনকার জাতীয় ভাষা ছিল। বঙ্গদেশেও বঙ্গভাষার বীজ বহুপূর্ব্বে রোপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় হইতেই ভাষার আকৃতি ঠিক হইল। স্বর্গীয় পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সংস্কৃতে লেখা পড়া করিতেন। সাধারণ কার্য্যে অর্থাৎ কথোপকথনে বা দলিল পত্রাদিতে বা কোন কোন তাম্রফলকে সাধারণের বোধগম্য হইবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার হইত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা। যতদিন ভাষায় ধর্ম্মভাব জাগরিত না হয়, ততদিন ভাষার সম্যক্ উন্নতি হয় না। বঙ্গভাষার চৈতন্যদেব হইতে সেই উন্নতি আরম্ভ হইল। যখন হইতে বাঙ্গলার মাতৃভাষাতে তাঁহার লীলামৃত লিখিত ও পঠিত হইতে লাগিল, তখন হইতেই বাঙ্গলা ভাষা শনৈঃ শনৈঃ বেগে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। একদিকে চৈতন্যদেবের সাম্যমত বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিত হইয়া দেশে দেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে লাগিল ও আবালবৃদ্ধবনিতা সেই ভক্তি রস আস্বাদন করিয়া হরিনাম ঘোষণা করিতে লাগিল, অপর দিকে বিপক্ষ পক্ষ হইতে শাক্তমত প্রচার করিবার নিমিত্ত "চণ্ডী" লিখিত হইল এবং রামায়ণ ও মহাভারত মহা কাব্যদ্বয় প্রচালিত হইয়া ভাষার পরিপুষ্টি ও উন্নতি করিয়া দিল। এইরূপ শঙ্করদেবও তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারা যে ভাষার চর্চ্চা হইতে লাগিল, তাহাও বাঙ্গলা ভাষা। তবে যেমন ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া উপদেশ দিতে হইলে, উপদেষ্টাদিগের চলিত ভাষাকে উপেক্ষা না করিয়া বরং আদর করা উচিত, সেইরূপ, মধ্যে মধ্যে সাধারণের বোধগম্যার্থ চলিত মতও প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই।

শঙ্করদেবের কিছুকাল পরে আহমবংশীয় রাজাগণ ক্রমে কামরূপ আপনাদিগের অধীনে আনিলেন। তাঁহারা আসামের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত পর্ব্বত হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়াছিলেন ও অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিলেন। ক্রমে বিজিতদিগের সভ্যতালোক দেখিয়া আপনাদিগকে সেই পরিমাণে উচ্চ করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ বিশেষতঃ বাঙ্গলার বিদ্যার গৌরবস্থল নবদ্বীপ হইতে ভাল ভাল পণ্ডিত আনাইয়া এবং নিজেরা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ "চন্দ্র" হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও পণ্ডিতদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা রুদ্রসিংহ, পণ্ডিত কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার রাজধানীতে আনয়ন করেন।

যেমন একদিকে আহোম রাজারা প্রায় সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা রাজ্যভুক্ত করিলেন, অপর দিকে বিজিতদিগের ভাষা আপনাদিগের ভাষা করিয়া লইলেন। এবং সেই

* "The popular character of the Vaishnavism taught by Sankar, Mahdhab, Damodar is probably a guarantee that the language of the works issued from their schools represent their true Vernacular of their time." Assam Gazette, Page 960 of October, 1894.

Notes on Historical Research—Assam by C. J. Lyall Esq. C. S. offg. Chief Commissioner, Assam.

জন্যই তাঁহাদিগের ভাষার অনেক শব্দ চলিত ভাষাতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে এই প্রদেশের ভাষা নদীয়ার ভাষা হইতে কতক পরিমাণে বাহিরে বাহিরে বিভিন্ন হইল, এবং এই জন্যই ঐতিহাসিক রবিন্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন যে, এখানকার আসামী ভাষাতে কেবল মাত্র এক পঞ্চমাংশ শব্দ বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্গত নয়। এই পঞ্চমাংশ হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবাসীদিগের ও আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অতি সামান্য প্রভেদ সত্ত্বেও এই ভাষা বাঙ্গলা হইতে ভিন্ন ছিল না। আধুনিক কামরূপের অধিকাংশ ও গোয়ালপাড়া জেলা বহুকাল কুচবেহার ও রঙ্গপুরের সহিত একত্র ছিল, সুতরাং ভাষারও পার্থক্য অধিক ছিল না। এখনও নিম্ন আসামে অর্থাৎ উক্ত জেলাতে বাঙ্গালা ভাষাই চলিত আছে। কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের সহিত স্বর্গীয় হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনও প্রভাকরের লেখক ছিলেন।* তিনিও ইহাকে ভিন্ন ভাষা বলিয়া জানিতেন না। এই প্রভেদের আরম্ভ হইল,যখন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের সময় আসামের শাসনপ্রণালী বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হইল। তথনই ২।১ জন আসামবাসী বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ভাষাকেও ভিন্ন করিতে চাহিলেন ও শিবসাগরস্থ মিশনারিগণ এই বিদ্বেষাগ্নিতে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত দলের আধিপত্য বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার গিয়াছে, এখন অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষার পুস্তকাদি আসামবাসীদিগের নিকট হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত, আসামবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাষা পৃথক্ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন, তখন অবশ্যই মধ্য ও উত্তর আসামের চলিত ভাষা ভিন্নভাষা বলিয়া আখ্যাত হইল ও আসামা ভাষা বলিয়া চলিত হইল। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ভাষার প্রভেদ কিছু অধিক হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা, যিনিই যাহাই বলুন না কেন, শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ উন্নতিলাভ করিতেছে ও বলিতে কষ্ট হয়, আসামের ভাষাকে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নিম্নগামী করা হইয়াছে। পৃথিবার সকল ভাষাতেই দেখা যায়, সাধারণের চলিত কথোপকথনে ও সাহিত্যের ভাষাতে অনেক প্রভেদ আছে,কিন্তু এখনকার আসামবাসীরা বলেন যে, চলিত কথা ভাষাতে ব্যবহার করাই উচিত, এই জন্য তাহারা "শিষ্য" স্থানে পূর্ব্বে যেমন শিষ্য লেখা হইত, এখন তাহা না লিখিয়া "শিষ" "বৎসর" কে "বচর" "চক্ষু" কে "চকু" লেখেন ও পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি করিয়া ভাষার পার্থক্যতা আরও বৃদ্ধি করেন। পাঠকেরা এখনকার যে কোন এক খানি আসামীভাষায় লিখিত পুস্তক বা সংবাদ পত্র লইয়া এবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। লিখিবার অক্ষর প্রণালী উভয় ভাষায় কোন পার্থক্য নাই। কেবল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাতে 'ৰ' পেট কাটা র চলিত ছিল, আসামে আজও তাহাই আছে। আর অনেক স্থানে "শ" ও "স" স্থানে ক্রমান্বয়ে 'চ' ও 'হ' রূপে চলিত হয়, যেমন "বাদশাহ" স্থানে "বাদচাহ" গোঁসাই স্থানে "গোঁহাই" ইত্যাদি; কোথাও বা "আ"-কার লোপ হয়, যথা "টাকা" স্থলে "টকা"; "খাবার দিবার" স্থলে "খাবর দিবর"; "দেখিবার" স্থলে "দেখিবর" ইত্যাদি।

* কবিতা সংগ্রহ, প্রথমভাগ।

ক্রিয়া সকল সংক্ষিপ্ত চলিত কথায় ব্যবহার হয়,যথা "হইয়াছিল"-"হৈছিল"; "গিয়াছে" "গৈছে"; "করিয়াছিল"-"করিছিল" ইত্যাদি; "আমি যাইব" পূর্ব্ববঙ্গে ইতর লোকে "মুই যাইমু" বলে, আসামে "ময় যা(ই)ম" ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অশুদ্ধ গ্রাম্য চলিত শব্দাদি সংশোধন না করিয়া, পার্থক্য বৃদ্ধি ও গতি নিম্নগামী করা হইতেছে। গৃহস্থালী অনেক শব্দ ও আচারব্যবহার বঙ্গদেশের মত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গভাষায় যেরূপ এক বচন স্থলে বহুবচন করা হয়, আসামী ভাষাতে তাহা করা হয় না; কিন্তু তাহা নয়, অধিকাংশ স্থলে বঙ্গভাষার মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। "গণ", "চয়" প্রভৃতি শব্দ দিয়া বহুবচনান্ত শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কেবল "সকল" শব্দের পরিবর্ত্তে "সকল" ও "বিলাক" শব্দ ব্যবহারহয়। এই শেষোক্ত শব্দ শঙ্কর দেবের সময় লিখিত ভাষাতে বহুল প্রচারিত ছিল না। যে সকল মহাত্মা কথিত আসামী ভাষার পক্ষপাতী হইয়া তর্ক করিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ উপরে উপরে কিছু বিভিন্নতা দেখিয়া একেবারে বলিয়া উঠেন যে, দুই ভাষা বিভিন্ন। কতিপয় আসামবাসী আজকাল ভেদনীতির পক্ষপাতী প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের পদানুসরণ করতঃ যুক্তিতর্ক ব্রহ্মপুত্র জলে নিক্ষেপ করিয়া বলেন, বাঙ্গালীরা দেশে আহার না পাইয়া আসামে আসিয়াছেন,এখন তাঁহাদের আসামে থাকা উচিত নয় ও এদেশ হইতে যাওয়াই উচিত। কিন্তু স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ গুণাভিরাম বড়ুয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার দেশস্থদিগকে বাঙ্গালীদিগের দ্বারা কি উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে বলিয়াছিলেন। হাসিও পায় দুঃখও ধরে, কোনও "N. B." নামা শ্রীযুৎ (আসামের শিক্ষিত ভদ্রলোক দিগকে "বাবু" বলিলে ইঁহারা অপমান বোধ করেন এবং বাবুর পরিবর্ত্তে Mr. ব্যবহার করেন,যিনি ইংরাজী জানেন না তিনি "শ্রীযুৎ" ব্যবহার করেন)। ১৮ই মে তারিখের আসাম টাইমস্ (Times of Assam) নামক সংবাদপত্রে "হলাধ"—"হলুদ", "কিতাব"-"বই", "খেতি"—"চাস" শব্দে বিভিন্নতা দেখাইয়া দুই ভাষা যে পৃথক্, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন! ইহার উত্তরে আমাদের আর কি বক্তব্য আছে? একজন পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসীর নিকট শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের চলিতভাষা নওগাঁ ও শিবসাগরে কথিত ভাষা, উভয়ই দুর্ব্বোধ্য ও উভয়ই ভিন্নভাষা বলিয়া বোধ হয়। যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই কথিত ভাষার পার্থক্য অনুভব করা যায়; এইরূপ পার্থক্যে যদি ভাষা ভিন্ন হইত,তাহা হইলে বোধ হয় এক বাঙ্গালা প্রদেশে অনেক অপভাষা হইত।

যদি শ্রীহট্টবাসীরা তাঁহাদের চলিত কথা তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদিতে ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, রাজপুরুষেরা ইহাকে ভিন্ন ভাষা বলিয়া লইতেন। কিন্তু এই রাজপুরুষদিগের নিকট ইহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয় যে, শ্রীহট্টবাসীরা তাহা না করিয়া তাঁহাদের লিখিত ভাষা নদীয়ার বঙ্গ ভাষাই রাখিয়াছেন।

শ্রীহট্টের ভাষাকে যেমন বাঙ্গলা বলা যায়, তেমনই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গলা বলা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখনকার আসামের ভাষা ক্রমে অধোগামিনী হওয়াতে পার্থক্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ অন্বেষণ করিলেই সহজে সমস্ত

বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ভাষা এক ছিল। মুসলমানেরা শ্রীহট্ট অধিকার করিয়া বঙ্গদেশের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিল। আসাম আহম রাজাদিগের হস্তে থাকিলেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইল। পরে রাজপুরুষদিগের অভিপ্রায়ানুসারে আসামের শাসন কার্য্য বঙ্গদেশ হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন হইল, অমনই ভাষাও ভিন্ন হইয়া গেল। গোয়ালপাড়া জেলা, বঙ্গদেশের সহিত শাসন সূত্রে আবদ্ধ থাকায় ও আসাম রাজাদিগের দখলিকার না থাকা হেতু, তথাকার বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে বাঙ্গলা পঠিত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীর সংখ্যা ২৪,৪৯,৭৪২। ইহার মধ্যে, যাহাদিগের মাতৃভাষা আসামী, তাহাদিগের সংখ্যা ১৪,০৩,৪৭৪। আসামী ভাষার পরিণাম কি হইবে, ইহা হইতে তাহার আভাস কতক পাওয়া যায়। আরও রেলওয়ে হইলে ভিন্ন দেশবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সংখ্যা অধিক হইবে ও তাহাদিগের ভাষার সহিত ইহার সংমিশ্রণ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ২৭শে এপ্রেল তারিখের "টাইমস্ অফ আসাম" পত্রিকার আসামবাসীর বন্ধু সহৃদয় ইংরেজ "S, E, P," যাহা বলিয়াছেন,তাহা প্রত্যেক আসামের হিতাকাঙ্ক্ষীর স্মরণে রাখা উচিত; ও "অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী" সভার প্রত্যেক সভাকে স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে সমস্ত বঙ্গ ও আসাম প্রদেশবাসীরা বঙ্গভাষারূপ মাতৃদেবীর অর্চ্চনা করিতেন, পরে যখন শেষোক্ত প্রদেশ প্রথমোক্ত হইতে বিভিন্ন হইল, তখন তাঁহারা মাতাকে পূজা করিতে না পাইয়া, মাতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিছেন। যেমন পূর্ব্বাপর হইয়া থাকে, প্রতিমা—মা হইতে অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িলেন ও সেবকেরা যাহার যাহা অভিরুচি ও ক্ষমতা অনুসারে প্রতিমার পূজা করিতে করিতে এত দূরে আনিয়াছে যে, প্রকৃত মাতার সহিত বাহিরে আকারগত প্রভেদ এত অধিক হইয়াছে যে,স্থূল দৃষ্টিতে আর মায়েরই প্রতিমা বলা সুকঠিন। তাই আসামীয়া ভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা করি,ভাই সকল, এক মায়ের সন্তান হইয়া পৃথক্ থাকিয়া আর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া, এস ভ্রাতৃশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এক মনে এক প্রাণে প্রকৃত মায়ের উপাসনা করি।

শ্রীকালীগোপাল রুদ্র।

কালীয়-দমন।

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন আজি কি অসুখে,বলনা,কি মনোদুখে,
মা তোমার সোণামুখ মলিন এমন ?
করুণা মমতা মাখা, কল্প তুলিকায় আঁকা,
কেন গো শিশিরে ঢাকা কমল নয়ন ?
বলনা কি অবসাদে, বলনা মা কি বিষাদে,
অমন অমরমূর্ত্তি ম্লান কি কারণ ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

২

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
তোমার স্বভাবশোভা, জগতের মনোলোভা,
কেন সে মলিন আজ শ্যামল কানন ?

পশু পাখী তরুলতা, কি জানি পেয়েছে ব্যথা,
কি এত গভীর শোকে সবে নিমগন ?
কুসুম ফোটেনা ডরে, আতঙ্কে ঝরিয়া পড়ে,
মরিয়া রয়েছে যেন মলয় পবন !
কোকিল ডাকেনা কুহু, সদা করে উহু উহু,
কি বেদনা, কি সে ব্যথা, কিবা জ্বালাতন ?
শুনিনা শিখীর কেকা, শিখিনী কাঁদিছে একা,
শোকে করে কোকবধূ নিশি জাগরণ !
হরিণী হারায়ে হায়, আকুল হরিণ ধায়,
বনে বনে খোজে যেন কেবলি মরণ !
কিবা ভয়ে কিবা ডরে, অলি গুণ গুণ স্বরে,
শরমে মরম কথা করে আলাপন ?
বসন্ত গিয়েছে চ'লে, আর আসিবেনা ব'লে,
কি এত মনের ক্ষোভে করি পলায়ন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৩

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আনন্দ উল্লাস হীন, কেন তুমি দিন দিন,
ঘরে ঘরে শুনি কেন কেবলি ক্রন্দন ?
কেন বল ব্রজবাসি, অধরে নাহি সে হাসি,
কি বিষাদে কিবা খেদে বিমলিন মন ?
কি আতঙ্কে কিবা ত্রাসে, বলনা কি সর্ব্বনাশে,
অবসন্ন অপ্রসন্ন ব্রজনারীগণ ?
কেন সে সুন্দর রূপে, ভেবে মরে চুপে চুপে,
অনলে ঢালিতে চায় কমল যৌবন ?
কেন সে সোণার ফুল, রাঙ্গা মেয়ে—কাল চুল,
উজলি নদীর কুল চারু চাঁপা বন,
কলসী লইয়ে কাঁকে, আসেনা চাতক ডাকে,
কি ভয়ে করেছে তারা দূরে পলায়ন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৪

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
শ্রীদাম সুদাম ভাই, কেন সে আনন্দ নাই,
সাজিয়া রাখাল বেশে গোঠে গোচারণ ?
বাজায়ে প্রেমের বেণু, লইয়ে আসেনা ধেনু,
কেন মম দেশবাসী সখাসাথীগণ ?
ব্রজের জননী যারা, হায় কি আতঙ্কে তারা,
দেয় না যাইতে বনে প্রাণের নন্দন ?
সকলি মৃতের মত, জীবন করিছে গত,
কেন এত মান হত পশুর মতন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৫

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন ভীরু ব্রজবাসি, নিরাশায় যাও ভাসি,
জগৎ করে যে ঘৃণা দেখনা কখন ?
তোমরা কি পা'র ধূলি, অসংখ্য সন্তানগুলি,
একটী মানুষ এতে নাহি কদাচন ?
সকলি কি ভস্ম-ছাই, একটী স্ফুলিঙ্গ নাই,
কালান্তক দ্যুতিমান্ মহা হুতাশন ?
সবি কি শৃগাল রাশি, আত্মবলে অবিশ্বাসী,
সিংহের সন্তান হায় নাহি একজন ?
বলিতে যে প্রাণ ফাটে, জননী যাইতে ঘাটে,
দুষ্ট ইন্দ্র ঐরাবতে করে আগমন,
তোমরা দেখিয়া তাহা, শুনে তার 'আহা, আহা'—
আকুলা জননী টানে দুকূল বসন, —
কাননে পশুর মত কর' পলায়ন !

৬

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
দাদা বলরাম সবে, বল আর কত সবে,
জীবিত থাকিয়া হেন মৃতের মতন ?
লুঠে নিল সরবস্ব, ক্ষেতের সুপক্ক শস্য,
দেখ না কি হে লাঙ্গলি কৃষীবলগণ ?
দেশ নাশে দস্যু চোর, কারো নাহি গায়ে জোর
সবাই মূষিকগর্ত্ত কর অন্বেষণ !
পৃথিবী বিদার' যাতে, সে লাঙ্গল আছে হাতে,
পার না শত্রুর বক্ষ করিতে কর্ষণ ?
বিদেশীরা নানা ছলে, ভীরু কাপুরুষ বলে,
কেমনে সহিছ বল এত কুবচন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
মোহনিদ্রা পরিহরি, উঠ ভাই ত্বরা করি,
অই যে উদয়াচলে উঠেছে তপন !
দিগন্ত আলোকে ভাসে,মহোৎসাহে মহোল্লাসে
কি মহত্ব কি দেবত্ব কি নবজীবন !
জড়তা ঠেলিয়া পায়, সকলেই আগে যায়,
উদ্দাম উদ্যমে যেন পূর্ণ প্রতিজন !
এস হই অগ্রসর, আমরাও পরস্পর
করিয়া নীচতা স্বার্থ চরণে মর্দ্দন,
করিগে প্রেমের খেলা,পবিত্র প্রভাত বেলা,—
কৃষি জীবনের সুখ গোঠে গোচারণ !—
এস আমি যাই আগে, প্রাণ রক্ত যদি লাগে,
আমিই তা কণ্ঠ হ'তে করিব অর্পণ,
তোমরা আমার শবে, দাঁড়ায়ে উঠিও তবে,
স্বর্গের আরেক সিঁড়ি উপরে তখন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৮

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন গো মা ব্রজভূমি, মলিন ব্যথিত তুমি,
থাকিতে তোমার আমি নন্দের নন্দন ?
সাধ্য কি রাক্ষস ক্রূর, কিম্বা কোন দেবাসুর,
ও পবিত্র দেবদেহ ছোঁয় কদাচন ;
গৃহদাহ, নারীচুরি, নির্ব্বাসন, বুকে ছুরি,
ঘুচাইব অসুরের যত উৎপীড়ন !
আমি দৈত্যদর্পহারী, আমি দৈত্যধ্বংসকারী,
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ অসুর-দলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৯

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আমার জীবন-আয়ু, তোমারি মা জলবায়ু,
তোমারি স্নেহের সর মমতা-মাখন !
তোমারি মা শস্যফল, আমার বাহুর বল,
হৃদয়ে শোণিত রূপে করে সঞ্চরণ !
এ দেহ নিশ্চিত—খাটি, তোমারি মা ধূলা মাটী,
তোমারি স্নেহের অঙ্কে করেছ পালন !
যদি মা তোমারি হিতে, পারি এ জীবন দিতে,
এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,
কি আছে সৌভাগ্য আর,এর চেয়ে মা আমার ?
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ প্রাণের নন্দন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১০

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কি ছার সে অঘাসুর, নারীচোরা শঙ্খচূড়,
কালীয় নাগের দুষ্ট অনুচরগণ ?
দীর্ঘচঞ্চু-দীর্ঘনাসা, কঠোর কর্কশ ভাষা,
ক্ষীণজঙ্ঘা বকাসুর বিকট দর্শন,
দেবাসুর বৎসাসুর, সকলি করিব চূর,
না রবে অসুর কুলে আর একজন !
গোঁড়া দৈত্য তৃণাবর্ত্তে, পূরিব পুরীষ গর্ত্তে,
কেশে ধরি বধিব সে কেশীর জীবন !
কালীয়ের কাল-মায়া, পূতনা পাপের ছায়া,
আর যত পাপিষ্ঠের দূত দূতীগণ,
আঘাতি চরণমূল, বধিব সে দৈত্যকুল,
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ দানব-দলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১১

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
পুণ্যদা যশোদা তুমি, মা আমার জন্মভূমি,
আবার তোমার যশে ভরিবে ভুবন !
ছার ইন্দ্র দেবরাজে, কি ভয় তাহার বাজে ?
ধরিব গোবিন্দ আমি গিরি গোবর্দ্ধন !
ঝাঁপায়ে কালিন্দীজলে, বিষহ্রদে কুতূহলে,
মহাবলে কালীয়েরে করি আকর্ষণ,
চরণে চূর্ণিব শির, ক্রূর সর্প সে পাপীর ;
নাকে মুখে ফেণরক্ত করিবে বমন !
জগৎ বিস্ময়ে ভয়ে, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লয়ে,
আদরে করিবে পূজা তব শ্রীচরণ !
আবার হাসিবে তুমি, ব্রজভূমি জন্মভূমি,
সোণামুখে করিবে মা সুধাবরষণ !
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ কালীয়-দমন !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

উদ্বাহ বিচার।

বর-বিক্রয় বা কন্যাদায়।

আজ কাল বিবাহ ব্যয়ের অপকারিতার প্রতি দেশের অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কাহাদের? যাঁহারা সমাজের মূল-দেহ হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া, চাকরি বা কার্য্যের উপলক্ষে সহর বন্দরে বাস করিতেছেন, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সভা করিয়া বক্তৃতা দান করেন, পত্রিকায় লেখেন বা পত্রিকা চালান, অথবা এ সব কিছু না করিয়া, বিলাতি বিলাসে জীবন ভাসাইয়া, জীবন-সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, একটী পয়সাকে পয়সার অপেক্ষা বড় এক ফোঁটা বুকের রক্ত মনে করেন, তাঁহারাই কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রাম সময়ে দেশের বা সমাজের এই সকল ক্লেশকর রীতিনীতির কথা দুই একবার ভাবিয়া থাকেন। মেয়েটী সম্মুখে তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে, বিবাহ দিতে হইবে। এত সাধের এত যত্নের স্নেহের পুতুলটী, আজও যে ছোট ছোট কোমল বাহু দুটীতে গলা জড়াইয়া, মোহমাখা কথায় আফিসের সাহেবের রাঙা চোক, গহনার্থ অভিমানিনী গৃহিণীর সদাকালব্যাপী খুঁতখুঁতানি ভুলাইয়া, জ্বালাময় সংসারে প্রাণভরা শান্তি দান করে, মর্ম্মান্তিক দুঃখের সময়ে যাহার মুখখানি সকলের আগে প্রাণে ভাসে, সেই প্রাণ-পুতলি অকূলে না পড়ে, এ চিন্তাও মাঝে মাঝে প্রবল হয়। কিন্তু মেয়েকে বিবাহ দিতে, সুপাত্রস্থ করিতে সেই অনেক বুকের রক্তের প্রয়োজন। এ সব কথা যখন মনে ভাসে, তখন নবীন বাঙ্গালী বাবু বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়েন। সেই উত্তেজনার মুখে দুই চারি কথা বলেন বা লেখেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাজ কত দূর হইবে, বুঝিতেছিনা। যাঁহারা সমাজের মূল পত্তন, সমাজ বৃক্ষের আসল গোড়া, তাঁহারা কি এ চিন্তায় নব শিক্ষিতদের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের স্বার্থ লাভের আশা আছে, তাঁহারা সহাস্য বদনে ভাবী সুখ সৌভাগ্যের কাল্পনিক সাগরে সন্তরণ জন্য আগে থেকেই বাহু প্রসারণ করিতেছেন, আর যাহাদের ঘাড়ে দায় চাপিয়াছে, তাঁহারা অদৃষ্টকে দোষ দিয়া যথাসাধ্য দায় উদ্ধারের উপায় দেখিতেছেন, আর না পারিলে, শেষে সর্ব্বাধম কার্য্য দ্বার-ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু কয়জন প্রাচীন মুরুব্বি লোকের মনে ক্লেশকর সামাজিক প্রথা উন্মূলনের চেষ্টা-প্রসূ জ্ঞান উদ্রিক্ত হইয়াছে? বলিতে গেলে এক জনেরও নয়।

আর একটী কথা বড় ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজের আর স্থিতি সংরক্ষক বন্ধন নাই। কেহ কাহারও কথা শুনে না, বাধা মানে না; একটা গভীর স্বেচ্ছাচারিতার প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। সকল মনুষ্যেরই মন উচ্ছৃঙ্খল। এ অবস্থায় কাহাকে কি বলি? যাহারা সমাজের বাস্তবিক কর্ণধার, প্রকৃত পরিচালন-ভার পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের কথা কেহ শুনেনা, কাহারও কথা কেহ শুনে না।

"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইতে গেলেও লাঞ্ছনা। কাজেই কেহ মোড়ল-গিরি করিতেও প্রস্তুত নন, দুই কথা উঠিলে সকলেই উদাসীন ভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া নিরস্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। যখন কিছু হইবার নয়, তখন মিছামিছি এত চীৎকার কেন? বস্তুতঃ এ কথার ন্যায় সঙ্গত এবং সন্তোষ জনক উত্তর কিছু নাই।

পুরাকালে হিন্দু সমাজে কন্যাদান মহা পুণ্য কার্য্য ও গৌরবের বিষয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও সেই পবিত্র বিশ্বাস অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং কথাটী হিন্দু সমাজে কোন ব্যক্তিরই অগোচর থাকিবার বিষয় নয়। উক্ত বিশ্বাস মনগড়া নহে—সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র-সম্মত। কন্যাদান বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে কিরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক।

মহর্ষি মনুর মতে বিবাহ অষ্টবিধ। যথাঃ—

"ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ট মোহধমঃ॥
মনুসংহিতা ৩য় অঃ, ২১ শ্লোঃ।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ এই অষ্ট প্রকার বিবাহ মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহবিধিই সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও কন্যাদানের প্রকৃত আদর্শ নীতি-মূলক। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ বিষয়ে মহাত্মা মনু বলেন;—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ২৭ শ্লোক।

কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া, সদাচার সম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা দান করিবেন, ইহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ বিধি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উক্ত বাক্যের পোষকতায় যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন;—

"ব্রাহ্মবিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিম্॥"
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—১ম অঃ, ৫৮ শ্লোক।

বরকে আহ্বান পূর্ব্বক যথাশক্তি বিভূষিত করিয়া কন্যাদান করাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান (পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ, পরবর্ত্তী দশ পুরুষ এবং আত্মা) পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে।

মহর্ষি মনু ব্রাহ্ম বিবাহের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য বলিয়াছেন:—

"দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈক বিংশকম্।
ব্রাহ্মী পুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়তে নসঃ পিতৃন্॥"
মনুসংহিতা—৩য় অঃ ৩৭ শ্লোক।

ব্রাহ্ম বিবাহে যে সন্তান জন্মে, সুকৃতকারী হইলে তাঁহাদ্বারা পরলোকগত পিতৃপিতামহাদি দশ পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্র পৌত্রাদি দশ পরবর্ত্তী পুরুষ এবং আত্মা, এই এক বিংশতি পুরুষ পাপ-মুক্ত হন।

ব্রাহ্ম বিবাহের ফল ও উদ্দেশ্য কত মহৎ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও ব্রাহ্ম বিবাহ (বিনা শুল্কে কন্যাদান) বিষয়ে অনেক বচন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে:—

"ন জামাতৃ সমং পাত্রং ন দানং কন্যায়া সমম্।
ন ভ্রাতৃসদৃশোবন্ধুর্নচ মাতৃ সমোগুরুঃ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ—পূর্ব্বখণ্ড, ৩৭ শ্লোক।

জামাতার সমান দানের পাত্র নাই, কন্যাদানের সমান দান নাই, ভ্রাতার সমান বন্ধু নাই এবং মাতার ন্যায় গুরু নাই।

অগ্নিপুরাণে যম বাক্যস্থলে উক্ত হইয়াছে:—

"কন্যাং যেতু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্ত্যাস্বলঙ্কৃতাং।
ব্রহ্মদেয়াং দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে॥
কন্যাদানন্ত সর্বেষাং দানানামুত্তমং স্মৃতং।"

যাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহবিধানানুসারে দেয় কন্যাকে যথাশক্তি অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া সম্প্রদান করেন, সেই সকল দ্বিজ শ্রেষ্ঠেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কন্যাদান সকল দানের মধ্যে উত্তম, শাস্ত্র ইহাই বলেন।

এই সকল বাক্য দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দানের মধ্যে কন্যাদানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অন্য সর্ব্ববিধ দানই কন্যাদানের নিকট হার মানিতেছে। উক্ত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে ;—

"সৎপাত্রেহি সুতাদানং কুলকীর্ত্তিকরং ভবেৎ।
অতঃ সৎকুলভূতায় দদ্যাদ্দুহিতরং কৃতী॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ—মধ্যখণ্ড, ২৯ শ্লোক।

সৎপাত্রে কন্যাসম্প্রদান করিলে, কুল-কীর্ত্তি লাভ হয়; অতএব কৃতী ব্যক্তির সৎকুলসম্ভূত পাত্রে কন্যাদান করাই উচিত।

এই শ্লোকটী আলোচনা করিলে, পরি-ষ্কাররূপে বুঝা যায়, সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐহিক মঙ্গল এবং তদ্ধেতু কেবল নিজের নহে, কুলেরও গৌরব সম্বর্দ্ধিত হয়। কথাটী শুধু কিতাবের নয়, সমাজে ইহার শত শত জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অদ্যাপি বিদ্য-মান রহিয়াছে। মহর্ষি সংবর্ত্ত মুনি ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে বলিয়াছেন ;

"অলঙ্কৃত্য তু যঃ কন্যাং বরায় সদৃশায় বৈ।
ব্রাহ্মীয়েণ বিবাহেন দদ্যাত্তান্ত সুপূজিতাম্॥
সকন্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিন্দতি পুষ্কলম্।
সাধুবাদং লভেৎসদ্ভিঃ কীর্ত্তিং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্॥
জ্যোতিষ্টোমাদিসত্রাণাং শতশতগুণীকৃতম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষোদত্বা হোমমন্ত্রৈস্ত সংস্কৃতাম্॥
অলঙ্কৃত্য পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ।
দত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি পূজিতস্ত সুবাদিষু॥"

সংবর্ত্তসংহিতা—৬১--৬৪ শ্লোক।

যিনি ব্রাহ্মবিবাহ বিধানানুসারে কন্যাকে সম্বর্দ্ধিত ও বিভূষিত করিয়া সদৃশ পাত্রে দান করেন, তিনি সেই কন্যাদানরূপ সুকৃতি বলে অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জন বর্গের সাধুবাদ এবং সৎকীর্ত্তি লাভে অধিকারী হন। যে ব্যক্তি হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যা দান করেন, তিনি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের শতশতগুণ ফল পান। যে পিতা কন্যাকে অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সম্প্রদান করেন, তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত এবং সুরগণের মধ্যে সম্মানিত হইয়া থাকেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধানে কন্যাদান করিলে, ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্থানান্তরে বলিয়াছেন ;—

"ভূদীপাশ্বান্ন বস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃপ্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্বাস্বর্গে মহীয়তে॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—১মঃ অঃ ২১০ শ্লোক।

ফলদায়িনী ভূমি, দেবালয়, অশ্ব, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রবাসীদিগের আশ্রয়, নৈবেশিক অর্থাৎ বিবাহার্থ দীয়মান দ্রব্য (এ স্থলে কন্যা), সুবর্ণ এবং ভারবাহী বলী-বর্দ্দ প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে ,—

"বস্ত্রদো রুদ্রভবনং কন্যাদো ব্রাহ্মণপদম্।
হেমদো বিষ্ণুভবনং প্রয়াতি কুলসংযুতঃ॥
যস্তু কন্যামলঙ্কৃত্য দদ্যাদধ্যাত্মবেদিনে।
শতবংশ সমাযুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমশ্নুতে॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ—১৩শ অং, ১৩৭।১৩৮ শ্লোক।

বস্ত্রদাতা রুদ্রলোকে, কন্যাদাতা ব্রহ্ম-লোকে এবং স্বর্ণদাতা সবংশে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কন্যাকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণ করে অর্পণ করেন, তিনি শতবংশের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

কন্যাদানের ফল এত মহৎ! এতদ্ভিন্ন বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

"গঙ্গাতীর নিবাসায় কন্যাং দদ্যেত্তু যঃ শুভাম্।
প্রত্যহং পিতরস্তস্য গয়াশ্রাদ্ধস্য ভোগিনঃ॥"
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ – মধ্যখণ্ড, ৫২ শ্লোক।

যিনি গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে সুলক্ষণা কন্যা সম্প্রদান করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রত্যহ গয়াশ্রাদ্ধ ভোগ করেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

"বিশিষ্টফলদা কন্যা নিষ্কামানাঞ্চ মুক্তিদা।"

সাধারণ রূপ কন্যাদানে দাতা বিশিষ্ট প্রকার ফললাভ করেন, নিষ্কামিদিগের মুক্তিও প্রাপ্তি হয়।

উপরি উক্ত বিধানানুসারে কন্যাদান করা কেবল যে শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের পক্ষেই কর্ত্তব্য, এমন নহে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে, ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"গোদান নিরতা যে চ কন্যাদান রতাশ্চ যে।
মদর্থং কর্ম্মকর্ত্তারস্তেবৈ ভগবতোত্তমাঃ॥"
বৃহন্নারদীয় পুরাণ—৫ম অং, ৬৩ শ্লোক।

যাঁহারা গোদান, কন্যাদান ও আমার কার্য্য করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব প্রধান।

ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথানুযায়ী কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে পুরাণ, উপপুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের মত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গেল, উপরে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পর্য্যালোচনা করিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কন্যাদান কিরূপ ফলদায়ক কার্য্য এবং তদ্দ্বারা নিজের ও পিতৃলোকের কত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। পুরাতন সমাজের বিষয় আলোচনা করিলে, সেই সময়েও ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথাই অধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। রাজন্যবর্গের মধ্যে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহাও শেষ অবস্থায় ব্রাহ্ম মতেই সিদ্ধ হইত। রাম-সীতা, নলদময়ন্তী এবং সত্যবান্ সাবিত্রী প্রভৃতির বিবাহ ব্রাহ্ম বিধানমতে সম্পন্ন হইয়াছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও অনিরুদ্ধ ঊষা প্রভৃতির বিবাহ প্রথমতঃ গান্ধর্ব্ববিধানে এবং অর্জ্জুন-সুভদ্রা প্রভৃতির বিবাহ-রাক্ষসবিধানে সম্পাদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে তাহাও ব্রাহ্মবিধানেই সিদ্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীলাভ সময়ে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকিলেও, উক্ত বিবাহ রাক্ষসবিধানে সম্পন্ন না হইয়া ব্রাহ্মবিধানেই হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মবিবাহেরই আদর ও প্রচলন অধিক ছিল।

সমাজের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি গুলিও ক্রমশঃ উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে, আমাদের সমাজই এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল। দান করা বা দানের পরিমাণ নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে দাতার ইচ্ছাধীন, অবস্থার প্রতিও অনেকটা নির্ভর করে। গ্রহীতার তদ্বিষয়ে কোন প্রকারের জেদ বা বাড়াবাড়ি করা নীতি-বিরুদ্ধ। যে কালে হিন্দুসমাজ উন্নতির শেষ সোপানে উন্নীত হইয়াছিল, সে কালের হিন্দুগণ এবম্বিধ জেদকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, সন্দেহ নাই। যদি তাহাই না হইবে, তবে ব্রাহ্মবিবাহে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার কন্যাদানের ব্যবস্থা করা হইত না। বস্তুতঃ তৎকালে ব্রাহ্মবিধানে কন্যা দান করিবার নিমিত্ত যে বরকে আহ্বান করা হইত, কন্যাদাতা শক্তি অনুসারে বস্ত্রালঙ্কার দিয়া যে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেন, শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে এইরূপ বিধিই দেখিতে

পাওয়া যায়। তখনকার ব্যবহারিক বৃত্তান্ত যতদূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাতেও উল্লিখিত নিয়ম প্রচলিত থাকিবার কথাই জানা যাইতেছে। তখন পাত্র কিম্বা তৎপক্ষীয় অন্য কোনও ব্যক্তি "আমাকে দুই হাজার বা চারি হাজার টাকা না দিলে কন্যা গ্রহণ করিব না" এইরূপ অন্যায় বাক্য প্রয়োগ দ্বারা দাতার এবং সমাজের গৌরব ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতেন, এমন শুনা যায় না। যিনি যাহা দিতে সমর্থ হইতেন, গ্রহীতা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাগ্রহণ করিতেন। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই প্রকারের দান ও গ্রহণের দর কত উচ্চ ও সমাজের গৌরব-বর্দ্ধক।

সেই-মঙ্গলদায়ক এবং সুপবিত্র কন্যাদান-প্রথা আজ কাল যে কত কলঙ্কিত ও সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা আর কাহারও জানিবার বা বুঝিবার বাকী নাই। কুলীন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ সমাজে ইদানীং যিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন কিম্বা দিবার জন্য উদ্যোগী আছেন, তিনিই এ বিষয়ে প্রকৃত ভুক্তভোগী।

শক্ত্যনুসারে যৎসামান্য শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা উৎসর্গ করিলেও এক সময়ে বরপক্ষের কোনরূপ আপত্তির কথা শুনা যায় নাই। সমাজের অধঃপতন হেতু বর্ত্তমান সময়ে সেই কন্যাদান এতই বিড়ম্বনা ও অনিষ্টের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আজ কাল রাশি রাশি অর্থ বৃষ্টি করিয়াও, কোন কোন দরিদ্র সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াও, বরের বা বরের অভিভাবকের মন পাইতেছেন না। আমরা এ বিষয়ের দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতে চেষ্টা করিব।

আপনি আজ কাল কন্যার বিবাহার্থী হইয়া, যদি আপনার অপেক্ষা কুলেশীলে নেহাৎ নীচ ব্যক্তির নিকটও উপস্থিত হন, তিনি বিবাহ ব্যয়ের ভাণ করিয়া, বরের পণ বাবত কতকগুলি টাকা দাবি করিয়া বসিবেন। সামাজিক নিয়মানুসারে আপনার নিকট পণ চাহিতে পারেন না বলিয়াই বিবাহ ব্যয়ের ভাণ করার প্রয়োজন হয়। কেবল ঐ প্রকারের ব্যয় চাহিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহা নহে। ছেলের পড়ার ব্যয়, পাত্রীর গহনা, ঘড়ি, চেইন, বাবিয়ানা ব্যয়, কুটুম্ব ব্যবহার, দান সামগ্রী ইত্যাদি নানা ছুতনাতায় আপনার ঘাড়ে এত বোঝা চাপাইয়া দিবেন যে, আপনি শুনিয়াই ফাঁপড়ে পড়িবেন। ক্ষোভে, ঘৃণায়, দুশ্চিন্তায় আত্মারাম কোণে লুকাইতে পথ পাইবে না। আর বর যদি আপনার অপেক্ষা উচ্চ ঘরের হয়, তবেতো কথাই নাই; একেতো মনসা—তা'তে আবার ধূনার গন্ধ। এইরূপ স্থলে কন্যা সম্প্রদান করিতে যাওয়া, আর জলৌকার মুখে আত্ম সমর্পণ করা প্রায় একই কথা।

বড় ঘরে হউক, আর ছোট ঘরেই হউক, ছেলেটী যদি দুই একটা পাস করিতে পারিল, তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইল। এই প্রকারের ছেলের ঘরে, অর্দ্ধোদয় যোগের গঙ্গা স্নানার্থী যাত্রীগণের ন্যায়, কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভিড় পড়িয়া যায়। এরূপ ছেলের অভিভাবকগণ প্রায়ই যেন মানুষ থাকেন না; অধিকাংশ স্থলেই ইহাদিগকে কন্যাদায়-গ্রস্ত বেচারিগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবজ্ঞা সূচক ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহাঁদের প্রসন্নতা লাভ করা বহু অর্থ ও আয়াস সাধ্য। অনেক স্থলে অভিভাবকগণকে সন্তুষ্ট করিয়াও নিস্তার নাই। তদুপরি
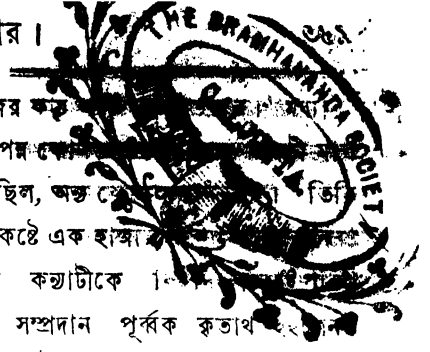
আবার বরের আদেশও তামিল করিতে হয়। বর মহাশয় পড়ুন বা না পড়ুন, তাঁহার পড়ার খরচের টাকাটা অগ্রিম লওয়া চাই। একথাতো অনেক আগেই হইয়া যায়, তৎপরে কন্যাকে কত ভরি স্বর্ণের গহনা দিতে হইবে, বরের আঙ্‌টি, ঘড়ি, চেইন কিরূপ ও কত টাকার চাই ইত্যাদি বিষয়েরও অগ্রিম চুক্তি হইতে দেখা যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবাহ-ব্যয়ের অপকারিতার প্রতি আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আবার একটুকু তলাইয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, বর-বিক্রয়রূপ কুনীতির প্রশ্রয় দান জন্যও প্রাচীন সম্প্রদায় অপেক্ষা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ই অধিক পরিমাণে দায়ী। তাঁহারা শিক্ষার স্পর্দ্ধা করিয়া, সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। আমরা বরের পণ গ্রহণ বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি। গল্পটী কাল্পনিক বা রঞ্জিত নহে; আমাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা প্রকৃত ঘটনা।

বিপিন বাবু উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল নক্ষত্র—পাস করা ছেলে। ঘটনা চক্রে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইল। স্ত্রী বিয়োগে মানুষের মনে সাধারণতঃ দুঃখ এবং শোকের উদয় হয়, বিপিন বাবুর মনে এ ঘটনা বিপুল অর্থ-পিপাসা জাগাইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন—যে ব্যক্তি গহনা পত্রের অতিরিক্ত আমাকে নগদ এক হাজার টাকা দেবে, তাহারই কন্যা বিবাহ করিব। পাত্রী কাল হউক, কুৎসিতা হউক, অথবা অঙ্গহীনা হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু টাকা একটী হাজার চাই। দেখুন, কুনীতির প্রশ্রয়ে শিক্ষা কত মলিন হইয়াছে; এইরূপ দৃষ্টান্তে শিক্ষিত লোকগণ সমাজের [illegible] অবস্থাপন্ন [illegible] কন্যা ছিল, অন্য [illegible] তিনি অতি কষ্টে এক হাজার [illegible] আপন কন্যাটীকে [illegible] করে সম্প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ [illegible] এতো একটী সামান্য কেচ্ছা মাত্র বলিলাম, ইহা অপেক্ষা পীড়াদায়ক আরও কত যে গুরুতর ঘটনা অহরহ সমাজে ঘটিতেছে, তাহার খোঁজ খবর কয় জনে রাখেন?

অনেকে বলিয়া থাকেন, "আজ কাল ছেলের উপর টাকা না লইলে চলে না। কারণ, আগেকার দিনে বালকগণকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপন করিতে হইত। তখন তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বড় একটা ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। আজকাল একটী ছেলেকে মানুষ করিতে গাঁইটের রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং অর্থ গ্রহণ না করিলে চলিবে কেন?" আমরা কিন্তু এই স্বার্থপরতার পক্ষপাতী নহি। ছেলে বিবাহ দিয়া টাকা পাইবে, এই আশায় কেহ কোন কালে ছেলের শিক্ষা দান করে নাই। আজ কালও বোধ হয় অতি অল্প লোকেই ঐরূপ ধারণায় ছেলের শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। ছেলেকে শিক্ষিত করা অভিভাবকের অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহার মূলে অলক্ষিত ভাবে যদিও নানাবিধ স্বার্থ নিহিত থাকুক, ছেলের মনুষ্যত্বের নিকট তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সাধারণতঃ, মানুষ করিতেই ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হয়; বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহ কখনো ছেলের শিক্ষা বিধান করেন

না। সুতরাং এই হেতু দর্শাইয়া টাকা গ্রহণ করা সহৃদয় ব্যক্তির কার্য্য নহে। অনেক অভিভাবক আবার পাঠের ব্যয়-সৌকর্য্যার্থ অল্প বয়সেই ছেলেকে বিবাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এবম্বিধ বন্দোবস্তে অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, "পুত্র বিবাহ দিয়া টাকা লওয়ার দরুণ বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইবার কারণ নাই। যেমন কন্যার বিবাহ কালে টাকা দিতে হয়, তেমনি আবার পুত্রের বিবাহে টাকা গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করা হইয়া থাকে।" স্বচক্ষে সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও যাঁহারা এবম্বিধ যুক্তি দেখান, তাঁহাদিগকে স্বার্থান্ধ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, এবম্বিধ ব্যয় বহন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর কি না? বিশেষতঃ যে ব্যক্তির পুত্র নাই কন্যা আছে, অথবা পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অধিক, তাঁহার বিবাহ ব্যাপারে আয় ব্যয়ের গড় সমান হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অপিচ, আজ কালের সমাজে এক ব্যক্তির চারি পাঁচটী কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাঁহার অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়ায়, সে কথা ঐ সকল ব্যক্তিগণ একবার ভাবিয়া দেখেন কি?

আজকাল দেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকেই কোন প্রকারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কষ্টের সহিত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে কন্যা সম্প্রদান করা কিরূপ বিড়ম্বনার বিষয় ও বিপজ্জনক হইয়াছে, বোধ হয় তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। সামান্য আয় বিশিষ্ট অনেক ভদ্রসন্তান কন্যা বিবাহ দিতে গিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান পর্য্যন্তও খোয়াইয়াছেন। অনেকে আবার ঋণজালে এতই জড়ীভূত হইয়াছেন যে, এ জীবনে আর তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অনেক স্থলে কন্যার বিবাহ ব্যয়ে দরিদ্র হওয়ার দরুণ পুত্রের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করিতেও অক্ষমতা দেখা গিয়াছে। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের ভাবীজীবন কি ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে! এই সকল বংশের উত্তরোত্তর দরিদ্র ও মূর্খের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে?

এই তো গেল কন্যার আত্মীয় স্বজনের কথা। অনেক স্থলে আবার কন্যাগণের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান বাজারে ভাল ঘরে বা ভাল বরে কন্যা সমর্পণের ব্যয় বহন করিতে অনেক দরিদ্র পিতাই অক্ষম। টাকা কড়ির অসঙ্গস্থাপ্রযুক্ত উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিতে পারেন না বলিয়া, খারাপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের কন্যার বিবাহ সাধারণতঃ কিছু বেশী বয়সেই হইয়া থাকে। যখন কন্যার বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথচ টাকার এবং বরের সঙ্গস্থা হইয়া উঠে না, তখন সেই কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ কন্যা লইয়া বিষম বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়েন। সেই সময় আর পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না, অথবা জ্ঞান থাকিলেও অবস্থার উৎপীড়নে তাহা দেখিবার সুবিধা থাকে না। তখন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া

যেখানে সেখানে কন্যা সমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে গুরুতর বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। অনেক কন্যা অনুপযুক্ত ও দরিদ্র বরের হাতে পড়িয়া চিরজীবন নানাবিধ কষ্টে ও অশান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এমন কি, অনেকের খাইবার সংস্থান পর্য্যন্তও থাকে না। এই সকল দরিদ্র ও অক্ষম পরিবারের সন্তানগণের অবস্থা ক্রমে যে কত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সে কথা অতি সহজে অনুমেয়।

এই প্রকারের কুরীতির প্রশ্রয়ে কেবল যে কন্যা বা কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণেরই অপকার হইতেছে, তাহা নহে। অনেক ছেলের অভিভাবক অর্থলোভ সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া, অল্প বয়সে ছেলের বিবাহ দিয়া চির জীবনের তরে তাহার মাথা খাইতেছেন। এমনও দেখা গিয়াছে, অনেক ভাল ভাল ছেলে বিবাহের পরে পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া, অথবা স্কুলের রেজেষ্টারিতে নাম মাত্র রাখিয়া, বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। তখন নানাবিধ বিলাসদ্রব্য ও এসেন্স ইত্যাদিই তাহাদের একমাত্র আদরের জিনিস হইয়া উঠে; ইস্তিরি করা সটান জামার দিকে আড়চোকে তাকাইতে তাকাইতেই জীবনটাকে মাটি করিয়া ফেলে। এই সকল বালকের জীবনের অবনতির নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকগণই দায়ী।

দর বৃদ্ধির মানসে অনেকে আবার দুই একটী পরীক্ষা পাস করিবার পূর্ব্বে ছেলের বিবাহ দেন না। বিবাহ কার্য্যে এরূপ কালবিলম্ব হেতু ছেলের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গল হয় বটে, কিন্তু ইহার মূলে অভিভাবকগণের যে কু-অভিসন্ধি নিহিত থাকে, তাহা স্মরণ হইলে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া থাকা যাইতে পারে না। এই সকল অভিভাবকই, সময়ে, সমাজের রক্ত শোষণের জন্য ভীষণ রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করেন।

ছেলের পণ গ্রহণ বিষয়ে এই প্রকারের অশাস্ত্রীয় প্রথা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সমাজের যে বিষম ক্ষতি ও পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, একথা ছোট, বড় কাহারও বুঝিবার বাকী নাই। কন্যাদান বিষয়ে আমরা আংশিকরূপে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান এবং পূর্ব্বকালের নিয়ম প্রণালী আলোচনা করিলাম, তদ্দারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, পুরাকালের বৈবাহিক নিয়ম প্রণালীতে এবং বর্ত্তমান সময়ের রীতিনীতিতে স্বর্গ পাতাল প্রভেদ, প্রাচীন সমাজের তুলনায় বর্ত্তমান সমাজকে নরক না বলিয়া থাকা যাইতে পারে না। শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন এবং পুরাতন সামাজিক প্রথা সমূহের অবজ্ঞা হেতুই যে সর্ব্বদা এই সকল নূতন নূতন উপদ্রবের কারণ উদ্ভাবিত হইয়া, দুর্ব্বল ও দরিদ্র সমাজকে প্রপীড়িত করিতেছে, একথা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আজকাল শারীরিক রোগ চিকিৎসকের ন্যায় সামাজিক রোগ চিকিৎসকের সংখ্যাও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর বৈদ্য প্রায় সকল ঘরেই দুই একজন করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুচিকিৎসক নহেন, রোগ নির্ণয় করিয়া, উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা বিষয়ে অনেকেই অপটু। অপিচ, ব্যবস্থার দোষে অনেক সময়, তাঁহাদের চিকিৎসায় রোগ প্রশমিত না হইয়া, বরং অধিকতর উগ্র হইতেছে। রোগের অবস্থা দিন দিন যেরূপ সাঙ্ঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে, অচিরে উপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ

চিকিৎসক না লাগাইলে ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দু-কুলের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দেশের সকলকে মিলিত হইয়া এই সাঙ্ঘাতিক অনিষ্টোৎপাদক পুত্র-পণ-প্রথা দেশ হইতে দূর করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। বড় বড় প্রবন্ধ লিখিলে বা রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেই সমাজ সংস্কার হয় না এবং এই কার্য্য দুই চারি বা দশ জনের সম্পাদ্যও নহে; ইহাতে দেশের ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র সকলেরই সহানুভূতি চাই। পুত্র-পণ-প্রথার অপকারিতা যখন সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন প্রত্যেকেই এই অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ভগবান্ এই সদভিপ্রায় সংসাধন পক্ষে দেশের লোকের সহায় হউন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

ধনগৌরব-স্পৃহা।

পৃথিবীর প্রধান রব,—টাকা, টাকা, টাকা। চরিত্রের আদর, ধর্ম্মের আদর, পুণ্যের আদর, নীতির আদর এখন কল্পনা-গঙ্গায় বিসর্জ্জিত, এখন উঠিতে বসিতে, যাইতে শুইতে, মানুষ কেবল টাকা টাকা করিয়া অস্থির। টাকার জন্য দোকানদারী করিয়া মানুষ অন্যকে ভুলায়, টাকার জন্য কত প্রকার অত্যাচার করে! টাকার জন্য মানুষ অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, প্রতিশ্রুতি অবহেলা করে, পরস্ত্রী হরণ করে, পাপকে প্রশ্রয় দেয়, দুর্নীতির সমাদর করে;—অথবা কি কুকার্য্য যে না করে, জানি না। টাকা মানুষের জপ তপ, যোগ তপস্যা—মানুষের সকলই। পৃথিবীতে ধনীর আদর সর্ব্বত্র, সকলের উপরে। খুব বড় বড় ধার্ম্মিক দেখিয়াছি—তাঁহারাও ধনীর সাত খুন মাপ করিয়া দ্বারের ভিখারী; যোগী সাধক অনেক দেখিয়াছি, তুমি দরিদ্র, মরিলেও তোমার খোঁজ লইবেন না, কিন্তু তাঁহারা সদা ধনীর গৃহে, মধু-আকৃষ্ট পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায়, আসিতেছেন, যাইতেছেন। ধার্ম্মিকগণের নিকটই যখন সাম্য, নীতি, ধর্ম্ম উপেক্ষিত, তখন আর কোথায় তাহার আদর দেখিতে পাইবে? পৃথিবীর অগণ্য নরনারী তোষামোদ, স্তুতি, বন্দনা লইয়া, দিবা রাত্রি, জয়োল্লাসে গৃহপূর্ণ করিয়া, ধনীর উপাসনা করিতেছেন। টাকার মায়ায়, টাকার ছায়ায়, টাকার মোহে, টাকার স্বপ্নে জগৎ আত্মহারা, দয়ামায়া-হারা, প্রেম-পুণ্য-হারা। টাকা, টাকা, টাকা—দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত মানুষ টাকার অন্বেষণে ব্যস্ত! কি নিদারুণ টাকার প্রলোভন!

জগতের সাম্যাবতারগণ,—বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য, খ্রীষ্ট এবং পার্কার, রুসো এবং ম্যাট্‌সিনি, পৃথিবীর ধন-গৌরব-স্পৃহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য আজীবন কঠোর সাধন এবং আজীবন তীব্র আন্দোলন ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও, পৃথিবী চিরদিন ধন-মদে মত্ত, আত্মহারা, অসংযত, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত। ধন যার, রাজ্য তার, মান তার, যশ তার, বুদ্ধি তার, বিদ্যা তার, সবই যেন তার;—পৃথিবী তাহার করতলস্থ। তার কথায় চন্দ্র সূর্য্য না উঠিলেও, রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়; বায়ুর গতি প্রবাহিত না হইলেও, অগণিত লোকের মনের গতি প্রবাহিত হয়; নদীতে উজান না বহিলেও, পুণ্যের স্থলে

পাপ, ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম সমাজে প্রশ্রয় পায়, আদর পায়। সহস্র চেষ্টাতেও, কোন যুগে, স্থায়ীরূপে, ধন-গৌরবের স্থলে পৃথিবীতে চরিত্র-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সহস্র চেষ্টাতেও, মানুষ নীতিজ্ঞের আদর, পুণ্যবানের আদর, ধার্ম্মিকের সম্মান সংরক্ষণের জন্য ধনীকে ভুলিতে বা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। টাকায় যাহার ভাণ্ডার পূর্ণ, শত সহস্র পাপে নিমগ্ন হইলেও তাহার অপরাধ গণ্য নয়;—ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, বিশ্বাস-ঘাতকও টাকার সাহায্যে সমাজে ধার্ম্মিক চূড়ামণি, বিচক্ষণতার শিরোমণি বলিয়া পূজিত। তুমি বড় শক্ত মানুষ, একদিন অপরাধীর অপরাধ লইয়া সমাজে খুব তোল-পাড় করিতে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি, তুমিও বিশ্বাসঘাতকের পদলেহন করিতে ছুটিতেছ ও তাহাতেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছ! এইরূপে দেখিতেছি, শক্তশক্ত মানুষকেও টাকায় ক্রয় করিয়া, ধন-গৌরবের বিজয় ডঙ্কা বাজাইবার জন্য, দিন দিন দল পুষ্ট হইতেছে। সম্পাদক বল, লেখক বল, টাকায় এ জগতে সকল-কেই ক্রয় করা যায়। যোগী বল, ঋষি বল, টাকার আকর্ষণে এ জগতে সকলেই প্রলুব্ধ। টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দের ন্যায় মধুর শব্দ বুঝি এ জগতে আর নাই! টাকায় সমালোচনা মিলে, টাকায় ধার্ম্মিক নাম ক্রয় হয়। টাকায় মানুষ বিবেকের পবিত্রধ্বনি উপেক্ষা করিয়া মত-বিরুদ্ধ প্রস্তা-বের পোষকতা করে। পৃথিবীর প্রধান রব,—টাকা, টাকা, টাকা!

ধনগত বৈষম্য পৃথিবীর মহা অনিষ্টের মূল, একথা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে কেহই এই মহা অনিষ্টকর বৈষম্যের হাত এড়াইতে পারেন না। বর্ণগত বা জ্ঞানগত বৈষম্যেও পৃথিবীর অপ-কার না হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু ধনগত বৈষম্য, সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যই বুঝি বা শ্রীচৈতন্য এবং খ্রীষ্ট, ধনীদিগের সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন—

"Then said Jesus unto his disciples, Verily, I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven." Matt. chap. xix, 23.

"And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God." Matt. chap. xix. 24.

"And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!" St. Luke, chap xviii. 24.

"For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God." St. Luke, chap. xviii. 25.

ভাবার্থ এই, "ধনী ব্যক্তিরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে অধিকারী নহে। সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া (কেহ কেহ বলেন, পার্শ্ব দ্বার দিয়া) উষ্ট্রের গমন করাও সম্ভব হইলে হইতে পারে; কিন্তু ধনীর স্বর্গ-রাজ্যে গমন তদপেক্ষও কঠিন।" কি তীব্র মন্তব্য! কেহ খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণে অভি-লাষী হইলে, অগ্রে ধনঐশ্বর্য্য বিক্রয় বা বিত-রণ করিয়া আসিতে বলিতেন।

"And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?" Matt. chap. xix, 16.

*　　*　　*　　*　　*

"The young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up: what lack I yet?" Matt. chap. xix 20.

"Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go *and* sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven and come and follow me." Matt. chap. xix. 21.

ভাবার্থ এই—"এক ব্যক্তি খ্রীষ্টকে আ-সিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি করিলে

আমি অনন্ত জীবন পাইতে পারি? অনেক উপদেশ প্রদানের পর খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য পাইতে হইলে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও এ ভাব দেখা যায়। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র রায় শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ধনীর সহিত কথোপকথনেও ধর্ম্মের ব্যত্যয় হয়, তিনি এই কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ও শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন আমরা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে ;
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'
প্রভু কহে 'কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ;
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়'।
সার্ব্বভৌম কহে 'এই প্রতাপ রুদ্র রায় ;
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।'
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ ;
'সার্ব্বভৌম! কহ কেন অযোগ্য বচন ?
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন ;
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।'
সার্ব্বভৌম কহে 'সত্য তোমার বচন ;
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম'।
প্রভু কহে 'তথাপি রাজা কালসর্পাকার ;
কাঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ;
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে।"

জগদীশ্বর বাবুর সংস্করণ—মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ, ২৪৪--২৪৫ পৃষ্ঠা।

খ্রীষ্ট যেমন শিষ্যদিগকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বলিতেন, শ্রীচৈতন্যও তদ্রূপ করিতেন। সনাতন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, একখানি ভোট কম্বলের মায়া ছাড়িতে পারিয়াছিলেন না ; সে জন্য শ্রীচৈতন্য কত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যথা —

"সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ;
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার।"

ঐ মধ্যলীলা, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

* * * *

এত বলি কাঁথা লৈল ভোট তারে দিয়া ;
গোসাইর ঠাই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া।
প্রভু কহে 'তোমার ভোট কম্বল কোথা গেল ?'
প্রভুপাদ সব কথা গোসাঞি কহিল।
প্রভু কহে 'ইহা আমি করিয়াছি বিচার,
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ;
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ ?
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ'।" ৪৬৫পৃষ্ঠা

মহাত্মা বুদ্ধদেবের কথা সকলেই জানেন। তিনি সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য, অতুল ঐশ্বর্য্য-মায়া তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অহিংসা পরমধর্ম্ম, এই উদার মত তিনিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার শিষ্যদিগের (শ্রমণ) তদানীন্তন কালের জীবন তাঁহার মতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। *

যে ধন ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি সাধকগণ এক বাক্যে এত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই

---

* "তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকাল স্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন,—"আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।" বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য, ৮ পৃষ্ঠা।

টাকা না হইলে মানুষের একদিনও চলে না। বিনিময়ের মূল—অর্থ। বিনিময় ভিন্ন রাজ্য, সমাজ, পরিবার কিছুই সংরক্ষিত হয় না, কিছুরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না। অথচ ধার্ম্মিকগণ ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কেন পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন, ইহার মীমাংসা কোথায়?

এই গুরুতর প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, সমাজের অবস্থা বুঝাইবার জন্য, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য নামক পুস্তকের প্রথম হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সংসারে একটী শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক" এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্যজ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর, নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেননা তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্ন সহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবন পথের ছায়া স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দ-কুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড়লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

"বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দুক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা, রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

"অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাস গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাসের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালির কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাস বাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার। তুমি যে হও, দুইহাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ -সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম কর।"

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।"

অর্থগত বৈষম্যের দরুণই আমেরিকার দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন, ইহারই জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লব। ইহারই বিনাশের জন্য শাক্যসিংহের উদ্ভব। কিন্তু সে সকল কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনার এ সময় নয়। এই অর্থগত বৈষম্য দূর করিবার জন্য, ধনীর ধনগৌরব ধ্বংসের জন্যই ইউরোপে কমুনিজম, সোসিয়ালিজম ও নিহিলিজমের সৃষ্টি। ধরা যেন ধনীদিগের গৌরব কিছুতেই সহিতে পারেন না! তাই মধ্যে মধ্যে জগতে সাম্যাবতারগণের উদ্ভব হই-

আছে। কিন্তু সে সকল কথারও বিস্তৃত বিবরণের এ স্থল নহে।

ধন-স্পৃহা মানুষের বড় সর্ব্বনেশে বৃত্তি। দুই মুষ্টি অন্ন হইলে যে মানুষের দিনপাত হয় এবং দশ মণ কাষ্ঠ হইলেই যাহার দেহের পরিণাম চিতাতে সমাহিত হয়, তাঁহার এত ধন-স্পৃহা কেন? বুঝিবা কেবল গরীবের প্রতি অদম্য অত্যাচারের দুর্জ্জয়প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য! এত ধন-স্পৃহা কেন যে, তার জন্য ধর্ম্ম ডুবাইতে হইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্যথা করিতে হইবে, প্রেমের বন্ধন, কাটিয়া পরিবার, আত্মীয় বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে;—পাপের পশরা মাথায় বহিতে হইবে—ঘৃণা নিন্দাকে তুচ্ছ করিয়াও অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অকার্য্য করণ, অ-রূপ দর্শন করিতে হইবে? দু'মুষ্টির জন্য কেন গালাগালি তিরস্কার মাথায় বহিয়া, পুষ্প-বর্ষণ-ধারণের ন্যায়, পাদুকার আঘাত পৃষ্ঠে বহিয়া পরের দাসত্ব করিতে হইবে? কেন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কেন জাল জুয়াচুরি করিতে হইবে? কেবল দু'মুষ্টির সংস্থান!! তার জন্য কখনও মানুষ এত কলঙ্কের বোঝা বহিত না!! না—কখনই দু'মুষ্টির জন্য নহে। ধন-স্পৃহা মানুষকে আক্রমণ করিলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান ভুলে, দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন কাটায়। যাহারা পেটের দায়ে অন্যের ধন চুরি করে, তাহাদের বরং কেহ মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ধন-স্পৃহাতে মানুষ যখন বন্ধুর বুকে ছুরি বসাইয়া ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, পিতৃহন্তারূপে সমাজে ভক্তির বিজয় নিশান উড়ায়, অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মীয়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তখন আর মার্জ্জনা নাই। ধনস্পৃহাতে মানুষের সৎগুণ রাশি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়; কেবল টাকা, কেবল টাকা, এই চিন্তা জীবনের জপমালা হয়। দিবারাত্রি মানুষ ইহারই অন্বেষণে ফিরিতে থাকে; আর কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, কেবল টাকার অন্বেষণ! ৯৯র ধাক্কায় সমস্ত সংকার্য্যের ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়। দারুণ ধন-পিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। এক টাকা পাইলে আর ৯৯৲ হইলেই শত পূরিবে, অথবা ১৲পাইলে আর ৯৯৯৲হইলেই সহস্র পূরিবে, এই চিন্তায় সদা বিভোর থাকে। আত্মীয় বন্ধু সকলই পর হয়, আপন হয় কেবল টাকা। টাকা জপ, টাকা তপ। একটী টাকা দান করিতে বা দুইটী টাকা দেনাশোধ করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, দারুণ চিন্তা হয়, হায়, যদি ঐ একটী না যাইত, আর ৯৯টী হইলেই শত পূরিত! দানের সময় হৃৎকম্প, দেনা শোধের সময় দারুণ বজ্রাঘাত!! টাকা পাইলে গাড়ী ঘোড়ায় চড়িব, নৃত্য গীতে মাতিব, বিলাসের উপর বিলাস ঢালিয়া ইন্দ্রিয় সুখের চরিতার্থ করিব, ধন-স্পৃহার পরিণতি ইহাই! ধনের কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ স্বর্গের কথা, পরলোকের কথা বিস্মৃত হয়, সংসারের সুখকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে—ঈশ্বরের স্থলে আত্ম-সম্মান ও আত্মপূজা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়। টাকায় আসক্তি বৃদ্ধি, আসক্তিতে মোহ বৃদ্ধি, মোহ বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম বুদ্ধির নাশ, ধর্ম্মবুদ্ধির নাশে অহঙ্কারের অভ্যুদয়। অহঙ্কার মানুষকে আক্রমণ করিলেই মানুষ অন্ধ হয়, সদসৎ বৃত্তি ভুলিয়া যায়, বিবেককে বলি দেয়। অহঙ্কারের ন্যায় এমন অন্ধত্ব জন্মাইবার জিনিস এই পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। অহঙ্কারের অভ্যুদয়ে যখন মানুষ বিবেককে বলি দেয়,—তখন মানুষ স্বপ্ন দেখে—"আমার ন্যায় কেহ নাহি ত্রিভুবনে।" অহঙ্কারী অন্য মানুষের ক্ষমতা স্বীকার করে না, অন্যকে বড় দেখিতে পারে না, অন্যের দর্প খর্ব্ব করিতে সে সদা

লালায়িত। সুতরাং অহঙ্কারের পরই পরশ্রী-কাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষে মানুষ পুড়িতে থাকে, পরনিন্দা তাহার শ্রীমুখের ভূষণ হয়, ক্রোধ তাহার নিত্য সহচর। ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মানুষকে আক্রমণ করিলে মানুষের মঙ্গলের পথ, কল্যাণের সোপান রুদ্ধ হয়। তখন মানুষ মহামোহে পড়ে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়।* তখন মানুষ ঘোরতর অত্যাচারী হয়, নৃশংস হয়,—নরহত্যা করে, ব্যভিচার করে,বিশ্বাসঘাতকতা করে। তখন মানুষ এতই নীচগামী হয় যে, অন্যের প্রতি অত্যাচর করিয়া উল্লাসে নৃত্য করে। কথিত আছে, নীরো নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণা-বাদন পূর্ব্বক রঙ্গ দেখিতেন। কিন্তু দর্পহারী ভগবান্ মানুষের এ দর্পও চূর্ণ করেন। মৃত্যু তাহার সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য হরণ করে, রোগ শোক তাহাকেও আশ্রয় করে,কাল তাঁহার অহঙ্কারকেও চূর্ণ করে। এ হেন লোক নেপোলিয়ন হইলে সেণ্টহেলেনায় বন্দী হয়,† সিজর হইলে ব্রুটাসের তীক্ষ্ণ অসিতে জীবন বলি দেয়,সিরাজউদ্দৌলা হইলে মিরণের হস্তে নিহত হয়,ষোড়শ লুই হইলে সিংহাসনচ্যুত হইয়া প্রাণে মরে। এইরূপ কত শতসহস্র অহঙ্কারী, পরস্বাপহারী, অত্যাচারী মানবের পতন হইয়াছে, মানব তাহা ধারণা করিতেও পারে না। তবুও মানবের শিক্ষা হয় না, তবুও মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা,অত্যাচারে দিক্‌ভ্রান্ত, পরধন-লুণ্ঠনে ক্ষিপ্র-হস্ত। সাধারণতঃ চৌদ্দ আনা লোকেরই এই দশা। যাঁহাদের এরূপ হয় না, তাঁহারা নরদেবতা; তাঁহারা আধুনিক বঙ্গভূমির বিদ্যাসাগর,তারক প্রামাণিক, মহারাণী স্বর্ণময়ী; প্রাচীন ভারতের দাতাকর্ণ, জনক ঋষি এবং শ্রীরামচন্দ্র। সেরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। বিরল বলিয়াই খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেব বুঝিবা বড়ই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ধন যদি এতই অপকারী, তবে বিধাতা মানুষকে ধনের অধিকারী করেন কেন? কেহ কেহ এইরূপ কথা বলেন। পৃথিবীর অত্যাচারের বিষয় একদিকে চিন্তা করিলে এবং একজন মানুষের কত সামান্য জিনিসে দিনপাত হয়,ভাবিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া আর উপায় নাই যে, বিধাতা মানুষকে ধনের অধিকারী করেন, কেবল দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিতে। তিনি কাহাকে দাতা করিয়া,কাহাকেও গ্রহীতা করিয়াছেন,কেবল প্রেম-প্রতিষ্ঠার জন্য। কোন কোন দেশের বিশেষের জিনিস,অন্য দেশে সচরাচর দেখা যায় না। বিধাতার এরূপ বিধান যেমন বিনিময়ের ভিতর দিয়া মানবপরিবারে প্রেম-বিস্তারের জন্য, অথবা মানুষকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য; ব্যক্তি বিশেষের ভাণ্ডারপূর্ণ করিয়া কাহারও ভাণ্ডার শূন্য করিয়া রাখিয়াছেন,সেইরূপ, প্রেমবিস্তারের জন্য। তিনি কাহাকেও দাতা করিয়াছেন, কাহাকেও গ্রহীতা করিয়াছেন। লক্ষ্য সকলেরই এক। কে বড়,কেবা ছোট? এক প্রেম-সিংহাসন-তলে সকলে উপবিষ্ট।

* ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
গীতা, ২য় অধ্যায় ৬৩।

† "Bonaparte was singularly destitute of generous sentiments The highest-placed individual in the most cultivated age and population of the world,—he has not the merit of common truth and honesty. * * He is a boundless liar." * * "All passed away, like the smoke of his artillory, and left no trace" * * "It was the nature of things, the eternal law of the man and the world, which balked and ruined him and the result,in a million experiment,would be the same. Every experiment, by multitudes or by individuals hat has a sensual and selfish aim, will fail." *Emerson.*

সকলেরই জীবন ধারণ এক মুষ্টিতে, সকলেরই পরিণাম ঐ শ্মশানের মাটী বা ছাই, বড় ছোট এ ভেদ-বোধ-অনলে কেন ভাই দগ্ধ হও ? কে মুনিব, কে বা ভৃত্য, কে রাজা, কেবা প্রজা ? সকলেরই পরিণাম এক, সকলেরই লক্ষ্য এক, বিভিন্নতা বোধ কেবল চক্ষের ধান্দা মাত্র। অথবা সকল বিভিন্নতা, অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া, পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে, সেই লক্ষ্য ধামে লইয়া যাইবার জন্য।

মানুষকে ধন দিয়াছেন যদি বিধাতা, তার ধারে দয়াও দিয়াছেন ; কিন্তু মানুষ ক্রমে-ক্রমে ধনস্পৃহাতে আত্মহারা হইয়া, দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অর্থের দাসানুদাস হইয়া পড়ে। অর্থের দাসত্বে যখন মানুষ আপনাকে বিক্রয় করে, তখন মানুষ পশু। পশু অপেক্ষাও পশু। এবম্বিধ বড় লোকের অত্যাচারে যখন জগৎ উচ্ছন্ন যাইতে বসে, তখন বিধাতা আবার তাহাদের পতন আনয়ন করিয়া জগতে সাম্য সংস্থাপন করেন। টাকা পাইয়া যে টাকার সদ্ব্যবহার করে না, দীর্ঘকাল কখনই তার ঘরে টাকা থাকে না। লক্ষ্মীর আসন সদা চঞ্চল। আজ এখানে, কাল সেখানে। বিধাতা অবসর অনেককেই দেন, কিন্তু যে অপব্যবহার করে, তাহার নিকট হইতে তাঁহার কৃপার দান প্রত্যাখ্যান করেন। উপকথায় বলে, ধনের মাইট ঘরে আসিলে, কদাচার করিলে, তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায় ও সে স্বস্থানে প্রস্থান করে। কথাটা উপকথায় ব্যবহৃত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সদ্ব্যবহার না পাইলে ধনৈশ্বর্য্য এক স্থলে থাকে না। এখানকার ধন ওখানে, তথাকার ধন এখানে, ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রতিনিয়তই যেন ছুটাছুটি করিতেছে। কত সহস্র রাজা পথের ভিখারী হইতেছে, কত সহস্র দরিদ্র রাজ-সিংহাসনে বসিতেছেন। সম্পদ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অনেকেই, ভোগ দখল করিতে পারে, অতি অল্প লোক। মহা প্রতাপান্বিত রাজা রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ রাজভবন আজি কীর্ত্তিনাশার গর্ভে, তাঁহার বংশধরগণের দিনপাতেও এখন কষ্ট ; ধনগৌরবে স্ফীত, তদানীন্তন কালের ধনকুবের জগৎ শেঠের ঐশ্বর্য্যসম্পদ পূর্ণ ভবন এখন ভাগীরথীর ক্রোড়ে,—একটী প্রাচীন মসজিদ্‌ ভিন্ন সিরাজের ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্রও নাই ; সকলই কালের ধ্বংস-কবলে। আধুনিক কালের কথাই বলিতেছি। প্রাচীন কালের কীর্ত্তি-কলাপ ত সকলই কালের গর্ভে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, কত কত রাজা জমীদারের ধন গৌরব, প্রহেলিকাবৎ, বিদ্যুৎবৎ বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে ; তাঁহাদের বংশধরগণের দিনপাতেও এখন কষ্ট। তুমি ধনগৌরবে স্ফীত হইয়া অহঙ্কারে মেদিনীকে যে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতেছ, তোমার এই গাড়ী ঘোড়া, হ্যাটকোট, মুষ্টিমেয় দশ বিশ হাজার টাকা, ধূলির ন্যায় সময়ের অদম্য ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া যাইবে, কে জানে ? তোমার ধন তোমার শ্মশানের সহায় নয়, তোমার ঐশ্বর্য্যসম্পদ মৃত্যুময়, নশ্বর জগতে কিছুতেই তোমাকে মৃত্যু, ধ্বংস, শেষ দশা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে কিসের অহঙ্কার ভাই তোমার ? তুমি দুগ্ধ-ফেননিভ সুখশয্যায় শয়ান থাকিয়া, কল্পনার চক্ষে দেখিতেছ, এবং ভাবিতেছ, তোমার সুখের শেষ নাই। মহামূর্খ তুমি ! দুঃখীর হৃদয়ে বজ্র হানিয়া তুমি তাহার কুলবধূকে অপহরণ করিতেছ, ঘটী বাটী, ঘর বেচিয়া আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছ ; শত শত নিরন্ন ব্যক্তিকে

নির্ব্বাসন করিতেছ বা হত্যা করিতেছ, এবং উল্লাসে, টাকার বলে ধর্ম্মাধিকরণকে, বিচারকে পরাস্ত করিয়া ভাবিতেছ, তোমার দুর্জ্জয় প্রভাব চিরদিনই সমান থাকিবে! তোমার ন্যায় মূর্খ আর কে? নীরোর ভীষণ অত্যাচার চিরদিন পৃথিবীতে সমানভাবে থাকে নাই, সিরাজেরও পতন হইয়াছে,—কত সহস্র সহস্র ব্যক্তির অহঙ্কার বিধাতা চূর্ণ করিয়াছেন! তুমি আজ ঐশ্বর্য্য-অট্টালিকায় বসিয়া, পোষাক পরিচ্ছদের গরিমায় মাতিয়া মলিন বসনাবৃত দরিদ্র বন্ধুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, রাজৈশ্বর্য্যের মায়ায় পড়িয়া বড় লোক সঙ্গী পাইয়া, উল্লাসে দিক্‌বিদিক, কাণ্ডাকাণ্ড শূন্য হইয়া ফিরিতেছ; দিনান্তে একবার মনে ভাবিও যে, এদিন চিরস্থায়ী নহে,—আবার ঘোর দুর্দ্দিন আসিবে, আবার মহা অন্ধকার আসিবে, আবার ভীষণ শোকসিন্ধু উথলিবে! বিধাতার রাজ্যে এ সকল ক্ষণস্থায়ী অভিনয় মাত্র। তাঁহার প্রদত্ত ধন জন, বন্ধু সম্পদ পাইয়া যে তাহার সদ্ব্যবহার না করে, কিছুদিন পর, নিশ্চয় সে সকল তাহাকে পরিত্যাগ করিবে! সম্পদের বন্ধু, বসন্তের কোকিল; দুঃখ দুর্দ্দিনময় দারুণ শীতে তাহারা কাছেও ঘেসিবে না। কত শত উদাহরণ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে,—কতশত প্রতিপালকের বক্ষে, অসময়ে, দুর্দ্দিনে, বন্ধুরূপী সয়তানেরা আঘাত করিয়া পিশাচের অভিনয় করিতেছে। স্থিরচিত্তে সকলেরই চিন্তা করা উচিত, কেন আছি, কোথায় চলিয়াছি, কেন এই সকল সুখ সম্পদ পাইয়াছি? চিন্তা করিয়া, ভক্তিভরে সকলেরই বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করা উচিত এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া, অকাতরে, অসহায় নরনারীর সেবার্থ অর্পণ করা উচিত।

উলঙ্গ অবস্থায় মানুষের পৃথিবীতে আগমন, শেষে আবার উলঙ্গ অবস্থাতেই গমন। মানুষের সঙ্গে ধন ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভব কিছুই যায় না। যাঁহারা বিশ্বাসী, ভক্ত, প্রেমিক, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই অটল, অচল, অপরিবর্ত্তিত। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী নির্ব্বিকারচিত্ত ছিলেন; সদা উলঙ্গ থাকিতেন, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, তাঁহার নিকট সমান; রাজভোগ ও পুরীষ তাঁহার নিকট তুল্য ছিল। তৃণশয্যা ও রাজশয্যা, উভয়কে যে সমান চক্ষে দেখিতে পারে, সে-ই ধন্য! ঘোর দারিদ্র্যে ও মহা সম্পদ-ঐশ্বর্য্যে সমভাবে যে ব্যক্তি বিধাতার চরণ-সেবা করিতে পারে, সে-ই ধন্য! নিরহঙ্কার, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, অনাসক্তচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি কাম্যবস্তু ভোগ করে, কোন অবস্থাতেই আত্মহারা হয় না, সেই ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী।* সংযম যে ধর্ম্মপথের কি মহা সহায়, তাহা যে বুঝিয়াছে, তাহার পক্ষেই ধর্ম্মার্জ্জন সহজ হইয়াছে। যিনি রাগদ্বেষ বর্জ্জিত, যাঁহার মন সংযত, অথবা বশীভূত, তিনি বিষয়ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।† অতি সুন্দর অট্টালিকায় থাকিয়াও যিনি মনে করিতে পারেন যে, তৃণশয্যাও ইহারই তুল্য, তিনিই ধন্য; আর অন্যদিকে তৃণশয্যায় শুইয়াও যিনি বিধাতার কৃপা-শয্যায় শুইয়াছি, মনে করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যাহার নিকট সমান, তিনিই

* বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।
গীতা, ২য় অ, ৭১।

† রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।
গীতা, ২য় অ, ৬৪।

ধন্য! সাধারণ মানবেরা অবস্থার দাস, কখনও দারিদ্র্যে নয়নজলে সিক্ত, কখনও সুখসম্পদে বিলাসের অট্টহাস্যে পরিপূরিত। সাধারণ লোক সাধক হইলেও, দরিদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ধনীর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, কেননা, সেখানে সুখসম্ভোগের খুব প্রত্যাশা। সাধারণ লোক, দারিদ্র্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে দরিদ্রকে ঘৃণা করে, পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণে লজ্জিত হয়, পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে, সম্পদ-শয্যায় শুইয়া বিশ্বপতিকেও ভুলিয়া যায়। সাধারণ লোক, যখন গরীব, তখন ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করে; যখন ঐশ্বর্য্যশালী, তখন শালের চোগা চাপকানে, মকমল কিনখাপে ও হীরা-মুক্তা-জড়িত স্বর্ণে দেহকে বিভূষিত করে! সাধারণ ধনীর গৃহ এবং বারাঙ্গনার গৃহে কোনই পার্থক্য নাই। আর যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, যাঁহারা মহাত্মা বিদ্যাসাগর তুল্য, তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াও সামান্য চটী পায় উড়নী গায়ও দিয়া রাজভবনে, লাট-প্রাসাদে বা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমভাবে বা রাস্তায় অপরিচিত ভাবে গমনাগমন করেন, এবং ঐশ্বর্য্য সম্পদ, সকলই গরীব সেবার জন্য, ইহা মনে ভাবিয়া, সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া বিমল আনন্দ পান! যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহারা সংসারের কালীসিংহের ঠাট্টা বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া, মহাত্মা তারক প্রামাণিকের ন্যায়, নিজে নামাবলী গায়ে দিয়া, শাল বনাত অকাতরে শত সহস্র দুঃখীকে দিয়া তাহাদের শীত নিবারণ করেন। যাঁহারা অসাধারণ, তাঁহারা অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করিয়া, দীনজননী মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায়, সামান্য আতপতণ্ডুলে উদর পূর্ণ করিয়া, মহানন্দে জগতকে অন্ন চিন্তার দায় হইতে রক্ষা করেন। সাধনার মাহাত্ম্য কোথায়? সংসার ছাড়িয়া যে বনে যায়, বনই তাহার আসক্তির বস্তু হইতে পারে; সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর হরিণের মায়ার ন্যায়, তাহার মন বনের মায়ায় জড়িত হইতে পারে! সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও যিনি মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া ভাবিতে পারেন যে, আমার যেন কিছুই নাই, আমি কিছুই নই, সকলই বিধাতার, তিনিই প্রকৃত সাধক। গৈরিক পরিলে যদি বৈরাগ্যের উদয় সম্ভব হইত, এজগতে সকলেই বৈরাগ্য সাধন করিতে পারিত। বৈরাগ্য, অনাসক্তি, নিরহঙ্কার, মনে। মনের উপর যিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী। বাসনাকে সংযত করিতে যিনি পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধক। সংযম, সাধন, বাহিরের আচার ব্যবহারের সহিত মনের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তবে সিদ্ধি লাভ হয়। সংযম, সাধন, সোজা জিনিস নয়। আত্মাবাসনার উপর যে জন জয়ী, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর। বিধাতা, হস্তস্থিত আমলকীবৎ, তাঁহার করতলস্থ। জটা বিভূতিতেও সাধন হয় না, ধনৈশ্বর্য্যেও সাধন যায় না। অবস্থার উপর, ঘটনার উপর জয়লাভ করিলেই মনুষ্যত্ব জন্মে। জনক রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন, পুণ্ডরীক ধনী হইয়াও ভক্তচূড়ামণি বলিয়া আদৃত হইতেন। * আত্ম-বাসনা-নিবৃত্তি যাঁহার হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই অবস্থা ও ঘটনা জয়ে সক্ষম। সকল অবস্থা ও সকল ঘটনায় যিনি অটল, অচল, বৈকুণ্ঠ এবং স্বর্গ, পুণ্য এবং শান্তি, পবিত্রতা এবং প্রেম তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে। দুঃখ এবং সুখ, উভয়কে তিনি বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করেন। দুঃখ পাইলেও তিনি বিষণ্ণ হন

* শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ, মধ্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায় দেখ। জগদীশ্বর বাবুর চৈতন্যলীলামৃত, পূর্ব্বভাগ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ এবং চৈতন্যভাগবত।

না, সুখ ঐশ্বর্য্য পাইলেও তাহাতে মত্ত হইয়া, উল্লাসে নৃত্য করিয়া, অত্যাচার-অনলে জগৎকে দগ্ধ করেন না। তিনি কামনা-বর্জ্জিত মহাবীর, তিনি অহঙ্কার-নির্ব্বাণ মহাকর্ম্মী। তিনি অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রাজ্যের দাসানুদাস।

এ সাধন বড় কঠোর সাধন। সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই সাধু মহাজনেরা এ পথ পরিত্যাগ করিতে বলেন। অহঙ্কারকে, কামনাকে, ভোগ-স্পৃহাকে—ইন্দ্রিয়, রিপু ও বৃত্তিদিগকে জয় করার ন্যায় দুরূহ কাজ আর কিছুই নাই। অনেকেই এ স্থলে অকৃতকার্য্য। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন,—সকল সাধনার বিঘ্ন ঘটায়, কামিনী ও কাঞ্চন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যও এই কথা বলিয়াছেন, খ্রীষ্টও এই কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্ট বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। সে কথা সত্য নহে। তিনি বাসনা ও ভোগস্পৃহা-নির্ব্বাণের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, সে সকলই অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন।*

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য, উভয়ে সমজ্ঞান-সাধন বড়ই কঠিন। কিন্তু তাহা না হইলেও কিছুই হইল না। যাঁহারা ধার্ম্মিকতার ভাণ করেন, তাঁহাদের নিকট এতটুক আশা করা অন্যায় নহে যে, তাঁহারা অন্তরে কতকটা সংযত হইবেন। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, ধার্ম্মিকতার অর্থ সেখানে স্বতন্ত্র। খাও, দাও, বক্তৃতা করিয়া সুখে বেড়াও, ধর্ম্মের অর্থ সেখানে এইরূপ। "ঋণ করিয়া ঘি খাও" গোছের চার্ব্বাকী মত এখন ষোল আনা সমাজকে অধিকার করিতেছে। ধার্ম্মিকতা এখন ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, ধনে! ধনগৌরবে পৃথিবী এখন মাতোয়ারা! কাকেই বা সংযমের কথা বলি, কেই বা শুনে! বিধাতাই জানেন, পৃথিবীর উদ্ধার কবে হইবে!!

গীতার প্রামাণ্য। (৪)

গীতা যে অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে শাণ্ডিল্য-প্রদত্ত প্রমাণের উপসংহার করা যাইতেছে।

(১) ভগবদ্বাক্যের প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দুইটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রদান করিয়াছি। প্রথমে আমরা দেখাইয়াছি যে, গীতা স্থূলরূপী ভগবানের বাক্য। স্থূলরূপী ভগবানের বাক্য বলিলে গীতা পরতঃ প্রমাণে গ্রাহ্য। ভগবান্ যে স্থূলরূপ ধারণ করিতে পারেন, তাহা সম্ভবনীয় বলিয়া সম্ভব যুক্তিতে স্বীকার্য্য; আর তিনি যে বাস্তবিক সেই স্থূলরূপ ধারণ করিয়া গীতোপদেশ দিয়াছিলেন, যাঁহারা পৌরাণিক ইতিহাসে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাহা অবিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের নিকট গীতা স্বাভাবিক আপ্তবাক্য। কিন্তু এই স্বাভাবিক আপ্তবাক্য যে যথাযথ নিবদ্ধ (Recorded)

*"And Jesus answering said unto them, the children of this world marry, and are given in marriage:" St. Luke, chap. xx, 34.

"But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:" St Luke, chap, xx, 35.

"And He said into his disciples, Therefore, I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on." St. Luke, chap. xii, 22.

"The life is more than meat, and the body *is more* than raiment." The same. 23.

* * * * *

"But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you." St. Luke, chap. xii, 31.

হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ সিদ্ধ আপ্তবাক্য। যেমন নিত্য আপ্তবাক্যের (বেদের) প্রমাণ সিদ্ধ আপ্তবাক্য, তদ্রূপ স্বাভাবিক আপ্তবাক্যেরও প্রমাণ সিদ্ধাপ্তবাক্য।

তবেই দাঁড়াইতেছে, হিন্দুধর্ম্মে সামান্য জনগণের নিকট শেষ প্রমাণ আসিয়া পড়ে এই সিদ্ধ আপ্তগণের উপর। এখন কথা এই যে, এই সিদ্ধ আপ্তগণ কতদূর প্রামাণ্য ছিলেন? খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি যত ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহাদের বাক্য খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকটও আপ্তবাক্য। সেই আপ্তগণের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্মীয় সিদ্ধ আপ্তগণ কোথায় দাঁড়ান? তাঁহাদের তুলনায় হিন্দু ধর্ম্মের আপ্ত ঋষিগণ যে কত উচ্চে ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই হিন্দু আপ্তগণ শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র হইয়া কেহ বা ভক্তিযোগে কেহ বা জ্ঞানযোগে ব্রহ্মপদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সমদর্শী, নিষ্কামী, বিবেকী, নিঃস্বার্থ, নিস্পৃহ ও পরম পবিত্র দেবতা ছিলেন। তাঁহাদের প্রাকৃত শরীরও আর সামান্য ভোগ শরীর ছিল না। তাঁহারা ইহ জীবনেই কর্ম্মফলের অতীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ পদবাচ্য, তাঁহাদের বাক্যই ভগবদ্বাক্য; তাঁহারাই জগতের গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাদের সহিত তুলনায় কোথায় তোমার জিসস্, মহম্মদ ও জুরয়াস্তর। নিজে বুদ্ধদেবও তত উচ্চতায় যাইতে পারেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে যে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ আছে, তিনি এ বুদ্ধদেব নহেন। যিনি যে পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাঁহাকে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র এই সিদ্ধ আপ্তগণের বাক্য। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র, সকলই ঋষিপূত আপ্তবাক্য। ব্যাস অনেক ঋষিপূত আপ্তবাক্য "নিবদ্ধ" করিয়া গিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্র ব্যাসকর্ত্তৃক নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের শেষ প্রমাণ সুতরাং ব্যাসবাক্য হইয়াছে।

(২) এক্ষণে সূক্ষ্মদর্শী স্বতঃপ্রমাণবাদিগণের কথা। স্বতঃপ্রমাণ, স্বকীয় প্রত্যক্ষ। সূক্ষ্মদর্শিগণের আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষে ভগবান্ কেমন সত্ত্ব মূর্ত্তিতে দেখা দেন, তাহা আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। সর্ব্বদা দেবসংসর্গ করাই পুণ্যপথের প্রথম সোপান। এই দেব সংসর্গ দ্বিবিধ—দেব-দেবীর সংসর্গ এবং দেবতুল্য সাধুগণের সংসর্গ। সর্ব্বদা দেব দেবীর অর্চ্চনা করিতে করিতে, এবং সাধু সঙ্গে থাকিতে থাকিতে, ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তগণের উপাসনা ক্রমে ক্রমে মানস-পূজায় পরিণত হয়। বহির্ব্বিষয় ক্রমে অন্তরস্থ হয়। তখন সংযমী ভক্ত শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনাদির সহায়তায় ক্রমে শারীর শৌচ এবং তৎপরে আভ্যন্তরিক চিত্তশুদ্ধি সাধন করেন। চিত্তশুদ্ধি সাধন হইলে গুরূপদেশানুসারে উপাসকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন—সাকার এবং নিরাকার উপাসক। কাপিল সাংখ্যে একেবারেই নিরাকার উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য, বেদান্ত এবং গীতামতে প্রথমে সাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

সাকার উপাসক, সূক্ষ্ম সগুণ ব্রহ্মকেই হৃদয়ে ধারণ করেন। বিশ্বজ্ঞান হইতে সগুণ ব্রহ্মের ভাবনা ও ধ্যান ঘনীভূত হয়। সগুণ ব্রহ্ম কি? যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। সগুণ, নির্গুণের সূক্ষ্ম রূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলিতেছেন:—

"যো নির্গুণঃ সো নির্লিপ্তঃ শক্তিভ্যো নহি সংযুতঃ।
সিসৃক্ষুরাশ্রিত শক্তৌ নির্গুণঃ সগুণোভবেৎ॥"

যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের অতীত—নির্গুণ, তিনি নির্লিপ্ততা হেতু শক্তির

সহিত সংযুক্ত হন না; কিন্তু সেই নির্গুণ পুরুষই সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ হইয়া শক্তিকে আশ্রয় করেন ও সগুণ হয়েন।

শৈবদর্শন দেখাইয়াছেন, ভগবানের প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু তাঁহার শাক্ত শরীর আছে।

এই মহান্ সূক্ষ্ম শক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ বলিয়া "সত্যং শিবং সুন্দরং।" তিনি চিৎ-স্বরূপ রূপে "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।" তিনি জ্ঞানময়রূপে লীলাময়; কারণ, জ্ঞান কখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। সংসাররূপ লীলায় ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি সদানন্দময়। যিনি শিবময়, সদানন্দ তাঁহার নিত্যাবস্থা। এজন্য তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ।

বাস্তবিক, কি স্থাবর—উদ্ভিজ্জ ও জড়-দেহ, কি জঙ্গম—প্রাণীদেহ, সকল স্থূল দেহই সূক্ষ্ম শক্তিপুঞ্জের সমষ্টি। যাহা প্রাণীর কার্য্য, উদ্ভিজ্জের কার্য্য, এবং জড়ের কার্য্য তাহা তদন্তর্গত শক্তিপুঞ্জেরই কার্য্য। স্থূল দেহ সেই শক্তি পুঞ্জেরই স্থূলরূপ মাত্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সূক্ষ্ম শক্তিময় দেহ। বিশ্বের এইরূপ সূক্ষ্ম শক্তির ভাবনায় ঈশ্বরধ্যান উদ্দীপিত হয়। আপ্তবাক্য হইতে যে ঈশ্বর-জ্ঞান পূর্ব্বেই লব্ধ হইয়াছে, ভক্তের বিশ্বজ্ঞান সেই ঐশ্বর জ্ঞানকে আরও দেদীপ্যমান করে*। ভক্তি ক্রমশঃ ধ্যানে মগ্ন হয়। ঘনীভূত ধ্যানে সূক্ষ্মশরীরী সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণময় ঈশ্বর † অন্তরে সত্ত্ব মূর্ত্তিতে উদিত ও প্রত্যক্ষীভূত হন। তাই গীতা বলিয়াছেন;

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০ম-১০।

যাঁহারা আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক কেবল আমাকেই ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি, যে উপায় দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান সগুণ ঈশ্বরকে ধ্যানযোগে * প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই মত্ত হইয়া যান, তাঁহাদের সেই পর্য্যন্তই ইহ জীবনে শেষ। কিন্তু অনেকে সেই অবস্থায় উপনীত হইলে মুক্তিকামী হইয়া পড়েন। যিনি মুক্তিকামী হন, তিনি যোগপথে আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। শক্তিমান্‌কে প্রত্যক্ষ করিলে কি তাঁহার আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ হইল? সগুণ, অনন্ত ঈশ্বর যে নিত্য, নির্গুণ পরমেশ্বরের সূক্ষ্ম শাক্ত শরীর মাত্র। যাহা শাক্তশরীরজ্ঞান, তাহা মানসলব্ধ সোপাধিক সাপেক্ষ জ্ঞান। কিন্তু উপনিষৎ বলেন, পরব্রহ্ম নিরুপাধিক ও নিরপেক্ষ।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"—কঠ।

তাঁহাকে বাক্য মন ও চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত

* অনুমান এবং বিশ্বজ্ঞান,—আপ্তবাক্য এবং ভক্তির অধীন হইলে তবে ঈশ্বরধ্যানের সহায়তা করে। এ বিষয় পর প্রস্তাবে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইবে।

† এই সর্ব্বশক্তিমানই পরব্রহ্মের মায়া, যোগীর ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মকারণার্ণব, শৈবের স্বয়ম্ভু, বৈষ্ণবের বিষ্ণু এবং পুরাণের তেত্রিশকোটী দেবতা।

* ধ্যানযোগ দ্বিবিধ। রামানুজ যে ধ্যানের লক্ষণ দেন, তাহা সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান। তৈলধারাবৎ বিচ্ছিন্ন স্মৃতিপরম্পরারূপে যে স্মৃতির আবির্ভাব সর্ব্বদা ঘটে তাহাই ধ্যান। কিন্তু সাংখ্যকারের ধ্যানলক্ষণ অন্য-বিধ। তাঁহার ধ্যান নির্গুণের ধ্যান। তিনি বলেন— "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ"—যখন অন্তঃকরণ বিষয় বা বৃত্তিশূন্য হয়, তখনই ধ্যান হইয়া থাকে।

হওয়া যায় না। যাঁহারা "তিনি আছেন" এই মাত্র জানেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন না।

তিনি "অস্তি" ইতি ধ্রুবতঃ। তিনি মহান্ "অস্তি"স্বরূপ, ইহা নিশ্চয়। তিনি জগতের অস্তিত্বরূপে কার্য্য-ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বরূপে মহান্ কারণব্রহ্ম। তিনি Grand Principle of Existence, তিনি The Eternal I am, তিনি স্থূল জগতের নিত্যত্ব এবং সূক্ষ্ম সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বরের নিত্যত্ব। শুদ্ধ "অস্তি" রূপে তিনি নিরুপাধিক নির্গুণ পরমাত্মা, সেই নির্গুণ নিরুপাধিক পুরুষের উপাসনাই নিরাকার উপাসনা। যোগী মুক্তিকামী হইয়া সেই নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। গীতা সেই নির্গুণের এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ;—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"
১৩অ-৩১॥

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব হেতু তিনি উৎপত্তিহীন, এবং নির্গুণত্ব হেতু তিনি উৎপত্তি ও নাশাদি রূপ বিকারহীন। কারণ, গুণেরই আবির্ভাব এবং তিরোভাবাদি আছে। এজন্য তিনি অনাদি ও নির্গুণ হেতু অবশ্য অব্যয়। তিনি শরীরে অবস্থিত হইয়াও কিছুই করেন না ; যে হেতু তিনি সূক্ষ্ম শাক্তশরীর রূপ মহা কারণের অতীত। তিনি কারণের অতীত হইয়া কার্য্যেরও অতীত। তিনি কার্য্যের অতীত বলিয়া বিশেষ-পরিণাম প্রাপ্ত স্থূল শরীররূপ কার্য্যাতীত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি নির্লেপ।

সগুণ হইতে নির্গুণ কেমন ক্রমে ক্রমে অনুস্যূত হয়, গীতা তাহা বলিতেছেন :—

"অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ।" ১১ অ—৩৭।

তুমি অনন্ত দেবেশ ও জগন্নিবাস—তুমি ব্রহ্মাদিরও জনক, অতএব তাঁহা হইতে গুরুতর—তুমি সৎ অর্থাৎ ব্যক্ত বস্তু—তুমি অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত বস্তু—তুমি সদসৎ হইতেও পরমবস্তু অর্থাৎ তাহারও অতীত।

অন্যত্র :—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

যেহেতু আমি ক্ষরের (কার্য্যব্রহ্ম) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ কারণব্রহ্ম) অপেক্ষাও উত্তম, এই জন্যই আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই নির্গুণের * উপাসনাই প্রধানতঃ ব্রহ্মোপাসনা। যে উপাসনা, জীবকে নির্গুণ ব্রহ্মপদে লইয়া যায়, সেই উপাসনাকেই নিরাকার উপাসনা বলে। সাকার উপাসনা দ্বারা সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু নিরাকার উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মে একীভূত হইয়া সাযুজ্য লাভ হইতে পারে না। উপাসনা দ্বারা নিজে ত্রিগুণাতীত না হইতে পারিলে সেই নির্গুণকে লাভ করা যায় না †। গীতা বলিতেছেন—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"
১৪ অ—২৬।

যিনি একান্ত ভক্তিযোগে আমার ভজনা করেন, তিনিই সত্ত্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

* এই নির্গুণ পুরুষই ব্রহ্ম হইতে পরব্রহ্ম, পুরুষ হইতে পুরুষোত্তম এবং ঈশ্বর হইতে পরমেশ্বর। তিনিই সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ। আত্মার পরমাত্মা। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতেও মহান্।

† এই জন্য পুরাণে বাসুদেব ত্রিভঙ্গ মুরারি। যিনি মায়ারূপ দৈত্য নাশ করিয়া ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণভঙ্গ, ত্রিতাপমোচন, ত্রিসংসারক্ষয় ইত্যাদি) ভঙ্গ করেন, তিনিই "ত্রিভঙ্গমুরারি"।

তবেই গীতা বলিতেছেন—

যে ভক্তিযোগী মুক্তিকামী হন, তাঁহারই নিরাকার উপাসনা অবলম্বনীয়। শাণ্ডিল্যও বলেন যে, ব্রহ্মদর্শন হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে পরাভক্তি হয়, পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। সুতরাং পরাভক্তি জ্ঞান ও দর্শন-সাপেক্ষ। তাঁহার ভক্তিসূত্র এই—

"সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ।"

শুধু শাণ্ডিল্য নহেন, পরমভক্ত নারদও সেই কথা বলেন :—

"সা তু কর্ম্মজ্ঞান যোগেভ্যোপ্যধিকতরা।"

"ফলরূপত্বাৎ।" ভক্তিসূত্র—২৫।২৬।

পরাভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ। সেই জ্ঞান কিরূপ, তাহা নারদ বলিতেছেন :—

অনুভাবয়তি ভক্তান্। ঐ—৮০।

তিনি ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া দেন। এই অনুভবই জ্ঞানচক্ষুলব্ধ "অনুভূতি"।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ এই :—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃম্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদিস্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

১১ স্কন্ধ২০অ—২৯।৩০।

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে (আমাকে লাভ করিয়া) তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বাত্মভূত আমি তাঁহার সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়গ্রন্থি সমস্ত ছিন্ন হয়, সমুদায় সংশয় বিনষ্ট হয় এবং কর্ম্ম সকল ধ্বংস হয়।

ভাগবতের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ভক্তিযোগ ধরিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হন, তাঁহাদেরই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। যে অনুভূতি বা জ্ঞানদৃষ্টিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, সেই জ্ঞানে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল (সংসারাসক্তি বা মায়া) ছিন্ন হয়, ব্রহ্ম ও পরলোক সাক্ষাৎ হওয়াতে পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় সকলের ছেদন হয় এবং যাহাতে কর্ম্মফল সঞ্জাত হয়, এমত কর্ম্মবীজেরও বিনাশ হয় *।

ব্রহ্মসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি অব্যয় পুরুষ, তিনিই জ্ঞানগম্য গোবিন্দ, সেই গোবিন্দ কিরূপে উপাসিত হন?

"প্রকৃত্যাগুণ রূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতঃ।"

সেই গোবিন্দ গুণরূপিণী ও নির্গুণরূপিণী শক্তিদ্বয় কর্ত্তৃক পরিষেবিত।

নন্দকুমার কবিরত্ন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, এই নির্গুণরূপিণী শক্তি রাধা এবং গুণরূপিণী শক্তি সকাম বিলাসিনী সগুণা চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সতত শতচন্দ্রের ন্যায় উদিত থাকিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সগুণ ভাবে দেখিতে ভালবাসিতেন এবং সেই সগুণ রূপেরই অহর্নিশ অর্চ্চনা ও ধ্যান করিতেন। কিন্তু রাধা সেরূপ ছিলেন না; রাধা ভক্তিযোগের প্রকৃত আরাধনা শক্তি। রাধা নিষ্কাম ভাবে নির্গুণেরও আরাধনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি পাপহর হরিকে দর্শন পাইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের রাসে এবং তৎপরে পুরুষোত্তমের মহারাসে মত্ত হইয়াছিলেন। রাধা নির্গুণা হইয়া প্রভাসের জ্ঞান যজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অতএব, ভক্তি শাস্ত্রালোচনায়ও প্রতিপন্ন হয় যে, পুরুষোত্তমকে জানিবার এক-

* ভক্তিযোগেও জ্ঞানের আবশ্যকতা দেখান আমার অভিপ্রায়। সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানসিদ্ধি হয় এরূপ শ্রুত আছে বটে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ নহে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা পরম্পরাক্রমে জ্ঞান লাভ হয়। সাংখ্যকার এইরূপ মীমাংসা করেন ;—"অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব।" সাংখ্যদর্শন—৪অ ২১ সূত্র।

মাত্র উপায় আত্ম-জ্ঞান। ত্রিগুণের অতীত না হইতে পারিলে এই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট না হইলে ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় না। অবিদ্যার বিনাশ হইলে প্রকৃত বিদ্যার উদ্ভব হয়। সেই বিদ্যায় ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানে মায়িক জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে পারে,কিন্তু নির্গুণ পরব্রহ্ম মায়িক জ্ঞানের অতীত।

পরমজ্ঞানে (পরাবিদ্যায়) যখন ব্রহ্ম-দর্শন ঘটে, তখন আত্মরতি জন্মে; তখন আত্মা পরমাত্মায় রমণ করেন। তাই ছান্দোগ্যে আছে :—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখমিত্যাদ্যুপক্রম্যাম্নায়তে। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় - আত্মমিথুন - আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি।"

যিনি ভূমা তিনি আনন্দস্বরূপ। যে ব্যক্তি দর্শন, মনন এবং জ্ঞান দ্বারা আত্মরতি,আত্ম-ক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন,তিনিই আনন্দধামের রাজা হইতে পারেন।

ভক্তিবাদিগণ এই আত্মমিথুন-আনন্দ-জনিত আত্মানন্দকে পরাভক্তি বলিয়াছেন। আত্মার পরমাত্মদর্শন হইলেই এই আনন্দ অনিবার্য্য। সেই জন্য জ্ঞানিগণ সেই আত্ম-রতিকে ভক্তি বলিয়া আর অভিহিত করেন নাই; তাহাকে কেবল আনন্দ বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, আত্মা ও পরমাত্মায় এই-রূপ আত্মরমণ ঘটে। যখন জীব পুরুষো-ত্তমের সাক্ষাৎ পান, গীতা বলেন, তখন জীব সর্ব্ববিৎ হয়েন এবং তখনই আত্মাতে অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য সমুদ্ভূত হয়। সেই জ্ঞানে বেদ শব্দব্রহ্ম রূপে উদিত হন। সুতরাং এই নাদব্রহ্মরূপ প্রণব আত্মার অধরলগ্ন-প্রায়। তাই, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অধরে বেণু সংলগ্ন। সেই গোবিন্দের ধ্যানে ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন।

"শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।"

ব্রহ্মসংহিতা আরও বলেন এই বেণুনাদই ত্রয়ীবেদ।

"অথ বেণু নিনাদশ্চ ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।"

অতএব, গীতা কিরূপ অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্ম প্রত্যক্ষই গীতার প্রমাণ এবং আত্মানু-ভূতিতেই গীতা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য।

এখন কথা এই, যে আত্মপ্রত্যক্ষ গীতার প্রামাণ্য, অজ্ঞানীজনগণের নিকট সেই আত্ম প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কোথায়? যাহারা যোগী নহে, যোগসিদ্ধ প্রামাণ্যে তাহারা বিশ্বাস করিবে কেন? তাহাদের বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। সেই বিশ্বাসের কারণ অনুমান। গীতা সেই অনুমান-মূলক প্রমাণে প্রতিপন্ন। আমরা পর প্রস্তাবে গীতার এই অনুমান-মূলক প্রামাণ্যের আলোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় নগর। (২)

কোতওয়ালী দ্বারের দক্ষিণ দিকে,প্রাচী-রের বহির্ভাগে প্রায় ৭ মাইল বিস্তৃত একটী উপনগর বা সহরতলী ছিল। এই সহরতলী ফিরোজ সাহার নামানুসারে ফিরোজপুর নামে কথিত হইত। বর্ত্তমান ফিরোজপুর গ্রামই এই সহরতলী। এখানে অনেক উৎ-

কৃষ্ট বাটী ও ঘন বসতি ছিল। তাহার কোন কোন বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোক্ত গড়বেষ্টিত স্থানের মধ্য দিয়া আরও কয়েকটী গড় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। বোধ হয়, উহার উপর দিয়া রাস্তা ছিল। মালদহ হইতে শিবগঞ্জ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রাস্তা স্থানে স্থানে ইহার একটীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গড়বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথী তীরে রাজবাটী ও দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই দুর্গ ও রাজবাটী চতুর্দ্দিকে উচ্চগড় ও পরিখায় বেষ্টিত ছিল। গড়ের উপরে এক্ষণে প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে অসংখ্য মর্কট বাস করে। সৈনিক ও বীরপুরুষদিগের বিহার-ভূমি এক্ষণে মর্কটের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ দিকে রাজবাটী ছিল। ইহা প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ও ৮ ফিট প্রশস্ত ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীর এক্ষণে ২২ গজী প্রাচীর নামে খ্যাত। স্থানে স্থানে ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজবাটীর প্রকোষ্ঠাদি কিরূপে নির্ম্মিত ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। কারণ ইহার সমস্ত স্থান এক্ষণে সমভূমি হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত ইষ্টক রাশি ব্যতীত অতীত সমৃদ্ধির আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। দুর্গের ঠিক উত্তরে প্রায় ১॥ মাইল দূরে প্রায় ৬০০ বর্গ গজ বিস্তৃত গড় ও পরিখায় বেষ্টিত একটী স্থান আছে। ইহা পুষ্পোদ্যান বলিয়া কথিত হয়।

এই গড় বেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগে অসংখ্য পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এই সকল পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক লোকালয়ে পরিপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণীগুলি এক্ষণে কুম্ভীরের আবাস স্থান হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, ভাগীরথী নদী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং নগরের সহরাংশ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা যে যে প্রমাণের বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই।—(১) গৌড়নগরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে কতকগুলি জলাভূমি দৃষ্ট হয় এবং অমৃতিনালা হইতে এই সকল জলাভূমি পর্য্যন্ত একটী পুরাতন নদীর শুষ্ক খাতও অনুসন্ধানে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে, ভাগীরথী নদী গৌড়ের উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। কালক্রমে নদী প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তদ্গর্ভস্থ অনেক স্থান বিলে পরিণত হইয়াছে। (২) ষ্টুয়ার্ট সাহেব তৎপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে (৩৫ পৃষ্ঠায়) পারস্য ইতিহাস লেখক মিন্‌হাজ উদ্দীনের লিখিত তবকতনসিরী গ্রন্থ হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "মিন্‌হাজ উদ্দীন ১২৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী নগরে উপনীত হইয়া তত্রত্য সমস্ত দেবালয়াদি পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণাবতীর দুইটী পক্ষ ছিল। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে এই পক্ষদ্বয় বিস্তৃত ছিল। ইহার পশ্চিম ভাগকে ডাল বলিত এবং লক্ষ্মণাবতী নগর এই ভাগে অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মণাবতী হইতে বীরভূমের অন্তর্গত নাগোর পর্য্যন্ত এবং অপর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত একটী উচ্চ রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দশ দিবসের পথ ছিল এবং এত উচ্চ ছিল যে, বর্ষাকালেও

ও যাতায়াতের সুবিধা ছিল।" প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক সময়ে গঙ্গা নদী বা তাহার কোন শাখা বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষের উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল, স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লক্ষ্মণাবতী নগর সংস্থাপনের পরে এ দিকে নদী ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বোধ হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল। তৎপর নদী প্রবাহ শুষ্ক হওয়ার পর লক্ষ্মণাবতী নগর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। নতুবা গঙ্গার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণাবতী নগর অবস্থিত হইলে, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে অর্থাৎ বর্ত্তমান জলাভূমির পূর্ব্বভাগে অবশ্যই কোন নগরের চিহ্ন দৃষ্ট হইত। আর অমৃতির নালা হইতে বাঘবাড়ীর দক্ষিণ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইলে লক্ষ্মণাবতী নগর গঙ্গার পশ্চিম তীরে না হইয়া দক্ষিণ তীরে হইত এবং দ্বারবাসিনী হইতে বল্লাল বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যে গড় বা উচ্চ রাস্তা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, তাহার অস্তিত্ব থাকিত না। দ্বারবাসিনী নামেরও কোন স্বার্থকতা থাকিত না। এই গড় ও দ্বারবাসিনী যে হিন্দু রাজত্ব সময়ে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ২য় প্রমাণ ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত তবকতনসিরীর ভ্রমাত্মক ও অসম্পূর্ণ পাঠের উপর নির্ভর করিতেছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব তবকতনসিরীর সমস্ত কথা গুলি উদ্ধৃত করেন নাই। তাহা হইলে এরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল না। পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত ব্লকমেন সাহেব মেজর রেভাটীর অনুবাদ অবলম্বন করিয়া যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—"লক্ষ্মণাবতী রাজ্য (নগর নহে) দুইভাগে বিভক্ত ছিল এবং উহা গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বভাগকে বারেন্দ্র বলিত এবং দেবকোট নগর এই ভাগে অবস্থিত ছিল। পশ্চিম ভাগকে রাল (অর্থাৎ রাঢ়) বলিত। এই ভাগে লক্ষ্ণুর নগর (লক্ষ্মণাবতী নহে) অবস্থিত ছিল।" ব্লকমেন সাহেব আরও বলেন যে, তিনি মেজর রেভাটীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, তাঁহার নিকটে তবকতনসিরীর যে সকল উৎকৃষ্ট হস্ত লিখিত পুস্তক আছে, তাহার সকল পুস্তকেই এই স্থানে লক্ষ্ণুর লিখিত আছে। এই লক্ষ্ণুর নগর কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ব্লকমেন সাহেব অনুমান করেন, বীরভূম জিলার অন্তর্গত ছিল। (১) তৎকালে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজ্য বারেন্দ্র ও রাঢ় এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এই দুই ভাগ গঙ্গার দুই পারে অবস্থিত ছিল, ইহাই মিন্‌হাজ উদ্দীনের লিখার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। আর ষ্টুয়ার্ট-সাহেব ধৃত পূর্ব্বোক্ত পাঠ শুদ্ধ হইলে বোধ হয়, মিন্‌হাজ উদ্দান বর্ষাকালে এখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহানন্দা নদীর জল ভাতিয়া বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে মোর গ্রাম মাধাইপুর একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। ইহা বারেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। মহানন্দার এক দিকে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও অপরদিকে লক্ষ্মণাবতী নগর দেখিয়া হয়ত মিনহাজ উদ্দীনের পূর্ব্বোক্ত ভ্রম জন্মিয়াছিল।

গৌড় নগরের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল নানা নৈসর্গিক কারণে ও উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার উপরে প্রাচীন কীর্ত্তি

(১) Journal of the Asiatic Society, Part XLII, Pages 211-212.

রক্ষার জন্য আমাদের দেশে চেষ্টা ও যত্ন অতি অল্প লোকেরই আছে (১)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নাটককার সেক্সপিয়র যে গৃহে বাস করিতেন, প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক সার ওয়াল্টার স্কট যে চেয়ারখানিতে বসিতেন, এমন কি যে কলমটী দ্বারা লিখিতেন, তাহা এখনও অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে। জর্ম্মনীর অন্তর্গত কলোন নগরে একটী গির্জ্জা ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। লণ্ডন নগরের টাউয়ার একাদশ-শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে (২)। কিন্তু এ হতভাগা দেশে প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী দূরে থাকুক, প্রস্তর খণ্ড পর্য্যন্ত বহু দিন এক স্থানে রক্ষা পায় না। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও গৌড় নগরে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন এবং সেই সময়েও সাসুজা তথায় অনেক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ইহার প্রায় এক শত বৎসর মধ্যেই ইহা নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্রাদির আবাসস্থান হইয়াছে। প্রাচীন কীর্ত্তি সকল কালের এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মনুষ্যের নিষ্ঠুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা ইংরেজ বাজার, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল প্রভৃতি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুমূল্য প্রস্তরাদি কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের সমাধি শোভিত করিতেছে। বর্ত্তমান ইংরেজ বাজারে এমন বাটী নাই, যেখানে গৌড়ের কোন না কোন চিহ্ন দৃষ্ট না হয়। অদ্যাপি রাশি রাশি ইষ্টক প্রত্যহ শকট পরিপূর্ণ হইয়া ইংরেজ বাজারে কেবলমাত্র শকটবাহকের পারিশ্রমিক স্বরূপ অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কেহ নূতন বাটী প্রস্তুত করিবেন, গৌড়ের ইষ্টকের অক্ষয় ভাণ্ডার তাঁহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। গ্রাণ্ট সাহেব বলেন যে, তিনি নিজামত দপ্তরে ইষ্টক বিক্রয়ের মূল্য বাবদে বার্ষিক ৮০০০৲ আদায় দেখিয়াছেন(১)। এই টাকা প্রতি বৎসর গৌড়ের নিকটস্থ কয়েকজন জমিদারের নিকট হইতে আদায় হইত। ইহাদের গৌড়ের গৃহাদি ভগ্ন করিয়া ইষ্টক প্রস্তরাদি বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল। বহুদিবস যাবৎ কলিকাতার সমাধির জন্য প্রস্তর বিক্রেতা বণিকগণ এই স্থান হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিতেন। কদমরসুল দর্গার অনতিদূরে ভাগীরথী তীরে যাইবার পথে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, বোধ হয় উহা ভাগীরথী তীরে নীত হইতেছিল, পথিমধ্যে ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মালদহ জিলার অন্তর্গত নানাস্থানে যে সকল আধুনিক মসজিদ ও সমাধিস্থান আছে, তাহার অধিকাংশ গৌড়ের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত এবং তৎসংলগ্ন অধিকাংশ প্রস্তরফলক গৌড়ের মসজিদ হইতে নীত হইয়াছে। ইংরেজবাজারের ৫ মাইল দক্ষিণে গিলাবাড়ী নামক স্থানে একটী মসজিদ আছে, উহা গৌড়ের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত এবং উহাতে গৌড়ের কোন দ্বারের একখণ্ড প্রস্তরফলক সংলগ্ন আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, "এই দ্বার ৯১০ হিজরীতে (১৫০৪।৫ খ্রীষ্টাব্দে) হোসেন সাহের সময়ে নির্ম্মিত হয়"। ইংরেজ

(১) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট গৌড়ের ভগ্নাবশেষগুলি রক্ষার জন্য ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন। ইহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কিছু কিছু টাকা মঞ্জুর ছিল। এই সকল টাকা কেবল জঙ্গল পরিষ্কারেই ব্যয়িত হইত।

(২) জনশ্রুতি অনুসারে ইহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়।

(১) Grant's Essays, 5th Report P. 285.

বাজারের থানার নিকটে একটী ক্ষুদ্র মসজিদ্ আছে, তাহাতে গৌড়ের কোন মাদ্রাসার প্রস্তর ফলক সংলগ্ন আছে, উহাতে লিখিত আছে যে "এই মাদ্রাসা কামরূপ ও কামতা-বিজয়ী হোসেন সাহের আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত হয়।" পুরাতন মালদহের দক্ষিণে নাঙ্কাপাটী সাহেবের সমাধির উপর একখণ্ড প্রস্তর আছে। তাহাতে লিখা আছে যে "এই মসজিদ দ্বার নছরত সাহের রাজত্ব কালে ৯৩৫ হিজরীতে (১৫২৮।২৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত হয়।" উক্ত মালদহের নিকট চালসাপাড়া নামক স্থানে একটী বিধবার সমাধির উপর একখণ্ড প্রস্তরে লিখিত আছে। যে "এই কূপ নছরত সাহের রাজত্বকালে ৯৩৮ হিজরীতে (১৫৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত হয়।" এই স্থানের একটী আধুনিক মসজিদে হোসেন সাহের সময়ের একখণ্ড প্রস্তরফলক সংলগ্ন আছে এবং উহা ৯১৪ হিজরীতে (১৫০৮ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত বলিয়া লিখিত আছে। এবম্প্রকার ভূরি ভূরি নিদর্শন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দূরদেশেও অনেক প্রস্তর নীত হইয়াছে। ব্লকম্যান সাহেব, শারণ হইতে হোসেন সাহের সময়ের একখণ্ড প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে লিখা ছিল যে, "এই মসজিদ ৯০৯ হিজরীতে (১৫০৩।৪ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়।"

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের মত। (২)

নৈয়ায়িকের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর স্তন্যাভিলাষে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বের অভ্যাস ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না এবং পূর্ব্ব শরীর ব্যতীত, অভ্যাস হইতে পারে না, অতএব পূর্ব্ব শরীর ও পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হইল। দেখা যায়, জীব ক্ষুধিত হইলে আহার করিতে অভিলাষ করে। আহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, জীব জানিয়াছে, আহারই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়। এই পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতি বশতঃ জীব ক্ষুধা লাগিলেই আহার করিতে অভিলাষ করে। জাতবৎস ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে অভিলাষ করে। এ জন্মে সে কখনও শিখে নাই, আহারই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়, তবে কেন তাহার আহারে অভিলাষ জন্মিল? এখানে বলিতে হইবে, জাতমাত্র শিশু ক্ষুধিত হইয়া পূর্ব্বাভ্যাস স্মরণ করতঃ আহারে অভিলাষ করিয়া থাকে। আত্মা পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করতঃ ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ পূর্ব্বক স্তন্যপানে অভিলাষ করিল। যদি বল, লৌহ যেমন অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্কান্তের দিকে উপসর্পণ করে, সেইরূপ শিশু পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীতও স্তন্যপানে অভিলাষ করে। এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা শিশুর স্তন্যপান ক্রিয়া প্রবৃত্তি পূর্ব্বক হইতেছে, কিন্তু লৌহের গমন প্রবৃত্তিপূর্ব্বক নহে। লৌহ যে কালেই হউক না কেন, অয়স্কান্তের সমীপে অবস্থিত হইলে তদভিমুখে ধাবিত হয়; ইহাতে তাহার অভিলাষ বা অনভিলাষ নাই; কিন্তু শিশু ক্ষুধিত হইলেই স্তন্যপানে অভিলাষ করে, ক্ষুধার্ত্ত না হইলে অভিলাষ করে না। এই প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্ব

জন্ম সিদ্ধ হইল। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইবে।

নৈয়ায়িকের তৃতীয় যুক্তি এই যে,কেহই বীতরাগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই শিশু রাগ দ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তনই রাগ দ্বেষাদির কারণ। পূর্ব্ব জন্মে বিষয়ের অনুভব ব্যতীত এ জন্মে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাগদ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বানুভব ও পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হইল। যদি বল, দ্রব্য গুণ-সমন্বিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, নির্গুণ দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না, অতএব রাগ দ্বেষাদি গুণসহ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপত্তি এই, সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা রাগ দ্বেষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু জড় পদার্থের গুণ, সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা উৎপন্ন হয় না। বিষয়ের আসেবন ব্যতীত সঙ্কল্প বিকল্পের উদ্ভব হয় না, অতএব জায়মান বালকের রাগদ্বেষাদি দেখিয়া পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়ের অনুমান করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইল।

নৈয়ায়িকের যুক্তি সমূহের মর্ম্মার্থ এই, জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত জীবের রাগদ্বেষাদি যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায়,উহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জগৎ ঐ সকল সংস্কারকে উদ্বোধিত করিতেছে মাত্র। প্লেটোর যুক্তিও ঐ প্রকার। স্মৃতিই পূর্ব্ব জন্ম প্রমাণ করিয়া দিতেছে,ইহা নৈয়ায়িক ও প্লেটো-উভয়েরই মত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, স্মরণের প্রামাণ্যগ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করা যাইতে পারে না, বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই—অতীত ঘটনা স্মৃতি ভিন্ন আর কিসের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে? চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তাহা বর্ত্তমান কাল বিষয়ক প্রমাণ; অতীত ও অনাগত বিষয় চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শুনা যায় না, অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করা যায় না। আমি বলিতেছি,কল্য কলেজে গিয়াছিলাম,এই বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? চক্ষুতে না স্মৃতিতে? অবশ্যই বলিতে হইবে,স্মৃতিই অতীত ঘটনার প্রমাণ। যদি আমি ঐ ঘটনা স্মরণ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে চক্ষু দ্বারা কলেজে গমন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম বলিয়া কি তাহার কোন সত্যাসত্যের নির্ণয় হইত? যদি অতীত ঘটনার স্মৃতি ভিন্ন অপর-প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে দুষ্মন্তকে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-জনিত অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না। সুতরাং সিদ্ধ হইল, স্মৃতিই অতীত ঘটনার প্রমাণ। নৈয়ায়িকেরা পূর্ব্ব জন্মের যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও স্মৃতিমূলক। পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি অস্বীকার করারও কোন কারণ দেখি না। যিনি ইংরেজী ভাষা কখনও জানেন না, ইংরেজী বর্ণমালা কখনও দেখেন নাই,এমন লোকের নিকট একখানি ইংরেজী পুস্তক লইয়া যাও,তিনি উক্ত পুস্তকের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইবেন। আর এক জন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া যাও,তিনি উহার ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইবেন। "Soul exists through eternity" এই অক্ষরগুলি দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু ঐ বাক্যটী দ্বিতীয় ব্যক্তির নয়নগোচর হইবামাত্র "Soul" এক অর্থ প্রকাশ করিবে, "exists" আর এক অর্থ প্রকাশ করিবে,

এইরূপে প্রত্যেক শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবে; কেন না তিনি পূর্ব্বেই ঐ শব্দগুলির অর্থ জানিতেন; শব্দগুলি দেখিয়া অর্থগুলি মনে পড়িল। যদিও সমগ্র বাক্যটী কোথাও পূর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু প্রত্যেক শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই জানিতেন। এই বিভিন্ন শব্দের রিভিন্ন অর্থ লইয়া এক নূতন অর্থের প্রতীতি হইল। আর প্রথম ব্যক্তি ঐ শব্দগুলির অর্থ পূর্ব্বে জানিতেন না ও ঐ অক্ষরগুলির সহিত পরিচিত ছিলেন না, সুতরাং শব্দগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে কোন অর্থেরই উপলব্ধি হইল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশাল বিশ্ব সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার মনে কত জ্ঞান জন্মিল, কত হর্ষ ভয় উৎপন্ন হইল। ঐ শিশুর অন্তরে যদি আকৃতি, রূপ ইত্যাদির জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে জগৎ দেখিয়া তাহার মনে কোন অর্থেরই প্রতীতি হইত না; মনে হর্ষ ভয়াদিরও উদ্রেক হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, রূপ, আকৃতি ইত্যাদির জ্ঞান ঐ শিশুর পূর্ব্বেই ছিল, জগৎ দেখিয়া উহা মনে পড়িল। পূর্ব্বেই জানা ছিল, স্বীকার করিলে পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইবে। বালকেরা যখন প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষা করে, তখন পূর্ব্ব-পরিচিত আকৃতি শব্দের সহিত মাতৃভাষার বর্ণমালার সাদৃশ্য অন্বেষণ করে। এই সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা অক্ষরগুলির জ্ঞান হয়। এইরূপে যে কোন বস্তুর জ্ঞান হউক না কেন, পূর্ব্বে তৎসদৃশ বস্তুর সহিত পরিচয় ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, শিশু যখন সর্ব্বপ্রথমে আকার, রূপ, রসাদি জানিল, তখন কোন্ বস্তুর আকারের সদৃশ আকার দেখিল? কোন্ বস্তুর রূপের সদৃশ রূপ দেখিল? অতএব শিশু এই সংসারে আসিবার পূর্ব্বে কিছু সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে, যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া পার্থিব বিষয় চিনিতে পারিল। মূলধন কিছুই হাতে নাই, সুদ কিসের বৃদ্ধি হইবে? শিশুর পূর্ব্ব জন্মে যে চক্ষু কর্ণাদি ছিল, তাহা এখন নাই, যে শরীর ছিল, তাহাও নাই, সব নূতন, সে তখন কেবল স্মৃতির সাহায্য গ্রহণ করিল, এ জগতের কোন বস্তুর সদৃশ বস্তু সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে কি না স্মরণ করিতে লাগিল। দেখিল, পূর্ব্বানুভূত রূপ রসাদির সদৃশ বহুবস্তু এ জগতে আছে। এইরূপে বর্ত্তমান জগতের রূপ রসাদির ক্রমিকজ্ঞান হইতে লাগিল। সামান্য বিশেষ ক্রমে জটিলতর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। ক্রমে এই সংসারের জ্ঞানে বিভোর হইয়া আত্মা পূর্ব্বজ্ঞান হারাইলেন, পূর্ব্ব সংসারের মমতা ত্যাগ করিয়া এই সংসারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন, দেহই আত্মা বলিয়া ভ্রম হইল। আত্মা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতেও প্রয়াস করিলেন না, বর্ত্তমান জগতের অর্থ বুঝিয়াই, যে অর্থ পুস্তকের সাহায্যে বুঝিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এই ত ঘোর মোহ! শাস্ত্রকারেরা এবম্প্রকার দেহাত্মবাদের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন। দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলেই আত্মার এ মোহ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞান সমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান সমূহকে আবৃত করিয়া ফেলিল। এখন আর তুমি পূর্ব্ব জন্মানুভূতির কিরূপে স্মরণ করিবে? বাল্যকালে যখন এ পৃথিবীর জ্ঞান হয় নাই, তখন পূর্ব্ব জ্ঞান (স্মৃতিরূপে) সম্পূর্ণ পরিমাণে ছিল, এ সংসারের জ্ঞানের

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতীত জন্মের জ্ঞানের হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান বিনষ্ট হইল, এরূপ নহে, কিন্তু বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞানে মিশিয়া গেল, সুতরাং পূর্ব্ব জন্মের সম্যক্ স্মৃতি কিরূপে হইবে।

তার্কিক বলেন, পূর্ব্ব জন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা সুখদুঃখাদির বৈষম্যের কারণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। সংসারে কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র এরূপ বৈচিত্র্য হইল কেন? এখানে বলিতে হইবে, অদৃষ্টই লোকের সুখদুঃখাদির বৈষম্যের কারণ; লোকে স্বানুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্যকর্ম্মের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ ও সুখ ভোগ করিতেছে। জাত বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাহার পূর্ব্বে ইহজন্মে সে পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তবে তাহার কেন সুখ ও দুঃখ জন্মিল? এখানে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্মসম্ভূত অদৃষ্ট ভূমিষ্ঠ বালকের সুখ ও দুঃখের বৈষম্যের কারণ, আর ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট স্বীকার করিলে পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইবে। যদি বল, ঈশ্বরই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ, তাঁহার ইচ্ছানুসারে জগতে এরূপ বিচিত্রতা হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও ধনী কাহাকেও দরিদ্র করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা শক্তির ইয়ত্তা কে করিতে পারে? তাহা হইলে উত্তরে বক্তব্য এই, ঈশ্বর কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য (partiality) নৈঘৃণ্য ও (cruelty)দোষের পাত্র হইয়াছেন, তাঁহার অকারণ অনুগ্রহে কেহ সুখী আর তাঁহার অকারণ নিগ্রহে কেহ দুঃখী হইয়াছে। এরূপ পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লুপ্ত হয়। যদি বল, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, তাঁহার শক্তির বিভেদ অনুসারে জগৎকার্য্যের বৈচিত্র্য হইয়াছে, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি অনুসারে লোকের সুখ ও দুঃখাদির বিভেদ হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই শক্তি ও শক্তিমানের বিভেদ অঙ্গীকার কর। এই শক্তি গুলি শক্তিমান্(ঈশ্বর) হইতে বিভিন্ন, ঈশ্বর এই শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে সুখদুঃখাদির বিভেদ ব্যবস্থা করিতেছেন, এই সকল শক্তি ও সুখদুঃখাদির পরস্পর হেতু, হেতুমদ্ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্তি সকলই সুখদুঃখাদির কারণ, শক্তিমানের(ঈশ্বরের) তাহাতে কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে বক্তব্য এই, তুমি যাহাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিতেছ, আমি তাহাকেই অদৃষ্ট বলিব, অর্থাৎ ঈশ্বর লোকের অদৃষ্টের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) বিভেদ অনুসারে সুখদুঃখাদির বিভেদ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরে কোন দোষ উপস্থিত হয় না, পূর্ব্বজন্ম পরজন্মও সিদ্ধ হয়। ভূমিতে যে প্রকার শস্য বপন কর, সেই প্রকারের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে, ইহাতে ভূমির কোন অপরাধ নাই; তবে ভূমি ব্যতীত অঙ্কুরের উদ্গম হইবে না, সেইরূপ ঈশ্বর কর্ম্মফলানুসারে প্রত্যেক লোকের পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করিতেছেন; ইহাতে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য কোন দোষেরই আপত্তি হইতে পারে না। ঈশ্বর বালকের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মানুসারে তাহার সুখ ও দুঃখের বিধান করিতেছেন, তাহাতে ঈশ্বরের দোষ কি? পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ স্বীকার করিলে, পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম ইত্যাদি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, আমি শক্তি ও শক্তিমানের বিভেদ স্বীকার করিনা, এক ঈশ্ব-

রই জগতের কারণ, তাঁহা হইতেই স্বভাবতঃ জগতের বৈচিত্র্য হইতেছে, তাহা হইলে উত্তর এই, এক কার্য্য উৎপাদন কালে কারণের যে স্বভাব থাকে, কার্য্যান্তর উৎপাদন কালে কারণের সে স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারেনা, সুখ বিধান কালে ঈশ্বরের যে স্বভাব থাকে, দুঃখ বিধান কালে তাঁহার সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল কেন? আর যদি কারণের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা হইলে বহ্নি ও জল হইতে পারিত। যদি বল, স্বীকার করিলাম, ঈশ্বর লোকের পাপ ও পুণ্য কর্ম্মানুসারে পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করেন, কিন্তু সেই পাপ ও পুণ্য পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত নহে, বর্ত্তমান জন্মের পাপ ও পুণ্য অনুসারেই ঈশ্বর সুখ দুঃখের বিধান করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে কেন? সে তথনও কোন পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তবে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছে কেন? কারণ, ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারেনা, পাপপুণ্য কারণের পূর্ব্বে সুখদুঃখাদি কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারেনা। যদি বল—

> উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলম্।
> ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
> নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমঃ
> তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥

"পূর্ব্বে কুসুমের উদ্গম তদনন্তর ফলের উৎপত্তি হয়, প্রথমে মেঘের উদয়, তদনন্তর বৃষ্টি হয়, নিমিত্ত (কারণ) ও নৈমিত্তিকের (কার্য্য) এইরূপই পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম", কিন্তু হে বিভো! তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহার পূর্ব্বেই সুখ সম্পদাদি আবির্ভূত হয়। ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহার পূর্ব্বেই সুখ হইতেছে ও যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন, তাহার পূর্ব্বেই দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইলে যে শিশু এখনও কোন পুণ্য কার্য্য করে নাই, তাহাকে সুখ প্রদান করিয়া ও যে এখনও কোন পাপ কর্ম্ম করে নাই, তাহাকে দুঃখ প্রদান করিয়া পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ঈশ্বর শিশুর পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে তাহার সুখ ও দুঃখের বিধান করিতেছেন, তাহা হইলেই পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হইবে, এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইবে। যদি বল, ঈশ্বর কোন কারণ সাপেক্ষ হইয়া লোকের ইহকাল ও পরকালের সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা করেন, ইহা না হয় অগত্যা স্বীকার করা গেল, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই কারণ, তাহা কে বলিল? বিদ্যা, ধন ইত্যাদির মধ্যে কোন একটী সেই কারণ হইবে, অর্থাৎ ইহজন্মে যে বিদ্বান্ বা ধনী ছিল পরজন্মে সে সুখী হইবে। ইহার উত্তর এই যে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম পরকালের হেতু না হইত, তাহা হইলে বিশ্বের লোকের ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না; জগতের প্রত্যেক লোকেই ইহকালে ও পরকালে সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, অন্ততঃ ধর্ম্মকে সেবা করা উচিত বলিয়া মনে করে। যদি বল, কতকগুলি লোক প্রথমে অকস্মাৎ কোন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, পরে অপর লোককেও ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিল, এইরূপে কার্য্য বিশেষে সমাজের অভ্যাস হইয়া গেল। সমাজের এই অভ্যস্ত কর্ম্মই পরে ধর্ম্ম আখ্যা লাভ করিল ও তদ্বিপরীত কার্য্য অধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইল। ইহার উত্তর এই, লোকের একরূপ অভ্যাস প্রথমে কেন হইল? জগতের সমস্ত লোকেরই একরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে, তুমি যদি বল ঐ

অভ্যাস অকস্মাৎ হইয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে, অকস্মাতের মধ্যে এত সুশৃঙ্খলা রহিয়াছে, তাহা নিয়মেরই নামান্তর মাত্র। অতএব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তি ইহজন্মে সমাজের মতৈক্যের কারণ। যদি বল জগতের আস্তিক লোকেরা পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি মিথ্যা বিষয়ের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেই মিথ্যা বিষয়ের স্বয়ংও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহার উত্তর এই, এমন অসামান্য লোক কে আছেন, যিনি কেবল পরকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিষয়ের কল্পনা করেন এবং স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে নানাবিধ ক্লেশে অবসন্ন করেন। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের হেতু সিদ্ধ হইল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত সংস্কার আত্মায় বিদ্যমান থাকে এবং উপযুক্তকালে ও উপযুক্ত স্থানে সেই সংস্কার অনুসারে আত্মার সহিত বিভিন্ন প্রকার ভোগ্য বস্তুর সম্বন্ধ ঘটে। যদি বল, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম পরকালের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হেতু, তজ্জনিত সংস্কার স্বীকার অপ্রয়োজন, তাহা হইলে উত্তর এই, ফলপ্রসব কালে কারণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে; পরোপকার করিয়াছিলাম বিশ বৎসর পূর্ব্বে, এখন তাহার ফল কিরূপে জন্মিবে? বলিতে হইবে, ফল প্রসব কালেও কারণ বিদ্যমান আছে, পরোপকার কর্ম্ম সংস্কার ব্যতীত অন্য কোন্ রূপে ফল প্রসব কালে আত্মায় বিদ্যমান থাকিতে পারে? আর এরূপ সংস্কার আত্মায় বিদ্যমান না থাকিলে শরীরাদি আত্মার ভোগজনক হইত না। সংসারে আত্মাও অসংখ্য, শরীরও অসংখ্য, অথচ বিশেষ বিশেষ শরীর দ্বারা বিশেষ বিশেষ আত্মার ভোগ সাধন হইয়া থাকে। পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম জনিত সংস্কারই আত্মা ও দেহ বিশেষের সংযোগের কারণ। জীব পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মনিবন্ধন দেহ ধারণের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এতদুভয়ের সংযোগে দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব হয়। গর্ভমধ্যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম ও পূর্ব্বজগৎ স্মরণ করিয়া থাকে, ক্রমে দেহাবরণে আবৃত হয় ও দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, অমনি তাহার পূর্ব্বের দিব্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। যদি বল, এ পৃথিবীতে একজন জীবনত্যাগ করিয়া বহুদূরস্থিত চন্দ্রাদিলোকে কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে? ইহার উত্তর এই, আত্মা বিশ্বব্যাপক সংসারে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার ব্যাপিত্ব নাই। তিনি কেবল মোহাচ্ছন্ন হইয়া সামান্য জড় দেহকে "আমি" বলিয়া আশ্রয় করেন, মোহ বশতঃ অনন্ত হইয়াও সান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার অব্যাহত জ্ঞানচক্ষুঃ জড় চক্ষুর আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

তার্কিকের যুক্তির মর্ম্মার্থ এই, কেবল ঈশ্বরই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মের সুখ ও দুঃখের কারণ নহে, এরূপ কথা বলিলে, বিশ্বপতির শাসনে দোষারোপ করা হয়। অতএব ঈশ্বর কোন কারণ সাপেক্ষ হইয়া সুখ ও দুঃখের বৈষম্যের বিধান করেন। সেই কারণেই অদৃষ্ট বা কর্ম্মসংস্কার। জীব, পুণ্য ও পাপ নামক কর্ম্ম রাশির অনুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত যে সংস্কার আত্মায় বিদ্যমান থাকে, তাহা যথাক্রমে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বা সামান্যতঃ অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকে কর্ম্মশরীরও বলা যাইতে পারে,

কেননা আত্মা ঐ সংস্কাররূপ আবরণে আবৃত থাকেন এবং ইহাকে কেহ কেহ কারণ-শরীরও বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেহেতু ইহা এই স্থূলদেহের উৎপত্তির কারণ। প্রত্যেক প্রাণী অদৃষ্ট বশতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ করে এবং এই ফলভোগকালে পুনরায় যে কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করে, তদ্দ্বারা পুনর্জ্জন্ম অবশ্য-ম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই জন্যেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, কেননা "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি" "শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না"। এইরূপে কর্ম্ম বশতঃ জন্ম, জন্ম বশতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে। যদি বল, কর্ম্ম ও জন্ম এরূপ পরস্পর সাপেক্ষ হইলে সর্ব্ব প্রথম জন্ম বা কর্ম্মের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে, ইহার উত্তর এই, যখন সংসার অনাদি, তখন ইহার সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম বা জন্ম কোন ক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

মীমাংসক ঈশ্বরকেও মানেন না, কিন্তু কর্ম্মফল ও জন্মান্তর স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের কোন কর্ত্তা নাই, লোক স্বীয় কর্ম্মানুসারে জন্ম জন্মান্তরে ফল-ভোগ করে। সর্ব্বপ্রথমে বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, কি অঙ্কুর হইতে বীজ জন্মিয়াছিল, এ প্রশ্ন যেমন নিরর্থক, কেননা সংসার অনাদি, সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম জন্ম বা কর্ম্ম; কোন্ কর্ম্ম বা জন্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, এ প্রশ্ন কোন ফলোপধায়ক নহে, কেননা সংসারের আদি নাই। ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া কেবল কর্ম্মফল দ্বারা জগতের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, ইহা আমি পরে প্রদর্শন করিব। এস্থলে কর্ম্মফল বুঝাইবার নিমিত্ত মীমাংসকের মত উদ্ধৃত করিলাম।

মীমাংসক বলেন—

দেবো ন কশ্চিদ্ভুবনস্য কর্ত্তা ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপিচ কশ্চিদাস্তে।
কর্ম্মানুরূপাণি শুভাশুভানি প্রাপ্নোতি সর্ব্বোহি জনঃ ফলানি॥
আদ্যন্তশূন্যেহত্র জগৎপ্রবাহে ক্রিয়াভবেৎ কর্ম্মত এব সর্ব্বা
কর্ম্মাপি পুংসাংভবতি ক্রিয়াতো বীজাঙ্কুরন্যায়তয়া ন দোষঃ॥
যাগাদিকার্য্যাহুতি ভাগ ভাজো মন্ত্রাত্মকাদেবগণা নিরুক্তাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কর্ম্মবশেন ভোগং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেহপি চরাচরস্য॥

শ্রুতিও, বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে লোকের জন্মান্তরে বিভিন্ন গতি হইয়া থাকে, ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—

হন্ত তইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথাচ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
যোনি মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণু মন্যে হনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥(কঠোপনিষৎ)

উপরি লিখিত যুক্তি সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মও ছিল এবং পর পর জন্মও আছে; পুণ্য ও পাপকর্ম্ম সেই পর-লোকের নিয়ামক, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীব স্বর্গাদি লোকে জন্মগ্রহণ করতঃ সুখ ভোগ করে এবং পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ দুঃখ ভোগ করে। একজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে লোক বিভিন্ন প্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহারও কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্যকর্ম্ম। আত্মা এইরূপ অদৃষ্টের অধীন হইয়া নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বেড়াইতে-ছেন এবং যত দিন তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় না হয়, তত দিন আরও কত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে আত্মা কিরূপে দেহাদির বন্ধন ও কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরনির্বৃতি লাভ করেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্লেটোর মতে শরীর হইতে আত্মার বিচ্ছে-

দই মৃত্যু। যাহাতে শরীরের সহিত আত্মার পুনঃ সম্বন্ধ না ঘটে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। শরীরের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলেই আত্মার চিন্তাশক্তির প্রসার কমিয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আত্মজ্ঞানের অবিষয়ীভূত। আত্মায় জগদ্বিষয়ক নিখিল জ্ঞানেরই আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু যখন আত্মা দেহরূপ আবরণে পরিচ্ছিন্ন থাকেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হ্রাস হইয়া আসে, তখন চক্ষুতে যাহা দেখায়, তাহাই দেখেন, কর্ণে যাহা শুনায়, তাহাই শ্রবণ করেন। এইরূপে আত্মার জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মৃত্যুতেও এই জ্ঞান সঙ্কোচের একান্ত প্রতিবিধান হয় না, মৃত্যুর পরেও আত্মা পুনরায় দেহান্তর আশ্রয় করেন। এইরূপে বারংবার তিনি দেহত্যাগ ও দেহ গ্রহণ করেন, চলিত কথায় বারংবার তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু হয়। এই জন্ম-মরণ প্রবাহকে সংসার বলে। আত্মার এই সাংসারিত্বের উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ। জন্ম মরণের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। যাঁহারা এরূপ মুক্তিপদের প্রার্থী নন এবং দৈহিক সুখ নিচয়ের অভিলাষী, তাঁহারা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলে জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া অভীষ্ট সুখলাভে সমর্থ হইবেন। সংসার ও মুক্তি, দুই পথ বিদ্যমান আছে, যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর। চিরশান্তি পরম পবিত্র ও অখিল বস্তু বিষয়ক অব্যাহত জ্ঞান ইচ্ছা কর, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষপদের প্রার্থী হও। বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও মিলন, কখনও বিরহ ইত্যাদি যদি কামনা কর, সংসারমার্গ অবলম্বন কর। জন্মজরামরণব্যাধি প্রভৃতি এই মার্গের অবশ্যম্ভাবী ফল। উভয় মার্গে কৃতকার্য্য হইতে হইলেই ধর্ম্ম প্রয়োজন। পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধির নৈর্ম্মল্য ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তিলাভ করিবে। আর যদি জন্ম জন্মান্তরে বহুসুখলাভ করিতে চাও; তাহা হইলেও ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। ধর্ম্মের পরিণামই সুখ।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১)

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ কাঁদ—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল সুধু গায়িতে প্রভাতি,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ!
হা ধরণি, তুই কি অপরিমেয়
কি কঠোর কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি
জেগে থাকে নিশিদিন?

৪

উদার আকাশ!—প্রভাত বাতাস!—
চাহ গো, কাঁদ গো, ফেল গো নিশ্বাস।
আরো ফুল ফল আরো তৃষা আশ
দাও দাও ধরাবুকে।
শিখাও জীবনে করিতে বিশ্বাস,
বুঝাও মরণ-দুখে।

৫

মৃত তোর ভক্ত কাঁদ মা জাহ্নবি,
মৃত তোর শিশু কাঁদ গো অটবি,
হে বঙ্গ-সুন্দরি, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

৬

কাঁদ তুমি কাঁদ।—জ্বলিছে শ্মশান—
কত মুক্তাছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল অহ্বান—
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

৭

যাও, গুরো, যাও, বুঝিয়াছি স্থির—
মানব-হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
কেবা বাণীপায় রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত।

বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কি রূপা কবিতা—কত সুধারস,
প্রেমে কত ত্যাগ—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পুত মত্ততায় মুগ্ধ দিক্‌দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।

৯

বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে-
আপনার হৃদে আপনি মরিলে।
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর।

১০

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা শ্রেয় ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে!
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি!
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চিরস্বপ্নে জাগি!

১১

তাই হোক হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে;
রাজহংস সম প্রেম-গুঞ্জরণে
চরণ-দুখানি ঘেরি।—
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
সকরুণ প্রেম হেরি।

১২

তাই হোক হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক;
জগতে থাকুক জগতের দুখ
জগতের বিসম্বাদ।
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

১৩

তাই হোক হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে;
দেখুক প্রেমিক সুগভীর যামে
স্বপনে জগত ঢাকি—
নামিছে অমরী ওই গীত ধরি
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

১৪

তাই হোক হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা।
লহ লহ, গুরো, মরণ-সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রতিবাদ)। (৫)

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, আমাদের নিরাকার ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এই মত দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারা সংস্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে, আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারি। আমাদের শাস্ত্রেও ব্রহ্মকে "অবাঙ্মনসগোচরম্" বলা হইয়াছে। অতএব, এখানে পাশ্চাত্য দর্শন ও আমাদের শাস্ত্র উভয়েরই এক সিদ্ধান্ত। ইহাই হইল Positive বা direct evidence (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) এতদ্ভিন্ন Negative বা indirect evidence (অবান্তরিক প্রমাণ) দ্বারাও এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ করা হইয়াছে। শ্রুতি বারম্বার বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যায়। তাহা হইলে হইল, যে ব্রহ্ম হইতে পারে নাই, অর্থাৎ যে মানুষ, সে ব্রহ্মকে জানে নাই। সুতরাং মানুষের নিরাকার ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আমরা শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত পাইলাম। এখন, "উপাসনা" যাহাকে বলা যায়, তাহা যদি জ্ঞানমূলক কোন ক্রিয়া হয়, তাহাতে যদি জানার কোন কাজ থাকে, তবে তাহা যে নিরাকার ব্রহ্মের সম্বন্ধে হইতে পারে না, ইহা উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়। ইহার অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। এই জন্যই নিরাকার উপাসনা বলিয়া কিছু হইতে পারে না। এই কারণেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" অর্থাৎ লোকে যাহাকে উপাসনা করে, যেমন ঈশ্বরাদি তাহা ব্রহ্ম নহে। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না। এই ত হইল আমাদের শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত। এখন নগেন্দ্রবাবু নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনা কি জিনিষ ও তাহা কি প্রণালীতে করিতে হয়, এবিষয়ে অতি অল্পই বলিতেছেন। সুতরাং "নিরাকার উপাসনা" বলিতে তিনি কি বুঝেন, ইহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টরূপে কিছু দেখা যায় না। সে যাহা হউক, তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎ-কার্য্যের আলোচনা, শাস্ত্র পাঠ, মহাত্মাদিগের মহৎ জীবনের অনুশীলন, নাম জপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চাবস্থায় সম্ভব। সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহির্জ্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া রূপ, রস,

গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্ম সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো
হর্ষশোকৌজহাতি ॥

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হন।

এস্থলে নগেন্দ্র বাবু সাধনের দুইটী অবস্থার কথা বলিতেছেন। একটী "প্রথমাবস্থা," অপরটী "উচ্চাবস্থা।" সাধনের এই অবস্থা ভেদে সাধকেরও অবস্থা ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সাধকদের মধ্যেও কেহ প্রথমাবস্থার সাধক হইতে পারেন; আর যিনি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চাবস্থার সাধক বলা যাইতে পারে। ইহাকেই পৌত্তলিকতার ভাষায় অধিকার-বিভাগ বলে। প্রথমাবস্থার সাধককে মন্দাধিকারী ও উচ্চাবস্থার সাধককে উচ্চাধিকারী বা শ্রেষ্ঠাধিকারী বলা যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবুর এই অধিকারবাদ শুনিয়া তাঁহার উচ্চ নিরাকারবাদী বন্ধুগণ কাণে আঙ্গুল দিবেন কি না বলিতে পারি না। সাধারণতঃ দেখা যায়, ব্রাহ্মগণ অধিকারবাদ মানেন না। তাঁহাদের মতে কি শিশু, কি যুবা, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ও নিরাকার উপাসনা করিতে পূরা ষোল আনা অধিকারী। পার্থিব বিদ্যা সম্বন্ধে একজন অন্য জনের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, একজন আর এক জনের শিক্ষক বা গুরু হইতে পারে, একথা তাঁহারা মানিলেও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে একজনে আর এক জনকে শিক্ষা দিতে পারে, একথা তাঁহারা প্রাণান্তেও স্বীকার করিবেন না। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা অতি সহজ জিনিষ; তাহা এক জনকে অন্যের শিখাইতে হয় না, তাহার জ্ঞান সকলেরই সমান ভাবে স্বভাবতঃ আছে। এই জন্য তাঁহারা গুরুগিরি ঘৃণা করেন। এই সকল মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নগেন্দ্র বাবু যে আজ তাঁহার অধিকারবাদ প্রচার করিতেছেন, ইহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। আর ব্রাহ্মগণ যে ক্রমে "পথে আসিতেছেন" ইহার প্রমাণ। বাস্তবিক ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সে যাহা হউক, নগেন্দ্র বাবুর নিরাকার উপাসনা কি, একবার দেখা যাউক। "সাধনের" প্রথমাবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎকার্য্যের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, মহাত্মাদিগের মহৎজীবনের অনুশীলন, নাম জপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা বোধ হইতেছে, মন্দাধিকারী-সাধকের আভ্যন্তরীণ (অর্থাৎ Private) নিরাকার উপাসনা। কারণ, এতদ্ভিন্ন প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক একটী উপাসনা আছে, যাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। ইহাকে প্রকাশ্য উপাসনা (Public prayer) বলা যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবু ইহার কথা কিছু বলেন নাই। কারণ, বোধ হয়, তাঁহার মতে ইহার সাধন সম্বন্ধে কোন উপকারিতা নাই। অথবা ইহা উপরে উদ্ধৃত অংশের "প্রভৃতি" কথার মধ্যে পড়িয়াছে। যাহা হউক, নগেন্দ্র বাবু এই প্রকাশ্য উপাসনার বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করুন আর নাই করুন, সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণের মধ্যে কিন্তু ইহারই বিশেষ গুরুত্ব দেখা গিয়া থাকে। এমন অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ, নাম জপাদির কোন আবশ্যকতা মনে করেন না। কেবল প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক উপাসনাই তাঁহাদের নিকট খাঁটি নিরাকার উপাসনা। এই বক্তৃতামূলক উপাসনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়

বলিয়াই অনেকে বলিয়া থাকেন, "Brahmoism is Christianity without a Christ—অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্ট ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্যবক্তৃতা মূলক উপাসনা সম্বন্ধে যদি একথা খাটে, তবে, নগেন্দ্র বাবুর প্রচারিত উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে যে, উহা প্রতিমূর্ত্তি-বিহীন সাকার উপাসনা। বোধ হয় সকলেই জানেন, হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনায় "শাস্ত্রপাঠ" "নামজপ" প্রভৃতি আছে। এ সকল ছাড়া আরও আছে, ধ্যান, ধারণাদি, যদ্দারা উপাসনার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। উপাসনার মূল উদ্দেশ্য কি? বেদান্তসার-কর্ত্তা বলেন, চিত্তের একাগ্রতা লাভ *। চিত্তের একাগ্রতা লাভ প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণাদি দ্বারাই হইতে পারে। যেমন সূর্য্যরশ্মি সকল এক খণ্ড বক্রদর্পণে (concave mirror) কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নিতেজে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা দিকে বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি সগুণ ব্রহ্ম মূর্ত্তিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া সাতিশয় বলবান্ ও তেজঃ সম্পন্ন হইতে পারে ও অবশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিতে সক্ষম হইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশ এই যে, সাকার যীশুখ্রীষ্টে চিত্তসমর্পণ দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। হিন্দুধর্ম্মেরও উপদেশ এই, সাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মে যুক্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা গেল, নিরাকারে পৌছিতে হইলে সাকার মূর্ত্তিরূপ সিঁড়ি দিয়া যাইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ যেমন একদিকে যীশুখ্রীষ্টকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের বাহ্যিক উপাসনাদির অযথা অনুকরণ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে পৌছিবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু সেইরূপ অন্যদিকে হিন্দুর সাকার উপাসনার জীবন-স্বরূপ প্রতিমা-পূজা বাদ দিয়া তাহার কেবল খোঁসটীকে নিরাকার উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। অতএব দেখা গেল, নগেন্দ্রবাবু মন্দাধিকারীর জন্য যে নিরাকার উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর সাকার উপাসনার খোঁসা মাত্র। অতঃপর সাধনের উচ্চাবস্থার নিরাকার উপাসনা কি, দেখা যাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। সাময়িক চিত্র।—শ্রীচন্দ্রনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ।৵০; এখানি কবিতা পুস্তক। দুই চারিটী কবিতা খুব সুন্দর হইয়াছে।

২। ফটোগ্রাফী শিক্ষা।—শ্রীআদীশ্বর ঘটক প্রণীত, মূল্য ১৷০। এরূপ পুস্তক আর আমাদের হাতে পড়ে নাই। ফটোগ্রাফী শিক্ষার যাবতীয় কথা ইহাতে সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। অনেকগুলি চিত্র দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৩। বিদ্যাসাগর।—শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত, মূল্য ১।০, বঙ্গবাসী প্রেস। বিহারি বাবুর বহুদিনের প্রতিশ্রুত "বিদ্যাসাগর" এতদিন পর প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একখণ্ড উপহার পাইয়া একান্ত বাধিত হইয়াছি। বিশেষ সমালোচনা পরে করিব।

৪। ভ্রমনিরাস।—শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য ৵০। চণ্ডীবাবুর বিদ্যাসাগরের ভ্রম-প্রদর্শন। বিশেষ সমালোচনা পরে করা যাইবে।

৫। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।—শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ।০। এই প্রবন্ধটী লিখিয়া হারাণ বাবু মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং উপাসনানান্তুচিত্তৈকাগ্র্যম্। বেদান্তসার

পরীক্ষক ছিলেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। উভয়েই নাকি প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবুর সম্পাদিত সাধনায় কিন্তু এ পুস্তকের বিশেষ নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধ মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই এক জন কেন নিন্দা প্রকাশ করিলেন, এ রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন। যাউক, সে সকল অবান্তরিক কথায় কাজ নাই।

আমরা হারাণ বাবুর একজন পক্ষপাতী লোক, আমরা পূর্ব্বে তাঁহার লেখারও অনেক প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তিনি স্বাধীনতার দোহাই দিয়া এ পুস্তকে যে সকল অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। কেহ কেহ বলেন, "তিনি বঙ্গবাসী আফিসে কাজ না করিলে মডেলভগিনী এবং যোগেন্দ্র বাবুর এত অসঙ্গত প্রশংসা করিতে পারিতেন না।" প্রশংসা করুন, তাহাতে কিছু আপত্তি নাই, কিন্তু "এমন বর্ণনাশক্তি বাঙ্গালায় আর কাহারও নাই" ও "কিন্তু আর এক অংশে,—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসাবে, ধর্ম্মাত্মা ও সংযমীর হিসাবে, লোক-শিক্ষক ও জীবনের-পথ-প্রদর্শক হিসাবে রাধাশ্যাম চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অনেক বড়; 'চন্দ্রশেখরের' কবি অপেক্ষা, 'রাধা শ্যামের কবির আদর্শ অনেক উচ্চ"—এই অযথা উক্তি দ্বারা বঙ্কিমবাবুকে অনেক ছোট করা হইয়াছে। আমরা ইহাতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। এই অমার্জ্জনীয় অসঙ্গত উক্তি, স্বাধীনতার নামে, বঙ্কিমচন্দ্রের একজন ভক্তের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইয়াছি।

পুস্তকের আর একস্থানে আছে, "স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয় ভাব বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশ লাভ করিল" এ কথাটীও ঠিক নহে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্তরত্নোদ্ধারের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।"

অসঙ্গত ভাব ও ভাষার চাঞ্চল্য বাহুল্যে এ গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র'কে উপেক্ষা করিয়া এবং 'সাম্য'কে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া তাঁহার হিন্দুত্ব প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও আমরা বলিব, "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" প্রবন্ধে হারাণবাবুর সূক্ষ্মদর্শন এবং সমালোচনা শক্তি যতটুক উন্মেষিত হইয়াছে, তাহা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হইলে, হারাণবাবু একজন কৃতী লেখক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। সৌভাগ্য-সোপান।—শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৲; তৃতীয় সংস্করণ। যে সকল পুস্তক বাঙ্গলা ভাষার গৌরব স্বরূপ, এ পুস্তক তাহার মধ্যে অন্যতর। পুস্তকখানি এতদিন শিক্ষা-বিভাগে উপেক্ষিত হইতেছিল। দেখিলাম, এবার ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে ইহা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি এ পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের কথা। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে এ পুস্তক বড়ই কঠিন হইবে; নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ্য হইলে ঠিক হইত। এই পুস্তকে যে সকল ভাব, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে, অজাত-শ্মশ্রু বালকদিগের তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন।

৬। পুণ্য-কাহিনী।—শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ।৵০। এই পুস্তকখানি পড়িলে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়; কেবল আনন্দ নয়, ইহাতে জীবনত্যাগের যে সকল অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা সংযত, সরল এবং চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানির প্রবন্ধগুলি আর একটু বিবেচনার সহিত নির্ব্বাচিত হইলে, পুস্তকখানি শিক্ষা বিভাগে বেশ চলিতে পারিত। পৃথ্বীরাজ ও সূর্য্য মল্ল প্রভৃতির ন্যায় গল্প ইহাতে না থাকিলেই ভাল হইত। আর একটী কথা, যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনত্যাগের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষার জন্য জীবনত্যাগের মাহাত্ম্য অনেক অধিক। সেরূপ দৃষ্টান্ত এ পুস্তকে নাই বলিলেই হয়। গ্রন্থকার পুস্তকের নাম নির্ব্বাচনে এ কথাটী স্মরণ রাখিলে ভাল হইত। এ পুস্তক পড়িয়া মোটের উপর আমরা খুব সুখী হইয়াছি।

নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রস্তাব। (১)

(১) বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

দুস্তর সাগরে ঐ ক্ষুদ্র তরণী ভাসিল। উহার মধ্যে যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখিতে পাইতেছি। উঁহাদিগের সকলেরই ললাটে যেন সত্যনিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা ও সাহস অঙ্কিত; ইঁহাদিগের মুখে হাসি নাই, অধিক কথা নাই, ভ্রুভঙ্গী নাই। বলিতে পার, উঁহারা কাহারা? কোথায় যাইতেছেন? স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, চিরকালের জন্য জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধুর মায়া কাটাইয়া উঁহারা কোথায় যাইতেছেন?—নিম্নে অনন্ত নীলাম্বু, উচ্চে দিগন্তব্যাপী ব্যোম-নীলিমা—উভয়ই মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে।—নিস্তব্ধ আরোহিগণ বক্ষে ধারণ করিয়া, তরণী তরঙ্গভঙ্গে—তর তর করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আবার জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কাহারা? ইঁহারা সত্যপালনকল্পে, ধর্ম্মরক্ষার্থে স্বাধীনতার মধুর পীযূষ অবাধে পান করিবার নিমিত্ত, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে, দূরে—বহু দূরে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য যাইতেছেন। ঐ শুন, ভক্ত বীরগণ একতানে জলদ-গম্ভীরস্বরে আকাশ কম্পিত করিয়া বিভু-গান গাইতেছেন। ঐ শুন, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতেছেন।—দুরাত্মা নরপতি ১ম চার্লস স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের শিরে আঘাত করিল। যাহারা নির্জ্জীব নহে—পশু নহে—কাপুরুষ নহে—তাহারা কেন অত্যাচার সহ্য করিবে? বরঞ্চ তাহারা দেশ ত্যাগ করিবে, প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করিবে না, সত্য ত্যাগ করিবে না, স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। তাই "মেফ্লোউয়ার" অর্ণবযান জলধিবক্ষে ভাসিল; তাই ভক্ত বীরগণ, তাই স্বাধীনতা-তাপসগণ, যে দেশে নিরুদ্বেগে, নির্ব্বিঘ্নে, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন, সেখানে চলিলেন। যেথানে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ হইতে পারে, তাহা ধর্ম্মক্ষেত্র। তাই এই অর্ণবযানযাত্রী ধর্ম্মক্ষেত্রের তীর্থযাত্রী—ভবিষ্যরাজ্যের জন্মদাতা। তাই তাহারা "Pilgrim Fathers."

পট পরিবর্ত্তন হইল। আবার আর একটী দৃশ্য দেখ। এ-ও সমুদ্র। এবারও জাহাজ।* প্রশান্ত জলরাশি। অস্তাচলগামী দিনমণি—আকাশ লোহিত। পোত বেগে ধাবিত। জাহাজ কন্ কন্ করিল। সহসা রমণীগণের তীক্ষ্ণ চীৎকার আকাশ বিদীর্ণ করিল। পোত গুপ্তশৈলে আহত ও বিদীর্ণ। বেগে বারিরাশি ছুটিতেছে। জাহাজ রক্ষার আশা নাই। এ দিকে প্রশান্ত সমীরণ, প্রশান্ত নিস্তব্ধ জলধি, নীল স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ। অভ্যন্তরে স্পষ্টদৃষ্ট রুধিরলোলুপ গ্রাহগণ বিচরণ করিতেছে। কিন্তু জাহাজে আর্ত্তনাদ, প্রার্থনা, ছুটাছুটী—ক্রন্দন, প্রশ্ন, সর্ব্বনাশ! ইতিমধ্যে সেনাপতির গম্ভীর তুরী ধ্বনি নিনাদিত হইল; অমনি পুরুষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইল—মরণ-কল্পে। হায়! মরিতে নির্ম্মম বিধাতার নির্দ্দয় বিধি! নিম্নে স্নিগ্ধ শান্ত জলরাশি হৈমরাগে রঞ্জিত, উচ্চে হাসিমাখা লোহিত মেঘে অম্বর শো-

* See "The Loss of the Birkenhead." The steam troopship Birkenhead sank near the Cape of Good Hope, 1852; 438 lives were lost including the military commander.

ভিত। মনোহারিণী স্মিতমুখী মধুরা প্রকৃতি— তোমার নিকট, এই সোহাগের সন্ধ্যায় চির-কালেরতরে বিদায় লইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগকরিতে যে বুক ফাটিয়া যায়। তাই এক-জন বলিয়া উঠিল, "যে যেমনে পার, নৌকায় উঠ।" কিন্তু ইংরাজ কাপুরুষ নহে। সেই ভীরুর কথা কেহ শুনিল না। ইংরাজ অবলা ও শিশুগণকে নৌকাতে উঠাইতে লাগিল। নৌকা, শিশু ও অবলাগণকে নিরাপদে রাখিয়া ফিরিল। আবার নারী ও শিশুগণকে নৌকায় উঠান হইল। আবার নৌকা ফিরিল। আবারও অবলা ও শিশুগণ। এদিকে আস্তে আস্তে জাহাজ জলগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। পুরুষগণ, দৃঢ়, নির্ভীকচিত্ত। শিশু ও অবলাগণ রক্ষা পাইল। জাহাজ ডুবিল। পুরুষগণ অটলভাবে ডুবিল, মরিল।

১ম উদাহরণ। অত্যাচার ও অধীনতা অতিক্রম করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করা। ইহাতে সত্যপ্রিয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বধর্ম্মপ্রিয়তা, আত্মনির্ভর, সাহস, উদ্যম, ঐক্যবল, অধ্যব-সায়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা—সকল গুণের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাদিগের চরিত্র আর আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর চরিত্র একবার তুলনা করিয়া দেখ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।

২য় উদাহরণ। কেমন সংযম! কেমন সাহস! শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখ। কিসে আর কিসে,— সিংহে আর শৃগালে যেন। আলোক আর অন্ধকারে যেন। সামলা মাথায় দিয়া, মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে, বাগ্জাল বিস্তার করিয়া, রামের ধন শ্যামকে দিয়া, শ্যামের নিকট অর্থ শোষণ করিয়া গাড়ি বাড়ী করা এক কথা— আর সত্যের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য, ঘর বাড়ী বিসর্জ্জন দিয়া, সাগর পার হইয়া অরণ্যে ঘর বাঁধা আর এক কথা। সাহেবের পা চাটিয়া পদোন্নতি লাভে গর্ব্বে স্ফীত হওয়া এক কথা—আর মজ্জমান জলযানে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য অবিচলিতভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আর এক কথা। বক্তৃতার জয়ঢাক বাজান এক কথা—আর কর্ত্তব্য-পালনে প্রাণদান করা আর এক কথা। যে শিক্ষাতে কেবল রসনা-চালন-পটুতা, কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে, সে এক বস্তু, আর যে শিক্ষাতে সত্যনিষ্ঠা, বল, সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায় ও পৌরুষ হয়, সে আর এক বস্তু। প্রথমটী কুশিক্ষা, দ্বিতীয়টী সু-শিক্ষা। প্রথমটীর পরিণাম ধ্বংস, দ্বিতীয়-টীর পরিণাম উন্নতি। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা কুশিক্ষা; ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, জাতির ধ্বংস।

ইতিমধ্যেই এই শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা তথা-শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যনাশ, নীতিনাশ, বুদ্ধি-নাশ, সুখনাশ, ও মনুষ্যত্ব-নাশ অনেক পরি-মাণে সাধন করিয়াছে। হঠাৎ উপর উপর দেখিলে, বোধ হয় যেন আমাদিগের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, উন্নতি হয় নাই, অধোগতি হইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষাতে ইংরাজের সাহস, বল, উদ্যম, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণ পাই নাই; সুরাপান, সৌখীন ব্যয় ইত্যাদি দোষ পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণে বিলক্ষণ অভিভূত হই-য়াছি। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দয়া, অতিথি-সেবা ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

প্রথম, স্বাস্থ্যনাশ। স্কুল কালেজে পাঠ করি-বার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ বেলা ১০টা হইতে ৪টা, তাহা আমাদিগের দেশের পক্ষে অনুপযোগী এবং আমাদিগের

পুরুষ-পরম্পরা অভ্যাসের নিতান্ত বিরুদ্ধ। ১০ টার সময় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইলে ৯টার মধ্যে আহার সমাপ্ত করিতে হয়, অর্থাৎ বেলা ৮টা বা ৮৷৷০ টার সময় ভোজনে বসিতে হইবে। পূর্ব্বে যাহা মধ্যাহ্নভোজন ছিল, এখন তাহা প্রাতর্ভোজন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে যেরূপ ক্ষুধা উদ্দীপিত হয়, প্রাতে আশৈশব আহার অভ্যাস করিয়াও সেরূপ ক্ষুধা হয় না। সূর্য্যের উত্তাপের সহিত ক্ষুধার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কতকটা অক্ষুধাতে আহার করিতে হয়। আবার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ব্যঞ্জনাদি সমুদয় প্রস্তুত করিবার যেরূপ অবসর পাওয়া যায়, প্রাতঃকালীন্ খাদ্য প্রস্তুতের জন্য সেরূপ অবসর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহা কিছু অল্প খাদ্য তাড়াতাড়ি করিয়া রন্ধন হয়, তাহা অনেক সময় উত্তমরূপে পক্ব হয় না। আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম না করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। কিন্তু ছাত্রগণকে আহার করিয়া পুস্তক-রাশি হস্তে করিয়া বিদ্যালয়াভিমুখে দৌড়িতে হয়। ইহাতে ভুক্ত অন্ন ও ব্যঞ্জন ভালরূপ পরিপাক হয় না। তৎপরে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন সুকুমার বালক বিদ্যালয়ে উপনীত হয়, তখন যদি একটু বিলম্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বসিতে পায় না, তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত মূঢ় শিক্ষকদিগের নিকট এই নিষ্ঠুর ব্যবহার Discipline নামে অভিহিত। অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে বহু ছাত্র ঠেসাঠেসি করিয়া অবস্থান করে, এবং দূষিত অবরুদ্ধ বায়ু সেবন করে। আটটা নয়টার সময় যে আহার হয়, তাহা ভালরূপ হয় না। সুতরাং বেলা একটা দুইটার সময় বালকদিগের অতিশয় ক্ষুধা বোধ হয়। কিন্তু তখন কোনও সারবান খাদ্য পায় না। দুই এক পয়সার মিঠাই খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি বা দেহ পুষ্টি হয় না। বেলা ৩টা ৪টার সময় বিদ্যালয় হইতে বাসায় গিয়াও দুই বা চারি পয়সায় যৎসামান্য জলযোগ হয়, তাহাতে বালকগণকে জঠরানলে দগ্ধ হইতে হয়। এখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য পল্লীগ্রামস্থ ব্যক্তিকে তাহার পুত্রগণকে সহরে পাঠাইয়া দিতে হয়। সহরে দুগ্ধ ইত্যাদি দুর্লভ। বাসায় মাতা বা মাতৃস্বসা বা পিতৃস্বসা বা ভগিনী অর্থাৎ যাঁহারা উত্তম আহারাদির জন্য বিশেষ যত্ন করেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই থাকেন না। থাকে পাচক ও চাকরাণী। উভয়ে বাজারের পয়সা চুরি করিবার জন্য যত ব্যস্ত, বালকদিগের যত্ন করিবার জন্য তত ব্যস্ত নহে। অপরাহ্নে রন্ধন করিয়া বালকগণের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইলে তাহারা বিদ্রোহী হয়। বালকগণের ক্ষুধা রাত্রিতে পড়িয়া যায়, যাহা কিছু ক্ষুধা থাকে, ব্রাহ্মণ ও ঝির উপদ্রবে এবং অর্থের অনাটনে তাহাও পরিতৃপ্ত হয় না। আহারের দশা ত এইরূপ, তাহার উপর আবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়।

সমুদয় বৎসর এইরূপ অর্দ্ধাহার ও অতিরিক্ত শ্রম করিয়া দেহ ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে থাকে। বৎসরের শেষে পরীক্ষার সময় প্রত্যেক বালককে মহা উদ্বেগ ও শঙ্কাময় দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হয়। পরীক্ষার ফল কি হয়, অদৃষ্টে কি আছে, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে যদি না পারি, এবম্বিধ আশঙ্কা চিন্তাতাপে বালকগণের প্রাণবায়ু শোষিত হইতে থাকে। সুতরাং জীবনের যে অংশ আনন্দের, উল্লাসের ও স্ফূর্ত্তির সময়, সেই অংশই সংশয়, চিন্তা, ভয়, বিষাদে আক্রান্ত থাকে, এবং এইরূপে, বাল্যকালেই ভাবী সাংঘাতিক রোগের বীজ দেশে

বপন করা হয়। অনাচারের ছিদ্র দিয়া নল-রাজার দেহে কলি যেরূপ প্রবেশ করিয়াছিল তেমনি, কুশিক্ষার ছিদ্রদিয়া বালকের দেহে রোগ প্রবেশ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন সমাপ্ত হয়, তখন যাহাতে অঙ্গচালনা হয়, কুশিক্ষিত যুবক তাহা করে না। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কঠিন মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু মানসিক শ্রমের সহিত স্বাস্থ্যজনক উপযুক্ত শারীরিক শ্রম করার শিক্ষা হয় নাই। সুতরাং বাল্যে শিক্ষা প্রণালীর দোষে যে রোগের বীজ গূঢ়ভাবে উপ্ত হইয়াছে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বিকাশ হইতে থাকে।

দেশের শিক্ষিত প্রৌঢ়জনের মধ্যে সচরাচর এমন এক ব্যক্তিও পাওয়া যায় না, যাঁহার শরীরে কোন না কোন ব্যাধি মূলবদ্ধ হয় নাই; মন্দাগ্নি, বহুমূত্র, শিরঃপীড়া, হৃৎপিণ্ড-ক্ষীণতা ইত্যাদি বিষম রোগের কোন না কোনটীতে প্রায় প্রত্যেকেই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন; অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কুশিক্ষার কি শোচনীয় পরিণাম!

বাঙ্গালার কোন এক চিন্তাশীল লেখক মনে করেন যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেহ দিন দিন এমন নিস্তেজ ও অসুস্থ হইতেছে যে, আর কয়েক পুরুষের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী ক্রমে নিঃসন্তান হইবে। ইংরাজি পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, মস্তিষ্কের অতিচালনায় সন্তান উৎপাদনের লাঘব হয়। এ কথা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু অস্বাস্থ্যে, রোগে ও দুর্ব্বলতায় যে সন্তানোৎপাদন কম হয় এবং ক্রমে ক্রমে বংশ লোপ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ দেখা যায় না।

২। নীতিনাশ। বর্ত্তমান শিক্ষাতে এক দিকে যেমন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, কায়িক রোগ সঞ্চারিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি নীতি ও ধর্ম্মবিধ্বস্ত হইতেছে, নৈতিকব্যাধি উৎপাদিত হইতেছে। হইবারই কথা। মা বাপ গুরুজন ছাড়িয়া ছাত্র সহরে পড়িতে আসিল। সেখানে তাহাকে শাসন করে, বা তাহার তত্ত্বাবধান করে, এমন কেহ নাই। বরঞ্চ তাহাকে মন্দপথে লইয়া যাইবার লোক আছে। সহরে বাসার চাকরাণী সাধ্বী নহে। পল্লিগ্রামে যে চাকরাণী থাকে, সে প্রতিবেশিনী সচ্চরিত্রা, লজ্জাশীলা, গৃহস্বামীর কন্যাতুল্যা। কুলটা দাসী ভদ্র-পরিবারে স্থান পায় না। চাকরাণী অন্তঃপুরে থাকে, সুতরাং পুরুষদিগের সহিত তাহার সংস্রব কম। সে "মা ঠাকুরাণী"র নিকটই সদাসর্ব্বদা থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করে। যে চাকরাণীর বাড়ী কাছে, সে রাত্রিতে বাড়ী গিয়া নিজের পরিবারের ভিতর থাকে; আর যদি বাড়ী দূরে হয়, প্রভুভবনে মা ঠাকুরাণী বা দিদি ঠাকুরাণী, পিসি ঠাকুরাণীর কাছে শয়ন করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া শ্রম করিয়া খাটিয়া খায়। তাহারা সহরের হাবভাব হাস্য কটাক্ষ রঙ্গভঙ্গ কিছুই জানে না। আবার পুত্রের উপর পিতা মাতার সতত চক্ষু রহিয়াছে। এস্থলে পুত্রগণের চরিত্র পরিচারিকা দ্বারা দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। সহরের চাকরাণী পল্লীগ্রামের চাকরাণীর ঠিক বিপরীত। তাহারা প্রায়ই দুশ্চরিত্রা। তাহারা ছাত্রগণকে নিত্য নরকের দিকে আকর্ষণ করে। বাসার অভ্যন্তরে এই। বাসার বাহিরে ইহার অপেক্ষা অধিক বই কম বিপদ নহে। সহরের প্রায় সকল পল্লীতেই বারাঙ্গনা-গৃহ। সুতরাং ছাত্রগণের বাসার ঠিক সম্মুখেই অনেক স্থানে মোহজনক পাপদৃশ্য

নিত্য নয়নগোচর হয়। ছাত্রগণের পাঠক্লান্ত নেত্র, যখন একটু বিশ্রামের জন্য, পুস্তক ছাড়িয়া বাতায়ন পথে চালিত হয়, কোথায় প্রকৃতির পবিত্র শোভা নীরদনীল শৈলমালা বা দুর্ব্বাদল শ্যামলক্ষেত্র বা বিশাল বিটপীপুঞ্জ বা নির্ম্মল সলিলা নদী বা পুষ্প মনোরম গুল্মলতা তাহাদিগের নয়ন ও মনের অবসাদ দূর করিয়া নয়ন ও মনকে শান্ত পবিত্র করিবে, না, হতভাগিনীদিগের নিত্য-পরিত্যজ্য, চিত্তপীড়াদায়িণী মূর্ত্তি ছাত্রদিগের নয়ন-পথে পতিত হয়। কি দুঃখের বিষয়! বাসায় এই। রাজপথে দুই পার্শ্বে সজ্জিতা ভূষিতা কুহকিনীগণ নিম্নে উচ্চে দণ্ডায়মান। ছাত্রগণ সহরে যত্র তত্র পাপদৃশ্য দেখিতেছে, পাপের প্রলোভনের অতি নিকটে বিচরণ করিতেছে। ইহার উপর, নিকটে তাহাদিগের পিতা বা অন্য কোনও গুরুজন নাই যে, তাহাদিগকে রক্ষা করেন বা শাসন করেন। বাসাতে, বাসার সম্মুখে, রাস্তার ধারে,চতুর্দ্দিকে প্রলোভন এবং গুরুজন শাসনের অভাব, এরূপ স্থলে যুবকদিগের নীতির যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের দেশে সহরে ছাত্রগণ যেরূপ রক্ষকহীন অবস্থাতে বাস করে, বিলাতে কুত্রাপি তাহা নাই। সার্‌চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় যে,এ দেশের বিদ্যার্থীগণকে সহরে এরূপ বিপন্ন ও অপরিদর্শিতভাবে থাকিতে দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দেশের লোক শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবেন না। ভাবী মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করেন না। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ের কোন প্রতীকার করেন না।

সহর স্বরূপ বিপদ সাগরে ছাত্রতরণীর এক মাত্র কাণ্ডারী শিক্ষক। যদি কাহারও কর্ত্তব্য হয়, ছাত্রগণকে রক্ষা করা,ছাত্রগণকে বিশুদ্ধ রাখা, তাহা শিক্ষকগণের। কিন্তু শিক্ষকগণ এবিষয়ে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ উদাসীন।

শিক্ষক ছাত্রের নীতির জন্য চিন্তিত নহেন। বিদ্যালয়ে আসিয়া,নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করাইয়া তিনি চলিয়া যান। ছাত্র স্কুলের বাহিরে কি করে না করে, অধঃপাতে যাইতেছে কিনা, ইহার তিনি কোন সংবাদই লন না। বিদ্যালয়ে পাঠের সময় স্নেহজাত ব্যাকুলতা ও আগ্রহের সহিত নীতি বিষয়ক উপদেশ দেন না। পরীক্ষাতে "পাশ" করাইতে পারিলেই শিক্ষকের যশ ও উন্নতি। শিক্ষকের চরিত্র ও স্বভাবের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নাই,অনেক স্থলে শিক্ষক নিজেই দূষিতচরিত্র,মদ্যপায়ী। সুরাপান বা ইন্দ্রিয়াসক্তি শিক্ষকের চাকুরীর পক্ষে কোন বিঘ্ন হয় না, যদি তিনি "পাস" করাইতে পারেন। এবম্বিধ দূষিতচরিত্র শিক্ষক ছাত্রের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারে না, প্রত্যুত তাহার দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ চরিত্র ছাত্রও দূষিতচরিত্র হয়। যে সকল ব্যক্তি পঠদ্দশাতেই পাপে পতিত হয়, তাহারা সংসারে প্রবেশ করিলে, টাকা উপার্জ্জন করিতে শিখিলে, তাহাদিগের নীতি-চরিত্রের চরম দুর্দ্দশা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

শিক্ষিত লোকের মধ্যে সুরাপান ইত্যাদি যে চরিত্রদোষ দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষাস্বরূপ বিষবৃক্ষের বিষময় ফল। অনেকে বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষাতে একটা বিষয়ে নীতির উন্নতি হইয়াছে,—যুবকগণ উৎকোচ গ্রহণ করেন না। আমি ত তাহা দেখিতে পাই না। যে সব চাকুরীতে বেতন কম, ক্ষমতা অধিক, সে সব চাকুরীতে পূর্ব্বেও যেমন ঘুষ চলিত, এক্ষণও তেমনি ঘুষ চলে। কাহাকে

কিছু না কিছু পূজা না দিয়া,কোনও আপিসে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই বিলক্ষণ জানেন। যাঁহারা বেতন অধিক পান, যাঁহাদিগের বিনা উৎকোচে বেতনের টাকাতে সংসার চলিতে পারে, তাঁহারাই কেবল উৎকোচ গ্রহণ করেন না। পূর্ব্বে ঐ সকল পদের বেতন কম ছিল, সুতরাং এ সকল পদের লোক উৎকোচ লইত। সাহেবদিগের মধ্যেও পূর্ব্বে যথন বেতন কম ছিল, খুব উৎকোচ চলিত। এখন বেতন অধিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উৎকোচের কথা প্রায়ই শোনা যায় না। কিন্তু ফর্ডাইস সাহেব সামান্য ডিপুটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ পদের বেতনে একজন ভদ্র সাহেবের সংসার চলা কঠিন। তাই ফর্ডাইস উৎকোচ-পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষেও সেইরূপ ডেপুটীর ও মুন্সেফের বর্ত্তমান বেতনে, বাঙ্গালীর সংসার একরূপ চলে। তাই উৎকোচ কম। শিক্ষিত ডেপুটী বা মুন্সেফকে ২০ বা ৩০ বা ৫০ টাকা বেতন দেওয়া হউক; দেখিবেন, উৎকোচ পূর্ব্বের মত অধিক হইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষার গুণে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ কমে নাই। যাহা কমিয়াছে, তাহা বেতন বৃদ্ধির জন্য। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভিতরে কেবল মদ্যপান ইত্যাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, এমন নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ঘোর স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী দুঃখী অনাথকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, অসমর্থ সহোদর ও বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও ভরণপোষণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে ক্ষুধাতুর অতিথি উপস্থিত হইলে তথনি নিষ্কাশিত হয়, দ্বারে অন্ধ ভিক্ষুক এক মুষ্টি চাউলের জন্য চীৎকার করিলে তিনি ও তাঁহার গৃহিণী শুনিতে পান না। অহো শিক্ষা! অহো ধর্ম্ম! ধর্ম্মের নাম কেন করি? ধর্ম্ম বলিয়া যে বাস্তবিক কোন বস্তু আছে,তাহা অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বীকার করেন না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম তাঁহাদিগের অধিকাংশের নিকট কাল্পনিক বস্তু। ধূর্ত্ত,বা আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণের সৃষ্টিমাত্র। শিক্ষার কি উন্নতিই আমাদিগের দেশে হইতেছে!

শিক্ষিত বাঙ্গালী যেমন স্বার্থপর,আবার তেমনি ভীরু ও কাপুরুষ। ভীরু ও কাপুরুষগণ বীরজাতির নিকট চিরকালই ঘৃণিত। তাই Englishman, Pioneer, Civil and Military Gazette প্রভৃতি সংবাদ পত্রে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি মধ্যে মধ্যে ঘৃণাপ্রকাশক বাক্য স্বতঃই নির্গত হয়। সে দিন Covil and Military Gazette কি বলিয়াছেন, শুনুন:—

"That spurious excrescence, the academic Bengalee Babu, is turbulent and courageous only as far as bombastic verbosity goes: and a Naik's guard of Madras sepoys or even the hospital dooly-bearers of a Madras regiment would put to ignominious flight the entire horde of seditious Babus."

বাঙ্গালী জাতি স্বাভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু, অনেকেই বিবেচনা করেন। কিন্তু সেটী ভুল। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-রচয়িতার একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে,তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইদানীং বাঙ্গালীকে দেখিয়া সকলেই অনুমান করেন যে, এজাতি কখনই বলবান ও সাহসী ছিল না। মেকলে (Macauley) সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহারা এতই ভীরু যে, কোম্পানীর সৈন্যমধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। তাহার এই কথাটী নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমসঙ্কুল। তিনি যে কালে ভারতবর্ষে ছিলেন, সে কালের বাঙ্গালিগণ বীর্য্যহীন বা সাহসবিহীন ছিল না; ভদ্রাভদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে বহু

বলীয়ান ও সাহসী পুরুষ ছিল। তাহার ভারতবর্ষে আসিবার কিছুকাল মাত্র পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, নবাবসিরাজ-দ্দৌলার সময়েও, আপন আপন জমীদারীর রক্ষার ভার জমীদারগণের প্রতি অর্পিত ছিল। নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগরের) রাজাদের সম্রাটদত্ত ফরমানে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই ভার নির্ব্বাহার্থে তাঁহাদিগের সৈন্য রাখিতে হইত এবং ঐ সৈন্যমধ্যে অনেক বঙ্গীয় যোদ্ধা থাকিত। তাহারা গদাযুদ্ধে, ধনুর্বিদ্যায়, অসিচর্ম্ম ব্যবহারে এবং বর্শাচালনে অতি সুনিপুণ ছিল। নবদ্বীপের রাজাদের সৈন্যের সেনানীপদে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়জাতীয় লোকই নিযুক্ত থাকিত। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্য মধ্যে মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গবাসী সেনাপতি ছিলেন। ** জমীদারপুত্রগণ তদানীন্তন রীত্যনুসারে যুদ্ধবিদ্যা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শিখিতেন। শুনিয়াছি, কুমার শিবচন্দ্র বন্দুক অভ্যাস করেন নাই বলিয়া, তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকদিন তাহার মুখ দেখেন নাই। আমাদের বাল্যাবস্থায় যখন জমীদার ও নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ হইত, তখন তাহাদিগের অনেক লাঠিয়াল ও সরকিওয়ালা থাকিত। তাহারা পশ্চিমদেশীয় যোদ্ধা অপেক্ষা বল বা সাহসে কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। তবে তাহারা কোম্পানির সৈন্যভুক্ত হইত না। ১ম, তাহারা বড় রণপ্রিয় ছিল না। ২য়, তাহাদের বাটীতেই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থাকাতে তাহারা বিদেশে যাইবার ইচ্ছা করিত না। ** দেশীয় সৈন্য ব্যতীত কোন দেশই বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন ইহা অবশ্য স্বদেশীয় সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইত। আমাদের এমন উর্ব্বরা দেশ যে, পার্শ্বস্থ রাজারা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন না, ইহা কখনই সম্ভব নহে, এবং বঙ্গীয় রাজারা যে বিদেশীয় সৈন্য দ্বারা স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতেন, ইহা বিশ্বাস্য নয়। ইদানীং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গীয় ইতিহাসে ও বঙ্কিম বাবুর "বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রবন্ধে" অকাট্য প্রমাণের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে "রঘুবংশের" সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের অনেক নরপতি ও জমীদার ভূয়োভূয়ঃ যুদ্ধে জয়ী হইয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ** সম্রাট আকবরের সময় প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি রাজা ও জমীদার বিনাযুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করেন নাই।"

যাহা উদ্ধৃত করিলাম, ভরসা করি, তাহাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ইদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালী কেমন দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছেন, বাঙ্গালী চিরকাল তেমন ছিল না। এই দুর্ব্বলতার ও ভীরুতার প্রধান কারণ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রায়ই রোগগ্রস্ত ও হ্রস্ব আহারে হীনবল। যাহারা হীনবল, তাহাদের সাহসের অভাব হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাহার উপর যে সকল উপায়ে সাহস কার্য্যতঃ বৰ্দ্ধিত ও উৎসাহিত হয়, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে আদৌ নাই; গৃহরুদ্ধ ক্ষীণ-দেহ পুস্তক-কীটের আর কত সাহস হইবে? শিক্ষাকালে বাঙ্গালী গ্রন্থে সাহসের কথা অনেক পড়ে, কিন্তু যাহাতে সাহসের অভ্যাস ও বিকাশ হয়, তাহাকে শিক্ষাকালে এমন কার্য্য কিছুই করিতে হয় না। সাহসের বিকাশ অনেকটা অভ্যাসের অধীন। জগদ্বিখ্যাত পোতযোদ্ধা বীর নেলসন (Nelson) যখন প্রথমবার যুদ্ধ করেন, তখন ভয়ে তাঁহার পদদ্বয় কম্পিত হইয়াছিল। এমন কি, তিনি দুঃখে সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হয় ত স্বভাবসিদ্ধ ভীরুতাবশতঃ তিনি যুদ্ধকার্য্যে অনুপযোগী। সেনাপতি তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "প্রথম বার আমারও ঐরূপ হইয়াছিল, কিন্তু অভ্যাসে দেখ এখন আমার আর কখন কিছুমাত্র ভয় হয় না। তুমিও আমার মত নির্ভীক হইবে।" যে বাঙ্গালী শিক্ষার সময় হইতে সাহসে অনভ্যস্ত ও অনুৎসাহিত, অথচ বীরত্ব বর্ণনাময় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তাহার বীরত্ব বাক্যবিভবে পর্য্যবসিত, সুতরাং উপহসিত হইবে না ত কি হইবে?

৩। বুদ্ধিনাশ। কেহ কেহ বলেন যে, "বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা স্বাস্থ্য ও নীতি বড়ই দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, স্বীকার করি, কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা আমাদিগের কতক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা কুসংস্কারে পূর্ণ ছিলাম। অজ্ঞান অন্ধকারের ভিতর ছিলাম। বর্ত্তমান শিক্ষাতে আমরা আলোক পাইয়াছি, আমাদিগের বুদ্ধি পরিচালিত হইয়াছে।" এ মতটীও প্রমাদযুক্ত। বর্ত্তমান শিক্ষ প্রণালীতে বুদ্ধিবিকাশ হইতেছে না, বুদ্ধিনাশ হইতেছে। বিদ্যালয়ে এখন যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বুদ্ধিচালনা প্রায়ই হয় না, প্রায়ই মুখস্থ করা হয়। আমি যখন কলেজে পাঠ করিতাম, তখন আমার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে ইহার দুইটী দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম। ইহাদিগের মধ্যে Hydrostatics বিষয়ক সহজ পুস্তক লিখিত পাঠও বুঝেন নাই। কিন্তু না বুঝিয়াও এমন মুখস্থ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহা আদ্যোপান্ত অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আর একটী ছাত্র Hamiltonএর Lectures on Metaphysics 2 vols. আদৌ পড়েন নাই, কিন্তু মহাপণ্ডিত অধ্যাপক সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট (Sir Alfred Croft) কৃত সমালোচনা বিশেষ শ্রম করিয়া তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়াছিলেন। ইহারা দুই জনেই বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; এক জন ১ম শ্রেণীতে। কোন কলেজের বি, এ, ক্লাসের ইতিহাস অধ্যাপনার আর একটী ঘটনা বলি। Dr. Arnold's Lectures on Modern History পাঠ্যপুস্তক। অধ্যাপক সেই পুস্তকখানি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ বলিল "মহাশয় এরূপ পড়াইলেত হইবে না। আমাদিগের অধিকাংশের ঐ পুস্তক নাই। সুতরাং ঐ পুস্তক আমাদিগের কখনও পড়া হইবে, তাহার আশা কম। যাহাতে আমরা ঐ পুস্তকের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, এরূপ notes লিখিয়া দিন।" অধ্যাপককে অগত্যা তাই করিতে হইল। ছাত্রগণ পুস্তক না পড়িয়া অধ্যাপকের 'notes' অর্থাৎ পরীক্ষকগণ সম্ভবতঃ যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম মুখস্থ করিল, এবং যাহারা ভাল করিয়া মুখস্থ করিল, তাহারা ঐ বিষয়ে ভাল করিয়া 'পাস' হইল। কারণ সৌভাগ্যক্রমে প্রশ্নগুলি সমুদয়ই notesএর ভিতর পড়িয়াছিল। এই রকল কাকাতুয়া ছাত্রগণ যে জ্ঞানলাভ করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিচালনা না করিয়া এইরূপ "যথালিখিতং তথা কণ্ঠস্থং" শিক্ষাতে কেবল কিছু মাত্র জ্ঞানলাভ হয় না, তাহা নহে; ভবিষ্যতে বুদ্ধিশক্তি চালনা করিবার ক্ষমতা ক্রমে একবারে লোপ পাইয়া যায়। কোন বিষয়ই বহুক্ষণ স্বাধীন ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিবার সামর্থ্য থাকে না। ছাত্রগণের অনেক বিষয় গলাধঃকরণ করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল মানসিক খাদ্য তাহারা মোটে পরিপাক করিতে পারে না। তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বুদ্ধিতে এক প্রকার মানসিক অজীর্ণ অক্ষুধা হয়। তাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া কোন বিষয়ই আর শিখিতে চাহে না, এবং যাহাও শিখে তাহাও পরিপাক করিতে পারে না, তাহার সার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না। ইহাকে বুদ্ধিনাশ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? এই জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালির ভিতর পাণ্ডিত্য এত কম, স্বাধীন চিন্তা, কোন মৌলিক বিষয়ের উদ্ভাবন একবারেই দৃষ্ট

হয় না। তদ্ব্যতীত, যাহাদিগের স্বাস্থ্য একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীতি আবিল হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের নিকট বহুবৎসরব্যাপী প্রগাঢ় চিন্তা-প্রসূত কোনও মূল্যবান গ্রন্থ প্রত্যাশা করা যায় না।

৪। সুখ-নাশ। যাঁহাদিগের স্বাস্থ্যনাশ, নীতিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইয়াছে, তাঁহাদিগের সুখনাশ অনিবার্য্য। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভিতর নির্ম্মল আনন্দ নাই। সন্ধ্যার সময় আফিসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহারা যখন বিশ্রাম করিয়া থাকেন, দেখিবেন, তাঁহারা কেমন নিরানন্দ, তাঁহাদিগের কথোপকথন কেমন নীরস, জীবন কেমন অবসাদময়। শিক্ষিত ভদ্র লোকের ভিতর সঙ্গীতের চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ভদ্রলোকের ভিতর যাঁহারা বিষয় কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহারা অনেকে সঙ্গীত নিপুণ ছিলেন। দশজন সমবেত হইলে, তানপূরা মৃদঙ্গসম্মিলিত, তানলয়-বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীর মধুর আলাপ হইত, শ্রোতৃগণের হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইত, সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয় সুখ হৃদয়কে যেন স্বর্গে লইয়া যাইত। সে সব সুখের দিন নব্য শিক্ষাগুণে এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন দশজন একত্র হইলে, না হয় পরনিন্দা, না হয় সুরাপান; না হয় গোলামির গল্প—অমুক সাহেব কি লিখিয়াছে, অমুক সাহেব কবে বদলী হইবে, ইত্যাদি। অহো শিক্ষা! এইরূপে যে শিক্ষাতে স্বাস্থ্যনাশ, নীতিনাশ, বুদ্ধিনাশ ও সুখনাশ হইতেছে, তাহা আর কিছু কাল চলিলে যে অচিরে শিক্ষিত বাঙ্গালী একবারে উৎসন্ন যাইবে, তাহা ত দেখাই যাইতেছে।   ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা। (১) *

আজ কাল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম লইয়া এ দেশে বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জাতীয় ধর্ম্মের উপকারিতা, বিশেষত্ব ও আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, এবং জগতের সমুদায় ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক উদার ভিত্তির উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; আর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকেরা, সার্ব্বভৌমিকতার অসারতা ও অযৌক্তিকতা অনুভব করিয়া, যত শীঘ্র পারেন, ইহাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সমাজ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের মধ্যেও সার্ব্বভৌমিকত্বের একটা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এ আন্দোলন আজ কাল সর্ব্বত্রই; তবে কোথাও কম, আর কোথায়ও বা কিছু বেশী। অতএব এ সময়ে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলে তাহা নিতান্ত অসময়োচিত হইবে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বিষয়টী অতীব গুরুতর। এরূপ একটী বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ যেরূপ পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন, সাধন-বল ও আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি থাকিলে এইরূপ একটী কঠিন প্রশ্নের স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, লেখকের সেরূপ কিছুই

* এই প্রবন্ধটী ভিন্ন নামে, ২৯শে আষাঢ়, শুক্রবার, তত্ত্ব-বিদ্যা সভায় পঠিত হইয়াছিল।

নাই। সুতরাং এ প্রবন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জন ও তৃপ্তি সাধন হইবে বলিয়া আশা করি না; সাধারণের ইহাতে চিত্ত-বিক্ষেপ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপারের উৎপত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ অনেকের চিত্তে উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ একটী বিষয়ের অবতারণা হয়, নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে ইহার আলোচনা হয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিত্তে এ বিষয়ের উদ্দীপনা জন্মে, এই অভিপ্রায়েই অযোগ্যতা ও অপরিপক্কতা সত্ত্বেও, এইরূপ দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ধর্ম্মের উদার ভিত্তি বা সার্ব্বভৌমিকত্ব জিনিষটা কি? সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। সার্ব্বভৌমিকত্ব ধর্ম্মের একটি স্বরূপ। সৃষ্টি-কৌশলে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া যেমন এক জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায়, পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ধরিয়া যেমন এক অপরিজ্ঞেয় আদি কারণে উপস্থিত হওয়া যায়, মানবের বিচার শক্তি, ন্যায়পরতা, প্রেম, প্রেমে আত্ম বিলোপ এবং অপরের সুখের জন্য আত্ম বিসর্জ্জনের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন এক অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ ও পবিত্র পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ জগতের সভ্য অসভ্য, আস্তিক নাস্তিক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু ম্লেচ্ছ, জুলু ইংরাজ সকলেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিশ্বাস দেখিয়া ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক বিধাতৃত্বে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধৃ ধাতুর অর্থ পোষণ করা। অতএব যাহাতে মনুষ্যকে পোষণ করে, তাহাই যদি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, তবে যুক্তিবাদী, জ্ঞানবাদী, হিতবাদী, বিবর্ত্তনবাদী, জড়বাদী প্রভৃতি সকলেরই ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, সকলেই বিশ্ব বিধাতা পরমাত্মাকে কোন না কোনরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে, এ কথা বলা কোনরূপে অযৌক্তিক নহে। বিভিন্ন দেশ-প্রচলিত জড়পূজা, নরপূজা, এবং ব্রহ্মপূজা দেখিয়াও এক অখণ্ড, অদ্বিতীয়, নিত্য এবং অনন্ত পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। আইসল্যাণ্ডবাসিগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিতবর কারলাইল বলিয়াছেন :—

"Of the chief god, Odin, we shall speak by and by. Mark at present so much; what the essence of Scandinavian and indeed of all Paganism is: a recognition of the forces of Nature as God-like, stupendous, personal Agencies,—as Gods and Demons....It is the infant thought of man opening it-self, with awe and wonder, on this ever-stupendous Universe."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নরম্যানদিগের প্রধান দেবতা ওডিনের বিষয় আমরা ক্রমে বলিতেছি। তাহাদের, কেবল তাহাদের কেন, আদিমাবস্থাপন্ন সমস্ত জড়োপাসকদিগের ধর্ম্মের মৌলিকভাব এখন লক্ষ্য করিয়া দেখ; ইহারা জড়শক্তিকে দেবী, মহতী ও মূর্ত্তিমতী বলিয়া জ্ঞান করে,—দেবতা এবং অসুরের মূর্ত্তি বলিয়া অনুভব করে। এই চির-অদ্ভুত পৃথিবীতে মানবের চিন্তাঙ্কুর এইরূপ ভয় ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইতে থাকে। সরল, অকপট, অশিক্ষিত নরম্যানগণের পক্ষে প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান কার্য্য সকলের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ করা এবং জড়শক্তির কার্য্য সকলকে সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক, মহৎ এবং দৈব বলিয়া জ্ঞান করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয়

নহে। মানব জাতির শৈশবাবস্থায় এইরূপ বিশ্বাসই স্বাভাবিক। জড়বিজ্ঞান যে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে, সরল-প্রাণ আদিম জাতি সকল সেই তত্ত্বের জড়মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসভরে তাহারই সম্মুখে প্রণিপাত করিয়াছে। নরম্যানেরা তুষার, অগ্নি, সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি প্রকৃতির ভীষণ শক্তি সকলকে দানব (Jotnns) বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা সূর্য্যালোক ও গ্রীষ্ম ঋতুর প্রখর উত্তাপ প্রভৃতিকে ভগবানের মঙ্গল বিধায়িনী শক্তি (Friendly power of God) বলিয়া পুজা করিত। অস্মদ্দেশীয় দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর-বিনাশী দুই শক্তির অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস ছিল। হিন্দুর দেবলোকের ন্যায় ইহাদেরও দেবলোক (Asgard) ছিল। হিন্দুর রক্ষ লোকের ন্যায় ইহাদেরও রক্ষলোক (Jotnnheim) ছিল। ইহাদের নিকট বজ্র কেবল মাত্র বৈদ্যুতিক শক্তি (Electricity) রূপেই প্রতীয়মান হইত না। বজ্রকে ইহারা থর (Thor or God Donner) বলিয়া বিশ্বাস করিত। থর দেবতার হস্তের অব্যর্থ অস্ত্র ভীষণ অশনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া জীবের বিনাশ সাধন করে, ইহাদের মনে এইরূপ বিশ্বাসও স্থান পাইয়াছিল। সৃষ্টির আদিম অবস্থাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ সরল, অমার্জ্জিত, অস্ফুট এবং অন্ধ বিশ্বাস ছিল। প্রাচীন গ্রীক্দিগের ধর্ম্মের আদিম অবস্থাও এইরূপই ছিল। তবে তৎকালীন শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাকৃচিক্যে তাহাদের সরল ও অকপট ধর্ম্ম বিশ্বাস আমোদপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যপ্রবণতা দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, এই মাত্র প্রভেদ। প্রাচীন আর্য্যভূমির প্রতি দৃষ্টি করিলে কি দেখিতে পাই? আর্য্য জাতির শৈশবকালে,—সরল, স্বাভাবিক বৈদিক অবস্থাতে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য,চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রত্যক্ষ দেবতারূপে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের ঝঞ্ঝাবাত, সূর্য্যের পাপতাপ-নাশিনী শক্তি এ সমস্তই প্রাচীন হিন্দুর নিকট দৈব শক্তি রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইত। মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের মেদে পরিপ্লুত হইয়া মেদিনী হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসের মূলে যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ এক পৌরাণিক সংস্কার যে বহুকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। প্রাচীন আইসল্যাণ্ডবাসিদিগের চিরপ্রচলিত ধর্ম্মসংস্কার পর্য্যালোচনা করিতে গিয়াও তদ্রূপই একটী সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"The Gods having got the Giant *Ymer* Slain, determined on constructing a world with him. His blood made the Sea; his flesh was the Land, the Rocks his bones, his skull was the great blue vault of immensity."

"দেবতাগণ ওয়াইমার নামক দানবকে বধ করিয়া তাহা দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহার শোণিতে জলধি, তাহার মেদে মেদিনী, তাহার অস্থিতে ভূধর এবং তাহার করোটিতে অনন্ত নীলাকাশ সৃষ্ট হইল।"

জড়জগৎ যেমন বাষ্পাবস্থা (Gaseous) হইতে দ্রবাবস্থা (Liquid state) এবং দ্রবাবস্থা হইতে ঘনাবস্থা (Solid state) ক্রমশঃ লাভ করিয়া জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে, অধ্যাত্ম জগতেও সেইরূপ বিবর্ত্তনের নিয়ম লক্ষিত হয়। জড়োপাসনা, নরোপাসনা এবং ব্রহ্মোপাসনা,এই তিনের মূলেই ব্রহ্মসত্তা,কথ-

নও তামসিক, কখনও রাজসিক, কখনও বা সাত্বিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন আইস্‌লেণ্ডবাসী নরমান জাতির মধ্যে এই ব্রহ্মসত্বার প্রতি প্রেম, ভক্তি ও নিষ্ঠা সাধুভক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যে নরমান্‌গণ আদিমাবস্থায় জড়োপাসক ছিল, তাহারাই ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ওডিন (Odin) নামক মহাপুরুষে তাহাদের স্বাভাবিক প্রেমভক্তি কেন্দ্রীভূত করিল। নরম্যানের ওডিন ও ইংরাজের সেমুয়েল জন্‌সন্, খ্রীষ্টিয়ানের খৃষ্ট ও মুসলমানের মহম্মদ, হিন্দুর বুদ্ধ,শঙ্করাচার্য্য,শ্রীচৈতন্য,নানক,কবির ও গ্রীকের সক্রেটীশ এর চীনের কন্‌ফুচ্; ইটালীয়ানের ডান্টে ও জর্ম্মানের গীটে এবং ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবের অধিনায়কগণের অশীতিপর বৃদ্ধ ভল্‌টেয়ার, ইঁহারা সকলেই সাধু বা মহাজন। ইঁহারা সকলেই স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় নরনারীগণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিত হইয়াছেন। মানবান্তরের যে স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান, জড়ে মহোচ্চভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, জড়ের পূজা করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মজ্ঞানই আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সুন্দরতর, পবিত্রতর মানবের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, মহত্ব এবং দেবত্ব দেখিয়া তাঁহাকে পূজার্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্রমে জড়ের অধিকার লোপ পাইয়া মহাপুরুষের অধিকার (Hierarchy) সংস্থাপিত হইল; জড় হইতে চৈতন্যে, অন্ধশক্তি হইতে আধ্যাত্মিক প্রেমে মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নত হইল; উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইয়া সাধু—আনুগত্য ও সাধুভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কারলাইল বলেন:—"Faith is loyalty to some Inspired Teacher, some spiritual Hero." "কোন সিদ্ধপুরুষের সম্পূর্ণ অনুগত হওয়াই প্রকৃত নিষ্ঠা।" জন সমাজের দুর্গতি দূর করিবার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে মহাজনের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইঁহাদের শক্তিতে জনসমাজ আলোড়িত, পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত হয়। এই সাধু সমাজের মধ্য দিয়াই চিরকাল ভগবানের মুক্তিবিধায়িনী শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের মধ্যে কোন অলৌকিকত্ব নাই। সমাজের যে সকল ঘটনা ও অবস্থা তাঁহার আবির্ভাবের কারণ,মহাজন তাহাদেরই অন্তর্ভূত। যে জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি আবির্ভূত হন, তিনি তাহাদেরই একটী ক্ষুদ্র অংশ,—তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত,—তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত তাঁহার জীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ,—এক কথায়, বহুকাল হইতে সমাজ মধ্যে যে সকল শক্তি গূঢ়রূপে কার্য্য করিতে থাকে, মহাপুরুষ তাহাদেরই চরম ফল মাত্র। মহাজন দেশকাল পাত্রের অধীন; দেশকাল পাত্রও মহাপুরুষের অধীন। মহাপুরুষ সময়ের ফল; সময়ও মহাপুরুষের দ্বারা শাসিত ও নিয়মিত। সমাজ মহাজনের অনুগত; মহাজন ও সমাজের অঙ্গীভূত। একের আনুগত্যে অপরের স্ফূর্ত্তি, একের প্রভাবে অন্যের সজীবতা। জ্ঞানীর শিরোমণি হারবার্ট স্পেন্‌সার তাঁহার "Study of Sociology" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন,—

"Then the origin of the great man is natural; and immediately this is recognized he must be classed with all other phenomena in the society that gave him birth, as a product of its antecedents. Along with the whole generation of which he forms a minute part—along with its institutions, language, knowledge, manners . . . ., he is a resultant of an enormous aggregate

of forces that have been co-operating for ages."

ইহার মর্ম্ম এই যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ অতি স্বাভাবিক। এইকথা স্বীকার করিলেই, সমাজের যে সকল অবস্থা, যে সকল ঘটনা তাঁহার আবির্ভাবের কারণ, তাঁহাকে তাহাদের ফলস্বরূপ বলিয়া মানিতে হয়। যে জাতিতে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তিনি যাহাদের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারে, তাহাদের ভাষা, তাহাদের জ্ঞান এবং তাহাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে যেমন তাঁহার যোগ, সেইরূপ বহুকালাবধি সমাজের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাঁহাকে তাহাদের ফলস্বরূপ বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজের অসংযুক্ত ও অসংযত অবস্থায় মানবের যে সকল শক্তি নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে তাঁহাতেই সেই সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। মনুষ্য সমাজের মৌলিক শক্তিতেই মহাপুরুষের শক্তি বর্ত্তমান; মনুষ্য-সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মহাপুরুষের উৎপত্তি এবং মনুষ্য সমাজের ঘোর সংকটের সময়েই মহাপুরুষের অভিব্যক্তি। তিনি অনাদিকাল মানব সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছেন এবং অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবেন। লোকচক্ষু তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু তিনি চির বর্ত্তমান। অনাদিকাল হইতে সমগ্র মানব সমাজের গূঢ় প্রদেশ দিয়া যে আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহার নিয়ন্তা। মহাপুরুষের এই অব্যক্ত স্বরূপ যখনই ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি ও সাহিত্যে প্রকটিত হয়, তখনই নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি জগতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আলোক, উত্তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন মূলে এক শক্তি, মহাপুরুষের মহাপুরুষত্বও তেমনি মূলে এক বস্তু। তিনি কখনও জ্ঞানাবতার, কখনও প্রেমাবতার, আর কখনও বা সেবাবতার রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। তাঁহাকে যখন যেরূপ কার্য্যসাধন করিবার জন্য আবির্ভূত হইতে হয়, সেই কার্য্যের প্রকৃতি অনুসারেই তাঁহার নাম[illegible]। কারলাইল বলেন,—

"That the Hero can be poet, prophet king, priest or what you will, according to the kind of world he finds himself born into. I confess, I have no notion of a truly geat-man that could not be all sorts of men."

ইহার তাৎপর্য্য এই,—

"মহাপুরুষ সমাজের যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, তদনুসারে তিনি কবি, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, নৃপতি, ধর্ম্মপ্রচারক, আর যাহাই ইচ্ছা কর, তাহাই হইতে পারেন। যিনি সর্ব্বপ্রকার মহাপুরুষত্ব পরিগ্রহ করিতে না পারেন, তাঁহাকে প্রকৃত মহাপুরুষ বলিয়া আমার জ্ঞান হয় না।"

মহাপুরুষের জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি যে কার্য্য সমাধা করিবার জন্যই আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি ধর্ম্মই প্রচার করুন বা কবিতাই লিখুন, সমাজ সংস্কার কার্য্যেই নিযুক্ত হউন, বা রাজনীতি লইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা-কার্য্যেই ব্যস্ত থাকুন, সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যেই তিনি মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগের পরমতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আপনার জ্ঞান, প্রেম ও সেবা দ্বারা পূর্ণাদর্শ পরমেশ্বরের জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবির, লুথর, মহম্মদ সকলেই এক-বাক্যে বলিতেছেন, মানবাত্মার সহিত পরমেশ্বরের নিত্যকালের সম্বন্ধ, আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার

জন্য, এই সত্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই মহাপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই সত্যেই মানবের মুক্তি, এই তত্ত্ব অবিষ্কার করাই মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। এই তত্ত্ব আয়ত্ত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থায়ই পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যোগ সংস্থাপিত হয়। জ্ঞানের উন্নতাবস্থাকেই বিজ্ঞানের অধিকার বলা যাইতে পারে।

একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যেন, বিজ্ঞান শব্দে কেহ কেবল জড় বিজ্ঞান না বোঝেন। বিজ্ঞান শব্দে এখানে তত্ত্বজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। ভূততত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান যাহাদ্বারা লাভ হয়,তাহাকেই বিজ্ঞান বলিতে হইবে। সরল বৈদিকজ্ঞানের সময় মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু আশ্চর্য্য ও মহৎ, তাহাকেই ব্রহ্মবোধে প্রণাম করিত, তাহারই স্তব স্তুতি করিত। উপনিষদের বৈজ্ঞানিক অবস্থায় ব্রহ্মের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপিত হইলে, ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের নিত্যাবস্থায় বিহার করিতে লাগিলেন। বেদের স্বাভাবিক জ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মভাব,উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইল। বেদের উপকরণে উপনিষদ্ গঠিত হইল; বেদের ব্যষ্টিভাব অন্তর্হিত হইল, উপনিষদের সমষ্টিভাব সেইস্থানে সংস্থাপিত হইল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থাকেই ধর্ম্মের নিরেট (Solid) অবস্থা বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় মানুষ মানুষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার জ্ঞানকরিতে পারেনা, অপূর্ণকে পূর্ণ এবং ভ্রান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেনা। এই অবস্থায়ই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগস্থাপিত হয়। এ অবস্থা লাভ হইলে আর মানুষ মূর্ত্তিতে, স্তম্ভে মৃত্তিকায়, আকাশে আপনার ইষ্ট দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে ধ্যান করে না। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণতি ব্রহ্মযোগে, আত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য যোগে। যতদিন আত্মাতে ইষ্টদেবকে স্থাপন করা না যায় ততদিন ব্রহ্মপূজার অবস্থা লাভ হয় না,ততদিন আধ্যাত্মিক অনুভূতি (spiritual conception) হইতে পারেনা। কিন্তু সাধকেরা বলেন যে, যোগের অবস্থায় মানুষ আপনাতেই বদ্ধ থাকে,আপনার ভিতরেই ব্রহ্মসত্ত্বার পরিচয় পায়, ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করে। কাহারও ভাগ্যে নাকি তাহাও ঘটেনা। অনেকেই ব্রহ্মযোগের একটী অবাস্তব অবস্থায় (abstraction), শূন্য সমাধিতে মগ্ন হইয়া কালকর্ত্তন করেন। অত্যুন্নত সাধকদিগের মতে লীলার অবস্থাই ধর্ম্মের বিশেষ উচ্চাবস্থা। তাঁহারা বলেন যে,এ অবস্থায় ভিন্ন সাধকের সম্যক ব্রহ্মসম্ভোগ হয় না, প্রকৃত দর্শন (realization) লাভ হইতে পারে না।

বৈদিক সরল ও সহজ ধর্ম্মভাবের ভিত্তিতে যেমন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান গঠিত হইয়াছিল, উপনিষদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেইরূপ পৌরাণিক জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গঠিত হইয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে। বেদের সরল ধর্ম্ম ভাব,উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভগবদ্গীতার জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সামঞ্জস্য, এ তিনের মধ্যেই একটী মৌলিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহারা একে অন্যের পরিণতি মাত্র। উপনিষদ্ যেমন বেদের ভাষ্য, গীতা ও সেইরূপ উপনিষদের ভাষ্য স্বরূপ। গীতার জ্ঞান ভক্তিকর্ম্মের মধ্যে এক অপূর্ব্ব যোগ আছে,— একের পরিণতিতে অন্যের স্ফূর্ত্তি। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির উৎপত্তি এবং

ভক্তির পরিপক্কাবস্থায়ই নিষ্কাম কর্ম্ম বা সেবার পরিসমাপ্তি। এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। নিষ্কাম কর্ম্ম বা সেবার অবস্থাই প্রকৃত ভাগবতীয় লীলার অবস্থা। সিদ্ধ পুরুষেরা বলেন যে, এই অবস্থায় তাঁহাদের দৃষ্টি সমগ্র মানবজাতির উপর নিপতিত হয়, তাঁহারা প্রকৃতি, আত্মা ও মানবসমাজের বিবর্ত্তনের মধ্যে ভগবানের লীলা দর্শন করেন, এবং ভক্তের মধ্যে ভগবানের লীলা দর্শন করিয়া ভক্তের সেবা করিয়া, ভগবানেরই পাদ-সেবন করিয়া থাকেন। আধারের সহিত আধেয়ের যেরূপ সম্পর্ক, তাঁহাদের মতে, সেই নিগুর্ণ নিরবয়ব ব্রহ্মের সহিত সগুণ সাকার ভক্তেরও তদ্রূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাস ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মযোগে এবং ব্রহ্মযোগ ভাগবতীয় লীলায় ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে। ক্রমশঃ।

নেপালের পুরা[illegible]
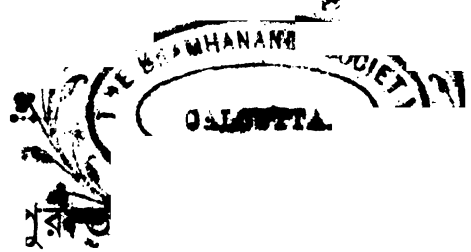
তুরেণীয় ব্রিজিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লিচ্ছবী নাম ধারণ করে। তাঁহারা বৈশালীনগরে মহা পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র মিথিলা (উত্তর বিহার) শাসন করিতে থাকে। মগধের মহারাজ অজাতশত্রু বৈশালীর পরাক্রান্ত ও সমরকুশল লিচ্ছবী জাতির উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। এই লিচ্ছবীজাতির পরাক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ বিদেহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মগধে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ৪৮৬ খীঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তিনি মিথিলা অধিকারের উপায় চিন্তনে নিযুক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে মগধের আধিপত্য কাশী ও কোশল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিথিলা অধিকার পূর্ব্বক পৈতৃক জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে তিনি অতঃপর মনোনিবেশ করেন।

বশুকার নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মহারাজ অজাতশত্রুর প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুচতুর, কার্য্যকুশল ও প্রভুভক্ত মন্ত্রীকে তিনি বুদ্ধদেবের সমীপে প্রেরণ করিলেন। লিচ্ছবীগণের সহিত [illegible] পরামর্শ করিতে বশুকার বুদ্ধদেবের সমীপে বিনীত ভাবে উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেব সেই সময়ে রাজগৃহের সন্নিহিত গৃধ্রকূট পর্ব্বতস্থ বিহারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৃধ্রকূট এক্ষণে উদয়গিরি নামে পরিচিত। মহাভারতে ইহা শৈলগিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই গৃধ্রকূট (উদয়গিরি) রাজগৃহের আড়াই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। গৃধ্রকূটের শিখরদেশে অসংখ্য প্রস্তর কুঠরী বিদ্যমান ছিল। ফাহিয়ান ও হিয়াংশঙের সময়েও এই সকল কুঠরীর অধিকাংশ বিদ্যমান ছিল। অর্হৎ ও বৌদ্ধ যতীগণ এই সকল প্রস্তর গহ্বরে সমাধিমগ্ন হইতেন। এক্ষণে উদয়গিরি পর্ব্বতে এই সকল প্রস্তর গুহার চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই।

বুদ্ধদেব লিচ্ছবীজাতির পরম সুহৃৎ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন। মন্ত্রী বশুকার মহারাজ অজাতশত্রুর অভিপ্রায় বুদ্ধদেবকে জ্ঞাপন করিয়া, লিচ্ছবীজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্য বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

শান্তিপ্রিয় বুদ্ধদেব মগধরাজের মন্ত্রীকে লিচ্ছবী জাতির সহিত মিত্রতা সংস্থাপনের জন্য পরামর্শ দিলেন। যতদিন তাঁহাদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী,একতা ও সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন রণদুর্দ্ধর্ষ লিচ্ছবী জাতিকে পরাজিত করিয়া মিথিলায় মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বশ্যকারকে বুদ্ধদেব স্পষ্টাক্ষরে এই অভিমত জানাইলেন। মন্ত্রী বশ্যকার ক্ষুণ্ণমনে রাজসদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি মহারাজকে বুদ্ধদেবের আদেশ ও উপদেশ জ্ঞাপন করিলেন। লিচ্ছবীজাতির প্রতি আন্তরিক ক্রোধ ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, যুবক অজাতশক্র বুদ্ধদেবের উপদেশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধের সুদুপদেশ উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকের নিকট গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। রাজা ও মন্ত্রী একত্র বসিয়া লিচ্ছবীজাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের উপায় চিন্তনে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

লিচ্ছবী জাতির সমবেত শক্তি ও সামর্থ্যের নিকট বলপ্রয়োগ কার্য্যকারী হইবে না ভাবিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী বশ্যকার কৌশলে তাঁহাদের পরাজয় সাধন করিতে মহারাজকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। পরস্পর মনোবাদ সংঘটিত করিয়া তাঁহাদের একতা বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে মিথিলায় মগধেশ্বরের অধিকার বিস্তার অসম্ভব বলিয়া বশ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন। কুটবুদ্ধি বশ্যকারের পরামর্শ মহারাজের নিকট নিতান্ত সঙ্গত বোধ হইল। কি উপায়ে ও কি কৌশলে লিচ্ছবীজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, মন্ত্রী দূরদর্শিতা প্রভাবে মহারাজকে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে মহারাজ সম্মত হইয়া, দূরদর্শী মন্ত্রী বশ্যকারকেই এই দুরূহ কার্য্য সাধনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। মন্ত্রীর প্রতি এই কঠোর ও দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। গুপ্ত মন্ত্রণা সুস্থির করিয়া, উভয়ে সভাগৃহ হইতে হৃষ্ট মনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

লিচ্ছবীজাতির সহিত সমরায়োজনের পরামর্শ করিতে, মহারাজ অজাতশক্র যাবতীয় বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে পর দিন রাজসভায় আহ্বান করিলেন। সভামধ্যে এই বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বশ্যকার মহারাজকে যুদ্ধ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়া, পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে সহসা সভামণ্ডপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। মগধরাজের সমরায়োজনের সংবাদ প্রদান করিতে সেই দিনই তিনি গোপনে বৈশালীতে দূত প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে দূত পথিমধ্যে ধৃত হইল। মহারাজ বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর প্রতি ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। কিছুতেই মহারাজের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। বশ্যকারের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক মগধ হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করার আদেশ সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। অবিলম্বে মহারাজের এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। বশ্যকার প্রকাশ্য ভাবে মগধরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপে অপমানিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া, বশ্যকার ক্ষুণ্ণ মনে অবিলম্বে রাজগৃহ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লিচ্ছবীজাতির পরম হিতৈষী মিত্র বলিয়া মহারাজ অজাতশক্র বশ্যকারকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, অবিলম্বে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এই কথা বৈশালী নগরেও রাষ্ট্র হইল। এই কথা শ্রবণে লিচ্ছবীরাজ বশ্যকারকে মহাসমাদরে বৈশালী নগরে আশ্রয় প্রদান করিলেন। বশ্যকারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা অবিলম্বে তাঁহাকে

রাজার প্রিয়তম উপদেষ্টা রূপে পরিণত করিল। কালক্রমে বশ্বকার বৈশালীরাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মগধেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী লিচ্ছবীরাজের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব দুঃখ ও অপমান বিস্মৃত হইলেন।

তিন বৎসর কাল বশ্বকার বৈশালীরাজের প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই তিন বৎসর বৈশালীতে অবস্থিতি করিয়া তিনি পরস্পরের প্রতি অতি কৌশলে এমন ভেদ উৎপাদন করিয়া দিলেন যে, দুর্দ্ধর্ষ লিচ্ছবী জাতির একতা ও সৌহার্দ্দ একবারে অন্তর্হিত হইল। রাজা ও মন্ত্রী, সামন্তরাজ ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, সৈনিক ও সেনাপতি, প্রভু ও ভৃত্যগণের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা সংঘটিত হইল। অমাত্য ও কর্ম্মচারীগণের ন্যায় সাধারণ প্রজার মধ্যেও ভ্রাতৃভাব অন্তর্হিত হইল। একতা ও সৌহার্দ্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশভক্তি ও স্বাধীনতানুরাগ দূরে পলায়ন করিল। লিচ্ছবীদিগের অধিকৃত মিথিলায় মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই উত্তম সুযোগ ভাবিয়া বশ্বকার পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে মহারাজ অজাতশত্রুকে বৈশালী আক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন। গঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক মগধেশ্বর বিনা রক্তপাতে বৈশালী অধিকার করিলেন। রাজধানী অধিকারের পর সমগ্র মিথিলায় মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে মন্ত্রী বশ্বকারের কৌশলে ও বিশ্বাসঘাতকতায় মিথিলায় বিদেহবংশের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্তর্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত হইয়া পরাক্রান্ত ও সমরকুশল লিচ্ছবী জাতি মগধের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইল। চির স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা এইরূপে অন্তর্হিত হইল। অনুমান ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

তিব্বতদেশীয় 'দুল্' গ্রন্থের মতে বিদেহরাজের মন্ত্রী ডুম্বু বৈশালীতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি বৈশালীর প্রসিদ্ধ প্রজাতন্ত্র রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্বে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পৈতৃক পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজগৃহে প্রত্যাগমন করেন *। তিব্বতীয় গ্রন্থের উল্লিখিত ডুম্বু মগধের মন্ত্রী বশ্বকার ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। লিচ্ছবীজাতির প্রতিষ্ঠিত বৈশালীর অতি প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের বিষয় কোরোসি, ক্ল্যাপ্রথ ও টমাস সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন †।

গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গম স্থলে পাটলী-নামে এক গণ্ডগ্রাম অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে হিরণ্যবাহু শোণ বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল হইতে বিংশতি মাইল পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান ফতুয়া ষ্টেসনের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইত। উভয় নদী বহুদূর পর্য্যন্ত পরস্পর সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া, একত্র সম্মিলিত হইত। এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত দ্বীপাকৃতি স্থানে পাটলীগ্রাম অবস্থিত ছিল। লিচ্ছবীদিগের সহিত যুদ্ধকালে এই গ্রামের মধ্য দিয়া মগধ-সম্রাটের সেনাগণ রাজগৃহ হইতে বৈশালী নগরে যাতায়াত করিতে থাকে। ইহাতে গ্রামবাসীরা দেড় মাস কাল পর্য্যন্ত এতদূর উৎপীড়িত হয় যে, স্ব স্ব আবাসস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারা অন্যত্র গমনে বাধ্য হয়। যুদ্ধাবসানে গ্রামবাসীরা পাটলীতে স্ব স্ব গৃহে পুনরায় প্রত্যা-

* Asiatic Researches (XX. 69), and Elphinstone's "History of India" (1866) P. 262.

† Journal of Asiatic Society of Bengal for 1838 (VII. 992-95)

বৃত্ত হয়। তাহারা গ্রামের মধ্যভাগে পর্য্যটকদিগের বিশ্রামের জন্য এক অতিথিশালা (অবস্থানাগার) নির্ম্মাণ করেন। নির্ব্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধদেব রাজগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহির্গত হন। আনন্দাদি প্রধান প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার সহগামী হন। আম্রবাটিকা ও নালন্দা হইয়া বুদ্ধদেব এই পাটলীগ্রামে উপনীত হইয়া, বিশ্রামাগারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পাটলী গ্রামের সমবেত অধিবাসীদিগের নিকট তিনি শীলধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে (অনুমান ৪৭৯ খ্রীঃ পূঃ) মগধের সম্রাট অজাতশত্রুর বিখ্যাত অমাত্য বর্ষকার ও সুনীধ পাটলীগ্রামে দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। পরাজিত লিচ্ছবী জাতির ভাবী উপদ্রব নিবারণের জন্য তাঁহারা পাটলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধদেবকে সশিষ্য ও সানুচর নিমন্ত্রিত করিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত করেন। মহাপুরুষ প্রীত হইয়া, পাটলী গ্রামের ভাবী সৌভাগ্য বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করেন। পাটলীর ভাবী প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধির বিষয় তিনি মগধেশ্বরের মন্ত্রীদ্বয়কে অবগত করেন। জলোচ্ছ্বাসে, অগ্নিদাহে, অন্তর্বিদ্রোহে ও বিশ্বাসঘাতকতায় এই পাটলী নগরী উৎসন্ন হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

অজাতশত্রুর সময় হইতে পাটলীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৩১৬খ্রীঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত পাটলীপুত্র সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের মহাসমৃদ্ধ রাজধানীতে পরিণত হয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র শ্রীহীন হইতে থাকে। মৌর্য্যবংশের ছয়শত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে সুবিখ্যাত গুপ্তবংশ অধিষ্ঠিত হন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভারতপর্য্যটন সময়ে পাটলীপুত্রের শোভা ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচীন গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর, কান্যকুব্জ নগরের মহতী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই বংশীয় শেষ সম্রাট দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজত্বের আরম্ভেই তিনি সম্রাটের আসন ও সম্মান হইতে বঞ্চিত হন। তিনি প্রাচীন রাজধানী পাটলীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তী নগরে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন। এই সময় হইতে পাটলীপুত্র পরিত্যক্ত হইয়া শ্রীহীন হইতে থাকে। অনুমান ৫৩০-৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর কাল দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত হৃতসাম্রাজ্য হইয়া হীনভাবে শ্রাবস্তীতে বাস করেন। হিয়াংশঙ্ শ্রাবস্তীর রাজা এই কুমারগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য নামে এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মালবরাজ যশোধর্ম্মনকে প্রতাপশীল শীলাদিত্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক গুপ্তসম্রাটের সেনাপতি ও মালবের সামন্ত রাজা যশোধর্ম্মন কান্যকুব্জে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি কনোজ আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতে পাটলীপুত্রের অবনতি আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাটলীপুত্র পরিত্যক্ত নগরীর হীনাবস্থা ধারণ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিব্রাজক হিংয়াংসাঙের মগধ ভ্রমণকালে (৬৩৭-৪০ খ্রীঃ) পাটলীপুত্র শ্রাবস্তীর ন্যায় অতি হীনাবস্থ সামান্য গ্রামে

পরিণত হয়। মহারাজ অজাতশত্রু ৪৮০ খ্রীঃপূঃ যে পাটলীপুত্র নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন, সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল যে নগরী আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া সর্ব্ব পরিচিত ছিল, তাহা এক্ষণে গঙ্গার কুক্ষিগত হইয়া নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাটনা নগরী পাটলীপুত্রের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছে।

পাটলী গ্রাম হইতে আনন্দাদি প্রিয় শিষ্যানুচরগণ সহ বুদ্ধদেব কোটিগ্রাম ও নাদিকো গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বৈশালীতে উপনীত হইলেন। বৈশালী এক্ষণে স্বাধীনতারত্ন হারাইয়া মগধের পদানত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বতন স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব শ্রীহীন বৈশালী নগরে প্রবেশ না করিয়া, নগরের বহির্ভাগে এক সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অম্বপালিকা নাম্নী এক বারবনিতা পরমাসুন্দরী, অতি বুদ্ধিমতী ও মহাধনশালিনী বলিয়া বৈশালী নগরে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই রমণী পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের অধিস্বামিনী ছিলেন। বুদ্ধদেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, অম্বপালিকা তাঁহাকে স্বীয়গৃহে পদার্পণ করিতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিলেন। পরদিন তিনি সশিষ্য বুদ্ধদেবকে স্বগৃহে ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইলেন। বেণুগ্রামে উপনীত হইয়া, তিনি শিষ্যবর্গকে বর্ষাকাল যাপনের জন্য বৈশালী নগরে পাঠাইয়া দিলেন। স্বয়ং বৈশালীর সন্নিহিত বেণুগ্রামে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। বেণুবনে বর্ষাবাসকালে তিনি অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ইহার চারিমাস পরে বৈশাখ মাসে কুশী নগরে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

বৈশালী নগরী অতি প্রাচীন স্থান। কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা এক্ষণে "বেসাড়" নামে পরিচিত। বর্ত্তমান পাটনা নগরের ২৭ মাইল দূরে গঙ্গার উত্তর তীরে এই 'বেসাড়' গ্রাম অবস্থিত। হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক শকবংশীয় তুরেণীয় ব্রিজি জাতি খ্রীঃ পূর্ব্বতন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সম্ভবতঃ মিথিলায় আপতিত ও উপনিবিষ্ট হন। কালক্রমে সমগ্র মিথিলায় তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মিথিলার সুপ্রাচীন বিদেহ রাজবংশ মগধে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। মিথিলা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই ব্রিজিজাতির পদানত থাকে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বৈশালী অতি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং শকজাতীয় ব্রিজিগণ তথায় মহাপরাক্রান্ত প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে রাত্রিকালে বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ) গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনোমা নদী অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। বৈশালী তখন শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য রাজগৃহের ন্যায় অতি প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৈশালীতে সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সন্ন্যাসীর বেশে বুদ্ধদেব এই বৈশালীতে প্রবিষ্ট হইয়া, এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। শাস্ত্রালোচনায় মোক্ষলাভের উপায় না দেখিয়া, তিনি বৈশালী হইতে রাজগৃহে ক্ষুন্নমনে গমন করেন। এই বৈশালীতে বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। বৈশালী তাঁহার অন্যতম প্রিয় আবাসস্থলে পরিণত ছিল। বৈশালীতে বুদ্ধদেব স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া, অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধদেবের উপদেশে বৈশালীর ব্রিজি জাতি

আরও অধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর শকজাতীয় ব্রিজি জাতি ক্ষত্রিয়জাতীয় লিচ্ছবীবংশীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে থাকেন। অনার্য্য 'ব্রিজি' নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা আর্য্যবংশীয় "লিচ্ছবী" নাম ধারণ করেন। তদবধি অসভ্য ও অনার্য্য ব্রিজিজাতি আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ লিচ্ছবীর বংশধর বলিয়া পরিচিত করিতে থাকেন।

অনুমান ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ মগধের সম্রাট অজাতশত্রুর আধিপত্য বৈশালীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বৈশালীতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর হইতে বৈশালী বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এই ঘটনার শত বৎসর পরে ৩৭৮ খ্রীঃপূঃ মগধের সম্রাট কালাশোক মহানন্দের রাজত্বকালে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। এই দ্বিতীয় মহাসঙ্ঘে বৌদ্ধশাস্ত্র "ত্রিপিটক" সংস্কৃত ও পরিশোধিত হয়। প্রবাদ আছে, বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র বৈশালীনগরের বিহারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্রাট কণিষ্কের আদেশে সেই প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ভিক্ষাপাত্র বৈশালী হইতে পুরুষপুর নগরে নীত হয়। পুরুষপুরের বর্ত্তমান নাম পেশোয়ার বলিয়া অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্মভূমি কপিলবাস্তু দর্শনের পর বৈশালীতে উপনীত হন। সেই সময়ে বৈশালী ভগ্নদশায় পতিত হয় নাই। ৬৩৯ খ্রীঃ হিয়াংশঙ্ সারনাথ হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া বৈশালীতে উপনীত হন। তিনি বৈশালীর ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন। বৈশালীতে তিনি অনেক হিন্দু দেবালয় ও দিগম্বর সন্ন্যাসী দেখিতে পান। এখানে তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া ব্যথিত হন। সেই সময়ে ৩।৪ টী মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যতীগণ বাস করিত। পর্য্যটক হিয়াংশঙের বর্ণনা অনুসারে নগরের পরিধি ৬০।৭০ লী (১০।১২ মাইল) ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। বৈশালীর পর তিনি ব্রিজি নগরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন। ব্রিজি হইতে তিনি নেপালের বিবরণ সংগ্রহ করেন। তিনি নেপালে গমন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। হিংয়াংশঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নেপালের পরাক্রান্ত রাজা অংশুবর্ম্মনের উল্লেখ আছে।

মিথিলার লিচ্ছবীজাতি কত কাল পর্য্যন্ত মগধের পদানত থাকে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তাঁহারা কিরূপ পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল, তাহা মহারাজ অজাতশত্রুর আদেশে পাটলীপুত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে স্পষ্টরূপ অনুভূত হইতেছে। অজাতশত্রুর সময় হইতে মহারাজ অশোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৪৮০—২২৩ খ্রীঃ পূঃ) মিথিলায় মগধের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। মিথিলার নানা স্থানে মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরস্তম্ভ ও শাসনলিপির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সারণ জিলার অন্তর্গত রাধিয়ায়, চম্পারণের অন্তঃপাতী বেতিয়া, মথিয়া, অররাজ ও কেশরিয়াতে এবং মজফরপুরের অন্তর্গত সরিয়ায় এইরূপ শাসনস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়া, মিথিলায় মগধ সম্রাটের শাসনপ্রভাব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকেন।

তাঁহার মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পরে রাজা বৃহদ্রথের নিধনে মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হয়। রাজা বৃহদ্রথ আপনার সেনাপতি পুষ্প (পুষ্য) মিত্রের হস্তে নিহত হন। পুষ্পমিত্র পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মগধে সুঙ্গ বা মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে রাজধানী পাটলীপুত্রের নাম পরিবর্ত্তিত করেন তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে পাটলীপুত্র "পুষ্প" পুর নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে থাকে।

বায়ু ও ভাগবত পুরাণের মতে ৯ জন এবং বিষ্ণুপুরাণের মতে ১০জন নরপতি মৌর্য্যবংশে প্রাদুর্ভূত হন। ডাক্তর কার্ন সাহেবের মতে ৩২২ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তদনুসারে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ডাক্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর খ্রীঃ পূঃ ৩২২—১৮৫ পর্য্যন্ত ১৩৭ বর্ষ কাল দশ জন মৌর্য্যবংশীয় নৃপতির রাজত্ব কাল অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান মতে ১৮৫—১১৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুঙ্গবংশীয় দশ জন এবং ১১৮—৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাণ্ব (সুঙ্গভৃত্য) বংশীয় চারি জন ভূপতি মগধে রাজত্ব করেন। অনন্তর ৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অন্ধ্র-ভৃত্যবংশীয় শিমুক (সিন্ধুক) কাণ্ববংশের আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া, মগধে শাতবাহন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

পক্ষান্তরে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের অনুমান মতে ৩২০—১৮৩ খ্রীঃ পূঃ মৌর্য্যবংশ, ১৮৩-৭১ খ্রীঃ পূঃ সুঙ্গবংশ এবং ৭১-২৬ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্ববংশ মগধে রাজত্ব করেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ু-পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে এই সময় অবধারণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সুঙ্গবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মিথিলায় লিচ্ছবীবংশ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মগধের আধিপত্য লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে মিথিলার লিচ্ছবীবংশের প্রাধান্য মগধে সংস্থাপিত হয়। পুষ্পমিত্রের বংশধরগণের রাজধানী পুষ্পপুর লিচ্ছবী-রাজের পদানত হয়। সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের বংশধরেরা মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। উত্তর পঞ্চালের প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রে সম্ভবতঃ তাঁহাদের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অহিচ্ছত্র এক্ষণে রামনগর নামে পরিচিত ও অযোধ্যা বিভাগের অন্তর্গত বরবাকী জিলায় অবস্থিত। এই রামনগরে মিত্রবংশীয় নরপতিদিগের নামাঙ্কিত অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে বৌদ্ধ-সঙ্ঘ এবং বোধিদ্রুমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা হইতে পুষ্পমিত্র ও তাঁহার বংশধর সুঙ্গবংশীয় নরপতিগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রামনগর ভিন্ন ভুইলাতালে সুঙ্গবংশীয় নৃপতিদিগের নামাঙ্কিত বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভুইলাতাল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত বস্তি জিলায় অবস্থিত। ভুইলাতাল অতি প্রাচীন স্থান। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংশঙ্ দেড় ক্রোশ পরিমিত ইষ্টকময় রাজবাটী ও সহস্রাধিক বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন। ভুইলাতালের ভগ্নাবশেষ খনন পূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ববিৎ কারলেইল সাহেব ১৮৭৯ খ্রীঃ সুঙ্গবংশীয় আট জন বৌদ্ধ নরপতির নামাঙ্কিত ১০৬টী মুদ্রা প্রাপ্ত হন। কারলেইল সাহেবের মতে এই স্থানই প্রাচীন কালে কপিল-

বাস্তু নামে পরিচিত ছিল। এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব ভারতভূমিকে পবিত্র করেন। ডাক্তর ফুরারের মতে ভুইলাতাল প্রাচীন কপিলবাস্তুর স্থলে অবস্থিত নহে।

মগধে সুঙ্গবংশের আধিপত্য অব্যাহত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সেখানে তাঁহাদের আধিপত্যের পরিচায়ক নানাবিধ চিহ্ন বিদ্যমান থাকিত। তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রাও মগধের কোন না কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইত। রামনগর ও ভুইলাতালে তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, মগধ হইতে তাঁহাদের নির্ব্বাসনের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রদান করিতেছে। বাঘেলখণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত নাগোধের রাজধানী উদ্বরা নগরের ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে ভরোট অবস্থিত। এই ভরোটে সুঙ্গবংশের অধীনে ধনভূতি নামে একজন বৌদ্ধরাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতার নাম আগরজ ও পিতামহের নাম বিশ্বদেব। ধনভূতির নামাঙ্কিত এক শিলালিপি সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তরলিপির দ্বারা আমাদের অনুমান সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে।

লিচ্ছবীর অধস্তন বংশধর সুপুষ্পের ভুজবীর্য্যে ও পরাক্রমে মগধে লিচ্ছবী বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুষ্পপুরে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ১৪৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সুপুষ্পের চতুর্ব্বিংশতিতম অধস্তন পুরুষ জয়দেব নেপালে লিচ্ছবীবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। মিথিলা ও মগধ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর কাল সুপুষ্পের বংশধরদিগের পদানত থাকে। প্রাচীন দেবপত্তননগরের পূর্ব্বোক্ত শিলালিপির সপ্তম শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হইতেছে।

"তস্মাল্লিচ্ছবিতঃ পরেণ নৃপতীন্ হিত্বা প—রং শ্রীমান্ পুষ্পপুরে কৃতিঃ ক্ষিতিপতি র্জাতঃ সুপুষ্প স্ততঃ।
সাকং ভূপতিভি স্ত্রিভিঃ ক্ষিতিভৃতাং ত্যক্ত্বান্তরে বিংশতিং খ্যাতঃ শ্রীজয়দেব-নাম-নৃপতিঃ প্রাদুর্ব্বভূবাপরঃ॥" ৭॥

ইতিপূর্ব্বে নেপালের রাজবংশাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৩১৫-৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর কাল জয়দেব (জয়বর্ম্মন) নেপালে রাজত্ব করেন। বংশাবলীর জয়বর্ম্মন ও শিলালিপির জয়দেব এক অভিন্ন ব্যক্তি। জয়দেব হইতে সুপুষ্প ২৩ পুরুষ অন্তর। পাঁচপুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, ২৩ পুরুষে ৪৬০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে ৪৬০—৩১৫ = ১৪৫ খ্রীঃ পূঃ সুপুষ্পের পুষ্পপুরে আবির্ভাব কাল জানা যাইতেছে। গুপ্ত বংশের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত মিথিলায় ও মগধে লিচ্ছবীবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

জাতীয় জীবনের অন্তরায়।

'ক্ষুদ্র' বঙ্গভাষার তুলনায় ইংরেজির প্রাধান্য কীর্ত্তনোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে জন্‌বুলের হুঙ্কারধ্বনি শুনি। বলা ভাল, ইহারা বাঙ্গালী জন্‌বুল্—তাই এক কাঠি সরেস! জন্‌বুল্ বলি, কেননা, ইহাঁদের কথাগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়। সাহেবের মুখে এমন কথা তবু মানায়।

কিন্তু আবার মাতৃভাষায় প্রতি হিতৈষণা (?)

প্রকাশ আছে। যদি হিতৈষণার ছদ্মবেশ না হয়, সেই আশায় আমাদের এই প্রয়াস।

ইঁহাদের আশঙ্কা এইরূপঃ—একতাই জাতীয় উন্নতির মূল, সেই একতা করিতে হইলে আমাদের এমন একটি ভাষা পাওয়া চাই, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদায় ভারতবাসীর মনের কথা জানিতে পারি, দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, এক কথায় ষোল আনা উন্নতিই যে এই একমাত্র ভাষার উপর নির্ভর করে, তাহা শুধু দেখিতেছি, ইংরেজি ছাড়া আর কিছুতেই হইতে পারেনা। ইংরেজি দ্বারা যে আমাদের এই সুবিধা হইতেছে, ব্যবস্থাপকসভা ও জাতীয় সমিতি প্রভৃতিই এ কথার সমস্ত প্রমাণ। তোমাদের বাঙ্গলাভাষা? হাঁ, সাহিত্য হিসাবে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা একটু উন্নত হইলেও, বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে—ছোটলাটশাসিত ভূখণ্ডের মধ্যেও সকল স্থানে যাহার চলিত নাই, এমন ভাষাকে, কি করিয়া ইংরেজিকে পদচ্যুত করিয়া, সেই স্থানে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়? এবং সম্ভব হইলেও হিতকর হইবে না। এবং তোমরা তাহা মনেও করিও না। কে এমন আছে যে, ইংরেজির অপেক্ষা বাঙ্গলাকে বড় বলিতে সাহস করে? ইংরেজিভাষার পরিসর বাঙ্গলা হইতে অনেক অধিক। এহেন ইংরেজি শিখিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে। ইংরেজি শিখিয়া, আমাদের যে সকল দোষ ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি যাইবার মতন হইয়াছে, অতএব ইংরেজি কম শিক্ষা করিলে সে সব আর হইবে না। আমাদের জাতিগত যে কত পাপ আছে, সে যে কত তা কি বলিব, তাহা এই ইংরেজির কল্যাণে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, নতুবা কখন নয়। আজ্ যে ইংরেজ পৃথিবীর মধ্যে কত বড় জাতি, তাহা কে না জানে? আমরা যখন ঘটনাচক্রে তাহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি, তখন যাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারি, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন। কারণ আমাদের ত শুদ্ধ ভাষাশিক্ষা নহে, তাহাদের নিকট চরিত্রগঠন শিক্ষা করিতে হইবে, সহবৎ শিক্ষা করিতে হইবে এবং উপরন্তু হয় ত আমাদের অতিথির স্বাস্থ্য পান করিবার সময় কয় ঢোক পান করিতে হইবে, তাহাও আমাদের ছেলেপিলেদিগকে শিখাইতে হইবে! (শেষোক্ত কথাটি স্বমুখে প্রকাশ নাই, উহ্য আছে!) অতএব সকল বিষয়েই ইংরেজি ও ইংরেজ যখন বড়, তখন বাঙ্গলাভাষাকে জাতীয় ভাষা করা বৃথা ও পণ্ডশ্রম ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর, এত কহিয়াও যে অবশেষ "বাঙ্গলা সাহিত্যকে বঙ্গোপসাগরে বর্জ্জন করিতে" বলেন না, ইহাতে আমরা নিরতিশয় কৃতজ্ঞ ও বাধিত হইয়াছি। অকিঞ্চিৎকর ধূলিমুষ্টির ন্যায় হাতে করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই! বাঙ্গলাসাহিত্যের পরমায়ুর জোর বলিতে হইবে!

এণ্ট্রেন্স্ অবধি ইংরেজির সঙ্গে ভাল বাঙ্গলা শিখাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয় যে, প্রস্তাবের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি পরীক্ষার বিষয়গুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং ইংরেজিকে 'পদচ্যুত' করিয়া, তাড়াইয়া দিয়া, আমরা শুধু বাঙ্গলা লইয়া থাকি। ছেলেরা ইংরাজি শিখুক, সেই সঙ্গে বাঙ্গলায়ও অধিকার হোক্, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিয়াই বলেন। অধি-

কাংশ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত ; সেই এণ্ট্রেন্স্ পাশ অধিকাংশের বাঙ্গলাভাষায় জ্ঞান কতখানি, বাঙ্গলাভাষাভিজ্ঞদের অবিদিত নাই। তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া, অন্তরঙ্গ মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য হইতে তাহাদিগকে চিরবঞ্চিত দেখিয়া যদি বাস্তবিকই দেশের সহৃদয় বিদ্বজ্জন কোন সদুপায় কল্পনা করেন, আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে বাধ্য। সত্য বলিলেও অনেকে বিরক্ত হন, প্রবেশিকার উচ্চতর পরীক্ষায় পাশ করিয়া অধিকাংশস্থলে 'গোড়ায় গলদ' বাহির হয়, তাহা উল্লেখযোগ্য ও সংস্কারযোগ্য নয় ?

মোটের উপর প্রতিবাদের দুই বিষয় ; এক,বাঙ্গলাভাষাকে সমুদায় ভারতের কাজের ভাষারূপে পরিণত করা 'অসম্ভব', আর, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ইংরেজিকে অন্যতম বিষয়রূপে শিক্ষা দিয়া,অন্যান্যবিষয় বাঙ্গলায় শিক্ষা দিলে "অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উঠিবে।" প্রথমোক্ত কথাটিকে প্রতিবাদের বিষয় করায় অদ্ভুত হইয়াছে ; কারণ, যে কথা এখন বাঙ্গলাভাষাহিতৈষীর সুখকল্পনা-মাত্র, যে কথায় তাঁহারা ভাবী সুখচিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু বলিয়া সুখী হন, যেখানে আশাভিন্ন নিশ্চয়তা নাই, সেই কথাটাকে লইয়া প্রতিবাদের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে অসামান্য আয়াস স্বীকার দেখিয়া ইহা ছাড়া আর কিছুই মনে আসে না,নিশ্চয়ই সাময়িক কাগজের নির্দ্দিষ্ট শূন্য পৃষ্ঠা পূরণ করিবার নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছিল !

বাঙ্গলাভাষা যে আপাততঃ সমস্ত ভারতের কাযের ভাষা হওয়া অসম্ভব, সে কথা আমরাও স্বীকার করি। প্রবল রাজভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিস্‌ভারতে কোনমতেই ইহার সর্ব্বথা প্রচলন হইতে পারেনা। আপাততঃ বাঙ্গলাভাষা যদি বাঙ্গালীর আলোচনীয় ভাষা হয়,তবেই আমাদিগকে সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু বাঙ্গলাভাষার সমস্ত ভারতের কাজের ভাষা হওয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া, ইহার আপনার উন্নতিকল্পে ত কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা দেখা যায়না। যদি বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার অনন্যকাম সেবক হইতে পারে,ইহার শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিতে যদি সমস্ত শিক্ষিত বক্তির অভিলাষ হয়, বিদেশীয় উন্নত সাহিত্যালোচনা করিয়া আমাদের শিক্ষিত সাধারণ যদি তাঁহাদের লব্ধজ্ঞান দ্বারা মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে পারেন, তবে নিতান্তই আশা করা যাইতে পারে, বাঙ্গলাভাষা একদিন সভ্যপৃথিবীর প্রধানতম ভাষার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিবে এবং বিস্তীর্ণ ভারতের পূর্ব্বদেশীয় এই বাঙ্গালী ভ্রাতারা তাহাদের শক্তিশালী সাহিত্যের সাহায্যে হিন্দুস্থানের পূর্ব্বগৌরব পুনঃস্থাপনে সক্ষম হইবে এবং শুধু ভারতবর্ষ নয়,পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয়েরাও আমাদের প্রাণোন্মাদকারী,বিদ্যাবতী, সুন্দরী ভাষার গুণমুগ্ধ সেবক হইয়া কোটিকণ্ঠে ইহার যশোগান করিবে।

বাঙ্গলাভাষা এখন সমস্ত ভারতের ভাষা না-ই বা হইল, কিন্তু তাহা বলিয়া এই আটকোটি লোকের ভাষার কি একটা স্বাতন্ত্র্য, উচ্চ আশা এবং সেই আশাসাফল্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা ? বিরোধই এইখানে যে, যাঁহারা ইহার উন্নতির আকাঙ্ক্ষী, সচেষ্টিত ব্যক্তিদের ইচ্ছা, যত্ন ও ভবিষ্যৎ আশায় বাধা দিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এ কথাটি বুঝিতে চাননা, পৃথিবীতে কোন কিছুই একদিনে পূর্ণতা পায় নাই। উন্নতি কালসাপেক্ষ, চেষ্টাসাপেক্ষ, পরিশ্রম-সাপেক্ষ। তাহার মূলে কর্ম্মেচ্ছাময়ী আশা। সেই শুভ উচ্চ আশায় যিনি

বাধা দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই বলিতে হয়। কোন অপ্রতিদ্বন্দী শক্তিশালী ব্যাপারের অন্তরালে, সমসাময়িক লোকনয়নের অজ্ঞাতে আরো অন্তবিধ ঘটনার উপাদান প্রস্তুত হইতে থাকে, যাহা ধীরে ধীরে পৃথিবীর এককোণে জন্মগ্রহণ করে, ধীরে ধীরে বড় হয়, ধীরে ধীরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও অবশেষে পুরাতনের পাশে সেই নূতনকে, বার্দ্ধক্যের পাশে যৌবনের মতন বোধ হয়। যে জাতীয় সাহিত্য লইয়া আজ আমরা আলোচনা করিতেছি, যুগে যুগে এমন অনেক জাতির সাহিত্যেতিহাস আছে, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী সহস্রগুণ শক্তিশালী যোগ্যতর ভাষার পার্শ্বে লালিত পালিত হইয়া, ক্রমশঃ আপন শক্তি বৃদ্ধির সহিত অবশেষে একদিন সকলের যোগ্যতর হইয়াছে।

এক Nation শব্দের অর্থ করিতে দারুণ উত্তপ্ত গ্রীষ্মকালে এত ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইবার কি আবশ্যক ছিল, বুঝিতে পারিনা। Nation শব্দের অর্থ সকলের ঠিক্ জানা ছিল। একটি সরল সহজ কথাকে সহজ অর্থে না বুঝাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিলে তাহা অনেকের আপত্তির কারণ হয়। "বাঙ্গালাভাষায় 'জাতি' শব্দ ইংরেজি Nation শব্দের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে"—ঠিক্ ত; কিন্তু আরো কিছু না বলিলে নিজের কথা হয় না, তাই আবার "Nation শব্দে অবশ্য এক রাজার শাসনাধীন দেশবিশেষের অধিবাসী সমষ্টিকেই বুঝায়, অতএব 'আমাদের জাতি' অর্থে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের সমগ্র অধিবাসীবর্গকেই বুঝিতে হইবে।" ভারতের সমগ্র অধিবাসীকে 'আমাদের' বোধ করা, উদারতা হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রিটিশ্ ভারতের ছত্রিশ ভাষাভাষী ছত্রিশ প্রকার ভিন্ন জাতি যে সকলেই একজাতি এবং তাহাদের সকলেরই একজাতীয় ভাষা, তাহা বলি না। সকলেরই ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত বলিয়া আমাদের পরস্পর সহানুভূতি ও একতা হওয়া উচিত, যাহাতে সকলেরই মঙ্গল, এবং সকলে একত্রিত হইয়া একমনপ্রাণে মিলিয়া রাজার নিকট আবেদন নিবেদন করিলে, ফল বেশী ফলিবার সম্ভাবনা জন্য, এমন একটি ভাষার আবশ্যক, যাহার সাহায্যে সকলেরই একই রকম কথা বলিবার সুবিধা হয় ও রাজাও ঠিক্ বুঝিতে পারেন। আপাততঃ ইংরেজিই যে, সে পক্ষে সুবিধাজনক, তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং ফলতঃ দেশের রাজনৈতিক সমুদায় অনুষ্ঠানে পরস্পর বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত জনসাধারণ তাহারই সাহায্যে মনোভাবের আদান প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজিকে জাতীয়ভাষা বলা যাইতে পারে না। যতদিন আবশ্যক, ততদিন ইহাকে একটা উপায় স্বরূপে গণ্য করা ব্যতীত, জাতীয়তা হিসাবে ইহার কোন সার্থকতা নাই। অপর পক্ষ আশা করেন, সমুদায় ভারতে এক ভাষার প্রচলন হইলে, জাতীয় একতাবন্ধনের বিশেষ সুবিধা হইবে। সে সুবিধা যেটুকু হইবার, ইংরেজির সাহায্যে হইয়াছে ও হয় ত তদপেক্ষা কালে আরো কিছু হইবে, কিন্তু শুধু তাহারই সাহায্যে কখনই অধিক হওয়া সম্ভবপর নয়। আর, আমাদের দ্রুত-বর্দ্ধিত মাতৃভাষার ক্ষতি করিয়া, সমস্ত ভারত একতাবদ্ধ হইবার খাতিরে, ইংরেজিকে জাতীয় ভাষাস্বরূপে ব্যবহার করিলে, হিতের পরিবর্ত্তে অহিত হইয়া বসিয়া আছে। ইংরেজি সমস্ত ভারতের ভাষা হইলেই কি সমস্ত ভারতবাসীর পরস্পর একতা হইবে, আশা করা যায়?

ইংরেজ ও আইরিশ্ পরস্পর ত এক ভাষাভাষী। তবে কেন আমরা এমন অলীক আশামুগ্ধ হই? তবে কেন নিজের ঘরের বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না পাইয়া, সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ফিরি? ইংরেজিকে কেহ ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না; যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে, সেই সঙ্গে যে যতদূর পারে মাতৃভাষার উন্নতি করিবে, বাঙ্গলাদেশ আপন পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। জাতীয় উন্নতি যে বহুল পরিমাণে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে, পৃথিবীর সমুদায় শিক্ষিত লোকই তাহা স্বীকার করিবেন এবং নিশ্চয়ই তাঁহারা শুনিলে বলিবেন, বাঙ্গালীর মাতৃভাষার উন্নতি-চেষ্টা তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখেরই পূর্ব্বাভাষ।

'জাতীয়' শব্দটিকে যতদূর উদার এবং ব্যাপক করা হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কোন অভিধান ইহার তেমন সংজ্ঞা করে নাই। ব্রিটিশ-শাসিত পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী না বলিয়া যে 'ব্রিটিশশাসিত ভারতের সমস্ত অধিবাসী বলা হইয়াছে, তবু রক্ষা! সম্ভবতঃ ভারতবাসীকে একতাবন্ধনে বাঁধিবার হিতৈষণা বুদ্ধিতে একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গবাসী এবং ভারতের অন্যান্য দেশবাসী যদি তাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, সমুদায় ভারতবর্ষকে 'রক্ষা' করিতে অভিলাষী হয় এবং সেজন্য সর্ব্বতোভাবেই ইংরেজিভাবাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে জর্ডনের জলে শুদ্ধ হইয়া ভারত উদ্ধারের চেষ্টা করাই ত সুবিধা! হয় ত কালে সোদরোপম ক্রিশ্চিয়ান্ বলিয়া ইংরেজ ভারতের মুক্তি দিতে পারে!

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গলা ভুলিলে বাঙ্গালীর জাতীয় সম্ভ্রম থাকে না। আর, বাঙ্গলা ভুলিয়া ইংরেজি না শিখিলে যদি ভারতের একতাবন্ধন না হয়, তেমন একতা নাই বা হইল। সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এখন এই, বাঙ্গালী কিসে বৈদেশিক সাহিত্যালোচনার সঙ্গে তাহার মাতৃভাষার উন্নতি করিতে পারে। জাতীয় সাহিত্যে বল সঞ্চয় হইলে, তাহারাও নিশ্চিত বলশালী হইবে, হয় ত সমস্ত ভারতের মুখাপেক্ষা তাহাদের করিতে হইবে না। অপ্রস্তুত ত্রিশকোটি লোক অপেক্ষা প্রস্তুত সাত কোটি লোক অনেক অধিক করিতে পারে। আমাদের মতে আপাততঃ অত বেশী পরার্থপরতার পরিবর্ত্তে নিজেদের বলবৃদ্ধি করাই সুসঙ্গত। সেই 'ছোটলাট-শাসিত দেশ টুকুর' অধিকাংশ যদি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে একদিন ক্ষমতাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়, তবে সমগ্র ভারত তাহার শুভফলভোগ করিতে পারে এবং সেই অংশের দশমাংশভাগ যদি যথার্থ মানুষ হইতে পারে, তাহাদের দ্বারা অসাধ্য সাধন অসম্ভব নয়। যেখানে যে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, কৃতপ্রতিজ্ঞ মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারাই হইয়াছে। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' বলা বাহুল্য।

বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকসভা ও জাতীয় সভায় যেরূপ ভাবে, যে ভাষার সাহায্যে কাজ চলিতেছে, তাহার উপস্থিত উদ্দেশ্য পক্ষে তাহাই উত্তম, কিন্তু জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন পক্ষে ইহাই যথেষ্ট এবং একমাত্র উপায় নয়; সর্ব্বার্থসাধক আরও অন্যবিধ উপায় অবলম্বন বিহিত। তাহাতে ইংরেজির প্রতি অবহেলা হইবে না, বরং আদর যত্ন হইবে, কিন্তু সে মাতৃভাষা ও জাতীয়বলবৃদ্ধিরই উপায়ের জন্য, শুধু ইংরেজির জন্য নয়। জাতীয়

সমিতি ও ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশ্য কি, না, একত্র হওয়া, আবেদন করা ও যথাসম্ভব কিছু পাওয়া; এই পর্য্যন্ত। নিজেদের জীবন-গঠনের কোন আবশ্যক নাই কি? সে কি ব্যবস্থাপক সভা ও কংগ্রেসমঞ্চে যাইয়া হইবে? না হয় মনে করি, উদার রাজার কৃপাগুণে আমরা ভারতবাসী কতকটা গুরুতর কাজ হাতে পাইলাম, কিন্তু পরমুখাপেক্ষিতার এতই কি মূল্য? আমরা কি কোন দিনই স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? সেই যত্ন-চেষ্টার সহিত ইংরেজি সাহিত্যকে একাধিক কারণে যত্ন করিতে হইবে; এক, রাজসমীপে সমস্ত ভারতবাসীর সমবেত আবেদন নিবেদনের জন্য, আর, জ্ঞানার্জ্জনের সহিত বাঙ্গলাভাষার সাহায্যের জন্য। শেষোক্ত কারণটীকে আমরা লঘুতর মনে করি না; ইহাতে কেবল যে ইংরেজি শিক্ষাই যথেষ্ট, তাহা নহে।

"ভারতে এক ভাষার প্রচলনে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি এবং ভারতবাসিগণের নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সমরেখায় সাধিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; আর তাহাতে Divide and Rule Policyর মূলে চিরদিনের জন্য কুঠার পড়িবে।"

এ কথার উত্তরে আমরা বিশেষ কারণ বশতঃ বেশী কিছু বলিব না; এই মাত্র বলি, সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতি অর্থাৎ একান্নভুক্ত করিতে না পারিলে, শুধু 'এক ভাষার প্রচলনে' তাহাদের 'নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সমরেখায়' সাধিত হইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। আর, ইহাই যদি কাহারো প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় হয়, তবে আমরা দূর হইতে এরূপ 'সমরেখায় উন্নতি'কে দণ্ডবৎ করি। পরন্তু, পুনরায় বলি, শক্তির স্বতন্ত্র সাধনা ব্যতীত ঐ Divide and Rule Policyর মূলে কখনই কুঠারাঘাত করা সম্ভব নয়।

সরলভাবে মনে এই কথাটি উঠে যে, এ দেশের লোক প্রতি কথায় অকারণে ইংরেজির সর্ব্বপ্রাধান্যকীর্ত্তনে কেন আত্মাবমাননা জাহির করে!—"এমন ব্যক্তি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ, যিনি মুহূর্ত্তের জন্যও গম্ভীর ভাবে ইংরেজি হইতে বাঙ্গলার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইবেন।" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদেরও মনোবুদ্ধির অগোচর ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী-শেষে, ইংরেজি প্লাবিত ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরেজি অভিজ্ঞ পাঠকদের নিকট মুহূর্ত্তের জন্যও গম্ভীরভাবে বাঙ্গলা হইতে ইংরেজির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে কাহারও সহসা উৎকট আবশ্যকতা হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা না বলিলে ইংরেজি শীত সঙ্কুচিত জড়সড় দেহে স্ফূর্ত্তিমতী বাঙ্গলার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।

কথার মধ্যে ত এই, জন কয়েক স্বদেশমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙ্গলাভাষার আশাধিক উন্নতি দেখিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি আশার কথা কহিয়াছেন। তৎপ্রতিবাদে যদি কেহ শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন,—ইংরেজি সাহিত্যের 'পরিসর' অতি বিস্তৃত, ইংরেজি সাহিত্যালোচনার ফলে আমরা মানব জাতিকে তাহার 'সমষ্টিভাবে' বুঝিয়াছি, এই মানবজাতির 'সভ্যাংশের বৃহত্তমভাগ ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ' এ হেন ইংরেজি শিখিয়া আর কিছু হোক্ না হোক্, 'সুসভ্য মানব-সমষ্টির বিশিষ্টাংশের' সঙ্গে আমাদের পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হইয়াছে, অতএব দেশহিতৈষিতার কুহকে মজিয়া আর কাজ নাই, ইং-

রেজি শিক্ষার সুযোগ হারাইলে জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে কি এই কথাগুলিকে নাট্যমঞ্চের অলীক অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না? বাপু, কেবা বলিতেছে, ইংরেজি ছোট, বাঙ্গলা বড়, আর কেবা বলে, সভ্যাংশের বৃহত্তমভাগ ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ হয় কি নয়, আর কে-ই বা ভাবে ইংরেজিকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলে আমাদের উন্নতি হয়। তাহা কেহই বলে না, শুধু আপনাপনি একটা পূর্ব্বপক্ষ খাড়া করান হইয়াছে মাত্র।

ইঁহাদের মতে 'শিশু' মাতৃভাষা শিক্ষা করা এক প্রকার অনাবশ্যক এবং বোধ হয় সেই জন্যই বলেন,—আমাদের যে জাতীয় কলঙ্ক, সে কেবল ইংরেজি না শিখিয়া এবং এই দেখ না দেশের 'অতি রঞ্জন স্বভাব,' 'ঈক্ষণ শক্তির অভাব', 'তেজোহানিকর চক্ষুলর্জ্জার অযথা প্রাবল্য।'

'প্রাচ্য অতিরঞ্জন'কে কেহ প্রশংসা করে না কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজি পড়িয়াই যে আমরা শুদ্ধ-সত্ত্ব-অপাপবিদ্ধ হইয়াছি, অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাও নয়, কেননা, তাহা দৃষ্টফলের বিপরীত। 'প্রাচ্য অতি-রঞ্জন' যেমন আছে, তেমনি প্রতীচ্য-সত্যাপ-লাপ সুবিখ্যাত! দৃষ্টান্ত গণ্ডায় গণ্ডায়।

ইংরেজি না জানিয়া, ইহাদের মতে, দেশের লোকের অবস্থা ত ঐরূপ ছিল; ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি শিখিয়া এখন বুঝি আমাদের 'ঈক্ষণশক্তির' প্রাবল্য, 'সত্য-নির্ভরতার' শক্তি, 'বিশ্বাসের' বৃদ্ধি ও দূরদ-র্শিতা হইয়াছে? আর, 'তেজোহানিকর চক্ষু-লর্জ্জার' বিপরীত কি বলিব নির্লজ্জতা?

রহস্য আরো আছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যদর্শনাদি নাকি আমরা ইংরেজের সাহায্যে পাইয়াছি! বরং ইহা বলিলে সত্য বলা হইত, প্রাচীন ভারতের সাহিত্যদর্শনাদির অস্তিত্ববুদ্ধি আমরা (কাহারা?) ইংরেজি অনু-বাদের সাহায্যে পাইয়াছি। নতুবা বুঝায়, যেন প্রাচীন ভারতের সাহিত্যদর্শনাদি অভি-মানভরে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছিল, বহুকাল পরে ইংরেজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের অপরিচিত বিস্মৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন! একথাকে বিশ্বাস করিলে বিশ্বাস করিতে হয়, স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি বিলাত হইতে সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সকল সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়াছিলেন, সে সকল বিলাত হইতে আনান হইয়াছিল। যে যে পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বিলাতী পণ্ডিত। কত শত বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে গৃহে ছাত্রেরা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছে, এ সকলের প্রতিষ্ঠাতা ইংরাজ!

আর এক স্থানে আছে,—

"মুখে যিনি যাহাই বলুন, আমরা ইংরেজকে অন্তরে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, তাঁহাকে বড় বলিয়া জানি, তাঁহার হাতের ছাপ ব্যতিরেকে কোন পদার্থকেই বড় সম্মানের চক্ষে দেখি না, ইংরেজের ভক্তির অভাবে হাজার বহুমূল্য বস্তুরও আমাদের নিকট সমাদর হয় না, আমরা সর্ব্ববিষয়েই ইংরেজের প্রশংসাবাদের জন্য লালায়িত এবং তাহা পাইলেই যেন জীবন সার্থক জ্ঞান করি। এইরূপে আমাদের মধ্যে যে যতদূর পরি-মাণে ইংরেজ হইতে পারে, সে আপনাকে ততদূর কৃতার্থ মনে করে— এমন কি ভিতরে যত দূর ইংরেজ হইতে পারি বা না পারি, আচার ব্যবহার পোষাক পরি-চ্ছদাদি বহির্বিষয়ের আড়ম্বরে সে ত্রুটিটুকু পোষাইয়া লইতে চাই। অতএব কালশক্তি ইহার বিরোধী, এবং কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় কার্য্যাদি হইতে দেখা যায় যে, দেশশক্তিও ইহার প্রতিকূল। আর বাকী এক রাজ-শক্তি, তাহা যে ইহার অনুকূল, একথা বোধ করি কেহ বলিবে না—তাহার ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যকলাপই ইহার প্রতিকূল। অতএব ইহা সম্ভব হইবে কি রূপে?"

জানা উচিত ছিল, জগতে অনেক 'অসম্ভব' সম্ভব হইয়াছে। যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, ইহা আমাদেরই জাতির যথার্থ ছবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা বলি, তথাপি এখনো ভালর সম্ভাবনা আছে।

ইংরেজ তাহার আপনার গৌরব বেশ বোঝে এবং সে পৃথিবীতে তাহার প্রতিষ্ঠাও করিয়াছে, এজন্য আমরা তাহাদিগকে 'অন্তরে সম্মান' করিব ইহা কিছু দোষের নয়, সে নিজের অনলস যত্ন চেষ্টাবলে সত্যই বড় হইয়াছে, এ জন্য তাহাকে আমরা 'বড় বলিয়া জানিব।' সে জানাও মিথ্যা জানা নয়, কিন্তু 'তাহার হাতের ছাপ ব্যতিরেকে কোন পদার্থকেই বড় সম্মানের চক্ষে দেখিনা' এবং 'তাহার ভক্তির অভাবে হাজার বহুমূল্য বস্তুরও আমাদের নিকট সমাদর হয় না, সে কথাটি সকল স্থলেও সকলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সত্য কথা বলা হয় কি না, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। এমন অনেক বেচারা আছে, যাহাদের পরের মুখে স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু আপনার স্বাধীন বিবেচনা বুদ্ধি ও গুণ-গ্রহণ-ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেও দলভুক্ত করিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যজনক।

ইংরেজ জাতির হাঁচি কাশিটি, মুহুর্মুহু-ধূমোদ্গারী-চুরট-মুখে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ানটির অনুকরণ না করিয়া কয়েকজন দেশীয় ব্যক্তি স্বদেশের উন্নতি কামনায় অন্যান্য সদনুষ্ঠানের সহিত জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য যত্নশীল আছেন; তাঁহারা ইংরেজের হাতের ছাপ না দেখিলেই কোন কিছুকে অসার মনে না করিয়া নিজের বিবেচনা ও অনুসন্ধানের প্রতি নির্ভর করেন, ইংরেজের প্রশংসাবাদের দিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না, দুঃসহ গ্রীষ্মে তাঁহারা ফ্লানেল সুটে আবৃত হওয়াকেও সভ্যতার অঙ্গ মনে করেন না। ইহাঁরা দেশস্থ লোককে কোন কথা বলিতে, লিখিতে ইংরেজিতে নিজের বিদ্যা জাহির করেন না, পরন্তু বিদেশীয় সাহিত্য-লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। ইহাদের নিকটেই আমরা দেশের ভাবী কুশল-প্রত্যাশা করি। লেখক যাহাকে অসম্ভব মনে করিয়াছেন, আমরা তাহাকেই সম্ভব মনে করিতেছি। বর্ত্তমানের অসম্ভব ঘটনা কোন দিন কি ভবিষ্যতে সম্ভব হয় নাই? কোন সদনুষ্ঠানে দেশশক্তি, কালশক্তি, রাজশক্তি প্রতিকূল হইলই বা; আমাদের নিশ্চিত গম্যস্থান যদি প্রতিকূলের দিকে হয়, আমরা সেই দিকে যাইতে চেষ্টা না করিয়া, কি নিরাশার সহজ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিব? উজান বহিতে হইবে, বায়ু যদি অনুকূল হয়, ভালই, প্রতিকূল হইলেও ক্ষতি নাই, কিছু বিলম্ব এই মাত্র।

পরে, প্রবন্ধের উপসংহারভাগে প্রতিপাদ্য প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিন পৃষ্ঠায় যাহা আছে, ভ্রমসঙ্কুল হইলেও সেই টুকুই প্রাসঙ্গিক বিষয়। "যদি এণ্ট্রেন্স ক্লাস্ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় সকল বিষয়ে শিক্ষা ও ইংরেজিকে স্বতন্ত্র শিক্ষনীয় বিষয় স্বরূপে গণ্য করা হয়, তবে ছাত্রগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিবার অবকাশ এবং শিক্ষাসমাপনের পর স্বদেশের হিতসাধন ও জীবনের মহৎকর্ত্তব্যপালনের উপায় তাহাদের নিকট সুগম করিয়া দেওয়া হয়"—একথা ইহাদের মনোনীত নয় এবং তাঁহাদের মতে ইহাতে হিতে বিপরীত হইবে। যুক্তি, বাঙ্গালা ভাষায় বিষয়শিক্ষার উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। একথা বিবেচনা করা উচিত বোধ হয় নাই, অকারণ কেন পুস্তক প্রকাশিত হইবে?

বাঙ্গালা দেশে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত যদি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিষয় শিক্ষা দিবার নিয়ম হয়, সেরূপ গ্রন্থের অভাব হইবে না।

এণ্ট্রেন্স ক্লাসে যে শ্রেণীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়,তেমনি বিষয় যদি বাঙ্গালায় লিখিতে হয়, ইংরেজি হইতে ভাব শিক্ষা করিতে যাইতে হইবে কেন? তাহাতে যে বিশেষ ভাবুকতার আবশ্যক, যেমনটি বাঙ্গালীর কল্পনার দৌড়ে কুলায় না, তাহা বোধ হয় কেহই জানেন না।

আর, এটি অতি সহজ ও সঙ্গত কথা যে, বালকদিগকে ইংরেজি ভাষা সযত্নে শিক্ষা দিবার সঙ্গে, মাতৃভাষায় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে,তাহারা ইংরেজিও শিখিবে, বাঙ্গলায়ও অভিজ্ঞ হইবে। তাহাতে মানসিক উন্নতি ভিন্ন মানসিক বৃত্তি 'ক্ষীণ' 'খর্ব্ব' 'নিস্তেজ' হইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। বিষয় শিক্ষায় ভাষাশিক্ষা গৌণভাবে হয়; ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, মূলভাষাই স্বতন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। অতএব ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে যদি বাঙ্গালা ভাষায় বিষয় শিক্ষা হয়,তবে ইংরেজিও শেখা হয়, সেই সঙ্গে মাতৃভাষায়ও অধিকার হইতে থাকে এবং অধিকন্তু বিষয়গুলি আরও বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। জ্ঞানের প্রসার এই উপায়ে আরো বৃদ্ধি বৈ অল্প হয় না।

স্কুলের যে ভিত্তির কথা বলা হইয়াছে, সে ভিত্তি যে এখনো বড় দৃঢ়,তা নয়। অনেকেই সে কথা জানেন। ইংরেজিতে বিষয় শিক্ষা না হইলেই ইংরেজির ভিত্তি আর বেশী দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা অল্প। সম্ভাবনা থাকিলেও অন্য উপায়ে তাহা নিবারণ করা উচিত, বাঙ্গালার উন্নতিতে বাধা দেওয়া সুবিবেচনা নয়। মাইকেল, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু,এই তিনটী মাত্র অসাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা কি একটা দেশের অবস্থা নির্ণয় করা সঙ্গত? ইঁহাদিগকে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে গণ্য করাই সঙ্গত। আর,তাঁহারাই কি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইবামাত্র বাঙ্গলায় হস্তার্পণ করিয়াছিলেন ও হস্তার্পণ করিবামাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? তাঁহাদিগকেও সে জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত বুদ্ধিতে মাতৃভাষার জন্য কয় জন লোক তাঁহাদের মতন খাটিতে চায়? তাহা অসম্ভব, সেই জন্যই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা করাইতে এমন বাধ্য বাধকতার নিয়মে আনা ভাল, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা তাহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

আর একটি কথা। বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 'তাঁহাদিগের পক্ষেও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিষয় শিক্ষা অপকারী হইবে।' যাহা হোক্, এই শিক্ষকোচিত উপদেশে বাঙ্গালার লেখকগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানিত মনে করিবেন, সন্দেহ নাই। এণ্ট্রেন্স ক্লাসের বিষয় শিক্ষার সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যলেখকদের বিষয় শিক্ষার তুলনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি নিজের যথার্থ সংস্কার প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তুলনাটিও যোগ্য বটে।

সে যাহা হোক্, ছাত্রদিগের বিষয় শিক্ষোপযোগী পুস্তক আপাততঃ বাঙ্গালা ভাষায় না থাকিলেও, যদি এরূপ বোঝা যায়, সেই অভাবের জন্যই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, পুস্তক হইতে বিলম্ব হইবে না। পরন্তু, প্রবেশিকার বিষয় শিক্ষা পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় করার আপত্তি পক্ষে আর একটি যুক্তি এই, যদি তাহা হইলে ফল ভাল হইত,

এদেশের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের বিষয়শিক্ষা ও ইংরেজিশিক্ষা ভাল হয় না কেন? এ দৃষ্টান্ত প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন অংশেই প্রতিকূল নয়। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বিষয় শিক্ষা তাহাদের আন্দাজে তাহাদের মতন হয়। উচ্চ বিষয় শিক্ষার জন্য উচ্চ পরীক্ষার পরবর্ত্তী ধাপ আছে, তাই বলিয়া ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণদের নিকট তাহাদের যথা-উপযুক্তের অধিক দাবী করিলে চলিবে কেন? মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের অপেক্ষা কম ইংরেজি জানে, তাহার কারণ তাহারা ইংরেজি কম শেখে। এণ্ট্রেন্সক্লাসে সাহিত্য হিসাবে পৃথক্ রূপে যে ইংরেজিটুকু পড়ান হয়, তাহা মাইনরের তুলনায় বেশী। যদি মনে করা যায়, মাইনরে যেমন বাঙ্গলায় বিষয় শিক্ষা হয়, তাহার সহিত এণ্ট্রেন্সপাঠ্য ইংরেজি তাহাদিগকে পড়ান হয়, তবে নিশ্চয়ই মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের এণ্ট্রেন্স-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান হয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য আরও উন্নত,—বাঙ্গালায় বিষয় শিক্ষার সহিত এণ্ট্রেন্সক্লাসে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১৫)

গো-বসন্তের চিকিৎসা।

গো-বসন্তের বিভিন্নপ্রকার চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপলব্ধি করিতে হইলে, কতকগুলি মূল বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল মূল বিষয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্শন (Observation) ও পরীক্ষার (experiment) ফল। গো-বসন্তের অণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা দুই শ্রেণীর চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১) অণুগুলি সকল অবস্থায় সমান মারাত্মক নহে। যে অবস্থার অণু মারাত্মক নহে, অথচ কিছু না কিছু রোগ উৎপন্ন করে, সেই অবস্থার অণু শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সামান্য রোগ উৎপন্ন করিলে, ভবিষ্যতে উৎকট গো-বসন্ত রোগ উপস্থিত হয় না। গো-বসন্ত রোগ হইয়া যে জন্তুটা বাঁচিয়া যায়, তাহার ঐ রোগ পুনরায় হয় না, ইহা গোপ কৃষক প্রভৃতি সকলেই জানে। এই জ্ঞান বহু সন্দর্শনের ফল। পরীক্ষা সকল দ্বারা এই জ্ঞান বিশেষিত হইয়া একটী অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভবের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই পাস্তার ও আর্লোয়াঁর চিকিৎসা প্রণালীর মূল। এই চিকিৎসা প্রণালীকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী বলা যাইতে পারে।

(২) গো-বসন্তের অণু কতকগুলি পদার্থের সংস্রবে আসিলে হীনবল অথবা এককালীন নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল পদার্থের ব্যবহার দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসা প্রণালীর মূল। এই শ্রেণীর চিকিৎসা প্রণালীকে রাসায়নিক চিকিৎসা প্রণালী বলা যাইতে পারে।

(১) প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী।

প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা প্রণালী বুঝিতে হইলে, কোন্ অবস্থায় গো-বসন্তের অণু স্বভাবতঃ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

(ক) ১৬° সাণ্টিগ্রাদ্ (৬০·৮° ফারেন্‌হিট্)

অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ উত্তাপে উপযুক্ত ক্ষেত্রস্থ হইয়াও গো-বসন্তের অণুর বংশবৃদ্ধি হয় না। এই উত্তাপে উপযুক্তক্ষেত্রে (যথা, মাংসের কাথে) অণুগুলি জীবিত থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে বটে, কিন্তু বীজ উৎপন্নের জন্য এই উত্তাপ যথেষ্ট নহে। আবার এই পরিমাণ উত্তাপে যে কৈশিকাণু গুলি জন্মে, তাহারও রূপ সাধারণ গো-বসন্তের কৈশিকাণুর ন্যায় নহে; অর্থাৎ সরল ও বক্র রেখার ন্যায় না হইয়া বর্ত্তুলাকার ঘটি পেয়ালার আকার ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করে। এই ন্যূন পরিমাণ উত্তাপে অণুগুলির বৃদ্ধি অতি ধীরে ধীরেই হইতেথাকে। যখন কোন ভূভাগের স্বাভাবিক উত্তাপ ৬০·৮° ফারেন্ অপেক্ষা ন্যূন থাকে, তখন ঐ ভূভাগের গো-বসন্ত রোগ আরম্ভ হওয়া অসম্ভব।

(খ) ৪৫° সাণ্টি (১১৩° ফারেন্) উত্তাপের অধিক পরিমাণ উত্তাপেও গো-বসন্তের অণুর বংশবৃদ্ধি হয় না। ৪২°, ৪৩°, ৪৪° সাণ্টি উত্তাপে অণুর বংশবৃদ্ধি অতিশীঘ্রই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এরূপ অধিক উত্তাপেও বীজাণু জন্মে না। ৪২°।৪৩° সাণ্টি উত্তাপে কৈশিকাণু একমাস হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়া, শেষে অণুগুলি মরিয়া যায়। এককালীন মরিয়া যাইবার পূর্ব্বে এই কৈশিকাণু হীনবল হইয়া যায়। ৪২°।৪৩°সাণ্টি উত্তাপে ৮ দিবসকাল কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রে (মাংসের কাথে) থাকিলে গো-বসন্তের অণু এত হীনবল হইয়া যায় যে, মেষের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, ইহা মেষকে মারিয়া ফেলিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না। এই পরিমাণে পরিবর্ত্তিত গো-বসন্তের অণু যদি এক দিবসের গিনিপিগ্এর শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ গিনিপিগ্ নিশ্চয় মরিয়া যায়। উপযুক্ত ক্ষেত্র মধ্যে দিবারাত্রি ৪২°।৪৩° সাণ্টি উত্তাপে ক্রমান্বয়ে ১,২,৩,৪,৫ হইতে ৩০ দিবস কাল পর্য্যন্ত, গো বসন্তের অণু রাখিয়া দিলে, ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর গো-বসন্তের অণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল অণু স্থায়িভাবে রাখিয়া দিবারও উপায় আছে। ৪২°।৪৩° সাণ্টিতে নিরূপিত কাল ধরিয়া, অণু জন্মাইয়া লইয়া, পরে ঐ অণু দিবারাত্রি ৩০°হইতে ৩৫° সাণ্টিতে রাখিয়া দিলে অণুতে এক হইতে দুই দিবসের মধ্যেই বীজ (spores) জন্মিতে থাকে। দশ দিবস এইরূপ উত্তাপে থাকিয়া সমস্ত কৈশিকাণুই বীজে পরিণত হয়। কৈশিকাণু গুলি বীজে পরিণত হইতে গেলে কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপযুক্ত উত্তাপ আবশ্যক, এরূপ নহে। পাত্র মধ্যে অবাধ বায়ু প্রবেশও আবশ্যক। কৈশিকাণুগুলি বীজে পরিণত হইলে এই বীজ ১৬° সাণ্টির ন্যূন উত্তাপে রাখিয়া দিলে, দুই এক বৎসর কাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। ২০ দিবস কাল ৪২°।৪৩° সাণ্টি উত্তাপে গো-বসন্তের অণু উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাখিয়া দিলে পাস্তারানুমোদিত 'প্রথম টীকারস' প্রস্তুত হয়। ১২ দিবস কাল ৪২°।৪৩° সাণ্টি উত্তাপে এই অণু রাখিলে, পাস্তারানুমোদিত 'দ্বিতীয় টীকারস" প্রস্তুত হয়। এই দুই টীকারস প্রস্তুত করিয়া লইয়া পরে ৩০°।৩২° সাণ্টি উত্তাপে দশ দিবস কাল ইহা রাখিয়া দিয়া, পরে বীজাণু অবস্থায় এই টীকারস ১০°।১৫°সাণ্টিতে রাখিয়া দিলে 'প্রথম টীকারস' দুইবৎসর এবং 'দ্বিতীয় টীকারস' এক বৎসরকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়।

(গ) কৈশিকাবস্থাগত অণু শরীরাভ্যন্তরে (শোণিতের মধ্যে) যেমন সহজে বর্দ্ধিত হইয়া আশানুযায়ী ফল উৎপাদন করে, বীজাবস্থাগত

অণু সেরূপ করিতে পারে না। একারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় টীকারসকে পুনরায় কৈশিকাবস্থাগত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বীজাণু-অবস্থাগত টীকারস মাংসের ক্বাথে তিন দিবস ধরিয়া ৩০°।৩২° সাণ্টি উত্তাপে রাখিয়া দিলে বীজাণুগুলি কৈশিকাণুতে পরিণত হয়। এই অবস্থাতে টীকারস ব্যবহারে উপকার দর্শে। কিন্তু কৈশিকাণু-অবস্থাগত টীকারস ব্যবহারের পক্ষে একটী বিঘ্ন আছে। কৈশিকাণু বায়ু ব্যতীত কেবল ২।৩ দিবস বাঁচিয়া থাকে। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে টীকারস প্রেরণ করিতে হইলে উহা সম্পূর্ণ বদ্ধ অবস্থায় প্রেরণ করাই আবশ্যক হয়; অর্থাৎ বোতলের মধ্যে পূরিয়া ছিপি দিয়া বাক্সে বদ্ধ করিয়া একটী কারখানা হইতে নানা স্থানে প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। জন্তুদিগের টীকা দিবার বন্দোবস্ত যদি টীকা প্রস্তুতের কারখানাতেই হয়, তবে টীকা নিস্ফল হওয়া সম্ভব থাকে না। বোতলে ভরিয়া টীকারস স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে ২।৩ দিবসের মধ্যেই উহা ব্যবহার করিয়া লওয়া আবশ্যক। পাছে ব্যবহার করিতে কিছু বিলম্ব হয়, তজ্জন্য আর দুইটী কৌশল আবশ্যক। (১) বোতল একবারে ভরিয়া না দিয়া উহার মধ্যে কিছু খালি স্থান (বায়ু) থাকিতে দেওয়া উচিত। (২) কেবল কৈশিকাণু-অবস্থাগত টীকারস না দিয়া, উহার সহিত অল্প পরিমাণ বীজাণু-অবস্থাগত-টীকারসও মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বোতলের মধ্যে কিঞ্চিৎ বায়ু থাকাতে কৈশিকাণুগুলি ২।৩ দিবসের কিছু অধিক বাঁচিয়া থাকে। বীজাণুগুলি বায়ু-শূন্য-স্থানেও অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বীজাণু অবস্থাগত টীকারস যে শরীরাভ্যন্তরে গিয়া কোন জন্তুর মধ্যেই কার্য্য করিবে না, এরূপ নহে। বোতল মধ্যে কিছু বায়ু রাখিয়া দিয়া এবং উহার মধ্যে বীজাণু অবস্থাগত টীকারস (Ancien vaccin) মিশ্রিত করিয়া দিয়া টীকা প্রস্তুত কারখানা হইতে ৪।৫ দিবস যাইতে লাগে, এমন স্থানেও জন্তুদিগের টীকা দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। 'প্রথম টীকারস' (Premier vaccin) ব্যবহার করিয়া তাহার অন্ততঃ দশ দিবস পরে "দ্বিতীয় টীকারস" ব্যবহার করিতে হয়। 'দ্বিতীয় টীকারস' (Deucieme Vaccin) ব্যবহার করিবার অন্ততঃ দশ দিবস পরে, কয়েকটী মাত্র জন্তুর মধ্যে গো-বসন্তের 'মারাত্মক বীজ' (Virulent Vaccin) প্রবেশ করাইয়া দেখা উচিত, টীকা দেওয়া ফলদায়ক হইয়াছে কি না।

(ঘ) ক্ষীণ (Attenuated) গো-বসন্তের অণু জন্তু পরম্পরার মধ্য গত হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ববল (Virulence) প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৮ দিবস কাল গো-বসন্তের মারাত্মক অণু যদি ৪২°।৪৩° সাণ্টি উত্তাপে রাখা যায়, এবং পরে যদি এই ক্ষীণতর অণু এক দিবসের গিনিপিগ্ বৎসের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ গিনিপিগ্ নিশ্চয়ই মরিয়া যায়। এই মৃত গিনিপিগের শোণিত যদি অধিক বয়স্ক একটী গিনিপিগের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহাও মরিয়া যায়। এই মৃত গিনিপিগের রক্ত যদি একটী শশকের রক্তের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তবে শশকটীও গো-বসন্ত হইয়া মরিয়া যায়। এই মৃত শশকের রক্ত মেষের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, মেষটীও 'গো-বসন্তে, মরিয়া যাইবে। অর্থাৎ ক্রমশঃ গো-বসন্তের অণু পূর্ব্বাবস্থা অথবা স্বাভাবিক মারাত্মক-

ভাব প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা যখন এই ফল পাওয়া গিয়াছে, তখন স্বভাবতঃ গো-বসন্তের অণুর এইরূপ পরিবর্ত্তনই সম্ভব। অর্থাৎ গো-বসন্ত যে এক জেলায় এক বৎসর প্রাদুর্ভাব হইল, অন্য জেলায় অন্য এক বৎসর, পুনরায় ৪।৫ বৎসর পরে উক্ত এক জেলায় পুনরায় দেখা দিল, এরূপ হইবার কারণ, অণুর অবস্থা পরিবর্ত্তন। যেমন পরীক্ষাগারে ৪২°।৪৩° সাণ্ডিতে গো-বসন্তের অণু থাকিয়া ক্রমশঃ উহা হীনবল হইয়া যায়, সেইরূপ 'মাঠে ঘাটে' এই অণু গ্রীষ্মকালে এইরূপ উত্তাপে থাকিয়া হীনবল হইয়া যায়। এই অবস্থায় অণুগুলি গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি বৃহদাকারের জন্তুর কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ ক্ষীণ ও পরিবর্ত্তিত অবস্থায় গো-বসন্তের অণু মূষিকাদি ক্ষুদ্রকার জন্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে এবং ক্রমশঃ বলীয়ান্ হইয়া কালক্রমে পূর্ব্ব মারাত্মকভাব লাভ করিয়া ক্রমশঃ বৃহদাকারের জন্তুদেরও নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। এক একটী সংক্রামকরোগ যে এক এক বৎসর অনেক জীব ধ্বংস করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হয়, ইহার সাধারণ কারণই বোধ হয় অণুর স্বাভাবিক রূপের পরিবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তন। এরূপ অনুমানের পক্ষে এই একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পরীক্ষাগারে যেরূপ কৃত্রিম উপায়ে কয়েক দিবস ধরিয়া দিবারাত্র ৪২°।৪৩° সাণ্ডি উত্তাপ রাখা যায়, স্বভাবতঃ এরূপ একই ভাবের উত্তাপ কয়েক দিবস ধরিয়া রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। গো-বসন্তের অণুকে হীনবল করিয়া ফেলিতে গেলে যে দিবারাত্র কয়েক দিবস ধরিয়া ঠিক্ একই ভাবের উত্তাপে রাখা আবশ্যক, এরূপ নহে। অনিয়ম দ্বারা, ফল অনিশ্চিত হইবে এইমাত্র, কিন্তু উত্তাপাধিক্য দ্বারা যে অণু হীনবল হইবে, তাহা নিশ্চয়। কত দিবসে কি পরিমাণে হীনবল হইবে, ইহা স্থির করিতে গেলে কাল, উত্তাপ, প্রভৃতি ঠিক্ রাখা আবশ্যক। লায়ন্স্ পশু-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শোভো সাহেব (M. Chauveau) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন, গো বসন্তের মারাত্মক অণু তিন ঘণ্টা কাল মাত্র, ৪৮° সাণ্ডি উত্তাপে থাকিলে টীকার উপযুক্ত অণুতে পরিণত হয়। নিতান্ত গ্রীষ্মের সময় অবিশ্রান্ত তিন ঘণ্টা কাল ৪৮° সাণ্ডি উত্তাপ স্বভাবতঃ এ দেশের মাঠে ঘাটেও পাওয়া যায়।

গো-বসন্তের প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালীগুলির মূলীভূত বিষয় কয়টী বর্ণিত হইল। এক্ষণে ক্রমান্বয়ে (১) শোভো-আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া, (২) আর্লোয়ঁ। আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া, ও (৩) পাস্তার্ আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাইবে। তিনটী প্রক্রিয়ার মধ্যে পাস্তারের প্রক্রিয়াই সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া ইউরোপময় গ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। এ কারণ পাস্তারের চিকিৎসা প্রণালীর প্রক্রিয়াগুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

নির্ব্বাসিতের আবেদন।

তোমরা বিচার কর সবে,
আমি যদি হই দুষী, যাহা ইচ্ছা—যাহা খুসি,
যে শাস্তি করিবে ভাই সহিব নীরবে!
মার' যদি জুতা—লাথি, লইব তা শির পাতি,
দেও যদি ফাঁসি শূলে—বিচারে যা হবে,—

কথনো হব না ভীত, অথবা বিষণ্ণ-চিত,
পোড়াইলে তুষানলে, ডুবালে রৌরবে,
পবিত্র ঈশ্বর স্মরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ছুঁইয়া তুলসী তামা—ঠাকুর মাধবে!
তোমরা বিচার কর সবে!

২

তোমরা বিচার কর ভাই!
কেন আমি দেশছাড়া, আত্মীয় স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?
তোমরা যেখানে যেয়ে, আদর সান্ত্বনা পেয়ে,
যাদেরে দেখিয়া হও সুখী সর্ব্বদাই,
আমারো ত পিতামাতা, আছে সে ভগিনী ভ্রাতা
আছে সে দুহিতা নারী সেখানে সবাই?
আমারো ত লয় মনে, মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই?
আমারো ত হয় আশা, শুনিয়া তাদের ভাষা
চিলাইর কলকলে পরাণ জুড়াই?
তোমরা বিচার কর ভাই!

৩

তোমরা বিচার কর ভাই!
কোন্ দোষে—কোন্ পাপে, বল কার অভিশাপে
হইয়াছি নির্ব্বাসিত, বল দেখি তাই?
করিনি ডাকাতি চুরি, মারিনি ত বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই!
শুধু তার হিতকামী, তারে ভালবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই!
কোন্ পাপে বল তবে, এ শাস্তি আমার হবে?
জগতে ইহার নাকি সুবিচার নাই?
শোন হিন্দু মোসল্‌মান, শোন ভাই খিরিষ্টান,
উড়িয়া আসামী গারো বেহারী লুসাই,
ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা যার, জনক জননী আর
পবিত্র ঈশ্বর নামে দোহাই, দোহাই!
তোমরা বিচার কর ভাই!

৪

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
কেন সে মায়ের বুকে, মরিতে দিবেনা সুখে,
হইতে দিবেনা মোরে ধূলা মাটী তার?
ছাই হ'ব—ভস্ম হ'ব, তারি বুকে মিশে র'ব,
কেন সে দিবেনা, তার কোন্ অধিকার?
শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
শত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার,
ওর তীরে শ্যাম মাঠে, পড়ে আছে শত ঘাটে,
কত যে কণ্ঠের আহা হীরামণিহার!
বড় সাধ মনে মনে, মিশিতে তাদের সনে,
হইতে সে চিলাইর চিতার অঙ্গার!
কেন সে দিবেনা, তার কোন্ অধিকার?

৫

তোমরা বিচার কর জনসাধারণ!
এ নহে সামান্য শাস্তি, এ ভাই সংপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চিরনির্ব্বাসন!
বিনা দোষে কেন তবে, এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ?
সংসারে আমার ভাই, যদিও কেহই নাই,
তবু ত তোমরা আছ দেশবাসিগণ?
নহ ত একটী দু'টী, বঙ্গবাসী আট কোটি,
সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন?
সবারি কি শূন্যবুক, রক্ত নাই একটুক,
হৃদয়ে গলিত বিষ্ঠা করে সঞ্চরণ?
এই ষোল কোটি হাতে, বল নাই একটাতে,
নাহিক অভয় দান আর্ত্তের রক্ষণ?
কেবলি কি খায় ঘাস, মুখেতে তুলিয়া গ্রাস,
কেহই জানে না আর আছে প্রয়োজন?
ষোল কোটি চক্ষু হায়, জলবিন্দু নাহি তায়,
সকলি কি চিরশুষ্ক মরুর মতন?
নাহি দয়া কারো প্রাণে, কেহ ধর্ম্ম নাহি জানে
কেহই বোঝেনা হায় পরের বেদন?
সত্যই ছাগল মেষ, ভরিয়াছে বঙ্গদেশ,

এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন?
তোমরা বিচার কর জনসাধারণ!

৬

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা
করিয়াছে নির্ব্বাসিত, করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি, করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা,
গোষ্ঠিগোত্রে যারা যুটে, জন্মভূমি নেয় লুঠে,
ভয়ে নাহি কথা কহে দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বস্ত্র হরে, দিনে রেতে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন্ কেঁদে হয় সারা,
তোমরা বিচার কর, কে হয় তাহারা?

৭

তোমরা বিচার কর, তাহারা কে হয়,
তারা নহে দস্যু চোর, দুর্দ্দান্ত দানব ঘোর?
পিশাচ রাক্ষস ভাই তাহারা কি নয়?
আমি সে দেশের অরি, চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই দিবানিশি এই মনে লয়!
সরল স্বদেশী মম, বিদলিছে পশু সম,
আহা হা, সে দুঃখ ভাই! প্রাণে নাকি সয়?
স্বপনে শিহরি উঠি, জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লানমুখ সকল সময়!
পিশাচ রাক্ষস ভাই তাহারা কি নয়?

৮

তোমরা বিচার কর, তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী, কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
সহায় সম্পদ হীন, দরিদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে?
দেখ ভাই দেখ চেয়ে, দেখ কি যাতনা পেয়ে,
দিন নাই রাত্রি নাই, ভাসি অশ্রুধারে;
দেখ কি বিষের জ্বালা, শোণিত করিছে কালা,
দেখ কি নরকানল জ্বলে হাড়ে হাড়ে!
কে আছে দুঃখীর জন্য, মানবে দেবতা ধন্য,
বাড়াও দয়ার হস্ত দীন অভাগারে,
সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান, কে আছে বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে,
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে!

৯

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
সবার চরণে ভাই, কাতরে এ ভিক্ষা চাই,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই ইহা ছাড়া আর!
এই জীবনের কর্ম্ম, এই জীবনের ধর্ম্ম,
এই জীবনের ব্রত করিয়াছি সার,
যাবৎ বাঁচিয়া আছি, এ সাধনা লইয়াছি,
মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মা'র!
বাঙ্গালার নরনারি! অই শোন,—শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার,
দানবে লুঠিছে তারে, কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারিনা সহিতে ভাই পারিনা যে আর!
হও শীঘ্র অগ্রসর, সবে মিলে পরস্পর,
সকলে সহায় হও দীন অবলার!
যে জাতি যেখানে থাক,' সতীর সতীত্ব রাখ',
আপনার মা বোনেরে স্মর' একবার,
পেয়েছ যে প্রাণ হস্ত, পুণ্য কার্য্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার,
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভগবদ্গীতা।

হয়ে আশাহীন আর সংযত অন্তর,
ত্যজি সর্ব্ব পরিগ্রহ—কেহ করে যদি
কেবল দৈহিক কর্ম্ম—নাহি পাপ তার।২১

(২১) আশাহীন—(মূলে আছে "নিরাশী")। কামনা বিহীন (স্বামী)। তৃষ্ণা (মধু), বা কামনা (রামা-নুজ) শূন্য। দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্ট বিষয়ে অভিলাষ বা কামনা-বিহীন (শঙ্কর)।

অযাচিত লাভে তুষ্ট, দ্বন্দ্ব বোধহীন,
সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান, মাৎসর্য্য-বিহীন—
হেন জন কর্ম্ম করি বদ্ধ নাহি হয় ২২

যেই জন মুক্ত, আর আসক্তি-রহিত
জ্ঞানে সমাহিত চিত্ত—যজ্ঞ হেতু তার
আচরিত কর্ম্ম হয় সমূলে বিলয়। ২৩

সংযত অন্তর—(মূলে আছে "যতচিত্তাত্মা")। চিত্ত=অন্তঃকরণ; আত্মা=বাহ্যদৃষ্টিতে দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মার অধ্যাস হয়, সেই দেহ ইন্দ্রিয় বা কার্য্য কারণ সঙ্ঘাত শরীর। এই চিত্ত ও আত্মা সংযত (স্বামী, শঙ্কর, মধু)।

পরিগ্রহ—ভোগের উপকরণ (মধু)। প্রাকৃত বস্তুতে মমতা (বলদেব) রামানুজ)।

কেবল দৈহিক কর্ম্ম—(মূলে আছে "শারীরং কেবলংকর্ম্ম") যে কর্ম্ম শুধু শরীর স্থিতি বা রক্ষার জন্য প্রয়োজন—অভিমান (অর্থাৎ নিজ কর্তৃত্ব অভিমান) বর্জ্জন করিয়া কৃত সেই কর্ম্ম (শঙ্কর, মধু)। শরীর নির্ব্বাহ মাত্র উপযোগী ভিক্ষা ভ্রমণাদি স্বাভাবিক কার্য্য (স্বামী)। স্বামী আরও এক অর্থ করেন; তিনি বলেন, আত্মকর্তৃত্ব অভিনিবেশ রহিত পূর্ব্বক কেবল শরীরের দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শারীর কর্ম্ম। শঙ্কর ও মধুসূদন বলেন, অবিহিত কর্ম্ম যখন বাক্য মনের দ্বারা না করিয়া কেবল শরীরের দ্বারা করিলেও প্রত্যবায় হয়, তখন কেবলশরীর দ্বারা কৃত কর্ম্মে পাপ হয় না, ইহা বলাযায় না।

যাঁহারা গীতার অধ্যাত্মব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বলেন, "কেবল" অর্থে—গুরু উপদেশ লভ্য কুম্ভক যোগের প্রক্রিয়া বিশেষ। এ অর্থ সঙ্গত নহে। (গীতার ৩।১৮ দেখ)।

(২২) অযাচিত লাভে তুষ্ট—(মূলে আছে, "যদৃচ্ছা লাভ") প্রার্থনা না করিয়া ও যত্ন না করিয়া উপস্থিত যাহা লাভ হয়, তাহাতে পরিতুষ্ট (শঙ্কর)। বিনা যত্নে শাস্ত্রানুমোদিত অন্নবস্ত্র প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তুষ্ট (মধু) যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত শরীর ধারণোপযোগী বস্তুতে সন্তুষ্ট (মধু)। যাচ্ঞা সংকল্প প্রভৃতি প্রযত্ন ব্যতীত যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে তুষ্ট (বলদেব)।

শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসী নিম্নলিখিত দ্রব্য শরীর রক্ষার জন্য সংগ্রহ করিতে পারেন—

"কৌপীন যুগলং বাসঃ কন্থাং শীত নিবারিণীং।
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহং॥"

দ্বন্দ্বাতীত—(২।৪৫ শ্লোকের টীকা দেখ)। শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু (শঙ্কর, স্বামী)। সমাধি অবস্থায় ক্ষুৎ পিপাসা শীতোষ্ণাদির অতীত হওয়া যায়—কেন না তখন এ সকলের অনুভূতি থাকে না। তবে ব্যুত্থান অবস্থায়, ইহাদের স্ফুরণ হইলেও আত্মদর্শন হেতু তাহাতে চিত্তক্ষোভ হয় না (মধু)।

মাৎসর্য্য বিহীন—নির্ব্বৈর বুদ্ধি (শঙ্কর, স্বামী)। অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও, তাহার প্রতি বৈরভাব বিহীন। নিজকৃত কর্ম্মই সে উৎপীড়ন হেতু, এইরূপ অনুভব হইতে নির্ব্বৈর বুদ্ধি হওয়া যায়, (রামানুজ, বলদেব), অথবা সকলেই সেই এক আত্মা, ভেদদর্শন মায়া মূলক, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত উভয়েই এক এরূপ ধারণা হইতেও নির্ব্বৈর বুদ্ধি হওয়া যায়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান—সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমত্ব চিত্ত অর্থাৎ সিদ্ধিতে হর্ষ, বা অসিদ্ধিতে বিষাদ এরূপ বৃত্তি রহিত (শঙ্কর, রামানুজ)।

নাহি বদ্ধ হয়—শরীর রক্ষার জন্য কেবল ভিক্ষা ভ্রমণাদি কর্ম্ম করিলে তাহাতে বদ্ধ হয় না (শঙ্কর, মধু)। কেননা, জ্ঞানাগ্নিতে সে কর্ম্ম দগ্ধ হয় (শঙ্কর)। এই ভাবে কর্ম্ম করিলে জ্ঞান নিষ্ঠা ব্যতীত ও তাহা বন্ধন কারণ হয় না (রামানুজ)।

(২৩) মুক্ত—ধর্ম্মাদি বন্ধন বিমুক্ত (শঙ্কর), রাগদ্বেষাদি মুক্ত (বলদেব, স্বামী); কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অধ্যাস শূন্য (মধু)।

আসক্তি বিহীন—নিষ্কাম (স্বামী)। ফলাসক্তি শূন্য (মধু)। আত্মা ব্যতীত অনাত্ম বিষয়ে আসক্তি শূন্য (রামানুজ)।

যজ্ঞ হেতু আচরিত—যজ্ঞ নির্ব্বৃত্তি হেতু (শঙ্কর) অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি সম্পাদনার্থ (গিরি)। পরমেশ্বর আরাধনার্থ (স্বামী, বলদেব), অথবা যজ্ঞ রক্ষার্থ বা লোক সংগ্রহার্থ (স্বামী) যজ্ঞ রক্ষার্থ—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দান প্রভৃতি-শ্রেষ্ঠ লোককে আচরণ করিতে দেখিয়া ইতর লোক তাহার অনুসরণ করিবে, ইহাই যজ্ঞ রক্ষা। সেই যজ্ঞ রক্ষার্থ অথবা বিষ্ণু প্রীতি জন্য (মধু)।

সমূলে—কর্ম্মফলসহিত নষ্ট হয় (শঙ্কর)।

(১৯-২৩) পূর্ব্বে ১৮ শ্লোকে যে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহাই ১৯ হইতে ২৩—এই পাঁচ শ্লোকে বিশদ করা হইয়াছে (স্বামী, রামানুজ, বলদেব)। অথবা কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনে লাভ কি, তাহাই এই কয় শ্লোকে দেখান হইয়াছে। (শঙ্কর)। এই স্থলে শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলিয়াছেন, যে দুই শ্রেণীর সাধকের—উক্তরূপ কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন ইত্যাদি হইতে পারে;—যাহারা জ্ঞানার্থী বা জ্ঞানমার্গগামী আর যাঁহারা জ্ঞানারূঢ়। যাঁহারা জ্ঞানমার্গগামী তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। আর যাঁহারা জ্ঞানারূঢ়, তাঁহারা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীগণ কেবল জীবনমাত্র রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ভিক্ষা ভ্রমণাদি কর্ম্ম করেন। আর যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাঁহাদের আত্মদর্শন হইলে পর—নিজ প্রয়োজন সাধক কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি না থাকিলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মগতি প্রভাবে তাঁহারা তখনও লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন। কেন না, এই প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহার সঞ্চিত শক্তি হেতু ইঁহারা একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। জীবন্মুক্ত হইয়াও ইহারা জনকাদির ন্যায় ব্যুত্থান অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম্মবশে বৈদিক লৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তবে আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ায়, ইহাদের দৃষ্ট (ইহ জন্মে সুখভোগরূপ) ও অদৃষ্ট (পরজন্মে স্বর্গাদিরূপ) প্রয়োজন সাধক কর্ম্মের আর আবশ্যক থাকে না বলিয়া, তাহাদের বন্ধন কারণ হয় না।

কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শনরূপ যে নিঃশ্রেয়সঃ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে যাঁহারা অবস্থিতি করিতে পারেন, তাঁহারা কামনা সংকল্প ও ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মকে আশ্রয় না করিয়া তৃপ্তভাবে, সংযতচিত্তে, এবং মমতাহীন, দ্বন্দ্বাতীত, ও সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া—এক কথায় নিষ্কামভাবে কর্ম্মও করিতে পারেন। তাঁহাদের কর্ম্মে বন্ধন কারণ থাকে না।

উক্ত পাঁচ শ্লোকের মধ্যে ১৯।২০ শ্লোকে—কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন কিরূপ (স্বামী, রামানুজ), অথবা কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের ফল কি, তাহার সাধারণভাবে উল্লেখ হইয়াছে। কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম ও লোকহিতার্থ কর্ম্ম উভয়ই অকর্ম্ম ও বন্ধন কারণ নহে, তাহা বুঝান হইয়াছে। ২১।২২ শ্লোকে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ভ্রমণাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আর ২৩ শ্লোক ঈশ্বরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

> যজ্ঞের অর্পণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হবি আর
> ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম হোতা,—ব্রহ্ম কর্ম্মে হেন
> হয় সমাহিত যেই, ব্রহ্মে তার গতি। ২৪

(২৪) যজ্ঞের অর্পণ—মধুসূদন বলেন, দেবতার উদ্দেশ্য দ্রব্য ত্যাগ = যাগ; আর এই ত্যক্ত দ্রব্য বা হবি—অগ্নিতে প্রক্ষেপই হোম। ত্যাগ ও প্রক্ষেপ বা যাগ ও হোম—যজ্ঞের এই দুই ক্রিয়া। প্রথম ক্রিয়ার কর্ত্তা যজমান; দ্বিতীয় ক্রিয়ার কর্ত্তা অধ্বর্য্যু।

অর্পণ = যাহা দ্বারা অগ্নিতে হবিঃ ক্ষেপণ করিতে হয়, সেই স্রুব বা জুহু (স্বামী, শঙ্কর); অথবা যে মন্ত্রে হোম করিতে হয়, সেই মন্ত্র (মধু); অথবা যে দেবতা উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হয়, সেই দেবতা (মধু, বলদেব) অথবা যে ফল হেতু যজ্ঞ করা হয়, সেই স্বর্গাদি ফল (মধু)।

যজ্ঞের পঞ্চবিধ উপকরণ বা কারক যথা,—কর্ত্তা (যজমান ইত্যাদি); কর্ম্ম (হোম, যাগ); করণ (স্রুবাদি); সম্প্রদান (ইন্দ্রাদি দেবতা) আর অধিকরণ (অগ্নি এবং দেশ কাল)।

ব্রহ্মকর্ম্মে হেন সমাহিত—যজ্ঞের অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা—সকলেই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই কর্ম্ম এইরূপ ধারণা যাহার জ্ঞানে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কর্ম্মে সমাহিত।

যজ্ঞের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গে ব্রহ্মবোধ দুইরূপে হইতে পারে। বিষ্ণুর প্রতিমাতে যেমন বিষ্ণুবুদ্ধি হইতে পারে, অথবা নামাদিতে যেমন ব্রহ্মবোধ হইতে পারে, যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গে সেইরূপ ব্রহ্মবোধ হইতে পারে। কিন্তু এ অর্থ শঙ্করাচার্য্য সঙ্গত মনে করেন না। তিনি বলেন যে, তাহা হইলে দ্বৈতজ্ঞান লোপ হয় না। যজ্ঞের বিভিন্ন উপকরণে ব্রহ্মজ্ঞান আরোপিত হইলে সেই অর্পণাদি উপকরণ সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র ধারণা, তাহা দূর হয় না। অর্থাৎ এই অর্পণাদিতে অর্পণবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না। অধিকন্তু তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপিত হয় মাত্র। যখন দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (২।৩৩ দ্রষ্টব্য) তখন যজ্ঞের উক্ত উপকরণে স্বতন্ত্র দ্রব্য জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ উহা প্রকৃত জ্ঞানযজ্ঞ হয় না। ততক্ষণ অর্পণাদিতে ব্রহ্ম অভিধান অনর্থক।

এই জন্য শঙ্করাচার্য্য, গিরি, মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের অদ্বৈতবাদ সঙ্গত অন্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, যজ্ঞের অর্পণাদি অঙ্গে সাধারণতঃ লোকের অবিদ্যা হেতু দ্বৈত বা ভেদজ্ঞান থাকে। শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, অথবা রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম, সেইরূপ অজ্ঞানবশে ব্রহ্ম পদার্থেই স্রব, অগ্নি, হোতা প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের ভ্রান্ত অধ্যাস হয়। নিঃশ্রেয়সঃ অদ্বৈত জ্ঞান উদয় হইলে আর এ ভ্রম থাকে না। তখন জগতে আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের উপলব্ধি হয় না। অজ্ঞান বা অবিদ্যা হেতু জ্ঞানে জগৎ ও কর্ম্ম বা যজ্ঞ রূপ যে ছায়া, যে কাল্পনিক বা ব্যবহারিক অধ্যাস পড়িয়াছিল, আত্মজ্ঞান হইলে সেই ছায়া দূর হইয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞান তখন পূর্ণ মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়। তখনই কর্ম্মে অকর্ম্ম বা ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন সাধারণ লোকে যাহাকে অর্পণ হবি প্রভৃতি মনে করে, ব্রহ্মবিদ্ সেই সকলই ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভ্রমবশে রজ্জুতে সর্প কল্পনার ন্যায় ব্রহ্মেতেই অর্পণাদি সমস্ত কল্পিত হইয়াছে। যাহা অধিযজ্ঞে অর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই ব্রহ্মবিদের নিকট অধ্যাত্মব্রহ্ম।

[illegible]ানের ন্যায় বিদ্বান যখন লোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অথবা সাধারণের নিকট যজ্ঞে প্রবৃত্ত বলিয়া বোধ হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন কর্ম্ম করেন না। কেননা যে বিভিন্ন উপকরণে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, সেই বিভিন্ন উপকরণে ব্রহ্মবিদের ভেদদৃষ্টি থাকে না, সে সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ ধারণা থাকে। সুতরাং ব্রহ্মবিধ সেরূপ কর্ম্মকালেও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেতেই সমাহিত থাকেন। এই জন্য সেরূপ কর্ম্মের ফল উৎপাদন শক্তি থাকে না।

যিনি সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসী—লোকসংগ্রহার্থও কর্ম্ম করেন না, কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম্মমাত্র করেন, তিনিও যজ্ঞ না করিয়া যজ্ঞের এই স্বরূপ উপলব্ধি করেন।

ব্রহ্মে তার গতি—অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানে বা কর্ম্মব্রহ্মে যে সমাহিত, সে ব্রহ্মেতে গমন করে। অথবা এইরূপ যজ্ঞের পরিণাম ব্রহ্মলাভ হয়। কেহ কেহ অর্থ করেন, যজ্ঞের সাধারণ ফল বা গতি যে স্বর্গ, ব্রহ্মবিদ্ তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।

কোন যোগী দৈব যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান ;
অন্য কেহ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি রূপেতে
যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকেই করেন অর্পণ। ২৫
দেয় কেহ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সকল
আহুতি সংযমানলে ; শব্দাদি বিষয়
কেহ বা আহুতি দেয় ইন্দ্রিয় অগ্নিতে। ২৬

---

(২৫) যোগী—কর্ম্মযোগী বা কর্ম্মী (স্বামী, শঙ্কর, রামানুজ)।

দৈবযজ্ঞ—ইন্দ্রাদি দেব অর্চ্চনা রূপ যজ্ঞ। (স্বামী ভাষ্য)।

অন্যকেহ—ব্রহ্মবিদ্ (শঙ্কর) কিম্বা উক্ত যোগী হইতে ভিন্ন তত্ত্বদর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসী (মধু)। জ্ঞানযোগী (স্বামী)। অথবা পূর্ব্ব শ্লোক উক্ত ব্রহ্মকর্ম্মে সমাহিত জ্ঞানী (বলদেব, রামানুজ)।

ব্রহ্মাগ্নিতে...অর্পণ—রামানুজ ও বলদেব অর্থ করেন যে, উক্ত ২৪ শ্লোকে উল্লিখিত যজ্ঞ সাধনভূত স্রুবাদি দ্বারা যজ্ঞকে, অর্থাৎ যজ্ঞরূপ বা ব্রহ্মাত্মক আজ্যাদি যজ্ঞে ব্যবহৃত দ্রব্যকে, ব্রহ্মরূপ যজ্ঞাগ্নিতে হোম করেন। স্বামী বলেন, ইহাই জ্ঞান যজ্ঞ। ইহাতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মকেই ব্রহ্মে লীন করা যায়।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন স্বতন্ত্র অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, সত্যজ্ঞান আনন্দ ঘন সর্ব্ব বিশেষণ রহিত যে ব্রহ্ম বেদান্তে "ন ইতি ন ইতি" বলিয়া বাচ্য, সেই অগ্নিরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্মাগ্নি। যজ্ঞকে অর্থাৎ উপাধিযুক্ত ত্বং পদার্থ বাচ্য, জীবাত্মাকে (যাঙ্ক) উক্ত নিরূপাধিক তৎপদার্থ পরব্রহ্ম স্বরূপে জ্ঞান-যোগীরা দর্শন করেন। ইঁহারা বলেন, জীবব্রহ্ম অভেদ দর্শন সাধন ও যজ্ঞ মধ্যে গণ্য। ইহাই জ্ঞান যজ্ঞ। যজ্ঞাগ্নিতে যেমন হবি বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মাকে বিলীন করিতে হয়। সেই সাধনাই জ্ঞানযজ্ঞ।

(২৬ দেয় কেহ = অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (স্বামী, বলদেব)।

সংযম-অনলে—অর্থাৎ ইহারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে সংযম করেন। (শঙ্কর, রামানুজ)। অথবা ইহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া মনস্তত্ত্বে বিলীন করেন। (গিরি, বলদেব, মধু)।

আত্মাতে সংযম-যোগ অনল জ্বালিয়া—
জ্ঞানবলে, করে কেহ আহুতি অর্পণ
সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম আর। ২৭

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই তিনকে একত্রে সংযম বলে। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (পাতঞ্জল দর্শন)। হৃদ্-পুণ্ডরীকাদিতে মনকে চিরকাল স্থাপন করাই ধারণা। এই একত্রধৃত চিত্তের ভগবদাকার বৃত্তি প্রবাহ ধ্যান। আর বিজাতীয় বা অনাত্ম প্রত্যয় অন্তরিত হইয়া সর্ব্বদা আত্ম প্রত্যয় প্রবাহই সমাধি। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত (মধু)। মধুসূদন এই সমাধিতত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তিনি এই স্থলে অর্থ করেন যে,ধ্যান ধারণা সমাধি সিদ্ধির জন্য এ যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। বিষয় হইতে নিগৃহীত ইন্দ্রিয় সকল বিক্ষেপ অভাবে চিত্তরূপ হয় বা চিত্তে বিলীন হয়। ইহাই সংযমযজ্ঞ।

কেহ বা—গৃহস্থগণ (স্বামী, বলদেব)। মধুসূদন অন্য অর্থ করেন।

ইন্দ্রিয় অনলে—অর্থাৎ গৃহীগণ অনাসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় উপভোগ করে (বলদেব, স্বামী)। অথবা ইহারা ইন্দ্রিয়দিগের শব্দাদি বিষয় প্রবণতা নিবারণ করে(রামানুজ)। মধুসূদন বলেন,যেমন সমাধি অবস্থায় সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধরূপ যজ্ঞ করিতে হয়, তেমনি ব্যুত্থান অবস্থায়, রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া স্পৃহাশূন্য হইয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিরুদ্ধ বিষয় ভোগ করিতে হয়—ইহাই ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয়ের হোম করা।

(২৭) আত্মাতে সংযমযোগ—মনের সংযমরূপ যোগ। (অর্থাৎ ইহারা মন বলে, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ শক্তির কর্ম্ম প্রবণতা নিবারণ করিতে যত্ন করে—রামানুজ, বলদেব)। আত্মাতে ধ্যান পূর্ব্বক একাগ্রতা অবস্থাই যোগ (স্বামী); আত্মজ্ঞান বিষয়ক সংযম, ধারণা ধ্যান—সংপ্রজ্ঞাত সমাধি,ইহার পরিপাকে যোগ বা নিরোধ সমাধি। পাতঞ্জলদর্শন ৩।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে শঙ্কর, গিরি, মধুসূদন সকলেই বলেন, যে এই শ্লোকে ভগবান পাতঞ্জলি উক্ত "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" সংজ্ঞাযুক্ত যোগ উক্ত হইয়াছে। "সর্ব্ব ব্যাপার নিরোধ পূর্ব্বক আত্মাতে সমাধান রূপ ধ্যান ধারণা সমাধিলক্ষণযুক্ত সংযমই যোগ (গিরি)। মধুসূদন বলেন, এ স্থানে ব্যুত্থান শূন্য সমাধির কথা উক্ত হইয়াছে। এই সমাধি কিরূপ,মধুসূদন তাহা বিস্তারিত বুঝাইয়াছেন। এখানে তাহা সমস্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন,কারণ সৎ,আর তাহার কার্য্য অসৎ—ইহা জানিয়া ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চ স্থূল ভূতাত্মক জড়জগৎ হইতে তাহার মূল কারণ চৈতন্যে উপনীত হওয়া যায়। এই চৈতন্য মাত্র গোচর যে সমাধিতে হয়, তাহাই লয় পূর্ব্বক সমাধি। তবে যদি এই চৈতন্যে সমাধিকালে অবিদ্যাবীজ ধ্বংস না হইয়া থাকে, তবে তাহা সবীজ সমাধি। ইহা শ্রেষ্ঠ নহে। অবিদ্যাবীজ ধ্বংস হইলে যে নির্ব্বীজ সমাধি হয়, তাহাই প্রধান। এবং তাহাই এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞান বলে—আত্মানুসন্ধান জ্ঞান (বলদেব)। ধ্যেয় বিষয় জ্ঞান (স্বামী)। বিবেক বিজ্ঞান (শঙ্কর) বেদান্ত বাক্য জন্য ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞান (মধু)।

কেহ—ধ্যাননিষ্ঠ (স্বামী)। (মনু ৪।২২-২৪ দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, প্রাণ কর্ম্ম—চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও মনের কর্ম্ম ইন্দ্রিয় কর্ম্ম। আর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচ প্রধান প্রাণ কর্ম্ম এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক পাঁচ গৌণপ্রাণকর্ম্ম এই দশবিধ প্রাণ কর্ম্ম—

প্রাণ = বহির্গমন, অর্থাৎ নিঃশ্বাস।

অপান = অধোগমন, বা প্রশ্বাস।

ব্যান = আকুঞ্চন প্রসারণাদি সমস্ত দেহব্যাপার—অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ও দেহে রক্ত সঞ্চালন (Circulation)

সমান = অসিত পীতাদির সমুন্নয় বা সমীকরণ (Digestion)

উদান = ঊর্দ্ধে নয়ন (Assimilation)।

পাঁচ গৌণ বায়ু, যথা—

"উদ্গারে নাগ আখ্যাত কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকর ক্ষুৎকারো জ্ঞেয়ঃ দেবদত্ত বিজৃম্ভণে॥
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।"

উক্ত পাঁচটী প্রধান প্রাণকর্ম্মই পাঁচজন জৈবক্রিয়া বা (Vitalation) মাত্র।

মধুসূদন বলিয়াছেন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মে-

দ্রব্য যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, কিম্বা যোগ-যজ্ঞ
করে কেহ, কেহ যতি ঘোর ব্রতধারী ;
কেহবা স্বাধ্যায়, কেহ জ্ঞান যজ্ঞে রত। ২৮

ন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি এই দুই অন্তরেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ, এই সপ্তদশ পদার্থে লিঙ্গ-শরীর গঠিত। ইহাই সূক্ষ্মভূত ও সমষ্টিরূপে হিরণ্যগর্ভ খ্যাত। এই সমষ্টি লিঙ্গ শরীর উল্লিখিত নির্বীজ সমাধিতে লয় করিতে হয় অর্থাৎ সমাধি অনলে আহুতি দিতে হয়।

(২৮) দ্রব্যযজ্ঞ—তীর্থাদিতে যজ্ঞবুদ্ধি পূর্ব্বক দ্রব্য দান (শঙ্কর), দ্রব্যদান (স্বামী)। অন্নাদি দান (বলদেব)। ন্যায়তঃ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক, দান, যাগ বা হোম উপায়ে অথবা দেবার্চ্চনায় ব্যয় করাই দ্রব্যযজ্ঞ (রামানুজ)। মধুসূদন বলেন, যথাশাস্ত্র দ্রব্য ত্যাগই দ্রব্য যজ্ঞ। স্মৃত্যুক্ত পূর্ত্ত ও দত্ত নামক কর্ম্মে দ্রব্য-ত্যাগ—দ্রব্যযজ্ঞ।

যথা,—"বাপীকূপ তড়াগাদি দেবতায়তনানিচ।
অন্ন প্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যাভিধীয়তে॥
শরণাগত মন্ত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনং।
বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥"

ইহা ব্যতীত ইষ্টার্থ শ্রৌতকার্য্য ও দৈব য সকলই দ্রব্যযজ্ঞ।

তপোযজ্ঞ—তপস্বীর তপস্যা রূপ যজ্ঞ (শঙ্কর) কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ উপবাস প্রভৃতিতে নিষ্ঠারূপ যজ্ঞ (রামানুজ, বলদেব, মধুসূদন, স্বামী)।

যোগযুক্ত—প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি লক্ষণ যুক্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ (শঙ্কর, স্বামী মধু)। রামানুজ ও বলদেব ভিন্ন অর্থ করেন ; তাঁহারা বলেন এস্থলে পুণ্যস্থান বা পুণ্যতীর্থ প্রাপ্তিই যোগ। যাহারা পুণ্য তীর্থ সঙ্গমপর, তাহারাই যোগযজ্ঞ রত।

যদি ২৭ শ্লোকোক্ত আত্মসংযমযোগকে সমাধি যোগ বলিতে হয়, তবে এখানে যোগযজ্ঞের যে অর্থ রামানুজ করিয়াছেন, তাহাই অধিক সঙ্গত হয়। কিন্তু মধুসূদন বুঝাইয়াছেন,যে যোগের আট অঙ্গ :—যম,নিয়ম,আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। তন্মধ্যে ২৬ শ্লোকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারের কথা মাত্র উক্ত হইয়াছে ; ২৭ শ্লোকে, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই তিন যোগাঙ্গ আত্মসংযম যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ;

অপানেতে প্রাণ আর প্রাণেতে অপান
কেহ বা আহুতি দেয়,—প্রাণাপান গতি
করে রোধ, প্রাণায়াম-পরায়ণ যারা ;
কেহ বা আহার নিজ করি নিয়মিত,
প্রাণপণে প্রাণেতেই অর্পেণ আহুতি। ২৯

পরের ২৯ শ্লোকে প্রাণায়ামের কথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে যোগযজ্ঞ অর্থে যোগের অপর তিন অঙ্গ যম, নিয়ম, ও আসনের কথা কথিত হইয়াছে। যম,—অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ এই পাঁচটি। নিয়ম,—অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ-তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি। আসন, অর্থাৎ সিদ্ধ, পদ্ম প্রভৃতি অনেক প্রকার "স্থিরসুখ" যোগোক্ত আসন। মধুসূদন যোগ শাস্ত্র হইতে এই সমস্ত শৌচাদিতত্ব বিস্তারিত বুঝাইয়াছেন। তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

যতি ঘোর ব্রতচারী—পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "তে জাতি দেশকাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতং।" মধুসূদন বলেন যে, যাহারা অহিংসাদি পঞ্চ প্রকার 'যম' বা উপরতিতে, দেশকাল অবচ্ছেদে দৃঢ়রূপে স্থিত তাহারাই ঘোর ব্রতধারী যতি। তাহারা জাতি অবচ্ছেদে অর্থাৎ মৃগয়াকালে মৃগ ব্যতীত আর কিছু হত্যা করিব না, বা তীর্থস্থানে হত্যা করিব না অন্যত্র করিব, বা পুণ্য দিন ব্যতীত অন্য দিনে জীব-হিংসা করিব—ইত্যাদি রূপ অবচ্ছেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বজাতি সর্ব্ব দেশ সর্ব্বকাল ও সর্ব্ব প্রয়োজন সার্ব্বভৌমিক ভাবে অহিংসাদি পঞ্চ 'যম' রূপ যজ্ঞ দৃঢ়রূপে আচরণ করেন, তাহারাই ঘোর ব্রতধারী যতি।

স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ—যথাবিধি ঋগ্বেদাদি মোক্ষ শাস্ত্রাভ্যাস বা পাঠ ইহাই স্বাধ্যায় যজ্ঞ ; আর শ্রবণ মননাদি দ্বারা এই সকল শাস্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞানই জ্ঞান-যজ্ঞ (স্বামী, শঙ্কর, মধু, রামানুজ)।

(২৯) অপানেতে প্রাণ…প্রাণায়াম পরায়ণ যারা—সকল টীকাকারই বলিয়াছেন, এস্থলে যোগোক্ত প্রাণায়াম ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ—রেচক, পুরক ও কুম্ভক। শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করাই প্রাণায়াম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,

অন্তরস্থিত বায়ু নাসিকা দ্বারা পরিত্যাগ করাই বা শ্বাস নির্গমন করাই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া। আর বায়ু বিনির্গ করিয়া পুনর্ব্বার বাহ্যবায়ু নাসিকা দ্বারা টানিয়া লও-য়াই বা অন্তরে প্রবেশ করানই প্রশ্বাস—ইহা অপান বায়ুর কার্য্য। (কোন কোন স্থলে অধোগমনকারী বায়ুকে অপান বায়ু বলে, এস্থলে অপান বায়ুর সে অর্থ নহে) পুরকাখ্য প্রাণায়াম কালে অপানেতে প্রাণবায়ুর লয় করিতে হয়, আমরা অপান বায়ুর দ্বারা প্রাণবায়ুকে এক করিতে বা মিশাইতে হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস উর্দ্ধে টানিয়া লইয়া তাহা বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়,তাহার প্রশ্বাস বা ত্যাগ বদ্ধ করিতে হয়। সেইরূপ রেচককালে প্রাণেতে অপান বায়ু মিশাইতে হয়, বা বদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। আর কুম্ভকাখ্য প্রাণা-য়ামে প্রাণ অপান উভয় বায়ুরই গতি রোধ করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদ প্রাণায়াম:।"

রেচক—বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহাতে উদার্য্য বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহিরে স্থাপন করিতে হয়। পুরক—অন্তঃবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহাতে বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। কুম্ভক—স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহাতে রেচক পুরক কিছুই না করিয়া বায়ুকে অভ্যন্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। রেচক পুরক কুম্ভকের স্থান কাল নিয়ম আছে। শ্বাস ও প্রশ্বাসকে হ্রস্ব দীর্ঘ করা অর্থাৎ বেগে বা মৃদু ভাবে গ্রহণ করা ইহাই স্থান বা দেশ নিয়ম। আর সমান মাত্রায় ১৬। ৬৪। ৩২ বার মন্ত্র বিশেষ উচ্চারণ বা মনে মনে ধ্যান পূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক কুম্ভক ও পুরক করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "বাহ্যাভ্য-ন্তরস্তম্ভ বৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্ম।"

স্বামী বলেন, পুরক কালে "হং" ও রেচককালে "সঃ" এই "হংস" মন্ত্র, অথবা ইহা উলটাইয়া রেচক কালে "স" ও পুরককালে "হং" এই সোঽহং মন্ত্র অর্থাৎ অজপা মন্ত্র জপ দ্বারা তৎপদার্থ ও তং পদার্থ বা ব্রহ্ম বা জীবাত্মার ঐক্য ভাবনা করিতে হয়।

আহার নিয়মিত—অর্থাৎ আহার সংকোচ অভ্যাস। যোগ শাস্ত্রে আছে,

"মিতাহারং বিনা যস্ত যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানা রোগোভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিদ্ধতি॥

সবে এরা যজ্ঞবিদ্—দূরিত কলুষ
যজ্ঞহেতু; ভুঞ্জি সুধা যজ্ঞঅবশেষ—
ব্রহ্ম সনাতনে তারা করয়ে প্রয়াণ। ৩০

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্মান বর্জ্জিতং।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহার মিমং বিদুঃ॥
অন্নেন পুরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কং।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥"

প্রাণেতেই প্রাণপণে অর্পেণ আহুতি—প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বায়ুকে ঐ সমস্ত বায়ুতে হোম করেন; অর্থাৎ যে যে বায়ু প্রাণায়াম দ্বারা জয় করা যায়, অন্যান্য বায়ু তাহাতেই জয় হয় বা লয় হয় (শঙ্কর, গিরি)। অথবা আহার সঙ্কোচ হেতু প্রাণগণ অথবা ইন্দ্রিয়গণ ক্ষীণ হয়,—এবং এইরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয় বৃত্তি লয় করিতে হয় (স্বামী, বলদেব)। অথবা কুম্ভ-কের দ্বারা প্রাণাদি সকল বায়ু একত্র স্তম্ভ করিয়া তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে লয় করিতে হয়—ইহাই হোম (স্বামী, মধু)। মধুসূদন আরও বলেন, ইহাই চতুর্থ রূপ কুম্ভক। পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে। ইহা চতুর্থ প্রাণায়াম। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থী"

অর্থাৎ বাহ্য বা রেচক ও আন্তর বা কুম্ভক এই উভয় অবলম্বন না করিয়া কেবল কুম্ভক অভ্যাসই চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। অথবা অন্য টীকাকারের অর্থানুসারে বাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল ও আন্তর অর্থাৎ হৃদয় নাভিচক্র ইত্যাদি উভয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভ বা কুম্ভক রূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করাই চতুর্থ প্রাণায়াম। ইহাই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এই শ্লোকে চারি প্রকার প্রাণায়ামের কথাই উক্ত হই-য়াছে। (মধু)।

(৩০) সবে এঁরা—পূর্ব্বে ২৫ শ্লোক হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত নানারূপ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫ শ্লোকে সাধারণতঃ যজ্ঞকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—এক দৈবযজ্ঞ, আর এক জ্ঞান-যজ্ঞ। কর্ম্মযোগীরাই দৈব যজ্ঞ করেন, এবং তাহাতে ক্রমে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয়। জ্ঞানযোগীরা সাধা-রণতঃ সন্ন্যাসী—তাঁহারা ব্রহ্মরূপ মহা অগ্নিতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে যে সকল পদার্থ মায়া হেতু জ্ঞানে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা নিঃক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মতেই

নাহি ইহ-লোক তার যেই যজ্ঞহীন,
হে কুরুপ্রধান, তার কোথা পরলোক। ৩১

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে
আছয়ে বিহিত; কর্ম্মজাত সেই সব
জে'ন তুমি—এই জ্ঞানে হবে মুক্তিলাভ।৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে, ওহে পরন্তপ,
জ্ঞান-যজ্ঞ হয় শ্রেষ্ঠ। পার্থ, এই সব
নিখিল করম হয় জ্ঞানে পরিশেষ। ৩৩

সমস্ত লয় করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন (শঙ্কর)। ২৬ শ্লোকে দুই প্রকার যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। স্বামীর মতে—তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয় সংযম যজ্ঞ ও গৃহীর নিষ্কাম ভাবে বিষয় ভোগ যজ্ঞ। আর মধুসূদনের মতে তাহা যোগীর নিরোধ অবস্থায় ধ্যান ধারণা সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ সংযম যজ্ঞ আর তাহার ব্যুত্থিত অবস্থায় নিষ্কামভাবে বিষয়ভোগ যজ্ঞ। ২৭ শ্লোকে প্রকৃত যোগ বা নির্ব্বীজ সমাধিরূপ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। ২৮ শ্লোকে ছয় প্রকার যজ্ঞ উল্লিখিত হইয়াছে। ২৯ শ্লোকে প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ২৫ হইতে ২৯ শ্লোকে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। (স্বামী, মধু)। যথা, দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ (২৫), নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যজ্ঞ ও গৃহীর নিষ্কাম কর্ম্ম যজ্ঞ (২৬), ধ্যান যজ্ঞ (২৭), দ্রব্যযজ্ঞ, তমোযজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ, জ্ঞান যজ্ঞ, যতির যজ্ঞ (২৮) ও প্রাণায়াম যজ্ঞ (২৯)। (স্বামী।)

সবে এঁরা,—অর্থাৎ উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকারী। রামানুজ বলেন, এই কয় শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কর্ম্মযোগ বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ হইতে ১৩ শ্লোকে যে মহা যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই যজ্ঞ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ যজ্ঞে ইহারা সকলে নিষ্ঠাবান।

ভুঞ্জি সুধা—যজ্ঞ করিয়া তাহারই অবশিষ্ট দ্বারা যথাকালে যথাবিধি ভুক্ত অন্নই অমৃত। (মনু ৩।২৮৫ দেখ)। (শঙ্কর, স্বামী)। বলদেব বলেন, এই অমৃতাখ্য অন্ন ও ভোগ ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় উপভোগ যজ্ঞ এস্থলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

প্রয়ান—অর্থাৎ যথাকালে গমন করে (শঙ্কর) এই যজ্ঞ উপায়ে মুমুক্ষুর একেবারে মুক্তি হয় না, ক্রমশঃ মুক্তি পথে গিয়া যথাকালে মুক্তি হয় বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় (গিরি)।

(৩১) নাহি ইহ লোক—উল্লিখিত যজ্ঞ মধ্যে যে কোনরূপ যজ্ঞে রত নহে, সেই যজ্ঞহীন। (শঙ্কর) অথবা মহাযজ্ঞ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম রহিত যে, সেই যজ্ঞহীন। (রামানুজ)। তাহার ইহলোক অর্থাৎ এই অল্পসুখ যুক্ত মনুষ্য লোক (স্বামী, মধু) অথবা এই সর্ব্বপ্রাণি সাধারণ লোক (শঙ্কর) অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধক প্রাকৃত লোক (বলদেব, রামানুজ) নাই। সুতরাং বিশিষ্ট সাধনা সাধ্য (শঙ্কর, মধু) অথবা বহুসুখ পূর্ণ (স্বামী)। অথবা পরম পুরুষার্থ সাধক মোক্ষরূপ (রামানুজ) পরলোক তাহাদের নাই।

(৩২) বেদমুখে—(মূলে আছে "ব্রাহ্মণোমুখে" —সকল টীকাকারই ইহার অর্থ করিয়াছেন—বেদমুখে, অর্থাৎ বেদে কথিত আছে।

কর্ম্মজাত—কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত—আত্মা হইতে উদ্ভূত নহে; সুতরাং আত্মা—নিষ্ক্রিয়, নির্ব্যাপার (শঙ্কর, স্বামী, মধু, বলদেব)। পূর্ব্বে ৩ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে "যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ।" পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" গিরি বলিয়াছেন, আমাদের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই দুইশক্তি আছে। ইহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিতেই ক্রিয়াশক্তি পর্য্যবসিত হয়। এই ক্রিয়াশক্তি হেতু কর্ম্ম ও যজ্ঞ হয়।

(৩৩) দ্রব্যময়—দ্রব্য সাধন সাধ্য (শঙ্কর), জ্ঞান বিহীন, দ্রব্য উপলক্ষিত যজ্ঞ (মধু)। বলদেব ও রামানুজ বলেন যে, প্রত্যেক কর্ম্মের দুই অংশ—জ্ঞান ও কর্ম্ম। যজ্ঞ—জ্ঞানাকার ও কর্ম্মাকার। তবে এই যজ্ঞ যখন জ্ঞানাংশ বিহীন হয়, তখন ইহা শুধু দ্রব্যময় যজ্ঞ, আর কর্ম্মাংশ বিহীন হইলে ইহা শুধু জ্ঞানময় যজ্ঞ। অথবা প্রত্যেক যজ্ঞেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই অংশ থাকে। তাহার মধ্যে কর্ম্মাংশ অপেক্ষা জ্ঞানাংশ শ্রেষ্ঠ। শঙ্কর বলেন, যে শুধু দ্রব্যযজ্ঞে কর্ম্মফল ধ্বংস হয় না—এই জন্য ইহা কর্ম্মফলহীন জ্ঞানযজ্ঞ হইতে নিকৃষ্ট।

জ্ঞানে পরিশেষ—মোক্ষ সাধক জ্ঞানেই সকল কর্ম্ম অন্তর্ভূত হয় (শঙ্কর), অর্থাৎ ফল সহিত শ্রুতি

প্রণিপাত প্রশ্ন আর শুশ্রূষা করিয়া
লভ তবে এই জ্ঞান; জ্ঞান-উপদেশ
দিবেন তোমারে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ। ৩৪
জানি যাহা, হেন মোহ রবেনাক আর,
হে পাণ্ডব; যাহা হতে, সর্ব্বভূতগণে
নেহারিবে আপনাতে—অথবা আমাতে।৩৫

ও স্মৃতিউক্ত অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয় (মধু)। অথবা এই সকল কর্ম্মেরই চরম ফল জ্ঞান (রামানুজ); সুতরাং জ্ঞান লাভ হইলে সকল কর্ম্মই সাঙ্গ বা নিবৃত্তি হয় (বলদেব)। (গীতায় ২।৪৬ দ্রষ্টব্য) ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন, তপসা নাশকেনেতি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীতি চ।"

(৩৪) প্রণিপাত—তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞান কি তাহা জানিতে হয়। শ্রুতিতে আছে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্।" (মধু)। গিরি বলেন, এই প্রণিপাতাদি গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নহে। ইহা জ্ঞানার্জ্জন জন্য বহিরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনের কথা পরে ৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

এই জ্ঞান—আত্মজ্ঞান (রামানুজ)। বলদেব, মধুসূদন বলেন, এই জ্ঞান পরমাত্মা বিষয়ক, জীবাত্মা বিষয়ক নহে।

তত্ত্বদর্শীগণ—কেবল বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ও তাহার অর্থাদি গ্রহণ হইতে পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি কেবল তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু তত্ত্বদর্শী নহেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ দিতেও সমর্থ নহেন। কিন্তু যাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, যাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি জন্মিয়াছে, যাঁহার বিজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই তত্ত্বদর্শী। গিরি ও মধুসূদন বলেন যে—এখানে বহুবচন গৌরবে ব্যবহৃত হইয়াছে। নতুবা একাধিক গুরু বা আচার্য্যের নিকট জ্ঞান উপদেশ লইতে হয় না।

(৩৫) জানি যাহা—যে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান—তৎপরে সাধনা দ্বারা লাভ করিলে বা জীব-ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধি হইলে (রামানুজ, বলদেব)। (এই প্রকৃত জ্ঞান কখন লাভ হয় বা কখনই বা আত্মার নিজস্ব করিয়া লওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী ৩৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।)

হেন মোহ—বন্ধু বধাদি হেতু মোহ (স্বামী, মধু, বলদেব), দেহেতে আত্মাভিমানরূপ এবং সেই হেতু মমত্ব রূপ মোহ (রামানুজ)।

সর্ব্বভূতগণে—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত (শঙ্কর), অথবা পিতৃপুত্রাদি সকলে (মধু, স্বামী)।

নেহারিবে আপনাতে অথবা আমাতে—অর্থাৎ এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থই অবিদ্যা বিজৃম্ভিত অবিদ্যা হেতুই জীবের জ্ঞানে ভেদ দর্শন হয়—"আমি" ব্যতিরিক্ত পদার্থ "ইহা" বা "ইদং" জ্ঞানে কল্পিত হয়। জ্ঞানলাভ হইলে "আমি" ও "ইহা" এই পার্থক্য থাকে না। তখন আমাতেই এই সমস্ত সংস্থিত, আমার বাহিরে ইহার কিছুই নাই, এইরূপ অনুভূতি হয়। তাহার পর ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের এই অনুভূতি হইতে ক্রমে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অভেদ দর্শন হয়। তখন এই সমস্ত ও আমি সকলই এক, সকলই ক্রমেই এক ঈশ্বরে সংস্থাপিত, ইহা ধারণা হয়। প্রথমে জীবজ্ঞানে (বা ত্বং পদার্থে) এই সমস্ত চরাচর আরোপিত হইয়াছে, জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই, ইহা প্রতিভাত হয়। আর "তৎ ত্বম্ অসি" অথবা "তুমিই সেই" এজন্য এই সমস্ত চরাচর ভগবান্ বাসুদেবে কল্পিত হইয়াছে। এই ধারণাই জ্ঞানে বদ্ধমূল হয়।

ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। সুতরাং এ তত্ত্ব সহজে ধারণা করা সম্ভব নহে। একজন জর্ম্মান দার্শনিক (পল ডুসেন) বলিয়াছেন—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কাণ্ট (Kant) ও সপেনহরের (Sopanpenheaur) লিখিত এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা না বুঝিলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এই সমস্ত চরাচর কাল ও স্থান বা দেশ এই দুই তত্ত্বে অধিষ্ঠিত। কিন্তু কাল ও স্থান আমাদের অনুভূতির বাহিরে নাই। কাল ও স্থান কাল্পনিক। অতএব কাল ও স্থানে প্রতিবিম্বিত সকলই কাল্পনিক। ব্রহ্ম বা আত্মা এই দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা দেশ কাল ও কারণসূত্রের বাহিরে সংস্থিত। এই দেশ কাল বন্ধনই আমাদের জ্ঞানে মায়া বা অবিদ্যা বন্ধন। এই যে জগতে বহুত্ব দর্শন হয়, 'আমি' ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের ধারণা হয়—সে এই কাল ও স্থান অধ্যাস জন্য।

যখন জীব এই অজ্ঞান আবরিত থাকে,তখন তাহার জাগ্রত অবস্থা। তখন আমি ও আমি ভিন্ন অন্য পদার্থের পার্থক্য ধারণা বদ্ধমূল থাকে। সাধনার দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা দ্বারা অজ্ঞানের প্রভাব হ্রাস হইলে—'স্বপ্নাবস্থা' উপস্থিত হয়। তখনও এ পার্থক্য জ্ঞান থাকে সত্য; কিন্তু তখন সর্বভূত আত্মাতে বা জীবের আত্মজ্ঞানে প্রতিফলিত হইয়াই আত্মা হইতে তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই, এইরূপ একটা ধারণা ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে থাকে। অজ্ঞান কুহেলিকা ক্রমে ক্রমে অপনীত হইতে থাকে। সেই জন্য তখনও ব্রহ্মে জগৎ অধ্যাস হয়, এবং ব্রহ্ম সগুণ (ঈশ্বর) রূপে প্রতিভাত হয়। তাহার পর যখন দেশ কাল আবরণ একেবারেই দূর হইয়া যায়—জীবের মুক্তি বা সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হয়, জগৎ জ্ঞান বা ভূত জ্ঞান তখন দূর হইয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্মে তখন জীবাত্মা একবারে লীন হয়। পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে তখনই অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

কিন্তু তত্ত্বদর্শী যদি সর্ব্বভূতকে কেবল নিজ আত্মাতে দর্শন করেন, অথবা সর্ব্বভূতই নিজ আত্মারই বাহিক অধ্যাস বলিয়া ধারণা করেন, এবং তাহার পর আর অগ্রসর হইতে না পারেন—অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বভূত অবস্থিত বা আরোপিত হইয়াছে, ইহা অনুভব না করেন, তাহা হইলে তিনি মায়াবাদী। আর যদি তিনি সর্ব্বভূতকে নিজ আত্মাতে দর্শন না করিয়া কেবল ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত ইহা দর্শন করেন,তাহা হইলেও তিনি অদ্বৈতবাদী নহেন; কেন না সর্ব্বভূত সম্বন্ধে তখনও তাঁহার প্রভেদ জ্ঞান বা তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব জ্ঞান দূর হইয়া যায় নাই। জীবাত্মার সহিত অর্থাৎ জ্ঞাতার সহিত তাহাদের বা জ্ঞেয় ইদং পদার্থের প্রকৃত একত্ব বোধ তখনও তাঁহার উৎপন্ন হয় নাই। প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানী হইলে সর্বভূত নিজ আত্মাতে সুতরাং পরমাত্মাতে অধ্যাসযুক্ত, ইহা ধারণা করিতে হয়। আত্মার ও পরমাত্মার একত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হয়। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, দেশ কাল বন্ধন হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিতে হয়। ইহা যে সম্ভব, ইহাই অতি অল্পলোক ধারণা করিতে পারে। সুতরাং এ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কি কঠোর সাধনাসাধ্য, তাহা একরূপ অনুমান করা যায়। এই উপায় যোগ বা আত্মসংযম সমাধি। এই জন্য ধ্যানীর এত প্রাধান্য (গীতার ৬।৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ধ্যান দ্বারাই বিজ্ঞান লাভ হয়:—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন ॥৬।২৯॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। ৬।৩০॥

এ স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, উপরিউক্ত শ্লোকের অর্থ ও তত্ত্বমসি এই মহা বাক্যের প্রকৃত অর্থ এক। আধুনিক জর্ম্মান অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সপেন হর ও পল ডুসেনের প্রধান দর্শন গ্রন্থ এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা মাত্র, তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন।

এ স্থলে দ্বৈতবাদী বলদেব অর্থ করেন, "আত্মাতে বা আত্মস্বরূপে সর্ব্বভূত উপাধিরূপে স্থিত ইহা প্রতীয়মান হয়, আর সর্ব্বকারণ ঈশ্বরে সর্ব্বভূত কার্য্য ভাবে স্থিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নিজ আশ্রিত জীবদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ও গুণানুরূপ দেহ প্রদান করেন। যাহারা হরিবিমুখ, তাহাদের দেহাদিতে মমতা হয়, যাহারা হরিপরায়ণ বা মুক্ত, তাহাদের হস্তাহত প্রভৃতি ভেদ ভাব থাকে না—সকলই সমান জ্ঞান হয়। রামানুজ বলিয়াছেন "প্রকৃতি সংসর্গদোষ বিনির্ম্মুক্ত সকল আত্মবস্তু (বা জীবাত্মা) পরস্পর সমান—ঈশ্বরের তুল্য সমান। প্রকৃতি বিনির্ম্মুক্ত সকল জীবই সমান, আত্ম স্বরূপে সমান জ্ঞান লাভ হইলেও ইহাই উপলব্ধি হয়। 'নির্দ্দোষ হি সমং ব্রহ্ম।' এই জন্য সকল ভূতই ঈশ্বরের সমান। এই জ্ঞানলাভ করিলে বিদ্বান পুণ্যপাপ পরিহার পূর্ব্বক নিরঞ্জনরূপ পরম সাম্য ভাব বা ঈশ্বরের স্বারূপ্য বা স্বাধর্ম্ম্য লাভরূপ মুক্তি নামরূপ হীন হইয়া প্রাপ্ত হয়।" রামানুজ এস্থলে তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে অর্থ করিয়াছেন।

সমস্ত পাতকী হতে অতি পাপকারী
হও যদি—তবু জ্ঞান-তরির আশ্রয়ে,
সর্ব্ব পাপ পারাবার তরিবে নিশ্চয়। ৩৬

(৩৬) সর্ব্বপাপ—মোক্ষার্থীর পক্ষে ধর্ম্মও বন্ধন কারণ,সুতরাং পাপ (শঙ্কর),পাপ (মূলে আছে "বৃজিনং) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-সংসার ফল (মধু)।

তরিবে—সংসারে আর পুনরাবর্ত্তন হইবে না, (মধু), সংসার প্রবাহ অতিক্রম করিবে।

প্রদীপ্ত পাবক যথা ইন্ধন সকল
করে ভস্ম, হে অর্জ্জুন,—জ্ঞানাগ্নি তেমতি
করি দেয় ভস্মসাৎ কর্ম্ম সমুদায়। ৩৭
নাহিক পবিত্র কিছু জ্ঞানের সমান
এ সংসারে; কালে হয় যোগ সিদ্ধযারা
আত্মাতে এ জ্ঞান তার প্রকাশে আপনি।৩৮
জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান, তৎপর যে জন,
সেই করে জ্ঞান লাভ। লভি এই জ্ঞান
অচিরে পরম শান্তি পায় সেই জন। ৩৯

(৩৭) ভস্মসাৎ করে—জ্ঞান বা আত্ম যাথাথ্য জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত বা নির্বীজ করে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা অকস্মাৎ নির্বীজ করে না—কেবল নির্বীজ করিবার কারণ হয়। জ্ঞান প্রারব্ধ কর্ম্মফল ব্যতীত সকল কর্ম্মই দগ্ধ করে। অর্থাৎ যে কর্ম্ম হেতু এই জন্মে শরীর লাভ হইয়াছে,সে কর্ম্মবীজ ভস্ম হয় না, কেন না,তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে জ্ঞানলাভ হইবে, সেই মুহূর্ত্তে এ শরীরও লয় হইত। এই প্রারব্ধ কর্ম্মশরীর উপভোগের দ্বারা ক্রমে নষ্ট হয়। কিন্তু সে সঞ্চিত কর্ম্মের ফল অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অতীত অনেক জন্মকৃত কর্ম্মের ফল তখনও ফলিতে আরম্ভ হয় নাই, তাহাই জ্ঞানোদয়ে ভস্মীভূত বা নির্বীজ হয়। এ জন্মের পূর্ব্বে অসংখ্য জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে,সেই সকল জন্মে কৃত-কর্ম্ম হইতে জাত ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক যে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট শক্তি বা সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের জীবত্ব আমরণ অক্ষুণ্ণ রাখে,তাহাতেই জীবের ক্রম বিকাশ হয়। ইহা আত্ম প্রত্যক্ষের উপায়ভূত যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে"বিবেকখ্যাতি রবিপ্রবাহা-নোপায়ঃ।" শ্রুতিতে আছে,

"বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

বেদান্তদর্শনে আছে "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌতদ্ব্যপদেশাৎ ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতেত্বিতি'

(৩৮) কালে—মহাকালে (শঙ্কর), যথাকালে অর্থাৎ সাধনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে (গিরি)। সদ্য বা একেবারে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না (বলদেব) ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন।

যোগ সিদ্ধ—কর্ম্মযোগে সিদ্ধ বা সংস্কৃত(স্বামী, রামানুজ, মধু)। কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগে সংসিদ্ধ (শঙ্কর)।

প্রকাশে আপনি—আত্মাতে জ্ঞান যখন প্রকাশিত হয়, তখন আত্মসাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,ইহার জন্য ধ্যান যোগ আবশ্যক। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য অর্থ করেন, সমাধিযোগে সংসিদ্ধ হইলে এই জ্ঞান আত্মাতে প্রকাশিত হয়। শুধু কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু তাহাতে যে বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে বা তত্ত্ব আত্ম প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহা স্পষ্ট করিয়া গীতায় কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

(৩৯) শ্রদ্ধাবান—গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত (স্বামী), গুরু ও বেদান্ত বাক্যার্থে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত (মধু)।

তৎপর—তদেকনিষ্ঠ (স্বামী), বা গুরু উপাসনা প্রভৃতি জ্ঞানোপায়ে অভ্যস্ত অভিযুক্ত (মধু)। সেই অনুষ্ঠাননিষ্ঠ (বলদেব)। শঙ্কর ও গিরি বলেন,সকলের বুদ্ধি বা ধারণাশক্তি সমান নহে। যে মন্দ প্রস্থান,তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, তাহার গুরূপদেশ লাভ করিয়াও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না।

জিতেন্দ্রিয়—বিষয় হইতে যাহার ইন্দ্রিয় নিবর্ত্তিত হইয়াছে,যে সংযমপর যোগী (শঙ্কর)।

পরমশক্তি—মোক্ষ, মুক্তি(শঙ্কর,স্বামী) অবিদ্যা কার্য্য নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ(মধু,রামানুজ)। স্বামী বলেন, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ করিতে হয়, জ্ঞান লাভ হইলে আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না,শীঘ্রই মোক্ষ লাভ হয়। এস্থলে বুঝা যায় যে, গুরূপদেশ দ্বারা বেদান্তাদি শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি হইলে জ্ঞানী হওয়া যায়, তাহার জন্য গুরুর উপদেশ শ্রবণ ও মনন এই দুই জ্ঞান যোগের ক্রিয়া আবশ্যক। তাহার পর জ্ঞান কি, ইহা জানিয়া, সেই জ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হয়। ইহা ধ্যানযোগ। এই সাধনায় পরিণামে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় বা আত্মসাক্ষাৎ কৃত বিজ্ঞান জন্মে, তাহার পরেই মোক্ষ হয়। এই জন্য গীতায় অন্য এক স্থলে বলা আছে যে, জ্ঞানী ও বহু জন্ম পরে মুক্তি লাভ করেন। বিজ্ঞান লাভ জন্যই জ্ঞানীর কয়েক জন্ম অতিবাহিত করিতে হয়, ইহাই উক্ত কথায় অর্থ। অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া যায়।

সেক্ষপীয়রের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

৩৩ শ সংখ্যা।

দেখিয়াছি কত দিন বিমল প্রভাতে,—
সহাস্যে তপন চাহি পর্ব্বত শিখরে
শ্যামল ধরণি-মুখ সাদরে চুম্বিতে,
সুরঞ্জিয়া স্বর্ণবর্ণে তটিনী লহরে।
দেখিয়াছি রাহুরূপী মেঘ ক্ষণপরে
ঢাকিয়াছে সে সুন্দর স্বর্গীয় বদন।
ডুবায়ে বিষাদে ধরা; রবি নতশিরে
সলজ্জিত করিয়াছে পশ্চিমে গমন।
ললাট উজলি মম একদা তপন
ক্ষণতরে প্রকাশিল হেন শুভ্রজ্যোতি!
মেঘাবৃত কিন্তু হায় যদিও এখন
তবু না উপজে ঘৃণা কভু তার প্রতি।
কলঙ্কিত হয় যবে ত্রিদিব লোচন!
কি আশ্চর্য্য হবে তুমি পার্থিব তপন?

শ্রীবিহারীলাল গুহ রায়।

ছাই।

শ্মশানে সমাপ্ত যবে জীব-লীলা-অভিনয়,
জীবনের সাক্ষ্য দিতে কি বা শেষে প'ড়ে রয়?
ছাই-ছাই শুধু ছাই, ছাই বিনা কিবা আর?
চৌদিকে কালের ছায়া, মাঝে ঘোর অন্ধকার!
কি না পুড়ে ও শ্মশনে? সব যায়, কিবা রয়?
কাহারি বা শেষে ওই ছাই পরিণাম নয়?
অতীতের ইতিহাস অবাক্ অনুচ্চস্বরে,
সবারে ঐ ছাই পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।
সঙ্কুচিত ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল গর্ভে ল'য়ে,
চাহি ওই ছাই পানে রয়েছে অবাক হয়ে!
দুই পাশে নীরবতা, মাঝারে নীরব ছাই;
নীরব—অথচ যেন কত কি শুনিতে পাই!
শ্মশানের মহাবেদী চির-উপদেশময়,
ছাই-রূপী মহামুনি মুখ বুজে কথা কয়!
কি মহা গম্ভীর ছবি, দেখিয়া অবাক্ হই;
সব যেন শূন্যময়! অনিমেষে চেয়ে রই।
জীবনে কি কোলাহল! অন্তিমে সাড়াটি নাই,
এত দর্প—এত তেজ শেষে কিন্তু—ওই ছাই!
এত রূপ—এত বল, গরিমার অন্ত নাই,
এত ধন—এত জন, শেষে কিন্তু—ওই ছাই!
তবে কেন কোলাহল? কেন তবে অহঙ্কার?
ছাই পরিণাম যার কিসের গরব তার?
দু'দিনের জীবনের শেষ পরিণাম তুমি,
কেমনে তোমায় ছাই, কেমনে ভুলিব আমি?
কি বুঝি তোমাতে আছে, প্রাণ মন কেড়ে লয়,
মনে পড়ে শুধু সেই শেষ-অঙ্ক-অভিনয়!
শ্মশানের বেদী হ'তে কেবলি উঠিছে রব,
সব যাবে—সব যাবে, ছাই শুধু—ছাই সব!
ঘর ছাই, বাড়ী ছাই, ধন ছাই, জন ছাই,
বিষয়—বাসনা ছাই, সংসার ছেয়ের ছাই!
জনমে—ধূলার মুষ্টি; মরণেও সেই ছাই;
ইহা বিনা দেহতত্ত্ব খুঁজিয়া কিছু না পাই!
ধূলা-ঘট ভেঙ্গে যেতে, উড়ে যেতে কত ক্ষণ?
ধূলার গুমর কেন? ছাই হবে পরক্ষণ।
জীবন্ত বৈরাগ্য-তত্ত্ব এমন কোথায় আর?
এমন কোথায় আর মহা প্রস্থানের দ্বার?
এই পথে ইহলোক, ওই পথে পরলোক;
যে যাবে চলিয়া যা'ক, যে পথে বাসনা হ'ক!
এ পথে মরণ ভয়, ও পথে অমৃত রাশি;
এ পথে ক্রন্দন রোল ও পথে অনন্ত হাসি!
মহাসন্ধি তুমি ছাই, কেমনে ভুলিব আর?
তোমার ঐ দুই পাশে দুই মহা পারাবার!
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে, আপনা হারায়ে যাই
অজানিতে শূন্য হয়ে মহাশূন্যে মিশে যাই।
শ্মশান বৈরাগ্য গুরু! শ্মশান রতন-খনি;
কে জানিত ছিল হেথা ছাই চাপা মহামণি!
যত দিন বেঁচে থাকি, বুকে রাখি এই ছাই,
এ ছাই স্মরণে রেখে পরলোকে চলে যাই!

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

দেবশিশু।

দোর খুলি দেলে ঝি যাই আমি যাই,
কাঁদিছে কাঙ্গাল বুলা কেহ ওল নাই!
দুর্ব্বল হয়েছে বল কিছু খায় নাই,
বাপ নাই, মাও নাই, নাই বল ভাই।
কাঁদিছে কাঙ্গাল বুলা যাই আমি যাই।
মা দিয়েছে আজ মোলে টাকা গোটা দুই,
ব্যাগ খুলি দেলে ঝি, টাকা ওলে দেই।
বলে দেই এই টাকা ভাঙ্গাইয়া নিও,
চাল কিনে দাল কিনে পেট ভলে খেও।
মা যদি বকেন মোলে চুপ কলে লব,
লাগিলেও মালিলেও কথাটি না কব।
ওলে ঝিলে এনে দেলে লুটি কয় খানা,
বাতাসা কলাই ভাজা এলাচিল দানা।
তুই যদি না পালিস বল মোলে ভাই,
ওই জানালাল পথে চুপ কলে যাই।
যা আছে খাবাল কিছু আনি জোল কলে,
খেয়ে দেয়ে সুখে বুলা ঘলে যাক্ চলে।
দুয়ালে কাঙ্গাল কাঁদে কি বলে দালাই,
দোল খুলে দেলে ঝি! যাই আমি যাই!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

লুই পাস্তার্।

গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়,৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে, বর্ত্তমান যুগের প্রধানতম বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লুই পাস্তারের মৃত্যু হইয়াছে। ২৭ বৎসর ধরিয়া পাস্তার পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত থাকিয়াও,বৃদ্ধ বয়সে তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া,নানা শুভকর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, জীবনের প্রৌঢ়াবস্থাতেও কোন ব্যক্তি কখন এত দূর যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, এত দূর ফলবান হইয়াছেন কি না, সন্দেহ। সেপ্টেম্বর মাসে পারিস্ নগরে গ্রীষ্মাধিক্য হওয়াতে পাস্তার্ হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি ইহ জীবন ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ঐ দিবস তিনি পুরোহিত ডাকাইয়া জীবনের শেষ কর্ত্তব্য পালন করিয়া,শান্তিতে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবা মাত্র, শোক-সংবাদ ফ্রান্সময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ফ্রান্সের শ্রমজীবী ও কৃষককুল পাস্তারের নাম যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিত, দেশের আর কাহারও নাম এরূপ কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সহিত উহারা হৃদয়ে ধারণ করিত না। যখনই ফ্রান্সের কৃষককুল কোন সাধারণ বিপদে বিপন্ন হইত, তখনই তাহারা ভাবিত, পাস্তার্ তাহাদের কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করিবেন। পাস্তারের মৃত্যু সংবাদ, বিষণ্ণ বদনে একজন কৃষক অন্য জনের কাছে প্রকাশ করাতে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ফ্রান্সের অতি হীন পল্লিগ্রামেও এই সংবাদ ছাইয়া পড়িল। প্রেসিডেণ্ট ফর তার-যোগে পাস্তার্-পত্নীকে জানাইলেন,"বিজ্ঞান, ফ্রান্স ও মানবজাতি অমূল্যনিধি হারাইল।" পাস্তারের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ বার্থোলো (যাঁহার মতের সহিত পাস্তারের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতের ঘোর অনৈক্য) ফিগারো সম্বাদ পত্রে, পাস্তার্ যে ফ্রান্সের বিজ্ঞান জগতের সর্ব্ব প্রধান জ্যোতিঃ ছিলেন, এই মর্ম্মে একটী প্রবন্ধ

লিখিয়া পাঠাইলেন। পর সপ্তাহে, বুধবারে জর্ম্মনীর রাজধানী বার্লিন্ নগরে জর্ম্মন্ চিকিৎসক সমিতির এক অধিবেশন হয়। ১৮-৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তার্ এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। অধিবেশন কালে প্রোফেসার্ ভার্কাউ (Virchow) পাস্তার্ যে সমিতির সর্ব্বপ্রধান সদস্য ছিলেন, এই মত প্রকাশ করেন। পাস্তার্ অন্যান্য ফরাশিশের ন্যায় ঘোর জর্ম্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন। এমন স্থলে, পাস্তারকে জর্ম্মন্-চিকিৎসক-সমিতির প্রধানতম সদস্য বলিয়া প্রকাশ্য সভায় জর্ম্মণীর একজন প্রধান বৈজ্ঞানিকের নির্দ্দেশ করা, পাস্তারের বৈজ্ঞানিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার সম্বন্ধে একটী প্রধান প্রমাণ। ইংরাজ ও ফরাশিশের মধ্যেও ঘোর বিদ্বেষ ভাব; কিন্তু প্রধান প্রধান ইংরাজ বৈজ্ঞানিক সকলেই পাস্তারকে আপনাপন হইতে অনেক উচ্চাসনে বসাইয়া থাকেন। প্রোফেসার লাঙ্কাষ্টার, পাস্তারের মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে,তাঁহার সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন;— "এই অদ্ভুত ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমুদায়, সাধারণের অগোচর থাকিয়া, ব্যবসা-ক্ষেত্রে রোপিত হইলে, পাস্তার্ পৃথিবীর মধ্যে এতদিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পারিতেন। তাঁহার আবিষ্কার সমুদায়ের আর্থিক মূল্য বাৎসরিক কয়েক কোটী মুদ্রা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।" সার্ জোসেফ লিষ্টার্, সার্ জেমস্ প্যাজেট্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজ চিকিৎসকও পাস্তারের চিকিৎসা প্রণালীর পক্ষপাতী। জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে পাস্তারের আবিষ্কার কেহ কেহ চূড়ান্ত বলিয়া এখনও স্বীকার করেন না; কিন্তু যে ইংরাজ 'কমিশন্' পাস্তারের পরীক্ষাগার ও কার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটী 'রিপোর্ট' লেখেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে পাস্তারের চিকিৎসা প্রণালী চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই রোগ সম্বন্ধে পাস্তারের গবেষণা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, ইনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেই ইনি বৈজ্ঞানিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহা হইতেই ফ্রান্স ও ইটালীর রেশম-ব্যবসায়ের নব অভ্যুদয়; ইঁহা হইতেই সুরা-প্রস্তুতকারীগণ অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে যথাযথ রূপে সুরাকে পরিণত (maturity) অবস্থায় আনিতে হয়, তাহা শিখিয়াছে। ইনিই ইউরোপের গো, মেষ, ইত্যাদি জন্তুকে মরক হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

আঙ্গুর ফলের লতাক্ষেত্র-মণ্ডিত ফ্রান্সের জুরা প্রদেশের দোল্ নগরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাস্তার্ নিজে, তাঁহার পিতাই যে তাঁহার গবেষণা, তাঁহার অধ্যবসায় ও তাঁহার উন্নতির মূল, এ বিষয় একখানি গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। পাস্তারের পিতা, নেপোলিয়নের সমরবিভাগের একজন সারজেণ্ট্ ছিলেন। সমর-নৈপুণ্য হেতু সংগ্রামক্ষেত্রেই এক সময় নেপোলিয়ন্ তাঁহাকে মেডাল্ দান করিয়া সম্মানিত করেন। সমরবিভাগের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া পাস্তারের পিতা, চর্ম্ম-ব্যবসায় করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। পাস্তার অষ্টাদশ বর্ষেই বিদ্যাভ্যাসের সহিত অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। বিসার্স কলেজে এইরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাস্তার্ একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পারিস্

নগরের ইকোল্ নর্ম্মালে প্রবেশ করেন। ২৫ বৎসর বয়সে পাস্তার ডাক্তার-অব্-সায়েন্স উপাধি লাভ করেন। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাস্তার ডিজোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার (Physics)অধ্যাপক নিযুক্ত থাকেন; ১৮৪৯ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন; ১৮৫৭ খ্রীঃ হইতে ১৮৬৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পারিসের ইকোল্নর্ম্মালের বিজ্ঞান শিক্ষার অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। পরে পারিসের শিল্পবিদ্যালয়ের (School of Fine Arts) ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপক এবং শেষে ফ্রান্স দেশের বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ আসন অর্থাৎ সর্ব্বণের (Sorbonne) রসায়নের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। পাস্তারের পূর্ব্বে ডিউমা (Dumas) সর্ব্বণের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৫২ বৎসর বয়ক্রমে, ফরাশিস্ গবর্ণমেণ্ট্ পাস্তারের জন্য বাৎসরিক ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ১৬০০০ টাকা)পেন্সন্ এর বন্দোবস্ত করেন। ইতিপূর্ব্বেই রেশম-কীটের ব্যাধি নিবারণার্থ পাস্তারকে যে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল,তদ্দ্বারা তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েন। এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়াও, পাস্তার্ পেন্সন্ পাইবার পরে যে সমস্ত হিতকর আবিষ্কার করেন, তদ্দ্বারা তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সম্মানিত ও জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিস্ গবর্ণমেণ্ট পাস্তর্কে 'গ্রাণ্ড্ অফিসার্ ডি লিজঁ ডি হনার্' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৮২খ্রীষ্টাব্দে পাস্তার্ 'একেডামির' সদস্য নিযুক্ত হয়েন। ঐ সালে ইংলণ্ডের সোসাইটী অব্ আর্টস্ও তাঁহাকে আল্বার্ট মেডাল্ পাঠাইয়া সম্মানিত করেন। ক্রমশঃ দেশ বিদেশ হইতে সম্মান ও উপাধির বর্ষণ বাড়িতে লাগিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিশ্ গবর্ণমেণ্ট,পাস্তারের ৭০ বৎসর বয়ক্রম উপস্থিত হওয়াতে, একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই উৎসবে ইউরোপের প্রত্যেক দেশ হইতেই প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপস্থিত থাকিয়া পাস্তারকে সম্মান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রয়াল্ সোসাইটী, সার্ জোসেফ্ লিষ্টারের দ্বারা, এই সময়ে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। এই উৎসবে পাস্তার যে বক্তৃতা করেন,তাহার শেষভাগের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, পাস্তারের জীবনের যে উদ্দেশ্য,তদ্বিষয়ে সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার বক্তৃতার শেষ ভাগ এই :—

"দেশ বিদেশ হইতে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া একত্র হইবার কারণ আমার মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। আমি বরাবরই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, বিজ্ঞান ও শান্তি, অজ্ঞানতা ও সমরকে জয় করিবে। আমি বরাবরই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে, জাতি সমস্ত ধ্বংসে মন না দিয়া ক্রমশঃ সংগঠনের উদ্দেশে এক মত হইয়া বদ্ধপরিকর হইবে; আমি বরাবরই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে, ভবিষ্য জগৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের অধিকার ভুক্ত হইবে, যাহারা মানবজাতির দুঃখ বিমোচনার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন হইবে।'

পাস্তারের স্বভাব প্রকৃত ফরাশিশ স্বভাব হইলেও,আধুনিক ফরাশি স্বভাবে যে সকল দোষ দেখিতে পাওয়া যায়,পাস্তার ঐ সকল দোষযুক্ত ছিলেন না। যাঁহারা মনে করেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পক্ষে ঐতিহাসিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস করা অসম্ভব, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন,বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব প্রধান বৈজ্ঞানিক মহামতি পাস্তার, একজন অতি ধার্ম্মিক ও উৎসাহশীল খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। পাস্তারের চরিত্র এত বিশুদ্ধ ছিল,তাঁহার আদর্শ তাঁহার ছাত্রদিগের পক্ষে এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে,

প্রোফেসার্ ডুক্লো—(Duclaux) প্রভৃতি ফ্রান্সের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক, (যাঁহারা এককালে পাস্তারের ছাত্র ছিলেন) সকলেই উৎসাহী খ্রীষ্টীয়ান। ডুক্লো, যিনি এখন পাস্তারের স্থান অধিকার করিতেছেন, এক-জন অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের ক্যাথলিক। যাহাতে তাঁহার ছাত্রগণ কুসংসর্গে পড়িয়া মতিভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া আমি বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কোন 'হোটেলে' থাকিলে বিদেশের ছাত্র কুচক্রে পড়িয়া যাইবে না, এবিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ দেখিয়া, তাঁহার নিজবাস গৃহের চিত্রাদি দেখিয়া, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, পাস্তারের নির্ম্মল চরিত্রের জ্যোতিঃ যে তাঁহাতে বিলক্ষণ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মে। যে খানেই পাস্তারের ছাত্র দেখিয়াছি, সেই খানেই পাস্তারের উপর দেব-সম ভক্তি, সেই খানেই নির্ম্মল চরিত্র, সেই খানেই ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা দেখি-য়াছি। বর্ত্তমান যুগের ফরাশিশ্, গৃহের সহিত, স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে বড় ভাল-বাসে না। গৃহে স্ত্রীপুত্র রহিয়াছে, অথচ প্রত্যহ হোটেলে বা 'কার্ফেতে' বসিয়া সময় নষ্ট করা ফরাশিশ্ ভদ্রলোক মাত্রেরই অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বড় মানুষের ন্যায় ফরাশি বড় মানুষেরা প্রায় স্ত্রী-পুত্র সঙ্গ-বিহীন হইয়া ছুটীর দিবস বাগান-বাটীতে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে ভালবাসেন। পাস্তার্ স্ত্রী-পুত্রকে অতিশয় আদর ও যত্ন করিতেন। পাস্তার-পত্নী স্বামীর সহিত বৈজ্ঞা-নিক গবেষণায় অনেক সময় যোগ দিতেন।

পাস্তার গোঁড়া ক্যাথলিক্ হইয়াও যে, জীবনের শেষ অবস্থায়, রেপাব্লিকান্ গবর্ণ-মেণ্টের নিকট এতাদৃশ সম্মানিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কারণ নহে। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম-বিহীনদিগের এবং প্রটেষ্টাণ্টদিগেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ক্যাথলিক্ দল, রেপাব্লিকান্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী নহে। পাস্তার্ সর্ব্ব প্রথমে রাসায়-নিক বলিয়াই ইউরোপে খ্যাত হন। জৈবিক অম্ল (organic acids) একই রাসায়-নিক গঠনে গঠিত হইয়াও যে বিভিন্ন ভাব ধারণ করে; ইহাদের প্রত্যেকের যে দুইটী বি-সম (asymmetrical) ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই বি-সম ভাব প্রকটিত করি-বার বাহ্য উপায় যে রশ্মিরেখা ইহাদের মধ্যে পাত করিয়া ঐ রশ্মির আবর্ত্ত লক্ষ্য করা, এই সকল তাঁহার প্রথম আবিষ্কার। কঠিন পদা-র্থের দানা সকল (crystals) সম্বন্ধে পাস্তা-রের গবেষণা চূড়ান্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিক দলে সম্মানিত। রাসায়নিক গবেষণা হইতে পাস্তার ক্রমশঃ অণু-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণায় হস্ত-ক্ষেপ করিলেন। তরল বা রসযুক্ত পদার্থ সকল ভাবিয়া, মাতিয়া বা গাঁজিয়া যাইবার কারণ যে কতকগুলি জীবিত অণুর সংযোগ, ইহা তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন। এই সকল অণুর সংযোগ বিনা যে কোন দ্রব্য মাতিয়া বা পচিয়া যায় না, ইহাও তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন।

পাস্তারের এই গবেষণা সম্বন্ধে সমস্ত ইউ-রোপ-ব্যাপী একটী প্রতিবাদ উপস্থিত হইল। এইঘোর প্রতিবাদের ফল যে পাস্তারের জয়, তাহা আমরা এক্ষণে জানি। কিন্তু পাস্তার যখন এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই নিকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি যে স্বতঃই হইয়া থাকে, এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। বুফ্ফঁ, লিবিগ্, বার্জ্জিলিয়াস্, মিট্স্-কেরিক্, প্রভৃতি প্রধান

প্রধান বৈজ্ঞানিক ইহার উদাহরণ। পাস্তার যখন ঘোষণা করিলেন, বীজ ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হয় না, জীবিত অণু ভিন্ন সামগ্রী পচিতে পারে না, তখন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার কথা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, পরে পরীক্ষা দ্বারা উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, পচন-শীল পদার্থের মধ্যে জীবিত অণু জন্মে বটে, পচনকার্য্য কেবল অণুঘটিতও হইতে পারে বটে, কিন্তু এই অণুর উৎপত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। পাস্তার দেখাইলেন, ঠিক্ যেমন গোধুমের বীজ বপন না করিলে গোধুমের গাছ হইতে পারে না, সেইরূপ জীবিত অণুর বীজ উপস্থিত না থাকিলে, পরে উহার সংঘটন হইতে পারে না। সাধারণ্যে এ কথায় বিশ্বাস জন্মিতে অনেক বিলম্ব হইল। ইতিপূর্ব্বেই চতুর্দ্দশ লুইয়ের শাসন কালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ভান্‌হেলমণ্ট মূষিক ও বৃশ্চিক প্রস্তুত করিবার নির্জ্জীব উপাদান সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। লোকেও দেখিত, ভান্‌হেল্‌মণ্টের নির্দ্দেশানুসারে তাহারা যদি তনু-গ্রীব একটী পাত্র মধ্যে এক খণ্ড মলিন বস্ত্র ও কয়েক দানা গোধুম রাখে, তবে ঠিক্ ৩ সপ্তাহ মধ্যে উপাদানগুলি ভাবিয়া গিয়া মূষিকে পরিণত হয়। তাহারা আরও দেখিত, উক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারের নির্দ্দেশানুসারে যদি তাহারা একখানি ইষ্টকের মধ্যে ছিদ্র করিয়া, উহার মধ্যে শুষ্ক তুলসীপত্র গুঁড়া করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়া, আর এক খণ্ড ইষ্টক উহার উপর চাপাইয়া রাখিয়া, ইষ্টক দুই খণ্ডকে রৌদ্রে রাখিয়া দেয়, তবে তুলসী পত্রের গন্ধ দ্বারা যে 'ভাবের' উৎপত্তি হয়, উহা হইতে কতকগুলি বৃশ্চিক জন্মিয়া যাইত। আণুবীক্ষণিক জীবিত পদার্থগুলি পর্য্যন্ত বীজ ভিন্ন জন্মিতে পারে না, একথায় লোকের সহসা কেমন করিয়া বিশ্বাস জন্মিবে? কিন্তু কালসহকারে পাস্তার পুরাতন বিশ্বাস এককালে অপনীত করিতে সক্ষম হইলেন। পাস্তার্ আপন পরীক্ষার ফল প্রচার করিবার দশ বৎসর পরে, প্রসিদ্ধ জর্ম্মন্ বৈজ্ঞানিক ব্যারণ্ লিবিগ্ উহার প্রতিবাদসূচক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাদটী বাহির রহিবার পরেই পাস্তার লিবিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাক্ষাৎ কালে লিবিগ্ স্পষ্টই বলিলেন, যে বিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে, ঐ বিষয়ে তিনি আলাপ করিবেন না। জগৎ বুঝিল, লিবিগ্ মনে মনে পাস্তারের মতে আস্থাবান হইয়াছিলেন।

পদার্থ সকল যে পচিয়া, ভাবিয়া, টকিয়া বা মাতিয়া যায়, তাহার কারণ জীবিত অণুর সংযোগ; এ বিষয়ে প্রমাণ করিবার পরেই, পাস্তার্ ঘোষণা করিলেন যে, অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে দুইটী প্রধান বাধা অপনীত হইয়া গেল। একটী বাধা, ক্ষত স্থান পচিয়া যাওয়া, অপরটী ক্ষতজনিত প্রদাহ ও জ্বর (Purulent infection and Septecimea)। ইংলণ্ডের প্রধানতম চিকিৎসক পাস্তারের এই ঘোষণায় বিশ্বাস করিয়া, অণুনাশক (antiseptic) চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যে চিকিৎসা-প্রণালী (Listerism) এখন জগৎ বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যে পাস্তারের গবেষণার ফল, ইহা লিষ্টার্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। অণুরোধক (aseptic) চিকিৎসা প্রণালীও যে পাস্তারের গবেষণার ফল, ইহা সার্ স্পেন্সর ওয়েল্‌স্‌ও স্বীকার করিয়াছেন। পাস্তার ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর একটী স্তবকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদি পচা,

ভাবা, গলা সমস্ত জীবিত অণুঘটিত বলিয়া প্রমাণিত হইল,তবে সংক্রামক রোগ সকলও হয়ত জীবিত অণুজাত। পাস্তারের এইরূপ সাধারণ ধারণা হইবার প্রধান হেতু এই যে, রেশম-কীটের সংক্রামক পীড়া (Pebrine) সংক্রান্ত গবেষণা দ্বারা তিনি জীবিত অণুর ব্যাধি উৎপাদিকা শক্তির যে কি ভয়ানক প্রকোপ,তাহা পরীক্ষাদি দ্বারা কয়েক বৎসর ধরিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। রেশম-কীটের সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত করিবার পরে পাস্তার ক্রমশঃ কুক্কুটের গুটিরোগ, শূকরের সংক্রামক জ্বর (Swine fever) গো-মেষাদির গুটি রোগ (Anthrax), এবং জলাতঙ্ক রোগ, এই কয়েকটী রোগ নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। ওলাউঠা রোগ নিবারণের উপায় ও ডিপ্‌থিরিয়া রোগ নিবারণের উপায়ও পাস্তারের পরীক্ষাগারের কার্য্যের ফল। পাস্তার পেন্সন্ লইয়া নিজেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পরীক্ষাগারে ফরাশিশ্, রুশ্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় কয়েকজন খ্যাতাপন্ন বৈজ্ঞানিক যুটিয়া গেলেন। 'পাষ্টার ইন্‌ষ্টিটিউট্' ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের ও বৈজ্ঞানিক শিষ্যগণের প্রধানতম আগার বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িল। 'পাষ্টার্ ইন্‌ষ্টিটিউট্' ইউরোপের মধ্যে মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র। এই ইন্‌ষ্টিটিউটের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পাস্তারের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক ডুক্লো। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্, সেণ্টপিটার্সবার্গ, ওডেস্‌সা, মস্কৌ, পালার্মো, নেপলস্, রাইওজেনেরো, বিউনস্ এয়ার্স্, হাভানা, প্রভৃতি কয়েকটী স্থানেও 'পাষ্টার্-ইন্‌ষ্টিটিউট্' স্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটিশ্ রাজ্যের কোথাও এখনও পাষ্টার্-ইন্‌ষ্টিটিউট্' স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু আন্দোলন বিলক্ষণই চলিতেছে। সে দিবস সিংহলে 'পাস্তার্-ইন্‌ষ্টিটিউট' সংস্থাপন অতি অদ্ভূত ভাবে রোধ হইয়া গেল। প্রস্তাবটি 'ভোটে টি'কিল' না। সিংহলবাসীদের বিশ্বাস 'পাস্তার্ ইন্‌ষ্টিউটের' উদ্দেশ্য জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা। সিংহলে যেন বৎসরে দুই একটী লোকে জলাতঙ্ক রোগে মরে, তাহা নিবারণের জন্য এরূপ অনুষ্ঠানের আবশ্যক কি? 'পাষ্টার্, ইন্‌ষ্টিটিউটে' মানুষ ইতর জন্তু ও কৃষিজাত ঔষধির যাবতীয় সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়া থাকে, সিংহলবাসিদের ইহা ধারণা নাই।

পাস্তার্ কিছু অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক ছিলেন। জীবের সকল প্রকার ব্যাধি বিষয়ে সর্ব্বদা তাঁহার মন নিমগ্ন থাকিত। সময়ে সময়ে আমোদ আহ্লাদের সময়েও, হঠাৎ তাঁহার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। অন্যমনস্ক ভাব বশতঃ একদা পাস্তার্ তাঁহার জামাতার গৃহে কিছু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। আহার কালে পাস্তার ফলগুলি গ্লাশের জলে ধৌত করিয়া আহার করিতেছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে, কাঁচা ফলের উপরিভাগে ব্যাধি-উৎপাদক অণুর বিদ্যমানতা হেতু, কাঁচা ফল খাওয়া যে সংক্রামক রোগের একটা প্রধান কারণ, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটী বিষম তর্ক উঠে। তর্ক করিতে করিতে পাস্তার কিছু গরম হইয়া পড়েন ও ক্লান্তিবোধ করিয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, যে গ্লাশে ফল ধুইয়া খাইতেছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবে, সেই গ্লাশের অণুমিশ্রিত জল পান করিয়া শেষ করিলেন। উপস্থিত বন্ধুবর্গ হাস্য করিয়া পাস্তারকে দেখাইয়া দিলেন, তর্কে তাঁহাদেরই জয় হইয়াছে।

পাস্তারের সমাধি-ব্যাপারে ইউরোপের সকল রাজ্য যোগ দিয়াছিল। সমাধির আয়োজন ফরাশিশ্ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃকই সূচিত হইয়াছিল। পাঠক কল্পনা-চক্ষুতে সমাধি যাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারিবেন, পাস্তার কিরূপ পূজ্য বলিয়া ইউরোপে গণ্য হইয়াছিলেন। প্রথমে দেখুন, জেনারল্ সসিয়ের পশ্চাতে পারিস্ নগরের প্রধান ব্যূহ চলিয়া গেল; তাহার পশ্চাতে ফ্রান্সের কৃষি-সমিতির সভ্যগণ; পরে উত্তমর্ণের দল; তৎপশ্চাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধারণ সমিতি সকলের দুই এক জন করিয়া নির্ব্বাচিত সভ্য। তাহার পরে দেখুন, ফ্রান্সের 'রেপাব্লিকান্ গার্ড্' নামক আর একটী প্রধান ব্যূহ; তৎপশ্চাতে 'পাষ্টার্-ইন্ষ্টিটিউটের' সভ্য ও ছাত্রগণ, এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ছয়টী অশ্বযুক্ত সমাধি-যান। এই যানের মধ্যে মোসিয়ু পোয়াঙ্কার ও ফরাশিশ্ 'একেডামির' আর আর ডিরেক্টরগণ আসীন। এই যানের অগ্র পশ্চাতে ইউরোপের সমস্ত রাজ্য হইতে প্রেরিত রাশি রাশি সম্মানসূচক 'রীদ্' (Wreath) যানের পশ্চাতে আবার দলে দলে 'সেনেটার', 'একেডামিশান্,' চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক। রাজ-পথ এককালীন নিস্তব্ধ। সমাধি-বাদ্যের গভীর নিনাদ ভিন্ন আর কোন শব্দই কর্ণ-গোচর হয় না। ধীরে ধীরে সকলে পারিসের প্রধান মন্দির নোতার্দামে প্রবেশ করিল। পূর্ব্ব হইতেই মন্দিরের মধ্যে 'রেপাব্লিকের' প্রেসিডেণ্ট, গ্রীশ্-রাজ পুত্র নিকোলাস্, গ্রাণ্ড-ডিউক্ কন্ষ্টান্টাইন্ প্রভৃতি রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া পাস্তারের দেহ-পুট (Coffin) সাহ্বান করিয়া মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। মন্দির মধ্যে সকলে উপস্থিত হইবা মাত্র পারিসের আর্চ বিশপ মোক্ষ-বচন(Absolution)উচ্চারণ করিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই নোতার্দামের ঘণ্টা রাজি বাজিয়া উঠিল। পরে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার শান্তির জন্য অন্যান্য পুরোহিতগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আর্চ-বিশপ মহাপ্রসাদ (Mass) উৎসর্গ করিলেন। যজ্ঞোৎসর্গের অনুষ্ঠান মন্দির মধ্যে চলিতেছে, এমন সময়ে মন্দিরের বহির্ভাগে, একটী প্রশস্ত স্থলে, এক সুন্দর সামিয়ানা খাটান হইল। এই সামিয়ানার নিম্নে উচ্চ একটী বক্তৃতা-মঞ্চ (Tribune) গ্রথিত হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মোস্যিউ পোয়াঙ্কার এই মঞ্চোপরি উঠিয়া পাস্তার সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মভেদী বক্তৃতা করিলেন। পরে সকলে সমাধি স্থলাভিমুখে যাত্রা করিয়া, পাস্তারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পাস্তারের সম্মানের জন্য ফরাশিশ্ গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত আয়োজনই করিয়াছিলেন।*

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়

* জন্ম মৃত্যু পৃথিবীর প্রাত্যহিক ব্যাপার। কতলোক জন্মিতেছে, কতলোক মরিতেছে। কিন্তু প্রকৃত মহতের জন্ম পৃথিবীতে বিরল ঘটনা। ইংলণ্ডের হক্সলী এবং ফ্রান্সের পাস্তার, বিজ্ঞান-জগতের অলঙ্কার স্বরূপ। মহতের পূজা করিয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ধন্য হইয়াছে। ইঁহাদের তিরোধানে বিজ্ঞান-জগত গাঢ় আঁধারে ঘেরিয়াছে। ২৯শে জুন, (১৮৯৫) হক্সলির স্বর্গারোহণ হয়। তিনমাসের মধ্যেই পাস্তারের তিরোধান! কি কুক্ষণেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়াছিল! ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের গভীর শোকে জগত বিষাদে মগ্ন। আমরা ক্ষীণ বাঙ্গালী, আমরাও এই দুই মহাত্মার জন্য অশ্রু ফেলিতেছি। বিধাতা উভয়ের আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। ন, স।

নৃসিংহাবতার বঙ্কিমচন্দ্র।

The lamb, thy riot dooms to bleed today,
Had he thy reason, would he skip and play?
Pleasest to the last he crops the flowery food,
And licks the hand just-raised to shed his blood.

—*Pope's Essay on Man.*

কবিবর পোপের এই অননুকরণীয় কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অনুদিত হওয়া অসম্ভব। তথাচ ইংরেজি-অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য নিম্নলিখিত অনুবাদ দিতে যত্ন করিলাম। ইহাতে যদি মূলের শতাংশের একাংশ ভাবও ব্যক্ত করিতে পারে, তথাপি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

জানিত যদ্যপি মেষ-শাবক এমন
বধিতে তাহারে আজ করেছ মনন;
করিত কি নৃত্য শাব খেলিত কি আর?
মৃত্যুমুখে চুম্বিত কি পুষ্পিত আহার?
হায়, কত সুখে সে ত করিছে লেহন
সে হস্ত, যে হস্ত তারে করিবে ছেদন।

কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মেষশাবতুল্য হিন্দুপাঠকের প্রায় এই সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের বালবৃদ্ধ হিন্দুনরনারী সকলে যে রূপ আগ্রহে ও ঔৎসুক্যে বঙ্কিম চন্দ্রের পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছেন, সেরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বঙ্গবাসী এত মনোযোগ ও এত অর্থব্যয় আর কাহারও জন্য করে নাই। রঙ্গমঞ্চে, বধ্বঞ্চলে, ত্রিতলগৃহে বা পর্ণকুটীরে—বঙ্কিম চন্দ্রকে দেখা যায় নাই কোথায়? বঙ্কিম চন্দ্রের পুষ্পিত বাক্য শুনে নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই বলিলেও চলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রতিদান করিলেন ভাল! যে কুটিল ব্রাহ্মণ্য নীত্যবলম্বনে তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হিন্দু মাত্রেরই গভীর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। পুষ্পিত আহার দাতা যে ঘাতকের কার্য্যও করিতে পারেন, বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যিক জীবনে ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নবীনচন্দ্রও কোন কোন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একখানি কাব্য লিখিতে দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণচরিত্র যে বুদ্ধদেবচরিত্রের ছায়ায় অঙ্কিত, এ কথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণচরিত্র বৌদ্ধচরিত্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তিনি জানিতেন যে, যে গীতাবক্তা কৃষ্ণ তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়, সেই গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এবং উহা তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত*। এই তৃতীয় স্তর, যাহাতে অবতারবাদ বর্ণিত, তাহা বুদ্ধ-পূর্ব্ব ঘটনা হইতে পারে না। গীতাবক্তা কৃষ্ণ বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সময়ও কল্পিত হওয়া সম্ভব নহে। গীতাধর্ম্ম বৌদ্ধ প্রাধান্য লোপের অব্যবহিত পূর্ব্বে সূচিত ও আন্দোলিত। কেন না, উহাতে বৌদ্ধনীতির অনুকরণে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সংস্থাপন-যত্ন স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, ইহা জানিয়াই, হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গীতাধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যনীতি সমর্থক কৃষ্ণকে বঙ্গবাসীর

---

* বঙ্কিমবাবুর মতে মহাভারতে তিনটি স্তর আছে, তন্মধ্যে ১ম স্তর অতি প্রাচীন, ২য় স্তর হইতে পারে ব্যাস নামক কল্পিত কবির রচনা এবং ৩য় স্তর বহু লোকের রচনা।

সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। যদি এ দেশে এমন দুর্দ্দিন আবার কখন আইসে যে, ভেদ-ধর্ম্ম জাগ্রত হয়, তবে তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক শক্তি অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রচ্ছন্ন করার শক্তি তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর ছিল, সন্দেহ নাই। স্বার্থের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে অনেক সময় অভিপ্রায় গোপন করিতে হয়। কৌশলী বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ অভিপ্রায় গোপন মানসে ধর্ম্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ৺কেশবচন্দ্র সেনকে সুব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। ইহা দেখিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন, বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মনীতি অতি উদার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাঁহাদিগকে আমাদের স্পষ্ট নিবেদন এই যে, আমরা কিন্তু উহা পোপ-বর্ণিত পুষ্পিত আহারের সমতুল্য বোধ করি। তিনি যদি এইরূপ পুষ্পিতবাক্য না বলিতেন, "কৃষ্ণচরিত্র" ও 'ধর্ম্মতত্ব' শিক্ষিত সমাজের কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না।

হৃদয় প্রচ্ছন্ন করিবার এই উপায় উদ্ভাবন করিলেও বঙ্কিমবাবুর হৃদয় গুপ্ত থাকে নাই। তবে দোষ তাঁহার নহে; দোষ তদীয় শিষ্য নবীনচন্দ্রের। আমরা যখন সমালোচনার স্তম্ভে কুরুক্ষেত্রের প্রথম সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন নবীন বাবু তাঁহার কল্পনার মৌলিকত্বের অনুকূলে বঙ্কিম বাবুর স্বহস্ত লিখিত একখানি গুপ্ত চিঠির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যবশতঃ অদ্যাপি আমার হস্তগত আছে। বঙ্কিম বাবুর উক্ত পত্রের খানিক অংশ হীরেন্দ্রবাবু কর্তৃক সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর প্রকৃত মত কি, তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু হিন্দু পাঠকের উহা জানিয়া রাখা অতি আবশ্যক।

"Now I believe *it is not historically true either that Krisna set himself up against the Bramanical authority* (there was never a greater champion of it) or that the Brahmans ever coalesced with the Non Aryans in order to put down the Kshatriyas."

ইটালিক অংশও বঙ্কিমবাবুর নিজস্ব।

পুনর্ব্বার ;—

"Remarks on Chapter I (of Raibatak):—Krisna preached, if he preached anything, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give a new character to Krisna which this chapter does." সাহিত্যে মুদ্রিত বঙ্কিমবাবুর পত্রাংশ।

হীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদ এই ;—

"আমার মতে কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিকূল করিয়া চিত্রিত করা ইতিহাসের অনুগত নহে। কৃষ্ণের মত আর কে ব্রাহ্মণগণের পরিপোষক ছিল? আর ব্রাহ্মণেরা যে অনার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয় শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ইহাও ঐতিহাসিক নহে।"

"কৃষ্ণ কোন মত প্রচার করিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। যদি কিছু করিয়া থাকেন, তবে সে ব্রাহ্মণভক্তি। তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিরোধীরূপে চিত্রিত করা সর্ব্ববিধ জনপ্রবাদ ও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিপরীত। তবে অবশ্য আধুনিক কবি কৃষ্ণের চরিত্র নূতনভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন। এ সর্গে তাহাই করা হইয়াছে।" সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩০০।

এই প্রকার ধমক ও প্রলোভনে পড়িয়া কি প্রকারে নবীনবাবু স্বপ্রতিভাঙ্কুরিত রৈবতকে আরব্ধ কৃষ্ণচরিত্রকে বিকৃত ও অনুকৃত পথে ধাবিত করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের পাঠক তাহার কতক অনুভব করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র নহে। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

নবীন বাবুর নিকট লিখিত পত্র হইতে কি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, বর্ণ-প্রাধান্যের পৃষ্ঠপোষক জানিয়াই বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণকে ঈশকৃষ্ণরূপে স্থাপনের জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন ?

কৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারিলে, ভেদধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ পুরাণ জাগ্রত হইবে, পুরাণের সহিত ভেদধর্ম্ম জাগ্রত হইলে,ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য উজ্জলতর হইবে, সহস্র সহস্র বর্ণস্তরের উপর ব্রাহ্মণস্তর স্থাপিত হইবে, দেশ ক্ষুদ্রবৃহৎ পোপসমূহে সমাচ্ছাদিত হইবে,জাতীয় অর্থ নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণের পদ সেবার জন্য অধিকতর ব্যয়িত হইবে,এই আশায় বা দুরাশায়, বঙ্কিমবাবুর শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। যখন কৃষ্ণও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ক্রশ (cross) অর্থাৎ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণকে ত্রাতা বা অবতার বলিয়া একবার স্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকল আর যায় কোথা ? ব্রাহ্মণের পদ-ধৌতকারী কৃষ্ণকে সংস্থাপন করিয়াইত একবার লুপ্তপ্রায় বর্ণভেদকে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আবার সেই সাঙ্করিক চাল চালিয়াছেন। যখন ঈশ্বরাবতার স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদধৌত করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, হীন বর্ণ সকল কেন করিবে ? এই অভিপ্রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র দাসত্বধর্ম্ম প্রচারক পৌরাণিক কৃষ্ণকে বঙ্গবাসীর সম্মুখে নব পরিচ্ছদে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা অবগত আছি ;—

চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ
তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং।
গীতা—৪।১৩

এই কৃষ্ণোক্তির অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়া কেহ কেহ কৃষ্ণকে জন্মগত-বর্ণভেদ-বিরোধীও মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন, জন্মগত বর্ণভেদ উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মণোচিত শ্রেষ্ঠগুণ অর্থাৎ সাত্বিকগুণ যাহার আছে,সেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু উহার ব্যাবহারিক অর্থ যাহা জাতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যে এইরূপ গুণানুযায়ী বর্ণভেদ অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ গীতাকার অন্য একস্থানে কৃষ্ণোক্তির মধ্যে বর্ণভেদের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যে জন্মগত বর্ণভেদ কথা,তাহা,যাঁহারা সরলভাবে গীতার অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন নহে। সে স্থান এই ;—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা নকুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।
গীতা—৩।২৪

আমরা ভরসা করি, এই সঙ্করবর্ণকে কেহ গুণানুযায়ী সঙ্করবর্ণ বুঝিবেন না।

কৃষ্ণোক্ত বর্ণসঙ্করের এই নিন্দা হইতে একটি ঐতিহাসিকতত্ত্ব স্বতঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। যে সময় গীতা লিখিত, সে সময় সঙ্করবর্ণের উপর ব্রাহ্মণগণের বড় ক্রোধ। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে সঙ্করবর্ণের কর্ত্তা হইতে হইবে, কৃষ্ণ এ জন্য ভীত,যেন বর্ণসঙ্করত্বের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় পাপ নিহিত আছে।* যাঁহারা এতাদৃশ গীতাগায়ক কৃষ্ণকে রক্তমাংসধারী খাটি মানব মনে করেন, তাঁহারা ইহার একটা উত্তর অক্লেশে দিতে পারেন। কেননা, কৃষ্ণের গাত্রচর্ম্ম যে প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহাতে তিনি যে না সঙ্কর, না আর্য্যবংশসম্ভূত, এইরূপই বোধ হয়,অর্থাৎ তিনি অনার্য্য বা শূদ্র ছিলেন। তার পর যখন তিনি ব্রাহ্মণগণের

* হিন্দু সঙ্করবর্ণ কিনা ?—নামক যে প্রবন্ধ ১৩০১ সনের আশ্বিন মাসের জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও আমি গীতার এই শ্লোকের সমালোচনা করিতে যত্ন করিয়াছি।

দাসত্ব ("devotion to Brahmans") প্রচার করা জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য স্বয়ং রাজসূয় যজ্ঞে সমগ্র রাজমণ্ডলী সমক্ষে ব্রাহ্মণ-পদধৌত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্করবর্ণকে নিন্দা করা অতি সহজ কথা। ফলে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্কাশনের জন্য যখন উদ্যম, উৎসাহ আরম্ভ হইল, তখন অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, যাহারা আর্য্যানার্য্যরক্ত-মিশ্রিত, তাহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপনের প্রধান সহায়। শাক্যসিংহের উপদেশ বাক্য বা সাম্যবাদ ইহাদের প্রযত্নেই শূদ্র বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ে পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং গীতাকার ব্রাহ্মণ লেখকের শূদ্র অপেক্ষা বর্ণসঙ্করের উপর ক্রোধ বেশী। বিশেষতঃ শূদ্রগণকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, কিছুতেই ভেদধর্ম্ম বা বর্ণপ্রাধান্য প্রবল হইবে না, এজন্য শূদ্র হইতেই একজনকে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের ধনুর্দ্ধর (champion) করিয়া সজ্জিত করা ও তৎকর্ত্তৃক দাসত্বধর্ম্ম প্রচার করার কথা কল্পনা করা তদানীন্তন উত্থানকারিগণের এক পরম রমণীয় উপায়, সন্দেহ নাই।

"দেখ তোমরা যে বুদ্ধদেবের পশ্চাদ্গামী হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে মানিতেছ না, কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাস করিতেছ না, তোমাদের অবতার কৃষ্ণ তোমাদেরই বংশজাত। তিনি বুদ্ধদেব অপেক্ষা জ্ঞানী এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি ত ব্রাহ্মণদিগকে এত মানিতেন যে, সর্ব্বসমক্ষে ব্রাহ্মণের পদধৌতব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের জয়ের জন্য কুরুবংশধ্বংস উদ্দেশে মিথ্যা কথা বলিবারও পরামর্শ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপক্ষের যোদ্ধা অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন, অথচ স্বধর্ম্ম (সূতধর্ম্ম) পালন করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আত্ম-সংযম শিক্ষা যাহা আমরা বর্ণনা করিতেছি, তাহার কিছুই বৌদ্ধশিক্ষা অপেক্ষা কম নহে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার কর, নাস্তিক বুদ্ধের কথা শুনিও না।"

গীতাকারের এবম্বিধ উদ্দেশ্য গীতায়ই ব্যক্ত। বঙ্কিম বাবু ইহা জানিতেন। এজন্যই তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে শিষ্যকে মন্ত্র দিতে গিয়া মন্ত্র দিলেন;—

"নমোগোব্রাহ্মণহিতায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমোনমঃ"।

সত্য বটে, মন্ত্রের মূলাংশ মাতৃজারের ন্যায় উহ্য আছে, তবে কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বের মূল মন্ত্র যে উহাই, তদ্বিষয় সন্দেহ আছে কাহার?

"গো হিতে ব্রতী হইয়া হিন্দু তুমি মুসলমানের সহিত বিবাদকর, তবেই তুমি ব্রাহ্মণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইবে। আর স্পষ্টতঃই ব্রাহ্মণের হিতে প্রবৃত্ত হও। কেননা কৃষ্ণ ত ইহাই করিয়াছিলেন।"

গীতোক্ত কৃষ্ণচরিত্রে ভক্তি বিশ্বাস স্থাপিত হইলেই এই ফল নিশ্চিত। যে প্রকার কোরানিক মাদকতার সহিত গীতার ভাষা ব্যক্ত, তাহাতে একবার উহা ভগবদুক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিস্তারের পথে আর কণ্টক থাকে কি? নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র এই নিষ্কামধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন! কামদেব-জনয়িতা পৌরাণিক কৃষ্ণের মুখেই এইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম শোভা পায়!

বঙ্কিম বাবু অবশ্যই জানিতেন যে, যে পূর্ণ মানবত্ব ধর্ম্মের লক্ষ্য এবং যাহার আদর্শ বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধনীতি।

"Go, ye now, O Bhikhus, and wander for the gain of the many, for the welfare of the many, out of compassion for the world, for the good, for the gain, for the welfare of gods and men. Let not two of you go the same way. Preach, O Bhikhus, the doctrine which is glorious in the beginning, glorious in the middle, glorious in the end, in the spirit and in the letter; proclaim *a consummate, perfect and pure life of holiness." Mahavagga,* I, 11, i. *Quoted iu Ancient India by Mr. Dutt.*

অর্থ। "জগতের হিতেচ্ছায়, অনেকের লাভ ও মঙ্গলের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, হে ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রচারার্থে বহির্গত হও।

কিন্তু দুই জন এক দিকে যাইও না। হে ভিক্ষুগণ! যে সত্য আদ্যন্ত মধ্যে গৌরবপূর্ণ, যাহা অক্ষরে ও অভিপ্রায়ে গৌরবান্বিত, সেই পরম সত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ ও পবিত্র জীবন লাভই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ইহাই প্রচার কর।" মহাভাগ ১১.১১।

এই পরম পবিত্র ও পূর্ণ জীবনের প্রাপ্তি-বিষয়ক উপদেশই যে বিপুলাকৃত হইয়া বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্বরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা বোধহয় অনেক পাঠক এক্ষণ স্বীকার করিতে পারেন। কেবল বৌদ্ধনীতিই যে "ধর্ম্মতত্ত্বের" নীতি, এমত নহে, বৌদ্ধচরিত্রের চিত্রই "কৃষ্ণচরিত্রে" প্রস্ফুটিত।

"What then is the distinguishing feature in Budha's life-work which has made his tenets a religion,—and the religion of a third of the human race ?

We answer, *his character.* Goutam's holy and pious life, his world-embracing sympathy, his unsurpassed moral precepts, his gentle and beautiful character, stamped themselves on his teachings which were not altogether new, gathered round him the meek and the lowly, the gentlest and best of the Aryans, struck kings on their thrones and peasants in their cottages and united sects and castes together as in a communion of love !"

Again,

"He insisted only on self-culture, on benevolence, on pious resignation. He know no difference between man and man except by their acts ;"

Ancient India, page, 343, 344.

অর্থ। "বুদ্ধদেবের জীবন-ব্যাপী কার্য্যের বিশেষত্ব কি? কি জন্য তাঁহার মত মনুষ্য জাতির এক তৃতীয়াংশের ধর্ম্মে পরিণত হইল?

ইহার উত্তর তাঁহার চরিত্র। গৌতমের ধর্ম্মময় পবিত্র জীবন, তাঁহার জগদ্ব্যাপিণী সহানুভূতি, তাঁহার অপরাজিত নৈতিকোপদেশ, তাঁহার বিনীত ও মহিমাপূরিত চরিত্র, যাহা তাঁহার উপদেশ বাক্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল—এই পবিত্র জীবন ও চারিত্রিক উৎকর্ষ দেখিয়াই দীন দরিদ্র, রাজা ও প্রজা সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রীতিপূর্ণ এক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল।"

পুনশ্চ ;—

"তিনি আত্মসংযম, দান, স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিতেন। তিনি মানুষে মানুষে কোন বিভিন্নতা স্বীকার করিতেন না। অর্থাৎ বর্ণগত বিভিন্নতা স্বীকার করিতেন না, কর্ম্মগত বিভিন্নতা স্বীকার করিতেন।"

এই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি ও বুদ্ধদেবচরিত্র একটুক রূপান্তরিত হইয়া গীতানীতি ও কৃষ্ণচরিত্রে পরিণত হইয়াছে। তবে বিভিন্নতা এই, একটি বিশুদ্ধ হিন্দু নীতি, স্বাধীন ও পবিত্র হিন্দু জীবনের সহধর্ম্মিণী ; অপরটি দাসত্ব-নীতি, মন ও হৃদয়ের অবনতিকর ব্রাহ্মণানুগত্যের পরিচারিকা। বঙ্কিম বাবু যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন, তবে বোধ হয় কৃষ্ণ-চরিত্র না লিখিয়া, পবিত্র হিন্দু চরিত্র, বুদ্ধদেবের বিষয় লইয়াই শেষজীবন অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণমিকিয়াবিলি। সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুর দুঃখে তাঁহাকে একদিনও দুঃখিত দেখা যায় নাই, বরং তাহাদের ক্রমশঃ উন্নতিতে তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র সংস্থাপনে তাহাদের উন্নত মস্তক নত হইতে পারে, এ জন্যই তিনি আসল ধার্ম্মিক চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, নকল চরিত্র লইয়া, স্বাভ্যস্ত ও ঔপন্যাসিক মহিমার ইতিহাসের গন্ধ ছড়াইয়া কৃষ্ণ চরিত্র লিখিয়া গেলেন। ধর্ম্মজগতের রাজশ্রী এবং হিন্দুর মূর্ত্তিমতী প্রতিভাস্বরূপ বর্ণভেদ-সংহারিণী বৌদ্ধ সাম্যনীতি যবনিকান্তরালে নিক্ষিপ্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সফল হইবে, বিশ্বাস করিলে, হিন্দু আর জীবিত থাকিতে পারে না। তবে কতকগুলি নব্যযুবক বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তে যেন বিকৃত ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, যে যাহা বলে, তাহাই হিন্দুর উন্নতি-সূচক মনে করিতেছে—ইহা বড় দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

পবিত্র অমৃতনদ হইতে দুটি নদী বাহির হইয়াছে,—রাজনীতি ও সমাজনীতি। দুইটি

এ দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসেবায় শুষ্ক হইয়াছে। তবে নবজল সঞ্চারে সমাজনীতি স্বাস্থ্যশালিনী হইবার আশা ছিল, তাহার পথে বঙ্কিমচন্দ্র দারুণ অন্তরায় হইয়াছেন।

হা বঙ্কিমচন্দ্র! হা বঙ্গসেবিত প্রতিভা বিত উজ্জ্বল রত্ন! তোমার মুখ মেষপশুবৎ হিন্দুর জন্য এবং হৃদয় ব্রাহ্মণের জন্য গঠিত হইয়াছিল? তুমি নৃসিংহাবতার!

শ্রীমধুসূদন সরকার।

দার্শনিকজ্ঞান ও ব্রহ্ম। (৪)

আমরা পূর্ব্বের প্রবন্ধ সকলে যাঁহাদিগের মত সমালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিয়াছেন, ইউরোপেও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাশক্তি কতদূর উচ্চে উঠিয়াছিল। Spinozaর দার্শনিক মতটীর অনেকাংশে হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ঐক্য আছে। মতগত দুই একটী স্থলে একটু গোলযোগ থাকিলেও, দর্শনশাস্ত্রও যে ব্রহ্ম প্রতিপাদনে অতি শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কি ভারতীয়, কি বিদেশীয়, সর্ব্বদেশের মনীষীগণের চিন্তাই প্রায় একইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুদর্শনসমালোচনার সময়ে আমাদিগের এ বিষয়ে একটু বিশেষ করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণতঃ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এ স্থলে আমরা দুই একটী কথা বলিব।

প্রধানতঃ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র প্রাচীনকালে ত্রিবিধ প্রণালীতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছে। সেই ত্রিবিধ প্রণালী এইঃ—প্রথম, Empericism, দ্বিতীয়, Dogmatism, তৃতীয়, Scepticism, অদ্যকার প্রবন্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, এই প্রণালীত্রয়ের সংক্ষিপ্তবিবরণ প্রদান করা আমাদের আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা না হইলে, হয় ত অনেকে, আমাদের প্রবন্ধ বুঝিতে বা কি উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে ভ্রমে পড়িতে পারেন। প্রথম প্রণালী (Empericism) র উদ্দেশ্য এই যে, দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কেবলমাত্র পদার্থ-দর্শনের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা বস্তু নির্ণয় করতঃ, সত্য সকলের অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইবে; তৎপর বহুদর্শিতা হইতে সঞ্জাত সেই যাথার্থ্যগুলিকে বিচার-বলে—ন্যায়মতানুসারে—একত্র সম্বদ্ধ ও শ্রেণীগত করিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ, ইহার অতিরিক্ত বিষয়ে বা পদার্থে অগ্রসর হইতে দর্শনশাস্ত্রের অধিকার নাই। দেখিয়া শুনিয়া, এবং তদুপরি পরীক্ষা করিয়া বিচারশক্তির প্রয়োগে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই, দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইল। এই প্রণালী অনুসারে, বহুদর্শিতার (Experience) বাহিরে যাইতে দর্শন-শাস্ত্রের অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বা ঈশ্বর-তত্ত্ব আবিষ্কারে, দর্শন তত উপযোগী নহে, কেননা এ সমস্ত বিষয় মানুষের বহুদর্শিতার বাহিরে,—ইহারা বস্তু-দর্শনের সীমার অন্তর্গত নহে। পদার্থজ্ঞান হইলেই যথেষ্ট হইল। এ মতের প্রধান গুরু বেকন বলিয়া গিয়াছেন,—

"As is God, so also is the Spirit, which God has breathed into man, scientifically incognizable?"

আবার তিনি বলিয়াছেন,—

"Philosophical *theology* is incompetant to ground any *affirmative* knowledge, although it is sufficient for the refutation of atheism."

তাহা হইলেই, দেখা যাইতেছে, এই প্রণালীতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস সকলেই করেন, কেবল উহা দর্শনশাস্ত্রের সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে,—দর্শনশাস্ত্র তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে তত উপযোগী নহে। Bacon, Hobbes প্রভৃতি মনস্বীগণ এই প্রণালীর সেবক। দ্বিতীয়, Dogmaticism প্রণালী। এই প্রণালীর প্রতিপাদ্য এই যে, মানব চিন্তা-বলে, স্বীয় মানসিক জ্ঞানবলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার অবিনশ্বরতায়, ও ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানে উপনীত হইতে পারে। কেবল পদার্থজ্ঞানই যে দর্শনশাস্ত্রের সীমা-ভুক্ত,—বস্তুজ্ঞান যে জন্মিলেই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হইল,—তাহা নহে। ইহার চিন্তাবলে ব্রহ্মপ্রতিপাদনেরও ক্ষমতা রহিয়াছে। যাহা মনুষ্যের বহুদর্শিতার বাহিরে, এই প্রণালী অনুসারে, দর্শনশাস্ত্র তাহাও মনের-চিন্তা বলে নির্ণয় করিতে সক্ষম। পণ্ডিত Descartes, Malbranche, Spinoza এবং জর্ম্মনীর সুবিখ্যাত Leibnitz এই কয়েকজন মনীষী এই প্রণালীর পৃষ্ঠপোষক। ইঁহারাই আমাদের প্রবন্ধের সমালোচ্য। তৃতীয়তঃ, Scepticism প্রণালী। এই প্রণালীর অনুসরণ-কারীগণ একরূপ নাস্তিক। ইঁহারা ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দিগ্ধ। যাহা মানবের বস্তু দর্শনের অতীত,—যাহা বহুদর্শিতার বাহিরে বর্ত্তমান, তাহা দর্শনের সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে—তাহার অস্তিত্বেও সন্দেহ।

"Universal doubt respecting that which lies beyond the range of experience."

দার্শনিক Hume নামক পণ্ডিত এই প্রণালীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। এখন, আমরা ত্রিবিধ দার্শনিক প্রণালী দেখিয়া আসিলাম। প্রথম এবং তৃতীয় প্রণালীর অনুসরণ করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারেই, অর্থাৎ Dogmatic school এর দার্শনিক পণ্ডিতগণেরই দর্শন শাস্ত্র বিবৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই মতের পরিপোষক প্রধানতঃ চারিজন পণ্ডিত। তন্মধ্যে আমরা Descartes প্রভৃতি তিনজন দার্শনিকের মত বিশ্লেষ ও তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইঁহারা কেমন যুক্তিবলে, জড়, আত্মা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিবিধ জ্ঞানের সমালোচনা ও আবিষ্কার করিয়াছেন। ফলতঃ, ব্রহ্মপ্রতিপাদনের এই Dogmatic প্রণালীই অতি সমীচীন। মানব বাস্তবিক ব্রহ্ম ও প্রকৃতি, এই দুই প্রধান বস্তু লইয়াই জন্মিয়াছে; এই দুইটীই মানবের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে একজন বর্ত্তমান বৃদ্ধ বিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরেরও মত এইরূপ। পাঠক দেখুন, তিনি কি বলিতেছেন :—

"The conditions by which man is surrounded and hemmed in, by determining his opportunities, must affect his duties. It is inevitable that Ethics should run out beyond the circle of mere introspection in order to determine the objects in whose presence man continually stands, the relations he bears to them, and the dealings he can have with them. What these objects are that constitute the scene around him, may be expressed in two words:—NATURE and GOD;—understanding by the former the totality of perceptible phenomena; and by the latter, the eternal ground and cause whose essence they express. * * * The speculative curiosity of men moves about through the circle of three great objects, GOD, NATURE and the SOUL, and is ever attempting to determine the relations subsisting among these."

Dogmatical philosophy বা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক দর্শন মতাবলম্বী তিনজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত ও পরস্পর পার্থক্য দেখান হইয়াছে। আজ আমরা এই Dogmatic school এর চতুর্থ অবশিষ্ট দাশনিক Liebnitz নামক পণ্ডিতের দার্শনিক মত বিশ্লেষ করিয়া আমাদের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহার পর, বিধাতার ইচ্ছা থাকিলে, অন্য এক প্রবন্ধে দর্শনশাস্ত্রের Critical period বা যৌক্তিক-কালের শিরোমণি স্বরূপ এবং সেই মতের আবিষ্কারক Kant, Fitche, Schelling এবং Hegel, এই চারিজন পণ্ডিতের দর্শন সমালোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে। এ প্রবন্ধে কেবল দর্শনশাস্ত্রের Dogmatic school এর মত বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পাঠক দেখিয়াছেন, ডেকার্টে এবং মালব্রাঁসে, ইহারা উভয়েই দ্বৈত পদার্থ-বাদী। জড় ও চেতন—এক পদার্থ, এবং ব্রহ্ম অন্য এক পদার্থ। স্পিনোজা একমাত্র বস্তুবাদী; ইনি, কেবল মাত্র ব্রহ্ম পদার্থ জড় ও চেতনাকারে পরিণত, এই মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু অদ্যকার সমালোচ্য পণ্ডিত Leibnitz পূর্ব্বোক্ত মত-দ্বয় হইতে বিভিন্ন অন্য এক অভিনব মত আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমিকত্ব gradaton স্বীকার করেন। ইনি Monadology র প্রবর্ত্তক ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। ইহাকে একরূপ পরমাণু-বাদ বলা যাইতে পারে। যদিও প্রাচীন পরমাণুবাদ ও ইহাঁর monad ঠিক্ একরূপ পদার্থ নহে, তথাপি আমরা ইহাকে পরমাণুবাদই বলিলাম। এখন এই monadology বা পরমাণুবাদ কিরূপ, তাহাই দেখিতে অগ্রসর হওয়া যাউক।

পরমাণু বা Monad ভিন্ন জগতে কোনও পদার্থের সত্ত্বা নাই। এই পরমাণুই একমাত্র পদার্থ বা substance। এই পরমাণু অবিমিশ্রিত, অবিস্তার্য্য (unextended) এবং অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ। শক্তি বা Force এই পরমাণুর Essence বা মূল উপাদান। স্পিনোজার মতে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থের যেমন Thought এবং Extension এই দুইটী মূল উপাদান, সেইরূপ শক্তি বা force এই পরমাণুর উপাদান। ইহার মতে ব্রহ্ম প্রধান ও প্রথম পরমাণু; আত্মা ও চিন্তাশীল জীব (Spirits) মাত্রই পরমাণু; কেন না এই আত্মার নিজের উপরে কার্য্য করিবার,—'শক্তি' প্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে। এবং দেহাদি জড়পদার্থ সকল পরমাণুর সংঘাত মাত্র; এই পরমাণু সমূহের একত্র বহু সম্বন্ধ হইয়াই জড়ের উৎপত্তি। আমরা বলিয়াছি, শক্তি এই পরমাণুর উপাদান। এই শক্তিকে Idea বা কার্য্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তিও বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক পরমাণুতে এই শক্তি বা Idea বর্ত্তমান। এই শক্তি লইয়াই পরমাণুর পরমাণুত্ব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম যে, Descartes এর মতে, জড়পদার্থ কেবলমাত্র Extension বা ঘনত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান মতে, Extention ছাড়াও জড়ের শক্তি বা Force নামে একটী ধর্ম্ম সর্ব্বদা বিদ্যমান। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, Descartes এর প্রবর্ত্তিত পদার্থের দ্বৈতবাদ, ইহাঁর মতে টিকিতে পারিল না। বরং Spinoza প্রবর্ত্তিত পদার্থের একত্ববাদের সঙ্গে, এ মতের মিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; কেন না Spinozaও

বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক জড় পদার্থ Thought এবং Extension, এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। ইনিও বলেন যে, প্রত্যেক জড় পদার্থ Extension এবং Force, এই দুই প্রকারের ধর্ম্মবিশিষ্ট। যাঁহারা আমাদের প্রদর্শিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শন বুঝিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাগুলি অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু এইটী আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে যে, যদিও এ অংশে স্পিনোজার সহিত, Leibnitz এর মত-গত ঐক্য আছে, তথাপি এ উভয়ে একটী গুরুতর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। Spinoza বলিয়াছেন, জড় মাত্রই Extended বা ঘনত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ইনি বলেন, প্রত্যেক জড় বিভাজ্য। জড় পদার্থের বিভাগ করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাই, জড় সূক্ষ্মতম পরমাণু সমূহের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে জড়ীয় পরমাণু Extended নহে। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরমাণু অবিস্তার্য্য ও নিতান্ত সূক্ষ্ম। যাহা বিস্তার্য্য, তাহাই বিভাজ্য; যাহার সংঘাতে বা সমষ্টিতে এই জড় সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অবিভাজ্য, সুতরাং অবিস্তার্য্য। সুতরাং তাহা অবিনাশ্য ও হইল। ব্রহ্ম ভিন্ন সে পরমাণু (Substance)র সৃজন ও ধ্বংস অসম্ভব। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্ম পদার্থই Monad বা পরমাণু নামে অভিহিত। অতএব Monad এর এইরূপ বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মা মানবদেহে একটী মাত্র সূক্ষ্মতম স্থানে কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিত। বস্তুর অনুভূতি কালে, বস্তু হইতে সঞ্জাত Motion বা গতি সকল, এই সূক্ষ্ম স্থানে আত্মাতে যাইয়া উপস্থিত হয়।

ইঁহার দর্শন বুঝিতে হইলে, আমরা যে Idea বা শক্তির কথা উপরে বলিলাম, তাহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক; কেন না, এই Idea র উপরেই ইঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক পরমাণু Force বা Idea বিশিষ্ট; প্রত্যেক Monad এ বিভিন্ন বিভিন্ন Idea আছে; এই Idea একরূপ নহে। প্রত্যেক অণুর প্রত্যেক Idea ভিন্ন ভিন্ন। এই Idea বা শক্তি দ্বিবিধ (ক) Active বা ক্রিয়াশীল, ও (খ) Passive বা নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত। প্রত্যেক Monad এ এই দ্বিবিধ শক্তি আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্ম ও আত্মা ক্রিয়াশীল শক্তি বিশিষ্ট। দেহাদি জড় পদার্থ এই Passive idea বিশিষ্ট, ইহার নিজের শক্তি (active force) নাই; পরকর্ত্তৃক চালিত হয় মাত্র। নিম্নে এই Idea র শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেওয়া [illegible]

Idea (active and passive)

obscure (জড়)

clear (আত্মা [illegible]

confused (জড়)

Adequate &c. (ব্রহ্ম)

I[illegible] &c.
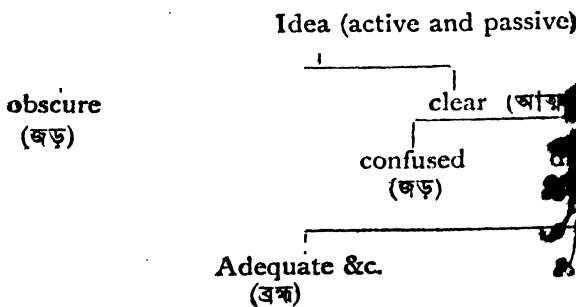
এই কয়েকরূপ Idea-র সমস্তগুলি সম্বন্ধে বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা প্রয়োজনীয় কয়েকটী মাত্র শ্রেণীর কথা বলিব। যে পদার্থের Idea বা জ্ঞান হইতেছে, যদ্দ্বারা

তাহার জ্ঞেয় পদার্থের (object) পৃথক্ সুন্দর জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম Clear বা স্পষ্টজ্ঞান। এই জ্ঞান পদার্থের উপর সীমাবদ্ধ। যথন, জ্ঞেয়বস্তুর সমস্ত অংশের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয়,তাহাই Distinct বা পরিষ্কৃতজ্ঞান। এই জ্ঞান পদার্থের অংশের উপর (Parts of objects) সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইহা দ্বারা বস্তুর সমুদয় গুণ বা ধর্ম্মরাশিকে সেই জ্ঞেয় বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। যাহা Clear এবং distinct নহে, উহাই Confused বা অস্পষ্ট ও সুপ্ত জ্ঞান। আবার যথন জ্ঞেয়বস্তুর ঐ সমস্ত গুণ বা ধর্ম্মরাশির সুপরিষ্কৃত জ্ঞান (distinct) জন্মে, তথনই তাহাকে Adequate বা সর্ব্বদর্শী জ্ঞান বলা যায়। এই শ্রেণীগত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বদর্শী; তাঁহার এই Adequate বা সর্ব্বদর্শী Idea আছে। মানব-মন বা Soul স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত জ্ঞানশালী; কিন্তু সাধনা করিলে, এই আত্মা সর্ব্বদর্শী জ্ঞানেরও অধিকারী হইতে পারে। আবার ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জড়-পদার্থের confused বা সুপ্ত ও অস্পষ্ট-জ্ঞান আছে। কেননা, জড় এই confused idea এর আধারভূত বহুতর অণুদ্বারা সমুবেত। ইতর-প্রাণী রাজ্যে চিন্তা নাই; কেবল অনুভূতি ও [illegible] আছে মাত্র। এবং উদ্ভিজ্জ রাজ্যের idea [illegible] (Sleeping monads with unconsc[illegible] ideas)। অতএব আমরা দেখিতেছি [illegible] এইরূপ বিভিন্ন রকমের Idea থাকাতে, এবং এই Ideaই পরমাণুর উপাদান হওয়াতে, প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানবাত্মায় এই Ideas সকলের একটা ক্রমিকত্ব আছে,—ইহারা ক্রমশঃ পর পর উৎপন্ন হয়। এই ক্রমিকত্ব (Succession of ideas) আন্তরিক কার্য্য-কারণ হইতে উৎপন্ন; একটী Idea অন্যটীর জনক বা কারণ। আবার জড়পদার্থে গতি বা Motion প্রভৃতি উৎপন্ন হয়;—পরমাণুর এই গতি, বিয়োজন, সংযোজন প্রভৃতি বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।

এখন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, Idea পরমাণুর উপাদান হওয়াতে, পরমাণুর বস্তু দর্শনাদি প্রত্যক্ষজনক ক্রিয়া (Perception) করিবার অধিকার আছে।

"If it is by the aid of the conception of force that we must conceive all substances, it follows that they must contain something anologous to feeling and appetite &."

জগতের যে অংশের সহিত যে পরমাণুর নিকট সম্বন্ধ, উহা জগতের সেই অংশের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক পরমাণু সেই সেই স্থলে,জগতের দর্পণ-স্বরূপ; সেই সেই স্থলের বস্তুরাশি উহাতে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান জন্মে। কাল এবং স্থানের সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াই ঐন্দ্রিয়িক বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে,আমরা সমর্থ হইয়া থাকি। কিন্তু এই জ্ঞানের তারতম্য আছে; কেননা আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, প্রতি অণুর Idea সমান নহে এবং যে পরমাণু যাহার বেশী নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহার জ্ঞান তত উত্তম। সুতরাং যিনি একটী মাত্র পরমাণুর জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি সমস্ত নিখিল-পদার্থেরই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, কেননা পরমাণু জগতের দর্পণস্বরূপ।

Idea অনুসারে প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর বিভিন্ন হওয়াতে, দেহ ও মনও সম্পূর্ণ পৃথক্। সৃষ্টির একটী ক্রমিক-শৃঙ্খলা রহিয়াছে। পদার্থের গতি এবং বিশ্রান্তি (Rest) এই দুই চরম ক্রিয়ার অন্তরালে যেমন অনন্ত ও অসংখ্য ক্রিয়ার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি

ব্রহ্ম এবং জড়, এই দুইয়েরও অন্তরাল-ভাগে অনন্ত ও অসংখ্য পদার্থের বিভাগ রহিয়াছে। অতএব, Active Force বা ব্রহ্ম এবং Passive Force বা জড়, এই দুইটীমাত্রই যে জগতে পদার্থ—এবং ইহাদের অন্তরাল যে পদার্থশূন্য, ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নে আসিতে আসিতে জীবসৃষ্টি জড়ে পরিণতি পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, Descartes এর প্রবর্ত্তিত কেবলমাত্র দ্বিবিধ মূল-পদার্থ এবং Spinozaর প্রবর্ত্তিত কেবলমাত্র একবিধমূল-পদার্থ ইহাঁর মতে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এস্থলে কিন্তু একটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা? আত্মার Ideas এবং দেহের Motions—এদের মধ্যে কোনও রূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে কিনা? Leibnitz এর মতে ইহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। তবে কি করিয়া ইচ্ছা জন্মিলেই তদনুরূপ দৈহিকগতি বা ক্রিয়া জন্মিয়া থাকে?

"The succession of perceptions in the soul cannot modify the mechanical movements of the body, nor can the latter interfere with or change the succession of perceptions."

আমরা দেখিয়াছি, Descartes এর মতাবলম্বীগণ, আত্মা ও দেহের পরস্পরকার্য্যে সর্ব্বদা ঈশ্বর উপস্থিত হন, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। Leibnitz বলেন, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম এরূপ করিয়া মন ও দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যদিও উহারা নিরপেক্ষ-ভাবে কার্য্য করে, তথাপি উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিয়াই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে "পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য" বা Doctrine of Pre-establishment বলে। Leibnitz দুইটী ঘটিকা-যন্ত্রের দৃষ্টান্ত লইয়া উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঘটিকানির্ম্মাতা, এরূপ করিয়া দুইটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, উহারা ঠিক্ সমভাবে ও একইরূপে চলিবে ও কার্য্য করিবে; অথচ তাহাদের উভয়ের কার্য্যে নির্ম্মাতার আর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। দেহ ও মন সৃষ্টি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সাকার ও নিরাকারোপাসনার প্রত্যুত্তরের উত্তর। *

পূর্ব্বে নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, যাহার আকৃতি, বিস্তৃতি ও বেধ আছে, তাহা সাকার, এক্ষণে বলিতেছেন, যাহার বিস্তৃতি আছে, তাহা সাকার, ভাল, জানা থাকিলে মন মুহূর্ত্তমধ্যে কাশী বা মক্কায় যাইতে পারে; দেহ ছাড়িয়া কাশী বা মক্কায় যায় না, দেহে থাকিয়া কাশী বা মক্কা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া থাকে, সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনের বিস্তার আছে, অতএব মন সাকার হউক। আর এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ বিস্তৃতি; কারণ বিশ্বে এরূপ কোন পরমাণু নাই, যাহাতে ব্রহ্ম বিদ্যমান নাই, সুতরাং সমুদয় বিশ্বে, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম বিস্তারিত আছেন। সেই

* এই বিষয় লইয়া অনেক বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে। গঙ্গেশ বাবুর বক্তব্য শেষ হইল, যতীন্দ্র বাবুর বক্তব্য শেষ হইলে আর একবার মাত্র নগেন্দ্র বাবুর শেষ উত্তর প্রকাশ করিয়া এই বাদ প্রতিবাদ শেষ করা যাইবে। ন,স।

বিস্তারবান ব্রহ্ম বোধ হয় সাকার। আর যদি বলেন,ব্রহ্মের চতুঃপার্শ্বে এই জগৎ ঝুলিতেছে, তাহা হইলে বিস্তার না থাকাতে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু যে তাঁহাকে বারম্বার অনন্ত বলিয়াছেন,তাহা কিরূপে সম্ভব হয়?

আমার সাকার নিরাকারের সংজ্ঞা লইয়া নগেন্দ্রবাবু ৫২৪ ও ৫২৫ পৃষ্ঠায় অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে আমার সংজ্ঞা অযুক্ত হইয়াছে; হউক, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; তাঁহার সংজ্ঞা যে নির্দ্দোষ, তাহা তিনি পাঠকগণকে একটু ভাল করিয়া দেখাইয়া দিউন এবং তিনি যে সাকার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন। ৫২৯ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবু হিমালয়কে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পূজার এক অভিনয় আমাদিগকে নমুনা স্বরূপে দর্শাইয়াছেন,তাহার মন্ত্র—"জগদীশ! ধন্য! ধন্য! ধন্য! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মহিমা!" এই কথাগুলি বলা হইতেছে উপাসনা, আর নগেন্দ্র বাবু হইতেছেন উপাসক ও ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্য; ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে—এই উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা তিনই নিরাকার,না কেহ সাকার,কেহ নিরাকার? যদি এই তিনের মধ্যে কেহ সাকার হয়, তবে যেখানে সাকার আছে, সেখানে ব্রহ্ম নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উপাস্যের পরিচ্ছেদ আছে, বুঝা যাইতেছে, সুতরাং এ নিরাকার অনন্ত নহেন। আর নগেন্দ্র বাবু উপাসনা করিলেন যে ঈশ্বরকে,তিনি হিমালয়ের মধ্যস্থ না বহিঃস্থ?

সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় নিরাকার মনের ক্ষয় হয়,ইহা নগেন্দ্র বাবুর মতে অমূলক কথা! এ সংবাদ বোধ হয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক শাস্ত্র সকল হইতে সংগৃহীত। আমরা গুরুমুখে শুনিয়াছি, যাহাতে মনন ধর্ম্ম আরোপিত হয়,তাহার নাম মন; মন সুখ কিম্বা দুঃখাদি মনন করে, তজ্জন্য সুখ ও দুঃখ মনের বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সমাধির বিষয় আমি জ্ঞাত নহি,নগেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই জানেন, সুষুপ্তি আমিও জানি, নগেন্দ্র বাবুও জানেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তিনি আপনার জীবনের মধ্যে কখনও কোন দিন সুষুপ্তিতে কোন বিষয় মনন করিয়াছেন কি? আর—

"অমনস্থান্নমে দুঃখ রাগ দ্বেষ ভয়াদয়ঃ
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ"
ও
"রাগেচ্ছা সুখ দুঃখাদি বুদ্ধৌ সতং প্রবর্ত্ততে
সুষুপ্তৌনাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তুনাত্মনঃ।"

পাহাড়ী বাবার উদাহরণের সহিত ইহা মিলিল না, অতএব বোধ হইতেছে, ঐ সকল কথা বাতুলের প্রলাপ! কিন্তু নগেন্দ্র বাবু কি পাহাড়ী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,সমাধি অবস্থায় তাঁহার মনন ছিল কি না?

অনন্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু অতি আশ্চর্য্য কতকগুলি যুক্তি আমাদিগের উপর বর্ষণ করিয়াছেন, সহজে পাঠকগণের বোধগম্য হইবে বলিয়া অনন্তকে "apprehend" করিতে পারি "Comprehend" করিতে পারি না বলিয়াছেন, যেন ভারতবাসীরা স্বদেশীভাষা অপেক্ষা বিদেশী ভাষায় মজবুদ বেশী! অনন্তকে সান্ত করা হইবে না, নিজে ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া অনন্তের তুল্য হওয়া নগেন্দ্র বাবুর মতে উপাসনা প্রণালী হইতেছে, কিন্তু হৃদয়-কলসে পূরিলে কি অনন্তের বিস্তার বাড়িল না কমিল? ১২৬ পৃষ্ঠায় হৃদয়-কলসে পূরিতে নগেন্দ্র বাবু স্বীকার।

নগেন্দ্র বাবু ৫৩০ পৃষ্ঠায় বলেন—কিন্তু সাকারবাদীর প্রতিমাকে ব্রহ্মোপাসক প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। উপাসনার অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। প্রতিমা কিরূপ ক্ষুদ্র নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,তদুত্তরে বলেন,ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্র। ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটা ঢেলাও ত ক্ষুদ্র! যুক্তি সকল পড়িয়া উত্তর দিব কি, ইহারা স্বয়ংই পাঠক সমাজে কথা কহিবে। ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, আমার হৃদয়-কলসের যেরূপ আয়তন, অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের সেই পরিমাণ জল অবশ্যই তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে। হৃদয়-কলসে আসিতে পারে, প্রতিমা-কলসে আসিতে পারে না কেন? প্রতিমা কি ব্রহ্মের ভাদ্রবধূ? এক প্রকার চতুষ্পদ আছে,সে সমস্ত বহিতে পারে, কিন্তু ভাতের কাটী বহিতে পারে না। ১২৮ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবু বলেন, মন, সুখ, দুঃখ,দয়া, প্রেম ও ঈশ্বর নিরাকার অর্থাৎ ইহাদের আকার নাই, এই মাত্র সাদৃশ্য, তাহা ভিন্ন অনন্ত প্রভেদ। দশ বিশটা উদাহরণের দ্বারা নগেন্দ্র বাবুর দেখান উচিত ছিল যে,ইহারা নিরাকার হইয়াও পরস্পর বিভিন্ন। তিনি জল ও তৈল, মৃৎখণ্ড ও কোহিনুর প্রভৃতি গুটীকতক সাকারের উদাহরণ দিয়া আমাদিগের চক্ষে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত নিরাকার পদার্থ নিচয়ের সহিত ঐ সকল উদাহরণ কি প্রকারে সংলগ্ন হইতে পারে?

আমি সূক্ষ্ম জড় তাড়িতের আকৃতি বিস্তৃতি ও বেধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন,যেমন আধারে থাকে, সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা নিশ্চয়ই একটা গোলেহরিবোল উত্তর। ঐ ঘটিটাতে তাড়িত আছে, অতএব ঘটিটার আকার তাড়িতের আকার হইল, কিন্তু ঘটিটার বাহিরও যে তাড়িত থাকিল? এরূপ ভাবে ব্রহ্মকে ঘটির আকার বলায় বাধা কি?

নগেন্দ্র বাবু ১২২ পৃষ্ঠায় বলেন, নিরাকার জ্ঞান দ্বারা আমরা সাকার পদার্থ সকলকে জানিতে পারি। দৃষ্টি শক্তি নাই বলিয়া অন্ধ দেখিতে পায় না। চক্ষু আমাদিগকে বাহ্য বস্তু দেখাইতেছে না, নিরাকার দৃষ্টি শক্তি দেখাইতেছে। আমরা জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি যে, আমাদের দুইটা সাকার চক্ষু আছে। ১২৩ পৃষ্ঠায় বলেন, জ্ঞান, জ্ঞানকে ও বৃক্ষকে উভয়কেই জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানকে জানি কিন্তু জ্ঞান নিরাকার। বহির্জগৎকে জানিতে পারি, আমাদের জ্ঞান দ্বারা। বৃক্ষ আছে জানিতেছি, আমার জ্ঞান দ্বারা। পুত্তলিকা জানিতেছে না,কারণ উহার জ্ঞান নাই। জড় জগৎ আছে, এ সংবাদের জ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া গেলে জানিতে পারিনা। ১২৪ পৃষ্ঠায় বলেন, সাকার জগৎ নিরাকার দর্শন শক্তি বা দর্শন জ্ঞান দ্বারা লব্ধব্য। দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তিই নিরাকার ইত্যাদি। ইহাতে প্রশ্ন এই যে—

(১) নিরাকার জ্ঞান দ্বারা বলাতে জ্ঞানকে কাহারও করণ বলিয়া বোধ হইতেছে,অতএব নিরাকারের করণত্ব কিরূপ এবং উহার প্রযোক্তাই বা কে?

(২) "নিরাকার পদার্থ জ্ঞানের বিষয়"—নিরাকার পদার্থের বিষয়ত্ব কিরূপ?

(৩) "জ্ঞান, জ্ঞানকে ও বৃক্ষকে জানে" জ্ঞান স্বয়ং জানে,না, কোন করণের অপেক্ষা করে? জ্ঞান কীটাণু দেখিতে পায় না কেন? এবং অনুবীক্ষণ চক্ষে দিয়া দেখিতে পায়ই বা কেন? যদি শক্তি জ্ঞানের করণ হয় এবং

শক্তিও নিরাকার হয়, তবে নিরাকার বস্তু নিরাকার করণের দ্বারা কার্য্য করে স্বীকার করিতে হইবে। একটা করণ হয়, একটা প্রযোক্তা হয় কি কারণে? ইহাদিগের সম্বন্ধ উল্টাইবার বাধা কি? অর্থাৎ শক্তি দর্শক ও জ্ঞান করণ হইতে পারে না কেন?

(৪) "কাষ্ঠ পুত্তলিকা জানিতেছে না, কারণ উহার জ্ঞান নাই" অতএব নিরাকার জ্ঞানের ও শক্তির কোথাও উদয়, কোথাও অনুদয় দেখা যাইতেছে। অজ্ঞান হইয়া গেলে জানিতে পারি না বলিলে জ্ঞানের ক্ষয়োৎপত্তিও আছে দেখা যাইতেছে, অতএব নিরাকারের ক্ষয়োদয় কিরূপ? উহার মরেই বা কি, জন্মেই বা কি?

(৫) "দৃষ্টি শক্তি ও শ্রুতিশক্তি নিরাকার"—নিরাকার দৃষ্টি শক্তি শুনিতে পারে না, ও নিরাকার শ্রুতিশক্তি দেখিতে পারে না; দেহ হীন নিরাকারদিগকে এক বিষয়ে পারগ ও অন্য বিষয়ে অপারগ দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, এই নিরাকারগণের প্রভেদ কি, যদি কোন প্রভেদ না থাকে, তবে এক দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে না কেন?

(৬) শাস্ত্রে দ্বিবিধ জ্ঞানের উল্লেখ আছে, যথা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। নগেন্দ্র বাবু যে জ্ঞানের কথা আলোচনা করিয়াছেন, উহা পরোক্ষ না অপরোক্ষ? এবং ঐ জ্ঞানের ও নগেন্দ্র বাবুর কথিত শক্তির লক্ষণ কি? এবং উহার বাস কোথায়?

যাঁহারা সাকারোপাসক, তাহারা গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের সেবক; গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের দেহ আছে, যাহার দেহ আছে, তাহার উপাসনার নাম সাকারোপাসনা; তজ্জন্য হিন্দু সমাজের প্রত্যেক উপাসককে সাকারোপাসক বলা যায়। আমাদের বিবেচনায়, উপাস্যের দেহের নাশ আছে বলিয়া নশ্বরের উপাসক বলিতে চাও—বল, দেহীর নাশ নাই বলিয়া অবিনশ্বরের উপাসক বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার। ঋষিদিগের সেবকেরা এইরূপ সাকার নিরাকারাত্মক বস্তুর উপাসনা করেন।

"চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥"

সুতরাং ভক্তেরা ঈশ্বরের কল্পিত সাকার রূপের উপাসনা করেন। অশরীরীর উপাসনা করেন না। তাঁহারা পরিমিত আধারে অনন্তকে আহ্বান করিয়া সেই সাকার নিরাকার রূপ ব্যষ্টি বিভুর পুজা করেন। ঈশ্বর অবলম্বন করিলে ভক্তের বিশ্বাসে উহা তাঁহার দিব্য দেহ হইয়া যায় এবং বিসর্জ্জনান্তে স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে। ভক্ত উপাস্য দেবতাকে স্থূল চক্ষে স্থূল ভাবে ও মানস চক্ষে অপঞ্চীকৃত ভৌতিক শরীরী জ্ঞানে উপাসনা করেন। ঈশ্বরের উহা অনগ্রহ দেহ। ভক্তের নিকট উহা সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই বিদ্যমান। ঐ দেহ সকল ক্রিয়ার উপযোগী এবং স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহাকারে পরিণত হইতেও সমর্থ। উপাস্যের উচ্ছানুসারে উহার ক্ষয়োৎপত্তি হইয়া থাকে। কঠোর উপাসনা দ্বারা উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মিলে, তিনি ভৌতিক রূপ সংহরণ করিয়া ভক্তের নিকটে স্বরূপেও আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

হিন্দুগণের এইরূপ করিবার যুক্তি হিন্দুর নিকট ঈশ্বরাজ্ঞা, যদি আপনারা ইহার যুক্তি শুনিতে চাহেন, তাহা দিতেও হিন্দু পরাঙ্মুখ নহেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক ব্যক্তি সুগন্ধ, সুরস, বায়ু ও গীত বাদ্যে প্রিয়। এ সকল বস্তু অদৃশ্য, এজন্য আতর ও গোলাপ ফুলাদি আশ্রয় করিয়া

সুগন্ধ, জল ও নানাবিধ সরবতকে আশ্রয় করিয়া সুরস, তাল বৃন্তাদি আশ্রয় করিয়া বায়ু এবং গায়ক ও বীণাদি যন্ত্রের আশ্রয় করিয়া গীতবাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ কি বলিতে পারেন যে, দৃশ্যকে আশ্রয় না করিয়া তাঁহারা ঐ সকল অদৃশ্য বস্তু পাইয়া থাকেন? যখন দৃশ্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে অদৃশ্য পাওয়া যায় না, তখন সাকারের আশ্রয় ব্যতিরেকে নিরাকার ঈশ্বর কিরূপে লাভ হইতে পারে? অতএব সাকারোপাসনা অপরিহার্য্য হইতেছে না কি? তবে আপনি সাকার যথেচ্ছারূপ আশ্রয় করিতে পারেন, সখ হইল, আশ্রয় করিলেন, না হইলে করিলেন না। হিন্দু তাহা করিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্টক্রম ব্যতিরেকে উপাসনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে হিন্দুকে কাপুরুষ বলিতে চাহেন, বলুন, কিন্তু আপনি কি বিনাবলম্বনে উপাসনা করিতে পারেন? অনন্তকে সান্ত না করিয়া উপাসনা করিতে পারেন কি?

উপনিষৎ প্রভৃতি মহামান্য শাস্ত্র হইতে নগেন্দ্র বাবু অনেক উপাদেয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, এবারও করিয়াছেন। বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ ও সংহিতা শাস্ত্রও সেই আর্য্য মনীষীগণের সম্পত্তি। মামলাবাজদিগের মধ্যে সেই সকল মামলাবাজেরা অতিশয় বেয়াকুব, যাহারা নিজের দাখিলী দলিলের দ্বারা প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাভূত হয়; নগেন্দ্র বাবু এরূপ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে ঋষিদিগের নিজের দাখিলী দলিলের দ্বারা ঋষিদিগের উপাসনা প্রণালীর ব্যর্থতা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পারিলে অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে, সন্দেহ নাই। বাজীকরে যেমন পুতুল নাচায়, সেইরূপ পুরাণের কোন কোন বচন তুলিয়া কখনও ঋষিদিগের মুখে চূণকালী দিতেছেন, আবার যখন কৃপা হইতেছে, তখন উপনিষদের বচন তুলিয়া নিজের উদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা করিতেছেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে চূণকালী-মুখো ঋষিদিগেরও অভিনন্দন করিতেছেন। নর্ত্তকের যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ নাচে; কিন্তু নিজে নাচে কি কেহ নাচায়, তাহা বুঝা যায় না। "ব্রহ্ম" শব্দ যাঁহাদের মুখ হইতে প্রথমতঃ নির্গত হইয়াছিল, ব্রাহ্মীস্থিতিতে যাঁহারা নিরন্তর অবস্থিতি করিতেন, মূর্খ আমাদিগের তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। ত্রিগুণ তত্ত্বের মারপেঁচ না বুঝিয়া শাস্ত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া মানুষকে মুহুর্মুহু হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

নিরাকারোপাসনা আমি কঠিন বলিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই কঠিন যে আমার ন্যায় মূর্খের পক্ষে, এমত নহে। অনেকের পক্ষে উহা কঠিন। নগেন্দ্র বাবু বলেন, যথার্থ ধর্ম্ম যাহা, ধর্ম্মের প্রকৃত পথ যাহা, তাহা নিশ্চয়ই কঠিন; কঠিন হইলেও উহাই আমাদের একমাত্র পথ, পথটা এতই সস্তা কি? যে মনে করিবে, সেই ধরিতে পারিবে? এতই বাজা'রে জিনিষ কি? নিরাকারে উপাস্য উপাসক ভাব স্থাপিত হইতে পারে কি? যাহারা উপাসনা করে বলে, তাহারা সত্য সত্যই কি উপাসক না গলাবাজ অনুপাসক? অগ্নিকে যেমন আলিঙ্গন করা যায় না, তেমনি দেহবানগণের নিরাকারোপাসনা হয় না। কেহ নিরাকার উপাসনা করি, মনে ভাবে, তাহাতেই সে নিরাকার উপাসনা করে, এরূপ সাব্যস্ত হয় না। ভগবান শিব বলেন,—

"অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্ত মিদমিত্থং বিবর্জ্জিতং
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ।

নগেন্দ্র বাবু কি এই পদবিস্থ? কিন্তু

আমরা জানি,নগেন্দ্র বাবুর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান নহেন, সেই জন্য আমরা "ব্রহ্মের অপবাদ" নামক প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নগেন্দ্র বাবু সমাধি দ্বারা বোধ হয় তাঁহার অসর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম স্থির করিয়াছেন। আর বোধ হয়,তাঁহার সমাধির অনুভূতি অনুসারে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যের অর্থ করিয়াছেন!!!

৫২৭ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবু উক্ত বাক্যের অর্থ এইরূপ করেন—চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম বটে অথচ নয়। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্যের মধ্যে "অথচ নয়" কোন্ কথার অর্থ? ইহার মানে কি এইরূপই যে এক সময়ে সমস্ত ব্রহ্ম অন্য সময়ে নয়? অথবা প্রতি মুহূর্ত্তেই এই উভয় প্রকারের অর্থ সত্য? ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি কোন মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্ম, অন্য মুহূর্ত্তে নয় হয়, তাহা হইলে সেই সময়ের নামকরণ করুন। আর যদি প্রতি মুহূর্ত্তেই উভয় বাক্য সত্য হয়, তবে সাকারোপাসকের প্রতিমাকে তাঁহার প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার বাধা কি? ১২৮ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, সাকারোপাসনা ভ্রান্তি—অজ্ঞান; আমি সাকারোপাসক,সুতরাং আমি ভ্রান্ত ও অজ্ঞান, অতএব ক্ষমার্হ।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুগধর্ম্ম।

শ্রীধাম কাশীবাসী তীর্থাশ্রমী পূজ্যপাদ শ্রীশঃ দয়ানন্দ স্বামী দণ্ডী মহারাজের প্রশ্ন;—"যুগধর্ম্ম কি?"

উত্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে;—

"কৃতে যদ্ধ্যায়েতো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
"কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ।"

*　*　*　*

এই কলিকালে শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তনই "যুগধর্ম্ম"

প্রশ্ন। সংকীর্ত্তনের প্রযোক্তা অর্থাৎ চেতনকারী কে?

উত্তর। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

প্রশ্ন। তাঁহারা সাকার কি নিরাকার এবং তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ?

উত্তর। সাকার,যথা আকৃতি প্রকৃতি;—

"আজানুলম্বিতভুজৌ, কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ, কমলায়তাক্ষৌ,
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ, যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ, করুণার তারৌ॥"

*　*　*　শ্রীচৈতন্যভাগবত

প্রশ্ন। পুরাণে কিছু প্রমাণ আছে?

উত্তর। আছে, যথা মহাভারতে:—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গ বরাঙ্গ সশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎ সমা শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ॥"

*　*　*

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

*　*　*　ইত্যাদি।

প্রশ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কখন কোন্ সময়ে কোথায় প্রাদুর্ভূত হন এবং তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর। কলির প্রথম সন্ধ্যায় (বঙ্গ দেশস্থ) সুরধুনী সন্নিধ শ্রীধাম নবদ্বীপ (মায়াপুরে) শ্রীশচীদেবী গর্ভে বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তত্র প্রমাণ অষ্টাদশ পুরাণে আছে। যথা, পদ্মপুরাণে;—

"কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গ সৌ মহীতলে,
ভাগিরথী তটে,
দেব শচী গর্ভে সমুদ্ভূতং॥"

প্রশ্ন। সঙ্গীত বা কীর্ত্তনের অর্থ কি ?

উত্তর। "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীত মুচ্যতে।" অর্থাৎ গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী একত্র হইলে তাহার নাম সঙ্গীত। আর

"নাম লীলা গুণা দীনাং উচ্চৈ ভার্ষতু কীর্ত্তনং ॥"
(সঙ্গীত-লহরী।)

অর্থাৎ নাম লীলা গুণাদি প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ করার নাম সংকীর্ত্তন।

প্রশ্ন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কি নাম গান ছিল না ?

উত্তর। পূর্ব্ব যুগেও ছিল। ভক্তিগুরু নারদ আদি ঋষিগণ সাম গান অর্থাৎ বেদোক্ত স্তুতি পাঠ দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিতেন। কলিকালে ভগবদ্ভক্ত-গণ খোল করতাল বাদ্য সংযোগে গান করিয়া ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করেন। যেখানে নাম গান হয়, সেইখানেই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

"মদভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি।"

ইহাই ঈশ্বরের শ্রীমুখের আজ্ঞা।

প্রশ্ন। কীর্ত্তন গানের রচয়িতা কে ?

উত্তর। যাঁহারা মহাজন নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তিশাস্ত্রে তাহাদের নাম এইরূপ পরি-কীর্ত্তিত আছে, যথা,—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাসৌ, জয়দেব কবীশ্বরঃ
লীলাশুকঃ প্রেমযোক্তৌ রামানন্দশ্চ নন্দদঃ
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ
পৃথিব্যাং ধন্য ধন্যস্তে বর্ত্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥

এই সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ বা রসিক পুরুষ আর বহুশত শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী ভক্তগণ-কর্ত্তৃক পদ-গানের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন। পদ-কর্ত্তাগণ কোন্ দেশীয় ও তাহাদের কোন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আছে কি না ?

উত্তর। সকলেরই জীবনচরিত আছে।

(১) প্রথম লীলাশুক (নামান্তর বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুর)। ইনি দ্রাবিড়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। কর্ণাট প্রদেশীয় চিন্তামণি নাম্নী কোন বেশ্যার উপদেশে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি, সংস্কৃতে "শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত" নামে এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে পূর্ব্ব রাগাদি শ্রীকৃষ্ণের গুণগান সমূহ বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে ঐ গ্রন্থ স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকু-রের আখ্যায়িকা বড়ই চমৎকার।

(২) শ্রীজয়দেব স্বামী। ইনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, রাঢ়দেশের অন্তর্গত বীরভূম প্রদেশে, "অজয় নদী তীরে" কেন্দবিল্ব গ্রামে বাস করিতেন। রাঢ়ীয় হইলে কি হয়, ইনি সংস্কৃতে কবীশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। বাঙ্গালীর কম গৌরবের বিষয় নহে যে, ইহাঁর রচিত মধুর কোমল কবিতাবলী "শ্রীগীতগোবিন্দ" জম্বু দ্বীপ খণ্ডে অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষে আদৃত ও পূজিত। এই মহাত্মা বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন। তৎকালেই গীতগোবিন্দ লিখিয়া প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার এরূপ গ্রন্থ জগতে দ্বিতীয় নাই।

(৩) কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর। ইনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ, দ্বারবঙ্গের নিকট "বিশপী" গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার খ্যাতি কবিরঞ্জন; ইনি, পঞ্চ গৌড়াধিপ রাজা শিব সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ক্ষমতায় বাঙ্গলা, হিন্দি, মৈথিলী, এবং ব্রজভাষা মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গীতোপযোগী বহুশত পদ রচনা করেন। সে সমুদায় গান অতি সুমিষ্ট।

(৪) ঠাকুর চণ্ডীদাস। ইনিও বাঙ্গালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বীরভূমের অধীন "নান্নুর

গ্রামে” ইঁহার বাস ছিল। ইনি বিদ্যাপতি ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ; শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী বাসুলী দেবীর কৃপাদেশে তথনকার নিখুঁত বাঙ্গালায়, নায়ক নায়িকার রসভাব-সমন্বিত বিবিধ ছন্দ বন্দে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস-ঘটিত পদ্য গীত যাহা রচনা করেন, তাহা মধুর হইতেও সুমধুর। ইনি এবং বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের আখ্যায়িকা বড়ই শ্রুতিমধুর।

(৫) ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ ভক্ত শ্রীমৎ সনাতন, শ্রীমৎ রূপ, শ্রীমৎ জীব, শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট, শ্রীমৎ দাস রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদগণ সংস্কৃত পদ্যাবলী, গীতাবলী, এবং ব্রজবুলী, আর ঠাকুর নরহরি ও ঠাকুর বৃন্দাবন, ঠাকুর জ্ঞানদাস, (১) গোবিন্দদাস, ঠাকুর লোচনানন্দ, জগদানন্দ, নয়নানন্দ, রায় রামানন্দ, দাস মুকুন্দ, প্রেমানন্দ, বংশী-বদনানন্দ, মুরারি গুপ্ত, বসু রামানন্দ, বাসু-দেব ঘোষ, (২) গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময়ে, ঠাকুর নরোত্তম, ঠাকুর যদুনন্দন, বংশীদাস, বলরাম দাস, মনোহর দাস, বৈষ্ণব দাস, ঘনশ্যাম দাস, অনন্ত দাস, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, সঙ্গীত-মাধব রচয়িতা (৩) কবীন্দ্র গোবিন্দদাস, বসন্ত রায়, চন্দ্র শেখর, প্রভু শ্রীশ্রীবীরভদ্র, রাজা বীর হাম্বির, ধীর হাম্বির রাজা নরসিংহ, প্রসাদ দাস, জগন্নাথ দাস, দৈবকিনন্দন, পদামৃত গ্রন্থকার রাধামোহন প্রভৃতি, ঠাকুর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ পদাবলীর অনুকরণে বহুশত পদ রচনা করেন। ঐ সমুদয় পদ ৬৪ চৌষট্টি রসে পরিপূর্ণ এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত। তৎসমস্ত গানই কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয়। ভাবুক ভক্তগণ অমৃত বোধে সেই রস আস্বাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ রসিক ভক্তগণকে লইয়া সর্ব্বদা ঐ সমুদয় গীতের রসাস্বাদন করিতেন এবং ভাবে বিভোর হইতেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যক্ত আছে ;—

“চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
গান শুনি পরম আনন্দ॥” ইত্যাদি।

প্রশ্ন—ঐ সমস্ত পদাবলীর মধ্যে কোন্ কোন্ রস ও প্রসঙ্গ আছে ?

উত্তর—সংক্ষেপে লিখিতেছি।—

(১) ব্রজলীলায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, বাল্যলীলা, সখ্য বাৎসল্য, শ্রীরাধিকার জন্মলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোবর্দ্ধণলীলা, কালীয় দমন, পুলীন ভোজন, নায়ক নায়িকা অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠা, অভি-সারিকা, বিপ্রগর্ব্ব, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, রূপানুরাগ, হিম বর্ষাদি সর্ব্বকালোচিত অভিসার মান, প্রেমবৈচিত্র্য, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভি-সারানুরাগ, বংশী শিক্ষা, সম্ভোগ, অকারণ মান, নায়ক নায়িকা ভাবে নানাস্থলে নানা রূপে মিলন, সাক্ষাৎ দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, চিত্র দর্শন, আলম্বন, উদ্দীপন, সূর্য্যপূজা, রসালস, নিত্যরাস, মহারাস, ঝুলন, বসন্তলীলা, নৌকা-বিলাস, দানলীলা, প্রবাস, অদূর প্রবাস, দূর প্রবাস, বিরহ, ভূত বিরহ, ভবন বিরহ, অষ্ট-কালীয় লীলা ইত্যাদি।

(২) শ্রীনবদ্বীপ লীলায়—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর জন্মোৎ-সব, বাল্যলীলা, নবদ্বীপ বিলাস, নগর-কীর্ত্তন, জাহ্নবী লীলা, সখ্যরস, নবদ্বীপ নাগরীগণের খেদোক্তি, রূপ, সন্ন্যাস লীলা,

অভিষেক, পুলীন ভোজন, দণ্ডমহোৎসব, স্নানযাত্রা, রাস যাত্রা, বেড়া সংকীর্ত্তন, বাহ্যদশা, দিব্যোন্মাদ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দ্বাদশ মাসিক বিরহ, উৎকণ্ঠা, প্রলাপ, দশদশা, প্রার্থনা, ভক্তগণস্থ বিয়োগ, নানাপ্রকার রস, উপরস প্রভৃতি। পদসমুদ্র নামা একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাজন প্রণীত পদ সংখ্যা কিছু কম ১৫০০০ পদের হাজার। এই সমুদ্রে নিমজ্জন করিলে ইচ্ছামত সকল রত্ন লাভ করিতে পারা যায়। পরিতাপের বিষয়, অস্মদ্দেশে রসভাব সমন্বিত ইহার অধিকাংশ পদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই, অথবা গায়ক মাত্রেরই জানা শুনা নাই। তাহার কারণ, গ্রন্থখানির বড়ই অভাব। এই সমুদ্রেরই এক অংশ "পদকল্পতরু" এবং শুদ্ধাংশ "পদ কল্প-লতিকা" এবং "গীত-চিন্তামণি" প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সঙ্গীতবেত্তাগণ, তাহাই শিক্ষা করিয়া, কীর্ত্তন ব্যবসায় করেন। পদ-সমুদ্রের পদ বড় একটা কাহারও শিক্ষা নাই।

স্বামী জিউ, এই কথা অবগত হইয়া প্রসন্ন বদনে গ্রন্থখানি দেখিতে ইচ্ছা করেন। পশ্চাৎ গ্রন্থখানি দর্শন করিয়া যারপর নাই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন। পূর্ব্ব হইতেই গ্রন্থ প্রকাশে আমার ইচ্ছা ছিল। মধ্যে গ্রন্থ লইয়া একটী দায়াদি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সেই প্রতিবন্ধকে ইহা পূরণ হয় নাই।

বহু অর্থ নাশের পর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায়, আদালতের নিষ্পত্তি এবং সালিসী বিচারে গ্রন্থ-স্বত্ত্ব আমি পাইয়াছি; সুতরাং স্বামীজীর আজ্ঞায়, পূর্ব্ব উদ্দেশ্যানুসারে এবং বদান্যবর্গের ও ভক্তগণের অনুগ্রহ প্রসাদাৎ বর্ত্তমান যুগের অধিষ্ঠাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যুগল চরণ স্মরণ করিয়া, এই ঘোর কালস্রোতের বিপরীতে একখানি তরি ভাসাইব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি। ফলতঃ এই তরি কতদূর যাইবে, বা কোথায় গিয়া থামিবে, কি যাইতে যাইতে নিমগ্ন হইবে, তা কালের কাল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই জানেন। সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ অনধিকার। কারণ, ব্যাপার গুরুতর, রাজসূয় যজ্ঞ বিশেষ, গ্রন্থ খানি অতি প্রকাণ্ড, প্রকাশ করা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ, বিশেষতঃ মুদ্রণাদি কার্য্যে অধিক সময়ের আবশ্যক। এদিকে আমি সকল বিষয়ে হীন, শরীর জরাগ্রস্ত, পরিশ্রমে অপটু। স্রোতের অনুকূলে যদি নৌকা ছাড়া হইত, বা বায়ু যদি অনুকূল হইত, কোন ভাবনা ছিল না, অনেক দূরের কথা বলিতে পারিতাম। অন্যদিকে, এ তরণীর সজ্জা দেশ কাল পাত্রানুসারিণী নহে। ইহাতে যে যে সামগ্রী বোঝাই হইবে, তাহা মহাজনি মাল; কিন্তু এ সময়ে তাহার বড় কাটতি নাই। কারণ, এখন অর্থকরী ইংরাজি বিদ্যারই অধিক চর্চ্চা; নাটক, নভেল, খোষগল্লাদি পুস্তকেরই আদর বেশী। তার উপর আবার বিজ্ঞাপনের ধূম, "লূতা তন্তু বিশিষ্ট" জাহাজের মাস্তুলে লম্বা চৌড়া বড় বড় খবরের কাগজাদিতে বিজ্ঞাপনের বিজয় নিশান। সে ফাঁদ বড় মন্দ নয়। কথায় আছে ;—

"দেব উপদেব পড়ে, তন্ত্র মন্ত্র কাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ, ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥"

সেই প্রকার, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, চতুর, অচতুর সেই কুহকিনী কুহেলিকায় পড়িয়া অনেকে মজিতেছেন, দেশকেও মজাইতেছেন। যাঁহারা কোন কালেও কোন মহাজনের কৃত পদ ও তাহার সংখ্যাও জানেন না, চক্ষেও দেখেন নাই, কালের এমনি মহিমা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্প মাত্রায় পদ সংগ্রহ করিয়া বড়

বড় অক্ষরে ;—"অমুক ঠাকুরের সমগ্র পদাবলী, অঙ্গ সৌষ্ঠবে মনোহর, এত ফর্ম্মার অধিক, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ, কাপড়ে বাঁধা, স্বর্ণাক্ষরে লেখা" এইরূপ প্রলোভন দর্শাইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের এই কার্য্যে হস্তপ্রসারণ না করিতে করিতে আবার ইঙ্গিতে (ইঙ্গিতে কেন কাগজে কলমে লিখিয়া) বিভীষিকা দেখাইতেছেন, অভিমানে বলিতেছেন, গান বিদ্যার পদ শিখিলে কি হইবে? ও গুল সেকালের বস্তাপচা; এখনকার নূতন নূতন টাটকা মাল থাকিতে পুরাতন কে আদর করিবে? যে মাল কাটিবে না, যে ব্যবসা চলিবে না, তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

যাহারা অকুতোভয়, নবতারুণ্যে যাহাদের অপরিসীম বল ও উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, সত্যবটে তাঁহাদিগের নিকট এ গান ভাল লাগিবে না। তাঁহারা এই আয়োজনের দিকে ফিরিয়াও দেখিবেন না। যাঁহাদিগের আশা ভরসা শেষ হইয়াছে এবং যাঁহাদের ভগবানের নাম গানে প্রবৃত্তি আছে, এবং প্রেম জন্মিয়াছে, আর শোণিতও শীতল হইয়াছে, এবং ভবসাগরের পার অপার দেখিতেছেন, সেই সকল সাধুগণ এবং সাহিত্যানুরাগিগণ, অবশ্য ইহার আদর করিবেন।

সেকালের বিদ্বান্ আর একালের বিদ্বানের তুলনা করিয়া দেখিলে লজ্জায় মুখ নত হয়। এখন নম্রতা নাই, বিনয় নাই, কেবলই বিদ্যাভিমান আর আত্মাভিমান। বিদ্যাবাগীশ বা বিদ্যা-দিগ্‌গজ হইলে কি হয়?

"ভবন্তি নম্রা স্তরবঃ ফলোদ্গমৈঃ॥"

ফলের উদ্গম হইলে বৃক্ষ যেরূপ অবনত হয়, বিদ্যার উদয় হইলে মনুষ্য সেইরূপ নত ও বিনয়ী হইয়া থাকেন। ইহাই ঋষিধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আর্য্যশাস্ত্রের উত্তরোত্তর যতই শিক্ষালোচনা হইবে, ততই নম্রতাদিগুণ উপস্থিত হইবে। যখন আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হইবে, তখন ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে আর বিলম্ব থাকিবে না। যেহেতু—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
ধনিন, পণ্ডিত, জ্ঞানীর বড় অভিমান॥"
শ্রী, চৈ, চ।

ইহা নিশ্চিত যে, ভগবান দাম্ভিকের নহেন। বিশেষতঃ যাঁহারা অভিমানী, তাঁহারা দীন অপেক্ষা ঈশ্বরের কৃপালাভে বহুদূরে পড়েন। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন ;—

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥"

যাহা শিক্ষা করিলে, যাহা অনুশীলন করিলে, ঈশ্বর বিষয়িণী মতি হয়, তাহারই নাম বিদ্যা। কিন্তু অবিদ্যা নামে যে একটী জিনিস আছে, তাহা বড় ভয়ঙ্করী। বর্ত্তমান কালে অন্যান্য বিদ্যা অপেক্ষা যাঁহারা অর্থকরী-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, সেই অবিদ্যার প্রভাবে তাহাদের মন হঠাৎ বিগড়াইয়া যায়। ঐ বিদ্যা শিক্ষায় আত্মভিমানই অধিক হয়। বলা বাহুল্য, ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষক অভিমানী, শিক্ষক অপেক্ষা অধ্যক্ষ অভিমানী, উত্তরোত্তর অভিমানেরই বৃদ্ধি। যে বিদ্বানের এবম্বিধ অভিমানই মূলমন্ত্র, ঈশ্বরের স্তোত্রগান সে বিদ্বানের ভাল লাগিবে কেন? যে শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষদিগের ফল সাধনের মোক্ষ উপায়, তাহা তাহারা ভয়ঙ্করী বিদ্যার প্রভাবে একেবারে ভুলিয়া যায়। মনে করে না যে ;—

"ন বিদ্যা সঙ্গীত পরঃ॥"

সঙ্গীতের তুল্য বিদ্যা নাই। এক সময় যে বিদ্যার প্রভাবে ভূতভাবন ভগবান দ্রব হইয়াছিলেন। শাস্ত্রবেত্তাগণ বলিয়াছেন ;—

"সঙ্গীত সৎকাব্য, গুণানভিজ্ঞঃ
খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছ বিষাণ হীনঃ
চরন্ত্য সৌ কিন্তু, তৃণং ন ভুঙক্তেঃ
পরম্পশূনাং মপি ভাগ্য হেতোঃ ॥"
(সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীত সৎকাব্যের যাহারা চর্চ্চা না করেন, তাহারা পশু। আরো বলিয়াছেন ;—

"যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদা, সুতপদ কমলে, নাস্তি ভক্তি র্নরানাং,
যেষাং মাভীর কন্যা, প্রিয়গুণ কথনে, নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলাঃ ললিত গুণ কথা, সাদরে নৈব কর্ণৌ,
তে ধিক্ তান ধিগতান ধিগেতান, শিতরাং কীর্ত্তনাস্তো মৃদঙ্গঃ॥
সঙ্গীত-লহরী।

অর্থাৎ যাহারা হরিনাম সংকীর্ত্তনে বিরক্ত, তাহাদিগকে ধিক্! ধিক্! ধিক্!

"ধ্যায়ন কৃতে যজন যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন।
যদোপ্নোতি তদাপ্নোতি, কলৌ সংকীর্ত্ত কেশবং॥"

কলিতে সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে কেশবের গানে যতই আনন্দ, যতই সুখ, যতই প্রেম, এমন আর কিছুতেই নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়াই শেষের মুখপাত্র এবং ভগবদ্ভক্তগণ সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

স্বামীজীর প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া আমি নিজের কতকটা অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। ইহা এক প্রকার আমার ধৃষ্টতার পরিচয় এবং অপরের উপহাস-যোগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তাহারই নাম "যুগধর্ম্ম" অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্ত্তন। কলিতে "হরের্নামৈব কেবলং" হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় কঠোর তপস্যাদি করিতে হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যদি কিছু তত্ত্ব জানিবার কাহারও ইচ্ছা হয়, বলরাম দাসের কৃত পদাবলী আর তাঁহার কৃত "অমিয় নিমাই চরিত" পাঠ করিলে অনেকেরই সন্দেহ অপনোদন হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীহারাধন দত্ত।

রামপ্রসাদের জাতিনির্ণয়। *

রামপ্রসাদকে দাস উপাধিধারী সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত রসিকবাবু, প্রসাদের রচিত কালী কীর্ত্তন হইতে অনেকগুলি পদসংগ্রহ করিয়াছেন ; ঐ সকল পদের ভণিতায় রাম প্রসাদ আপনাকে "দাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য যে তাঁহার উপাধি দাস ছিল, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট কোনও হেতু আমরা দেখিতে পাইতেছিনা। রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন ; ভক্তগণের হৃদয় সাধারণতঃ দৈন্য-ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। রামপ্রসাদও আত্মদৈন্য প্রকাশের নিমিত্তই আপনাকে "দাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যথা ;—

"আমি তুয়া দাসদাস, দাসী পুত্র হই॥" †
"করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥" ‡
"কবিরামপ্রসাদে ভাষে, রক্ষাকর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার আপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥" §

* ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কর্তৃক লিখিত "রামপ্রসাদ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

† কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর। ‡ কালী কীর্ত্তন।

§ প্রসাদ পদাবলী।

এই সকল দাস শব্দ প্রয়োগ দেখিয়া কি রামপ্রসাদকে দাস উপাধিধারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে? যদি তাহাই করা হয়, তবে অনেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে, রাম-প্রসাদের নাম পর্য্যন্তও উল্টাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন;—

"কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
সে বুঝে—অক্ষর কালী হৃদে আছে যার॥" *

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে, রাম প্রসাদের অপর একনাম "কালীকিঙ্কর" ছিল। তাঁহাকে দাস বলিয়া কল্পনার ভিত্তিও ঠিক এই রকমেরই বটে।

কায়স্থ সাব্যস্ত করিবার নিমিত্তই রাম প্রসাদকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করা রসিক বাবু নেহাৎ আবশ্যকীয় মনে করিয়াছেন। তর্কস্থলে রাম প্রসাদকে দাস বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহার কায়স্থত্বের কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ রসিক বাবুর প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আত্মমত সমর্থনের নিমিত্ত বলেন;—

"দাস উপাধি সেকালে কেন, একালেও কায়স্থগণই অধিক ব্যবহার করেন। অন্য উপাধি থাকিলেও কায়স্থগণ সেই উপাধির পর দাস শব্দ ব্যবহার করেন।"

এইটি ঠিক কথা। আপন আপন উপাধির পরে কায়স্থগণ "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা—"ঘোষদাস" "বসুদাস" ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল মাত্র দাস উপাধীধারী কায়স্থের সংখ্যা অধিক নয়। কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্য জাতির মধ্যেই এই উপাধির বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "দাসগুপ্ত" বলিয়া আপন পরিচয় দেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কেবল মাত্র "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং রসিক বাবুর এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া রাম প্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া সাব্যস্ত করার কোনও কারণ নাই।

তিনি রাম প্রসাদের বৈদ্যত্ব ঘুচাইবার নিমিত্ত আর এক স্থলে বলিয়াছেন;—

"সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থই বঙ্গভাষার যাহা কিছু অনুশীলন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত বৈদ্যগণের মধ্যে আর কাহাকেও এ পথে বড় দেখা যায় নাই।"

ধন্য রসিক বাবুর দৃষ্টিশক্তিকে! বিজয়-গুপ্ত, গোবিন্দদাস, আনন্দময়ী গুপ্তা এবং লালা জয়নারায়ণ সেন প্রভৃতি মহাকবিগণের আশে পাশেও তাঁহার নজর ঘেঁষিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বড় বড় বৈদ্য কবি ছিলেন, যাঁহাদের নাম সাহিত্য-জগতে চিরদিনের তরে অজর অমর হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই ধুয়া ধরিয়া, রাম প্রসাদকে কায়স্থ বলা রসিক বাবুর সঙ্গত হয় নাই।

রসিক বাবু আরও বলিয়াছেন;—

"তদানীন্তন বৈদ্যগণ সকলেই চিকিৎসাব্যবসায়াবলম্বী কবিরাজোপাধিভূষিত ছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। সেন প্রভৃতি উপাধি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। চিকিৎসাব্যতীত তৎকালে তাহারা অন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। রাম প্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজ রূপেই দেখিতে পাইতাম। গীতরচক, গ্রন্থপ্রণেতা, জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞরূপে দেখিতে পাইতাম না।"

পুরাকালে সকল সম্প্রদায়েরই এক একটী স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল; একে অন্যের ব্যবসায় গ্রহণ করিতেন না। সে কালে, বৈদ্যগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু এই সকলই হিন্দুরাজত্ব কালের কথা। মুসলমানগণের শাসন সময়ে সাম্প্রদায়িক ব্যবসার শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল; তখন আপন-

* কালী কীর্ত্তন।

আপন সুবিধা দেখিয়া যাহার যে ব্যবসা ইচ্ছা, আরম্ভ করে। এ কথাটী বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল, ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকের মধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম হইয়াছে। রসিক বাবু বলেন, সম্ভবতঃ ১৬৩৯ শকে জন্মিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ অতি সামান্য তফাৎ। রসিক বাবুর হিসাব মতেও যদি ধরা যায়, তবে রাম প্রসাদের আবির্ভাব কাল ১৭৮ বৎসরের বেশী হয় নাই। পলাশির যুদ্ধের সময় হইতে মুসলমান শাসনের ধ্বংস কাল গণনা করিলে তাহাও ১৩৮ বৎসরের কথা। তবেই দেখা যাইতেছে, রামপ্রসাদ মুসলমান রাজত্বের শেষ আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ব্যবসায়ের বিচার আদবেই ছিল না। অন্যান্য জাতির ন্যায় অনেক বৈদ্যও এই সময়ে আপন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া চাকরি ব্যবসায় ধরিয়াছিলেন। মুসলমানের শাসনকালে হেকিমি চিকিৎসার বহুল প্রচার হেতু, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্য্যাদার কথঞ্চিৎ হানি হইয়াছিল; বৈদ্যগণের চাকরি ব্যবসায় অবলম্বন করার ইহাও একটী কারণ বটে। এই সময়ে যে বৈদ্যগণ চাকরি ব্যবসায়ী ছিলেন, মহাত্মা কৃষ্ণজীবন মজুমদার এবং তৎপুত্র মহারাজ রাজবল্লভ সেনই এ কথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। রামপ্রসাদও রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক, সুতরাং তিনি এই সময়ে জমিদারের চাকরি করিয়াছিলেন বলিয়াই কায়স্থ জাতীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। নবাবী আমলে চাকরী করিতে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া সেকালে সকলেই পারসী পড়িতেন। রামপ্রসাদেরও সেই অনুরোধে পারস্যভাষা শিক্ষা করা অসম্ভব নহে। তাঁহার রচনার কোন কোন স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে পারস্য ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদ্যের সেন ও দাস প্রভৃতি উপাধিকে আধুনিক বলাও অভ্রান্ত কল্পনা নহে। এই সকল উপাধি আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এ কথায় কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে, আমরা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিবার নিমিত্ত রসিক বাবু, তাঁহার গানের "শিশুকালে পিতা মলো, রাজ্য নিল পরে" এই পদটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ;—

"এই গীতাংশের দ্বারা তাঁহার পিতামহদিগকে জমিদার বলিয়া বোধ হয়। সেকালে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈদ্যের জমিদারীর কথা কোন পুথিতে,পুস্তকে বা লোকমুখে শুনা যায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদ কায়স্থ ছিলেন, একথা নিশ্চিত।"

রসিক বাবুর এই অদ্ভুত যুক্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্তও আমরা মহারাজ রাজবল্লভকেই সাক্ষী মান্য করিতেছি। তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পর্য্যন্ত শোভা পাইতেছে, তথাপি রসিক বাবু পুথি পুস্তক খুঁজিয়া বৈদ্য জমিদারের নাম পাইলেন না, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। রাজবল্লভ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের আদি পুরুষ রাজা শ্রীহর্ষ সেনের নামও এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। বলা বাহুল্য যে,তিনি রাজবল্লভের কেন, রামপ্রসাদের পিতামহেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সেকালে বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতীয় ছোট বড় ভূম্যধিকারীর অভাব ছিল না। সুতরাং ভূম্যধিকারীর পৌত্র বলিয়াই রামপ্রসাদকে কায়স্থ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রবন্ধটী যতই তলাইয়া দেখিতেছি, ততই

দুঃখ হইতেছে। রসিকবাবু রামপ্রসাদের বৈদ্যত্ব খণ্ডাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন ;—

"দাস সকলে এক গোত্র। সুতরাং রামপ্রসাদ দাস বৈদ্য হইলে, লক্ষ্মীকান্ত দাস তাঁহার ভগিনীপতি হইতে পারিতেন না।"

রসিক বাবু জাতিতে কায়স্থ। বৈদ্যের কুল সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁহার জানিবার বিষয় নহে। সম্ভবতঃ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি এ কথাটী লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধূর্ত্ত লোকের হাতে পড়িয়া, যেরূপ ভাবে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের নিম্নোদ্ধৃত বচনটী দেখিলেই রসিক বাবু বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি বিষম ভেল্কিতে পড়িয়াছেন।

"ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্য-কৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপিচ ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাং তদনন্তরং।
মৌদ্গল্যাঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এ বচ ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়্‌ণী মতাঃ।" *

এই বাক্য দ্বারা দেখা যায়, দাস উপাধিধারী বৈদ্যের মধ্যে মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য এই ছয়টী গোত্র প্রচলিত আছে। বচন প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া,সমাজের দিকে তাকাইলেও রসিক বাবু এই কথাটা অনায়াসে জানিয়া লইতে পারিতেন।

এখন দেখা যাইতেছে, রামপ্রসাদ এবং তাঁহার ভগিনীপতি উভয়ে দাস উপাধিধারী হইলেও রামপ্রসাদের বৈদ্যত্বের হানি হয় না। বিভিন্ন গোত্রের দাসের কন্যা দাসেতে অর্পণ করিতে কোনও বাধা নাই।

রামপ্রসাদ আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দেওয়াতেও তাঁহার কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্যত্বেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বৈদ্যগণ, উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে, প্রণব উচ্চারণের এবং দ্বিজ শব্দ ব্যবহারের অধিকারী হন। এইটী শাস্ত্রসম্মত কথা ;—সমাজেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কায়স্থগণের মধ্যে অদ্যাপি ঐরূপ প্রচলন দেখা যায় নাই।

উপরি উক্ত কয়েকটী যুক্তি ব্যতীত রামপ্রসাদকে কায়স্থ এবং দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করার পক্ষে রসিক বাবু অন্য কোনও যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। আমরা যথাসাধ্য তাঁহার ঐ সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রামপ্রসাদ যে বৈদ্য জাতীয় এবং সেন উপাধিধারী ছিলেন, এখন তদ্বিষয়ের প্রমাণ পক্ষে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

রামপ্রসাদ একটী গানে নিজকে নিজে বলিয়াছেন ;—

"কেন ভিষকপ্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত।" *

"ভিষক" শব্দে বৈদ্যকেই বুঝায়। রসিক বাবু বলেন, রামপ্রসাদের রচিত এমন কোন পদ তিনি দেখেন নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। বোধ হয়, উপরোদ্ধৃত পদটী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়াই ঐরূপ কহিয়া থাকিবেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া,তাঁহার প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময়ে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কোনও কথা সংগ্রহ করা যত কষ্টকর, গুপ্ত মহাশয়ের সময়ে তত ছিল না। কারণ ইঁহারা উভয়ে এক শতাব্দীর লোক ; বিশেষতঃ তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ধার্ম্মিক লোকের জীবন বৃত্তান্ত অনেকটা মুখে মুখেই রাখিতেন। রামপ্রসাদের জীবনীও

* বৈদ্যকুল তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

* কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

ঐ ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং গুপ্ত মহাশয়কে তাহা সংগ্রহ করিতে বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তিনিই বলিয়াছেন, রামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন। রসিক বাবু এই প্রাচীন বাক্য অবিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কোনও কারণ দেখাইতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের উপাধির দ্বারাও তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। সেকালে কবিরাজ, কবিরঞ্জন, কবিভূষণ, কবিরত্ন প্রভৃতি উপাধি অন্য জাতি অপেক্ষা বৈদ্যগণের প্রতিই অধিকমাত্রায় প্রয়োগ হইত। সুতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ বিষয় সাব্যস্ত করিতে যাওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

রামপ্রসাদ যে বৈদ্য এবং সেন উপাধিধারী ছিলেন, পণ্ডিতবর ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত বাক্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ;—

"রামপ্রসাদের বংশীয়েরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রপৌত্র বাবু গোপালচন্দ্র সেন ও বৃদ্ধ প্রপৌত্র বাবু কালীপদ সেন কলিকাতাতেই বিষয় কর্ম্ম করেন।" *

ইহা চাক্ষুষ প্রমাণ। রসিক চন্দ্রের অনুমান এই প্রমাণের নিকট কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যাহাই বলুন না কেন, লোকে কিন্তু তাঁহার এই ধৃষ্টতাকে প্রশংসা করিবে না।

বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ রামপ্রসাদের সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি রাম প্রসাদের বাসস্থান পরিদর্শন এবং তাঁহার বংশধরগণের সহিত আলাপাদি করিয়া জানিয়াছেন, রামপ্রসাদ বৈদ্য জাতি এবং সেন বংশীয়। দয়াল বাবু জাতিতে কায়স্থ, তিনি অনুসন্ধানে রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া জানিতে পাইলে, বৈদ্য এবং সেন উপাধিধারী বলিবার কোনও কারণ ছিল না। তিনি বলিয়াছেন ;—

"—প্রায় দুই বৎসর কাল এইরূপে কল্পনা রাজ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া, ঘটনাক্রমে কলিকাতায় জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের নিকট তিনটী নিশ্চিত কথা পাইলাম। সেই তিনটী কথা এই—(১) রামপ্রসাদ একজন বৈদ্যকুল-সম্ভূত, রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের সমসাময়িক কবি। (২য়) তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক ছিলেন। (৩) তাঁহার বাড়ী হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে।" *

দয়াল বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন ;—

"আমি এবার রামপ্রসাদের বাসভূমি পরিদর্শন করিতে গিয়া ও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে গিয়া, একটী অতি প্রধান ঘটনা অবগত হইয়াছি ; সেইটী এই যে, রামপ্রসাদের রামদুলাল নামক একমাত্র পুত্র ছিল, এমন নহে ; রামমোহন নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। এই উভয়, রাম দুলাল সেন ও রামমোহন সেনের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন"

ইহা দয়াল বাবুর স্থানীয় অনুসন্ধানের ফল। রামপ্রসাদের বংশধরগণের সহিত আলাপ করিয়া তিনি একথা বলিয়াছেন। আমি ঘরে বসিয়া—"একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলে লোকে আমাকে পাগল বই আর কি বলিবে? দয়াল বাবু কেবল একথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই ; তিনি রামপ্রসাদের বংশধরগণের সহিত আলাপ করিয়া এক বংশাবলীও সংগ্রহ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত বংশাবলীর সহিত মিলিত করিয়া, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

* বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

* প্রসাদ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। দয়াল বাবুর সকল কথাই এই বহি হইতে উদ্ধৃত হইল।

কৃত্তিবাস সেন।
|
রামেশ্বর সেন।
|
রাম রাম সেন (দুই বিবাহ।)

(১ম পক্ষ) নিধিরাম সেন | (২য় পক্ষে) রামপ্রসাদ সেন। | বিশ্বনাথ সেন। | অম্বিকা। (কন্যা) | ভবানী। (স্বামী লক্ষ্মী-নারায়ণদাস)

পরমেশ্বরী। রামদুলাল সেন। রামমোহন সেন। জগদীশ্বরী। জগন্নাথ দাস। কৃপারামদাস

রাজচন্দ্রসেন। জয়নারায়ণ সেন। দুর্গাদাস সেন।

কালাচাঁদ সেন। শ্রীগোপালচাঁদ সেন শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেন।

শ্রীকালীপদ সেন।
(এসিঃ ইঞ্জিনিয়ার)

বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি দয়াল বাবুর বংশাবলী সংগ্রহ সময়ে জীবিত ছিলেন। এবং কবিরঞ্জনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বাবু কালীপদ সেন মহাশয় এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করার কথাও তাহাতে লিখিত হইয়াছে।

রসিক বাবু বলেন ;—

"প্রসাদ-প্রসঙ্গকার এবং তদনুবর্ত্তী প্রসাদ পদাবলীকার রামমোহন নামে রামপ্রসাদের আর একটী পুত্র ছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের মতের পোষকতার জন্য রামমোহনের বংশীয় সেন উপাধিধারী কতিপয় জীবিত ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা রামদুলালের বংশীয় কতিপয় সেন উপাধিধারীর উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। * * * * রামমোহন নামে রামপ্রসাদের কোন পুত্র ছিল না ; রামপ্রসাদ দাসের পুত্র, রামদুলালের পুত্র পৌত্রাদিরও সেন উপাধি হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে।"

এতৎ সম্বন্ধে দয়াল বাবু কি বলিয়াছেন, দেখুন ;—

"রামপ্রসাদ ভাই, ভগিনী, ভগ্নীপতি ও ভাগিনেয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার তিনটী সন্তানেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অপর একটী পুত্র (রামমোহন) থাকিলে, নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? এই প্রশ্ন অবিকল এই ভাষায় আমি কবিরঞ্জনের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "কবিরঞ্জন" বিদ্যাসুন্দর" রচিত হওয়ার পরে তাঁহার পিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকে তাঁহার নামের উল্লেখ হয় নাই।"

বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্য কোনও পুস্তকে রামপ্রসাদ আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। দয়াল বাবুর উপরোদ্ধৃত কথাটী কাটিবার নিমিত্ত রসিক চন্দ্র কোনও কথা বলিয়াছেন কি? তবে কথাটা ঢাকা দিবার নিমিত্ত তিনি দয়াল বাবু প্রভৃতিকে এবং রামমোহনের বংশধরগণকে অন্যায় রকমে আক্রমণ করিয়াছেন, দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন;—

"সংগ্রহকার মহাশয়েরা সেন উপাধিধারী যে সকল জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব

পুরুষ কোন রামপ্রসাদ হইতে পারেন, সেন উপাধিও অবশ্যই তাঁহার থাকিবে, কিন্তু তিনি কবিরঞ্জন উপাধি-ধারী কীর্ত্তন ও গীতরচক রামপ্রসাদ দাস নহেন। নামের সমতা দেখিয়াই ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন উপাধিধারী কোন কীর্ত্তিমান পুরুষকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়াও অধস্তন বংশ্যগণের উপযুক্ত নহে।"

এ অতি মজার কথা! জীবিত ব্যক্তি-গণের পূর্ব্ব পুরুষের নাম রামপ্রসাদ হইতে পারে,—তাঁহার সেন উপাধি থাকিতে পারে, —কিন্তু তিনি রসিক বাবুর সেই রামপ্রসাদ নন!! দয়ালচন্দ্র রামপ্রসাদের বংশধরগণের বাড়ীতে যাইয়া, তাঁহাদের সহিত আলাপাদি করিয়া যে সকল কথা জানিয়াছেন ও বলিয়া-ছেন, রসিক বাবুর মতে সেই সকল কথা দয়াল বাবুর কল্পনা মাত্র। তিনি সংগ্রহপূর্ণ করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিবার অভিপ্রায়েই এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আর, রাম-মোহনের বংশধরগণ অন্যায় মতে ভিন্ন জাতীয় লোককে টানিয়া আনিয়া, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের আসনে বসাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা অনুপযুক্ত বংশধর। কিন্তু রসিক বাবু ঘরে বসিয়া, কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র খোঁজ খবর না লইয়া, সব জান্তার মত যে এলোমেলো বকিয়াছেন, তাহা অতি সত্য—অতি দৃঢ়। ধন্য রসিক বাবুর কল্পনাকে!

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও রাম প্রসাদ সম্বন্ধে দয়াল বাবুর মতেই সায় দিয়া-ছেন। এবং তিনি যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া-ছেন, তাহাও উপরি উক্ত বংশাবলীর অনু-রূপই বটে।* বলা বাহুল্য যে, কৈলাসচন্দ্রও কায়স্থ বংশোদ্ভব; তাঁহার বৈদ্যের পক্ষ টানিয়া কোনও কথা বলিবার কারণ নাই।

এতদ্ভিন্ন, রামপ্রসাদের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের প্রতি যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। নিম্নে সেই উক্তি প্রদর্শিত হইল;—

"এই সংসার সুখের কুটী।
ওরে খাই দাই মজা লুটি॥
যার যেমন মন, তেম্নি ধন মন কররে পরিপাটি।
ওহে সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি॥ *

এই কথার উপর নির্ভর করিলে, রাম প্রসাদকে সেন বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; তাই রসিক বাবু আজুগোঁসাইর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। যে যুক্তি মূলে তিনি গোঁসাইকে কাল্পনিক বলিয়া প্রতি-পন্ন করিতে চাহেন, তাহা অতীব অকর্ম্মণ্য।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা আমা-দের বক্তব্য ছিল। প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং এই খানেই উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। রামপ্রসাদের বাসস্থান সম্ব-ন্ধেও রসিক বাবু গোলমাল করিয়াছেন। দয়াল বাবু হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে যাইয়া, স্বচক্ষে রামপ্রসাদের বাড়ীর স্থান এবং পঞ্চমুণ্ডী সাধনবেদী প্রত্যক্ষ করিয়া-ছেন। রসিক বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া, রামপ্রসাদের অন্য একটী বাসস্থান বা অপর একটী বংশ সাব্যস্ত করিয়া যদি এই সকল কথা বলিতেন, তবে তাঁহার কথার অনেকটা জোর ধরিত। তাহা সাব্যস্ত করিতে না পারা পর্য্যন্ত, আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সং-গৃহীত বিবরণ অবিশ্বাস করিয়া, রসিক বাবুর মতে সায় দিতে পারিতেছি না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

* সাধক সঙ্গীত দ্রষ্টব্য।

* প্রসাদ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা। (২)

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মের এইরূপ উন্নত আদর্শ লাভ করিতে হইলে সাধকের বিশেষ প্রয়োজন কি। এরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে বিশেষ সাধন অবলম্বনের প্রয়োজন, এবং বহুকালাবধি সাধন ভজন করিয়াও যে অনেকের ভাগ্যেই এরূপ অবস্থা লাভ হয় না, তাহা না বলিলেও চলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন পরম ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সৎ জন্ম, সৎ শিক্ষা, সৎ সঙ্গ ও সৎ সাধন এই কয়েকটী অবস্থা যাঁহার জীবনে ঘটে, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য?" এই হিসাবে আমাদের অনেকের পক্ষেই ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা লাভ করিবার পথে অনেক বিঘ্ন বাধা রহিয়াছে। কিন্তু সেজন্য সাধনে নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হউক আর না হউক, সাধন না করিলে প্রত্যবায় আছে। সাধনশীলতায় মনুষ্যত্ব, সাধনবিহীনতায় মনুষ্যত্বের অভাব। সুতরাং সাধন করা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে উদার হইতে হইবে। ধর্ম্মলাভের পক্ষে যদি কোন বিশেষ ভাব, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে, তবে, তাহা সম্পূর্ণ উদারভাব, সম্পূর্ণ উদার প্রণালী।

যেমন বীজের পরিণতি বৃক্ষে, তেমনি ধর্ম্মসাধন-প্রণালীর পরিণতি ধর্ম্মজীবনে। আম্রবৃক্ষের বীজ হইতে যেমন বট বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না, সংকীর্ণ, বদ্ধ ও অজ্ঞানতামূলক প্রণালী হইতেও তেমনি উদার, মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের প্রকাশ হইতে পারে না। এই উদার প্রণালীর কার্য্য কি? এই প্রশ্নের মীমাংসায় এখন প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। বহুত্বে একত্ব স্থাপন করাই এই প্রণালীর কার্য্য। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে একীকরণ করিতেছেন, সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যাত্মজগতে বহুরূপের মধ্যে একরূপ, বহুধর্ম্মে, ধর্ম্মের প্রাণ চৈতন্যস্বরূপকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ মনুষ্যজীবন সফল করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

"সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

"যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আমাকে একই জানিয়া ভজনা করেন, তিনি জ্ঞানী হইয়া সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাতেই অবস্থিতি করেন।" ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় আর ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন হরি, কালী, রাম, কৃষ্ণ, সগুণ নির্গুণের বিবাদ বিসম্বাদ লোপ নিশ্চয়ই পাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আর এক স্থলে বলিতেছেন :—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি॥"

"যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র এবং সকল বস্তুকে আমাতে দেখেন, তাঁহার নিকট আমি অদৃশ্য থাকি না এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য থাকেন না।" ব্রহ্মযোগের অবস্থায় এই অবস্থা ঘনীভূত হয় এবং তখনই তত্ত্বজ্ঞানী সম্পূর্ণরূপে সমদর্শী হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥"

"যিনি যোগ দ্বারা সমাহিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী তিনি সমস্ত ভূতে আপনাকে এবং ভূত সকলকে আপনাতে দৃষ্টি করেন।" কিন্তু এ অবস্থা লাভ করা কথার কথা নয়। এ অবস্থা যাহার লাভ হইয়াছে, তিনি সমস্ত জড় ও চেতনের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অনুভব করেন; পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, নাস্তিক আস্তিক, জুলু ইংরাজ, হিন্দু ম্লেচ্ছ সকলেরই ভিতরে তিনি ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি, ধর্ম্মের প্রকৃত-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াও তাঁহার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, সুন্দর শ্যামল পত্রবিশিষ্ট কুসুমিত বৃক্ষের শোভায় মোহিত হইয়া, বৃক্ষেতে সেই পূর্ণ সুন্দরের জীবন্ত স্বরূপ সন্দর্শন করিয়াও তিনি তদ্রূপ ভাবাবেশে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। দলাদলি তাঁহার ত্রিসীমায় পৌছিতে পারে না, মতামতের দ্বন্দ্ব নিগ্রহ তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের তরে বিদায় গ্রহণ করে।

সম্প্রদায় বিশেষের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এই অবস্থা লাভ করিতে হয় বটে, কিন্তু এ অবস্থা লাভ হইলে আর তাঁহার সাম্প্রদায়িকত্ব থাকে না, তিনি কোন নিয়মে, আচারে ও প্রণালীতে বদ্ধ থাকেন না। তখন সকল দেশ, সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার আপনার হইয়া যায়, তিনি কায়মনোবাক্যে সকলেরই শুভকামনা করিয়া থাকেন। তিনি তখন যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই প্রকৃতির অব্যক্ত শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, সাধু অসাধু সকলের মুখেই সেই প্রেমস্বরূপের প্রেম মুখ দর্শন করিয়া আত্মহারা হন। সকলেরই সহিত তিনি আত্মার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করেন। তাঁহার নিকট সমস্তই পবিত্র ও মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী এমারসন্ বলিতেছেন;—

"To the poet, to the philosopher, to the saint, all things are friendly and sacred, all events profitable, all days holy, all men divine".

বাস্তবিকও কবি, তত্ত্বজ্ঞানী ও ভক্তের নিকট সমস্ত পদার্থই পবিত্র ও অনুকূল, সকল ঘটনাই মঙ্গলজনক, সকল দিনই পবিত্র এবং সকল মানুষই দেব-ভাবাপন্ন। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মহাজনেরাও অধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। পুণ্যের প্রতি অনুরাগ এবং পাপের প্রতি অরুচি প্রকাশ করা, ন্যায়ের প্রশ্রয় দান ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাঁহাদেরও পক্ষে স্বাভাবিক। তবে পাপের প্রতি ঘৃণা থাকিলেও পাপীকে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রেম আলিঙ্গন দিয়া থাকেন এবং সকল ঘটনায়ই ভগবানের হস্ত সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করেন। সে যাহা হউক, এখন গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, সমদর্শনই এইরূপ উন্নত অবস্থার আদি, মধ্য এবং অন্ত। সমদর্শন লাভ করা যে সাধন প্রণালীর লক্ষ্য নহে, তাহা অবলম্বন করিয়া লোকের কখনও এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ হইতে পারে এ বিশ্বাস আমার নাই।

প্রস্তাবের আদ্যাংশে অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মশক্তি নানা আকারে কখনও অস্ফুট কখনও বা ব্যক্তভাবে মানব হৃদয়ে ও ধর্ম্মজগতে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহারই ফলে কোন জাতির মধ্যে কখনও জড়োপাসনা, কখনও নরোপাসনা, কখনও বা ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান

করিতেছে। ধর্ম্মের এইরূপ ক্রমোন্নতি অস্বীকার করিলে ধর্ম্ম জগতের ইতিবৃত্তও অস্বীকার করিতে হয়।

অতএব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, অজ্ঞানতামূলক পৌত্তলিকতা বা জড়োপাসনার মধ্যেও যেখানেই সাধক প্রেম, ভক্তি ও নিষ্ঠা দ্বারা আপনার সর্ব্বস্ব সেই অব্যক্তের চরণে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার নিকট পূর্ণব্রহ্ম শক্তির স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে—সেখানেই অপূর্ণের মধ্য দিয়া সেই পূর্ণ পুরুষেরই উপলব্ধি হইয়াছে। একেশ্বরবাদিগণ পৌত্তলিক বলিয়া যাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করেন, বাস্তবিকও কি তাঁহারা অবজ্ঞার পাত্র?

পৌত্তলিকগণ মূর্ত্তিতে কিম্বা কোন সৃষ্ট পদার্থে যে ইষ্ট দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করেন, একেশ্বরবাদিগণ সেই ইষ্টদেবকেই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে প্রয়াস পান। সেই অনন্ত, অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয় পুরুষকে কোন কেন্দ্রে স্থাপন না করিয়া কেহই তাঁহার ধারণা করিতে পারেন না।

মানবাত্মা অনন্তের স্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি দ্বারা আবৃত, সুতরাং পরিমিত। অতএব যাঁহারা সেই অনন্তকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহারাও সেই অপরিমেয়কেই পরিমিত আত্মায়, অতীন্দ্রিয় প্রেম স্বরূপকেই ক্ষুদ্র চিত্তে, নির্ম্মল নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ পুরুষকেই মলিন মনে স্থাপন করিয়া, মন, বুদ্ধি, কল্পনা এবং ভাব দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। তবে কেহ বা ভিতরে, আর কেহ বা বাহিরে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করেন, এই মাত্র প্রভেদ। আর একটি কথা। পূজার প্রকৃত উপকরণ প্রেম, ভক্তি ও নিষ্ঠা সান্তকে আশ্রয় না করিয়া ব্যক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই ঈশ্বরের চরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ইত্যাদি ভাব ভক্তের মনে স্বভাবতঃই উদয় হইয়া থাকে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্ঞান ও প্রীতির যোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারেন, সেই প্রাণের প্রাণকে প্রাণে বসাইয়া সোহাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ও ধন্য পুরুষ। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা সম্ভব হয় না। চিরাগত সংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া যাঁহারা আপনার ভিতরে উপাস্য দেবতার পরিচয় পান, তাঁহারই সৌভাগ্যবান, তাঁহারাই উচ্চ অধিকারী, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অধিকার ভেদ অস্বীকার করা যায় না। এবং অধিকার ভেদ স্বীকার করিলেই নিরর্থক, অপ্রীতিকর সাকারনিরাকারের বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়। যখন সেই পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণপ্রেম অপূর্ণ মানবাত্মায়, ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ে কখনও পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও ধৃত হইতে পারে না, তখন তাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করা, ঘৃণা বিদ্বেষ করা জ্ঞানীর কার্য্য নয়। নিকৃষ্ট প্রণালীর সম্মুখে শ্রেষ্ঠ প্রণালী ধরিয়া, অজ্ঞানীকে জ্ঞানের কৌশলে ফেলিয়া শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের আভাস প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এক মুহূর্ত্তের আচরণের দ্বারা মানব হৃদয়ের যে পরিবর্ত্তন সাধন করাযায়, শত বৎসরের যুক্তিতর্ক, বিবাদ বিসম্বাদ, ঘৃণা বিদ্বেষের দ্বারা তাহার শতাংশের একাং-

শেরও পরিবর্ত্তন ঘটেনা। অবজ্ঞায় মানুষের অন্ধতা, গোঁড়ামী আরও বর্দ্ধিত হয়, অপ্রেমে মানুষ স্বাভাবতঃই বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া সত্যকে জানিতে ও বুঝিতে প্রস্তুত হয় না। ঈশ্বর আত্মাতে, মূর্ত্তিতে, জড়ে, চেতনে সর্ব্ব ঘটেই অধিষ্ঠান করিতেছেন, এ জ্ঞানের উদয় হইলে আর পৌত্তলিককে অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া মনে হইতে পারেনা, ঈশ্বরকে মূর্ত্তি হইতে,মূর্ত্তি পূজকদিগের অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া আপনার আত্মার অধিকারভুক্ত করা যায় না। যিনি অবিভাজ্য, তাঁহাকে লইয়া আবার ভাগাভাগী কেন? প্রাণ খুলিয়া, সাম্প্রদায়িক মতের রজ্জু ছিন্ন করিয়া একবার পৌত্তলিকের দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখি,তাঁহার প্রেম ভক্তি ও নিষ্ঠার মূলে ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাও কি না? চিরকাল মূর্ত্তি-পূজক হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য কেহই পৃথিবীতে আগমন করেনা।

"ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে।" (ব্রাহ্মধর্ম্ম)

রোগী যেমন কুপথ্য করিয়া চিররুগ্ন হইয়া থাকিতে চায়, মূর্ত্তিপূজকও তেমনি মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে সৎগুরুর সাহায্য, শাস্ত্রালোচনা, সাধুসেবা, লোকহিতব্রত, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং শ্রবণ কীর্ত্তন, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি অবলম্বন নাকরিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে অজ্ঞানতার তিমিরে নিমজ্জিত থাকে। মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে, অধিক কিছু না হউক, শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ অন্ততঃ এই চারিটী উপায় অবলম্বিত হইলেও তাহা হইতে শুভফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরলোকগত রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয়ে ইদানীং অনেকেই অবগত আছেন। নিরক্ষর কালীপূজক রামকৃষ্ণ সৎগুরু, সৎসাধন ও সৎসঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের কিরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত দুই চারিটী তত্ত্বকথা পাঠকরিলেই সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মে। রামকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ—

"গ্যাসের আলো নানা স্থানে,নানাভাবে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদায়ই ভিতরে ভিতরে এক আধার হইতে আসিতেছে। সেইরূপ নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল ধর্ম্মালোক সেই এক পরমেশ্বর হইতেই আসিতেছে।"

আর এক স্থলে বলিতেছেন:—

"যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও,তবে মায়ারূপ পানাকে হৃদয় পুকুর হইতে উঠাইয়া ফেল।"

রামকৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন হইল,—"মুক্তি হবে কবে?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"আমি যাবে যবে।" তাঁহার মতে মনুষ্যের ভিতর দুইটা "আমি"কার্য্যকরে,একটা কাচা 'আমি' অপরটা পাকা 'আমি'।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেনের কথা বঙ্গদেশে কে না জানে? রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গয়া গঙ্গা কাশী॥"

দেঁতো ব্যক্তি না হাসিলেও যেমন তাহার দন্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে; তদ্রূপ মনুষ্য ব্রহ্মনিরূপণ করিতে পারুক আর না পারুক, তিনি স্বতঃই প্রকাশিত রহিয়াছেন। কি গভীর তত্ত্বদর্শন! পৌত্তলিক রামপ্রসাদের স্বরচিত বহুসংখ্যক গীতের মধ্যে একটী গীতের এক পংক্তিতে যে গভীর ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়,অনেকের ব্রহ্ম বিষয়ক বহু প্রস্তাব পাঠ করিয়াও তাহা লাভ করা যায় না। এইরূপ আরও আরও সাধু পুরুষের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,

পৌত্তলিকতা হইতে কি উপায়ে তাঁহারা চরমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী এই উভয় দলেরই সাধারণ সম্পত্তি; কেবল তাহা নয়, ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই সম্পত্তি। ঘোর নাস্তিকও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত নহে। এরূপ লোক অল্পই দেখিয়াছি, যাহার হৃদয়ে কোন না কোনরূপ বিশ্বাস বিদ্যমান নাই। কেহ ঈশ্বরে, কেহ শক্তিতে, কেহ ইতিহাসে, কেহ পৌরুষে, কেহ অদৃষ্টে, কেহ কর্ম্মে, কেহ সাধনাবলে, কেহ আত্মসুখে, কেহবা আত্মবিসর্জ্জনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তুমি জ্ঞানী, ধর্ম্মবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছ, তোমার বিচারানুসারে তুমি ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পার। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে ইহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; তত্ত্বজ্ঞানী জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের অঞ্জনে ইহাদের প্রত্যেকের অন্তরস্থ সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দর্শন করিয়া প্রত্যেকের চরণে প্রণিপাত করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত ষ্টপফোর্ডব্রুক মহাশয় তাঁহার *Theology in the English Poets* নামক গ্রন্থের এক স্থলে কবিবর শেলীর বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"Shelly, when the fire of emotion or imagination was burning in him, is very different from the violent denier of God and of Christianity whom we meet in his daily intercourse with men. He does carry his atheism and hatred of religion into his verse, but these are the least unconscious portions of his poetry. When he is floating on his wings, he knows not whither, his atheism becomes pantheism, and his hatred of Christianity is lost in enthusiastic but unconscious statement of Christian conceptions."

ইহার মর্ম্ম এই যে, দৈনন্দিন জীবনে লোকের সহিত বাদপ্রতিবাদের সময়ে যিনি তীব্রভাবে ঈশ্বর ও খ্রীষ্টধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মদ্রোহী শেলী কল্পনার উদ্দীপন সময়েও ভাবাবেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার কবিতায় অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার গন্ধ না আছে তাহা নয়, কিন্তু তাহা তাঁহার কবিতার অতিশয় অব্যক্ত অংশ মাত্র। কল্পনা-পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন,—অনন্তে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার অবিশ্বাস অদ্বৈতভাবে পরিণত হইত, তাঁহার খ্রীষ্টদ্রোহ অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্টীয়ভাবে বিলীন হইত।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আস্তিক নাস্তিক, নিরাকারবাদী ও পৌত্তলিক, সকলের অন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, সকলেই ব্রহ্মোপাসক, এবং তত্ত্ববিচার, আত্মপরীক্ষা, সৎকর্ম্ম এবং সৎসঙ্গ অবলম্বিত হইলে সকলের অন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া সমদর্শী না হইতে পারিলে, সকল ধর্ম্ম ও সমস্ত নরনারী হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না, সর্ব্বঘটে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয় না। যতদিন শিক্ষাগত, স্বদেশানুরাগমূলক, সাম্প্রদায়িক গৌরব-জনিত, রাজনৈতিক দ্বেষজনিত, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসংস্কারমূলক একদেশদর্শিতা থাকে, ততদিন কোন লোকের পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মের বাহ্যাবরণ সকল ভেদ করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরস্থ তত্ত্ব সকল দর্শন করা সম্ভবপর নহে। সমদর্শনের গুণ এই যে, তাহা লাভ হইলে মানুষের দৃষ্টি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ভেদ করিয়া অন্তরঙ্গে প্রবিষ্ট হয়, আচার বিচার, পূজা অর্চ্চনা, সাধন ভজনের আবরণ ভেদ করিয়া প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সূক্ষ্ম রাজ্যে উপস্থিত হয়। তুমি আমি যেখানে বাহির দেখিয়াই

বীতশ্রদ্ধ ও অপসারিত হই, সমদর্শী সেখানে অন্তর দেখিয়া তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকেন। তুমি আমি, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে সত্যের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন ভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া অনুদার,সাম্প্রদায়িক, মলিন ও গোঁড়া হইয়া নিতান্ত কূপাপাত্রের ন্যায় জীবন ধারণ করি; সমদর্শী মুক্ত ও বদ্ধভাব মিশ্রিত, মানবীয় ও ঐশ্বরিক ভাবযুক্ত জাতি সকলের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক প্রাণ দর্শন, এক জ্ঞান মনন, এক সুর ও এক তান শ্রবণ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠেন, "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ধর্ম্মের এইরূপ উদারভাবের কথা এদেশে নূতন নহে। বহুকাল পূর্ব্বে গীতাকার এদেশে এই উদার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন, বিশ্বজনীন ভাবের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। সেই পুরাকালে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্র ভিন্ন এবং অন্যত্র এইরূপ বিশ্বজনীন ভাবের জন্ম সম্ভব হইত কি না,কে বলিতে পারে? আর্য্য ঋষিগণ ভিন্ন সেই অনৈতিহাসিক যুগে আর কোন্ দেশীয় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই বা এইরূপ বিশাল ভাব ধারণা করিবার যোগ্য হইতেন? অর্জ্জুন স্তব করিতেছেন:—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাং স্তথা ভূতবিশেষ সংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশ কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চদিব্যান্॥

হে দেব,তোমার দেহে,সমস্ত দেবতা,জরায়ুজাদি ভূতসমূহ, দেবাদিপতি কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, সমস্ত দিব্য ঋষি ও উরগগণকে দেখিতেছি।

"অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপং
নান্তং নমধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

আমি তোমার অনেক বাহু,উদর, মুখ ও চক্ষুযুক্ত অনন্তরূপ সর্ব্বত্র দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! আমি তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতেছি না।

গীতার জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের প্রণালীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রণালী অল্পই আছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

যেতুহসর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়িসংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যা বেশিত চেতসাং॥

"কিন্তু যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করত অনন্যভক্তি যোগে আমাকে উপাসনা করে, সেই সকল মদর্পিত ব্যক্তিকে আমি অচিরাৎ এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।"

গীতাকার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম,এই তিনেরই যথাযথ স্থান দিয়াছেন, তিনেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের ভিতরে যে একটা অবিচ্ছেদ্য অন্তর্গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহাও গীতাকার অতি বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত একে অন্যের হাত ধরিয়া মুক্তিরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন, কাহারও সঙ্গে কাহারও বিবাদ নাই,কাহারও প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা নাই। কেবল অশ্রদ্ধা নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না,একের প্রতি অন্যের গভীর শ্রদ্ধা আছে বলাই সঙ্গত।

গীতাকার কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের, এবং জ্ঞানের দ্বারা প্রেমের এবং প্রেমের দ্বারা নিষ্কাম সেবার উৎকর্ষ সাধন করিয়া ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উদার ধর্ম্মপ্রণালীতে

ধর্ম্মের বহুরূপ,বহুভাব এবং বহু আচার স্থান পাইয়াছে, এক ধর্ম্মরূপ ভাগীরথী বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া বিশাল সাগর-বক্ষে একাকার হইয়াছে। যে প্রণালীতে একের বহুত্ব দেখাইয়া, বহুত্বকে একে পরিণত করিতে পারে, সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, সেই ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

গীতাকারের বহুশতাব্দী পরে দীল্লীশ্বর আকবর এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে, সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলমান স্থফী,পার্শি ও য়িহুদী,খ্রীষ্টান ও স্বাধীন চিন্তাবাদী নাস্তিকাগ্রগণ্য ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে তত্ত্বালোচনার জন্য সমবেত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল; প্রতি শুক্রবার রাত্রে দিল্লীশ্বর এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া ভারতের তৎকালীন রাজধানীতে বসিয়া তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে কখনও কখনও রজনী প্রভাত হইত। তাঁহারই উদ্যোগে ও সাহায্যে ফৈজী নামক তাঁহার জনৈক সভাসদ্ হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং গণিতশাস্ত্র সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহারই সাহায্যে রাজসভা হইতে বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের অনুবাদ হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত সভ্যজগতেই ধর্ম্মের এক নবযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বকবি সেক্ষপীর এই যুগে ইংলণ্ডে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র মানবজাতির সহিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানবাত্মার অভিন্ন যোগের তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

আকবরের প্রায় তিন শত বৎসর পরে জ্ঞানীর শিরোমণি, ভারতের বর্ত্তমান শতাব্দীর নেতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র সকল রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া,এবং আপনার স্বাভাবিক উদারতা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব দর্শনের ক্ষমতা বলে,ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার এই সুবিশাল ভাবের প্রকাশ মাত্র। ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সার্ব্বভৌমিক কিনা, ইদানীং ব্রাহ্মসমাজ ইহার প্রবর্ত্তকের প্রদর্শিত উদার পথে চলিতেছেন কিনা, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয়ে যে এই যুগে এই উদার ধর্ম্মভাব সর্ব্বাগ্রে স্থান পাইয়াছিল,এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। বর্ত্তমান সময়ে মোক্ষমূলার প্রভৃতিই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও এবিষয়ে রামমোহন রায়কে গুরু বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারাও এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রকাশ দর্শন করিবার জন্য আশান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

সমস্ত জ্ঞান-জগতের দৃষ্টি এই দিকেই নিপতিত রহিয়াছে, সার্ব্বভৌমিক ভাবই বর্ত্তমান যুগের প্রধান ভাব। (Spirit of the age) সিকাগো নগরের বিগত বিরাট ধর্ম্মসভা, বিগত মাঘ মাসে প্রয়াগক্ষেত্রে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, এ সমস্তই এই ভাবের লক্ষণ (Expression) বলিয়া প্রতীতি জন্মে। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত আপন আপন অধিকার ও প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মানুগত হইয়া একে অন্যের সহায় হইবেন, ইহাই বর্ত্তমান যুগের আদেশ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক সকলেই পবিত্র পথে থাকিয়া জাতীয়

প্রণালীতে ধর্ম্মসাধন,জাতীয় ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ইহাই সকল দেশীয় জ্ঞানীগণের ভূয়োদর্শনের ফল। এ ধর্ম্মের বিস্তৃতি ও গভীরতা আছে, অপসৃতি ও লঘুতা নাই। ইহার জাতীয়তা আছে,কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা নাই; ইহার বিবেক আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নাই; ইহার শাস্ত্র আছে, কিন্তু অশাস্ত্রীয়তা নাই, ইহার গুরু আছে,কিন্তু অসৎ গুরু নাই। এই সার্ব্বভৌমিক গভীর মুক্তিপ্রদ, জ্ঞান-ভক্তি নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রতিপাদক ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ হইয়া জীবের মোহান্ধকার দূর করুক, ইহার সুশীতল ছায়াতে বসিয়া নরনারী অক্ষয় শান্তি লাভ করুক!

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।

মহর্ষি গৌতমের আত্মা।

একদা শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, দার্শনিকমতে আত্মতত্ত্ব জানিতে আমার বিশেষ কৌতুহল হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

গুরু বলিলেন, আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিক মত এক প্রকার নহে; অতএব ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ,ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেতি অপরে, মন ইত্যন্যে, বিজ্ঞান মাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে, শূন্যমিত্যপরে, অস্তি দেহাদি ব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে, ভোক্তৈব কেবলম্ নকর্ত্তেত্যেকে, অস্তি দেহাদি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ, আত্মা সভোক্তু্রিত্যপরে,এবং বহবো বিপ্রতিপন্না, যুক্তিবাক্যতদাভাস সমাশ্রয়াঃ সন্তঃ তত্রাবিচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেতানর্থঞ্চেয়াৎ"। শারীরক ভাষ্য, ১মঃ অঃ।

"প্রাকৃত অর্থাৎ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি ও নাস্তিকগণ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা মনে করে। কোনও মতে ইন্দ্রিয়গণই চৈতন্যবান্ আত্মা; কোনও মতে মনই আত্মা; কোনও মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা, আবার কোনও মতে শূন্যই আত্মাপদবাচ্য। কোনও সম্প্রদায় বলেন, দেহাদি ব্যতিরিক্ত জন্ম মৃত্যু প্রবাহের অধীন আত্মা আছেন, তিনিই কর্ত্তা ও ভোক্তা। কেহবা বলেন, আত্মা কেবল ভোক্তাই, কর্ত্তা নহেন। অন্যে আবার ভোক্তার অতিরিক্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। আর কেহ বলেন, আত্মা ভোক্তার স্বরূপ। লোকে এই প্রকার যুক্তিবাক্য বা যুক্তি বাক্যাভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের সমর্থন করিয়া থাকেন। অতএব বিবেচনা না করিয়া যে সে মতের অনুসরণ করিলে মুক্তিলাভ হয় না, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।"

অতএব তুমি কোন্ মত শুনিতে চাও?

শিষ্য। আপনি সংক্ষেপে যে সকল মতের উল্লেখ করিলেন, তাহাদের মধ্যে কোনও কোনওটি আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অতএব একটু বিস্তার করিয়া উপদেশ দিন্,পশ্চাৎ আমার যেমত শুনিতে ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করিব। ভাল,নাস্তিকগণ যে দেহকে আত্মা বলেন,তাহার কি কোনও যুক্তি আছে?

গুরু। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যুক্তি অবশ্যই আছে। নাস্তিক বা চার্ব্বাক-মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু, এই চারিটি মাত্র ভূত পদার্থ। এই মতে আকাশ ভূত মধ্যে পরিগণিত নহে। এই চতুষ্টয় ভূতই দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। কারণ,ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর উৎপত্তি বিরুদ্ধ নহে। কিণ্ব বা সুরাবীজ দ্রব্যান্তর সংযোগে মাদক দ্রব্যের উৎপাদন করে। গন্ধক ও পারদ অগ্নিতাপে

সংযুক্ত হইয়া লোহিতবর্ণ হিঙ্গুলে পরিণত হয়। এই প্রকার নির্জীব বস্তু হইতে সজীব ও সচেতন বস্তুর উৎপত্তিও শাস্ত্রসিদ্ধ। মক্ষিকার বিষ্ঠা হইতে সজীব পুদিনা শাকের উৎপত্তি হয়। গোময় হইতেও বৃশ্চিকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব ভূতচতুষ্টয় দেহাকারে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার কোনও মতে বিচিত্র নহে। এই মতে চৈতন্য দেহেরই ধর্ম্ম বিশেষ। ইহারই নাম দেহাত্মবাদ বা ভূতাত্মবাদ।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়াত্মবাদ কাহাকে বলে?

গুরু। ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ, চার্ব্বাকেরই অবান্তর সম্প্রদায়ান্তর্গত। ইহারা দেহের চৈতন্য স্বীকার না করিয়া, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহেরই চৈতন্য স্বীকার করিয়া থাকে, এইমাত্র বিশেষ। তাঁহারা বলেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিলেই, দর্শন শ্রবণ, আঘ্রাণ রসন ও স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের অভাবে, ঐ সকল জ্ঞানেরও অভাব হয়। জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাবের নামই মৃত্যু। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। তবে যে ইন্দ্রিয় বিশেষের অভাব হইলেও উক্ত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে; তাহা কেবল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ, সেই একই দেহে অবস্থিত আছে বলিয়া। নহিলে স্মরণের উপপত্তি কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারেনা। এই সকল ইন্দ্রিয় এক পরিবারস্থ জনগণের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে বিষয় ভোগ করে বলিয়া যুগপৎ একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ইহারই নাম ইন্দ্রিয়াত্মবাদ।

শিষ্য। মন আত্মবাদ কি প্রকার এবং ইহা কোন্ সম্প্রদায়ের মত?

গুরু। যাঁহারা মনকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও চার্ব্বাক সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্গত। ইহারা বলেন, স্বপ্নাবস্থায় সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অভাব হইলেও মনের ব্যাপার বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, চৈতন্যের সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব মনই চৈতন্যবান্ ও আত্মা পদবাচ্য।

মন, পর্য্যায়ক্রমে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত যুগপৎ একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মনোযোগ না হইলে, চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তী অতি বৃহৎ পর্ব্বত প্রভৃতিও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইন্দ্রিয় বিশেষের বিনাশ হইলেও মন বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, বিনষ্ট ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে। অন্যথা এক দেহে অবস্থিত থাকাতে যদি এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের স্মরণ করা সম্ভব হয়, তবে এক গৃহে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের পরস্পরের অনুভূত বস্তুর স্মরণ না হইবার কারণ কি? অতএব মনই চৈতন্যবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারই নাম মন আত্মবাদ।

শিষ্য। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ কি প্রকার? এবং এই মত কোন্ সম্প্রদায় মানিয়া থাকেন?

গুরু। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যোগাচার বৌদ্ধগণের মত। এই মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। নিখিল জগৎ, বিজ্ঞান প্রবাহময়। ইহার অপর নাম আলয় বিজ্ঞান বা প্রত্যয়। বিজ্ঞান মিথ্যা নহে; তবে কি না ক্ষণিক অর্থাৎ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। দীপ-শিখা উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন হইয়াও যেমন স্থিরজ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার, এই বিজ্ঞানও প্রতিনিয়ত ধ্বংসোৎপত্তির অধীন হইয়াও স্থায়ী বলিয়া

অনুভূত হয়। ফলতঃ এই আলয়বিজ্ঞানই নিখিল জগৎ রূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই বিজ্ঞান প্রবাহের কোনও অধিষ্ঠান বা আধার আছে বলিয়া বোধ হয় না, অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। ইহারই নাম ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ।

এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের আবার অন্য বিবিধ অবান্তর ভেদ আছে। অনুমেয় বাহ্য-বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাহ্য বস্তুবাদ। অনুমেয় বাহ্য-বস্তুবাদিগণ বলেন, আলয় বিজ্ঞান প্রবাহের উপলব্ধি অন্তরে হয় সত্য, কিন্তু তাহার আলম্বন অধিষ্ঠান অবশ্যই বাহিরে আছে। সুতরাং বিজ্ঞান প্রবাহের সত্তাও বলিতে হইবে। নিরালম্ব প্রত্যয় যুক্তি-বিরুদ্ধ। অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞানের আলম্বন, অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে।

আর প্রত্যক্ষ বাহ্য বস্তুবাদিগণের মতে বিজ্ঞানের আলম্বন বাহিরের বস্তুও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আলয়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জন্মে ও সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। সর্ব্বশূন্যবাদ কাহাকে বলে?

গুরু। সর্ব্বশূন্যবাদ মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। এই মতে সবই শূন্য, কোনও সত্য বস্তু নাই। কারণ সুষুপ্তিকালে কোনও জ্ঞান থাকে না, জাগ্রদবস্থায় অকস্মাৎ অহং অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানের উদয় দেখা যায়। অতএব অহংধী অসদাবলম্বনা অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞানের মূলে অভাব বা শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। অহংধী যদি অভাব হইতে উৎপন্ন হইল, তবে অহং জ্ঞান প্রসূত জগৎই বা কেন অভাব সম্ভূত না হইবে। আর জগৎ যদি অভাবময় হইল, তবে বলিতে হয়, সবই শূন্য; শূন্য বৈ আর কিছুই নাই। ইহারই নাম সর্ব্বশূন্যবাদ।

শিষ্য। শারীরক ভাষ্যে যে আরও চারিটি মতের উল্লেখ আছে; এই মতগুলি কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের অনুমত?

গুরু। এইগুলি যথাক্রমে ন্যায়, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল ও অদ্বৈত বাদের মত। এক্ষণে তুমি কোন্ মত শুনিতে ইচ্ছা কর?

শিষ্য। ন্যায়সূত্র-প্রণেতা ভগবান অক্ষপাদ কি প্রকার দেহাদি ব্যতিরিক্ত নিত্য পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই আমাকে বিস্তারিত ভাবে উপদেশ দিন্।

ক্রমশঃ।

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ-সরস্বতী।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

কিছু দিনাবধি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। অনেকের ধারণা যে, হিন্দুধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম আমরা বিগত সহস্র বর্ষ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছি, পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, হিন্দু সাধারণের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সে কালের সাধারণ লোকের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগরের অভ্যন্তরে কি নিহিত আছে, তাহার জ্ঞান বড়ই বিরল ছিল। সে জ্ঞান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরাপর লোক কতকগুলি চিরাগত সামাজিক আচার পদ্ধতি রক্ষা করিয়া ও পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতেন। চতুর্দ্দিক এক প্রকার তমসাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ ও ধর্ম্ম পালন সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়।

এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইল, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র দেখা দিল, সমাজ মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব নবীন শক্তি উদ্রিক্ত হইল। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় কৃপাণধারী হইয়া তথনকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম নিপাতনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। মহা আন্দোলন উঠিল। সমাজ কম্পিত হইল। হিন্দুগণের বহুকাল-সঞ্চিত অবসাদ ভঙ্গ হইল। জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইল, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূত্রপাত এই।

ক্রমে ইংরাজী চর্চ্চায় হিন্দু যুবকগণের মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাঁহারা দেশীয় আচার পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ,ধর্ম্মে আস্থাহীন ও বিলাতীভাব প্রণোদিত হইয়া যথেচ্ছা-চারী হইয়া উঠিলেন। খ্রীষ্টান মিসনরিগণের শুভযোগ উপস্থিত হইল—তাঁহারা হিন্দু যুবক-গণকে অল্প আয়াসেই স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এ সময়ে রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা হিন্দু সমাজের অনেক উপ-কারও সাধিত হইয়াছিল। মুদ্রা যন্ত্রের প্রভাবে এবং ধারাবাহিক জ্ঞান চর্চ্চাবশতঃ কিছু-দিনে প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থ সকল অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমে হিন্দু সাধারণ সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অনু-ভব করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে,হিন্দুধর্ম্মে এমন অনেক অমূল্য সত্য নিহিত আছে, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-সভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, সাময়িক পত্রে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ পাদ্রি-গণের অনুকরণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিলাতি কায়দা অনুসারে "গুরুগম্ভীর" নাদে হিন্দুধর্ম্মের মহিমাব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়া সাধা-রণের ধর্ম্মপিপাসা ও স্বীয়২ অর্থপিপাসা পরি-তৃপ্ত করিতে লাগিলেন,—বালকগণ গীতা পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। ইহা-কেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলা হইতেছে।

এদেশে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রকাশবশতঃ এবং বিলাতি সংস্কৃত চর্চ্চার প্রভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের মহিমা দেশ দেশান্তরেও বিঘোষিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মকে এখন বিলাতের লোকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম যে কেবল "পুতুল" পূজা মাত্র, এখন আর বিলাতের পণ্ডিতগণ তাহা বলিতে সাহস করেন না,—এমন কি, ভূতিভোগী পাদ্রিগণও আর সেরূপ ভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতে সাহস করেন না, যেরূপ ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে করিতেন। ইহা হিন্দু সাধারণের বিশেষ আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল গৌরব ঘোষণা করিলেই ধর্ম্ম পালন করা হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,বাস্তবিকই হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধিত হইতেছে,না যাহাকে পুনরুত্থান বলা হইতেছে,তাহা কেবল স্বজাতি-বৎসলতা মূলক আন্দোলন মাত্র! কথাটি নি-তান্তই গুরুতর এবং এ প্রস্তাবে তাহার মী-মাংসা করাও অসম্ভব। সাধারণের বিবেচনার জন্য আমরা এসম্বন্ধে গুটিকতক আবশ্যকীয় কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কিরূপে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে,তাহার আভাষ উপরে দেওয়া হইল। সত্যের অনুরোধে ইহা

স্বীকার করিতে হইবে যে, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর,ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও মুদ্রা যন্ত্রের প্রভাব বশতঃ যে সকল নূতন শক্তি সমাজ মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আন্দোলন তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি লোক উদ্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা কথায় কথায় বেদব্যাস ও যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিয়া থাকেন এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের নামে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান,তাঁহাদের মতে যাহা কিছু বিলাতী, সমস্তই দোষাবহ, যাহা কিছু দেশী সমস্তই উত্তম। তাঁহারা বলেন,বিশ্ববিদ্যালয় (University) "বিষবৃক্ষ", ইরাজি ভাষা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহা দেশহিতৈষিতার বিকার। সাধারণের মধ্যে যে জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে,বিগত ৫০বৎসরের মধ্যে আমাদের মাতৃ ভাষার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আমাদের সংবাদ পত্র, পুস্তকাবলী, শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদাদি এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় আন্দোলন, সমস্তই মুখ্য বা পরোক্ষ ভাবে ইংরাজী চর্চ্চার ফল স্বরূপ। ইংরাজী পরিহার করিলে আমাদের ভাবী উন্নতির পথ কণ্টকাকুল হইবে। কিন্তু আমরা ধর্ম্ম ও নীতি-নিরপেক্ষ ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী নহি,ধর্ম্ম ও নৈতিক ভাবের অভাব বশতঃ যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হয়, ইংরাজী ভাষা তাহার জন্য অপরাধী হইতে পারে না। আমরা যদি সন্তানগণের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারি, তবে আমরা স্বয়ং অপরাধী, বিশ্ববিদ্যালয় বা ইংরাজি ভাষা নহে।

যথার্থই কি হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে? বিগত সহস্র বৎসরাবধি আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্মরূপে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সত্য সত্যই কি সেই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে? আমাদের বিশ্বাস যে ঠিক তাহা হইতেছে না। যাহাকে পুনরুত্থান বলা হইতেছে, তাহা হয়ত এক প্রকার স্বজাতি-বৎসলতা জড়িত হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন মাত্র—পুনরুত্থান নহে।

(১) এ সম্বন্ধে প্রথম বিবেচ্য বিষয় এই যে, আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে পারে কি না।

সমাজ ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে সংস্থিত। ধর্ম্ম বিশ্বাস-ভিত্তির উপরে সংস্থিত—যুক্তির উপরে নহে। আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত সমাজরক্ষার উপযোগী ধর্ম্ম হইতে পারেনা। পৃথিবীতে তাহাই দেখা যাইতেছে। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার না করিলে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অদর্শন হইয়া যায়। মহম্মদকে নবি এবং তাঁহা দ্বারা ঈশ্বর স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন,স্বীকার না করিলে,মুসলমান ধর্ম্ম অস্তিত্ববান থাকিতে পারেনা। বুদ্ধদেবকে অমানুষী শক্তি সম্পন্ন, অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অটল থাকিতে পারেনা। হিন্দুধর্ম্মও তাই। কেবল যে হিন্দু ধর্ম্মে অবতারবাদ আছে, এমন নহে, হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিভূমির বেদ আপ্তবাক্য। "ইতি শ্রুতেঃ" বলিলে পণ্ডিত সমাজে সমস্ত গুরুতর ও পরস্পর-বিসম্বাদী মতের মীমাংসা হইয়া যায়, তাহার উপর আর যুক্তির ক্রিয়া নাই। আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে যুক্তির ক্রিয়া একবারে নাই,এমন নহে,কিন্তু সে যুক্তি বেদ ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়,তবে মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে করিতে হইবে। শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা সর্ব্ব-বিধ তর্কের নিরসন হইবে, কারণ তাহা

আপ্তবাক্য। যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, সকলই সত্য—পরস্পর আপাতঃ বিরোধী মত সকল শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে, শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা নহে। যাহা শাস্ত্রে আছে,তাহার কোন অংশই অসত্য বা অযৌক্তিক বোধে ত্যাগ করিবার যো নাই, সমস্তই শাস্ত্রীয় শাসনানুসারে সমঞ্জসীভূত করিয়া লইতে হইবে।

যদি সত্য সত্যই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধিত হয়, তবে আমাদিগকে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি অভ্রান্ত আপ্তবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অবিশ্বাস-তরঙ্গে আজ মানব-সমাজ কম্পমান—সে তরঙ্গ ভারতেও বহিতেছে। আমাদের বিশ্বাস আর অটল নাই। সমাজ-বন্ধনের প্রভাবে এখন হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ সম্পাদিত হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা ধর্ম্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা বশতঃ নহে। এক্ষণে যে সকল ইংরাজি-শিক্ষিত নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায় ও নেতা,—যাঁহারা কথায় কথায় বেদব্যাসের উল্লেখ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভগবদ্গীতার তরজমা পাঠ করিয়া হিন্দুত্ব সার্থক করিতেছেন, এবং গীতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, যাঁহারা মোক্ষমূলর প্রণীত বেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন,যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রাদি যথোচিতরূপে অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, যাঁহারা মহাভারতে শত শত স্তর আবিষ্কার করিয়া, কল্পিত দুই চারিটি স্তরকে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া ইংরাজী যুক্তিদ্বারা কৌতূহলময় নবীন কৃষ্ণচরিত্র গঠন করিতেছেন,—তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে পারেন যে, "আমি নিখিল বেদ ও সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত ও আপ্ত বাক্যরূপে বিশ্বাস করি?"

যাঁহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সেই অর্থে হিন্দু, যে অর্থে ব্রাহ্মগণ হিন্দু ও জৈনগণ হিন্দু। ব্রাহ্মগণ আপ্তবাক্যরূপে বিশ্বাস না করিলেও, বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপদেশগুলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণকার ইংরাজী-শিক্ষিত,শাস্ত্রীয়-তরজমা-পাঠকারী হিন্দুগণও তাহাই করিয়া থাকেন। নিখিল বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত বিশ্বাসী এ দলে অতি অল্প। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ লোক এখন কতক-গুলি বিদ্যমান আছেন। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা ন্যূন ও নবীন হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

যদি বেদ বেদাঙ্গে যথোচিত বিশ্বাসের অভাব থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত পুনরুত্থান হইল না। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা একটা তরঙ্গ মাত্র, কিছু দিনে স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য সাধন করিয়া বিলীন হইয়া যাইবে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রার্থনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কারণ বশতঃ হিন্দুধর্ম্মের উত্থান সম্বন্ধীয় আন্দোলন উৎপাদিত হইয়াছে, অনেক পরিমাণে সেই সকল কারণের ক্রিয়া বশতঃই হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ পুনরুত্থানের ঘোরতর ব্যাঘাত হইতেছে সে কারণ কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন বর্ত্তমান আন্দোলন, মুখ্য বা পরোক্ষভাবে ইংরাজী চর্চ্চার ফলস্বরূপ, সেই রূপ, ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির প্রাদুর্ভাব হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত পুনরুত্থানের বিষম বিরোধী। ইংরাজী না শিখিলেও নয়, কারণ তদ্দারা আমাদের নানাবিধ মঙ্গল হইতেছে। কিন্তু তাহার প্রভাবে স্বাধীন যুক্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে—আপ্তবাক্যে বিশ্বাস দূরীভূত না হইয়া ক্রমশঃ শিথিল হই-

তেছে। ইহার সামঞ্জস্য ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

(২) দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই যে, জাতি ও অন্নভেদ রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে পারে কিনা। হিন্দুধর্ম্ম বর্ণাশ্রম-মূলক। জাতিভেদ বিলাতে নাই, এমন নহে। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে জাতিগত প্রবল প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রিয়া বশতঃ তাহা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইলেও, এখনও বিলাতে তাহা লুপ্ত হয় নাই, উচ্চবংশে ও নীচ বংশে অনেক ভেদ। তবে সেখানকার জাতিভেদ ও এখানকার জাতিভেদে আকার-গত পার্থক্য অনেক আছে। সেখানে অর্থ-বলে নিম্নজাতি উচ্চজাতিতে মিশিতে পারে, এখানে তাহা পারে না। এখানে যেমন অন্ন-বিচার আছে, সেখানে তাহা নাই। এখন কথা এই, আমাদের জাতিভেদ ও অন্ন বিচার রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ও দেশের মঙ্গল হইতে পারে কিনা।

সমস্যা বড়ই গুরুতর। কেবলমাত্র ধর্ম্ম লইয়া কখন কোন জাতি অস্তিত্ববান ছিল না—থাকিতেও পারে না। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতী-তও কোন সমাজ গঠিত ও উন্নত হইতে পারে না—স্থির থাকিতে পারে না। মানবের যেমন অন্যান্য প্রবৃত্তি আছে, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও আছে, এবং তাহা অতি প্রবল প্রবৃত্তি। সুতরাং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ব্যতীত মানব বা মানবসমাজ কখনও স্থির থাকিতে পারে না। যেমন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির প্রয়োজন, সেইরূপ অন্যান্য প্রবৃ-ত্তির পরিতৃপ্তিরও প্রয়োজন। ইচ্ছা কর বা না কর, জীবন ধারণের জন্য ক্ষুধা নিবারণ করিতেই হইবে এবং আহার আহরণের উপযোগী চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গণের উপভোগের যথোচিত ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সুতরাং অন্নজল, ঘর দ্বার, বসন ভূষণ, পরিবার-পালন, সমাজ-রক্ষা এবং ধর্ম্মসাধন, সমস্তই প্রয়োজন।

হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ছিল না, ধনের অভাব ছিল না, মনুষ্যের অভাব ছিল না, বিদ্যা বুদ্ধির অভাব ছিল না, তথাপি হিন্দুগণ জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে পারেন নাই—তাঁহারা ম্লেচ্ছগণের পদ-দলিত হইয়াছেন। তাহার অবশ্যই গুরুতর কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। কোন কোন স্বদেশ-বৎ-সল হিন্দু ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরাজা নাই, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইবে কিরূপে? কিন্তু হিন্দুসাম্রাজ্য কেন অদর্শন হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। হিন্দুত্ব ছিল, শাস্ত্র ছিল, ধন ছিল, যোদ্ধা ছিল, রাজা ছিল,—তথাপি কেন হিন্দুগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই? তাহার কারণ যতই জটিল হউক, হিন্দুহৃদয়ে এমন কোন মহাপাপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, যদ্দ্বারা হিন্দুগণ জাতীয় জীবন রক্ষা করিবার অনুপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন। তাই মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

এক্ষণে যদি আমাদিগকে উন্নতিকামী হইতে হয়, অর্থাৎ আমাদিগকে সেইরূপ উন্নতির আকাঙ্ক্ষী হইতে হয়, যে উন্নতি আজ বিলাতে মূর্ত্তিমতী, তাহা হইলে আমা-দিগকে সেই উন্নতির মূল মন্ত্র ইউরোপীয়-গণের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ইউ-রোপীয়গণের পদতলে বসিয়া আমাদিগকে বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী সাহিত্য, সর্ব্বো-পরি বিলাতী স্বজাতি-বৎসলতা ও দেশ-হিতৈষিতা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহা অপরিহার্য্য।

আমরা বলিতেছি না যে, বিলাতের সমস্ত বিষয়ই আমাদের অনুকরণীয়। কোন কোন বিষয়ে হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হিন্দু জাতির আধ্যাত্মিকতা পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ অথবা দোষ শূন্য নহে। তাহাতে আধ্যাত্মিকতার অনেক অভাব আছে এবং এজন্য সে সভ্যতায় ভোগ বিলাসের অত্যন্ত প্রবলতা, তাহা কখনই অনুকরণীয় নহে—সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য। উভয় দেশীয় সামাজিক গঠনের পার্থক্যবশতঃ ও অন্যান্য কারণে, য়ুরোপের সমস্ত সামাজিক আচার পদ্ধতি আমাদের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু সে পৃথক কথা। য়ুরোপীয় সভ্যতার বা সামাজিক আচার পদ্ধতিতে যতই দোষ থাকুক, আমরা য়ুরোপের বর্ত্তমান উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না। আমাদের যে সকল বিষয়ের অভাব আছে, তাহার জন্য য়ুরোপের নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে। য়ুরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, বাণিজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি যে মহাশক্তির ফলস্বরূপ, আমাদিগকে সেই শক্তির সাধনা করিতে হইবে—নতুবা আমরা অধঃপতিত থাকিব।

আমরা বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই পথেই পাদবিক্ষেপ করিতেছি। বিলাতী বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের ভাষার মর্ম্মে ২ বিলাতী ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। আমরা বিলাতের নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদ পত্র, বক্তৃতা, সভাসমিতি গ্রহণ করিয়াছি। বিলাতী আদর্শে গৃহনির্ম্মাণাদি আরম্ভ হইয়াছে, বিলাতী উপাদানে আমাদের গৃহ সজ্জিত হইতেছে। বিলাতী আদর্শে ব্যবসা বাণিজ্যও চলিতেছে। এমন কি, রমণীগণের কবরী বন্ধনেও বিলাতী আদর্শ দেখা যাইতেছে। এখন কি আর প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব? যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে, বা জীমূতবাহনের সময়ে, অথবা রঘুনন্দনের সময়েও আমরা যেরূপে জীবনধারণ করিতাম, এখন সেরূপে জীবনধারণ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। যদি আমরা য়ুরোপের ন্যায় স্বদেশের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, য়ুরোপীয় জাতিগণের ন্যায় জাতীয় জীবন লাভ করিবার কামনা করি, তবে আমাদিগকে, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতেই হইবে—বিলাতে যাইতেই হইবে।

কেবল য়ুরোপীয়গণের বহু আয়াস-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার লাভ করিলেই হইবে না,—লইতে হইলে দিতেও হয়। সেই রত্ন-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নূতন ২ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সেই ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে হইবে; নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য, নূতন জ্ঞানলাভের জন্য, দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। অর্থাগম জন্য পোতবাহী হইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য বিস্তার করিতে হইবে। কেবল স্বদেশের নহে, বিদেশেরও মঙ্গল কামনা করিতে হইবে।

ইহা জাতিভেদ ও অন্নভেদ রক্ষা করিয়া কেমন করিয়া হইতে পারে? আমরা হিমালয়ে গিয়া ভূ-কর্ষণ করিয়া হয় ত কোন প্রকারে প্রাচীন ভাবের হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে পারি, সাংসারিক উন্নতিকে তুচ্ছ মনে করিতে পারি, সাংসারিক সুখ সম্ভোগে উদাসীন হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কয় জনের মন ভিজিবে? কোটি ২ হিন্দুর মধ্যে কয়জন এরূপে জীবন ধারণ করিতে প্রস্তুত? আমরা সমাজ মধ্যে এরূপে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার বাসনার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। অর্থ-

পিপাসা ও ভোগ-প্রবৃত্তি চারিদিকেই হিন্দু-হৃদয় মথিত করিতেছে।

পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ ও অন্ন-ভেদ সম্বন্ধে ক্রমে২ ক্ষীণ-বল হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে রেঙ্গুন বা সিলোন্ গমন করিলে জাতিনাশ হইত, এখন আর তাহা হয় না। এখন হিন্দু সমাজের অনেক প্রধান-কল্প লোক সিলোন ও রেঙ্গুনে বর্ষে২ ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকেন, অথচ সঙ্গে কোন হিন্দু পাচক থাকে না। অনেকে হোটেলে বা গৃহে বিলাতী খানা খাইয়া থাকেন, তাহাতেও আর জাতি নাশ হয় না। যাঁহাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাঁহারা অবাধে এরূপ করিতে পারেন। সমাজের প্রকোপ দুর্ব্বলের উপর। ইহা সামাজিক শিথিলতার পরিচায়ক। পাঁউরুটী বিস্কুটে আর জাতি যায় না। সে কালের হিন্দুগণ বিলাতী তরল ঔষধ পান করিতে সম্মত ছিলেন না,—এখন তাহা গঙ্গা-জলবৎ হইয়াছে। আরও কোন২ আকারে ম্লেচ্ছের পানীয় চলিত হইয়া গিয়াছে—বরফ, লেমনেড ও সোডা-ওয়াটারে আর কাহারও হিন্দুত্ব বিচলিত হয় না। বিলাত গমনেরও শাস্ত্রীয় শাসন বাহির হইয়াছে, কেবল তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে বাকী আছে। সুতরাং কিরূপে বিশ্বাস করিব যে,বর্ত্তমান আন্দোলন পুরাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পরিচায়ক,অথবা জাতি ও অন্নভেদ রক্ষা করিয়া পুরাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্ভবপর।

(৩) তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণের উন্নতি, জ্ঞান-প্রাধান্য ও বর্ণ-প্রাধান্য ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে পারে কি না।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মের আর এক বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ অপরাপর সমস্ত জাতির শীর্ষস্থানীয় ও পূজনীয়। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রবল কারণও বিদ্যমান। পুরাকালের ব্রাহ্মণগণ জগতের যে কত উপকার সাধন করিয়াগিয়াছেন,তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন। তাঁহারা অদর্শন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনের প্রভা এখনও জগতে আলোক বিস্তার করিতেছে। সংস্কৃত ভাষায় যাহা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণগণের মনঃপ্রসূত। তাঁহাদের মনীষা, জ্ঞানচর্চ্চা, সাংসারিকসুখে ঔদাসীন্য, সমাজমঙ্গলকামনা প্রভৃতি গুণ-রাজি স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয় এবং ভাবিয়া শোকে আকুল হইতে হয় যে,তাঁহাদের বর্ত্তমান সন্ততিগণ তাঁহাদের তুলনায় কি হীন ও অপদার্থ হইয়াছেন!

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ লিখিত আছে। সমাজ-অভ্যন্তরস্থ যে সকল ব্যক্তিতে সেই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকল লোক যদি ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হন, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্মণের উপর আর কাহারও কোপদৃষ্টি পতিত হইতে পারে না। কিন্তু লক্ষণ ধরিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করা বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে। পুরাকালেও ব্রাহ্মণেতর বংশ হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভের প্রমাণ অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয় সেরূপ কদাচিৎ হইত। লক্ষণ বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা দেড় কোটির ন্যূন নহে। এই বিপুল ব্রাহ্মণ-সমাজ যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও, সমগ্র হিন্দুসমাজের বরণীয় হইয়া আপনাদেরর শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে সমর্থ কি না? ব্রাহ্মণ অপরাপর সমস্ত জাতির পূজনীয়, ইহা শাস্ত্রীয় শাসন এবং এখনও ব্রাহ্মণের জাতিগত মর্য্যাদা অনেক আছে।

কিন্তু ভক্তি চিরকালই গুণের পক্ষপাতী। যিনি জ্ঞানী ও জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ও স্বদেশ-বৎসল, তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না,—তিনি নমস্যজাতির অন্তর্গত না হইলেও, তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার করিতে হয়। ভক্ত হরিদাসকে অশ্রদ্ধা করা সুকঠিন। সেইরূপ দুরাচারী হীনচেতা ব্রাহ্মণের প্রতিও ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

ভারতীয় বিপুল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য সম্পাদনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ নানা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন, কারণ, জীবন রক্ষা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা চাই। যজন যাজনাদি দ্বারা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের জীবিকা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার। যখন ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি একত্রে বসিয়া এক শিক্ষকের নিকট একই বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন এবং একই প্রকার গুণপনা লাভ করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত পরস্পর এক প্রকার "গুরু-ভাই" হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাঁহারা জীবনে যে পরস্পর সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বংশমর্য্যাদা এখনও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ ব্যতীত তাহা কি চিরদিন রক্ষিত হইতে পারে? ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ে আর ব্রাহ্মণের সে সম্মান নাই, যাহা ৬০।৭০ বর্ষ পূর্ব্বে অপরাপর সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণকে দান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত।

বর্ত্তমান-ব্রাহ্মণগণ যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় জ্ঞানপিপাসু, অধ্যবসায়ী, সংযতেন্দ্রিয়, স্বদেশবৎসল ও নির্লোভ হইতে পারেন, তাঁহারা যদি পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ভিক্ষাভোজী হইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহারা যদি ঋষিগণের ন্যায় জ্ঞানের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া অপরাপর সকলকে শিক্ষা দিতে পারেন,—তাহা হইলে, এখনও, তাঁহারা কেবল হিন্দুজাতির নহে, জগতে সমস্ত জাতির পূজনীয় হইতে পারেন। পুরাকালে যত বিদ্যা ছিল, ঋষিগণ সমস্তই জানিতেন; যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, তত্ত্ববিদ্যা সমস্তই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। অথচ তাঁহারা সুবর্ণলোলুপ ছিলেন না। শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হইলে—আপনাদের চিরাগত উচ্চাসন রক্ষা করিতে হইলে—এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণকে সংস্কৃতভাষা-ভাণ্ডার-নিহিত জ্ঞানলাভ করিলেই হইবে না, ষড়দর্শন-শিক্ষা করিলেই হইবে না, তাঁহাদিগকে বিলাতি জড়বিজ্ঞানও শিক্ষা করিতে হইবে। সামানতঃ তাঁহাদিগকে পুরাতন ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে ও তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। উচ্চ জ্ঞানের সহিত যদি তাঁহারা আদর্শ চরিত্রের পরিচয় দিতে পারেন, তবেই ব্রাহ্মণ্য রক্ষা হইতে পারে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রক্ষার কথাও হইয়া থাকে। কোন কোন বদান্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ অর্থ দানও করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্য প্রকার। কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে, ন্যায় বা স্মৃতি পাঠ করিলে, টোলধারী হইলে, ব্রাহ্মণ্য রক্ষা হইবে না। অর্থবলে ব্রাহ্মণ্যের সৃষ্টি হয় নাই—অর্থ দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতে পারে না। সুবর্ণকে লোষ্ট্র জ্ঞান করিয়া, জ্ঞানকে ব্রহ্মস্বরূপ বোধে তাহার অনুশীলন করিতে না পারিলে—কর্ত্তব্যাস্ত্রে হীন স্বার্থকে

বিনাশ করিয়া সমাজ জীবনে নিজ জীবন নিমজ্জিত করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত উন্নতি ও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা হইবে না। আমরা যদি ভারতীয় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে এরূপ দশ বিশ জন আদর্শ ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বুঝিতাম যে, সত্য সত্যই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে। ব্রাহ্মণের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান অসম্ভব।

আর এক কথা এই। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণেতর বংশে আবির্ভূত হইতে পারে কি না। পৃথিবীর সকল দেশেই নিম্নজাতির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। য়ুরোপে নিম্ন জাতীয়-ব্যক্তিগণ ক্রমাগত উচ্চজাতিতে মিশিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের আচার পদ্ধতিগত উৎকর্ষও হইতেছে। ভারতীয় জাতিভেদের পার্থক্য বশতঃ এখানে সেরূপ মিশামিশি হইতেছে না বটে,কিন্তু নিম্নজাতীয়ব্যক্তিগণের অবস্থা ও আচারগত উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন জাতি অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতেছে। এখন নিম্নজাতীয় ব্যক্তিতে, সাধনা বলে, যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তবে তিনি ব্রাহ্মণোচিত সম্মানের অধিকারী কি না? দুরাচার হইলেও ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণ-তনয় পূজিত হইবেন ও সাধুচরিত হইলেও অন্যজাতি হেয় ও অস্পৃশ্য থাকিবে, ইহা বর্ত্তমান কালে কতদূর সম্ভব, তাহা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের নেতাগণের বিশেষ বিবেচ্য।

প্রিয় পাঠক, আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন না। আমাদের সমাজের একটী রোগ এই যে, স্পষ্ট কথা শুনিলেই আমরা বক্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া থাকি—দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। দোষ বাহির না হইলে তাহা নিবারণ করা কঠিন। এই উদ্দেশেই, হিন্দু সাধারণের বিবেচনার জন্য দু একটী স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কথাটা কিরূপ দাঁড়াইতেছে।

প্রথমতঃ, আমরা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসহীন ও শাস্ত্রীয় শাসনে আস্থা-হীন হইতেছি। আপ্তবাক্যে বিশ্বাস পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে না, অথচ হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, য়ুরোপীয় সভ্যতার সকল অংশ আমাদের আদর্শ স্থানীয় না হইলেও, তথাকার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি যে আমাদের আদর্শ স্থানীয়, বোধ হয় অল্প লোকেই একথা অস্বীকার করিবেন। যদি আমাদের আদর্শ এইরূপ, তবে য়ুরোপীয়গণের নিকট হইতে আমাদিগকে সেই উন্নতির মূলমন্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে—য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে যাইবার প্রয়োজন হইবে। ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগত জাতি ও অন্নভেদের শিথিলতা হইয়া আসিতেছে, অথচ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধীয় চেষ্টা ও আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ সমাজের গতি সেই পথেই হইতেছে,যে পথে য়ুরোপীয় উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণগণের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান অসম্ভব। অথচ সে উন্নতির কোন চিহ্ন দেখা যায় না, যে উন্নতি প্রভাবে তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অপরাপর সমস্ত জাতির পূজিত হইতে পারেন।

সুতরাং সেই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে,

যাহা আমরা বিগত সহস্র বর্ষ যাবৎ হিন্দু ধর্ম্মরূপে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি—যে ধর্ম্মের মূল আপ্তবাক্য (বেদ)—স্মৃতি ও পুরণাদি যাহার স্কন্ধ—ব্রাহ্মণ্য, জাতিভেদ ও অন্নভেদ যাহার শাখা প্রশাখা,—সেই ধর্ম্মতরু পুনরায় সর্ব্বাঙ্গে সজীব হইতেছে,আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। আমাদের ভ্রম হইলেও হইতে পারে,কিন্তু যে পর্য্যন্ত পক্ষপাতবিহীন যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহা নিরাকৃত না হয়, ততদিন আমাদের সংশয় সহবাস অনিবার্য্য।

তবে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যে নিষ্ফল হইবে, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না। এতদ্দ্বারা হিন্দুর মন জাগরিত ও বলিষ্ঠ হইতেছে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভরসা করি, পরিবর্ত্তনের কথায় কেহ রুষ্ট হইবেন না। কারণ, পরিবর্ত্তন মানবজীবনের অপরিহার্য্য নিয়ম। কালে ২ যেমন মানবের অবস্থা, জ্ঞান ও প্রবৃত্তিগত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেইরূপ তাহাদের আচার পদ্ধতি ও ধর্ম্মও ক্রমে ২ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবীন আকার ধারণ করে ও তাহাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী হয়। ভারতযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুগণের সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুধর্ম্মেই যুগ-ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে এবং ইহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক। হয় ত এমন দিন উপস্থিত হইবে, যখন এই প্রস্তাবে লিখিত ত্রিবিধ বিষয়ের সন্তোষকর মীমাংসা হইয়া যাইবে; হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় আপনার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নবীন বেশে পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় হইবে, হয় ত বর্ত্তমান আন্দোলন এই মহা কার্য্যের সহায় স্বরূপ হইবে। আমাদের আশা ও বিশ্বাস যে, যাহা ভারতের ও হিন্দু জাতির ভাবীমঙ্গল-প্রসূ,তাহা অটল ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবে,—যাহা ভাবী মঙ্গল উৎপাদনকারী নহে, তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় ক্ষণিক প্রভা বিস্তার করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

ফুলরেণু।

সরলা।

ক'বছর হ'ল আজ দেখিনা তোমারে,
সরলা! স্বর্গের স্বপ্ন; তবু স্বপ্ন প্রায়,
বর্ষমান আঁখি-মেঘে অশ্রু শত ধারে,
ইন্দ্রধনু রূপ ছায়া পড়ে কল্পনায়!
ভুলিয়াছ তুমি বটে, তুমি গিরিনদী,
নিত্য বহ' নব স্রোতে নব স্থান দিয়া,
বালুতে আঁকিয়া তব তরঙ্গ অবধি,
আমি শুষ্ক স্রোত-চিহ্ন রয়েছি পড়িয়া!
শত্রুও ভোলেনি মোরে, শত শত্রুতায়
হৃদয়ে জ্বলন্ত-স্মৃতি রেখেছে জাগ্রত,
কৃতজ্ঞ অন্তরে করি নমস্কার তায়,
সেও নহে অকৃতজ্ঞ রমণীর মত!
শত্রুর অধিক শত্রু তুমি লো ললনে,
একখানি পত্র দিয়া নাহি কর মনে!

সরলার মৃত্যু।

সহস্র চিন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অবসরে,
সরলা! ফুটিয়া উঠে তোমার আনন,
শ্রাবণের যথা ঘন নীল মেঘ স্তরে,
সহসা শশীর রূপে তোষে লো নয়ন!
সময়ের কতদূরে এসেছি ভাসিয়া
ছাড়িয়া তোমার সেই পুষ্প-উপকূল,
তথাপি চিলাই যেন বহে শিরা দিয়া,
কহিয়া তোমারি কথা কুল্ কুল্ কুল্!
এগার বছরে তব পুষ্প-উপহার
হয়নি মলিন আজো, তেমনি উজ্জ্বল,
সেই পরিমল পূর্ণ প্রণয়ে তোমার,
রয়েছে অমৃত-সিক্ত গোলাপের দল!
যা কিছু তোমার প্রিয়ে ঠিক্ আছে তাই,
কেবল তুমিই দেখি সেই তুমি নাই!

সন্দেহে।

সরলা! কি বেঁচে আছ' কিম্বা গেছ' ম'রে
বুঝিতে পারি না এ যে বুঝা বড় দায়,
দেখি না তোমারে আজ ক' বছর ধ'রে,
একখানি পত্র আর নাহি পাওয়া যায়!
যে বলে বাঁচিয়া তুমি সে ত বলে ভুল,
সে তোমার প্রেতমূর্ত্তি দেখেছে নিশ্চয়,
আমতলে সন্ধ্যাকালে এলাইয়া চুল,
অমাবস্যা শনিবারে দাঁড়াইয়া রয়!
তুমি যে মানুষ ছিলে, ছিল তব প্রাণ,
বুক ভরা স্নেহ ছিল করুণা প্রণয়,
সে ত পিশাচীর তৃষা শুধু রক্ত-পান,
হৃদয়ে নরক-কুণ্ড পূতিগন্ধময়!
অনিশ্চিত মৃত্যু তব সরলা সুন্দরী,
কুশ-পুত্তলিকা প্রাণে তাই দাহ করি!

শ্রাদ্ধ।

সরলা মরিয়া ভূত হয়েছে নিশ্চয়,
যেখানে সেখানে তারে দেখিবারে পাই,
উঠিলে সোণার শশী চির-সুধাময়,
নিরখি তাহার মুখ আতঙ্কে ডরাই!
প্রভাত-পলাশে দেখি তাহারি অধর,
শরত-প্রভাত-পদ্মে সেই যেন হাসে,
শিহরিয়া উঠে মোর শ্লথ কলেবর,
সে যখন গায় পড়ে বসন্ত-বাতাসে!
বন থেকে সে আমারে কুহু রবে ডাকে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পাই বেলী-বাসে,
করিয়া বিজলী-ভঙ্গি ইশারা আমাকে,
উড়ায়ে জলদ-চুল ধ'রে খে'তে আসে!
তাই তার শ্রাদ্ধ করি প্রেমের গয়ায়,
দিছি হৃদ্-পিণ্ড দান গদাধর পায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

স্বর্ণ রাজ্যের অধিবাসী।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা যে দেশের নামও জানিতেন না, ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে দেশ প্রথম ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের দ্বারা ইউরোপীয়দিগের নিকট আবিষ্কৃত মাত্র, আজি সেই দেশ ইংরাজের উপনিবেশ, ইংরাজে পরিপ্লুত। আর সেই ওলন্দাজ জাতি? আজি কোথায় তাহারা? বহির্দ্দেশ বাণিজ্যে যে ওলন্দাজ এবং পর্টুগিজদিগের ক্ষমতা তখন অপ্রতিহত ছিল, তাহারা এখন নগণ্য; এবং কাল মাহাত্ম্যে ইংরাজের প্রভাব এখন বিশ্বব্যাপী। স্বর্ণগর্ভা অষ্ট্রেলিয়ায় আজি সকলই নূতন। প্রাচীন

বন দিন দিন উৎসাদিত হইতেছে; আর দ্বিগর্ভীকাঙ্গারু, ওয়াল্লাবী, এবং বান্দিকুট, এখন দূরবনপ্রান্তে সভয়ে বিচরণ করে। স্বচ্ছসলিলা নদীগুলি বনের অন্ধকারের ছায়া বুকে মাখিয়া বিজনে প্রবাহিতা ছিল; আজি তাহাদের বক্ষ রৌদ্র-প্রদীপ্ত, পোত-পরিব্যাপ্ত। আর দেশের বনে বনে, তমসা নদীর কূলে কূলে, যাহারা প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিত, আজি কোথায় তাহারা? নদীর মাছ, আকাশের পাখী, বনের পশু শরবিদ্ধ করিয়া, নদীর খরস্রোতে লাফাইয়া পড়িয়া, যাহারা আনন্দধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইত, আজি কোথায় তাহারা, এবং কোথায় তাহাদিগের সেই আনন্দধ্বনি? কৃষ্ণকায় হউক, কদাকার হউক, বিশ্বস্রষ্টা যাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন, প্রজাপতি যাহাদিগকে এই দশলক্ষাধিক বর্গমাইল ভূমির অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন, বিধাতার এই নববিধানে তাহারা কোথায় গেল? 'কাল' বলিতেছে, "আমি তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছি এবং করিব"। যাহারা এই স্বর্ণরাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডারের প্রহরী ছিল, এই নাতিশীতোষ্ণ মনোহর প্রদেশ যাহাদের অধিকারে ছিল, তাহারা নির্ব্বিবাদে সুসভ্য জাতির চরণপ্রান্তে একটি কোণে টিকিয়া রহিতে পারিতেছে না কেন? একখানা ইংরাজী কথা-গ্রন্থে আছে যে, একটা মাছি ভণ্ ভণ্ করিয়া আঙ্কল্‌টবিকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল; আঙ্কল্‌টবি, তাহাকে না মারিয়া, মুক্ত বাতায়ন পথে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও বাপু উড়িয়া যাও; এ পৃথিবী বহু বিস্তৃত; এখানে তোমার আমার, দুজনার বাস করিবার স্থান যথেষ্ট আছে।" ষ্টার্ণ সাহেবের স্বদেশীয়গণ এই মক্ষিকা অপেক্ষাও নির্ব্বিরোধী জাতিকে (১) একটু স্থান দান করিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না কি?

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া দেশের একখানি অতি সুন্দর ইতিহাস, তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত জে, ডি, উড্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে এবং তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত, তাহা যে গবর্ণমেণ্টের কোলটানা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথাপি এই গ্রন্থেই দেখা যাউক যে, আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ কি?

উডস্ সাহেব লিখিতেছেন যে, দেশটি আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ প্রায় ছিল; কিন্তু দিন দিন তাহারা লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৮৭৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৪ পর্য্যন্ত যে হারে ইহাদের সংখ্যা কম পড়িয়া আসিতেছে, তাহাতে নাকি আর ৫০ বৎসর পরে, অস্ট্রেলিয়ায় একটিও আদিম অধিবাসী রহিবে না। (২) শ্বেতকায় জাতির উপস্থিতি এই ধ্বংসের একটি কারণ বটে; কিন্তু তাহাই একমাত্র বা মুখ্য কারণ বলিয়া উডস্ স্বীকার করেন না। উডস্ ইহার বিশিষ্ট কারণ দেখাইবার পূর্ব্বে আপনা হইতেই "ঠাকুর ঘরে কে" প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক গণ্য মান্য লোক (উডস্ সাহেবের নিজের কথা)

(১) অস্ট্রেলিয়ার সরকারী কর্ম্মচারী উডস্ সাহেব স্বপ্রণীত অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে লিখিয়াছেন;—"The blacks did not oppose the settlement of the whites." তবে ইহারা মক্ষিকা অপেক্ষাও নির্ব্বিরোধী না ত কি?

(২) উল্লিখিত ইতিহাসের ৩৯২ পৃষ্ঠায় আছে;—"As far as the statistics go ·····in another half century, there will not be a solitary black fellow left."

বৃথা দোষারোপ করিতেছেন যে, শ্বেতকায়দিগের অত্যাচারেই কৃষ্ণকায়েরা উচ্ছন্ন যাইতেছে। ছি! তাও কি কখনও হয়? এই প্রকার লিপিপ্রণালী হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কি উদ্দেশ্যে একজন সরকারী জজকে দিয়া খোদ্ গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তক লিখাইয়া লইয়াছেন। উডস্ বলেন যে, প্রথমতঃ আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংসের কারণ এই যে, দেশের জমি, উপনিবেশ স্থাপন-কারীগণ লইয়াছে; কাজেই প্রচুর আহার সংস্থান করিতে না পারিয়া ইহারা মরিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা প্রবন্ধে অযথা ইংরাজী উদ্ধার অসঙ্গত বলিয়া, উডস্ সাহেব কি প্রকার ধৃষ্টতার সহিত কথা গুলি লিখিয়াছেন, তাহা তুলিতে পারিলাম না। টীকায়ও চলে না; কারণ কথা অনেক। গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়টি পাঠ করিলেই সকল কথা প্রতীত হইতে পারিবে। গ্রন্থখানিতে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, তাহা স্বীকার করি। উড্‌সের কথা এই, আমরা তাড়াই নাই, স্বধু উঠান চষিয়াছি। জমি, শ্বেতকায়দিগের, তাহার উপসত্ব তাঁহাদিগের; তাহাতে ফলমূল থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে কৃষ্ণকায়ের কি? পাকা বেলের রূপ দেখিয়া কাকের পেটভরে কৈ? ইতিহাস খানা লেখার ভার জজের হাতে না দিয়া উকীলের হাতে দিলে ভাল হইত।

উচ্ছেদ প্রাপ্তির ২য় কারণটি আরও মনোহর। জজসাহেব বলেন যে, কৃষ্ণকায়েরা শিশুকন্যা বধ করিয়া ফেলে; এমন কি, অনেক সময়ে শিশু সন্তান মাত্রই মারিয়া ফেলে বলিয়া ইহাদের লোক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বালিকা বধের ফলে এখন স্ত্রীজাতির সংখ্যা এত কম যে, এ জাতির আর বৃদ্ধি প্রাপ্তির আশা নাই। এখন কথা এই যে, কৃষ্ণকায়েরা পুর্ব্বে বালিকা বধ করিতনা, এখন করে কেন? ইহারা কি এতই নির্ব্বোধ যে, জাতির বিলোপের এত বড় একটা স্থূল রকমের কথা, ইহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না? দেখা যাউক, ইহাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে উডস্ নিজেই কি লিখিয়াছেন। ইহারা ৫ ফুট হইতে ৬ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ; ইহাদের ললাট বিস্তৃত, এবং চক্ষু উজ্জ্বল। চক্ষের বেষ্টন ৩৪ হইতে ৩৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত। এ প্রকার দেহমন্দির ত নির্ব্বুদ্ধিতার আধার বলিয়া মনে হয় না! তাহার পর, ইহাদিগের ভাষা সম্বন্ধে উডস্ সাহেব ভাষা তত্ত্ববিৎদিগের গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কথা গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন;—"ইহাদের ভাষায় বিংশতি পর্য্যন্ত গণনাঙ্ক আছে; এবং ভাষা এত প্রত্যয়বহুল যে অনেক ইউরোপীয় ভাষায় এমন নাই। (৩) ইহারা সহজে যুক্ত শব্দ গড়িতে পারে, এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য, অনায়াসে নূতন শব্দ গড়িয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাদের ভাষায় শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার প্রভৃতিরও যোজনা আছে। (৪) যাহাদের ভাষা এই প্রকার, তাহারা কি এত নির্ব্বোধ হইতে পারে যে, সাধারণ রকমের হিতটুকুও বুঝিয়া লইতে পারে না? অনুমান হয় যে, কারণটা বুদ্ধির দোষ নহে। তবে সাধ করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আপনাদের ধ্বংস আপনারাই সাধন করিতেছে কেন? উডস্ বলেন যে, ভবি-

(৩) "The Native languages possess inflections which many European languages do not." (Page 400)

(৪) "The natives evince great facility in compounding words, in forming new ones to represent objects previously unknown to them, and also in inventing figurative expressions." (৪০০পৃষ্ঠা)

ষ্যতে খাইতে দিতে পারিবে না বলিয়াই মারিয়া ফেলে। কথাটা ভাবিতে গেলেও বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তবুও ত সবটুকুর কৈফিয়ৎ পাওয়া গেল না; আহার যোগাইতে পারিবে না বলিয়া একমাত্র বালিকা বধেরই তাৎপর্য্য কি? ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ত সমান খাটে! আর একটু কথা আছে, উডস্ সাহেব তাহাও পাকে চক্রে বলিয়া আপনাদিগকে ধরা দিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন যে, ইহাদের স্ত্রীলোকদিগের শরীর সুগঠিত; তবে ইউরোপীয় আদর্শে বিচার করিলে মুখশ্রী সুন্দর বলিতে পারা যায় না, কুৎসিৎ বলিতে হয়। তবে মুখ দেখিলে ঘৃণা হয়, এমন নহে। তাহার পরেই আবার লিখিতেছেন যে, উপনিবেশ-স্থাপনকারীগণ, কৃষ্ণকায়দিগের রমণীসংগ্রহে সময়ে সময়ে বিশেষ মনযোগ দেন নাই, তাহা নহে। তবে কথাটা লইয়া শত্রুপক্ষ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। (৫) কথাটার মীমাংসার জন্য আরও লিখিয়াছেন যে, স্ত্রী অপহৃতা হইলে ইহাদের বড় বাধে না; কারণ, ইহারা সতীত্বের মর্য্যাদা জানে না। এমন করিয়া গোঁজা মিল দিয়া যাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে, তাঁহার হাতে গ্রন্থ লিখিবার ভার না দিলেই ভাল হইত। লেখক জজ্ না হইয়া উকীল হইলে ছিল ভাল। যদি লোক সংখ্যা বাড়িলে অনাহারেই প্রাণ যায়, যদি কন্যা সন্তান পুষিলে শ্বেতাঙ্গই অপহরণ করে, তবে আত্মধ্বংসে ইহাদের দুঃখ কি? সাহেব ইহাদের মধ্যে একটি সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে লিখিয়াছেন; সে কথাটা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, কত ক্ষোভে ইহারা পীড়িত। সংস্কারটি এই যে, বাল্যকালেই অনেক বালককে খোজা করিয়া দেওয়া হয়; এবং বালিকাদিগকেও এমন একটা পীড়াদায়ক অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, যাহাতে সন্তান ধারণ সম্ভব পর হয় না। আপনাদের অহিত পশুতেও বোঝে; এমন দ্বিতীয় বর্ব্বরজাতি পৃথিবীতে নাই, যাহারা এমন করিয়া আত্মঘাতী হইয়া থাকে। তবুও কি বুঝিতে বাকী থাকে যে, ইহারা কেনই ইচ্ছা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতেছে?

কোন কোন পাঠক হয় ত বলিবেন যে, ক্ষতি কি? এ সংসার-রণক্ষেত্রে স্থিতি-সংকল্পে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে দুর্ব্বল ত মারা পড়িবেই। কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া যাউক। কিন্তু কই? সভ্যতা অভিমানী ইংরাজ নিজে যে অন্য কথা বলেন। ইংরাজ বলিতেছেন যে, সুসভ্যতার ফলে তাঁহারা পরোপকারবৃত্তি দ্বারাই এখন চালিত হইতেছেন। দরিদ্র হউক, দুর্ব্বল হউক, রোগী হউক, সকলকেই রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন। ঐ দেখ পাগ্‌লাখানা, দরিদ্র-"খানা," দাওয়াই-খানা প্রভৃতি মৃত্যুর খানায় কেহ না পড়ে বলিয়া নিরন্তর সতর্ক! কথার ভড়ং এই স্থানেই শেষ হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় কতকগুলি কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহাদের নাম কৃষ্ণজাতি রক্ষক (৬) ইহাঁদের মাহিয়ানার জন্য কৃষ্ণকায়দিগকে টেক্স দিতে হয় কিনা, উডস্ সাহেব তাহা লেখেন নাই। ইহারা ত মরিবেই; তবে যতক্ষণ বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ এই রক্ষকদিগের কৃপা হইতে ইহাদিগকে অব্যাহতি

(৫) "A great deal of stress has been laid upon the fact that the white men have taken away the black fellow's women, and the bad effect this procedure has upon the males of the tribes. No doubt it is a deep injury, but. ... (তার পরেই গোঁজামিল) — ৪০২ পৃষ্ঠা।

(৬) The protector of the black races.

দিলে ক্ষতি কি? ইংরাজ পরলোক মানে, অথচ পরলোক এত ভয়-শূন্য কেন? হায় বিধাতা, ইহাদিগের বনভূমি ত উৎসাদিত হইয়াছে; প্রখর রৌদ্রতাপে প্রতপ্ত হইয়া যে একটুখানি বৃক্ষের ছায়ায় বসিবে, তাহা ত ইহাদের ভাগ্যে আর নাই। নাই বা থাকিল; কিন্তু দুঃখ জর্জ্জরিত বহুতাপতপ্ত কৃষ্ণকায়-দিগের জন্য তোমার বিশ্বব্যাপী ছায়াও কি নাই? বুঝি নাই, নহিলে ইহারা আত্মঘাতী হইয়া মরিবে কেন? ইহাদের ভাগ্যেই কি সুধু এই কথা মিথ্যা হইয়া গেল যে;—

> মধ্যাহ্নসূর্য্যাংশু বিদগ্ধ দেহ-
> জনস্য শান্ত্যৈহি সদাস্তি ছায়া;
> সংসার তাপানল দগ্ধনৃণাং
> তাপোপশান্ত্যৈ ভগবৎ কৃপাস্তি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়নগর। (৩)

বল্লালবাড়ী।—ইংরেজ-বাজারের তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে রাজমহল রাস্তার পার্শ্বে বাঘবাড়ী নামক স্থানে বল্লালসেনের রাজ-ধানী ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক্ গড় ও পরিখায় বেষ্টিত ছিল। এই গড় ও পরিখা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গড়বেষ্টিত স্থানের পূর্ব্বভাগে রাজবাটী ও পশ্চিমভাগে দুর্গ অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিকে সিংহদ্বার ছিল। এই দ্বারের উপর দুই দিকে দুইটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎ-পন্ন হইয়া দ্বার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত দুই বৃক্ষের শাখা প্রশাখাদি জড়িত হইয়া দ্বারের আকারে অবস্থিত আছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ সংলগ্ন লম্বমান ইষ্টক সমূহ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাটী ও দুর্গ এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও ব্যাঘ্রের আবাস ভূমি হইয়া প্রকৃত বাঘবাড়ী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

দ্বারবাসিনী।—বল্লালবাড়ী হইতে অমৃতি নালা পর্য্যন্ত একটি গড় আছে। পূর্ব্বেই উল্লি-খিত হইয়াছে যে,এই অমৃতিনালা এক সময়ে ভাগীরথী নদীগর্ভস্থ ছিল। এই ভাগীরথী তীরে চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অমৃতি নালার তীরে অদ্যাপি একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বল্লালবাড়ীর দ্বারে অধিষ্ঠিতা বলিয়া দেবী ও স্থানের নাম দ্বারবাসিনী হইয়াছিল।

পাতালচণ্ডী—লোহাগড় অর্থাৎ উত্তর দিকের তৃতীয় গড় পশ্চিম দিকে যে স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানকে পাতালচণ্ডী কহে। কথিত আছে যে, এই স্থানে সুড়ঙ্গ-মধ্যে চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিল, এজন্য ইহা পাতালচণ্ডী নামে খ্যাত। ইহার নিকটে একটি জলাশয় আছে। এই জলাশয় সম্বন্ধে একটি গল্প আছে যে, ইহার মধ্যে একগাছি লৌহশৃঙ্খল নিকটস্থ এক অশ্বথ বৃক্ষের সহিত বদ্ধ ছিল। এই শৃঙ্খল যতই আকৃষ্ট হইত, ততই জল হইতে নির্গত হইত, তাহার শেষ হইত না। আবার ছাড়িয়া দিলেই আপনা আপনি নামিয়া পড়িত। কথিত আছে, একদা গ্রে সাহেব নামে গোয়ামালতী কুঠীর কোন সাহেব হস্তীর পায়ে শৃঙ্খল জড়াইয়া তাহা টানিতে থাকেন; কিন্তু শেষ না হওয়ায় অবশেষে ছাড়িয়া দেন;— শৃঙ্খল হস্তীসহ টানিয়া লইবার উপক্রম দেখিয়া অবশেষে উহা কাটিয়া দেন। এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে এ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারি নাই। পাতালচণ্ডীর অনতিদূরে কালাপাহাড়

নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের বাসস্থান ছিল।

সাগরদিঘী।—ইংরেজবাজারের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাদুল্লাপুরের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এই বৃহৎ সরোবর অবস্থিত। ইহার জলভাগ দৈর্ঘ্যে ১৬০০ গজ ও প্রস্থে ৮০০ গজ। কথিত আছে যে, এই সরোবর লক্ষ্মণসেনের সময় ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে খনন আরম্ভ হয়। ইহাতে ৬টী ইষ্টক-গ্রথিত ঘাট ছিল। ঘাটগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ইষ্টকাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার তীরদেশ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিঞ্চিদধিক ৭৫০ বৎসর যাবৎ ইহা খনিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইহার জল নির্ম্মল ও গভীর আছে। চতুর্দ্দিকে কেবল জলজ উদ্ভিজ্জ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

মকদম আখী সেরাজউদ্দিনের দর্গা।—সাগরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে এই দর্গা অবস্থিত। মকদম সাহা একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ৯১৬ হিজরীতে (১৫১০) খ্রীষ্টাব্দে হোসেন সাহা এই দর্গা নির্ম্মাণ করেন। ইহার ছাদ এক্ষণে পড়িয়া গিয়াছে, প্রাচীর ও শীঘ্রই পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দর্গার যেরূপ সম্পত্তি আছে, তদ্দ্বারা ইহার সুন্দররূপ জীর্ণ সংস্কার হইতে পারে। কিন্তু স্বত্বাধিকারীর তাদৃশ যত্ন নাই।

ঝন্‌ঝনিয়া মসজিদ।—পূর্ব্বোক্ত দর্গার অনতিদূরে এই মসজিদ অবস্থিত। ইহা ৬টী গুম্বজ যুক্ত এবং রঞ্জিত ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। এই মসজিদ গিয়াসুদ্দিন আবুল মোজাফর মামুদ সাহার রাজত্ব কালে ৯৪১ হিজরীতে (১৫৩৪।৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) কোন স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

দুইটী স্তম্ভ।—ইংরেজ বাজার হইতে শিবগঞ্জ রাস্তার ধারে লোহাগড়ের কিঞ্চিৎ পরে দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এই দুইটী স্তম্ভ কোন প্রাচীন বাটীর দ্বারের স্তম্ভ বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানে রাজার দেওয়ানের বাটী ছিল এবং এই স্তম্ভদ্বয় উক্ত বাটীর প্রবেশ দ্বারের স্তম্ভ। কিন্তু এই স্তম্ভদ্বয় ব্যতীত কোন বাটীর চিহ্নই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই।

পিয়াস বাড়ী।—পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভদ্বয়ের কিছু দূরে, ইংরেজবাজার হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে এই পুষ্করিণী অবস্থিত। কথিত আছে যে, এই পুষ্করিণীর জল অত্যন্ত কদর্য্য ও বিষাক্ত ছিল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীদিগকে ইহার জল পান করিতে দেওয়া হইত, তাহারা এই জল পান করিয়াই প্রাণত্যাগ করিত। আবুলফজল বলেন যে,সম্রাট আকবরসাহ এই নিষ্ঠুর নিয়ম উঠাইয়া দেন। ইহার নিকটে একটী বৃহৎ বাটী ছিল, তথায় কারাগার ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার জলে কোন দোষ আছে,তাহা বোধ হয় না। কারণ পথিকেরা ও নিকটবর্ত্তী লোক ইহার জল ব্যবহার করিয়া থাকে।

রামকেলী।—পিয়াস বাড়ীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে রামকেলী নামক গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে সুলতান হোসেন সাহের মন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রী প্রসিদ্ধ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর বাসস্থানছিল। উভয়ের খনিত সনাতনসাগর, রূপসাগর,শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে একটী কেলীকদম্ব বৃক্ষ আছে,তাহার চতুর্দ্দিক ইষ্টক-গ্রথিত। প্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব এইস্থানে রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন,এবং এই বৃক্ষের পাদদেশে

হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে চৈতন্য দেবের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখে এখানে চৈতন্য দেবের স্মরণার্থ একটী মেলা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, এই স্থানে বলরাম তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন-এজন্য ইহা রামকেলী নামে প্রসিদ্ধ। রূপ সনাতনের সময়ে এই স্থানে ঘন বসতি ছিল। তাঁহারা নানা স্থান হইতে সুপণ্ডিত ও শাস্ত্র-বিৎ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে রূপ সনাতনের বাসা-বাড়ী ছিল, বসত বাটী ছিল না। এ জিলার অনেক লোকের সংস্কার যে, এই জিলার অন্তর্গত ইংরেজ-বাজারের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে মোরগ্রাম মাধাইপুর নামক স্থানে রূপসনাতনের মাতুলালয় ছিল এবং তাঁহারা এই স্থানেই প্রতিপালিত হন। শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় স্বপ্রণীত রূপসনাতনের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, রূপ সনাতনের পিতা কুমারদেব মোরগ্রাম মাধাই-পুরে হরিণারায়ণ বিশারদের রেবতীনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অধিকারী মহাশয় কোথা হইতে এই তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, আমি তাঁহাকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে বলেন যে, বৃন্দাবনে সনাতন-তত্ত্বনামক গ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছিলেন। ফলতঃ অনুসন্ধানে এরূপ কোন গ্রন্থ কোন স্থানেই পাওয়া যায় নাই। অধিকারী মহাশয়ের অনেক কথা স্বকপোল কল্পিত। এই অংশটীরও যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তাহা তিনি আমার নিকট এক-রূপ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে এই অংশটী পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এবং রূপ ও সনাতনের মন্ত্রিত্বে নিযুক্তি সম্বন্ধে এ অঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে; তাহা এই:—এক সময়ে সুলতান হোসেন সাহ একটী মিনার বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত স্তম্ভের যখন উপরের ছাদ ব্যতীত আর সমস্তই শেষ হইয়াছিল, তখন সুলতান উহার উপরে উঠিয়া উহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণান্তর ছাদ নির্ম্মাণ সমাধা করিবার মানসে রাজমিস্ত্রী আনয়ন জন্য সংকল্প করিলেন এবং স্তম্ভ হইতে অবরোহণ করতঃ হিঙ্গা নামক এক পদাতিককে সম্মুখে দেখিয়া মোরগ্রাম মাধাইপুর যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই সময়ে বাদসাহের মুরশীদ (গুরু) উপস্থিত হওয়ায়,তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং হিঙ্গাকে মোরগ্রাম মাধাইপুর যাইয়া কি করিতে হইবে,তাহা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। হিঙ্গা,বাদসাহের আদেশ পাইয়া বিলম্ব করিতে সাহসী না হইয়া, তৎক্ষণাৎ মাধাইপুরে গমন করিল। কিন্তু তথায় কি করিতে হইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে সনাতন ও রূপের বাটীর নিকট ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সনাতন ও রূপ পদাতিকের ইতস্ততঃ ভ্রমণ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও,কাহার বাটী অনুসন্ধান করিতেছ?" পদাতিক বলিল "মহাশয়, আমি বড় বিপন্ন হইয়াছি, আমি বাদসাহের আদেশানুসারে এখানে আসিয়াছি, কিন্তু এখানে কি করিতে হইবে, তাহা বাদসাহ আমাকে বলেন নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।" ভ্রাতৃদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাদসাহ আদেশ দিবার সময় কোথায় কি করিতেছিলেন?" হিঙ্গা উত্তর করিল যে,"বাদসাহ একটী স্তম্ভের

কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতঃ তাহা হইতে অবরোহণ করিয়া আমাকে এখানে আসিতে আদেশ দিয়াছেন।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে "উক্ত স্তম্ভের কার্য্যের কিছু অবশিষ্ট আছে কি ?" হিঙ্গা বলিল "সমস্ত শেষ হইয়াছে, কেবল ছাদ বাকী আছে।" তাঁহারা বাদসাহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পদাতিককে বলিলেন "এই মাধাইপুরে প্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রীগণ বাস করে, তুমি কয়েকজন সুনিপুণ রাজমিস্ত্রী লইয়া যাও।" হিঙ্গা তাহাই করিল। বাদশাহ হিঙ্গার সঙ্গে রাজমিস্ত্রী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি রাজমিস্ত্রী আনয়নের কথা বলি নাই, তুই কি রূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলি ?" হিঙ্গা আনুপূর্ব্বিক সনাতন ও রূপের কথা বাদশাহকে বলিল। ইতিপূর্ব্বে বাদশাহ মুরশীদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমার এইরাজ্য কতদিন থাকিবে ? মুর্শীদ বলিয়াছিলেন "যতদিন সনাতন ও রূপ মন্ত্রী থাকিবে"। এক্ষণে হিঙ্গার মুখে সনাতন ও রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহাদিগেকে আনয়ন জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, বাদশাহ তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রীত হইয়া এবং বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া, সনাতনকে মন্ত্রিত্বে ও রূপকে সহকারী মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিলেন। সনাতন অবশেষে সাকরমল্লিক ও রূপ দবিরখাস * উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ এই গল্পটী সম্পূর্ণ অমূলক। হোসেন সাহ কোন মিনার বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়না। গৌড় নগরের দুর্গের বহির্ভাগে বার দুয়ারীর অনতি দূরে যে একটী উচ্চ মিনার দৃষ্ট হয়, তাহা হোসেন সাহের নির্ম্মিত নহে, ফিরোজ সাহের নির্ম্মিত। আর মোরগ্রাম মাধাইপুর যদিও এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, কিন্তু তথায় সনাতন ও রূপের মাতুলালয় বা বাসস্থান ছিল, কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের পিতৃনিবাস প্রথমতঃ নবহট্টে † ছিল, তৎপরে জ্ঞাতিবর্গের সহিত কলহ হওয়ায় বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তাঁহাদের অন্য এক বাটী ছিল।

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুলপ্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেইক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গ দেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥
ভক্তিরত্নাকর।

চৈতন্যদেবের আগমনের পর হইতেই রূপগোস্বামী মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সনাতন গোস্বামীও কিছুদিন পরেই তাঁহার অনুসরণ করার মনস্থ করেন। সুলতান হোসেনসাহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। কদম রসুলের দর্গার

* দবিরখাস—খাসমুনসী বা প্রাইভেট সেক্রেটরী। সাকরমল্লিক—সম্রাটের বিশ্বস্ত।

† কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান নৈহাটী।

মধ্যে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত পিঞ্জর আছে। কথিত আছে যে, এই পিঞ্জরে সনাতন গোস্বামী অবরুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে কারাধ্যক্ষকে প্রচুর অর্থপ্রদান করিয়া সনাতন কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, কেহ কেহ বলেন যে, রূপ সনাতন জাতিতে ম্লেচ্ছ ছিলেন। পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া রূপ ও সনাতন নাম গ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থ, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রূপ ও সনাতন নাম পরে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে (১)। কিন্তু এ সম্বন্ধে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতষ্পুত্র জীবগোস্বামী স্বপ্রণীত বৈষ্ণবতোষিণী নামক গ্রন্থে যে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, তাঁহাদের আদি পুরুষ কর্ণাটের রাজা ছিলেন। রূপ ও সনাতন যে তাঁহাদের আদি নাম তাহাও তাহাতে লিখিত আছে।(১) ফলতঃ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এরূপ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন যে, যবন সংস্পর্শে, এমন কি যবন দর্শনে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। রূপ ও সনাতন যবনের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা যবন স্পর্শ করিতে হইত। তাঁহাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার কতকটা যবনের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য চৈতন্যের নিকট অতি দৈন্য ভাবে আপনাদিগকে ম্লেচ্ছভাবে পরিচয় দিয়াছিলেন (২)। তাঁহারা সাধারণতঃ মুসলমান উপাধি দবিরখাস ও সাকরমল্লিক নামেই পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছোপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন হিন্দুনামে পরিচয় দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; ইহাই পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার দিগের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে রামকেলী কেবল আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগের বাস। রেভেন্স সাহেব তদীয় গৌড়ের ভগ্নাবশেষ বিবরণে লিখিয়া-

(১) রূপ সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া।
পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥
ভক্তমাল।

প্রভু চিনি দুই ভাই বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন।
চৈতন্যভাগবত।

আজি হইতে দোহার নাম রূপসনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
চৈতন্যচরিতামৃত।

সাকর মল্লিক নাম সনাতনের ছিল।
রূপ সাকর মল্লিক অভিধা জানাল॥
প্রভু কহে তুমি হও অতি মহজ্জন।
তোমার এমত নাম না হয় শোভন॥
ত্রিকালজ্ঞ প্রভু জানে সর্ব্ব সমাচার।
সনাতন বলি নাম রাখিল তাঁহার॥
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক
(প্রেমদাসকৃত অনুবাদ)

(১) আদি শ্রীল সনাতন স্তদনুজঃ শ্রীরূপনামাততঃ
শ্রীমদ্ বল্লভ নাম ধেয়ো বলিতো। নির্ব্বেদ্যয়োরাজ্যতঃ,
আসাদ্যাতিকৃপাং ততোভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহর প্রেমাখ্য ভক্তিশ্রিয়ে॥
বৈষ্ণবতোষিণী।

(২) পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে বিচার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সহ নিরন্তর রয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
নীচ জাতি সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তার॥
ভক্তি-রত্নাকর।

ছেন যে, কতকগুলি জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সোণা মসজিদ অর্থাৎ বারদুয়ারীতে উপনীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রামকেলীতে তত জঙ্গল নাই। বারদুয়ারীতে যাইতে এক্ষণে কোন জঙ্গল দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার জঙ্গল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থান আবাদ হইতেছে (১)।

সোণামসজিদ বা বারদুয়ারী।—রামকেলীর পশ্চিমে এই মসজিদ অবস্থিত ছিল। গৌড়ের মধ্যে এই মসজিদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট ছিল। ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ক্যানিংহাম সাহেব বলেন যে, ইহার চূড়া ও গুম্বজগুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল, এজন্য ইহাকে সোণামসজিদ বলিত। এক্ষণে সাধারণতঃ লোকে ইহাকে বারদুয়ারী বলে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে আবৃত ছিল। এই মসজিদ ১২০ হাত দীর্ঘ, ৬০ হাত প্রশস্ত ও প্রায় ২৬ হাত উচ্চ ছিল। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক খণ্ডের ছাদ সারি সারি প্রস্তর স্তম্ভ ও খিলানের উপর অবস্থিত ছিল। সমুদয়ে ৪৪ টী গুম্বজ ছিল। ইহার কেবল চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীর ও দক্ষিণদিকের ১১ টী গুম্বজ মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রস্তর ফলক স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা লিখিত ছিল, তাহার মর্ম্ম এই;—"যিনি ঈশ্বরের নামে মন্দির প্রস্তুত করেন, তিনি স্বর্গে তদনুরূপ গৃহ প্রাপ্ত হন। এই মসজিদ হোসেন সাহের পুত্র নছরত সাহ প্রস্তুত করেন। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। ৯৩২হিজরী।"(১৫২৬খ্রীষ্টাব্দে)।

দখলদরজা।—বারদুয়ারীর অনতিদূরে দুর্গের উত্তর দিকে এই দ্বার অবস্থিত। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত। ইহা মধ্যের দিকে প্রায় ৭৫ হাত লম্বা এবং এত উচ্চ যে, হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্য ভাগে কতকগুলি কুঠরী আছে, তথায় প্রহরীগণ বাস করিত। ইহার সম্মুখ ভাগ প্রায় ৪৬ হাত লম্বা। ইহার উপরে কোন প্রস্তর-ফলক নাই। মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন যে, গোয়ামালতী কুঠীতে এক খণ্ড প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাতে প্রথমতঃ একটী ঈশ্বরের স্তোত্র লিখিত ছিল। তৎপরে বর্ব্বক সাহের গুণাবলী বর্ণিত ছিল। সর্ব্বশেষে লিখিত ছিল যে, ৮৭১ হিজরীতে=১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ব্বক সাহের দ্বারা এই দ্বার ও রাজপুরী নির্ম্মিত হয়। রিয়াজ আছাল্লাতীন লেখক বলেন যে, এই দ্বার হোসেন সাহ প্রস্তুত করেন (১)। এই দ্বারের উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী পয়ঃপ্রণালী দক্ষিণদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার অনতিদূরে একটী সমাধি আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হোসেন সাহের সমাধি। এই দ্বারের দক্ষিণে চাঁদদ্বার ও নিমদ্বার নামে আরও দুইটী দ্বার ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কোন চিহ্ন নাই।

দুর্গ।—দখলদরজার পরেই ভাগীরথী তীরে দুর্গ অবস্থিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক্ গড় ও পরিখায় বেষ্টিত। গড় ও পরিখা ব্যতীত দুর্গের কোন চিহ্নই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। গড়ের উপরে এক্ষণে প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুর্গ প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬০০ হইতে ৮০০ গজ প্রশস্ত ছিল।

---

(১) গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে এক্ষণে অনেক সাঁওতালের বসতি হইয়াছে। ইহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনেক স্থান আবাদ করিয়াছে ও করিতেছে।

(১) ক্রেইটন সাহেবের মতে বর্ব্বক সাহ ও ক্যানিংহাম সাহেবের মতে মামুদ সাহ এই দ্বার প্রস্তুত করেন।

বাইশগজী প্রাচীর।—দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাজবাটী ছিল। ইহা চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীর-বাইশগজী প্রাচীর নামে খ্যাত। ইহা প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ও ৮ ফুট প্রশস্ত। স্থানে স্থানে ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রাচীর বেষ্টিত স্থান প্রায় ৭০০ গজ দীর্ঘ ও ২৫০ গজ প্রশস্ত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত ছিল—দরবার মহল, শয়ন মহল ও অন্দর মহল। ইহার প্রায় সমস্তই এক্ষণে শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

ঘড়ীখানা।—দখল দরজার দক্ষিণে অনতিদূরে ঘড়ীখানা ছিল। এই স্থান হইতে ইংরেজ-বাজারে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আনীত হয়। এই ঘণ্টা প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাজান হইত। তিন ক্রোশ দূর হইতে ইহার শব্দ শুনা যাইত। প্রায় ৩০ বৎসর হইল এই ঘণ্টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

খাজাঞ্চী।—বাইশগজী প্রাচীরের মধ্যে একটী বড় পুষ্করিণীর নিকটে এক খণ্ড ভূমি আছে; লোকে ইহাকে খাজাঞ্চী বলে। বোধ হয়,এই স্থানে বাদশাহের খাজানা খানা বা ধনাগার ছিল। কেহ কেহ ইহাকে অন্দরমহলও বলে।

গোছল-খানার গুম্বজ।—খাজাঞ্চীর পশ্চিম দিকে চতুষ্কোণ একটী গুম্বজ আছে। ইহা সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্নানাগার ছিল।

বাঙ্গলা কোট।—খাজাঞ্চীর উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রায় সিকি মাইল দূরে একটী স্থান আছে। তথায় একটী পুষ্করিণী ও তাহার নিকটে কতকগুলি খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ, কতক ভগ্ন প্রাচীর ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি দৃষ্ট হয়। এই স্থানকে লোকে বাঙ্গলাকোট বলে। ইহার নিকটে দুইটী সমাধি আছে। মহদীপুরের প্রাচীন লোকদিগের ও কদমরসুল দর্গার রক্ষকের প্রমুখাৎ শুনা যায় যে, ইহা হোসেনসাহ ও তাঁহার মহিষীর সমাধি।

মিনার বা পির আসা মিনার।—দুর্গের পূর্ব্ব প্রাচীরের বহির্ভাগে এই স্তম্ভ একটী সরোবরের নিকট অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে, আসা নামক পীর এই স্তম্ভের উপরে বাস করিতেন। ফার্গুসন সাহেব বলেন (১) যে,ইহা দিল্লীর কুতুব মিনারের ন্যায় কোন জয়-স্তম্ভ হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগকে উপাসনার্থ আহ্বানের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় ৬০ হাত উচ্চ; উপরে উঠিবার জন্য একটী গোলাকার সিঁড়ি আছে। শিরোদেশে একটী কুঠরী ছিল,তাহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কোন প্রস্তর-ফলক নাই। ৮৯৩ হিজরী (১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) ফিরোজসাহ এক মিনার বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয়,এই স্তম্ভই সেই মিনার। পির আসা নামও ফিরোজসাহ নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। অনেকে এখনও ইহাকে ফিরোজা মিনার বলে। (২)

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

---

(১)Fergussons History of Indian Architecture-

(২) কানিংহাম সাহেব বলেন যে, ফিরোজা শব্দের অর্থ নীলবর্ণ, কারণ ইহা নীলবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত ছিল।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৫)

লিচ্ছবীবংশ।

গুপ্তবংশের মগধে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর, মগধ হইতে লিচ্ছবীবংশের আধিপত্য উন্মূলিত হয়। মগধ হইতে গুপ্তবংশের অধিকার মিথিলা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। গুপ্তবংশের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে লিচ্ছবীবংশ মিথিলা হইতে দূরীভূত হইয়া নেপালের দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। ৩১৯খ্রীঃ (২৪১ শকাব্দে) মহারাজ শ্রীগুপ্ত পাটলীপুত্র (পুষ্পপুর) নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যে অব্দের প্রচলন করেন, তাহা সর্ব্বত্র গুপ্তাব্দ নামে প্রচলিত হয়। শ্রীগুপ্তের রাজত্বারম্ভের কিছুকাল পূর্ব্বে জয়দেব নেপালে লিচ্ছবীবংশের আধিপত্য সংস্থাপিত করেন। এই জয়দেবই নেপালের বংশাবলীতে জয়বর্ম্মন নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনিই লিচ্ছবীবংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মানগৃহে এই লিচ্ছবীবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ৩১৫খ্রীঃ মহারাজ জয়দেবের দ্বারা নেপালে লিচ্ছবীবংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নেপালে জয়দেবের বংশধরগণের রাজত্ব মানগৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৫৩ হর্ষাব্দে (৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ব্বোল্লিখিত রাজপ্রশস্তি লিখিত হয়। সেই সময়ে জয়দেবের বংশধরেরা নেপালে রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রশস্তির ষষ্ঠ শ্লোকে ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

"অস্ত্যেব ক্ষিতিমণ্ডলৈকতিলকো লোকপ্রতীতো মহান্,
আত্রিদিব প্রভাবমহতাং মান্যঃ সুরানামপি।
স্বচ্ছং লিচ্ছবি-নামবিভ্রদপরো বংশঃ প্রবৃত্তোদয়ঃ,
শ্রীমচ্চন্দ্রকলাকলাপধবলো গঙ্গাপ্রবাহোপমঃ॥"

নেপালের লিচ্ছবীবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। লিচ্ছবীবংশের আধিপত্য কালে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই রাজপ্রশস্তির দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রশস্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহারাজ জয়দেবের পর একাদশ জন নরপতি নেপালে রাজত্ব করেন। তদনন্তর বৃষদেব লিচ্ছবীবংশে আবির্ভূত হন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। বংশাবলীর মতে জয়দেব ও বৃষদেবের মধ্যে চতুর্দ্দশ জন নরপতি নেপালের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই চৌদ্দ জনের মধ্যে তিন জন স্ব স্ব ভ্রাতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত শিলালিপিতে তাঁহাদিগকে পুরুষগণনায় উল্লেখ করা হয় নাই। বংশাবলীর মতে বৃষদেব বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে লোকেশ্বরাদি বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃষদেবের ভ্রাতা বালার্চ্চনও বুদ্ধদেবের উপাসক ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এই বৃষদেবের রাজত্ব কালে দক্ষিণাপথ হইতে নেপালে আগমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বৃষদেবের পুত্র শঙ্কর দেব পশুপতিনাথের মন্দিরে এক ত্রিশূল প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃষদেবের সময়ে শঙ্করাচার্য্যের নেপালে আগমন একান্ত অমূলক। কারণ সেই সময়ের শতাধিক বর্ষেরও পরে শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। বংশাবলীর নির্দ্দেশ অনুসারে এই

ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, বৃষদেবের মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত নেপালে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অনাদৃত হইতে থাকে। বৃষদেবের পর শঙ্করদেব, ধর্ম্মদেব, মানদেব, মহীদেব, এবং বসন্তদেব যথাক্রমে পিতৃবিয়োগের অন্তে স্ব স্ব সিংহাসনে উত্তরোত্তর অধিষ্ঠিত হন।

রাজবংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট সময় উপেক্ষার যোগ্য হইলেও, রাজবংশের নামমালা সম্বন্ধে বংশাবলীর সত্যতা ও অভ্রান্ততা শিলালিপি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। বংশাবলীর রুদ্রদেব বা বালার্চ্চন শিলালিপিতে ধ্রুবদেব নামে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

"একাদশ-ক্ষিতিপতীন্ মহনীয়কীর্ত্তীন্
ত্যক্তান্তরে বিজয়িনো জয়দেবনাম্নঃ।
শ্রীমান্ বভূব বৃষদেব ইতি প্রতীতো
রাজোত্তমঃ সুগতশাসন পক্ষপাতী ॥ ৮ ॥
অভূত্ততঃ শঙ্করদেবনামা,
শ্রীধর্ম্মদেবোঽ প্যুদপাদি তস্মাৎ।
শ্রীমানদেবো নৃপতি স্ততোঽভূৎ
ততো মহীদেব ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৯ ॥
বসন্ত ইব লোকস্য কান্তঃ শান্তারিবিগ্রহঃ।
আসীদ্ বসন্তদেবোঽস্মাদ্, দান্তসামন্তবন্দিতঃ ॥১০॥

জয়দেব হইতে বসন্তদেব পর্য্যন্ত একবিংশতি জন লিচ্ছবীবংশীয় নরপতি নেপালে রাজত্ব করেন। বংশাবলী হইতে তাঁহাদের নাম গ্রহণ করিয়া, আমরা নিম্নে তাঁহাদের আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ করিলাম। এই সময় নির্দ্দেশে চারি পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করা হইয়াছে। আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যাসত্যতা পশ্চাৎ বিবিধ শাসনলিপি হইতে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। নেপালের ইতিহাস লিচ্ছবীবংশ হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে।

লিচ্ছবীবংশ।

১। জয়দেব (৩১৫ — ৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
২। বর্ষদেব (৩৪০ — ৬৫ খ্রীঃ)
৩। সর্ব্বদেব (৩৬৫ — ৯০)
৪। পৃথ্বীদেব (৩৯০ — ৪১৫)
৫। জ্যেষ্ঠদেব (৪১৫ — ৪০)
৬। হরিদেব (৪৪০ — ৬৫)
৭। কুবেরদেব (৪৬৫ — ৯০)
৮। সিদ্ধিদেব (৪৯০ — ৫১৫)
৯। হরিদত্তদেব (৫১৫ — ৪০)
১০। বসুদত্তদেব (৫৪০ — ৬৫)
১১। পতিদেব (৫৬৫ — ৯০)
১২। শিববৃদ্ধিদেব (৫৯০ — ৬১৫)
১৩। বসন্তদেব (৬১৫ — ৪০)
১৪। শিবদেব (৬৪০ — ৬৫)
১৫। রুদ্রদেব (৬৬৫ — ৯০)
১৬। বৃষদেব (৬৯০ — ৭১৫)
১৭। শঙ্করদেব (৭১৫ — ৪০)
১৮। ধর্ম্মদেব (৭৪০ — ৬৫)
১৯। মানদেব (৭৬৫ — ৯০)
২০। মহীদেব (৭৯০ — ৮১৫)
২১। বসন্তদেব (৮১৫ — ৪০)

শিবদেব হইতে বসন্তদেব পর্য্যন্ত লিচ্ছবীবংশীয় নৃপতিদিগের নাম পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় নেপালের বিবিধ শিলালিপি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শাসনলিপির সময় নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভগবান লালের যে ভ্রম সংঘটিত হয়, সুপণ্ডিত সিসিল বেণ্ডল (Cecil Bendall) ও ফ্লীট সাহেবের দ্বারা তাহা ১৮৮৫ খ্রীঃ সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়। লিচ্ছবীবংশীয় মানদেব ও বসন্ত দেবের সময় শিলালিপিতে শকাব্দে প্রকাশিত বলিয়া, পণ্ডিত ভগবান লালের প্রথমতঃ ধারণা জন্মে। ডাক্তর বুলারের

পরামর্শে তিনি পরে শকাব্দের পরিবর্ত্তে সেই সময় বিক্রমসংবতে নির্দ্দিষ্ট বলিয়া অনুমান করেন। ডাক্তর ভগবানলাল ইন্দ্রাজী ও বুলার সাহেবের এই ভ্রমপূর্ণ অনুমানের নিমিত্ত তাঁহারা নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ডাক্তর ভগবান লাল এই নিমিত্তই আপনার আবিষ্কৃত উপকরণের যথোচিত ব্যবহার করিতে সক্ষম হন নাই। শকাব্দ বা বিক্রমাব্দ দ্বারা যে শিলালিপির সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা এক্ষণে প্রদর্শন করিব।

১৮৮৪ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে সুপণ্ডিত বেণ্ডল সাহেব বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করার মানসে নেপালে গমন করেন। তিনি নেপালে পর্য্যটন করিয়া তথা হইতে কয়েকখানি নূতন শাসনলিপি সংগৃহীত করেন। ভাটগাঁর গোলমাঢ়িটোলে লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজ শিবদেবের নামাঙ্কিত একখানি শাসনপত্র তিনি প্রাপ্ত হন। সেই শাসনলিপিতে অংশুবর্ম্মন 'মহাসামন্ত' উপাধি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। ঠক্কুরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা অংশুবর্ম্মনকে নেপালের অধিপতি বলিয়া সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। ৬৩৯ খ্রীঃ হিয়াংসাঙ্ ব্রিজি নগরে উপনীত হইয়া তথা হইতে নেপালের বিবরণ সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। হিয়াংসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অংশুবর্ম্মনের আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। এই অংশুবর্ম্মনের ভগিনী ভোগদেবী রাজপুত্র সুরসেনের সহিত পরিণীতা হন। ভোগদেবীর গর্ভে ভোগবর্ম্মন ও ভাগ্যদেবীর জন্ম হয়। অংশুবর্ম্মনের অনুরোধে উক্ত শাসনলিপি লিখিত ও প্রচারিত হয়। অংশুবর্ম্মনের ভাগিনেয় ভোগবর্ম্মন মহারাজ শিবদেবের অধীনে কোন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত শাসনপত্র প্রচারের ভার এই ভোগবর্ম্মনের প্রতি অর্পিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজ শিবদেবের রাজত্ব সময় ৬৪০—৬৫ খ্রীঃ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই শাসনলিপি হইতে আমাদের অনুমানের সত্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এই শাসনলিপির শেষভাগ দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, ৩১৮ সংবতের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে ইহা উৎকীর্ণ হয়। ৩১৮ সংবৎ গুপ্তাব্দ ভিন্ন শকাব্দ বা বিক্রম সংবৎ হইতে পারেনা। শকাব্দ প্রবর্ত্তনের ২৪১ বৎসর পরে ৩১৯ খ্রীঃ গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট শ্রীগুপ্তের সিংহাসন অধিরোহণের সময় হইতে গুপ্তাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। গুপ্তাব্দের অষ্টাশীতিতম বর্ষে মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধিকার নেপাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং নেপালের লিচ্ছবীবংশ গুপ্তসম্রাটের পদানত হয়। গুপ্তসম্রাটদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, নেপালে গুপ্তাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। তদবধি লিচ্ছবীবংশ আপনাদের শাসনপত্রে গুপ্তাব্দের ব্যবহার আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বেই লিচ্ছবীবংশ গুপ্তবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং নেপালের প্রতি গুপ্তনরপতিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহারাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবীবংশীয়া রাজকুমারী কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য অল্লাধিক পরিমাণে নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আলাহাবাদের প্রস্তরস্তম্ভ এই সমুদ্রগুপ্তের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। সেই প্রস্তরস্তম্ভে নেপালের উল্লেখ দেখা যায়। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে নেপালের গুপ্ত-

সম্রাটের আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। অনুমান ৪০৭ খ্রীঃ (৮৮ গুপ্তাব্দে) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তদবধি নেপাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নেপালে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়। নেপালের রাজবংশাবলীর মতে "ভুক্তমানগত" নেপালের প্রথম রাজা। তিনি ৮৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এই নাম কোন মনুষ্যবাচক নহে বলিয়া স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইহা "ভুজ্যমান গুপ্তবর্ষ" শব্দের অপভ্রংশ ও অশুদ্ধি পাঠ বলিয়া সুপণ্ডিত ফ্লীট সাহেব অনুমান করেন। গুপ্তবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাল ইহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভিটারীর প্রস্তরলিপি ও গয়ার শাসন পত্রে লিচ্ছবীবংশের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্তের নামাঙ্কিত কুহাউনের স্তম্ভলিপিতে নেপাল পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারিত থাকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শিবদেবের নামাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত শাসনলিপি ৩১৮ গুপ্তসংবতে লিখিত হয়। ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইল। এই শাসনলিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ৬৩৭ খ্রীঃ (৩১৮ গুপ্তাব্দে) লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজ শিবদেব নেপালে রাজত্ব করিতেছিলেন। শিবদেব ও অংশুবর্ম্মন একই সময়ে নেপালে আবির্ভূত হন। এই শাসনলিপির সময়ে অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবীরাজের আজ্ঞাবহ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অংশুবর্ম্মন সেই সময় পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অবলম্বন করেন নাই। মহাপরাক্রান্ত অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবীরাজের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অংশুবর্ম্মন অধীন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নেপাল শাসন করিতেছিলেন। লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজ শিবদেব তাঁহার হস্তে ক্রীড়নকভাবে বিদ্যমান ছিলেন। রাজার নামে অংশুবর্ম্মন নেপালে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই নিমিত্তই পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্‌ মিথিলা হইতে নেপালের বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক অংশুবর্ম্মনকে নেপালের নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

লিচ্ছবীবংশীয় শিবদেবের রাজত্বকালের শেষভাগে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মন পশ্চিম নেপালে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাজা শিবদেব ও তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্বনেপালে রাজত্ব করিতে থাকেন। মানগৃহে লিচ্ছবীবংশের রাজধানী স্থাপিত ছিল। 'কৈলাসকূট' ভবনে ঠকুরী বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অংশুবর্ম্মনই নেপালে ঠকুরীবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় দেড়শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত লিবচ্ছী ও ঠকুরী বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম নেপালে এক সময়ে সমভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

আপনাদের নামাঙ্কিত শাসনপত্রাদিতে লিচ্ছবীবংশ যেমন গুপ্তাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন, সেইরূপ ঠকুরীবংশ রাজকীয় যাবতীয় লিপিতে হর্ষাব্দের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। নেপালের বংশাবলীর মতে অংশুবর্ম্মনের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বিক্রমাদিত্য স্বয়ং নেপালে আগমন করিয়া, নেপালে সংবতাব্দ প্রচলিত করেন। এই বিক্রমাদিত্য কনোজের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ভিন্ন অপর কেহ নহেন। তিনিই বিক্রমাদিত্য নামে বংশাবলীতে পরিচিত হইয়াছেন। ৬০৬-৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রদেশ প্রবলপ্রতাপে শাসন করিতে থাকেন। নেপাল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর নেপালের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের

অধিকারভুক্ত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক অংশুবর্ম্মন সম্ভবতঃ নেপালে ঠক্কুরীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি হর্ষাব্দ পশ্চিম নেপালে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে ঠক্কুরীবংশ আপনাদের শাসনপত্রে হর্ষাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন। হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পশ্চিম নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না থাকিলে, অথবা চতুর অংশুবর্ম্মন তাঁহার অধীনতা স্বীকার পুরঃসর পশ্চিম নেপালে স্বাধীনতা অবলম্বন না করিলে, পশ্চিম নেপালে হর্ষাব্দ প্রচলনের অন্য কারণ দেখা যায় না। লিচ্ছবীবংশের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অংশুবর্ম্মন পশ্চিম নেপালের শাসনদণ্ড স্বাধীনভাবে পরিচালন করিতে থাকেন। হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক অংশুবর্ম্মন আপনার পূর্ব্বতন প্রভু শিবদেবের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরেই অংশুবর্ম্মন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া, কনোজরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভের কাল ৬০৬ খ্রীঃ হইতে কনোজ ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশে হর্ষাব্দের গণনা আরম্ভ হয়।

নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু নগরের পাঁচ মাইল উত্তরে শিবপুরী নামে এক গ্রাম আছে। তাহার নিকটে 'বুড্ড নীলকণ্ঠ' নামে ৪০ বর্গ ফুট পরিমিত একটী প্রাচীন জলাশয় বিদ্যমান আছে। এই জলাশয় সর্ব্বদা এক নির্ঝরিণীর জলে পূর্ণ থাকে। রুদ্রমতি নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এই পুষ্করিণী হইতে নির্গত হইয়াছে। জলাশয়ের মধ্যস্থলে জলশায়ী এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিবর্ম্মন এই বিষ্ণুমূর্ত্তি জলাশয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জলাশয়ের তীরবর্ত্তী এক প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ শিবদেবের নামাঙ্কিত আর একখানি প্রাচীন শিলালিপি পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবী রাজ শিবদেবের সেনাপতি বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছেন। এই লিপি খণ্ডিত। ইহা কোন্ সময়ে খোদিত হয়, তাহা জানা যায় নাই।

বাঙ্গমতী নামে জনাকীর্ণ গ্রামের নিকট একখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রাম কাটমাণ্ডু নগরের ৪মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে মৃত্তিকাতলে এই প্রস্তরলিপি সচরাচর প্রোথিত থাকে। প্রতি দ্বাদশ বর্ষের অন্তে রথযাত্রার সময়ে ইহা উত্তোলিত হইয়া, গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে নীত হয়। অবলোকিতেশ্বরের মৃণ্ময়মূর্ত্তি রৌপ্যমণ্ডিত। তিনি মৎসেন্দ্রনাথ নামে বাঙ্গমতী গ্রামে পূজিত হইতেছেন। এই শিলালিপি ৩৪ হর্ষাব্দের(৬৪০খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে লিখিত হয়। ইহাতেও অংশুবর্ম্মন 'মহাসামন্ত' নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি পশুপতিনাথের উপাসক ছিলেন। এই শাসনলিপি 'কৈলাসকূট' রাজধানী হইতে লিখিত হয়। প্রাচীন দেবপাটন নগরে পশুপতিনাথের সুবিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরাংশে অংশুবর্ম্মনের রাজধানী 'কৈলাসকূট' নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের উত্তরাংশে ৪০ ফুট উচ্চ এক মৃত্তিকাস্তূপ 'কৈলাসকূট' নামে অদ্যাপি পরিচিত।

দেবপাটন নগরে পশুপতিনাথের প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরে গণেশদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই

গণেশ মন্দিরের সমীপে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়, তাহা ৩৯ হর্ষাব্দের (৬৪৫ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমীতে লিখিত হয়। এই লিপি কৈলাসকূট হইতে যুবরাজ উদয়দেবের দ্বারা প্রচারিত হয়। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্বেই মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মন রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। অংশুবর্ম্মনের ভগিনী ও ভোগবর্ম্মনের মাতা ভোগদেবী পতি শূরসেনের মৃত্যুর পর 'শূরভোগেশ্বর' নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভোগবর্ম্মনের ভগিনী ভাগ্যদেবী 'ললিতমহেশ্বর' নামে এক শিবমন্দির স্থাপিত করেন। এই উভয় দেবমন্দিরের পূজার্চ্চনার ভার এক দল সেবাইতের প্রতি অর্পিত হয়। শাসনলিপিতে তাহারা 'পাঞ্চালিক' নামে পরিচিত হইয়াছে। দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালার শাসন সমরক্ষণের ভার অদ্যাপি পঞ্চায়েৎ দ্বারা নেপালে নির্ব্বাহিত হয়। নেপালে ইহারা 'গুটি' নামে পরিচিত।

কাটমাণ্ডু হইতে ব্রিটিস রেসিডেন্সী যাওয়ার পথে 'রাণীপোখরী' নামে এক সরোবর আছে। তাহার নিকটে 'সাতধারা' নামক স্থানে একখানি ক্ষুদ্র শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, অংশুবর্ম্মনের রাজত্বকালে ৪৫ হর্ষাব্দে (৬৫১ খ্রীঃ) বিভুবর্ম্মন দ্বারা এই সপ্তধারা খনিত ও নির্ম্মিত হয়।

উপরে যে পাঁচখানি শিলালিপির বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে লিচ্ছবীবংশীয় শিবদেব এবং ঠকুরীবংশীয় অংশুবর্ম্মনের সময় নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। শিবদেব ও অংশুবর্ম্মন একই সময়ে নেপালের বিভিন্ন ভাগে রাজত্ব করেন। শিবদেবের রাজধানীর নাম মানগৃহ ও অশুবর্ম্মনের রাজধানীর নাম কৈলাসকূট। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়েই প্রাদুর্ভূত হন। লিচ্ছবীবংশ আপনাদের নামাঙ্কিত শাসনলিপিতে গুপ্তাব্দের এবং ঠকুরীবংশ হর্ষাব্দের ব্যবহার করিতে থাকেন। ৬৩৭-৬৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত অংশুবর্ম্মন মহাসামন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। ৬৪৫ এবং ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের শাসনলিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, লিচ্ছবীরাজ শিবদেবের রাজত্বের শেষভাগে, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজোপাধি গ্রহণ পুরঃসর স্বাধীন ভাবে পশ্চিম নেপাল শাসন করিতে থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে শিবদেবের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে যে সময় অনুমান করিয়াছি, শাসনলিপির নির্দ্দিষ্ট সময়ের সহিত তাহার সামান্য পার্থক্য ঘটিতেছে। এই সামান্য ব্যতিক্রম আমাদের অনুমানের সত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে লিচ্ছবী ও ঠকুরী বংশীয় নরপতিদিগের সময় নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে শাসনলিপির প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিব। শিবদেব ও অংশুবর্ম্মনের বংশধরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাসন-লিপি হইতে সংগৃহীত করিয়া অতঃপর প্রদর্শন করিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রেম-ভিখারী।

১

সংসার-পাথার মাঝে আমি যে ভিখারী গো
ভিক্ষা মোরে দাও!
আমার হৃদয় নিধি হারায়েছি আমি গো
কি আর শুধাও?
এই ছিল কোথা গেল,
কোথা এবে লুকাইল,

আঁধারে করিল আলো পরশ রতন,
হায় আমি সে রতন হারানু এখন!

২

আমারে এ রবি শশী আমারে এ গ্রহ তারা
না দেয় আলোক!
হায় আমি কোথা যাব! বহিতে না পারি আর
এ বিষম শোক।
কুজ্ঝটিকা অন্ধকার,
বেড়িয়াছে চারি ধার,
শূন্য—শূন্য-সবশূন্য, অনন্ত গগন
অভাগারে নাহি করে কর বিতরণ।

৩

আমার মাণিক যবে হৃদয়ে আছিল রে!
আলোকিয়া ঘর,
হয়েছিল ধরাধাম কি সুন্দর—কি সুন্দর
স্নেহের আকর!
রবি করে স্নেহ ঝরে,
তরু শিরে স্নেহ ক্ষরে,
স্নেহময়—স্নেহময়—ভূধর সাগর
হয়েছিল চরাচর স্নেহের নির্ঝর!

৪

সংসার পাথারে আমি প্রেমের ভিখারী গো
ভিক্ষা মোরে দাও!
প্রেম মন্ত্র—মহামন্ত্র তোমরা সকলে গো
আমারে শিখাও!
এ সংসারে এস এস,
আমার হৃদয়ে বস,
ডুবে যাই ডুবে যাই হারাই চেতন!
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও নরনারীগণ।

৫

প্রেমের সাগরে আমি ডুবিবারে চাই গো
ডুবিবারে চাই,
আমার এ বড় সাধ আমার আমিত্ব আমি
সাগরে ডুবাই!
অহঙ্কার দূর হবে
প্রেমে একাকার সবে,
এ বুদ্‌বুদ ভেঙ্গে যাবে খুলিবে নয়ন,
এই ভিক্ষা চাই ওগো নরনারীগণ।

৬

হায়! সে হৃদয় নাথ কোথা গেল ফেলি মোরে
অকূল পাথারে,
কাঁদিতেছি তাই আমি শূন্যমনে বসে এই
বিষম আঁধারে।
এস দেব তুমি এস,
অভাগার হৃদে বস,
তব দরশন মাত্র আবার আবার,
উথলিবে অভাগার প্রেম-পারাবার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

প্রেমের আদর্শ।

১

সাজো তুমি, স্বজনি লো, প্রেমের যূথিকা,
সলাজ কলিকাগুলি, সাবধানে হাতে তুলি,
সভয়ে ভুঞ্জিতে চাই সৌরভ-কণিকা।
তীব্র এ চম্পক-ঘ্রাণ, চাহেনা কবির প্রাণ,
অন্ধ করে গন্ধরাজ নিবিড় পরাণে;—
প্রেমের মত্ততা, সখি, ভাল নাহি লাগে।

২

পর তুমি, প্রাণাধিকে, ঊষার সুষমা;—
প্রশান্ত আকাশ-গায়, দু'টি রশ্মি দেখা যায়,
নিকুঞ্জে মৃদুল কণ্ঠে গীতি মৃদুতমা।
চাহিনা সে দ্বিপ্রহরে, রৌদ্রমাখা মেঘথরে
প্রমত্ত পাপিয়া তান দৃপ্ত অনুরাগে;—
প্রেমের সপ্তম, সখি, ভাল নাহি লাগে।

৩

হও তুমি, প্রিয়তমে, ক্ষীণা স্রোতস্বতী;—
অতি মৃদু মৃদু তান, ধীরে ধীরে বহমান,
কহিয়া কবির কাণে অপূর্ব্ব ভারতী।
চাহি না যে উন্মাদিনী বর্ষার-তটিনী-রাণী,
আপনি সহস্র-ধারা আপনার রাগে;—
প্রেমের প্লাবন, সখি, ভাল নাহি লাগে।

থাকো তুমি, বালিকা লো, বধূ বাঙ্গালীর ;—
উদাসিনী উমারাণী, শান্তির প্রতিমা-খানি,
নায়িকা স্বজন-কাব্যে, রহস্য গভীর !—
চাহিনা সে ভীমা-শ্যামা, ছিন্নমস্তারূপা বামা,
বিয়োগান্ত নাট্যে যার বীর মূর্ত্তি জাগে ;—
প্রেমের ভৈরবী, সখি, ভাল নাহি লাগে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

মানবী কি দেবী।

স্বরগের পূত ছবি
মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী
নীরব মাধুরী যেন বাসন্তী নিশায়।
মল্লিকা-সুরভি-বাস
হিমাংশুর সুধা-হাস
শরীর ধরিয়া যেন এসেছে ধরায়।
চারু মুকুলিকা গুলি
যথা সমীরণে দুলি
বালারুণ করে ফুটি হাসে মধুময়,
থেকে থেকে রাঙ্গা দুটি
অধর-পাপড়ি ফুটি
তেমনি সলজ্জ হাসি প্রাণ কেড়ে লয়।
যেমন গোধূলি কালে,
সুদূর দিগন্ত কোলে,
রক্তিম কিরণ মৃদু ভাসিয়া বেড়ায়,
তেমনি ললাটতলে,
সুকোমল গণ্ডস্থলে,
ঈষৎ রক্তিম আভা কিবা শোভা পায়।
কুঞ্চিত কুন্তল দাম
জলদ প্রতিম ঠাম
স্থির সৌদামিনী পাশে মেঘ যেন খেলে।
নব কিশলয়ে নত
বসন্ত বল্লরী মত
শ্যামল মাধুরী যেন আঁখি'পরে দোলে।
যবে মুখপানে চাই
আপনা ভুলিয়ে যাই
সম্মুখে খুলিয়া যায় স্বরগের দ্বার,
যেন কোন দেবী এসে
হাত ধ'রে মৃদু হেসে
পরাইয়া দেয় গলে পারিজাত হার।
যখন সরম ভুলি
প্রেমপূত আঁখি তুলি
মৃদুল দৃষ্টিতে মোর মুখপানে চায়,
যেন ইন্দ্রজাল বলে
মরুময় হৃদিতলে
শত মন্দাকিনী স্রোত ছুটাইয়া দেয়।
রূপমুগ্ধ আঁখি মোর
চাহিয়া চাহিয়া ভোর,
মিটেনা পিয়াস কেন তাই শুধু ভাবি ;
এমন পাগল করা
এমন হৃদয় ভরা
রূপ যার, জানি না সে মানবী কি দেবী।

শ্রীবিজয়গোপাল পাল।

গীতার প্রামাণ্য। (৬)

তৃতীয়তঃ, গীতা অনুমানেও প্রামাণ্য।

আমাদের সামান্য জ্ঞান সমুদায়, হয় ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ, না হয় সেই প্রত্যক্ষের অনুমান। ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ লইয়াই মন কার্য্য করে ; সে প্রত্যক্ষের অতীত হইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষে যাহা নাই, তাহা মানসিক অনুমানে নাই। প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই অন্ধ অনুমান দিশাহারা হয়,

কিছুই ঠিক করিতে পারে না। কারণ, যাহা অনুমানে লব্ধ হয় নাই, অনুমান তাহার মীমাংসা করিবে কিরূপে? যাহা অনুমানে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই অনুমানের হাত আছে। ব্রহ্ম, আত্মা, পরলোক, জীবের কর্ম্মফল প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় আদৌ অনুমানে লব্ধ হয় নাই, সুতরাং অনুমান দ্বারা তাহাদের কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না।

আমাদের বাহ্য জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, তাহা সাপেক্ষ (Relative) সমান জ্ঞান মাত্র। সংসারে সমুদায় বস্তু পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের জ্ঞান নহিলে অপরের জ্ঞান জন্মে না। যদি শ্বেতজ্ঞান না হইত, তবে লোহিত বা কৃষ্ণজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। গো জ্ঞান না হইলে অশ্ব জ্ঞান হয় না। সুতরাং বাহ্যজ্ঞান মাত্রই পরস্পর সাপেক্ষ জ্ঞান। যাহা পরস্পর সাপেক্ষ তাহা (á posteriori এবং অর্জ্জিত জ্ঞান। সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। ধর্ম্মীর জ্ঞান আপেক্ষিক, তাহা নির্ম্মল নিরপেক্ষ Absolute জ্ঞান নহে।

আমাদের বাহ্য জ্ঞানের এই সাপেক্ষ ধর্ম্ম বশতঃ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অতীন্দ্রিয়ের আভাস মাত্র আইসে—যেমন অংশত্ব জ্ঞান নিরংশত্বের আভাস, অবয়ব জ্ঞান হইতে নিরবয়বের আভাস, পরিমিত জ্ঞান হইতে অপরিমেয়ের আভাস, সান্ত হইতে অনন্তের আভাস এবং অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বের আভাস। কিন্তু এ সমস্তই আভাস মাত্রই থাকিয়া যায়। তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান কোন মীমাংসা করিতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমানের অন্ধতা প্রযুক্ত তাহা ব্রহ্ম নিরূপণে কি জন্য অসমর্থ, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি।

(১) এ জগতে সমস্ত পদার্থই পরস্পর সাপেক্ষ কার্য্যকারণ ভাবে অবস্থিত। যাহা একের কার্য্য, তাহা অন্যের কারণ এবং যাহা একের কারণ, তাহা অন্যের কার্য্য। সেই জন্য বাহ্য জ্ঞান ও অনুমান কেবল কার্য্য কারণের জ্ঞান মাত্র। যাহা একেবারে কার্য্য রহিত বা একেবারে কারণ হীন, এমত বস্তু অনুমানের বহির্ভূত। সুতরাং অনুমান আদি কারণে উঠিতে পারে না।

(২) প্রাকৃতিক কার্য্যজ্ঞান উপাদান কারণের সমবেত কার্য্যফলজ্ঞান মাত্র। তুমি কাষ্ঠ, জল, অগ্নি, তণ্ডুল ও পাত্র একত্র করিয়া দিলে তবে অন্ন প্রস্তুত হইল। সুতরাং তোমার অন্নরূপ কার্য্যজ্ঞান কতিপয় উপাদান কারণের সমবেত ফলজ্ঞান এবং তুমি অন্নের নিমিত্ত-কর্ত্তা মাত্র। আমরা যে সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাহা এইরূপ নির্ম্মাণ-কার্য্য; তদ্দ্বারা বস্তুর আদি উৎপত্তি বা সৃষ্টিজ্ঞান সম্ভবে না। সৃষ্টির কর্তৃত্ব আছে কি না, তদ্বিষয়ে অনুমান সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যিনি বলেন, এ জগৎ ঈশ্বর-নির্ম্মিত, তিনি ন্যায়ানুসারে অভ্যুপগম (Hypothetical) সিদ্ধান্তই করিলেন। কি নিমিত্ত কারণ, কি উপাদান কারণ, দুই কারণই যে এক পরব্রহ্মে নিহিত রহিয়াছে; ব্রহ্ম নিজেই উপাদান এবং নিজেই নিমিত্ত-কারণ হইয়া "অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ" হইয়াছেন, এ জ্ঞান অনুমানের বিশ্বজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয় না।

(৩) বাহ্যজ্ঞানে প্রতীত যে, যেখানে শরীর, সেই খানেই চেতনা। প্রাণহীন মৃতশরীর শরীর নহে, তাহা শরীরের ধ্বংস, মৃত্যুমাত্রই শরীরের ধ্বংসারম্ভ হয়। সুতরাং শরীর ব্যতীত চেতনা নাই। এ প্রত্যক্ষের

সম্ভবতঃ অনুমান এই যে, চেতনা শরীরজাত চিৎ হইতে যে জড় এবং শরীরের উৎপত্তি, এই শাস্ত্রোপদেশ অনুমানে সিদ্ধ নহে। সুতরাং অনুমান দ্বারা চিতের নিত্যত্ব সপ্রমাণ না হওয়াতে আত্মার নিত্যত্ব এবং পরকালের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয় না।

(৪) এ বিশ্ব কৌশলময়। এই কৌশলজ্ঞান হইতে কোন কৌশলজ্ঞ পুরুষের অনুমান হওয়া সম্ভব। কিন্তু অনুমান ত সেই স্থানেই স্থির থাকিতে পারে না। কার্য্য কারণ জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন অনুমান কহে, এই কৌশলময় পুরুষের উৎপত্তি কিরূপ? এই কৌশলজ্ঞ পুরুষের উৎপত্তিকারণ যদি অন্য কৌশলজ্ঞ পুরুষ হন, তবে সেই অন্য পুরুষের উৎপত্তি কিরূপ? তবেই অনন্ত পরম্পরায় পুরুষের ক্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং অনবস্থা দোষ জন্য কোন মীমাংসাই সম্ভব নহে।

কৌশল মাত্রই শক্তির অভাবের পরিচায়ক। যেখানে বলের অভাব, সেই স্থানেই লোক,কৌশলদ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে। তেতালায় লৌহকড়ি তোলা বাহুবলের অভাব প্রযুক্ত লোকে কপি-কল ব্যবহার করে। সুতরাং বিশ্বকৌশল বিদ্যমান থাকাতে অনুমান বলে যে, বিশ্বকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, সে বিশ্বকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন।

এ বিষয় সুবিস্তৃতরূপে লিখিতে গেলে নিরীশ্বরতা প্রতিপাদক একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই পর্য্যন্তই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আমাদের মূল কথার পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, অনুমান অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। তৎসম্বন্ধে সম্ভাবনা এবং অসম্ভাবনা মাত্র অনুমিত হয়—সকলই সম্ভব এবং সকলই অসম্ভব! সেই জন্য সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, অনুমানে ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন, বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন,সাংখ্যকার এমত কথা বলেন নাই যে "ঈশ্বরাভাবাৎ" ঈশ্বর নাই; তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।"—সাংখ্যসূত্র ১অ ৯২ সূত্র।

বেদান্ত এই কথারই সমর্থন করিতেছেন :—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"
তলবকারোপনিষৎ।

টীকাকার অনুমত অর্থ এই :—

যাঁহারা এরূপ জানিয়াছেন যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন এবং যাঁহারা এরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, আমরা সামান্য ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন না। জ্ঞানিগণ বিলক্ষণ জানেন যে, ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে যে, তাঁহাকে সামান্য ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান দ্বারা জানা যাইতে পারে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানাদি অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান অনুমান-সিদ্ধ নহে, তাহা অন্য কোন উপায় দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অলৌকিক বিষয় সমস্তের জ্ঞান বহুকাল হইতে সংসারে সুপ্রচারিত আছে। সুতরাং তাহা সাধারণ লোকমণ্ডলীর একরূপ সংস্কারবৎ হইয়া আছে। লোকে শৈশব হইতে তাহা অর্জ্জন করে এবং বড় হইলে মনে করিতে পারে যে, এই সমস্ত জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উপজাত হইয়াছে। কিন্তু বেদ দেখাইয়া দিতেছে

যে, তাহা পূর্ব্বে জ্ঞানিগণের আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধারণ জনগণ মধ্যে সুপ্রচারিত থাকিলে তাহার যে উৎপত্তিকারণ নাই, এমত সম্ভবিতে পারে না। যখন উৎপত্তিকারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন তাহাকে স্বভাবজ বলা যাইতে পারে না। অতএব, আমরা আশৈশব যে সমস্ত অলৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন করি, পরে সহজ বোধ হইলেও, বাস্তবিক তাহারা সহজ জ্ঞান নহে। সে সমস্ত জ্ঞানই অর্জ্জিত।

অতএব, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শুদ্ধ অনুমান দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা দুষ্কর। অনুমান লৌকিক বিষয় মধ্যে আবদ্ধ। সে গণ্ডী অতিক্রম করিতে গেলে অনুমান কোন মীমাংসা করিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা আপ্তবাক্যের শাসনাধীন না হইতে চাহেন, তাঁহারা নানাবিধ অনুমান ও তর্কজালে জড়িত হইয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। কিছুতেই তাঁহাদিগকে ঠিক রাখিতে পারে না। কোন সাধারণ ধর্ম্মমত বা তন্ত্র তাঁহাদিগকে শাসন করিতে পারে না। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন ধর্ম্মগুরু হইয়া পড়েন। শিষ্য কেহই নাই, অথবা নিতান্ত নির্ব্বোধেরা বা ধর্ম্মচিন্তাবিহীন জনগণ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই শিষ্যেরাই দেখেন যে, তাহাদের গুরুগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন বিষয় ও নূতন নূতন তন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। এক সময়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, অন্য সময়ের উপদেশের সহিত তাহার মিল নাই। সুতরাং তাহাদের গুরুগণ নিজেই আত্মবিরোধী হইয়া পড়েন। প্রতি বায়ু ফুৎকারে গুরুগণের মত পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং কর্ণধারবিহীন নৌকা যেমন তরঙ্গাভিক্ষিপ্ত হইয়া দিক্‌বিদিক্ চালিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে আপ্তবাক্যশাসনাধীন না হইলে, শুদ্ধ নিজ বুদ্ধি ও অনুমানাবলম্বিগণ নানা দিকে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকেন। আপ্তবাক্য কর্ণধারের কার্য্য সাধন করে; আত্মার গতি ও ধর্ম্মের গতি ঠিক করিয়া দেয়। তার পর তুমি নানা গুরূপদেশে তরঙ্গদোলায় দোদুল্যমান হইতে পার, কিম্বা কোন কোন সময়ে বায়ু-তাড়িত হইয়া পার্শ্ব দিকে হেলিতে দুলিতে পার, কিন্তু বেদবাক্য তোমার লক্ষ্যকে ঠিক করিয়া দিয়া দিগ্‌দর্শনের শলাকাবৎ সেই অনুকূল দিকেই তোমার অধ্যাত্ম-তরিকে প্রচালিত করে। মনু বলিতেছেন :—

> "উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
> তান্যর্বাকালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানিচ ॥"
> ১২-অ-৯৬।

যাহা বেদ-মূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত শাস্ত্র, তাহা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে; আধুনিকতা হেতু তাহা নিষ্ফল ও মিথ্যা।

তবে কি অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে অনুমান কোন কার্য্যেই আইসে না?

আপ্তবাক্য দ্বারা অলৌকিক বিষয় জ্ঞান জন্মিলে, অনুমান সেই জ্ঞানের সহায়তা করে। গুরূপদেশ বা শাস্ত্রজ্ঞান হইতে অদৃষ্টার্থক বিষয়ের অর্থবোধ জন্মে। এই জ্ঞানকে অনুমান সম্ভব-যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দেয়। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ অনুমান পরিদৃশ্যমান। এজন্য দর্শন বলিয়াছেন, আমার অধিকারী হইতে গেলে, অগ্রে সমগ্র বেদপাঠ করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। দর্শন শাস্ত্র সমুদায় বেদেরই মীমাংসক। জ্ঞান না থাকিলে কিসের মীমাংসা করিবে? অতএব, অগ্রে শাস্ত্রজ্ঞান, তৎপরে তাহার মীমাংসা।

বেদান্ত ভাষ্যকার পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমন্দির বলেন ;—

"ন চানুমানস্য নিয়তপ্রামাণ্যম্।"

অনুমানের নিয়ত প্রামাণ্য নাই। মাধবাচার্য্য এ কথার ব্যাখ্যা করিয়া লেখেন ;—

"ন চানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রামাণ্যমস্তি।"

অনুমান স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোন বিষয়ে (ধর্ম্মবিষয়ে) প্রমাণ হইতে পারে না।

কূর্ম্মপুরাণেও এই কথা ;—

"শ্রুতিসাহায্যরহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ॥
শ্রুতিস্মৃতিসহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্।
প্রমাণপদবীং গচ্ছেন্নাত্র কার্য্যা বিচারণেতি॥"

শ্রুতি-সাহায্য-নিরপেক্ষ অনুমান কুত্রাপি নিয়ম সহকারে অর্থ সাধনে সমর্থ এবং প্রমাণান্তর রূপে পরিগণিত হয় না। যাহা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্য সমন্বিত, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং তাহাই প্রমাণ পদবীরূপে পরিগণিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই।

মনু বলিতেছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাঽবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" ১২অ—১০৬

বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।

গীতা কিরূপ অনুমান দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চাহেন? গীতা নিজেই তাহা বলিতেছেন :—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"
১০অ—৯।

ভগবদ্ভক্তগণ আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া মদীয় তত্ত্ব, ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ সমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া এবং নিরন্তর আমার কীর্ত্তন করিয়া নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন ও পরম শান্তিলাভ করেন।

শ্রীধর বলেন ;—শ্রুত্যাদি প্রমাণে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া যেরূপে ব্রহ্মকে জানা যায়, সেইরূপে জানিয়া ভক্তগণ ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন।

অন্যত্রও গীতা বলেন :—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"
৪ অ—৩৯।

যিনি গুরূপদিষ্ট বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্, গুরুভক্তিপরায়ণ এবং যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ, জ্ঞানলাভানন্তর তিনি অচিরে মোক্ষলাভ করেন।

গীতার বিষয় যে আত্মজ্ঞান, তাহা লাভ করিতে হইলে সংযতেন্দ্রিয় হওয়া চাই এবং গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরূপদেশ শ্রবণ করা চাই। গুরূপদেশে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে কখনই গীতোপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের অধিকারী নহে। কিন্তু যাহারা গুরূপদেশ এবং শাস্ত্রজ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়া শুষ্ক অনুমান ও স্বকীয় স্বতন্ত্র বুদ্ধি অবলম্বনে সংশয়ী হয়েন, তাহারা কেবল নিরীশ্বরতায় উপনীত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। গীতা সেই কথা বলিতেছেন :—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"
৪ অ—৪০।

যাঁহার গুরূপদিষ্ট অর্থে জ্ঞান নাই বা কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে শ্রদ্ধা নাই, তিনি সংশয়ী হইয়া বিনষ্ট হন। তাঁহার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং সুখও নাই।

তবেই গীতা বলিতেছেন, যে সামান্য অনুমান ও বুদ্ধি পারমার্থিক বিষয়ে কেবল

সংশয়পূর্ণ এবং শ্রদ্ধাবিহীন, তদ্বারা আমি প্রামাণ্য নহি। আমার প্রমাণ ভক্তিযুক্ত অনুমান। এইরূপ অনুমান দ্বারা গীতোক্ত আত্মতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ, কর্ম্মফলবাদ প্রভৃতি সমুদায় বৈদিক অলৌকিক তত্ত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। গীতা সেরূপ প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মতত্ত্বের অনুমানমূলীয় প্রমাণ এইরূপ :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" ২অ-১৬।

যাহা পরিবর্ত্তনীয়, তাহাই অসৎ। সতের আশ্রয় ব্যতীত অসৎ কখন প্রতীত হইতে পারে না; যাহা সৎ, তাহার কখনই পরিবর্ত্তন বা অভাব হইতে পারে না। সৎ ও অসতের এইরূপ তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বদর্শিগণ আত্মাতিরিক্ত কাহারই নিত্যতা স্বীকার করেন না।

আলোক ভিন্ন যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না, তেমনি সৎ ভিন্ন অসতের প্রতীতি হয় না। এই দেহ এবং সুখ-দুঃখ-বোধ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা দিবানিশি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা কোন্ বস্তুর পরিবর্ত্তন? যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল অসতের নিয়ত উদয় হইতেছে, তাহাই আত্মা। এস্থলে বহির্বিষয়ের অনুমান অলৌকিক আত্মবিষয়ে আরোপ করিয়া সামান্যতোদৃষ্ট ন্যায়ে (Analogy) আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণ সিদ্ধ হইল। এজন্য আমাদের দর্শনশাস্ত্রে উপমান প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা উপমানকে অনুমান-অন্তর্গত বলেন, তাঁহারা উপমানকে অস্বীকার করেন না। Bishop Butler এই Analogy বলে এককালে ইংলণ্ডীয় নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের ধ্বংস করিয়া আপ্তবাক্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

গীতার জন্মান্তরবাদ কিরূপ অনুমান তর্কে সিদ্ধ, দেখুন :—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥"
২ অ—১৩।

এই বর্ত্তমান দেহে যখন প্রথমে শৈশব তৎপরে যৌবন, তৎপরে বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, যখন এক দেহের উপর সাক্ষাৎ এত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্য অপরিবর্ত্তনীয় একটি নিত্যসত্ত্বা দেহান্তরে বর্ত্তমান আছেন। সেই নিয়মে মৃত্যুর পর যে দেহান্তর হয়, তাহারও পরিবর্ত্তনে অন্য দেহ হয়; এক দেহ ধ্বংসের পর যে অন্য দেহ হয়, তাহা পরিবর্ত্তন মাত্র। দেহান্তর প্রাপ্তিতে যখন কোনরূপে আত্মনাশ হয় না, তখন ধীর ব্যক্তি (ন্যায় সঙ্গত উপমান যুক্তিবলে) দেহান্তর প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হয়েন না। কারণ—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানী দেহী॥" ২ অ-২২।

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করেন, দেহী ও (আত্মা) সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ প্রাপ্ত হন। গীতায় কর্ম্মফলবাদের অনুমান এইরূপ :—

আমরা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবাদ দ্বারা জানিতে পারি, কর্ম্মানুসারেই আত্মার দেহান্তর ঘটে। তাই যদি হইল, তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আদিতে কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল। তৎসম্বন্ধে গীতা বলেন, তুমি আদি কোথা পাইলে?

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাং শ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান॥"
১৩অ-১৯।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার, সুখ দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই যে সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। সুতরাং যুক্তি এই,যখন এই প্রকৃতিই অনাদি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে,প্রকৃতি-জাত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদিও অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যদি তুমি অনাদি কি, এবং অনন্ত কি,তাহা জানিতে পার,তবে তোমার কর্ম্মফলবাদের মীমাংসা সম্ভবনীয়। তবে কি এ মীমাংসা অসম্ভব? গীতা বলেন, অসম্ভব কেন? তুমি নিজে ত্রিগুণাতীত হও, তাহা হইলেই অনন্ত ও অনাদি ব্রহ্মপদে উপনীত হইবে এবং সেই অদ্বৈতাবস্থায় তোমার আদি কারণের অনুভব হইবে। সেই অবস্থায় পাপ নাই, পুণ্য নাই,কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, সবই একাকার, সবই "একমেবাদ্বিতীয়ং"। অনুমান এই খানে নিরস্ত হইল।

যে অনুমান তর্কে গীতার আত্মতত্ব,জন্মান্তরবাদ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই অনুমান তর্কের শেষ আসিয়া পড়ে নিরপেক্ষ ও নির্ম্মল জ্ঞানলাভে। সেই জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আত্মজ্ঞান আবশ্যক। এই আত্মজ্ঞান লব্ধ হইলেই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সমস্ত তত্বের মীমাংসা হইয়া যায়। এই জ্ঞানাবস্থায় উঠিবার জন্য গীতা আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবের যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই প্রত্যক্ষের উপর সমস্ত অলৌকিক তত্বের প্রামাণ্য স্থাপিত। এখন কথা এই, যাহারা অজ্ঞানী ও মূঢ়,সেই সামান্যজনগণের নিকট এই অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কোথায়? যে হিন্দু অজ্ঞানিগণ এই আত্মপ্রত্যক্ষে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বুঝাইবার পূর্ব্বে সেই যুক্তি কিরূপে অনুমানে সিদ্ধ, সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মনে করুন, আমরা হিন্দু ভারতবাসী কখন আমেরিকায় যাই নাই; তবে আমেরিকার সত্তায় বিশ্বাস করি কেন? সে বিশ্বাসের এই কয়েকটি কারণ আছে:—

(১) আমেরিকা যাহাদের জন্মভূমি, সেই মার্কিনেরা ভারতে আসিয়া এখানে মার্কিন দ্রব্যের আমদানি করিয়া সেই মহাদেশের সত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন।

(২) অপরদেশীয় লোকও আমেরিকায় গিয়া স্বচক্ষে সেই মহাদেশ দেখিয়া আসিয়া তাহার সত্তা ভারতবাসিগণের নিকট সপ্রমাণ করিতেছেন।

(৩) এই দুই শ্রেণীর লোকেরই মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা বাক্য বলিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ যখন আমেরিকায় যাওয়া আপামর সকলেরই সাধ্য, তখন প্রবঞ্চনা বাক্য অসম্ভব।

অজ্ঞানীর নিকট আত্মপ্রত্যক্ষও তদ্রূপ অনুমানে প্রামাণ্য।

প্রথম কারণ—গীতা বলিতেছেন;—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো। বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
১৫অ—১৫

আমি সমুদায় বেদদ্বারা জ্ঞাতব্য, আমি বেদান্তকৃৎ (জ্ঞানদাতা গুরু) এবং আমি বেদার্থবেত্তা।

সুতরাং তিত্তির প্রভৃতি নানা ব্রহ্মবিৎ বৈদিক ঋষি আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধ ব্রহ্মতত্ব প্রচার করিয়া সেই আত্ম-প্রত্যক্ষ সত্তার প্রমাণ দিতেছেন।

দ্বিতীয় কারণ—তৎপরবর্ত্তী ব্যাসাদি নানা সিদ্ধ ঋষি সেই আত্ম প্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

গীতা বলিতেছেন ;—

পরং ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদ স্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষিমে ॥"

১০ অ—১২।১৩

"তুমি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয় ও পরম পবিত্র বস্তু। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি সকলেই তোমাকে এক বাক্যে নিত্য পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব (দেবগণেরও কারণ) জন্মরহিত সর্ব্বব্যাপক ও প্রভুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং (অর্জ্জুন বলিতেছেন) তুমি স্বয়ংও আমাকে ঐরূপ কহিতেছ।"

সুতরাং গীতার এই বাক্যে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈদিক ঋষিগণের পরবর্ত্তী কালের সিদ্ধ ঋষিগণও সেই আত্মপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া একই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণোক্তির সহিতও মিলিয়া যায়।

তৃতীয় কারণ—কি বৈদিক ঋষি, কি তৎপরবর্ত্তী ঋষি, কাহারই প্রতারণা করিবার কোন কারণ নাই ; যে হেতু আত্ম-প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসহ ; পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত বা অপ্রমাণীকৃত হইতে পারে ; সুতরাং তদ্‌সম্বন্ধে কোন অলীক কথার সম্ভাবনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সাধ্যগণ পরম আরাধ্য, নিষ্কামী, নিস্পৃহ এবং নিঃস্বার্থ হইয়া বিপ্রলিপ্সার অতীত হইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহাদের কথা অপ্রামাণ্য নহে।

এই এই কারণবশতঃ হিন্দু অজ্ঞানিগণ গীতোক্ত বৈদিক আত্মপ্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ ফল প্রত্যক্ষ বলিয়া যেমন আয়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্য, বেদোক্ত অলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় সেইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ হওয়াতে তাহাও আয়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্য। তাই ন্যায়-দর্শন বলিলেন ;—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্যাং আপ্ত প্রামাণ্যাং।"

বৃত্তিকার অর্থ করিলেন ;—

যদ্রূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্য, তদ্রূপ বেদের অর্থ দৃষ্ট-ফলে প্রতীত বলিয়া বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী, সেই যথার্থবাদীর উক্তি বলিয়া বেদ প্রামাণ্য।

মহাভারতোক্তি এই ;—

"পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥"

কল্লুকভট্টকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলী-উদ্ধৃত।

পুরাণ, মানবধর্ম্ম, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, সাঙ্গবেদ এবং চিকিৎসা এই চারির সিদ্ধি যেন আজ্ঞামত ঘটে, এজন্য, কোন প্রকার তর্কে তাহাদের অপ্রমাণ সিদ্ধ নহে।

গীতা এই নিমিত্ত প্রত্যক্ষফলে প্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে, তাহা জ্ঞানমূলক। অজ্ঞানীর যাহাতে সেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়, যে জ্ঞানে বেদ প্রতিপন্ন, সেই জ্ঞানার্জ্জনের পথ স্থাপিত করিয়া বেদ হিন্দু সমাজকে নিয়মিত করিয়াছে। কার্য্যে এবং অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা ; আত্ম-জীবনে জ্ঞানের প্রস্ফুরণ এবং সেই আত্ম-জ্ঞানে ধর্ম্মের প্রমাণ। অজ্ঞানীকে কেবল বিশ্বাস ও অনুমান দিয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই বিশ্বাস ও অনুমান; সেই শাস্ত্র-জ্ঞান যাহাতে প্রত্যক্ষে প্রতীত হয়, তজ্জন্য আশ্রমনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই

আশ্রম চতুষ্টয় হিন্দু ধর্ম্মের বিরাট বিদ্যালয়। ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সংসারাশ্রমের ভক্তি ও কর্ম্মযোগে এবং বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জ্ঞানযোগে তাহার পরিণতি ও প্রমাণ। সুতরাং যে ধর্ম্ম আপনাকে আপনি সতত ও চিরকাল সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে, সে ধর্ম্মের প্রামাণ্য কখন অসার ও অলীক নহে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

৩২।* ভারতমঙ্গল—পূর্ব্বখণ্ড—আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত, মূল্য ২৲।

ইতিপূর্ব্বে উদ্দেশ্য এবং কাব্যগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন রচনাচাতুর্য্য, চরিত্র, দৃশ্য, ছন্দ ও ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

প্রথমতঃ রচনাচাতুর্য্য—

চিন্তা এবং ভাব সমূহকে সুশৃঙ্খলার সহিত স্থান কাল পাত্রের উপযোগিতানুসারে সংন্যস্ত করাই রচনার কৌশল। ইহার গুণে যেমন অপূর্ণ অস্ফুট ভাব সকলও পূর্ণ এবং প্রস্ফুটিতরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি আবার রচনার দোষে অতিসুন্দর এবং রমণীয় ভাবগুলি মলিন এবং নিষ্প্রভ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কতকগুলি উজ্জ্বল চাকচিক্যময় রং পাশাপাশি রাখিলেই সুচিত্র হয় না; সমাবেশগুণে একটী সাধারণ রংয়েরও এক অভিনব সৌন্দর্য্য বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ সুকবির হাতে, রচনাগুণে, একটী অতি সাধারণ ভাব কিম্বা দৃশ্য—এক অভাবনীয় নূতনত্বে পরিশোভিত হয়। কাব্যরচনার মূলমন্ত্র সুখদ অলঙ্কার প্রয়োগে। ভাষায় সকল ভাব পরিস্ফুট হয় না; হইলেও সকল সময়ে বড় তৃপ্তিকর হয় না। এই সকল স্থানে সুকবি কেবল আভাষ মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হন; পাঠকের সহিত ভাবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবশিষ্ট পথ এবং গম্যস্থান অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দেন। অলঙ্কার এই আভাষ এবং সঙ্কেতের প্রকাশক; ইহার মাধুর্য্যেই পাঠক কবির এই প্রত্যাবর্ত্তনে চটিয়া যাইতে পারেন না। আবার অনেক সময়ে ভাবের দীপ্ত সূর্য্যের দিকে কবি নিজে ও সরলভাবে তাকাইতে পারেন না, পাঠককেও প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; তখন কবি পাঠকেরসম্মুখে একখানা আয়না কিম্বা একটা জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্বটা মাত্র দেখাইয়া দেন। এই আয়না এবং জলাধার, কাব্যের আভরণ বা অলঙ্কার। কবি আনন্দচন্দ্র রচনা-কৌশলে কিরূপে কাব্যের মূলভাব (Plot)কে প্রসারিত এবং প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতেও পাঠক ইহার পরিচয় পাইবেন।

রচনার আর একটী বিশেষ গুণ, Concentration and conciseness,—আরম্বরশূন্য অত্যল্প এবং সামান্য ভাষায় একটী মহৎভাব কিম্বা দৃশ্যকে লিপিবদ্ধ করা। সাধারণ কবি যেখানে উপমার উপর উপমা প্রয়োগ করেন, বহুশ্রমে সমগ্র আভিধানিক সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া অসংখ্য মণি মুক্তা সাজাইয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না, নিপুণ সুকবি সেখানে বিশ্বাস

* বৈশাখ হইতে সমালোচিত পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া গেল। অতঃপর এইরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে।

পূর্ণ নিরুদ্বেগ এবং স্থিরচিত্তে সামান্য ভাষায় দুইটী সুন্দর লাইন লিখিয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করেন। একজন অযথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঠককে হয়রান করিয়া ফেলেন, কৃত্রিম আলোক-বাহুল্যে অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেন; আর একজন অজ্ঞাতসারে পাঠকের কৌতূহল প্রদীপ্ত করিয়া সৌন্দর্য্যের আবরণটী ঈষন্মুক্ত করিয়াই সরিয়া পড়েন। একস্থানে কবি অনিচ্ছুক পাঠককে লইয়া টানাটানি করিতেছেন; অন্যত্র পলায়োন্মুখ কবিকে ধরিয়া পাঠক ম্যাক্‌বেথের ন্যায় সোৎসাহে বলিতেছে—"Stay, you imperfect speaker, tell me more!" আনন্দচন্দ্রের আড়ম্বরশূন্য গোধূলি-চিত্র দেখুন—

"অস্তগত দিনমনি আইলা গোধূলি;
স্বর্ণময় সৌরকর ঈষৎ হাসিয়া
তরু-শিরে চলি গেলা নাহি জানি কোথা
অনন্ত আকাশ পথে কোন্ দূর লোকে॥"

কেমন সংক্ষিপ্ত, ভাবময় অথচ সম্পূর্ণ! প্রত্যুষ-বর্ণনাও তদনুরূপ—

"অর্দ্ধেক অরুণ-কান্তি দৃষ্টিরেখাপরে
হাসিল; সুন্দরবেগে সুগন্ধ বিস্তারি
প্রবাহিল গন্ধবহ; কলস্বর ভরিয়া
বিহঙ্গ কাকলি-ধ্বনি উঠিল সঘনে।
সুবসন্তে সুখময় সুনিভৃত দেশে
ধ্যানস্থ প্রকৃতি যেন নয়ন মেলিয়া
ত্যাজিলা নিশ্বাস ধীরে, গাইলা সুস্বরে
'জয় ব্রহ্ম জয়!' গীত কলকণ্ঠ-নাদে।"

লাবণ্যময়ী দেববালাগণের সভার, দূর দৃশ্যাবলীর ন্যায়, অর্দ্ধস্ফুট শোভা দেখুন—

"——মহানদী মৃদুল পবনে
অনন্ত-তরঙ্গ-রঙ্গে ধায় যথাবেগে
সুধাকর-করতলে, তেমতি বহিল
পবিত্র লাবণ্যস্রোত সুর-সভাতলে।"

কিন্তু কবির বর্ণিত স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের কোন একটা স্পষ্ট ধারণা হয় নাই। ১ম সর্গে স্বর্গধামের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ২য় সর্গ এবং তৎপরবর্ত্তী স্থান সমূহের স্বর্গ, তাহা হইতে বিভিন্ন। প্রথম সর্গের স্বর্গে—"শান্তি সুখে সুখী সবে অমৃত ভুঞ্জিয়া" "শান্তি রসে ভরা, প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ সকলি সেখানে অপরূপ";

"——হিংসা দ্বেষ পাপ প্রতারণা
নাহি সেথা, নাহি যথা মৃদুর অধরে
ধূলি ধূম পূতিগন্ধ, সানন্দ সকলি!
যে যায় আনন্দ পুরে, কভু নাহি ফিরে
ধরাধামে, নিত্যধাম অভিরাম হেন।"

ইহা হইতে স্বর্গের একরকম একটা ধারণা হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন কবি বলিয়াছেন—"দুঃখনামে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই; সুখের অভাবের নামই দুঃখ," তখন মনে হইল "শান্তি-সুখে সুখী" দেবদেশে বুঝি দুঃখ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গের স্বর্গ অন্যরূপ; এখানে যেন "অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ" বসুন্ধরাকেই "অভিরাম সত্যধাম" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করা হইয়াছে—

"দ্যুলোকের এক ভাব, নাহি ভাবান্তর,
নাহি হ্রাস, নাহি বৃদ্ধি, উত্থান পতন,
ঋতুর পর্য্যায় নাই, পুরাতন সব
নয়ন মনের প্রীতি পারে না বর্দ্ধিতে।"

এখানে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ "পুত্রকন্যাগণের ক্ষণিক বিরহে মনোদুঃখে মৃতপ্রায়"। স্বর্গের সুখ যেন সুখই নহে—

"দেবের সন্তান মোরা আজন্ম দেবতা,
নিত্য সুখে সুখী, কিন্তু সুখাস্বাদ কিবা
নাহি জানি, সুখ দুঃখ অভিন্ন জগতে।
নির্ভীক বীরেন্দ্র সম জীবন-সংগ্রামে
যে মানব, ভয় বিঘ্ন প্রলোভনে করি
পরাজয়, জয়োল্লাসে যায় স্বর্গপুরে,
দেবতার পূজ্য সেই, সুখী বলি তারে।"
"আজন্ম দেবতা মোরা, সাধন কেমন
জানি না; জানিনা তেঁই অভাবে সম্ভাবে
সুখের-স্বরূপ কিবা——"

জাহ্নবী যখন বলিলেন—

"ভাগ্যবতী আমা সম কে আছে জগতে ?

*　　*　　*

সহস্র সাম্রাজ্য এবে ঠেলি দুচরণে

তব সহ স্বর্গসুখ ভুঞ্জিব নিয়ত

নিত্যধামে———

তখন মনে হইল—স্বর্গ-সুখ বাসনা-পরিতাপ-শূন্য, নিকাম কর্ত্তব্য সাধন সম্ভূত ; অনাসক্ত অনুরাগ, নির্ব্বেদ নির্লিপ্ত প্রেমই বুঝি স্বর্গ সুখের মূল ; "অভিরাম নিত্যধাম" বুঝি চিরশান্তিময়স্থান। কিন্তু ৭ম সর্গে দেখি, স্বর্গে গেলেই সুখী হওয়া যায় না,স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া একটা বিশেষ কোন পদার্থ নাই—

সাঙ্গ করি মর্ত্ত্যলীলা আসিয়াছে বালা

স্বর্গধামে, কিন্তু হায় শান্তির সুহাসি

নাহি মুখে, মনোদুঃখে বিষাদ-কালিমা

বদনে, সুধাংশু যেন ঘন-আবরণে !"

হরি ! হরি ! তবে তো দেখি সয়তানের কথাটাই ঠিক :—

"The mind is its own place, and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven "

আবার ৯ম,১০ম,১২শ, ১৫শ, সর্গে দেখি স্বর্গবাসের শোক দুঃখ বিষাদ ব্যস্ততা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড, পৃথিবীর শোক তাপ অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক ; দেবতা যতদূর বিপদে অস্থির, শোকে মুহ্যমান, বিরহে কাতর, দুঃখে এবং বিষাদে "মৃত প্রায়" হন, মানুষও বুঝি ততদূর হয় না। দেখিয়া শুনিয়া দেবদূতী জাহ্নবীই অবাক্ !

"কিন্তু প্রাণেশ্বর, কহ কেন এ লাঞ্ছনা

সমভাবে সুরনরে ? একের লাগিয়া

কেন এ যাতনা কহ অপরের প্রাণে ?

দেবের পালনভার দিলা যার হাতে

ধর্ম্মরাজ, সেই প্রীতি বিকল এমতি

সত্যশোকে, সামান্য মানবী সম কাঁদে।"

স্বর্গের দেবদেবীগণ কান্নাকাটিতে বাঙ্গালী রমণীকেও হারাইয়াছেন। এই কথার সমর্থন করিতে এত অধিক স্থান হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেবল নিতান্ত উৎকট স্থানগুলি সংগ্রহ করিতেই নব্যভারতের ৪।৫ স্তম্ভ স্থানের আবশ্যক। শুধু একটী স্থান হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়া,অবশিষ্ট গুলি পাঠকের অনুসন্ধিৎসার উপর নির্ভর করিলাম।

"উন্মাদিনী প্রীতিদেবী সে শোকসংবাদে,

মণিহারা ফণী যথা, চলেছেন ধেয়ে

রাজপুরে, মুক্তকেশী, আরক্ত নয়না

স্খলিতবসনা দেবী, দিগঙ্গনা যথা

দিথিদিক-জ্ঞানশূন্য শত বজ্রাঘাতে !

পশ্চাতে জাহ্নবী ধায় ধরিয়া অঞ্চল

শশব্যস্তে, সম্বরিতে নাহি অবসর

বসন, সম্ভাষি শত আশ্বাস বচনে।"

ব্যাপার কি গুরুতর দেখিলেন ? দেবতা, তাই রক্ষা ! (পৃঃ ২০৪, ২২৩, ২২৫, ২৪২, ৩০৪—৫, ৩০৮ হইতে ৩১০, ৩১৩ দ্রষ্টব্য।)

চরিত্র।—এক দিক্ দিয়া দেখিলে ১ম খণ্ড ভারত-মঙ্গল কাব্যে দেশ কালের কোন সীমা নাই ; স্বর্গ মর্ত্ত্যরসাতল ব্যাপিয়া ইহার কার্য্য স্থান—"শত সৌরজগৎ"কাব্যান্তর্গত। সময়েরও বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই ; কিন্তু প্রকৃত কার্য্যভাগ(action)ইহাতে অতি অল্প। সামান্য কার্য্য করিতে বহুলোকের সমাগম হইলে যেমন বৃথা গোলমাল এবং বাক্য পরায়ণতার একশেষ হয়, ভারতমঙ্গলেও হইয়াছে তাহাই। কবি আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু ইহার বারো আনা লোক কেবল নিষ্ক্রিয় পরামর্শ দাতা মাত্র। ইহাদের অনেকেই যেন এক একটা আস্ত মূর্ত্তিমান বক্তৃতা। শুধু বাক্যন্ত্রটা দেখিয়া একটা মানুষের সমগ্র দেহের অনুমান হয় না ; টাউনহলে একটা

বক্তৃতা শুনিয়াও কোন বক্তার সমস্ত দোষ গুণের বিচার হইতে পারে না। খাঁটি বাক্‌-যন্ত্রগুলিকে বাদ দিলে আর যে সব চরিত্র থাকে, তাহাদেরও অনেকেরই সঙ্গে কার্য্য-ক্ষেত্রে পাঠকের দেখা সাক্ষাৎ বড় বেশী নহে। একেত এত অল্প পরিচয়ে লোকের সমালোচনা করিতে যাওয়া ভাল নহে; তাহাতে আবার এই অল্প পরিচয়েই দুই একজনের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহাতে বেশী ঘাটাঘাটি না করাই ভাল। রাম সীতার কথা প্রসঙ্গে জ্ঞানদেব 'সাগরে সেতু'র কথা শুনিয়া অস্থির; দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কহ দূত শুনি, অতল সাগরে সেতু কেমনে বাঁধিলা?" স্বয়ং জ্ঞান যেখানে "হালে পানি পাইলেন না" সেখানে সামান্য দূতটাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন? জয়ন্ত জাহ্নবী, সত্য প্রীতি, ধর্ম্ম-রাজ, অধর্ম্ম এবং ভণ্ড ইহারা কাব্যের প্রধান চরিত্র। ইহাদের এবং অন্যান্য সক-লের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলিতে পারি, "কিরণ কিরীট" এবং "অদৃশ্য" স্বচ্ছ দেহটা বাদ দিলে, ভারতমঙ্গলের দেবতাগণ, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ, রাজনীতি এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণশীল কতিপয় "বাঙ্গালী মহাপুরুষ" হইয়া পড়েন; দেবীদিগকে ব্রাহ্ম-সমাজের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বলিয়া ভ্রম হয়।

কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলকে স্থূল মূর্ত্তিতে কাব্যক্ষেত্রে অবতারণা করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা বড় কঠিন কার্য্য। এরূপ স্থানে পরস্পরের তুলনায় গুরু লঘু, সক্ষম অক্ষম, উচ্চ নীচ প্রভৃতির সম্যক নির্দ্দেশ করা যেমন গভীর চিন্তা এবং গবেষণা সাপেক্ষ, তেমনি ইহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে যুক্তি তর্ক বাক্ বক্তৃতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা এক রকম অসম্ভব। সুতরাং স্থূলভাবে ভারতমঙ্গলের কোন কোন চরিত্রকে যেমন অমনোরম এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সূক্ষ্মএবং অরূপক ভাবে দেখিতে গেলে সহ-জেই প্রতীত হইবে, ইহাদের এই প্রকার অপূর্ণতা এবং খর্ব্বতা একরকম স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। এই খানে সাধারণ এবং রূপক কাব্যের প্রভেদ। সাধারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যা-নুভূতির উদ্রেক করা, রূপক কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য,কোন বিশেষ সত্য কিম্বা বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশিত করা। সাধারণ কাব্যে যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য,রূপক কাব্যে তাহা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র; সাধারণ কাব্যে যাহা গৌণ উদ্দেশ্য, রূপকে তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সত্য প্রচারোদ্দেশ্যে,রূপক মহাকাব্য রচনা করিয়া তাহাকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করা এবং সাধারণ কাব্যের সর্ব্বলক্ষণান্বিতকরা, অতিদুরূহ ব্যাপার। কবি আনন্দচন্দ্র যে এই দুরূহ কার্য্যে অনেকটা সফল হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অরূপক ভাবে বিচার করিতে গেলে, ১ম খণ্ড ভারতমঙ্গলকে একখানি মানবাত্মার উন্নতির ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ইহার দেশকালকার্য্য সমস্তই একটী মানব জীবনে নিবদ্ধ। ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম-ময় জীবন হওয়াই মুক্তি; মানব জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে এই পরামুক্তি বা ব্রহ্মপদ লাভ হয়। কি প্রকারে সাধনবলে,সত্যপ্রীতি,ন্যায় পবিত্রতা সাহায্যে, প্রভূতশক্তিশালী পাপপ্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম সহ-চর রিপুকুলকে পরাজিত করিয়া, মানব-

হৃদয়ে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ভারত-মঙ্গল কাব্যে রূপকাবলম্বনে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবদানবের মহাযুদ্ধ অহরহ মানবহৃদয়েই সংঘটিত হইতেছে। এই সংগ্রামে দেবগণ কখনও জয়ী হইতেছেন, কখনও দানব হস্তে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছেন। ধর্ম্মজগতে মানব পঙ্গু বিশেষ; নিজের পায়ে চলিবার কিম্বা দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই; মানব-হৃদয়-নিহিত দেবতা সকল সহজেই পাপাসুর-সংগ্রামে পরাজিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে; কেবল ব্রহ্মকৃপায় এবং ব্রহ্মশক্তির অনুপ্রাণনে মানব ধর্ম্মরাজ্যে দাঁড়াইতে এবং অগ্রসর হইতে পারে। ভগবৎ কৃপা দুর্ব্বল মানবের এক মাত্র সহায়-যষ্টি; কেবল ইহার প্রসাদেই দুঃখনিবৃত্তি এবং মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে। ধর্ম্ম প্রাণ নরনারীর মস্তকে ঐশীকৃপার শান্তিধারা বর্ষিত হয়। সত্য,ন্যায়,প্রীতি ও পবিত্রতার উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; ইহারা ধর্ম্মের স্বরূপ অথবা চারি অঙ্গ। সাধুসঙ্গ সদালাপ সুমতি সুরুচি ধর্ম্মের চিরসহচর। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানযোগ,ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ,ইহার সকলকেই সমভাবে আশ্রয় করিয়া সাধন করিলে পূর্ণসাধনা এবং প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হয়। প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে পরামুক্তি এবং ব্রহ্মপদ লাভ ঘটে। মানব হৃদয়ে এই সকল দেবতা পাত্রভেদে সুষুপ্ত, জাগরিত এবং স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করিতেছে; মানব হৃদয়েই আবার ক্রূরমতি দানবগণ নানা ভাবে নানাবেশে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। এই খানে যেমন ধর্ম্মের রাজত্ব—দেবলোক, স্বর্গধাম; তেমনি এখানেই আবার অধর্ম্মের অধিকার—পাতালপুরী। তাই অশেষ দেবভাবমণ্ডিত মানব মানবী——জয়ন্ত জাহ্নবী—এই মহাকাব্যের ১ম খণ্ডের নায়ক নায়িকা। পুরুষ প্রকৃতি—নর নারীর প্রকৃত সম্মিলন ভিন্ন পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয় না; তাই মানবাত্মার ইতিহাসের এই মূল চরিত্র—যুগ্ম দম্পতীরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই মানবদম্পতীর হৃদয়ে,জ্ঞানভাব ইচ্ছা সাহচর্য্যে, সত্য-প্রীতি-ন্যায় পবিত্রতার ভিত্তিতে ধর্ম্মের দীপ্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত লইয়া ভারতমঙ্গল (পূর্ব্বখণ্ড) লিখিত এবং ইঁহাদের দেবত্বে উন্নতির সহিত ইহার পরিসমাপ্তি।

এই অরূপকভাবে দেখিলেই ভারতমঙ্গলের চরিত্রাবলীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা যায়। নচেৎ স্থূল, রূপকভাবে গ্রহণ করিয়া ইহাদের বিচার করিতে গেলে, অনেক অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য এবং অপূর্ণতা দ্বারা চরিত্র, গুলির সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবহৃদয়ে "পুণ্যের জয়, অধর্ম্মের পরাভূতি" সংস্থাপন এবং প্রদর্শন করা; তাহা একরকম সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু কাব্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি; মহাকাব্যে চরিত্রগত সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করা একটী প্রধান লক্ষ্য। ভারতমঙ্গলের চরিত্র গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ হইয়াছে বলা যায় না।

রূপক, অরূপক, যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক, কবির "স্বপ্নদেবী" সম্বন্ধে আমাদের একটু আপত্তি আছে। নিরর্থক এবং অনাবশ্যক চরিত্রের অবতারণা, কি কাব্য, কি উপন্যাস, কোথায়ও প্রশংসনীয় নহে। কল্পনা-রাজ্যেও ম্যাল্‌থাসের অনুশাসন পরিপালনীয়। রহস্যময় জগৎকাণ্ডে স্বপ্ন একটী "রহস্য" হইতে পারে; কোন কোন স্বপ্নের বাস্তবতায় কবি আস্থাবানও হইতে পারেন। তথাপি এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

যে, কেবলমাত্র "ইচ্ছার সন্ধান"টী বলিয়া দিবার জন্যই ভারতমঙ্গলে "স্বপ্নদেবীর" সৃষ্টি। এই "সন্ধানলাভের" উপর পরবর্ত্তী সমগ্র সাতটী স্বর্গের বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলী সংস্থাপিত হইয়াছে। এই গুরুতর কার্য্যভারটা 'ভেল্কীময়' অনিশ্চিত স্বপ্নের হাতে দেওয়া সুবিচার-সিদ্ধ হইয়াছে কি? বিশেষতঃ স্বয়ং সত্যদেবের পক্ষে, এত সহজেই বহু অসত্য পরিপূর্ণ "সমস্তই প্রায় মিথ্যা" স্বপ্নের যাথার্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড় অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহা অপেক্ষা সহস্র দেবসেনার মধ্য হইতে একটা "বীর হনুমান" আবিষ্কার করিয়া সন্ধানটা লাভ করিলেও হইত ভাল!

এখন ছন্দ ও ভাষা প্রভৃতি বিষয় দুই একটি কথা বলিলেই আমাদের সমালোচনা শেষ হয়, কবিবর মধুসূদনের পর বঙ্গভাষায় যাঁহারা অমিত্রাক্ষরছন্দে কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, আনন্দচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন শীর্ষ স্থানীয় কবি। জীবিত কবিদিগের মধ্যে এ বিষয়ে আনন্দচন্দ্র কাহারো অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় নহেন। ছন্দের নৈপুণ্য, ভাষার ঐশ্বর্য্য, অলঙ্কারের মনোহর প্রয়োগ প্রভৃতিতে, অনেক স্থানে, মহাকবির মধুর রচনা পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। স্থানে স্থানে ছন্দোময়ী ভাষার স্বাভাবিক লালিত্যময় সরল উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিমোহিত হইতে হয়। বৃন্দাবন বর্ণনার কয়েকটী পংক্তি দেখুন—

"মঞ্জুল নিকুঞ্জ-পাশে তমাল-বকুল
কেলিকদম্বের শাখে গাইছে পঞ্চমে
পিক-যূথ পাপিয়ার কলকণ্ঠ সহ :
প্রস্ফুট-কুসুম-কোলে মধপ করিছে
মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, বহিছে মলয়
সুধার সঞ্চার সদা, গোপকুল-বালা
আনন্দে করিছে কেলি কালিন্দীর জলে
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে শ্যামাঙ্গ ঢালিয়া।
মনোরঙ্গে করি নৃত্য, সঙ্গে ধেনুপাল
গোপাল গাইছে গীত বাঁশীর সুরবে।
শুনিয়া মধুর গীত হাসিছে ললনা
মধু-মুখে, মধুময় নদীবক্ষ-তাহে!'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আনন্দচন্দ্রের রচনায়ও যতি স্থাপন প্রভৃতির ত্রুটিতে দুই এক স্থানে ঈষৎ ছন্দ পতন ঘটিয়াছে —

"নাচে সুর মহানন্দে, সুরলোক হাসে,
শত সৌর-জগৎ মোহিত সে সঙ্গীতে।"
"চিন্তা নামে দেবদূতী কহিলা আসিয়া
মহাব্যস্তে —"মহারাজ, সমাগত হেথা
যুগল রাজকুমার রাজপুত্রীসহ'।"
"দাঁড়াইলা দময়ন্তী নলরাজপ্রিয়া
রাজলক্ষ্মী, রাজহংসী দাঁড়ায় যেমতি
সুপ্রভাতে সৈকতে সঙ্গিনীদলমাঝে।"

ভাষা বিশেষ আয়ত্ত্বাধীন না হইলে অনুপ্রাসের প্রায়ই সদ্ব্যবহার হয় না। অপরিপক্ক হস্তে অনুপ্রাস অনেক সময়ে কদর্য্যতা এবং বিরক্তির কারণ স্বরূপ। বহু আয়াস এবং কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি যেমন অপাঠ্য, ভাব তরঙ্গের স্বাভাবিক সহজ উচ্ছ্বাসে যাহারা স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহাদের দ্বারা ভাষার তেমনি শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ভারত-মঙ্গলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি; কিন্তু ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট না করিয়া অনেক স্থানেই পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি;—

"মহাতেজা মহাশক্তি, মুহূর্ত্ত মাঝারে
ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড পারে কাঁপাইতে
ভুজবলে ———"
"শত শত ইন্দ্রধনু সুশোভিল যেন
উচ্চ উপত্যকা যত তুষার-সম্পাতে
সুশুভ্র, শোভিত যথা শ্বেত-পুষ্পদাম
স্বভাবের সুবিশাল সুখ-শয্যোপরে।"
"না জানি কি মন্ত্রবলে বাসনাদানবী
ভুলাইল, ভুলিলাম, খেলিলাম খেলা।

অনুপ্রাসের অস্বাভাবিক তীব্র মাত্রাধিক্যও অনেক স্থানে আছে—

"পণ্ডিতের ষণ্ডসম গণ্ডমূর্খ সুত
পৃথিবীতে পূজ্য "বন্দ্য" "ভট্টাচার্য্য" নামে!!
পরিণয়-পরে হায়, পণ্যদ্রব্য রূপে
পরিহরি নিজবেশ পরকীয় নামে
পর-পদচিহ্ন-শিরে, হয় পরিচিত
পুরবালা, পরাধীনা রমণী এমনি
পৃথিবীতে; পরিতাপ নাহি সহে প্রাণে!"
"কোমলা অবলা মোরা, স্বভাবতঃ যথা
পতিপ্রেম-পরায়ণা, প্রভুপ্রতি তথা
ভক্তিশীলা: প্রাণসম পতিরত্ন যথা,
পিতৃসম প্রভু তথা; প্রভুর প্রসাদে
বাঁচে পিতৃদত্ত প্রাণ——"

পাঠক! উপরের পংক্তি-পর্য্যায়ে "প" য়ের পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যে পীড়া প্রাপ্ত হইলেন কি?

ভাষা, ভাবের অনুগামিনী। ভাবের-রুক্ষতা কোমলতা প্রভৃতির অনুরূপ ভাষা যদি রুক্ষ কোমলাদি গুণান্বিত না হয়, তবে রচনা বড়ই অনুপাদেয় হয়। তেমনি ঠিক ভাবানুযায়ী ভাষা (Onomatopaia) হইলে ভাবের প্রভাবে অনেক বাড়িয়া যায়। আনন্দ চন্দ্র এ বিষয়ে অমনোযোগী নহেন ——

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মাথা ধরাইয়া যেন
"বায়স কর্কশ-ভাষী শিপিবেশ ধরী
গায় গীত পিক স্বরে ;"
"——দৈত্যরাজ অধর্ম্ম আপনি
প্রকাণ্ড মুদ্গার ধরি প্রচণ্ড আঘাতে
ভাঙ্গে তার মুণ্ড অস্থি খণ্ড খণ্ড করি।"

যেন প্রচণ্ড আঘাতের শব্দগুলি শোনা যাইতেছে।

"——পুনঃ পুনঃ লাগিল পড়িতে
করতালি প্রবল করকাপাতসম
ইষ্টক-আলয়-পৃষ্ঠে জ্যেষ্ঠ কি আষাঢ়ে।"

দৈত্যের করতালি বাস্তবিকই বর্ষাকালের বিকট ছাদ পেটান গোছের।

"——কি করিয়া কহলো সজনি,
বাঁচিবে বততী হলে তরুশাখা-চ্যুত ?
আকুল, আকুল আমি, অকূল পাথারে
পতিত পতঙ্গ সম !"

হৃদয়-দ্রবকারী বিরহের কেমন তরলতা-ময় শিথিল ভাব !

৩৩। অহল্যাবাই।—শ্রীযোগীন্দ্র-নাথ বসু, বি, এ, সঙ্কলিত, মূল্য ।৵০। বাবু যোগীন্দ্রনাথ এখন বাঙ্গলা-সাহিত্য-জগতে সম্মানিত ব্যক্তি। রাজ-উদাসীন ইঁহার যৌবনকালের প্রথম উচ্ছ্বাস, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস, ফাদার দামিয়েন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ, কোন কোন স্থলে বিশেষ রূপ আদৃত হইয়া থাকিলেও, সমগ্র বঙ্গদেশে আদর পায় নাই। যৌবন-শেষে, প্রৌঢ়ের প্রারম্ভে বলিলেই হয়, তিনি মাইকেল-জীবনী লইয়া যখন বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, চতুর্দ্দিকে তখন সাদর অভ্যর্থনা, অনুরাগ-রঞ্জিত আশীর্ব্বাদ, সম্মান-গৌরবপূর্ণ যশো-রাশি বর্ষিত এবং বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাইকেলজীবনীর প্রথম সংস্করণ উঠিয়া গেল। এত আদর, এত সম্মান, এত যশ একালে আর কেহ পাইয়াছেন কিনা, জানি না। যোগীন্দ্রনাথ তৃতীয় গ্রন্থে বঙ্গে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

অহল্যাবাই, তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ। এখানি ছোট পুস্তক বটে, কিন্তু ইহাতেও যোগীন্দ্র বাবুর অসাধারণ ভাষা-নৈপুণ্য ও লিপি-চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল পুণ্য-বতী আদর্শ ভারত রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়, অহল্যাবাই, তাঁহার অন্যতম। পবিত্রতা ও ভগবদ্ভক্তিতে এই মহিলা কেবল যে মহারাষ্ট্র জাতির রমণীকুলের সম্মান বাড়াইয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের সকল দেশের নারী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অহল্যার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিতে২ শরীর রোমাঞ্চিত হয়,শৌর্য্য ও কোমলতায়, দয়ায় ও পবিত্রতায়, পুণ্য ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই পুস্তক খানি প্রত্যেক বঙ্গ-মহিলার একবার পাঠ করা উচিত। যোগীন্দ্রনাথ আমাদের পরম আত্মীয় ব্যক্তি,তাঁহার গৌরবে আমরা গৌর-বান্বিত, তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিতে আমরা সঙ্কুচিত।

৩৪। ভূলোক-রহস্য—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত,মূল্য ।০। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"অনেক দিন হইতে সংবাদ পত্রের অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ পড়িয়া এবং বিবিধ তত্ত্ব অবগত হইয়া, আনন্দিত ও বিস্মিত হইতাম। আর ভাবি-তাম, জগতে বিবিধ উপায়ে লোকের জানি-বার শুনিবার কতই পড়িয়া রহিয়াছে। এই কারণে জগতের সংবাদ ও অন্যান্য তত্ত্বগুলি কেবল পড়িয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিতাম না, জ্ঞাত ও পঠিত বিষয়গুলি বড় একখানা খাতায়, অবসর মতে লিখিয়া রাখিতাম। এই উপায়ে খাতাখানি ২।৩ বৎসরে বিবিধ তত্ত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল।" ভূলোক-রহস্যের সূচনা এই। সকল লোকেই পত্রিকা পড়েন, অনেক কথা, অনেক তত্ত্বই সকলের মনে থাকে না,মনে থাকিলেও অন্যে তাহা জানিতে পারে না। মনোমোহন বাবু সকল কথা লিপি-বদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বড় একটা অভাব দূর করিয়াছেন। এই পুস্তকে যে সকল কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যুবা

বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার সহিত জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। ভাষার জন্য মনোমোহন বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নাই, কেননা, তিনি যেমন পাইয়াছেন, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট আদৃত হইবে, আশা করি।

৩৫। কথা ও বীথি।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, প্রণীত। বিজয় বাবুর যুগপূজা সম্বন্ধে বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"যুগপূজা অতি সুন্দর হইয়াছে। এ দুর্দ্দিনে মূল্যবান গ্রন্থের কেহ আদর করে না।" বাস্তবিক কথা। বিজয় বাবুর "কবিতা", "বিদ্রূপ ও বিকল্প", "যুগপূজা" ইহার কোন খানিই ভাব ও সৌন্দর্য্য বিহীন নয়, অথচ এদেশে আদর পায়না। "কথা ও বীথির" অনেক কবিতাই নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার সুমুখী, চক্রতীর্থ বা ছিরিপরিচার, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি কবিতা যখন নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন অনেকেই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর আর কেহ তত্ত্ব লইতেছেন না। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। বাঙ্গালীর প্রশংসা কেবল মুখে মুখে, কাজের বেলা পকেটে হাত দিবার সময় অনেকেই পশ্চাৎপদ। বিজয় বাবু যেমন দুরূহ দর্শন বিজ্ঞানের কথা সহজ পদ্যের ভাষায় বোধগম্য করিতে পারেন, এমন অতি অল্প লোকেই পারে। নব্যভারতের পাঠকগণ তাহা বিশেষ রূপ জানেন। এরূপ প্রতিভাশালী একজন লেখক, যদি উৎসাহের অভাবে, বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবা পরিত্যাগ করেন, দুঃখের সীমা থাকিবে না। যাঁহারা কাব্যামোদী, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি প্রয়াসী, যাঁহারা জাতীয়-ভাষার শ্রীবৃদ্ধিপ্রার্থী, তাঁহারা একটু আদর, একটু সাহায্যের মাত্রা না বাড়াইলে, এদেশের গ্রন্থকারগণ টিকিতে পারিবেন না। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কে কতদিন জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে পারে?

৩৬। অবসর—শ্রীবরদাচরণ মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৲। বরদা বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, এখন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী; ইহা সত্বেও তিনি বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করেন। তিনি কেবল যে বাঙ্গালা পড়েন, তাহা নয়, বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আপন শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বরদা বাবু বাঙ্গালা ও ইংরেজি, দুই ভাষাতেই বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি। এই "অবসর" পুস্তকে কতকগুলি বাঙ্গালা কবিতা এবং শেষে কয়েকটী ইংরাজি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কথা ও বীথির ন্যায়, ইহারও বাঙ্গালা কবিতার কয়েকটী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যদিও কথা ও বীথিতে ও এই পুস্তকে তাহার উল্লেখ নাই, তবুও যাঁহারা নব্যভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার "মূক-বালিকা', এক খানি 'ফটো' তুমি কি দেবতা" প্রভৃতি কবিতা ভুলিতে পারেন নাই। কি ভাষার মাধুর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য, কি ভাব-সংযোজন ও বিষয়-নির্ব্বাচন,—সরলতায় মধুরতা, সৌন্দর্য্যে কমনীয়তা, ইহার কোন বিষয়ে এদেশের কোন কবিঅপেক্ষা বরদা বাবু হীন ও নিষ্প্রভ নহেন। যে গীতি-কবিতা বাঙ্গালা ভাষার গৌরব, বরদা বাবুর এই "অবসর" তাহার আদর্শ। যাঁহারা আমাদের এ কথায় সন্দিহান, তাঁহারা দয়া করিয়া অন্ততঃ "মূক-বালিকা" কবিতাটী পড়িবেন। এরূপ উচ্চদরের কবিতা যে কোন দেশের গৌরব। নানা কারণে বরদা বাবু সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত। যাঁহারা আদর করিয়া এ গ্রন্থ পড়িবেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ে মোহিত হইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরদা বাবু ইংরাজি কবিতা লিখিতেও বেশ পারদর্শী। কিন্তু সে জন্য আমাদের প্রশংসা করিবার বড় কিছু নাই। ইংরাজি ভাষার অভাব অল্প, বাঙ্গালা-সাহিত্য অভাব-সাগরে ভাসমান। যাঁহারা দয়া করিয়া এই দীনা, হীনা, মলিনা, অনাদৃতা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি সদয়, আমাদের নিকট তাঁহারাই প্রণম্য। এ জাতির ভাবী উন্নতির মূল তাঁহারা। আজ তাঁহারা অনাদৃত, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যে দিন তাঁহাদের নামে পুষ্পবর্ষণ হইবে।

বিদ্যাসাগর

পৈতৃক ধন।

বিদ্যাসাগর দরিদ্রের সন্তান। কি গুণে রাজাধিরাজের সম্মাননীয় ও আপামর সাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন? বিদ্যাবুদ্ধি ধনে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার সদৃশ লোকের অভাব ছিল না। হৃদয়ের মহত্ত্বে বিদ্যাসাগর সকলের শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

হৃদয়ের মহত্ত্ব যত উত্তরাধিকার-লব্ধ, তত স্বোপার্জ্জিত নহে। বীজের উৎপাদিকা শক্তি ও মনুষ্যের কর্ষণ শস্যোৎপাদক, ইহাদের মধ্যে কেহই নগণ্য নহে। কর্ষণাভাবে শক্তি বিশৃঙ্খল, অপব্যয়িত বা অব্যাবৃত রহিয়া যায়। মূলে উৎপাদিকা শক্তির অভাব থাকিলে কর্ষণে ফল হয় না। প্রস্তরে রসাল ফলের সম্ভাবনা কোথায়?

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর চঞ্চল, অনিষ্টপটু ও একাগ্র ছিলেন। বালক স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হয়। বিদ্যাসাগরে শৈশবেও কেহ নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে নাই। চিরদিন তাঁহার হৃদয় সুকোমল।

বিদ্যাসাগর দয়া, সৌজন্য, সত্যবাদিতা, সাহস ও তেজস্বিতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তেজস্বিতা গুণবানকে সুন্দর করে, নির্গুণকে কুরূপ করে। সৌজন্য হৃদয়ের কোমলতা ও সৎসঙ্গের ফল। ধর্ম্মভীরুতা হইতে যে সত্যবাদিতা উৎপন্ন হয়, বিদ্যাসাগরের তাহা ছিল না। তাঁহার সত্যবাদিতা, সাহস ও তেজস্বিতার ফল। বিদ্যাসাগর বুদ্ধিমান্, শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, বহু-বিবাহ-নিবারণ ও বিদ্যা-প্রচারে [illegible] জীবন অতিবাহিত হয়। আতুরের সাহায্যের ন্যায় ঐ তিনটি মহাকার্য্য তাঁহার পরোপকার-প্রিয়তার ফল—পরোপকার-প্রিয়তার জননী করুণা। শ্রমশীলতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা হৃদয়ের কোমলতা, বলের প্রচুরতা, অভাববোধ ও বিচক্ষণতা হেতুও জন্মিয়া থাকে। নিজে বড় হইব, নিজে সুখী হইব, এ স্বার্থপরায়ণতা বিদ্যাসাগরের কখন ছিল না। যাহার স্বার্থপরায়ণতা নাই, তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা কেন হইবে? পিতা মাতার দুঃখ নিবারণ করিব, ভাইগুলিকে সুখে রাখিব, দেশের দশজন বাসায় আসিলে তাহাদের কোন কষ্ট না হয়, এই কামনায় ঈশ্বরচন্দ্র পঠদ্দশায় অত পরিশ্রম করিতে ও অত কষ্ট স্বীকার করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। উক্ত সময় "কলিকাতার বাসায় সকলকেই আহারাদি বিষয়ে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুগ্ধ, মৎস্য ও উৎকৃষ্ট তরকারি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে জলখাবার জন্য আধ পয়সার ছোলা ভিজান থাকিত, আধ পয়সার বাতাসা আনিয়া সকলে মিলিয়া ঐ ছোলা আর বাতাসায় বৈকালের জলযোগের কার্য্য সমাধা করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ ছোলার কিয়দংশ রাত্রিতে কুমড়ার তরকারিতে দেওয়া হইত। প্রাতঃসন্ধ্যা কুমড়ার তরকারি আর ভাতে উদর পূর্ণ করিয়া বাসার পাচক ও দাস দাসীর কাজ একাকী সমাপন করিয়া বিদ্যাসাগরের সমগ্র

পাঠ সুন্দর প্রস্তত করাতেই যে কেবল তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও আগ্রহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নহে,—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিবারাত্রি এইরূপ ক্লেশকর শারীরিক পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে পড়িয়া ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদা প্রসন্নমনে কালাতিপাত করিতেন। কেহ কখন তাঁহাকে এই সকল বহুশ্রমের কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে কিম্বা এসকল কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে শুনেন নাই। সর্ব্বদা প্রসন্নতার পরিচায়ক ও হাস্যপূর্ণমুখে সকলের সহিত কথা কহিতেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স বিংশতি বৎসর। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া সপ্তদশবর্ষে ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বেদান্ত সমাপ্ত করিয়া ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন। বাসায় পিতা ঠাকুরদাস, ভ্রাতা দীনবন্ধু ও নিজে। দেশ হইতে মাঝে মাঝে দু একটি অতিথি অভ্যাগত উদিত হইতেন। এ সকলের রন্ধন কার্য্য তিনি একক সম্পাদন করিতেন, অথচ পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতেন। বাসার ঘরটি এত সঙ্কীর্ণ যে, অতি কষ্টে একটি বিছানা হইত। রন্ধন গৃহটিতে সূর্য্যকিরণ কখন প্রবেশ করিত না। দিনের বেলা কখন কখন প্রদীপ জ্বালিয়া রন্ধন করিতে হইত। ভিতরে অন্ধকার ও আরসুলা, বাহিরে কৃমিকীট, আহারের স্থানে জলের ঘটী লইয়া বসিতে হইত। কীট নিকটে আসিলেই জলস্রোতে ভাসাইয়া দিতে হইত। একদিন ভোজনের সময় ঈশ্বর চন্দ্র তরকারির মধ্যে একটা আরসুলা পাইলেন। তখন সে কথা প্রকাশ করিলে কিম্বা ভোজনপাত্রের নিকট ফেলিয়া রাখিলে পাছে ঘৃণা প্রযুক্ত অপর সকলের আহারের ব্যাঘাত জন্মায় এই ভয়ে ব্যঞ্জনসহ সেই আরসুলাটি মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।” অন্যের দুঃখ নিবারণে আত্মবিসর্জ্জনও সৌজন্যের প্রধান উপাদান।

স্বার্থ-বিসর্জ্জন বিদ্যাসাগর শিক্ষায় লাভ করেন নাই, পূর্ব্বপুরুষের শোণিতের সহিত ইহা তাঁহার দেহে প্রসারিত হইয়াছিল। দারিদ্র্য শক্তিমানের শক্তি দৃঢ় করে, দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করে। বিলাসে শক্তি শিথিল, অপটু ও দুর্ব্বল হয়। বিলাসের কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কেহ কখন মহত্ব লাভ করে নাই। যাহার অভাব নাই, তাহার উদ্যম নাই, যাহার উদ্যম নাই, তাহার শক্তি সঞ্চালিত হয় না। শক্তি সঞ্চালিত না হইলে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। বিদ্যাসাগর দরিদ্রের সন্তান, দারিদ্র্যে পোষিত, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কালেজে শিক্ষা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাসের আয় দশ টাকা মাত্র। সে সামান্য আয়ে বহুপরিবারের ভরণপোষণ হইত না বলিয়া বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরান্নের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। “কখন অন্ন জুটিত কখন জুটিত না; যখন জুটিত তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জন অভাবে কেবল নুন ভাতে দিনপাত করিতেন। যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া এক বেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া বৈকাল বেলার জন্য তরকারি ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন। বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তরকারি দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছগুলি পরদিনের

জন্য রাখিয়া দিতেন। পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সে দিনকার আহার সমাপ্ত করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।” দারিদ্র্যের কষাঘাতে হৃদয় যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন স্নেহের ন্যায় ঔষধ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। এই দারিদ্র্যের মধ্যে এক সম্মাননীয়া মহিলা পুত্রবৎ স্নেহে বিদ্যাসাগরকে লালনপালন করিয়াছিলেন। মা ছাড়িয়া আসিয়া কলিকাতায় তাঁহাকে মাতৃস্থানীয়া লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জাতি অবস্থার বিভিন্নতা সকল ভুলিয়া দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগরকে আপনার বুকের ভিতর আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভারতমহিলার স্নেহ কোমলতার আদর্শ। এই রমণী বিদ্যাসাগরকে নারীচরিত্রের মহত্বে আকর্ষণ করেন।

বিদ্যাসাগরের সত্যবাদিতা তাঁহার তেজস্বিতামূলক। মিথ্যাবাদিতা কাপুরুষতার লক্ষণ। কাপুরুষেরা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পায়। তেজস্বী বিদ্যাসাগরের প্রখর সত্যবাদিতার খরশানের নিকট রাজাসনে বসিয়া কলুষচরিত্র ভূম্যধিকারী ও বিচারপতি ত্রাসিত থাকিতেন। তোষামোদ, চাটুবাদ তাঁহার ভাষায় ছিলনা। এ তেজস্বীতা শারীরিক বলজনিত নহে। বাল্যকালে বিদ্যাসাগর ক্ষীণজীবী ছিলেন। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় ক্ষীণজীবী না হইলেও অসুরবলে বলীয়ান তিনি কখনই ছিলেন না। এ তেজস্বিতা তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার লক্ষণ; তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের দয়া ও পরার্থপরতার ন্যায় উত্তরাধিকার করিয়াছিলেন। এই তেজস্বিতা তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী, পরসাহায্য-প্রত্যাশী হইতে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত আত্মনির্ভর তাঁহার তেজস্বিতামূলক। এই আত্মনির্ভরের ভাব উত্তরকালে তাঁহাকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইয়াছে। বাল্যকালে তাহা বাল-স্বভাবসুলভ চপলতার অধীন করিয়া তাঁহার বহুবিধ ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছে। আত্মনির্ভর অনেক সময় অন্যের অসম্মানে প্রণোদিত করে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সৌজন্য, হৃদয়ের কোমলতা, সহানুভূতি, তাঁহাকে আত্মনির্ভরের কর্কশতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা বিদ্যাসাগর পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মনির্ভর, তেজস্বিতা ও প্রখরবুদ্ধি বিদ্যাসাগর পিতামহের নিকট উত্তরাধিকার করেন। তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন, পরার্থপরতা, বিশ্বসেবা মাতামহদত্ত। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর পিতৃবংশে মস্তিষ্ক, সম্পত্তি ও মাতৃবংশে হৃদয়ের অমূল্যরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারী লাল সরকার উভয়েই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তের অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র, বাবু নারায়ণ চন্দ্র ও বাবু সুরেশ চন্দ্রের নিকট ইঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। বিদ্যাসাগর জীবিত থাকিলে অন্যান্য ব্যবহারের ন্যায় ভ্রাতার ভ্রমনিরাস ব্যবহারে সন্তাপিত হইতেন। এরূপ বৃহৎগ্রন্থ লিখিতে চণ্ডী

বাবু কয়েকটি সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হই নাই; সুখী হইয়াছি যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভ্রম তাঁহার ঘটে নাই। যোগীন্দ্র বাবুর মাইকেলের নীচেই চণ্ডীবাবুর বিদ্যাসাগর চরিতের স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনা। সত্য বটে যোগীন্দ্র বাবুর সে দার্শনিকতা, সে বিচক্ষণতা,সে বিচার-শক্তি চণ্ডীবাবুর নাই, সত্য-বটে বাঙ্গালা ভাষায় যতদূর অধিকার চণ্ডী বাবুর নিকট আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই, তথাপি তাঁহার লেখার মিষ্টতা, তাঁহার সংগ্রহের অধ্যবসায়, তাঁহার সত্যপ্রিয়তা আমাদের সম্মাননীয় ও অনুকরণীয়। বাবু বিহারীলাল সরকারের ভাষা ও রচনা-কৌশল কোন কোন স্থানে চণ্ডীবাবুকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু অনুকরণ-প্রিয়তা দোষে তাঁহার মৌলিকতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি হয় নাই—তথাপি তাঁহার বিদ্যাসাগর-চরিত সকল বিষয়ে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বর্ষার বিরহ-গাথা।

(মেঘদূত)

বৈকাল হইতে মেঘে আকাশখানা ঢাকিয়া রাখিয়াছে; মধ্যে কিছু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই, চুপ্ চাপ্ বসিয়া আছি। আমার গৃহিণী আজ কয়দিন অত্যন্ত বিরক্তি আরম্ভ করিয়াছেন, কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। কোন কারণ নাই,হঠাৎ 'সক্' হইল—বাপের বাড়ী যাইব; এমন আবদারত দেখি নাই! সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহাকে পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। আমি অনেক করিয়া বুঝাইল্যুম, কিন্তু সে কথা শুনে কে? যখন রাগ করিলাম, গৃহিণী বড় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ভীত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব যে মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সর্ব্বস্ব সতীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজি আমিও যেন সেই মূর্ত্তি দেখিলাম! তখন অগত্যা পাঠাইতে মত্ দিতে হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা তুমি যাইতে চাও কেন?" গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি যাইতে দিবে না কেন,আগে তাই বল।" আমি বলিলাম,—"দেখ তোমাকে এক দিন না দেখিয়া, আমি থাকিতে পারি না। এমন বর্ষার দিনে, তুমি বাপের বাড়ী যাইবে, আর আমি এ ঘোর বর্ষা-বিরহ কেমন করিয়া সহিব?"

তখন অভিমানিনী, অঞ্চল খানি টানিয়া, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"কেন, সে দিন যে বলিতেছিলে,—

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে,
মিলন-দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে—,

তা এ 'মিলন দাবানলে' পুড়িয়া কাজ কি? দুই দিন একটু অন্তরে থাকি না কেন, দাবানল একটু নিবিয়া আসিবে!"

মনে মনে কবিতার কপালে আগুন জ্বালিয়া দিলাম। "মিলন দাবানল"! দাবানল নিবিয়া কাজ নাই, পুড়িয়া মরি—সেও ভাল!

গৃহিণী রাগের ভান করিয়া কাছ হইতে উঠিয়া গেলেন। গতিক ভাল নয় দেখিয়া, পিছন হইতে আমি তাঁহার অতি যত্নে বাঁধা

খোঁপাটী খুলিয়া দিলাম। একেবারে সব খুলিয়া গেল। আকাশে যেমনিতর মেঘের ঘটা, গৃহিণীর সুন্দর পৃষ্ঠোপরি তেমনিতর নিবিড় কেশের রাশি ছড়াইয়া পড়িল। খোঁপার উপর যে বেল্, মল্লিকা শোভা পাইতেছিল, সে গুলিও ছড়াইয়া পড়িল,—পড়িল গৃহিণীর সেই আল্‌তা পরা রাঙ্গা চরণতলে! তখন এলোকেশী, গ্রীবাটী বাঁকাইয়া, আবেশ-বিহ্বল আঁখি দুটী অভিমানে পূর্ণ করিয়া, সকোপ-দৃষ্টে আমার পানে চাহিল। সেই মেঘভরা আকাশের ছায়াতলে, নীলবসনা, উন্মুক্ত কেশা, সুন্দরীর সেই চাহনীতে, সেই সুকুমার ভঙ্গিতে, যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম, তেমন সৌন্দর্য্য আর কোথায় দেখিয়াছি,হঠাৎ মনে পড়ে না।—কিন্তু দূর হউক, এ সকল লিখিতে বসিলে আসল কথাই বলা হইবে না।

আমি বলিলাম,—"দেখ, বাপের বাড়ী ত যাইবেই, কিন্তু আমার একটী কথা রাখ। একবার কাছে ব'স, আমি একখানি কাব্য পড়িয়া তোমাকে শুনাই।"

গৃহিণী তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কাব্য শুনিতে পার্শ্বে বসিলেন। আমি বর্ষার বিরহ-গাথা "মেঘদূত" পড়িতে মনস্থ করিলাম। আমার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহাকে তাহা বুঝিতে দিলাম না।

তখন বৃষ্টি হইতেছিল না। আকাশটা জুড়িয়া মেঘ উঠিয়াছিল। মেঘের ছায়ায় আমার ক্ষুদ্র কুটীরখানি, তাহার আশপাশের বৃক্ষব্রততী গুলিকে লইয়া মলিন মুখে বসিয়াছিল। প্রকৃতি গম্ভীরা, গাম্ভীর্য্যে বড় সুন্দরী। পুখুর ঘাট সব জলে ভরিয়া গিয়াছে, চারিদিকের গাছ-পালাতে নব নব পত্রোদ্গমে এক নূতন শোভা হইয়াছে; বন-পার হইতে কৃষক গীতি, সেই ভরা পুষ্করিণীর উপর দিয়া আসিয়া, কি সুমধুর তানে প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে!

আমার গৃহ-প্রাঙ্গনে স্তবকে স্তবকে বেল, মল্লিকা, জুঁতি ফুটিয়াছে; পথি-পার্শ্বে কদম্ব-শাখায় "বর্ষার গৌরব" কদম্ব ফুটিয়াছে; আমার হৃদয়-সরোবরে মূর্ত্তিমান পুণ্যের ন্যায়, পূর্ণশতদল ফুটিয়া রহিয়াছে—সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, শোভায়, আমার চারিদিক উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল। সেই প্রফুল্লময়ীর পুণ্য হাসি-ভরা মুখখানির পবিত্র জ্যোতিতে আমার কুটীর আলো। আজি এই ঘন বর্ষার দিনে, এমনি প্রফুল্ল অন্তরে, প্রিয়তমার পার্শ্বে মহাকবির অপূর্ব্ব মেঘ বিরহ-গাথা 'মেঘদূত' পড়িতে বসিলাম।

পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, পথ-হারা অতিথির মত, একখানা খুব ঘন কাল মেঘ ঠিক যেন আমারই কুটীরের চালখানি ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পড়িতে পড়িতে থামিয়া সেই মেঘের পানে চাহিলাম। আমার মনে হইল, সে বুঝি কোন বিরহীর বিরহ-বার্ত্তা লইয়া, প্রণয়িণী সকাশে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাই ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—যদি কোন প্রবাসী বিরহী পায়! একবার সে আমার ঘরে উঁকি মারিল, দেখিল, সন্ধ্যার দীপ-শিখা নিস্তেজ করিয়া, আমার প্রিয়তমা আমারই পার্শ্বে বসিয়া আছেন। মেঘ অবশ্যই বুঝিল, এখানে কিছুই হইবে না। তখন সে অতি নিরাশ-প্রাণে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে হঠাৎ থামিয়া এই সব ভাবিতেছি, গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—"কৈ, থামিলে কেন? সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং—বলনা?"

তখন আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিলাম। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আকাশ হইতে মেঘগুলা অনেক নামিয়া আসিল, বৃক্ষলতা নিশ্চল হইয়া ভিজিতে লাগিল। আমি আবার গোড়া হইতে পড়িতে লাগিলাম।

এক যক্ষ, কুবেরের ভৃত্য ছিল। যক্ষ আপন প্রণয়িণীকে বড় ভালবাসিত; সে এতদূর যে, ভালবাসার মোহে, যক্ষ, কর্ত্তব্য কর্ম্মে বড় অবহেলা করিত। তাহার এই-প্রকার ভাব দেখিয়া, তাহার প্রভু কুবের একদিন অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে শাপ দিলেন,—"তোমাকে এক-বৎসরের জন্য দেশত্যাগী হইয়া প্রবাসে থাকিতে হইবে।" প্রভুর নিষ্ঠুর অভিশাপে যক্ষের প্রাণ কাঁদিল। জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয়-তমাকে ছাড়িয়া, একবৎসর তাহাকে প্রবাসে থাকিতে হইবে! একবৎসর আর সে প্রিয়তমার মুখখানি দেখিতে পাইবেনা! একবৎসর! বৎসরে কত মুহূর্ত্ত! এক মুহূর্ত্ত যাহাকে না দেখিলে সে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, একবৎসর তাহাকে দেখিতে পাইবে না!—এ দীর্ঘ বিরহ সে কেমন করিয়া সহিবে?

যক্ষের বাড়ী অলকায়। কুবেরের অভিশাপে যক্ষের সে দেবভাব আর থাকিল না। তখন পরাধীন, অভিশপ্ত যক্ষ শ্রীহীন হইয়া, অলকা পরিত্যাগ করিয়া, রামগিরি আশ্রমে গমন করিল। বড় আকুল প্রাণেই সে গৃহ ত্যাগ করিল।

যক্ষ রামগিরি আশ্রমে আসিল। যেথানে সতী-প্রতিমা সীতাদেবীর স্নানে জল পবিত্র হইয়াছিল, এ সেই রামগিরি। এই আশ্রমে থাকিয়া, বড় দুঃখেই যক্ষ, প্রিয়া বিরহ-ক্লেশ ভোগ করিতেছিল। দারুণ বিরহ তাপে যক্ষ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, সে এত কৃশ হইয়া গেল যে, একদিন হাতের বলয় কোথায় খসিয়া পড়িল! আর সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে প্রভাব নাই! এমনি-ভাবে সে আটমাস কাটাইল, বড় দুঃখেই কাটাইল। শেষে বর্ষা আসিল।

বর্ষা আসিল, যক্ষের ভয় হইল। সে এতদিন সকল দুঃখ সহিয়াছে, চোখের জল বুঝি চোখেই মারিয়াছে, বুঝি যখন বড়ই অসহ্য হইয়াছে, আশ্রম নিকটবর্ত্তিনী কোন পুণ্যতোয়া নদীর তরঙ্গে আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়াছে। এমন করিয়াও ত এই আটমাস কাটিয়াছে, কিন্তু এই বর্ষা কাটিবে কেমন করিয়া? বর্ষায়, প্রবাসে বিরহীর প্রাণ কি করে, যক্ষ তাহা বুঝিত, তাই তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। আর সেই বিরহ-বিধুরা, সৌন্দর্য্য প্রতিমা, যক্ষ-পত্নী—সেই বা কেমন করিয়া, সে কুসুম-কোমল হৃদয়ে বর্ষা বিরহের প্রচণ্ড পীড়ন সহিবে? ভাবিয়া যক্ষ আকুল।

বর্ষায় বুঝি প্রাণে এমনই একটা আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে যে, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে নিকটে না পাইলে প্রাণ বড় আকুল হইয়া পড়ে; যাহাকে পাই না, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বুঝি তাহাকে খুঁজিতে থাকি।

এমনি অবস্থায়, আষাঢ়ের প্রথম দিন, যক্ষ দেখিল, একখানা ঘনমেঘ রামগিরির তটদেশ জুড়িয়া আছে। মেঘখানা আকৃতিতে একটা হস্তির মত, সে যেন সেইখানে ক্রীড়া করিতেছে। আষাঢ়ের আকাশে, সেই মেঘের ক্রীড়া দেখিয়া, বিরহী যক্ষের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল! নিদ্রায় ও জাগরণে,

দিবানিশি অলকা তাহার মনে জাগিতেছে। আজি আবার দ্বিগুণ করিয়া সে আগুন জ্বলিল! মনে পড়িল—সেই অলকা, অলকায় যক্ষের সেই গৃহ, গৃহ-লক্ষ্মী প্রেম-প্রতিমা সেই প্রিয়তমা! প্রিয়তমা কেমন আছে? কি করিতেছে? কেহ আসিয়া কি তাহার সংবাদটা দিতে পারে না? কেহ কি যক্ষের দুইটা সান্ত্বনার কথা লইয়া, তাহার প্রণয়িনীর কাছে যাইতে পারে না? ভাবিতে ভাবিতে যক্ষ উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। মেঘের পানে চাহিয়া ভাবিল, মেঘ ত নানা দেশে চলিয়া বেড়ায়, তাহার দ্বারা প্রিয়তমাকে দুইটা কথা বলিয়া পাঠান যায় না? মেঘ কি সে উপকার টুকু করিবে না? এই ভাবিয়া, বিরহোন্মাদ যক্ষ, কুটজ কুসুমে মেঘের অভ্যর্থনা করিল, শেষে অলকায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিল!

মেঘ এইরূপে দূত হইল,—বুঝিলে কি? যক্ষ, মেঘকে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিল,—

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং—

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মেঘ অলকায় যাইতে স্বীকার করিল? এ দূতিগিরি করিতে আপত্তি করিল না?"

মেঘ আবার আপত্তি করিবে কি? যক্ষ বুঝিয়া লইল, মেঘ অলকায় যাইতে স্বীকার করিল। মদনসন্তপ্ত বিরহী যাহা ভাবে, সে মনে করে তাহার সে ভাবনা ঠিক। সে যেরূপ ভাবিয়া সুখী হয়, সেইরূপই ভাবিয়া থাকে, সত্যাসত্যের বিচার বড় করে না। নহিলে মেঘ কখনও দূত হয়, না তাহার কথা লইয়া অলকায় যাইবে, এইরূপ ভাবনা সে ভাবে?

গৃহিণীর মুখপানে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি কি ভাবিতেছেন। একটু বড় মধুর রহস্যের হাসিরেখা, অধরোষ্ঠের মাঝখান টুকুতে তাম্বুল রাগের সহিত মিশিয়া, বড় সুন্দর দেখাইতেছে। আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাবিতেছ কি?"

গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—ভাবিতেছি এই, বলি এ ব্যাপারটা কি? বিরহ কি এমনই জিনিস যে চেতন অচেতনে জ্ঞান নাই? মেঘ আবার দূত হইল! মেঘের সহিত আলাপ! আমার মনে হয়, কবি কালিদাসের এ সব বাড়াবাড়ি!"

বাড়াবাড়ি কিছুই নহে। যে চিত্তবিকারে এমন দশা ঘটে, ভাব দেখি, সে কি ভয়ানক চিত্তবিকার! কবিও নিজে বলিয়াছেন,—"কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু" যাহারা কামাতুর, চেতন অচেতন বিচার করিয়া দেখিবে, সে টুকু বুদ্ধি তাহাদের ঘটে নাই। তার পর শুন, যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তত্পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতি ক্রোধপবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতি রলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধোতহর্ম্যা॥
ত্বমারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বণিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীন বৃত্তিঃ॥

—হে মেঘ, বিরহ সন্তপ্ত জনের তুমিই ভরসা। তুমি এ অভাগার মুখ প্রতি চাও। দেখ, ধনপতি কুবেরের নিষ্ঠুর অভিশাপে কি যন্ত্রণাই আমি ভোগ করিতেছি! তুমি আমার প্রিয়ার কাছে দুইটা সংবাদ লইয়া যাও। এখান হইতে বরাবর অলকায় গমন কর, অলকায় যক্ষদিগের কৌমুদিবিধৌত

সুন্দর অট্টালিকা সকল দেখিতে পাইবে। আমার প্রিয়তমাও সেখানে আছে।

দেখ, তুমি আকাশে উঠিবে, আর বিরহ-বিধুরা রমণীগণ চোখের আশপাশ হইতে অলকাগুচ্ছ সরাইয়া সরাইয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে। তোমায় দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইবে, তাহাদের প্রিয়জনেরাও প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। কেননা, তোমায় দেখিয়া কোন্ প্রবাসী, বিরহ-বিবশা প্রিয়তমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? আমি পরাধীন ভৃত্য, হায়! আমার কপালে সে সুখ নাই!

যক্ষ, তখন মেঘকে অলকায় যাইতে বলিল। মৃদুমন্দ অনুকূল বায়ু বহিবে, মেঘের হৃদয় তাহাতে শীতল হইবে। বলাকাগণ ফুলের মালার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মেঘের চারিপার্শ্বে খেলিতে থাকিবে, চাতক সুমিষ্ট গান করিতে করিতে মেঘের বামপার্শ্বে * প্রফুল্ল অন্তরে ফুটিতে থাকিবে।—যক্ষ, মেঘকে এত সুখের সম্ভাবনা দেখাইল, মেঘ না যাইবে কেন?

বুঝি যক্ষ বুঝিয়াছিল, হয় ত মেঘ যাইতে চাহিবে না। কে জানে পথে কত কষ্টই আছে। কেনই বা মেঘ তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবে? তাই যক্ষ এক এক করিয়া দেখাইয়া দিল, কোন কষ্ট নাই, বরং সুখ আছে। কিন্তু তবু যক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাই একটু পাকাপাকি রকম করিবার জন্য বলিতে লাগিল,—

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥

—মেঘ, তুমি অলকায় গিয়া, বিরহিণী পতিব্রতা তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে পাইবে।—

গৃহিণী।—"মেঘের আবার ভ্রাতৃজায়া কে?"

বুঝিলে না? যক্ষ, মেঘের সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধ পাতাইল। যক্ষ ভাবিল, মেঘ এখন আমার ভাই হইল, এখন আর সে কোন ওজর করিতে পারিবে না, ভাইয়ের জন্য ভাই আর এই উপকার টুকু করিবে না? এখন মেঘ কেবল দূত নহে, যক্ষের ভাই; কাজেই যক্ষের পত্নী, মেঘের ভ্রাতৃজায়া হইল।—বুঝিলে কি?

গৃহিণী। বুঝিলাম। কিন্তু প্রবাসী হইলে, বর্ষায় কি এমনই বিরহোন্মাদ ঘটে?

এখন শুন, যক্ষ বলিতেছেন,—

—ভাই মেঘ, তুমি অলকায় গিয়া, বিরহিণী পতিব্রতা তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে পাইবে। কবে আমার শাপ মোচন হইবে, কবে আবার আমাদের মিলন হইবে, বসিয়া বসিয়া সে সেইদিন গুনিতেছে। আমারই আশায় সে এতদিন বাঁচিয়া আছে। বৃন্ত যেমন ফুলগুলিকে ধরিয়া রাখে, ঝরিতে দেয় না, তেমনি বিরহে যখন অবলাগণের কুসুম-কোমল হৃদয় ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, আশা অমনি সেই বৃন্তের মত ধরিয়া রাখে, ঝরিতে দেয় নাই।

তারপর যক্ষ আবার বলিতে লাগিল,—মেঘ বরাবর চলিয়া যাইবে, তাহার মধুর

* বামপার্শ্বে কেন? টীকাকারেরা ঐ বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ঘটাইয়াছেন। পণ্ডিত রামনাথ তর্কালঙ্কার বলেন, 'বাম' শব্দে Beautiful, তিনি বলেন পক্ষী কূজন শুভসূচক বটে, কিন্তু তখন তাহারা দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই সংগীত করে। তারতম্যমল্লিক বলেন, চাতক পক্ষী এ নিয়মের ব্যভিচার, তাহারা বামেই থাকে এবং তাহাতেই শুভসূচনা হইয়া থাকে।

গম্ভীর গর্জ্জনে তৃষিতা মেদিনীর প্রাণ জুড়াইবে এবং রাজহংস সকল মানস-সরোবরে যাইবার জন্য, কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।* পথে অনেক পাহাড় পর্ব্বত পড়িবে, শ্রান্তদেহ মেঘ সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিবে; কোথাও নদ নদী পড়িবে, তাহার শীতল বারিসংস্পর্শে মেঘের ক্লান্তি দূর হইবে।

এখন যক্ষ একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। তাহার মনে হইল, মেঘের আপত্তি করিবার আর কোন কারণ নাই। এইবার সে অলকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল। মেঘ কোন্ পথে যাইবে? রামগিরি ছাড়িয়া মেঘকে অলকায় যাইতে হইবে। যে সকল পাহাড়, পর্ব্বত,নদনদী, দেশ উপবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে,—যক্ষ একে একে, মেঘকে সেই সকল বলিয়া দিতে লাগিল।

এই উপলক্ষে,কবি অনেক দেশ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকল বর্ণনা এত ভাব ও কবিত্বপূর্ণ, এত সুন্দর ও মধুর যে, দু' এক কথায় তাহার কিছুই বলা হয় না। Scott, Byron প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ পাহাড় পর্ব্বত, নদনদীর অনেক বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মহাকবির বর্ণনা স্থানে স্থানে সে সকলও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

গৃহিণী।—কবি এই স্থলে যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন,কিম্বা যে সকল পর্ব্বত ও নদীর অবতারণা করিয়াছেন, সে সকল কি যথার্থ, না তাঁহার অসামুখী কল্পনা প্রসূত?

* কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্তই মেঘকে যাইতে হইবে। রাজহংস সকল কৈলাস পর্যান্ত মেঘের অনুসরণ করিবে। কবিরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, প্রতি বর্ষা সমাগমে রাজহংস সকল মানসসরোবরে গমন করিয়া থাকে। কৈলাসের মধ্যেই মানসসরোবর অবস্থিত।

আমার বোধ হয় দু' একটি যথার্থ না হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই সত্য। আজিও তাহার অনেক স্থান বিদ্যমান আছে। তবে কালক্রমে অনেকগুলির নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। তারপর শুন।

রামগিরি ছাড়িয়াই মেঘকে উত্তর দিকে যাইতে হইবে। সেখানে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনাগণ মেঘকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিবে, ভাবিবে বুঝিবা বাতাস গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া চলিয়াছে!

তারপর, পূর্ব্বদিকে ফিরিতে হইবে। সেখানে মালক্ষেত্র পড়িয়া আছে। চারিদিক সৌগন্ধে পরিপূর্ণ। তথায় সরলহৃদয় জনপদ-বধূগণ প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে মেঘের পানে চাহিয়া থাকিবে!

মালক্ষেত্র পশ্চাতে রাখিয়া,মেঘকে আবার উত্তরদিকে ফিরিতে হইবে। সেখানে আম্রকূট পর্ব্বত। মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া, কতবার তাহার দাবাগ্নি নিবাইয়া দিয়াছে, মেঘের সে উপকার আম্রকূট কখনই ভুলিতে পারিবে না।

ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ।*

* এইখানকার একটী কথা মনে পড়িতেছে। বিজাতীয়ের নিকট অনেক সময় হিন্দুগণ অকৃতজ্ঞ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "মেঘদূত" অনুবাদ কালে এই স্থান উপলক্ষ করিয়া Wilson সাহেব কি বলিয়াছেন,তাহা শুনুন:—

"The Hindus have been the object of much idle panegyric and equally idle detraction; some writers have invested them with every amiable attribute and they have been deprived by others of the common virtues of humanity. Amongst the excellencies denied to them, gratitude has been always particularized, and there are many of the *European* residents in *India*, who scarcely imagine that the natives of the country ever heard of such a sentiment."

যে অতি ক্ষুদ্র—অতি অধম, সেও কখন বন্ধুর উপকার ভুলেনা; যে উন্নত ও মহৎ, সেকি কখনও কাহারও উপকার ভুলিয়া থাকিতে পারে? অতএব, আম্রকূটে মেঘ যথেষ্ঠ অভ্যর্থনা পাইবে।

আম্রকূট হইতে কিছু নিম্নে নামিয়া,মেঘ চিত্রকূট দেখিতে পাইবে। যক্ষ বলিয়া দিল, "তুমি একবার চিত্রকূটে নামিও, শীতল বারিধারায় তাহার নৈদাঘ বহ্নি নিবাইয়া দিও।"

যক্ষের হৃদয়ের অবস্থাটা বুঝিও। সে যেমন নিজের বুকের আগুন নিবাইতে ব্যস্ত, তেমনি কে কোথায় পুড়িতেছে, তাহাদের জন্যও তাহার প্রাণ কাতর; তাই মেঘকে সকাতরে বলিয়া দিতেছে, এখানে একটু শীতল ছায়া দিও, সেখানে একটু স্নিগ্ধ বারিবর্ষণ করিও,অন্যত্র একটু গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে কাহারও হৃদয়ে আশা দিও। যা'র বুকে নাকি আগুন জ্বলে,সেই জ্বালা বুঝিয়া পরের আগুন নিবাইতে যত্নবান হয়!

আম্রকূট ফেলিয়া,মেঘ তারপর বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিবে। মেঘ দেখিবে, বিন্ধ্যার পাদদেশে বিশীর্ণা রেবানদী বহিয়া চলিয়াছে। রেবার তরঙ্গসংস্পর্শ সুশীতল সমীরণে মেঘের শ্রান্তি-দূর হইবে। রেবার চারিদিকে মনোহর শোভা! বর্ষাসমাগমে প্রকৃতি হাস্যময়ী। বৃক্ষলতার শ্যাম শোভা, কুসুম রাশির মধুর বিকাশ, বিহঙ্গ কুলের সুমিষ্ট সঙ্গীত,মেদিনীর সৌরভরাশি—মেঘের পথের চারিদিকেই কি শোভা! পর্ব্বতবাসী ও অরণ্যবাসী কিন্নর কিন্নরী সতৃষ্ণ নয়নে মেঘের পানে চাহিয়া থাকিবে, দেখিবে মেঘের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বলাকাগণ চলিয়াছে;—মেঘেরকোলে সেই বলাকার শ্রেণী—আহা! কি সুন্দর! চাতক, বারিবিন্দুর জন্য মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তৃষিত নয়নে চাহিয়া চলিয়াছে! যখন সেই কিন্নর কিন্নরী দেবগণ মেঘের মধুর গর্জ্জন শুনিবে, কতক ভয়ে, কতক উল্লাসে, তখন তাহারা স্ব স্ব প্রণয়িণীদিগকে আলিঙ্গন করিবে, আর মেঘের অভ্যর্থনা করিবে!

এমন পথ পর্য্যটন করিতে মেঘ না চাহিবে কেন?

কিন্তু মেঘকে এতটা প্রলোভন দেখাইয়া দিয়া, যক্ষের একটু ভয় হইল। কি জানি যদি সে পথে বিলম্ব করে? যদি সে পথের মাঝে কাহারও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আর অলকায় না যায়? কি জানি প্রণয়ি-হৃদয় এতই সন্দিগ্ধ বুঝি! যক্ষ কাতর ভাবে কি বলিতেছে, এই শুন :—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থংয়িয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ॥

—সখে মেঘ, যদিও তুমি আমার প্রিয়তমার কাছে শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিবে বটে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্র যাইতে পারিবে না। কুটজ কুসুমের সুগন্ধে পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমার বিলম্ব হইবে। তোমায় দেখিয়া ময়ূর ময়ূরী আনন্দাশ্রু ফেলিতে থাকিবে; যখন তাহারা সেই জলভরা আঁখি দুটীতে তোমার পানে চাহিয়া তোমার সাদর সম্ভাষণ করিবে,—তখন কি তোমার আর কিছু মনে থাকিবে? দেখিও একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইও!

তারপর মেঘ দশার্ণদেশে পৌঁছিবে। বিদিশা, দশার্ণদেশের রাজধানী। তথায় বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। তরঙ্গচঞ্চলা বেত্রবতী সুন্দর তটপ্রদেশে মধুর শব্দ করিতেছে। কামার্ত্ত যেমন বিলাসিনীর অধর-

চুম্বনে তৃপ্তি লাভ করে, বেত্রবতীর সে নির্ম্মল মুখখানি দেখিয়া, মেঘকেও একবার সে নদীজল পান করিতে হইবে!

গৃহিণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মেঘেরত বড় গরজ!

মেঘের গরজ আছে কি না বলিতে পারি না। যক্ষের কথায় মেঘ তাহা করিবে কি না, কে জানে? কিন্তু যক্ষ যদি মেঘ হইত, সে ওসকল কখনই উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিত না।

যক্ষ বলিয়া দিল,—"বিদিশার কোন পাহাড় প্রদেশে ক্ষণেক বিশ্রাম করিও, তারপর—

> বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন নদী তীরজাতানি সিঞ্চ-
> ন্নুদ্যানানাং নবজল কণৈর্যূথিকাজালকানি।
> গণ্ডস্বেদাপয়ন রুজাক্লান্ত কর্ণোৎপলানাং
> ছায়াদানাত্ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥

একটু বিশ্রাম করিয়া, একবার বননদী-তীরে যাইও। বননদীতীরে কুসুম উদ্যানে যূথিকা কুঁড়িগুলিতে একটু নবজলকণা সিঞ্চন করিও। আর সেখানে যে রমণীগণ কুসুমচয়ন করিতে করিতে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, রৌদ্রে যাহাদিগের কপোলদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, কাণের কুসুম আভরণগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সেই রমণীগণকে একটু খানির জন্য তোমার ছায়া দিয়া যাইও।

গৃহিণী কিছু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—"কবি বস্তুতঃই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। যে-খানে রমণীর কোন প্রসঙ্গ পাইয়াছে, যক্ষ সেই খানেই যেন একেবারে অধীর! রমণীর প্রতি পুরুষের এপ্রকার ভাব নিতান্ত ঘৃণার! আমি বেশ বলিতে পারি, যক্ষের প্রণয়িণী যদি এ সকল শুনিত, সে নিশ্চয়ই ঘৃণায় মরিয়া যাইত!

আমি ত শুনিয়াই অবাক্! যক্ষ যে প্রবাসী বিরহী, কামাতুর,—কবি ত প্রথমেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বিরহে যাহার এমন চিত্তবিকার ঘটিয়াছে যে মেঘকে পর্য্যন্ত দূত বানাইতে পারিয়াছে, সে যে এমন হইবে, তাহার বিচিত্র কি? তুমি কি এতক্ষণে ইহাই বুঝিলে?

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমার এ পরিশ্রম বৃথায় যাইতেছে না। ভাবিতেছি এই, মেঘের পথের চারিধারেইত প্রকৃতির মধুর শোভা; হইতে পারে, সেই শোভার মাঝে যে কোন প্রকারে হউক রমণী প্রসঙ্গ আনিতে পারিলে, শোভাময়ী প্রকৃতি আরও সুন্দরী হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে যা কিছু সুন্দর, তাহাই যক্ষের চক্ষে পড়িতে হয়? আর সুন্দর দেখিলেই কি অমনি হাঁ করিয়া থাকিতে হয়?"

"সুন্দর দেখিলেই হাঁ করিয়া থাকিতে হয়?" একথার ঠিক উত্তর কোথাও পাই নাই। বরাবর ইহাই দেখিয়া আসিতেছি, সৌন্দর্য্যের চরণে মানুষ চিরদিনই অবনত। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। সৌন্দর্য্য কোথায় নাই? বৃক্ষলতায়, কীট-পতঙ্গে, তৃণ গুল্মে, চন্দ্রসূর্য্যে—সৌন্দর্য্য কোথায় নাই? শিশুর হাসিতে, ব্রীড়াময়ীর সৌকুমার্য্যে, নদীর তরঙ্গে, গোবৎসের স্নিগ্ধ পাটলীবর্ণে, নিবিড় মেঘের নীলিমায়—সৌন্দর্য্য কোথায় নাই? সাগরে ভূধরে, গহনে প্রান্তরে,—চারিদিকে সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। এমন সৌন্দর্য্যের হাটে তবু মানুষ সৌন্দর্য্যের ভিখারী। নয়ন তৃপ্ত হয়না, আশা মিটেনা, সাধ পূর্ণ হয় না। তাই জন্ম জন্মও সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়া, রূপেন্দ্রিয় তবুও সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। যে অন্তরে কলুষিত, যে পাপচক্ষুতে বিশ্বের

ধারা ঢালিয়া সৌন্দর্য্যের মুখ মলিন করিয়াছে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষে পড়িবেনা, সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের উপাসক হইতে পারিবে না। মানবপ্রাণে সৌন্দর্য্যের পিপাসা অতি বলবতী। কেন তা বুঝি না, কিন্তু মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের দাস, যেখানে সৌন্দর্য্য, সেই খানেই মস্তক অবনত। তারপর শুন,—

যক্ষ বলিয়া দিল,--"মেঘ,বননদীতীর হইতে উজ্জয়িনীতে যাইও। পথটা একটু বাঁকা বটে *, কিন্তু তাহা হইলেও একবার সেখান হইয়া যাইও। কেন ?—

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥

তোমার বিদ্যুল্লতার বিলাস দেখিয়া, উজ্জয়িনীর পুরনারীরা চকিত নয়নে, চঞ্চল কটাক্ষে তোমার পানে চাহিবে,—তুমি যদি সে সুখে বঞ্চিত হও, তবে তোমারও চক্ষু থাকিয়াও অন্ধ, তোমার জন্মই বৃথা !"

গৃহিণী বলিলেন,—

"পথটা ত বলিলে বাঁকা, মেঘেরও শীঘ্র যাইতে হইবে, তবে আবার এ চঞ্চলনয়নার কটাক্ষ দেখাইবার লোভ দেখান কেন ? সোজা পথ ধরিয়া যাইলেই ত চলিত ?"

তুমি ঠিক ধরিয়াছ বটে, কিন্তু কথা কি জান, উজ্জয়িনী নাকি কবির স্বদেশ,স্বদেশের প্রতি কবির যথেষ্ঠ প্রাণের টান ছিল, তাই একটু কৌশল করিয়া তিনি উজ্জয়িনীর সৌন্দর্য্যটা দেখাইতে চাহেন। † তাই মেঘকে একটু ঘুরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সোজাপথ ছাড়িয়া সহজে কে বাঁকা পথে যাইতে চাহে? সেইজন্য কবি,যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে একটা প্রলোভন দেখাইয়া দিলেন যে, সেখানে চঞ্চল-নয়না পুরনারীর কটাক্ষ দেখিতে পাইবে। মেঘ কি এখন না যাইয়া থাকিতে পারিবে ?

গৃহিণী।—কিন্তু তাহাতে ত যক্ষেরই ক্ষতি, মেঘেরও ত বিলম্ব হইতে পারে ?

তা ঠিক। কিন্তু যাহার দ্বারা কাজ লইতে হইবে, তাহার একটু মন না রাখিলে চলিবে কেন ? যেখানে যা' সুন্দর,যক্ষ তাহা জানে, মেঘকে সে সকল বলিয়া দিলে মেঘ কত সন্তুষ্ট হইবে !

মেঘ যখন নির্ব্বিন্ধ্যানদী দেখিতে পাইবে, তখন কত পুলকিত হইবে। নবীনা যুবতীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণের ন্যায়,নির্ব্বিন্ধ্যার সে জলকল্লোল কি শ্রুতিমধুর ! তাহার ভ্রূভঙ্গীর ন্যায় নির্ব্বিন্ধ্যার সে বীচি-বিভ্রম কি হৃদয়-উন্মত্তকারী ! মেঘকে যেন বুকের ভিতর পূরিবার জন্য, নির্ব্বিন্ধ্যা তাহার বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া আছে !

নির্ব্বিন্ধ্যার পরেই সিন্ধুনদী। এই দারুণ উত্তাপে সিন্ধু শুকাইয়া গিয়াছে। মেঘ যেন তাহা উপেক্ষা করিয়া না যায়।

তারপর, মেঘ যখন অবন্তীনগরে পৌছিবে, যক্ষ বলিয়া দিল, সে যেন সে নগরের শোভা দেখিতে ভুলিয়া না যায়। অবন্তী, মর্ত্ত্যভূমে ইন্দ্রের আবাসস্থান, কবির কল্পনাতীত সুখের দেশ ! অবন্তীর বৃদ্ধেরা বৎসরাজের কত গল্পই জানে ! প্রেম-পাগলিনী সেই বাসবদত্তা, বৎসরাজের সেই বীরত্ব,—আহা ! এই আষাঢ়ের দিনে কত সুখেই তাহারা সেই সকল

* বিদিশা হইতে অলকা ঠিক উত্তরে, উজ্জয়িনী কিছু পশ্চিমে। উজ্জয়িনী দেখিয়া যাইতে হইলে মেঘকে কিছু পশ্চিম ঘুরিয়া যাইতে হয়।

† কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন, উজ্জয়িনী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী, কবি, রাজার মনোরঞ্জনার্থেই নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে এখানে উজ্জয়িনীর অবতারণা করিয়াছেন।

আলোচনা করিতেছে! মেঘ যেন সে সকল উপেক্ষা করিয়া না যায়।

উজ্জয়িনীতে মহাকাল দেবের মন্দির। মেঘ যখন সেই মন্দিরে হইবে, যক্ষ বলিয়া দিল—"মেঘ! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিও। সন্ধ্যায়, মহাকাল দেবের মন্দিরে পূজার জন্য শঙ্খ ঘণ্টা বাজিবে, তুমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করিও। তারপর দেখিবে, নর্ত্তকীরা আসিয়া নৃত্য করিবে। তাহাদের চরণ নিক্ষেপে নপুরগুলি বাজিতে থাকিবে, কঙ্কণকান্তি-খচিত চামর দণ্ড ব্যজন করিতে করিতে তাহাদের হাতগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তুমিও সেই সময় একটু বারিবর্ষণ করিও, তাহাদের পাদুকাশূন্য কোমল চরণগুলি জুড়াইবে! তোমার সুস্নিগ্ধ বারিবর্ষণে কত সুখী হইবে। তাহারা সেই বিশাল আঁখির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তোমার পানে চাহিবে! সে সুখে যেন বঞ্চিত হইও না।"

উজ্জয়িনীতে আর কি দেখিবে?

গচ্ছন্তীনাং রমণ বসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতি পথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরোমাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

যখন দেখিবে, উজ্জয়িনী রাজপথে অভিসারিণী রমণীগণ সূচিভেদ্য অন্ধকারে, আপনাদিগকে লুকাইয়া, অভিসারে চলিয়াছে, তখন তুমি তোমার স্বর্ণপ্রভা স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলো দেখাইয়া তাহাদের পথ দেখাইও, কিন্তু গর্জ্জন করিয়া যেন তাহাদিগকে ভয় দেখাইও না, তাহারা বড় ভীরু!

যক্ষ, রাত্রিতে মেঘকে চলিতে নিষেধ করিল। বলিয়া দিল, কোন সুখপ্রদ স্থানে বিশ্রাম করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইলে, সূর্য্যোদয়ে আবার চলিতে থাকিবে। কিন্তু যক্ষ সাবধান করিয়া দিতেছে,—"দেখিও, সূর্য্যের পথে দাঁড়াইয়া গোল বাঁধাইও না। দেখ, খণ্ডিতাকামিনী, সারানিশি প্রিয়বিরহক্লেশ ভোগ করিয়া, সূর্য্যোদয়ে প্রিয়তমকে পাইয়া আঁখিজল মুছিয়া থাকে; সূর্য্যও নিজ প্রিয়তমা নলিনী সুন্দরীর শিশির অশ্রু মুছাইতে থাকেন। অতএব তুমি তাঁহার পথে দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলে তুমি বিশেষরূপে তাঁহার বিদ্বেষের কারণ হইবে!"

তারপর মেঘকে আরও অনেক নদ নদী অতিক্রম করিতে হইবে। সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী সকলের বর্ণনা এত হৃদয়গ্রাহিণী যে দু' এক কথায় তাহার কিছুই বলা হয় না। যক্ষ বলিয়া দিল, এই সকল অতিক্রম করিয়া, মেঘ অবশেষে কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইবে। সে বর্ণনাই বা কি সুন্দর!

যক্ষ বলিতেছে,—

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যোবিততত্যস্থিতঃখং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

মেঘ! তারপর তুমি কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইবে। দশানন রাবণ এক সময় ভুজবলে কৈলাসকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ত্রিদশবনিতাগণের দর্পণের মত সে গিরি অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তাহার নির্ম্মল শৃঙ্গদেশ এত উচ্চ যে আকাশ ব্যাপিয়া আছে। সে রজতশুভ্র কৈলাসগিরি দেখিয়া মনে হইবে, যেন দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতিদিনের হাসি একস্থানে রাশীভূত হইয়া রহিয়াছে! তাই মেঘ! তুমি সেইখানে অতিথি হইও।

যদি দেখ সেই ক্রীড়াশৈলে হরগৌরী পরস্পরে হাতে হাত দিয়া পাদচারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তবে তাঁহাদিগের আরোহণের জন্য তোমার শরীর দিয়া সোপান করিয়া দিও, সে পাদস্পর্শে তুমি কৃতার্থ হইবে।

সেথানে দেখিবে সুরযুবতীগণ ক্রীড়া করিতেছে। অতি গ্রীষ্মের সময় তোমায় পাইয়া, তাহারা মনে করিবে বুঝি তুমি জলপূর্ণ কোন যন্ত্র বিশেষ! তখন তাহারা তোমায় গোলাপপাশের মত ঘুরাইতে থাকিবে, বিন্দু বিন্দু তোমার বারি ঝরিবে, তাহারা স্নিগ্ধ হইবে! যদি তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে না পার, তবে একটু গর্জ্জন করিও, ভয়ে তাহারা তোমায় ছাড়িয়া দিবে!

এইবার অলকা! যক্ষ বলিয়া দিল, কৈলাসের উৎসঙ্গদেশে, প্রিয়তম বন্ধুর মত, অলকা অবস্থিত।

সেই রামগিরি আশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণে আমরা অলকায় পৌছিলাম! সেই রামগিরির তটপ্রদেশ হইতে এক এক করিয়া কত দেশ, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী অতিক্রম করিয়া অলকায় আসিতে হইল! প্রতিবারেই মনে হইয়াছে যেন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, প্রতিবারেই কবি নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, পথিকের শ্রান্তি অনুভব করিতে দেন নাই! পথিকের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে, শ্রান্তি কোথায়, ক্লেশ কোথায়! রামগিরি হইতে অলকার যে পথ, সারাপথই কুসুমাবৃত! কুসুমেও কণ্টক আছে, কিন্তু সে পথে যে কুসুম, তাহাতে বুঝি একটিও কণ্টক নাই! এত সুধারাশি কোন্ কাব্যে আছে?

রামগিরি হইতে যখন অলকায় আসিয়া পৌঁছিলাম, মনে হইল যেন কোন্ স্বপ্নমন্ত্রে চলিয়া আসিয়াছি! যেথানে যাহা দেখিয়া আসিলাম, হৃদয়-মাঝে চরদিনের জন্য তাহা অঙ্কিত রহিল! সেই উজ্জয়িনী,—শ্যাম শোভায় প্রকৃতি হাস্যময়ী, প্রীতিপ্রফুল্লতায় নরনারী উৎফুল্ল; সেই অবন্তী, নরলোকে অমরাবতী, বৎসরাজের বীরত্ব, বাসবদত্তার প্রেম;—সে সকল কি কখন ভুলিব? সেই বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, গঙ্গা, যমুনা,—কূলে কূলে সৌন্দর্য্যরাশি উছলিয়া পড়িতেছে; সেই বননদীতীরে কুসুম কানন, বেলা, মল্লিকায় চারিদিক সুরভিপূর্ণ, মধুরকণ্ঠ বিহগের সুধাসঙ্গীতে নিনাদিত,—সে সকল কি ভুলিবার? প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য এমন করিয়া কয়জন দেখাইতে পারে? এমন "সরলে শোভাময়ী" ভাষাই বা আর কাহার? "মেঘদূত" আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য।

গৃহিণী।—এই সকল বর্ণনার মধ্যে বিরহবিধুর যক্ষের হৃদয়টুকুও কেমন চিত্রিত হইয়াছে! প্রতি ছত্রে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয়, প্রতি কথায় তাহার মর্ম্মকাতরতার উচ্ছ্বাস! যক্ষ যখনই কোন দেশ, কোন পর্ব্বত, কি কোন নদীর অবতারণা করিয়াছে, সমস্ত হৃদয়টুকু যেন তাহাতে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার হৃদয়-ভরা দারুণ দুঃখের ছায়া, সেই সকলের উপর পড়িয়া, বর্ণনাগুলি এতই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে! প্রিয়তমার মিলন আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তিজনিত কি জীবন্ত উচ্ছ্বাস!

সে সকল পরে বলিব। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এই বর্ষা-বিরহের দৌরাত্ম্যটা কত!

গৃহিণীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, লজ্জার রক্তিম আভা তাঁহার মুখখানি ঢাকিয়া

ফেলিয়াছে, অস্ফুট একটু হাসিরেখা অধরোষ্ঠের মাঝখানটুকুতে ক্রীড়া করিতেছে! তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বুঝিলাম, আমার এ পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, মহাকবি কালিদাসের লেখনীও সার্থক হইয়াছে!!

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। সেই বৃষ্টির পর, ঘোলাটে ঘোলাটে জ্যোৎস্নাটুকু বড় মধুর লাগিল। তেমন মধুর রাত্রে, তেমন মধুর বিরহ-গাথা, কত মধুর লাগে! আমি আবার আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু সে কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

গীতার প্রামাণ্য। (৭)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি—"ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সংসারাশ্রমের কর্ম্ম ও ভক্তিযোগে এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জ্ঞানযোগে তাহার পরিণতি ও প্রমাণ।" ইউরোপীয় পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রমাণপ্রণালীকে Verification বলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে যাহা প্রত্যয়রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যরূপে প্রমাণ করা চাই। যে ব্রহ্মজ্ঞান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে,আত্ম-প্রতীতি নহিলে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। বোধের প্রতিবোধদ্বারা শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্বের Verification হয়। কোন পণ্ডিত বলিতেছেন:—

"The weakness of the subjective Method is its impossibility of applying Verification; whereas the security of the objective Method lies in its vigilant Verification"—G. H. Lewes.

তিনি আরও বলেন:—

"The cardinal distinction between Metaphysics and Science lies in Method, not in the nature of their topics; and the proof of this is exemplified in the fact that a theory may be transferred from Metaphysics to Science simply by the addition of a verifiable element; or conversely may be transferred from Science to Metaphysics by the withdrawal of this same element."

স্থানান্তরে:—

"All facts require verification before they are admitted as truths."

"অন্তর্বিষয়ক প্রণালীর (Subjective Method) দোষ এই যে, তাহাতে জ্ঞান বা প্রত্যয় প্রমাণীকৃত হয় না; কিন্তু বহির্বিষয়ক প্রণালীতে (Objective Method) জ্ঞান বা প্রত্যয়কে অতি সাবধানে, বিশুদ্ধ পরীক্ষা প্রণালী ক্রমে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে; এজন্য তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ প্রণালী।"

"আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা আছে বলিয়া যে পদার্থবিদ্যার (Science) সহিত তত্ত্ববিদ্যার (Metaphysics) বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, এমত নহে; তাহাদের তত্ত্বনির্ণয়ের প্রণালী বিভিন্ন বলিয়া ঐ দুই বিদ্যার বিভিন্নতা হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার কোন মত বা প্রত্যয় যদি পরীক্ষা দ্বারা শোধিত হয়, তবেই তাহা পদার্থবিদ্যান্তর্গত হইতে পারে; আবার পদার্থবিদ্যার কোন মত বা প্রত্যয় যদি পরীক্ষা বা প্রমাণ দ্বারা পরিশুদ্ধ না হয়, তবে তাহা তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল।"

"কোন ঘটনা বা তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ করা আবশ্যক।" জি, এচ্, লুইস্।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পরীক্ষোত্তীর্ণ জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান। তত্ত্বনির্ণয়ের যাহা বিশুদ্ধ প্রণালী, তাহাতে দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়; প্রথম—প্রত্যয় বা মতসংগঠন; দ্বিতীয়—উপযুক্ত প্রমাণ বা পরীক্ষা দ্বারা সেই প্রত্যয় বা মত-সংস্থাপন।

তত্ত্বনির্ণয়ের এই পরিশুদ্ধ প্রণালী, হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে বেদজ্ঞান, তৎপরে অনুষ্ঠান দ্বারা সেই জ্ঞানের পরীক্ষা।

আমরা হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মতত্ব সকলের উপদেশ মাত্র পাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ও আত্মজীবনে তাহাদের সত্যতার উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান যত দিন না প্রমাণীকৃত এবং হৃদয়ে প্রতীত হয়, ততদিন তাহার পূর্ণতাও সম্যক্ অনুভূত হয় না। যখন আত্মাতে তাহার অনুভূতি হয়, তখনই তাহা একদা প্রমাণীকৃত ও স্বরূপতঃ জানা যায়। এই অনুভূতিই বিজ্ঞান। তত্বনির্ণয়ের এই বিশুদ্ধ প্রণালী গীতায়ও উপদিষ্ট হইয়াছে :—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
৬ অ—৮।

যাঁহার আত্মা জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা আকাঙ্ক্ষাহীন, ইত্যাদি—এ স্থলে "জ্ঞান" কি, তাহা শ্রীধর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"জ্ঞানমৌপদেশিকং"

"বিজ্ঞান" কি, তাহাও তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য"।

জ্ঞান—উপদিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিজ্ঞান—অপরোক্ষানুভূতি। যিনি এই জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞাত বিষয়ের অনুভব করিয়া তাহার সত্যতা প্রতীত করিয়াছেন, তিনিই তৃপ্ত এবং সেইজন্য নিরাকাঙ্ক্ষ, তিনিই যথার্থ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীধর "বিজ্ঞানের" অর্থ, অপরোক্ষানুভূতি করিয়াই নিরস্ত হইলেন; কারণ, এই অপরোক্ষানুভূতি বেদান্তীর নিকট অতি সুপরিচিত বিষয়। এই শব্দ মাত্র উচ্চারণে বেদান্তীর পঞ্চদশী এবং শঙ্করের "অপরোক্ষানুভূতিঃ" মনে পড়িবে। পঞ্চদশীতে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ অনুভূতির বিভিন্নতা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে॥"

জীব, জগৎ ও পরমাত্ম-তত্ব সম্বন্ধে দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান, শাস্ত্র এবং গুরূপদিষ্ট পরমার্থ-জ্ঞান। এই জ্ঞান কতকাল পর্য্যালোচনা করিবে? যতকাল না অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। পরোক্ষ-জ্ঞানে তুমি জানিতে পারিলে যে, এই জগতের কারণস্বরূপ একমাত্র পরংব্রহ্ম আছেন। এই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক করা চাই। এই জ্ঞান যখন অপরোক্ষানুভূতিতে নিশ্চয়াত্মক হইবে তখন জানিতে পারিবে যে, আমিই সেই নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বরূপ পরংব্রহ্ম। এই অপরোক্ষানুভূতির উদয় হইলে আর কোনপ্রকার বিচারের আবশ্যকতা নাই। তখন সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইল। শ্রীমদ্ভারতী-তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর জ্ঞানালোচনের কাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজস্থ শতসহস্র লোক এই জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিত।

এই "অপরোক্ষানুভূতি" কি, শঙ্কর তদ্‌সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে অপরোক্ষানুভূতির বিষয় সমস্ত পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থালোচনায় প্রতীত হয়, যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরব্রহ্মকে সেইরূপ প্রত্যক্ষীভূত করা যায়।

এই অপরোক্ষানুভূতি কিরূপে লাভ করা যায়? "যাঁহারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়-সম্পন্ন মুক্তিকামী-যোগী, তাঁহারাই কেবল যত্ন দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন।" তাই শঙ্কর-প্রণীত "অপরোক্ষানুভূতির" টীকাকার বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলিতেছেন :—

"কিং লক্ষণাপরোক্ষানুভূতিঃ সদ্ভিঃ সাধুভির্নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নৈর্ম্মুমুক্ষিভিঃ।"

যাঁহারা কর্ম্মোপাসক, তাঁহারা একেবারে অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানাধিকারী ও মুক্তিকামী না হইলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা কর্ম্মফল বাসনায় নিয়ত ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে; তাঁহাদের কর্ম্মফলই লাভ হইবে, কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় এবং তাঁহারাই তৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করেন;—গীতার উপদেশ এই। কর্ম্মযোগীর মুক্তি-কামনা বহু আয়াসসাধ্য। প্রগাঢ় তপোনুষ্ঠান ও সাধনা না করিলে কর্ম্মসন্ন্যাস সঞ্জাত হয় না। কর্ম্ম কাণ্ডের সহিত জ্ঞান কাণ্ডের এইরূপ সাধ্য-সাধন সম্বন্ধ। এই সাধ্য-সাধন ক্রমে যিনি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানে উঠিতে পারেন, তিনিই মুক্তির অধিকারী মুমুক্ষু। সেই মুমুক্ষু ব্যক্তিরই অপরোক্ষানুভূতি লাভের সম্ভাবনা। কিরূপ জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয়, তাহা শঙ্কর সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। যখন শাস্ত্র বা গুরূপদিষ্ট সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞানে প্রতীত হয়, তখন বাস্তবিক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়। সুতরাং সেই অবস্থায় জীব নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়েন। তাঁহার আত্মপ্রতীতিতে সমগ্র অধ্যাত্ম জগৎ প্রতীয়মান হয়;—ব্রহ্ম, আত্মা, জন্মান্তর জগৎ ও জীব—সকলই স্ব-স্বরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই তৃপ্ত আত্মায় অন্য কিছু জানিবার বাকী থাকে না। তাই গীতা বলিতেছেন :—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥
৭অ-২।

যাহা জানিতে পারিলে তোমার আর অন্য কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না, মদ্বিষয়ক সেই বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে সবিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এই বিজ্ঞান যে আত্মানুভূতি বা প্রত্যক্ষ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যেও প্রমাণ হইতেছে :—

"জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সহরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"
দ্বিতীয় স্কন্ধ, নবম অধ্যায়।

ভগবান বলিতেছেন—বিজ্ঞান বা অনুভব সমন্বিত পরম গুহ্যজ্ঞান এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ভক্তিরহস্য বা সাধন তুমি গ্রহণ কর।

শ্রীধরস্বামী এস্থলেও বিজ্ঞানের অর্থ "অনুভব" এবং জ্ঞানের অর্থ শাস্ত্রজ্ঞান করিয়াছেন। এই অনুভব কি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিজ্ঞান লাভ হইলে কি ফল ফলিবে, ভাগবৎ তাহা বলিতেছেন :—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
অথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥

আমার যে প্রকার স্বরূপ, সত্ত্ব এবং আমার যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সমস্ত তত্ত্ব বিজ্ঞান-লব্ধ হউক।

তৎপরে, যে সমস্ত তত্ত্ব এই বিজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা ভাগবৎ পরশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিজ্ঞান হইতেই পরমজ্ঞান লাভ হয়। পরমজ্ঞান কি, তাহা গীতা বলিতেছেন :—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥
১৩অ-২।

হে ভারত! সমুদায় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার

মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। অন্য জ্ঞান বন্ধকত্ব বা সংসারের হেতু; কেবল এই জ্ঞানই মুক্তি প্রকাশক। এই বিজ্ঞানোৎপন্ন বিবেক বা পরমজ্ঞান অলৌকিক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। গীতা বলিতেছেন :—

"ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥
৯অ-১।২।

এই বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ; সর্ব্ব গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতি পবিত্র,জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষ ফল, ধর্ম্মের অনুগত, অক্ষয় ফলপ্রদ এবং সুখে করণীয়। শ্রীধর।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিজ্ঞানোৎপন্ন পরমজ্ঞান জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষফল। তাহা শ্রীধরের ভাষায় দৃষ্টফল :—

"জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ।"

শ্রুতি বলিতেছেন :—

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমম্পদম্॥"
কঠোপনিষৎ।

বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ, সেই মনুষ্য সংসার পথের পার স্বরূপ বিষ্ণুর (সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের) সেই পরমপদ লাভ করেন।

বিজ্ঞান কি?

"বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং সারথি যস্য।"

কেনোপনিষৎ বলিলেন, ব্রহ্মকে সামান্য জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। তৎপরে বলিতেছেন, তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়? না—

"প্রতিবোধবিদিতং"

প্রতিবোধ কি? শঙ্কর বলেন,যেমন দিন দিন বুঝাইতে হইলে "প্রতিদিন" শব্দের ব্যবহার হয়, তেমনি এখানে "বোধং বোধং" বুঝাইবার জন্য প্রতিবোধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিদিন বলিলে যেমন এক দিনের পর আর একদিন বুঝায়, তেমনি প্রতিবোধ বলিলে এক বোধের পর অন্য বোধ বুঝায়। বোধের পর যে বোধ হয়,তাহাই প্রতিবোধ। বোধের অর্থ বুদ্ধির প্রত্যয় বা জ্ঞান। এই ঈশ্বরবুদ্ধিবিষয়ক বোধের উৎপত্তির পর কোন্ বোধের উৎপত্তি? তৎপরে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। অন্তরাত্মা সেই বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষীভূত হন। সর্ব্বপ্রত্যয় বা সর্ব্বজ্ঞানের জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে প্রত্যগাত্মা (প্রত্যক্ষীভূত আত্মা) বিদিত হয়েন। সেই বিজ্ঞানায়ত অন্তরাত্মাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। তবেই জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র দ্বার—বিজ্ঞান। কাহারা ব্রহ্মকে দেখেন? শ্রুতি বলিতেছেনঃ—

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"
কঠ।

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্বাভিলাষী হইয়া প্রত্যগাত্মাকে (প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে) দেখিয়া থাকেন।

হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী কেমন পরিপাটী দেখুন। শিষ্য গুরুমুখে বৈদিক অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেন। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের Verification হয়। কিসে হয়? —বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানোৎপন্ন বিবেক দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানের সমাধান ও পরিপাক হয়; নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা সকাম ও নিষ্কামধর্ম্ম, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম প্রভৃতি সমস্ত গীতোপদিষ্ট বিষয় প্রমাণীকৃত হয়। এমত পরিশুদ্ধ Verification আর

কি আছে? যে জ্ঞানের মূল অপরের প্রত্যক্ষ, তাহা নিজ প্রত্যক্ষে প্রমাণীকৃত। এরূপ অনুমান প্রণালীকে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিতেই হইবে। সকল অনুমানই প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানোৎপন্ন। যাহা পরকীয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানোৎপন্ন আনুমাণিক প্রত্যয়, তাহা যদি নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত হয়, তবে সে অনুমানের যাথার্থ্যে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এইরূপ অনুমান এই জন্য নির্দ্দোষ এবং বিশুদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিক বৈদিক জ্ঞান সমস্ত বহুকাল হইতে পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত হইতেছে। গীতোক্ত অলৌকিক বিষয়ের সত্যতা এই প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে। এই বিজ্ঞান বা অনুভবলব্ধ জ্ঞান চিরকালই এক রহিয়াছে।

অপরদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে যে তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) পরিদৃষ্ট হয়,তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব হওয়াতে সে সমস্ত তত্ত্ববিদ্যা অসম্পূর্ণ এবং অপ্রামাণ্য। কেবল হিন্দুতত্ত্ববিদ্যা বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সম্পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমাণীকৃত (Verified) হয়। সুতরাং বহির্বিষয়ক পদার্থবিদ্যায় যে Verification আছে,তাহা অন্তর্বিষয়ক হিন্দু পরমার্থবিদ্যায় নিবিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রমাজ্ঞানে লইয়া যায়।

আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, পরলোকের সত্তা, জন্মান্তরে আত্মার বিভিন্ন প্রকার গতি প্রভৃতি যে সমস্ত অলৌকিক এবং অদৃষ্টার্থক জ্ঞান, শাস্ত্র এবং গুরূপদেশ হইতে হিন্দু লাভ করেন, তাহা ঋষিবাক্যরূপে পরতঃ প্রমাণেই তিনি প্রথমে প্রত্যয় করিয়া থাকেন। আপ্তবাক্য বলিয়া সে সমস্ত কথা সত্য। বাইবেলোক্ত অলৌকিক এবং পারলৌকিক জ্ঞান সমূহও ঈশা-প্রোক্ত ভগবদ্বাক্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই আপ্তবাক্য কি সমান? এই দুই আপ্তবাক্যের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দুর মুক্তি স্বতন্ত্র। হিন্দুধর্ম্মোক্ত আত্মার পারলৌকিক গতি সমস্তের সহিত বাইবেলোক্ত আত্মগতির ঐক্য নাই। হিন্দুধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান এবং সৃষ্টাদিও স্বতন্ত্র। তাই যদি হয়, তবে ঐ দুই আপ্তবাক্যের ঐক্য কই? যদি ঐক্য না থাকে, তবে উভয়ই ভগবদ্বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কি? কখনই না। তবে কোন্ ধর্ম্ম প্রকৃত ভগবদ্বাক্য? এ প্রশ্নের মীমাংসা কি?

খ্রীষ্টান বলিতেছেন, সামান্য জ্ঞানের অনুমান দ্বারা খ্রীষ্টীয় আপ্তবাক্যের সম্ভাবনা ও সত্যতার প্রমাণ হইতেছে। হিন্দুও বলিতেছেন, সেই অনুমান দ্বারা কি হিন্দুধর্ম্মেরও যুক্তি প্রতিপন্ন হইতেছে না? সামান্য জ্ঞানের অনুমান দ্বারা যখন উভয়ই প্রতিপন্ন, তখন ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল না; যেখানকার কথা সেইখানেই রহিয়া গেল। কারণ, সম্ভবযুক্তি দ্বারা উভয়েরই সমান বলোপচয় হয়। এক সময়ে হিউম প্রভৃতি সংশয়ী ব্যক্তিগণ যখন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রত্যয় সমস্তকে আলোড়িত করিয়াছিলেন,Butler প্রভৃতি বিশ্বাসী ভক্তগণ Analogyর সম্ভবযুক্তি দ্বারা সেই সমস্ত প্রত্যয়কে সাধারণ লোকমণ্ডলীর মনে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস হিন্দুধর্ম্মজগতে তদ্রূপ ধর্ম্মান্দোলনের কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। তবেই ত দাঁড়াইতেছে, সম্ভবযুক্তি উভয় ধর্ম্মকেই সমান প্রতিপন্ন করে। সুতরাং সম্ভবযুক্তি দ্বারা আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অন্য কোন প্রমাণ-পথ আছে কি না?

হিন্দু বলেন, খ্রীষ্টান, তোমার সম্ভবযুক্তি সম্ভাবনা মাত্রই থাকিয়া যায়, কিন্তু আমার সম্ভবযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমার সম্ভবযুক্তির অনুমান বিজ্ঞানদ্বারা প্রমাণীকৃত হয়। সুতরাং আমার সম্ভবযুক্তি আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্থাপিত। তুমি আমার বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ দর্শনকে অমানুষ বলিতে পার না, যেহেতু তাহা মনুষ্যেরই সাধ্য এবং ইহ লোকেই শত শত মনুষ্য তাহা সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই পরীক্ষাপ্রণালীক্রমে যখন হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহাই প্রকৃত ভগবদ্বাক্য। খ্রীষ্টান, তোমার আপ্তবাক্য এরূপ প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে, এজন্য অপ্রামাণ্য ও অগ্রাহ্য। তাহা আপ্তবাক্যের ভাণ মাত্র। *

যাহা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত হইল, হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল আপ্তবাক্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে।

তবেই আমরা গীতায় যে সমুদায় প্রামাণ্যের পরিচয় দিলাম, তাহার উপসংহার করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ—

স্থূল অবতারবাদীর নিকট গীতা শ্রীকৃষ্ণোক্তিরূপে স্বাভাবিক আপ্তবাক্য। সূক্ষ্মদর্শীর নিকট গীতা আত্মানুভূত ভগদ্বাক্য। এজন্য তাহা সিদ্ধ আপ্তবাক্য। গীতা যে শুধু ভগবদ্বাক্য, এমত নহে, তাহা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য।

র্থক ভগবদ্বাক্য রূপে গীতা বেদবৎ প্রামাণ্য। এজন্য মহর্ষি ব্যাস ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়-শেষে তাহাকে উপনিষদ্‌রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আমরা দেখিতে পাই যে, গীতোক্ত উপদেশ সমুদায় "বিজ্ঞানে" প্রমাণীকৃত।

তুমি যদি স্থূলদর্শী হও, গীতা বলিতেছেন, তবে তুমি আমাকে মহর্ষি-প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণোক্তি বলিয়া গ্রহণ কর। বল—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥"

গীতাবাক্যই সর্ব্বদা গান করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু তাহা পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।

আর যদি তুমি সে প্রমাণ লইতে কুণ্ঠিত হও, তবে তুমি আমার উপদেশ সকল লইয়া আত্মজীবনে ব্রহ্মোপাসনা-ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, সেই সকল উপদেশ স্বতঃই সত্যরূপে প্রতীত হইবে। সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ এক প্রকাণ্ড উপাসনা পদ্ধতি। অতএব, কি স্বতঃ কি পরতঃ, উভয়বিধ প্রমাণে আমি দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি। বৈজ্ঞানিক অনুভূতিতে আমি আপনাকে আপনি প্রতিপন্ন করিতেছি। আমি স্বয়ং-সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা।

গীতা আপনাকে আপনি প্রতিপন্ন করিয়া সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে। এরূপ প্রমাণ-পথ আর কোন ধর্ম্মে নাই। হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ অলঙ্ঘ্য প্রমাণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইয়া চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* আজি কালি ইউরোপীয় উদার সমালোচকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সমুত্থিত। দত্ত মহাশয় তাঁহার সুন্দর বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন—Vide "Buddhism and Christianity" in Ancient India Vol. II.

দার্শনিকজ্ঞান ও ব্রহ্ম। (৫)

"প্রতিবোধ বিদিতং মত মমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং।
ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"
(কেণোপনিষৎ, ১২—১৩।)

"ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা যায়; এরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্ম-স্বরূপজ্ঞানে শক্তিলাভ হয় এবং আত্মবিষয়কজ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়। যদি মনুষ্য ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পারে, তবেই জন্ম সফল হয়, ইহলোকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ অর্থাৎ পুনঃ২ জন্মজরামৃত্যু ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞানিগণ সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মা উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হয়েন।"
(সীতানাথ দত্তকৃত অনুবাদ।)

এই জন্মজরা মরণশীল দারুণ সংসারচক্রে নিষ্পিষ্ট জীবরাশির একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবলম্বন। ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যকে ঘোরান্ধতম হইতে উদ্ধার করিয়া এমন একদেশে উপ-নীত করে, যেখানে অবিরত সুস্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি ক্ষরিত হইয়া মন-প্রাণে এক অপূর্ব্ব ও অননুভূত অমৃতধারার অভিষেক করাইয়া দেয়। কোথায় সেখানে জননীর আর্ত্তনাদ, কোথায় বা পতিবিয়োগবিধুরা সাধ্বীর অশ্রুজল? কোথায় বা এই নিদারুণ মায়া-মরিচীকার অনন্তবিস্তৃত পিপাসা? আজ্ যে দুঃখে তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল-পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া অসংখ্য বৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণা উৎপাদিত করিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে সেই যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব স্বসংবেদ্য পীযূষের উৎস চির-প্রবাহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য-জীবনের ইহাই বড় স্পর্দ্ধার কথা;—ইহাই বড় গৌরবের সামগ্রী। সাধনা করিলে,—হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে,—এই তৃণাদপি তৃণ ক্ষুদ্র মানব,—এই যন্ত্রণার লীলানিকেতন "মাটীর মানুষ,"—সেই অনন্ত পরব্রহ্মের আনন্দলাভ করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারে!! এই জন্যই ত দুঃখ-ক্লেশের আলয় হইলেও, মনুষ্য-জীবন একান্ত প্রার্থনীয়! এই জন্যই ত কবি গাহিয়াছেন:—

"What a piece of work is man! How noble is reason! How infinite in faculties! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!"

যে বস্তু ধ্যেয়, যে বস্তু তোমার প্রেমের সামগ্রী হইবে, তাহাকে বিচার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, একথা আমরা প্রথম সংখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পরীক্ষা বা বিচার-ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হই-লেই যথেষ্ট হইবে না। যেমন পদার্থজ্ঞান প্রয়োজনীয়, তেম্‌নি আর একটী বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তুমি বৈজ্ঞানিক, তোমার জলের জ্ঞান আছে; তুমি পরীক্ষাপদ্ধতি দ্বারা স্থির করিয়া লইয়াছ যে, জল কি কি উপাদানে গঠিত। এবং সেই উপাদান গুলিরই বা কি কি গুণ ও ধর্ম্ম। কিন্তু তোমার পিপাসায় যখন প্রাণ যাইতেছে, তখন এই জলজ্ঞান হওয়া-তেই যে পিপাসা নিবৃত্তি হইবে, তাহা মনে করিও না। শুষ্ক Oxygen এবং Hydrogen তোমার ওষ্ঠাগত তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইলে, তোমাকে ঐ জল আহরণ-

করিতে হইবে ;—ঐ জল পেট পূরিয়া পান করিতে হইবে। তাই বলি, কেবল পদার্থ-জ্ঞান লাভ করিলেই মানব মনের তৃপ্তি হয় না। কি কি উপাদানে অগ্নি গঠিত, কেবল সেই জ্ঞানেই তোমার অন্ন পাক করিয়া দিবে না। অতএব, ব্রহ্মকে বিচার করিয়া দেখার পর, তাঁহাতে ভক্তি করিতে হয়,—তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত-পথে সেই পরম পদার্থের স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া,তাঁহাকে নিজের জিনিস করিয়া লইবার জন্য তাঁহাতে প্রেম জন্মান আবশ্যক। ভক্তিপ্রেম না থাকিলে, উপাসনা না করিলে,শুষ্ক দার্শনিক-বিচারে কি হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও আমরা বলিতেছি ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপরে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়েই,মানবের হৃদয়-ভূমিতে প্রেম ও পরমানন্দের প্রসব করাইতে পারে ;—অন্যথা নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা সকলে,আমরা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় মনস্বী দার্শনিক পণ্ডিতের বিচার ও সিদ্ধান্ত-প্রণালী দেখিয়া আসিয়াছি, আজ্ ব্রহ্মভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ দেখিতে হইতেছে, উপাসনার আবশ্যকতা কি? কি উদ্দেশ্যে মানব উপাসনা করে? এ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। যিনি যাহাই বলুন না কেন, এস্থলে আমরা আমাদের নিজেরই মত বলিব। আমাদের বিশ্বাস এই যে, উপাসনার দ্বিবিধ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রথম উদ্দেশ্য, মানব মনের কামনার তৃপ্তিসাধন ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মনোবৃত্তির কর্ষণ ও ক্রমোন্নতি। মনুষ্য দুর্ব্বল, মনুষ্য আশার দাস। এই সংসারের অনন্ত প্রকার আবর্ত্তনে পড়িয়া,মানুষ স্বীয় অভীষ্টের প্রার্থনা করিয়া থাকে ;—এ প্রার্থনা স্বাভাবিক, আমাদের বিশ্বাস,এ প্রার্থনা সঙ্গত ;—এরূপ প্রার্থনায় মানুষের বাস্তবিক অধিকার আছে। অনন্ত সংসার-কাননে চারিদিকে দারুণ দাবানল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—একটু অগ্রসর হইলেই তোমায় তাহাতে পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে,—এসময়ে এমন মানুষ কয়জন আছে,যে তাহার অভীষ্টদেবের নিকটে জাবনের প্রার্থনা না করে? যন্ত্রণা-উদ্ধারের প্রার্থনা না করে? যে না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, আমরা বলি সে মানুষ নহে।—সে মানুষ হইতে আরও উন্নত। এরূপ উন্নত-স্তরে বর্ত্তমান মানব যেন কামনা-সিদ্ধির প্রার্থনা না করে ; তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই ;—তাহার না করাই উচিত,মনে করি। কিন্তু যে "মানুষ", সে ত প্রার্থী হইবেই। সেই দয়াময় প্রাণের দেবতাও তাহা পূরণ না করিয়া থাকিতে পারেন কি? ভক্তজীবনের কথা আমরা জানিনা,কিন্তু একথা বোধহয় ঠিক্ যে,বিধাতা মানবের ঐকান্তিক ও শ্রদ্ধাসহকারে কৃত-কামনা পরিপূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। পাপের অনুতাপের যে করুণ-রোদন, বিধাতা কি তাহাতে কর্ণপাত করেন না? তবে একটী কথা এই যে, তোমার যে সমুদয় কামনাই পূরণ হইবে, তাহা নহে। হয় তুমি ভ্রান্ত হইয়া অন্যায় বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে পার ; অথবা এরূপ হইতে পারে যে, তুমি যাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছ, ভগবানের চক্ষে,তাহা পূর্ণ হইলে হয় ত ভবিষ্যতে তোমার ঘোরতর অমঙ্গল হইবে। এই দুই শ্রেণীর প্রার্থনা, আমাদের বোধ হয়, পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন :—

"তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্তচক্র দয়াদাক্ষিণ্য শূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্রম্য রেখায় অহরহ চলিতেছে; তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সে-ই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া সংসার-চক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?

—আমরা এ উক্তির প্রতি অক্ষর সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। চক্র, টানের মত ঠান পাইলে, কখন কখন আবর্ত্তন-পথ ছাড়িয়াও দিয়া থাকে। ভক্তজীবনের অনেক ঘটনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানব-মনের অন্তস্তলদর্শী মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন:—

"Whereto serves mercy,
But to confront the visage of offence?
And what's in prayer but this twofold force,
To be forestalled ere we come to all,
Or pardoned being down."

আমরা বলিয়াছি, উপাসনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মানব-মনের কর্ষণ ও উন্নতি। এই উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত জ্ঞানীর অবলম্বের। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী, প্রথম উদ্দেশ্য হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। নিষ্কাম হইয়া,—ভগবদিচ্ছা সফল হউক বলিয়া,—উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। কামনা ধ্বংস হইলে, মানব-মন ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠে। বিধাতার অনন্তত্ব এবং তাঁহার অতি বিচিত্র কার্য্যকলাপাদির বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে মানবমন ক্রমশঃ অনন্তের পথে উন্নত হইয়া উঠে। এইরূপ সাধনা উৎকৃষ্ট ও চরম সাধনা।

এখন ব্রহ্মোপাসনা কি করিয়া করিতে হয়, তাহাই প্রদর্শন করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এসব সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে;—এসমস্ত বিষয়ে সকলের মত সমান হওয়া সম্ভব নহে। আমরা আমাদের নিজের মতই বিবৃত করিব। আমাদের বোধ হয়, মোটামোটী উপাসনার প্রণালী চতুর্ব্বিধ। ১। ইন্দ্রিয়-সংযম। ২। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব। ৩। শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও সৎসঙ্গ। ৪। হৃদয়-ক্ষেত্র পরিষ্কার করা। এই চতুর্ব্বিধ প্রণালীরই আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-সংযম। বহির্মুখীন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। শ্রুতিও তাই বলেন, যথাঃ—"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু, স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ, আবৃত্ত-চক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্" ॥ (কঠোপনিষৎ, ৪র্থবল্লী, ১ শ্লো)—অর্থাৎ "স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দ্বার সকলকে ববির্মুখীন করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেইজন্যই মনুষ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, অন্তরাত্মাকে দেখেনা। জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন" (সীতানাথ দত্তকৃত অনুবাদ) ॥ ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিয়া, স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করতঃ সেই এক আত্মাভিমুখে, ব্রহ্মাভিমুখে—ছাড়িয়া দিতে হয়। মনে কর, তোমার সম্মুখে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ জলাশয় রহিয়াছে। তোমাকে একটী ক্ষেত্রে ঐ জলাশয় সকলের জলরাশি বেগে প্রবাহিত করাইতে হইবে। তোমার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, একটী ছোট প্রণালী খনন করিয়া, সেই পৃথক্ পৃথক্ চারিটী জলাশয়ের জল সেই একটী প্রণালীতে ছাড়িয়া দেওয়া। এইরূপ করিলেই, ঐ জলরাশি ভীমবেগে ঐ প্রণালীর দ্বারদিয়া ক্ষেত্রে আসিয়া একত্রে পড়িবে। সে বেগ কম নহে। এইরূপ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় গুলিকেও তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত

করিয়া, মন নামক সূক্ষ্ম-প্রণালীতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তখন ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ মন-প্রণালী দিয়া দারুণ-বেগে আত্মক্ষেত্রে—ব্রহ্ম ক্ষেত্রে যাইয়া ঘনীভূত হইবে। এইরূপে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ব্রহ্মাভিমুখী হইলে তখন আর চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযমের ইহা ভিন্ন উৎকৃষ্টতর প্রণালী আমরা অবগত নাহি। গীতাও এইরূপ বলেন—"যতো যতো নিশ্চরতিমনশ্চঞ্চল স্থিরং। তত স্ততো নিযম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ" (৬ষ্ঠ অধ্যায়)॥ দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্ত্বার অনুভব। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থে, সমস্ত ঘটনায়, ভগবান্‌ মঙ্গলহস্ত প্রসারিত দেখিতে হইবে। ঐ যে দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ঘনঘটা আকাশের মুখ আচ্ছাদিত করিল, ঐ যে প্রবলতর করকাঘতে মেদিনী টলিল,—উহাতেও ব্রহ্ম সত্ত্বার অনুভব করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে যে, উহাও ব্রহ্ম-শক্তিরই আংশিক বিজৃম্ভনমাত্র। আবার ঐ যে অস্তগমনোন্মুখ রবির 'পল্লবরাগতাম্র' কিরণ-জালে দিগ্বলয় বিভাসিত হইয়া তোমার মনে পরমা শান্তির লহরী উত্থাপিত করিল,—জানিবে উহাও সেই ব্রহ্মশক্তির লীলামাত্র।

সুখের স্রোতে যখন গা ঢালিয়া দিয়াছ, তখনও যেমন ব্রহ্মানুভব করিতে হইবে, আবার যখন ভীষণ বিপদ ও কষ্ট ভীম-ভ্রুকুটী করিতে থাকে, তখনও সেই সত্ত্বাই দেখিতে হইবে। ফলতঃ সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে, প্রতি কার্য্যের মূলে, প্রতি ঘটনার অন্তরালে সেই মহীয়সী ঐশীশক্তির অনুভব করা বিধেয়। আমরা এ সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত গল্প বলিব, বোধ হয় এ স্থলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। একদা একজন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী পূজার ছুটীতে কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সর্ব্বত্র রেল হয় নাই; তাঁহাকে নৌকাপথে পদ্মানদী পার হইয়া আসিতে হইয়াছিল। যখন তাঁহারা পদ্মার ঠিক্ মধ্যস্থলে আসিয়াছেন,—এমন সময়ে মসীশ্যাম মেঘমালা নীলাকাশের চারিদিকে সজ্জিত হইয়া আসিল। চতুর্দ্দিক ঘোরতর অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিল। ভীম বায়ু ঘোর-গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাদ্রমাসে পদ্মার বিক্রম অনেকে দেখিয়াছেন; এখন আবার বায়ুর সহায়তা পাইয়া অনন্ত জলরাশি এক একবার পর্ব্বতবৎ উচ্চ হইয়া গভীর নিম্নে পড়িতে লাগিল। মাঝিরা প্রমাদ গণিল; হা'ল ছাড়িয়া দিয়া, তাহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিল। কিন্তু এই ঘোর বিপদে, কর্ম্মচারী তখনও নৌকামধ্যস্থ শয্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় শুইয়াছিলেন। নিকটে স্ত্রী বসিয়াছিল; কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। স্বামীকে তখনও শয়ান দেখিয়া স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইল;—তাঁহাকে চীৎকার করিয়া ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারী আর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বেগে শয্যা হইতে উঠিয়া, নিকটে একখানা তরবারি ছিল, সেই তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া স্ত্রীর প্রতি আক্রমণার্থ ধাবিত হইলেন। স্ত্রীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, নিষ্কাশিত অসি ঊর্দ্ধে তুলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, তোমার ভয় হইতেছে?" স্ত্রী স্বামীর ঐ ভাব দর্শনে ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকমাত্র। ধীরে, মস্তক অবনত করিয়া, স্ত্রী উত্তর করিল—"না, আমার ভয়

হইতেছে না"। স্বামী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, ভয় হইতেছে না কেন"? স্ত্রী বলিলেন,—"ভয় পাইব কেন? আমিত জানি ঐ অস্ত্র কাহার হস্তে রহিয়াছে? আমিত জানি, ঐ অসি আমার স্বামীর হস্তে রহিয়াছে? • এবং সেই স্বামী আমাকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহা হইতে আমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। সহস্র অসি তুলিয়া তুমি ধাবিত হও না কেন, আমি কিছুমাত্র ভয় পাইব না"। স্বামী স্ত্রীর এই উত্তর শুনিয়া, হাসিয়া অসি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন—"প্রিয়তমে! তবে আমায় জাগাইতেছিলে কেন? তবে আমায় ভর্ৎসনা করিতেছিলে কেন? আমিত জানি, এই নদীর জল, এই বায়ু, এই মেঘ, এই গর্জ্জন—এ সমস্তই সেই আমার প্রাণারাম ভগবানের হস্তেই রহিয়াছে। এবং সেই ভগবান্ আমায় এত ভালবাসেন যে, তাঁহার দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও; এ ঝড় বৃষ্টিতে আমাদের কিছুই হইবে না"॥ পাঠক! দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঈশ্বর-নির্ভরতা!!! বিপদে, সম্পদে সর্ব্বদাই, সর্ব্বত্র এইরূপে বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিতে হয়॥ তৃতীয়তঃ শ্রবণ, মনন প্রভৃতি। যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয়, যেখানে তাঁহার মহিমা-গীত হয়, সেই খানেই তাহা শুনিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় রত থাকিতে হয়। সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রবন মননে রত থাকিতে হয়। চতুর্থতঃ হৃদয় পরিষ্কার করা। যাহার অনুশীলন করিলে হৃদয় পরিষ্কৃত হয়, পাপ-চিন্তা, অনিষ্ট-ভাবনা প্রভৃতি দূরে যাইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়,—চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তাহারই বিষয়ে যত্নশীল হওয়া বিধেয়। মমল-দর্পনের প্রতিবিম্ব-গ্রাহিকা শক্তি থাকে না। চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হইলে, তবে তাহাতে ব্রহ্ম-ছায়া পতিত হইতে পারে। মূলতঃ,এই চতুর্ব্বিধ উপাসনার প্রণালীই আমাদের নিকটে উত্তম বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রণালীতে উপাসনা করিলে, সাধক ক্রমশঃ উন্নত ও ব্রহ্ম-নির্ব্বান প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টচার্য্য।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়নগর। (৪)

কদমরসুলের দর্গা—দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্ব-প্রান্তে পূর্ব্বদ্বারের নিকটে এই দর্গা অবস্থিত। ইহার মধ্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের পদচিহ্ন স্থাপিত আছে এজন্য ইহাকে কদমরসুল বা মহম্মদের পদচিহ্নের মন্দির বলে। কথিত আছে হোসেনসাহর পুত্র নছরত সাহ মদিনা হইতে মহম্মদের পদচিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া আনয়নপূর্ব্বক এই স্থানে স্থাপন করেন। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং তৎপরে মিরজাফর ইহা পুনঃ স্থাপন করেন। এই মন্দির অক্ষুন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহার একটীমাত্র গুম্বজ ও চারিদিকে চারিটী ক্ষুদ্র চূড়া আছে, ইহার রক্ষার জন্য সম্পত্তি আছে। ইহার বহির্ভাগে সংলগ্ন প্রস্তর-ফলকে আরবী-ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে,

"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়াছেন যে,যিনি উত্তম কার্য্য করিবেন, তিনি দশগুণ পুরস্কৃত হইবেন। মহম্মদের এই পদচিহ্ন হোসেনসাহর পুত্র নছরতসাহ কর্ত্তৃক৯৩৭ হিজরীতে (১৫৩০-৩১) খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন্ এবং তাঁহার রাজপদ ও অবস্থার উন্নতি সাধন করুন।"

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে উত্তরদ্বারে একটী প্রস্তর ফলক সংলগ্ন আছে। তাহাতে লিখিত আছে:—

"মহম্মদ বলেন যে যিনি ঈশ্বরের নামে মন্দির প্রস্তুত করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। এই মসজিদ্ বর্ব্বকসাহর পুত্র ইউসফ সাহর রাজত্বকালে মীরসাদ খাঁর দ্বারা নির্ম্মিত হয়; ৮৮৫ হিজরী ১০ই রমজান"।

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, এই প্রস্তর-খণ্ড স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়াছে। কদম-রসুল দর্গার মধ্যে একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পিঞ্জর প্রদর্শিত হয়,তাহাতে সনাতন গোস্বামী কারা-রুদ্ধ ছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

কদমরসুলের পশ্চাতে একটী চত্বর আছে,তাহার ছাদ ও প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে। উহাতে কতক গুলি সুন্দর সুন্দর সমাধি দৃষ্ট হয়, বোধ হয় কোন কোন রাজা ও আমীরের সমাধি হইবে। ইহার পশ্চিমে একটী সরোবর আছে তাহাকে জালালীতালাব কহে। বোধ হয়, সুলতান জালালউদ্দীনের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

ফতেখাঁর দর্গা—কদমরসুলের দর্গার বহির্দ্দেশে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বাঙ্গলা ঘরে ফতেখাঁ নামক একজন পীরের সমাধি আছে, ইহাকে ফতেখাঁর দর্গা বলে।

সাহাইল্লা মজ্‌দুলের দর্গা—কদমরসুলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে এই দর্গা অবস্থিত। ইহাতে একখণ্ড প্রস্তরে একটী বড় পদ্য লিখিত আছে। পূর্ব্বে দর্গার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল, এখন তাহা নাই।

চিকামসজিদ—কদমরসুলের দক্ষিণে অনতিদূরে বড় গুম্বজী একটী মসজিদ আছে। তাহা এক্ষনে চামচিকার বাসস্থান বলিয়া লোকে চিকামসজিদ বলে। কিন্তু গড়ের লোকের প্রমুখাৎ শুনা যায় যে,পূর্ব্ব হইতেই ইহার নাম চিকামসজিদ। কেহ কেহ ইহাকে চোরখানাও বলে। কারারুদ্ধ আমী-রেরা এই স্থানে উপাসনা করিতেন। ইহার উত্তরদিকে কতকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বদ্বার বা লুকাচুরীদ্বার—দুর্গও রাজ-বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই দ্বার অবস্থিত। ইহাকে সাধারণতঃ লোকে লুকাচুরী-দ্বার বলে। ইহা দ্বিতল ও ইষ্টক নির্ম্মিত। গৌড়ের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে যে, সাহ-সুজার দ্বারা এই দ্বার নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই দ্বারের দ্বিতল গৃহে নহবতখানা ছিল। ইহার দক্ষিণদিকে অনতিদূরে আর একটী দ্বার আছে। ইহা দুর্গ প্রবেশের গুপ্তদ্বার বলিয়া কথিত হয়। এই গুপ্তদ্বারের ভগ্নাবশেষ সামান্যরূপে এখ-নও বর্ত্তমান আছে।

তাঁতীপাড়া মসজিদ—শিবগঞ্জ রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এই মসজিদ অবস্থিত; ১৮৮৫ খৃষ্টা-ব্দের জুলাই মাসে ভূমিকম্পে ইহা পড়িয়া-গিয়াছে। কেবল রাশীকৃত ইষ্টক অতীত কালের সাক্ষী-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এই মসজিদ ৮৮০ হিজরীতে সুলতান বর্ব্বকসাহর পুত্র ইউসফ সাহর দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

লটনম মসজিদ—তাঁতী পাড়া মসজিদের অনতিদূরে শিবগঞ্জ রাস্তার বামপার্শ্বে বাঁশ-বনের মধ্যে এই মসজিদ অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে,কোন নর্ত্তকী দ্বারা এই মস-জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার প্রকৃত

নাম নটীমস্‌জিদ। কিন্তু বোধ হয় লটন নামক কোন স্ত্রীলোক দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মেজর ফ্রাঙ্কলিন ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই মস্‌জিদের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন ঃ—

"ইহা দৈর্ঘে ও প্রস্থে ৬০ ফুট এবং মেজে হইতে গুম্বজের শিখরদেশ পর্য্যন্ত ৭০ ফুট উচ্চ। সম্মুখভাগে ৫০ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ ও ৩৫ ফুট উচ্চ, তিনটী গুম্বজ যুক্ত একটী বারেন্দা ছিল (এক্ষণে এই বারেন্দার কোন চিহ্ন নাই)। মস্‌জিদের মধ্যভাগ একটা বর্গক্ষেত্র, প্রত্যেকদিক ৩৬ ফুট, উপরি ভাগে একটী প্রকাণ্ড গুম্বজ, তাহার নিম্নভাগের ব্যাস ৬০ফুট। ইহার সমস্ত নানা বর্ণের রঞ্জিত ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত"।

ইহার উপরে কোন প্রস্তর-ফলক নাই। বোধহয় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ ইউসফসাহর সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

ছোট সাগরদীঘী—লটনমস্‌জিদের উত্তর পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে ছোট সাগরদীঘী নামে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা দৈর্ঘে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ৪০০ গজ। ইহার জল অত্যন্ত নির্ম্মল। ইহার সহিত সংযুক্ত পয়-প্রণালী দেখিয়া অনুমান হয় যে, গৌড়ের অনেক স্থানে ইহার জলনীত হইত এবং পানীয়স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

ধনপৎ সদাগরেরবাড়ী—ছোট সাগর দীঘীর উত্তরদিকে অনতিদূরে হাঁসপুকুর নামক পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে একটী চতুষ্কোনাকৃতি বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার ৫০ টী প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ ইহাকে ধনপৎ সদাগরের বাড়ী ও কেহ কেহ চাঁদ সদাগরের বাড়ী কহে। বোধ হয়, ইহারা গৌড়ের প্রধান সদাগরছিলেন।

কোতোয়ালীদ্বার—নগরের দক্ষিণ সীমায় মৃত্তিকাগড়ের মধ্যে এই উচ্চদ্বার অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে সেলামী দ্বারও কহে। (১) ইহা ৫১ ফুট উচ্চ, দুই পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত উচ্চগড়। ইহার আকৃতি ও উচ্চতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক্ষণে ইহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ইহার উপরে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই দ্বার অসম্পূর্ণই ছিল। এই দ্বারের উত্তরদিকে অনতিদূরে শিবগঞ্জ রাস্তার উপর একটী সেতু আছে, তাহার পার্শ্বে এক খণ্ড প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে যে, সুলতান মহম্মদসাহ ৮৭২ হিজরীতে এই দ্বার নির্ম্মান করেন। ইহার অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গুনমন্ত মস্‌জিদ—মহদীপুরের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-সীমার প্রাচীরের নিকট জঙ্গলের মধ্যে এই প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৭২ হাত দীর্ঘ, ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩২ হাত প্রশস্ত। ইহাতে ২৭ টী গুম্বজ আছে, ৯টী পড়িয়া গিয়াছে। কথিত আছে যে, ইহার ভিতরে একটী গর্ত্তের মধ্যে অনেক টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

ফিরোজপুর দ্বার—কোতোয়ালী দ্বারের পরে, গড়ের বাহিরে প্রায় ৭ মাইল বিস্তীর্ণ একটী উপনগর বা সহরতলীছিল। কোতোয়ালী দ্বারের অনতিদূরে রাস্তার বামপর্শ্বে বাল দীঘী নামে একটী দীঘী আছে। ইহা ৫০০ গজ দীর্ঘ ও ২০০ গজ প্রশস্ত। ইহার দুই মাইল পরে ফিরোজপুর দ্বার। এই দ্বারের পরেই সাহসুজার গুরু সাহ নিয়ামত-উল্লা নামক পীরের বাসস্থান। ইহার বংশাবলী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা একটী বৃহৎ

(১) কানিংহাম সাহেব বলেন যে, এখানে অপরাধী দিগের প্রাণদণ্ড হইত, এজন্য ইহার প্রকৃত নাম কাটাল দরজা।

সরোবরের তীরে অবস্থিত। তথায় সাহ নিয়ামত-উল্লার একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদও আছে। ইহার রক্ষার জন্য প্রায় ৬০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ছিল।

দারসবাড়ী—মহদীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যে বালদীঘীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে বড় রাস্তার দক্ষিণদিকে একটী স্থান আছে, উহা সাধারণতঃ দারসবাড়ী (বিদ্যালয়) নামে কথিত হয়, কারণ ইহার নিকটে একটী মাদ্রাসা ছিল। এই স্থানে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মসজিদ্‌ আছে। ইহা ৬৫ হাত দীর্ঘ ও ৩৮ হাত প্রশস্ত। ইহার ৩৮টি গুম্বজ বর্ত্তমান আছে। ইহাতে একখণ্ড প্রস্তর-ফলক ছিল। কয়েকবৎসর হইল উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। বোধ হয় কলিকাতা চিত্রশালিকায় প্রেরিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত ছিল যে, বর্ব্বকসাহর পুত্র ইউসফসাহ ৮৮৪ হিজরীতে উক্ত মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

ছোটসোণা মস্‌জিদ বা খোজাকে মস্‌জিদ—কোতোয়ালী দ্বারের দুই মাইল দক্ষিণে এই মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহা হোসেনসাহর অন্তঃপুরের প্রধান খোজার মসজিদ। এই মস্‌জিদ এখনও প্রায় পূর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, কেবলমাত্র প্রাঙ্গনটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া শিবগঞ্জের রাস্তা গিয়াছে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত। মধ্যভাগ সুন্দর কারুকার্য্য যুক্ত। উত্তর পশ্চিম দিকে একটী উচ্চ সিংহাসন আছে। ইহার ১৫টী গুম্বজ। বহির্ভাগে একখণ্ড প্রস্তর ফলক সংলগ্ন আছে তাহাতে লিখিত আছে যে, হোসেনসাহের রাজত্বকালে ওয়ালী-মহম্মদ দ্বারা এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। তারিখের স্থান টুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

টাঁকশালদীঘী—ছোট সোনামসজিদের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটী দীঘী আছে, তাহাকে টাঁকশাল দীঘী বলে। ইহার নিকট টাঁকশাল ছিল, কিন্তু তাহার কোন ভগ্নাবশেষ নাই।

এবম্বিধ লুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ লইয়াই এক্ষণে সেই প্রাচীন গৌড়নগর বর্ত্তমান। বস্তুতঃ এই সকল ভগ্নাবশেষ ও ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদে আপ্লুত হয়, শোক ও দুঃখে অন্তঃকরণ অভিভূত হয়। কালের কি বিচিত্র গতি! সংসারের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! মানব কীর্ত্তির কি ভীষণ পরিণাম! যে গৌড় নগরে এক সময়ে ১২ লক্ষ লোকের বসতি ছিল, যে স্থানে পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে রাজপথগুলির সমধিক প্রশস্ততা সত্বেও এত জনতা হইত যে, অনেক লোক পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত; সেই গৌড়নগর এক্ষণে জনমানবহীন এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যে স্থান প্রশস্ত রাজপথ ও বিচিত্র সৌধমালায় পরিশোভিত ছিল, সেই স্থান এক্ষণে শস্যক্ষেত্র ও অরণ্যে পরিবৃত হইয়াছে। যে স্থান প্রমোদকানন ও হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের বিলাসভূমি ছিল এবং নৃত্যগীতাদি মহোৎসবে ও নাগরিকদিগের কোলাহলে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইত, সেই স্থান এক্ষণে চিরনিস্তব্ধতা পরিপূর্ণ হইয়া মর্কট ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিহারভূমি হইয়াছে। সরোবরগুলি কুম্ভীরের আলয় ও দেব মন্দিরগুলি চর্ম্মচটিকার আশ্রয় স্থান হইয়াছে। ইহার যে দিকে করা যায়, কেবল ধ্বংস ও বিনাশের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। চিন্তা করিলে কেবল সংসারের অনিত্যতা ও রূপ গোস্বামীর লিখিত সেই চির প্রসিদ্ধ শ্লোকটীই স্মরণ করাইয়া দেয়:—

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥

পাণ্ডুয়ার বিবরণ।

ইংরেজ বাজারের প্রায় ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ সকল অবস্থিত। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই স্থানেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর অবস্থিত ছিল এবং এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই প্রাচীন গৌড়। কালক্রমে গঙ্গা প্রবাহ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীরও স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজতরঙ্গিনীর বর্ণনানুসারে স্পষ্টই বোধ হয় যে, প্রাচীন সময়ে এই নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর দুই একটী মূর্ত্তি ব্যতীত হিন্দু সময়ের কোনই চিহ্ন বা ভগ্নাবশেষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গৃহ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই মুসলমানদিগের সময়ে নির্ম্মিত। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ইলিয়াস সমসুদ্দীনের রাজত্বকালে বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়নগর হইতে পাণ্ডুয়াতে উঠিয়া যায়। এই স্থানে ৫জন রাজা ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তৎপরে গৌড়নগরে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। মুসলমানেরা ইহাকে ফিরোজাবাদ বলিত। এই সময়ে যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহাতে ফিরোজাবাদ নাম অঙ্কিত ছিল। মুসলমানদিগের সময়ে এই নগর বড় বৃহৎ ছিল না। গৌড়ের সমস্ত লোক এখানে আসিয়াছিল তাহাও বোধ হয় না। কেবলমাত্র রাজকর্ম্মচারিগণ ও কতক কতক নাগরিক এখানে আসিয়াছিল।

মুসলমান পাণ্ডুয়া প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত ছিল। প্রায় ৮।১০ হাত হাত প্রশস্ত একটী ইষ্টকমণ্ডিত রাস্তা নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড়ের ন্যায় এখানেও অসংখ্য পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। মহানন্দা হইতে একটী ক্ষুদ্র খাল নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। এই খালের উপরে নগরের মধ্যভাগে তিনটী খিলানযুক্ত একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু ছিল। উক্ত রাস্তার উত্তর প্রান্তে একটী মৃত্তিকা গড়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা গড়দ্বার নামে অভিহিত হয়। দক্ষিণ প্রান্তেও মৃত্তিকাপ্রোথিত ইষ্টকাদি দেখিয়া অনুমান হয় যে, এদিকেও দ্বার ছিল। কিন্তু এই অংশ দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন থাকায় গড়ের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এই নগরের সহরতলী প্রায় বর্ত্তমান মালদহ নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালদহ নগর পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল। এখানে একটী দুর্গ ও মহানন্দার অপর পারে একটী স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার ১০ মাইল উত্তরে রায় খাঁ দীঘী নামক স্থানে একটী দুর্গ ছিল এবং প্রায় ২০ মাইল উত্তরে দিনাজপুরের অন্তর্গত একডালা নামক দুর্গ অবস্থিত ছিল। মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তা পাণ্ডুয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এই নগরের ভগ্নাবশেষের প্রস্তরাদিতে স্থানে স্থানে অদ্যাপি হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। হিন্দুদেবালয়াদি ভগ্ন করিয়াই যে এই এই সকল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া ঘোরতর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে সাঁওতালের বসতি হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা জঙ্গল অনেক কমিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদিগের রাজধানী স্থাপন সময়ে ও নগরের চতুর্দ্দিক অরণ্যাকীর্ণ ছিল। যাতায়তের দুর্গম বলিয়াই এখানে রাজধানী স্থাপিত হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

সাকার ও নিরাকার উপাসনাপ্রতিবাদ। (৬)

নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চাবস্থায় সম্ভব। "সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন।" ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হন।

সাধনের উচ্চাবস্থায় অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন দ্বারা যে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, যখন মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তখন আর সে মানুষ থাকে না; তখন সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। এখন এই দুইটী আপাততঃ বিসদৃশ কথার সামঞ্জস্য কোথায়? ইহাদের সামঞ্জস্য অধ্যাত্মযোগ শব্দের অর্থে। ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে অধ্যাত্মযোগ কি তাহা আগে দেখিতে হইবে। স্পষ্টতার অনুরোধে বিস্তৃতি পাঠকগণ মাপ করিবেন।

"অধ্যাত্মযোগ" কি? উল্লিখিত কঠোপনিষদ্ বাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতসঃ আত্মনি সমাধানম্।" অর্থাৎ রূপ রসাদি বিষয় হইতে চিত্তকে সংযত করিয়া আত্মায় সমাধি করা। শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ কোথায় পাইলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকপোল কল্পিত? না তাহা নহে। সেই কঠোপনিষদেই অন্যত্র আছে—

যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃপরমাঙ্গতিম্।
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং যখন বুদ্ধিও বাহ্য বিষয়ে ব্যাপার শূন্য হয়, সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এইরূপ স্থির অচল ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগ বলা হয়। অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বহির্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেবল এক পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। এই কথা সেই শ্রুতি অন্যত্র আরও স্পষ্টরূপে বলিতেছেন —

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসীপ্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি ॥

ইন্দ্রিয় হইতে রূপরসাদি সূক্ষ্ম, রূপরসাদি হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ সূক্ষ্ম; পুরুষ অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম কিছুই নাই, তিনিই সকলের চরম অবস্থা, তিনি সকলের পরমগতি। তিনি সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন. তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশ্য নহেন। কেবল সূক্ষ্মদর্শি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরূপণক্ষম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। কি প্রণালীতে তাঁহাকে দর্শন করা যায়? তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শক্তিকে মনে সংযত করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, বুদ্ধিকে মহ-

তত্ত্বে সংযত করিবে, মহত্তত্ত্বকে পরমাত্মায় সংযত করিবে। বলা বাহুল্য এই ইন্দ্রিয়াদি সংযমনই অধ্যাত্মযোগ। এই সকল শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য কি একবার দেখা যাউক।

আমি চাহি সর্ব্বোপাধিশূন্য, নামরূপ-বিহীন নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপে মিলিত হইতে। আমি জড়-জগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ জড়-জগৎ তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমি অধ্যাত্মজগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ আমার মন তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া জড়-জগতের চিত্র দ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলে। মোট কথা আমার চিত্তবৃত্তির সাহায্যে আমি যেখানেই তাঁহাকে দেখিতে যাইব, সেখানেই তাঁহার সাকার ভিন্ন নিরাকার স্বরূপ দেখিতে পারিব না। এমন কি, যদিও তিনি আমার হৃদয়কন্দরে বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পারিতেছি না—কেবল আমার এই চিত্তের জন্য। তাঁহার স্বরূপদর্শনে আমার চিত্ত এক প্রধান অন্তরায়। আমার চিত্ত সর্ব্বদাই বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে—আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সর্ব্বদাই রূপ রসাদির সহিত গাঁথা রহিয়াছে, আমি কিছুতেই তাহাদিগকে অন্যদিকে ফিরাইতে পারি না। এক রকম ধরিতে গেলে, সেই রূপ রসাদি লইয়াই চক্ষু কর্ণের অস্তিত্ব। রূপ রসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে তাহাদের মন হইতে পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। আবার যতক্ষণ রূপ রসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার নিরাকার ব্রহ্মদর্শনও হইবে না। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন:—

ইন্দ্রিয়সকলকে মনে লয় কর।

করিলাম ; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মকে জানিবার জন্য আমার ইন্দ্রিয় সংযমই যথেষ্ট হইল না। আমার গন্তব্য পথের এখনও অনেক বাকী। যাহাতে রূপ রসের একটু নাম গন্ধও নাই, আমি চাহি সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল এখন আর বাহিরের দিকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধাবমান হয় না বটে, ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত হওয়াতে বহির্জগতের নব নব ভাব সকল আমার চিত্তপটে এখন আর অঙ্কিত হয় না বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্বসঞ্চিত ভাব সকল আমার স্মৃতিতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এখনও আমি কোন কিছু চিন্তা করিতে বসিলে সেই সকল ভাবের আলোড়ন বিলোড়ন হইতে থাকে। এই সকল ভাব রূপ রসাদির প্রতিকৃতি, ইহারা থাকিতে কখনও আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারিব না, ইহারা তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আমাকে সেই সকল চিত্র মুছিয়া ফেলিতে হইবে। তাই শ্রুতি আদেশ করিতেছেন, মনকেও লয় কর। মনকে লয় করিলাম। আমি এখন ইন্দ্রিয়শক্তিকে সংযত করিলাম, মনকেও সংযত করিলাম, কিন্তু তবুও আমি ব্রহ্ম হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। আমার অহংভাব, আমিত্ব, "আমি" বলিয়া পৃথক অস্তিত্ব* এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই আমিত্ব বজায় থাকিতে, আমি সেই পরব্রহ্মে বিলীন হইতে পারিব না। অনন্ত পরমাত্ম-

* শ্রুতিতে "মনের" পরই "বুদ্ধি"। সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটীর মধ্যে "অভিমান" বা "অহঙ্কার" নামক একটী স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সাগরে আমি একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ; তরঙ্গের এই তরঙ্গত্ব থাকিতে সে সমুদ্রের অনন্তত্বে ডুবিতে পারে না। তরঙ্গকে সাগর হইতে হইলে, তাহার সেই তরঙ্গ নাম ছাড়িতে হইবে; বায়ুবিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন করা আবশ্যক, অভিমান-সংযম করিতে হইবে। আমিত্ব বিনষ্ট হইলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যে সাম্যের ধ্বজা উড়াইয়া একদিন ফরাসী জাতি নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিল, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না। যে সাম্যের তান ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ আজ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, আত্মকলহ ও স্ব স্ব প্রধানতার অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া ভস্মীভূত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না।

যে সাম্যের ফলে—

> বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
> শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
> গীতা।

পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন,—ব্রাহ্মণ শূদ্র, মনুষ্য,পশু,পাপ পুণ্য সমস্তই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় দর্শন করিতে সমর্থ হন—তাহাই প্রকৃত সাম্য। প্রথমোক্ত সাম্য অহঙ্কারমূলক; "তুমি যে মানুষ আমি ও সেই মানুষ —তোমার যে অধিকার,আমারও সেই অধিকার হওয়া উচিত," ইহাই সেই সাম্যের মূল মন্ত্র। শেষোক্ত সাম্য অহঙ্কার-বিনাশের ফল; "তুমি, আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময় —আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই" এইরূপ জ্ঞানমূলক। ইহা "অভিমান" সংযমের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম লাভের জন্য অভিমানকেও লয় করিতে হইবে। কিন্তু জীবের আমিত্ব দূর হইলেই সে ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারে না—সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একত্ব সম্পাদিত হইলেও সৃষ্ট ও স্রষ্টার প্রভেদ থাকিয়া যায়।' এই জন্য যে শক্তি দ্বারা কর্ত্তা আর কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, যে-জ্ঞান থাকাতে জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, সেই "বুদ্ধি"* বা "মহত্ত্বকেও" সংযত করা আবশ্যক। এই "বুদ্ধি" বৃত্তিই (finite-consciousness), অভিমান (Self-consciousness or ego) কে ব্রহ্মের (Divine consciousness) সহিত সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—বুদ্ধিকেও সংযত কর। এই "বুদ্ধির" পর আর একটী স্তর "অব্যক্ত" বা "প্রকৃতি"। প্রকৃতি সংসার বীজ স্বরূপ—যেমন বটকনিকাস্থিত বটবৃক্ষশক্তি। ইহা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কারণের আধারভূত। যতক্ষণ জীব এই প্রকৃতি স্তরে অবস্থান করে, ততক্ষণ সে নির্গুণ, নিস্ক্রিয়, শান্ত শিব অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে কিছু দূরে থাকে। তখনও সে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। যদিও সে সৃষ্ট পদার্থের রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তথাচ এখনও সে সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টা হইতে পারে নাই। প্রকৃতি স্তরে থাকিতে তাহার পুনর্ব্বার সংসারাভিমুখে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। বটবৃক্ষশক্তি হইতে বটবৃক্ষ জন্মিবার আশ্চর্য্য কি? এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—প্রকৃতিকেও লয় কর। এই রূপে আমরা দেখিলাম, ইন্দ্রিয়ের লয়, মনের লয়, অভিমানের লয়, বুদ্ধির লয়, মহত্তত্ত্বের

* জীব বিশেষে যাহা "বুদ্ধি" জগতে তাহা "মহত্তত্ত্ব"।

লয়, প্রকৃতির লয়—এই লয়ের উপর লয়, মহাপ্রলয় সংসাধন করিলে তবে মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে—ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারে। অতএব যখন ব্রহ্মে আধ্যাত্মযোগ দ্বারা সমাধি করিতে পারে, তখন মানুষ, মানুষ থাকে না। তখন মায়ামোহাচ্ছন্ন জীব মায়ামোহ কাটাইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়। তণ্ডুল ও জলপূর্ণ ঘট হইতে তণ্ডুল উঠাইয়া লইলে জল থাকে; জল নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলে ঘট একমাত্র আকাশ দ্বারা পূর্ণ থাকে—সেই ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে কেবল এক উপাধিভেদে পৃথক্—বস্তুতঃ পৃথক নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া দিলে সেই সান্ত আকাশ অনন্ত আকাশে, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশাইয়া যায়। যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে, জীব এই রূপে জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে সমাধি করিতে পারে, তাহাকেই অধ্যাত্মযোগ বলে। ইহাই স্থান বিশেষে জ্ঞানমার্গ, আত্মসমাধি, জ্ঞানযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনের প্রথমপাদ, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শনাদি ও মাণ্ডুক্য উপনিষদাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়েও ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। যাঁহারা এই অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিতে অধিকারী, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান এই কয়টী যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়। * এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধ হইলে, তৎপরে সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমাধি দুই প্রকার, "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" ও "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি"। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার পদার্থের চিন্তা বা অনুভূতি থাকে। এই সমাধি অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান ও বুদ্ধির সংযম হইয়া থাকে। এই সকল সংযমাবস্থা ভেদে, ইহা "সবিতর্ক" "সবিচার," "সানন্দ" ও "অস্মিতামাত্র" এই চারি ভাগে বিভক্ত (বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ—পাতঞ্জলদর্শন ১ম পাদ, ১৭ সূত্র।) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা থাকে না। নিরবলম্ব ভাবে তখন কেবল এক পরমাত্মাই জ্ঞান হইয়া থাকে। "তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বনভাবপ্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ—পাতঞ্জলদর্শনভাষ্য। এই সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। তখনই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, জীবের মুক্তি লাভ হয়।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা অধ্যাত্মযোগের যদি কিছুমাত্র আভাস দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে ইহা যে কতদূর গুরুতর জিনিস, কতদূর কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। নিরাকারবাদীগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে সমাধি

* "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেক খ্যাতেঃ—পাতঞ্জল দর্শন ২, ২৮ সূত্র অর্থাৎ "যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজস্তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ, মৃত্যুভয়, এই পাঁচ রকম অবিদ্যারই ক্ষয় হইয়া যায়। মানবগণ যেমন এক একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে, ততই অবিদ্যাদি মল কাটিয়া যাইতে থাকিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মা আর বুদ্ধ্যাদি জড়পদার্থ এতদুভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়" তখনই চিত্তশুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়। "যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধযোঽষ্টাবঙ্গানি"—পাতঞ্জলদর্শন।

করিতে প্রয়াসী কি না,তাহা তাঁহাদের আভ্যন্তরীন জীবনের কথা। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে,তাঁহাদের প্রকাশ্য উপাসনা, বক্তৃতা,উপদেশ ও প্রবন্ধাদিতে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনা কিম্বা দেখা যায় না। বরং সচরাচর দেখা যায় যে, তাঁহারা যম নিয়ম আসন প্রণায়াম প্রভৃতি সাধনাঙ্গকে কুসংস্কার মূলক বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন। আর যদিও কেহ কেহ "জ্ঞানযোগ," "অধ্যাত্মযোগ' "ব্রহ্মসমাধি" প্রভৃতি বড় বড় কথা অনেক সময়ে ব্যবহার করেন,তথাচ তাঁহারা অর্থ বা গুরুত্ব সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের মতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অধ্যাত্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মে নিরবলম্ব সমাধি করা যায়। সে যাহা হউক, নগেন্দ্রবাবু অধ্যাত্মযোগের গুরুত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ,তিনি লিখিয়াছেন—"নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চ অবস্থায় সম্ভব"। অতএব ইহা যে সকলেই সকল সময় অনুষ্ঠান করিতে পারে, একথা তিনি স্বীকার করেন না। তাহা হইলে ফলে এই দাঁড়াইল যে, নগেন্দ্রবাবুর মতে সাধারণতঃ নিরাকারবাদীগণ "শাস্ত্রপাঠ," "নামজপ," "জগৎ কার্য্যের পর্য্যালোচনা" ও মহৎ জীবনের অনুশীলন প্রভৃতি নিম্ন অঙ্গের সাধন প্রণালীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সাধন প্রণালী "সাবলম্বন" ইহা নগেন্দ্রবাবু স্বীকার করেন। ইহা সাকার জ্ঞানমূলক তাহা পূর্ব্বেই বিশদরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহা প্রচলিত হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার অঙ্গ, প্রতিমা পূজার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান, একথা সকলেই জানেন। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যাহাকে নিরাকার উপাসনা বলেন, তাহা বস্তুতঃ হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত সাকার উপাসনা ভিন্ন কিছুই নহে,একথা প্রমাণিত হইল। আশাকরি, অতঃপর সাকার উপাসক নিরাকারবাদী সাকার-উপাসক হিন্দুকে নিন্দা করিবেন না ও তাঁহাদের নিরাকার উপাসনার গর্ব্ব করিবেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ।

ঐতিহাসিক আলোচনা।

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, প্রকাশক থাকিলেও লেখকের অভাব; বর্ত্তমান সময়ে কৃতবিদ্য, প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু লেখকের অভাব না থাকিলেও যে সকল উপকরণ ও উপাদানে ইতিহাস লিখিত হয়, ভারতে তাহা নাই, এবং সেই জন্যই ভারতের সমগ্র ইতিহাস প্রকাশিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর "মহাভারত," ভারতবর্ষের হিন্দুরাজত্বের সমগ্র প্রকৃত ইতিহাস নহে; মুসলমানের আবল্ ফজল্, ফার্দ্দোশী কিম্বা বুল্‌বন্, ভারতের মহম্মদীয় শাসনের ইতিহাস-লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না, এবং বর্ত্তমান সময়ে বিলাতীয় কিম্বা ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত লেখকবৃন্দের লেখনী হইতে ভারতেতিহাস নামে যে সকল অসংখ্য গ্রন্থ নির্গত হইতেছে, তাহাও কোনও কালে ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। যে সকল কারণে এই সুবৃহৎ ভারত-খণ্ডের সম্পূর্ণ

ইতিবৃত্ত লিখিত হওয়া অসম্ভব, তাহার মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; তদ্যথা—প্রথমতঃ,প্রাচীন হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থাবলী অনেক সময়ে অযথা বর্ণনে পরিপূর্ণ এবং মুসলমানেরা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন,তাহা কোন ও ইতিহাসের অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইলেও সমগ্র ইতিহাসের কঙ্কাল বলিয়া গণ্য হয় না। বর্ত্তমান কালে ইংরাজেরা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শাসনকর্ত্তাদিগের সংক্ষিপ্ত রোজ্‌নামচা বলিলেই হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপকরণের অভাবই প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, লেখকদিগের অনুসন্ধানবৃত্তিহীনতা প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশের পক্ষেও অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা ইউরোপীয় লেখকগণের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছু করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় ৪৮ কোটি অধিবাসী পূর্ণ সুবিশাল ভারতবর্ষ, আর কোথায় তাহার তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ইতিহাস!!

দেশীয় লেখকদিগের মধ্যে দুই এক জন ভিন্ন কেহই কখনও বঙ্গদেশের বাহিরে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ; অনেকে হয়ত আপনার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে বসিয়াই ইতিহাস লিখিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের অংশ বিশেষও কখনও উত্তমরূপে পরিভ্রমণ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন,তাঁহারা দেখিবেন যে, ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছুই লিখিত হয় নাই। সুবিশাল,বিপুলবপু,দন্তীবরের কেবলমাত্র পুচ্ছটির বর্ণনা করিয়া যদি কেহ "সম্পূর্ণ মাতঙ্গেতিহাস" বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যেমন হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না, এখনকার পুস্তকবিক্রেতা ও ব্যবসায়ী প্রকাশকদিগের "সম্পূর্ণ ভারতেতিহাস" দেখিয়া আমরাও অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে পারি।

ভারতের কোথায় কি ছিল, কোথায় কি আছে, তাহার কখনও নিরাকরণ হয় নাই। ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সমবেত-সমষ্টি ভূমি বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে পরিগণিত। এই মহা প্রসিদ্ধ দেশে কেবল জলবায়ু বা মানব-সমাজের ভিন্নতার জন্য বৈচিত্রের স্ফূর্ত্তি পায় নাই,—কেবল ভাষা-ভিন্নতা জন্য ইহার বিচিত্রতার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, কেবল প্রাচীনতার জন্য ইহার প্রসিদ্ধি বা বৈচিত্রের সৃষ্টি হয় নাই,কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে, অধিক কি সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ক্রমে ইহা অনন্ত ঐতিহাসিক লীলার শীর্ষভূমি বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই অনন্ত ঐতিহাসিক লীলার মহা ইতিহাস কোথায়? এই অনন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্য ইতিবৃত্ত কোথায়? তাহাতেই বলিতেছি,ভারতের ইতিহাস নাই, বুঝি আর হইবেও না।

প্রাচীন কথা ছাড়িয়া দিয়া, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব-ভাগ ভারতেতিহাস হইতে বাদ দিয়া, কেবল যদি ভারতের খ্রীষ্টীয় রাজত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেও স্পষ্টতঃ দেখা যায়, ভারতের বর্ত্তমান কালের ইতিহাসও লিখিত হয় নাই। যাহা সত্য, তাহা অসত্য বর্ণে রঞ্জিত, যাহা অসত্য, তাহা সত্য বলিয়া বর্ণিত, যাহা সংক্ষিপ্ত তাহারই অযথা বিস্তৃতি এবং যাহা বিশাল তাহা লেখকের হাতে পড়িয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে,

যেখানে একলক্ষ ঘটনাবলীর বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে দুইটি কিম্বা তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার প্রকৃত কারণ বর্ণিত হইলে স্বার্থের হানি হয়, তাহা বর্ণিত হয় নাই। না জানি কত অনন্ত ঐতিহাসিক-তত্ত্ব, বর্ত্তমানকালের লেখকেরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, এমনও দেখা গিয়াছে যে, অসংখ্যাসংখ্য ঘটনাবলীর জনশ্রুতি পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। তাহাতেই বলিতেছি, ভারতের সমগ্র ইতিহাস বুঝি আর হইল না।

ভারতবর্ষের ভৌগলিক বিবরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই দেখা যায়, এতবড় সুন্দর ও বিশাল দেশ পৃথিবীর বুঝি আর কোথাও নাই। পৃথিবীর কোনও দেশে একাধারে ৪৬ কোটি লোকের অধিবাস নাই; কোথাও ১৩৬ প্রকারের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা নাই; কোথাও এত প্রকারের বিভিন্ন বিভিন্ন জল বায়ু একই দেশে দেখা যায় নাই; কেবল তাহাই নহে, ধারাবাহিকরূপে ষড়ঋতুকে এমন সুন্দর নিয়মানুসারে উদয় হইতে পৃথিবীর আর কোনও দেশে ভৌগলিকেরা দেখেন নাই। মহাবিশাল পর্ব্বত, সুদূর গহন বন, সুদীর্ঘা নদী, সুন্দর সরোবর, অসংখ্য প্রকারের জীব, জন্তু, উদ্ভিদ (তরু, লতা, ফল, পুষ্প), অগণ্য প্রকারের মানবীয় শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি নানা প্রকারের কর্ম্ম, গুণও বৃত্তির মনুষ্য যেমন ভারতভূমিতে একাধারে দেখা যায়, এমন কোনও দেশেই নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ইত্যাদি মানবজাতির প্রিয় ও প্রধান জ্ঞানকরী বিদ্যার যেরূপ ভারতে বিশদরূপে আলোচনা হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে প্রাচীন কাল হইতে সেরূপ হয় নাই। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, সরস্বতীকুলবাসী, সামবেদ-গায়ী প্রাচীন আর্য্যদিগের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩৩৬ প্রকারের বিদেশীয় জাতির প্রাদুর্ভাব এবং এতদ্দেশীয় প্রাচীন অসভ্যজাতির আধিপত্য-প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা করিলে দেখা যায়, ভারত যেন পৃথিবীর ঐতিহাসিক লীলার এক মহাকেন্দ্র ভূমি। এখন বল দেখি, এই সুবিশাল ভারতের সমগ্র ইতিহাস কখনও কি লিখিত হইয়াছে? অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া কেবল একটি নক্ষত্রের যথাকথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের বর্ণনা বলিয়া পরিগণিত হয় না, এখনকার ইংরাজ-লেখনী-প্রসূত কিম্বা দেশীয় শিক্ষিত বৃন্দের সংগৃহীত ইতিহাস ভারতেতিহাস বলিয়া তেমনই গৃহীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। তাহাতেই বলিতেছি, ভারতের আংশিক ইতিহাসও লিখিত হয় নাই। যাহা তুমি আমি জানি না, যাহার অনুসন্ধানে কখনও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই নাই, তাহা কেমন করিয়া বর্ণিত হইবে? কূপবদ্ধ মণ্ডূক কেবল কূপজলেরই সমাচার দিতে পারে, মহাসাগরের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? যাঁহারা অনুবাদ করাকেই ইতিহাস বলেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থ বালকদিগের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের জন্য ইতিহাস লিখুন ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টিও অনুসন্ধান বঙ্গদেশ অথবা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যায় নাই, তাঁহারা ইতিহাস না লেখেন, এই প্রার্থনা। এইরূপ লোকের নিকট ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র

তবে কি ভারতের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব? একেবারে অসম্ভব না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে সুকঠিন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত কোনও শিক্ষিত সমাজ, সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি-গিরির উচ্চতম সোপানে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারে না, একথা যখন সমাজের লোকেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখনই ঐতিহাসিক আলোচনার দিকে সমাজীয় লোকের প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। প্রথমেই ইতিহাস পাঠ এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনার আবশ্যকতা ও ফল বুঝাইয়া দেখা আবশ্যক; লুপ্ত প্রবৃত্তি পুঞ্জকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং সমাজের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ কি, তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে, ইতিহাসের দিকে লোকের শুভদৃষ্টি নিপতিত হইলে, অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির তীব্র উচ্ছ্বাস হইলে, ভারতের সমগ্র ইতিহাস সংগ্রহের পক্ষে চেষ্টা করা বোধ হয় অফল-প্রসূ হইয়া উঠিবে না; কিন্তু তাহা হইলেও যে প্রণালীতে ইহা লিখিত ও সংগৃহীত হইবে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। কেবল প্রাচীন গ্রন্থ, জনশ্রুতি বা প্রত্নতত্ত্বের উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না; ভ্রমণের প্রয়োজন। প্রতি জেলার লোকেরা যদি আপনাদের জেলার এক একখানি ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমবেত সমষ্টি এক সময়ে ভারতের সমগ্র ইতিহাসের সুবিশাল কঙ্কাল বলিয়া পরিগৃহীত ও পরিগণিত হইতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

মহর্ষি গৌতমের আত্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গুরু। মহর্ষি ইন্দ্রিয়াত্মবাদের অসারত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সূত্রের কল্পনা করিয়াছেন;—

দর্শন স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ।৩।১।১ সূঃ

অর্থ।

চক্ষুর প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু স্পর্শদ্বারা চিনিয়া লইতে পারা যায়; অতএব ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যবান্ নহে। ইন্দ্রিয়াতীত এক পৃথক্ চৈতন্যময় পদার্থ আছেন। ১।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

যে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই তাহা চিনিতে পারে। একের প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু

(১) মহর্ষি ভূতাত্মবাদ অর্থাৎ দেহের চৈতন্যবত্তা খণ্ডনের নিমিত্ত পৃথক্ কোনও সূত্র করেন নাই। কারণ, আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করাতে আপনা হইতেই ভূতাত্মবাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে যাঁহারা পাপপুণ্য মানেন ও তাহার ফল ভোগ স্বীকার করেন; অথচ পারলৌকিক আত্মা মানেন না, তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ" ৩।১।৪ ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। অনাবশ্যক বোধে মূলে আমরা এই সমস্ত সূত্রের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। দেহের চৈতন্যবত্তা খণ্ডনের নিমিত্ত ভাষ্য পরিচ্ছেদ প্রণেতা বলিয়াছেন,—

"শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।"

অর্থাৎ মৃতব্যক্তির দেহে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না; অতএব দেহ চৈতন্যবান্ নহে।

ফলতঃ ন্যায়মতে আশ্রয়ের বিনাশ হইলে, তদীয় পরিমাণেরও বিনাশ হয়। যথা—

অন্যে কোন ক্রমেই চিনিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ না হইলে, কেহ কোনও বস্তু চিনিতে পারে না। যে যাহা প্রত্যক্ষ করে, সেই তাহা স্মরণ করিতে পারে। আমার প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু তুমি স্মরণ করিতে পার না, সুতরাং চিনিতেও পার না।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্যবান্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে চক্ষুর অনুভূত বস্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের চিনিবার কথা নহে। কিন্তু যে দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয় কস্মিন্‌কালেও স্পর্শ করে নাই, চক্ষুমাত্র যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; এমন বস্তুও গাঢ় অন্ধকারময় স্থানে চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত কেবল স্পর্শ দ্বারা চেনা যাইতে পারে। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, দর্শনও স্পর্শনের কর্ত্তা এক অভিন্ন চৈতন্য পদার্থ। তিনিই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, পশ্চাৎ ত্বগ্‌ দ্বারা স্পর্শ করেন। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহারই জ্ঞানসাধন মাত্র। অতএব ইহাদের করণ নাম সম্পূর্ণ উপপন্ন হইয়াছে। ২।

শিষ্য। মহর্ষি যে প্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্য আছে, বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আবার ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ যে প্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্যবত্তা সপ্রমাণ করেন, তাহাও অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন ;—

ন, বিষয়ব্যবস্থানাৎ।৩।১।২ সূঃ

অর্থ।

ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপর ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অপর কোনও চৈতন্যময় পদার্থ নাই।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

চক্ষুর বিষয় রূপ অর্থাৎ বর্ণ। চক্ষুঃ থাকিলেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। কর্ণের বিষয় শব্দ। কর্ণ দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, কর্ণের অভাবে শব্দের প্রত্যক্ষ ঘটে না। নাসিকার বিষয় গন্ধ ; নাসিকা দ্বারা গন্ধের উপলব্ধি হয় ; নচেৎ গন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না। জিহ্বার

"পরিমাণং তূলকাদৌ নাশস্ত্বাশ্রয়নাশতঃ।"
ভাষাপরিচ্ছেদ।

আশ্রয়ের নাশ হওয়াতেই তূলা প্রভৃতিতে পরিমাণের নাশ হয়। কিন্তু দেহ পরিমাণ, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব পরিমাণাশ্রয় দেহ ও সর্ব্বদা বিনষ্ট ও উৎপন্ন হইতেছে। তথাপি যে দেহে অভিন্ন জ্ঞান জন্মে, তাহা "সাজাত্যেন দীপকলিকাবৎ" অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল দীপশিখার ন্যায় সাজাত্য বশতঃ বুঝিতে হইবে। "শরীরস্য চৈতন্যে বাল্যে বিলোকিতস্য স্থাবিরে স্মরণানুপপত্তেঃ, শরীরাণাম্ অবয়বোপচয়াপচয়ৈরুৎপাদবিনাশশালিত্বাৎ", একের অনুভূত বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, অতএব উৎপন্ন বিনাশশীল শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর বৃদ্ধকালে স্মরণ উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ বার্দ্ধক্যে বাল্যকালের শরীর ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া, সম্পূর্ণ এক অভিনব শরীর উৎপন্ন হয়।

(২) অতএব মহর্ষি পাণিনি ইন্দ্রিয় শব্দের নিরুক্তিতে বলিয়াছেন,---

"ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা"। পাণিনি সূত্রপাঠ ৫।২।৯৩ সূত্র।

"ইন্দ্র আত্মা তস্য লিঙ্গম্ করণেন কর্ত্তুরনুমানাৎ"।
সিদ্ধান্তকৌমুদী।

ইন্দ্র শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মার অনুমানের হেতুকে ইন্দ্রিয় বলে। যেমন কুঠারাদি করণ দৃষ্টে ছেদন কর্ত্তা সূত্রধরাদির অনুমান হয়,সেই প্রকার চক্ষুঃ প্রভৃতি কারণ দৃষ্টে দর্শনাদির কর্ত্তা ইন্দ্র অর্থাৎ আত্মার অনুমান হইয়া থাকে।

বিষয় রস; জিহ্বা দ্বারা রসের অনুভূতি জন্মে; নহিলে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। এই প্রকার ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ; ত্বগ্-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়; ত্বকের অভাবে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। আর যদিও হর্ষ শোক সুখ দুঃখাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি ইহাদের আলম্বন, পুত্রৈশ্বর্য্যবধ বন্ধনাদি অবশ্যই বহিরিন্দ্রিয় সমূহের অধীন। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের অভাব হইলে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অভাবও অনিবার্য্য! জ্ঞান ভিন্ন চৈতন্যেরও পৃথক্ সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণই চৈতন্যবান্ আত্মপদ বাচ্য। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও চৈতন্যপদার্থ নাই।

গুরু। ইন্দ্রিয়াত্মবাদের পক্ষ যে প্রকার হেতু প্রদর্শন দ্বারা সমর্থিত হইল, তাহা সত্য হইলে, বার্দ্ধক্যে অন্ধত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি বাল্যাদি কালে দৃষ্ট পদার্থের কোনও ক্রমেই স্মরণ করিতে পারিত না, পারিবার কথাও নহে। কারণ, স্বানুভূত বস্তুরই স্মরণ হইয়া থাকে। সেই অনুভব কর্ত্তার চক্ষুর অভাব হইলেও যখন অনুভূত বস্তুর স্মরণে কোনও বাধা হয় না, তখন বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, দর্শন কর্ত্তা চক্ষু নহে। চক্ষুর অতীত কোনও দ্রষ্টা আছেন। চক্ষুঃ তাঁহারই দর্শন সাধন মাত্র। চক্ষুর অভাবে তিনিই দৃষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও এই যুক্তি খাটিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের বিভিন্ন-বিষয়তা ইন্দ্রিয়াত্মবাদের অনুকূল প্রমাণ নহে। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্যের সত্তাই প্রমাণিত হইতেছে। তথাহি—

তদ্ব্যবস্থাদেবাত্ম সদ্ভাবাদ প্রতিষেধঃ। ৩। ১। ২সূ

অর্থ।

ইন্দ্রিয়গণের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিরূপিত থাকাতে, আত্মার সদ্ভাবই প্রমাণিত হইতেছে। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্যের সত্তা নিষিদ্ধ হইতেছে না।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

ইন্দ্রিয়গণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিরূপিত না থাকিত; তাহা হইলে ফলবিশেষের গন্ধমাত্র আঘ্রাণ করিয়া, তদীয় রূপরসাদির স্মরণ সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধমাত্রই আঘ্রাণ করিতে পারে; রূপরসাদির প্রত্যক্ষে তাহার কোনও ক্ষমতা নাই। তথাপি কেন আম্রের গন্ধমাত্র আঘ্রাণ করিলে, তাহার অমৃত রসের স্মরণ হইয়া থাকে। কেনইবা দূরস্থ পুষ্পের গন্ধমাত্র অনুভূত হইলে, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। অতএব বলিতে হয়, নাসিকা প্রভৃতির বিষয় গ্রহণে কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহারা জ্ঞানসাধনমাত্র। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত পাঠ-বিষয়-গ্রাহী এক স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন, তিনিই বিষয় বিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া থাকেন। তবে যে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিনাশ হইলে, তদিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অভাব হয়, তাহার কারণ সাধনাভাবে ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। কুঠারাদি অস্ত্রের অভাবে ছেদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তথাপি কুঠারাদি অস্ত্রের যেমন কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়ের অভাবে প্রত্যক্ষাদির অভাব হইলেও সেই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। আরও দেখ—

সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ৩।১।৭ সূঃ

অর্থ।

বাম চক্ষুর প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু, দক্ষিণ চক্ষু-দ্বারা দেখিয়া চিনিতে পারা যায়। অতএব

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র চৈতন্য পদার্থ আছেন।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

একের প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু অপরে চিনিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্যবান্ পদার্থ ও দর্শনাদি জ্ঞানের কর্ত্তা হইলে, বাম চক্ষুর প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা চিনিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যখন এক চক্ষুর প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু অন্য চক্ষু দ্বারা চেনা যায়, তখন যে চক্ষু দর্শনের কর্ত্তা নহে, দর্শন সাধনমাত্র, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে,চক্ষুর অতীত এক চৈতন্যময় পদার্থ আছেন। তিনিই এক চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, অন্য চক্ষুদ্বারা চিনিয়া থাকেন।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ চক্ষুর দ্বৈত স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন;—

(৩) নৈকস্মিন্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বাভিমানাৎ।৩।১।৮সূঃ

অর্থ।

চক্ষুর সংখ্যা দুই নহে, এক। মধ্যে নাসিকার অস্থি ব্যবধান থাকাতে দুই বলিয়া ভ্রম হয়।

গুরু।—

একবিনাশে দ্বিতীয়া বিনাশান্নৈকত্বম্।৩।১।৯ সূঃ

অর্থ।

এক চক্ষুর বিনাশ হইলে, দ্বিতীয় চক্ষুর বিনাশ হয় না। এমন কি তাহার কোনও বিকারও জন্মে না। অতএব চক্ষুর সংখ্যা এক বলিয়া অবধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

অবয়বনাশেঽপ্যবয়ব্যুপলব্ধেরহেতুঃ।৩।১।১০ সূঃ

অর্থ।

অবয়বের বিনাশ হইলেও অবয়বীর বিনাশ হয় না। অতএব প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা চক্ষুর দ্বিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।

তাৎপর্য্য।

কোনও বৃক্ষের কতিপয় শাখার ছেদন করিলে, যেমন খণ্ডবৃক্ষ বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার চক্ষুর একাংশের বিনাশ হইলেও খণ্ড চক্ষুর অবস্থান যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

গুরু।—

দৃষ্টান্ত বিরোধাদপ্রতিষেধঃ।৩।১।১১ সূঃ

অর্থ।

অবয়বের বিনাশ হইলেও অবয়বীর বিনাশ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। অতএব ইহা-দ্বারা চক্ষুর দ্বৈত নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

যাহা অবিনাশী, তাহার অবয়ব নাই এবং যাহার অবয়ব আছে, তাহা অবিনাশী নহে। অতএব "অবয়বের বিনাশ হইলেও অবয়বীর বিনাশ হয় না", ইহা "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসম্বদ্ধ। আর বৃক্ষের দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। কারণ, ছিন্নশাখ বৃক্ষের বিকার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু এক চক্ষুর বিনাশ হইলে,অপর চক্ষুর কোনও বিকার লক্ষিত হয় না। অধিকন্তু মৃতব্যক্তির শিরঃ কপাল পরীক্ষা করিলে, চক্ষুর্দ্বয়ের অধিষ্ঠানভূত দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অবট বা গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। একই অবট নাসিকার অস্থি দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, অথবা ইহাদের পরস্পর কোনও সংযোগ আছে, এমত বোধ হয় না। অতএব চক্ষুদ্বয়ের একত্বাবধারণ কোনও ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য।—ভাল চক্ষুর সংখ্যা যদি দুই হয়, তবে আমরা প্রত্যেক বস্তু দুই করিয়া, দেখিতে পাই না কেন?

গুরু।—চক্ষুঃ তৈজস পদার্থ। উভয় চক্ষু হইতে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি রশ্মিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিঃসৃত হইয়া, বহিরালোকে পুষ্টিলাভ করতঃ দৃশ্যমান পদার্থের ঠিক্ একই

(৩) টাকাকার বিশ্বনাথ এই সকল সূত্রদ্বারাই চক্ষুর একত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা ভাষ্যবিরুদ্ধ। আমরা ভাষ্যকার মহামুনি বাৎসায়নেরই অনুসরণ করিলাম।

দৃশ্যবিন্দুতে নিপতিত হয় এবং সেই দৃশ্য বস্তুর একটি মাত্র বিম্ব গ্রহণ করে; কাযেই আমরা উভয় চক্ষুদ্বারা প্রত্যেক বস্তু একটি করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু যদি চক্ষুর প্রান্তভাগ অঙ্গুলি দারা নিষ্পীড়ন করা যায়, তাহা হইলে, রশ্মি প্রবাহদ্বয় আর একস্থানে পতিত হইতে পারে না। কাযেই এমত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুদ্বারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিম্ব গৃহীত হয়; আমরাও প্রত্যেক বস্তু দুইটি করিয়া দর্শন করিয়া থাকি। অতএব চক্ষুর সংখ্যা যে দুই, তাহাতে সংশয় নাই।

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্যের ইহাও একটি অন্যতম বলবৎ প্রমাণ। যথা,—

ইন্দ্রিয়ান্তর বিকারাৎ। ৩। ১। ১২ সূঃ

অর্থ।

এক ইন্দ্রিয় দ্বারা রস বিশেষের আস্বাদ করিলে, ইন্দ্রিয়ান্তরের বিকার উৎপন্ন হয়। অতএব ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্য পদার্থ আছেন

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

কোনও ব্যক্তিকে অম্লরস আস্বাদন করিতে দেখিলে, জিহ্বায় জল সঞ্চার হইয়া থাকে। চক্ষুঃ ও জিহ্বা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য-বান্ পদার্থ হইলে, চক্ষুর দর্শন দ্বারা জিহ্বার অম্লরসের স্মরণ কোনও ক্রমেই উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র চৈতন্যময় পদার্থ আছেন।

শিষ্য।—

ন স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বাৎ। ৩। ১। ১৩ সূঃ

অর্থ।

স্মৃতি আত্মার গুণ নহে। ইহা স্মর্ত্তব্য বিষয়ের ধর্ম্ম। অতএব উক্ত প্রমাণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

আমরা ত জন্মাবধি শত শত বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। আপনার মতে আত্মাও সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন; তথাপি সকল সময়ে সে সমস্ত পদার্থের স্মরণ হয় না কেন? অধিকন্তু যখন আমরা সেই বস্তু পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষ করি, অথবা তৎ সদৃশ বস্তু নয়ন-পথে পতিত হয়, তখই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে। স্মৃতি আত্মার গুণ হইলে, কখনও স্মরণ, কখনও বিস্মরণ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। গুণ গুণীর সহিত নিত্য সমবেত থাকে। যতক্ষণ পুষ্প থাকে, ততক্ষণ তাহার রূপেরও অভাব হয় না। অতএব স্মৃতি আত্মার গুণ নহে এবং ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্যও প্রমাণিত হইতে পারে না।

গুরু।—

তদাত্মগুণসদ্ভাবাদ প্রতিষেধঃ। ৩। ১। ১৪

অর্থ।

স্মৃতি আত্মার গুণ বলিয়াই একের প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ, অন্যের অস্মরণ উপপন্ন হয়। অতএব তাহার আত্মগুণত্ব নিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে।

স্মৃতি আত্মার গুণ না হইয়া, যদি স্মর্ত্তব্য বিষয়ের ধর্ম্ম হইত, তবে একের অনুভূত বিষয় অপরের স্মরণ করিবার কোনই বাধা থাকিত না এবং "আমি স্মরণ করিতেছি" এইপ্রকার আত্মা গুণরূপে স্মৃতিকে অনুভব করিতে পারিতাম না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, স্মৃতি বিষয়নিষ্ঠ নহে, আত্মারই গুণ। তবে যে কখনও স্মরণ কখনও বা বিস্মরণ ঘটে, তাহার কারণ উদ্বোধকের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব মাত্র।

অপরিসংখ্যানাচ্চ স্মৃতিবিষয়স্য। ৩। ১। ১৫ সূঃ

অর্থ।

অপরিসংখ্যান অর্থাৎ বিশেষ অনুধাবনের অভাবেই স্মৃতি, বিষয়ের ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

আমি ইহা অবগত আছি। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, আবার তাহাই দেখি-

তেছি ইত্যাদি স্মৃতির উদাহরণে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা বিষয় এবং জ্ঞান, এই তিনই একত্র অনুস্যূত থাকে। পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী জ্ঞানের প্রতি সন্ধান ব্যতীত স্মরণ উৎপন্ন হয় না। আবার উভয় জ্ঞানের অভিন্ন জ্ঞাতা না হইলেও জ্ঞানের প্রতি সন্ধান সম্ভব হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, স্মৃতি, জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মারই ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ-সরস্বতী।

নীতিশিক্ষা।

নীতি সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। নীতিশিক্ষা সমস্ত মনুষ্যত্ব সাধনের মূল। নীতিশিক্ষা ভিন্ন বালক বালিকাদিগের যে শিক্ষা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নামেরই যোগ্য নহে। কিন্তু আমরা কি দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি,—যথার্থ নীতিশিক্ষার দিকে আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তাহার ফলও কর্ম্মানুরূপ হইতেছে। এ বিষম বিড়ম্বনা আর কত কাল থাকিবে ?

যাহাকে আমরা এক্ষণে সুশিক্ষা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানী লোকের নববিকীরণ বলি,—সেই ইংরাজী শিক্ষার প্রথমকাল হইতে এদেশে যথেচ্ছাবিহারী 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের সৃষ্টি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ঐ দলের প্রথম আবির্ভাব হয়। সেই প্রথমকার ইয়ংবেঙ্গলগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কতক অংশে প্রবীণতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদবধি সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত ইয়ংবেঙ্গলগণ ত্রিংশবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কাহারও আয়ত্ত হইতে চাহে না। বালকদিগের অনুরূপে বালিকারাও পিতামাতার অনেক পরিমাণে অবাধ্য হইতেছে। বর কন্যার মিলনের সম্প্রতি এই লক্ষণ পরিস্ফুট।

স্কুল ও কলেজে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালা চলিল; প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের মহা আদর হইল; সেক্সপিয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হইতে লাগিল; শিক্ষার সোপানের তর তম ভাগ নির্দ্দেশ ও গণনা বিশ্রুত হইল; কিন্তু ছাত্রদিগের বিনয়াধান হইল না। নীতি ফল প্রসব পক্ষে আমাদের দেশের সুশিক্ষার বন্ধ্যাত্ব দোষ সুস্পষ্ট হইল।

মনুষ্যের প্রথম যৌবনে সকলই সুন্দর—সকলই মধুময় হয়। যে দেশ সৌভাগ্যশালী; সে দেশের লোকেরা তাহাদের নব কিশোরবয়স্ক সন্তানদিগের মুখশ্রীতে স্ববংশের ও স্বদেশের পক্ষে কত উন্নতির—কত সৌভাগ্যের—কত কল্যাণের লক্ষণ সন্দর্শন করেন। কিন্তু হায়! আমরা —দুর্ভাগা আমরা—দুর্ব্বিনীত 'ইয়ংবেঙ্গল' সন্তানদিগের ভবিষ্যতে নানা দুর্গতির সম্ভাবনা দেখিয়া শোকে ও দুঃখে আকুল হইয়া থাকি।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা করিয়া, ধনধান্যে সমৃদ্ধিমান হইবার আশায় এ দেশে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হয়। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যগণ বিজ্ঞান শিল্পাদির চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে ইংরাজীর নূতন ছটায় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমেই স্বদেশীয় সমস্ত বিষয়কে পদাঘাত করিতে শিখিল। ইংরাজী শিক্ষার এই লক্ষণ ধারাবাহিকরূপে চলিল। হিন্দু পিতা মাতাগণ সন্তানের উচ্ছৃঙ্খলতায় মর্ম্মান্তিক

কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যুগযুগান্তরের আলস্য, নিদ্রা ও জড়ভাবের ফল অনিবার্য্য রূপে ফলিল। প্রবল বন্যায় যখন ঘর দ্বার ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন নিরুপায় গৃহস্থ লোকেরা এক একটু উচ্চস্থান আশ্রয় করিয়া শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে যেমন জলপ্রবাহের গতি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, সেইরূপ এক্ষণকার হিন্দুকুলের পিতামাতাগণ 'নাচার হইয়া' ভগ্নমনে বিনয়-শূন্য বিতণ্ডা-পরায়ণ যথেচ্ছাচারী সন্তানগণের বিকৃত গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই যে কেবল এই 'ইয়ং বেঙ্গল' ধর্ম্ম ধারণ করেন, তাহা নহে। জঙ্গলময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, পল্লীগ্রামে,—যেখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা অল্পই হইয়া থাকে,—সেখানেও,—যেমন পোষাক বলিলে কোট পেণ্টুলন বুঝায়, চিকিৎসক বলিলে ডাক্তার বুঝায়, জ্বরের ঔষধ বলিলে কুইনাইন বুঝায়, বিচার স্থান বলিলে কেবল সদরের মুন্সফ কোর্ট বুঝায়, তেমনি স্বাধীনতা বা স্বচ্ছন্দতা বলিলে 'কিছুই মানি না' বুঝায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় যুবকদিগের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার অল্প বা অধিক সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। কালের গতি, বা ব্রিটিস্ আইনের গুণ, যাহাই হউক, এক্ষণে মুটিয়া, মজুর, বেহারা ও গাড়োয়ান প্রভৃতি ইতর লোকেরাও মনে করে, আমরা কাহারই অধীন নহি। স্ত্রী ও বালকেরাও সেই ম্যালেরিয়ার চিহ্ন প্রকাশ করে। প্রকৃত স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নানাপ্রকার অধীনতা, তাহা বুঝিতে তাহাদের কষ্ট হয়। সুনীতির অধীনতায় সহজ বিশ্বাসবৎ নির্দ্বন্দ্ব শান্তিসুখে তাহাদের তৃপ্তি হয় না। শিক্ষালোকসম্পন্ন নবোদ্যমশীল যুবকদিগের উক্ত চরিত্র লক্ষণ তন্নিম্ন পদবীয় সকল বালকের ও জড়বুদ্ধি অপর লোকের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়।

শিক্ষাপ্রণালী সংক্রান্ত এই শোকাবহ বিকৃত ফলের পরিচয় যাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন সৌভাগ্যশালী পিতামাতা অল্পই রহিয়াছেন। যাঁহারা সমস্ত দেশের বিষয় চিন্তা করেন, যাঁহারা স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা আপন প্রতিবেশীগণের সন্তানবর্গের দুঃশীলতা দেখিয়া তাহাদের সংসর্গ হইতে স্বকীয় পুত্র কন্যাগণকে তফাতে রাখিতে সর্ব্বদা অবহিত আছেন, এমন চক্ষুষ্মান লোকহিতৈষী ব্যক্তিগণ উক্ত তথ্যের যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আলোচনার নিমিত্ত আমরা তাদৃশ কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রথম সাক্ষী রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার ইংলণ্ডস্থ চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন,—

"He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term."

Biography of Raja Ram Mohun Roy: London, 1833-34.

ইহার কুড়ি বৎসর পরে সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪ অব্দে) বলিয়াছিলেন—

"Among this class of our educated countrymen, accordingly, you will find atheists and infidels of every shape, bold deniers of great truths and violent declaimers against all religion, and I ask you, ought this to remain as it is."

Lecture by Hurrish Chunder Mookerjee: Bhowanipore, 1854.

এই উক্তির পরে এদেশে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিলক্ষণ প্রচার হইল। বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত চলিল। জাতীয়

ভাবের বহু আলোচনা হইল। স্বদেশের স্বাভাবিক উন্নতির পক্ষে চেষ্টা হইতে লাগিল। বঙ্গীয় কবি ও সুলেখক সকল আবির্ভূত হইলেন। স্বদেশ-প্রেমের উচ্ছ্বাস শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু আসলে কিছুই হইল না।

ছাত্রদিগের উল্লিখিত স্বভাবের পরিচয় পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন—

"It is a lamentable fact that a century of English education has failed to produce the very first fruit of education, namely, true culture, which is but another name for discipline. Nay, one is almost inclined to believe that it has succeeded in destroying the discipline that already existed as a most amiable characteristic of the Hindu race. * * * It is my impression that the manner of imparting that education, the revolutionary ideas which it has disseminated, the antagonistic principles to the old established customs of the country which it has introduced, have succeeded in just awakening the spirit of independence in the minds of our young men, without teaching them that there is a spirit even higher than this—the spirit of self-control."

Speech by Dr. Sircar: Calcutta, 29th October, 1887.

যখন এদেশীয় লোকেরা শিক্ষা প্রণালীর এইরূপ দোষোদ্‌ঘোষণ করিতেছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট যে চক্ষু কর্ণ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকমিশন দ্বারা শিক্ষাসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের ফলাফল অবধারণ করিতেছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের উপরি উদ্ধৃত আক্ষেপ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণরজেনেরল বাহাদুরের এই বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হইল যে, শিক্ষাকমিশনের অভিপ্রায় মতে সমস্ত স্কুল ও কলেজে সুনীতি শিক্ষার বিধান করা হয়। এই বিজ্ঞাপনীতে গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষা প্রণালীর দোষে ছাত্রেরা শাসন-বিহীন হইয়া পড়িতেছে :—

"It cannot be denied that the general extension in India of education on these principles has in some measure resulted in the growth of tendencies unfavourable to discipline and favourable to irreverence in the rising generation."

গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপরের কথা সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রজাবর্গের সুশিক্ষার বিধান না হইলে দেশে শান্তি রক্ষা এবং সুশাসন বিস্তার করা অসম্ভব, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের বিনয় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদি সদ্‌গুণ সমাধান নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দেখিলেন,—administration of Justice corrupt, Police—"cruelty and oppression." &c. ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায় রক্ষা হয় না; পুলিশ কেবল লোকের প্রতি যন্ত্রণা দিয়া থাকে এবং সাধারণতঃ সর্ব্বত্র কেবল spectacle of intellectual and moral degradation —অর্থাৎ জ্ঞান ও নীতির দুর্গতির লক্ষণ দৃশ্যমান হয়। এই দুর্গতি পরিহারের জন্য তিনি করিলেন কি? তিনি মেডিকেল কলেজ স্থাপন দ্বারা পুরুষ ধর্ম্মযুক্ত ইউরোপ দেশের (manly Europe) বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনার উপায় করিয়া দিলেন এবং রামমোহন রায়ের সুবিখ্যাত বন্ধু এড্যাম সাহেবকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করাইয়া এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিলেন।

অতঃপর শিক্ষাসংক্রান্ত নানা প্রকার নিয়ম অবধারিত হইল। উন্নত পুরুষদিগের উপযোগী কলেজীয় শিক্ষা এবং সাধারণ লোকের যোগ্য সামান্য শিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইল। এই কার্য্য পরম্পরায় এই ঊনবিংশ শতাব্দী গত হইতে চলিল। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত (১৮৮৮ অব্দের) বিজ্ঞাপনীতে নির্দ্দেশ আছে যে—

"The intellectual part of the process has made good progress; it remains to introduce the moral element which forms the most prominent factor of European theory of education."

বস্তুতঃ এতকাল ধরিয়া ছাত্রদিগের কেবল বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে। নীতিশিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত হয় নাই। এখন গবর্ণমেণ্ট সেই অভাব পূরণের জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন।

উপরের উদ্ধৃত অংশে বিদিত হইবে যে (European theory of education) ইউরোপীয় শিক্ষা প্রণালীতে নীতিশিক্ষাকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। এ দেশের ভাগ্যে শত বৎসরেও তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত হইল না। অথচ উহার অভাবে যে মন্দ ফল হয়, তাহা অস্থিতে অস্থিতে সকলকেই বিদ্ধ করিল।

দেশের লোক নীতিপরায়ণ না হইলে শত শত প্রহরী স্থাপন করিয়াই বা গবর্ণমেণ্ট দেশের কোন্ শান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন? ১৭৯৩ সালের ৯আইনে ফৌজদারী এবং ২২ ও ২৩আইনে পুলিশ-সংক্রান্ত কার্য্য ভার নির্ব্বাহের নিয়মাবলী স্থাপিত হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান এবং ঘন ঘন নিয়মাবলী সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পূরা একটী শত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। শেষে হতাশ হইয়া বলিলেন, দেশের লোক ভাল না হইলে আমরা কি করিতে পারি? দেশের প্রকৃত শান্তি স্থাপন পক্ষে পুলিশ প্রায় 'ফেল' অক্ষম হইল দেখিয়া বহু আলোচনার পর বঙ্গের গবর্ণর(স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি) বলিলেন*—

"In reflecting upon the causes of the comparative failure of the Police in Bengal, it is necessary not to lose sight of the obstacles which the Police, as well as the Magistracy have to surmount. Foremost among our difficulties is the character of the general mass of the population from which the Police are drawn."

গবর্ণর বাহাদুর এতদ্দেশবাসীদিগের উপর সকল দোষ খ্যাপন করিয়া বলিয়াছেন:—

"The Police are of, and from, the people; and as are the people so are the police. To speak broadly the people have but a faintly developed sense of public morality, – of the far-reaching duties of the individual towards the public at large: they view without reprobation the giving and taking of bribes; they will not interest themselves in matters outside their immediate personal concerns, to oppose oppression or black mail or false evidence or other offences against the public."

এ দেশের লোক কেবল আপনার বিষয়টী দেখে; অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না; অপরের প্রতি অত্যাচারের নিবারণ,বা ন্যায় স্থাপন জন্য সাক্ষ্যদানাদি কিছু করিতে যায় না, এই স্বার্থপরতা দোষে এদেশে ন্যায় বিচার কঠিন। ইংলণ্ড বাসীদিগের স্বভাব ইহার বিপরীত। তত্রত্য ইংরাজগণ কাহারো প্রতি অপরকে অত্যাচার করিতে দেখিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করে। মেক্‌ফরসন্ সাহেব তাহাই বলিয়াছেন:—

"In Bangal it is, I believe, much more difficult than in England to bring offenders to justice because we have not here so high a standard of truth and so general sympathy with public justice. The public spirit, which in England will prompt strangers and disinterested persons to give evidence for the Crown and for the defence with no object but that truth may be established, is not often found in this country."

এই সকল অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া মেক্‌ফরসন সাহেব বলিয়াছেন,সম্প্রতি ধর্ম্মাধিকরণে ও পুলিশে ভাল ভাল লোকদিগকে নিযুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু এই ভাল লোক সকলই বা কোথা পাওয়া যাইবে? এই সমস্যার পূরণ আপাততঃ কঠিন বোধ হয়। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট মেক্‌ফরসন সাহেবের উক্তি ধরিয়া বলিয়াছেন:—

"They justify a demand for good officers. We want better Magistrates, better Station

* Supplement Calcutta Gazette, Oct. 1. 1890.

Police and better Village Police. The problem to be solved is how these are to be attained."

লোকের মনে ফৌজদারী ও পুলিশ ঘটিত অত্যাচার ও তাহার অবিচার তীব্ররূপে আঘাত করে। অতএব ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সূক্ষ্মদৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু কর আদায় ও দেওয়ানী সম্বন্ধে কত অন্যায় ঘটনা হইতেছে, তাহার তদ্রূপ আলোচনা হয় না। হিন্দুরাজগণ যাহাদিগের ধনের রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহাদের মধ্যে কেবল 'নাবালগ' গণের ধন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন। পরন্তু কর্ম্মচারীদিগের দোষে এই নাবালগী সেরেস্তার যেরূপ দশা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সাধ্যসত্ত্বে কেহ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে আপনার শিশুসন্তানকে স্থাপন করিতে চাহে না। এমন অবস্থায়—

বশাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাৎ রক্ষণং নিষ্কুলাসুচ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসুচ॥ মনু ৮।২৮

বন্ধ্যা, অপুত্রা, অভিভাবকহীনা, বিধবা, রোগাপন্না, সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগের ধনরক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া যথোচিতরূপে তাহার প্রতিপালন করিতে পারিবেন কি? এমন অবস্থায় পিতৃমাতৃ পরিত্যাগী পামর সন্তানগণের পাপের প্রতিবিধান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সম্ভব হয় কি? অকারণ পরিত্যক্তা, সতী স্ত্রী স্বামীর নামে নালিশ করিয়া 'সাক্ষী-সাবুদ' দিলে 'খোরপোষ' পাইবেন, এই আইন আছে; কিন্তু তাহাতে কয়টী বিপথগামী পুরুষের দুর্দ্দশাপন্না গৃহিণীর অন্নবস্ত্রের সুবিধা হইতে পারে? হিন্দুরাজত্বের আদর্শে, ধর্ম্মাধিকরণে অনুচিত অভিযোগ, অন্যায় বিচার ও মিথ্যা সাক্ষ্যের নিবারণ জন্য, গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাসনারম্ভে যে আইন ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে আইন আর প্রচলিত রাখিতে পারেন কি? ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যাহা জানেন না, অথবা যাহার প্রতিকার করিতে পারেন না, এমন আমাদের নৈতিক অবনতির বিস্তর দুঃখের কাহিনী আছে। সকল ব্যথা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে জানিবে?

পরন্তু সকল দেশেই রাজা সর্ব্বেশ্বর। বিশেষতঃ আমাদের দেশে রাজা ধর্ম্মের অবতার—ধর্ম্মের প্রতিনিধি। রাজা অন্যায় কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ধর্ম্মস্থাপন করিলে, সৎকার্য্য করিলে, তাহার যশ দিগন্তব্যাপী হয়। রাজার হস্তে দেশের মঙ্গল বহুপরিমাণে আয়ত্তাধীন বলিতে হইবে।

এই শতাব্দীর প্রথমে এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের ন্যায় ব্রিটিশ্ রাজকর্ম্মচারীদিগেরও চরিত্রে সন্দেহ জন্মিবার কারণ ছিল। ১৭৯৩ অব্দের ৩৮ আইন জারি না হইলে, এবং নানা প্রকারে ধরা-ধরি না করিলে কবেনেণ্টেড্ সিবিল সরভেণ্টে বা চিহ্নিত রাজকর্ম্মচারীগণের বাজে-আদায় বন্দ করা যাইত না। ১০০ বা ১৫০ টাকা মাত্র বেতন পাইয়া মুন্সফ ও জজ-পণ্ডিতগণ এবং ২৫।৩০ টাকা বেতন পাইয়া সেরেস্তাদারগণ যে নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারিবেন, তাহা তখন সম্ভব পর ছিল না। ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের উদরের মত অন্ন দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন।

আমরা উপরে বঙ্গীয় গবর্ণর বাহাদুরের যে প্রস্তাবনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তিনি কর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতি ও বেতন সম্বন্ধেও ভরসা দিয়াছেন। দরিদ্রতার কশাঘাত সহ্য করিয়াও ধর্ম্মপালন করিতে হইলে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাটুকুও অবলম্বনীয় হয়।

এস্থলেও গবর্ণমেণ্টের আশাজনক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি—

"Due regard is to be paid to financial consideration, but the Lieutenant Governor would observe that the scheme to be submitted to the Covernment of India is one which is expectd to "place the Police of Bengal upon a satisfactory basis as regards pay and promotion."

এইরূপ করিয়াই রাজা আমাদের ধর্ম্মের সহায় হয়েন। ফলতঃ ইহাও বুঝিতে হইবে, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের নীতিপালন পক্ষে গবর্ণমেণ্টের আজিও উক্ত প্রকার সহায়তার প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন সমুচিত ফল লাভ দুর্ঘট।

গবর্ণমেণ্ট অর্থ দিয়া সাহায্য করেন। যে স্থলে অর্থ দান করা সহজ না হয়, সে স্থলে উৎসাহ বাক্যেও অনেক সহায়তা করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের অভিমতিতেই দেশের বহু মঙ্গলকর অনুষ্ঠান বলীয়ান হইতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বুঝাইবে যে, এ দেশে নীতি শিক্ষার নিতান্ত হীনাবস্থা। আর নীতি শিক্ষার উন্নতি না হইলে এদেশের পিতা পুত্র, রাজা প্রজা, প্রতিবেশী ও গোষ্ঠিবর্গ, ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারই শান্তি নাই। আমরা এক্ষণে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিভাগের দিকে লক্ষ্য করিতেছি না; অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের কথাও তুলিতেছি না; সামরিক নীতি আলোচনারও এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা যে গৃহস্থ ধর্ম্মে রহিয়াছি, এই ধর্ম্মের কথা চিন্তা করি। কৃষি শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ লাভ পূর্ব্বক পরিবারবর্গের প্রতিপোষণ করা —সাধারণ মনুষ্যত্বটুকু রক্ষা করা, ইহাই আমাদের বর্ত্তমানকার সাধনার বিষয়। যে নীতি পালন দ্বারা উক্ত মনুষ্যত্বের সম্বর্দ্ধন হয়, সেই নীতির সমাধান চাই। তাহাই দুর্লভ জ্ঞান হইতেছে।

শত বৎসরের স্কুল ও কলেজে এই দুর্লভ বস্তুর উদ্ভব হইল না। জ্ঞানৈষণা প্রসার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাতে চরিত্রোৎকর্ষের সম্ভাবনা অল্পই রহিল। এখনকার নিতান্ত আবশ্যক এই যে, বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের ধর্ম্ম সমুন্নত হয়,—

"to fill the vacuam which a purely intellectual training has created, and to mitigate the evils of a one sided development."

এতন্নিমিত্ত শিক্ষা বিভাগের প্রতি সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান্ রাজকর্ম্মচারীর অভাবে পর্য্যাকুলিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা প্রচারের উপর ভরসা স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ম্যাকফরসন সাহেবের সিদ্ধান্ত এই:—

"The only remedy for this want of public spirit is to spread education among the masses."

অপরাপর চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ লোকদিগেরও এই সিদ্ধান্ত। অভ্যাস দ্বারা স্বভাবও কতক পরিবর্ত্তিত হয় এবং নীতির অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যত্বের সমুদায় সদ্‌গুণ আবির্ভূত হয়। আর দেশের অধিকাংশ লোক সজাগ ও চক্ষুষ্মান হইলে পাপ প্রবৃত্তির গোপন-ক্রীড়া সহজেই মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

এই যে মহাপুরুষদিগের মহদুক্তির উল্লেখ করিলাম, ইহাও তো ৫।৭ বৎসরের পুরাতন কথা। অনেক পুরাতন কথা তুলিলাম। এই সকল কথার পর কার্য্য কি হইয়াছে, তাহাই দেখা আবশ্যক। এ বার বোধ হয় অধোবদন হইতে হইল, কারণ, কার্য্য কিছুই হয় নাই। তথাপি কথাও ভাল; আলোচনারও ফল আছে; এই বলিয়া মনকে আশ্বস্ত করিতে হয়।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

সূর্য্যের সৃষ্টি।

১

দেখ দেখ ওই ব্রহ্মলোকে আজ
ছুটেছে আনন্দলহরী ধারা,
হবে নাকি আজ তপন সৃজন
চৌদিকে তাহার পড়েছে সাড়া।

২

মহান্ অনন্ত নীলিমাসাগরে
ভাসে ব্রহ্মলোক আলোকময়,
ছুটিছে আলোক ঝলকে ঝলকে
দিগাঙ্গনাগণ গাইছে জয়।

৩

শোভিছে তথায় প্রীতির কুসুম
স্নেহের নির্ঝর ঝরিছে শত,
শান্তিঃ শান্তিঃ রবে উঠিছে ঝঙ্কার
গগন-প্রাঙ্গণ ভাসায়ে যত।

৪

সে আনন্দ ধামে অনন্ত আসনে
বিরাট পুরুষ বসিয়া ধ্যানে,
সহস্র সহস্র অযুত ব্রহ্মাণ্ড
আছে লোমকূপে তিল প্রমাণে!

৫

শত চাঁদ তার চরণে পতিত
জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রেম-আধার,
গুঞ্জরিছে অলি মধুর ঝঙ্কারে
মাতিয়া দেহের সুবাসে তার!

৬

করি যোড়কর অবনত শির
আখণ্ডল আদি দেবতাগণ—
ব্রহ্মের সান্নিধ্য পরম পবিত্র—
অমৃতের স্রোতে হয়ে মগন,

৭

ভকতিবিহ্বল রোমাঞ্চিত কায়
গদ গদ স্বরে ডাকিছে তাঁয়,
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেমের লহরী
অশ্রুরূপে দেহ প্লাবিয়া ধায়!

৮

"জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম সনাতন
অনাদি কারণ ত্রিলোক পতি,
(জয়) শঙ্কর শিব সৃজন পালন
প্রলয় কারণ দেবের গতি।

৯

"না ছিল কিছুই আলো কি আঁধার,
ছিল মহাশূন্য অনন্ত ছেয়ে,
তোমার আদেশে আঁখির নিমিষে
শত স্বর্গলোক ছুটিল ধেয়ে!

১০

"হ'ল অগণন দেবের সৃজন
শচীসহ গায় ত্রিদশ-পতি,
'(জয়) শঙ্কর শিব সৃজন পালন,
প্রলয় কারণ দেবের গতি'।

১১

"হবে নাকি আজ তপন সৃজন
ওহে ভগবান্ করুণাময়!
দেখিব আমরা তপন কেমন
গায়িব হরষে তোমারি জয়।

১২

"দেখিব কেমনে, ভীম আবর্ত্তনে
বিজলী চমকে গ্রহের নাথ,
ছুটিবে আকাশে ধাঁধিয়া নয়ন
হুহুঙ্কার করি গ্রহের সাথ!

১৩

"জয় ভগবান করুণানিধান
কর কৃপাদান অখিলপতি,
(জয়) শঙ্কর শিব সৃজন পালন
প্রলয় কারণ দেবের গতি"!

১৪

ভাঙ্গিল ধেয়ান উঠি ভগবান
ছাড়ি ব্রহ্মলোক দেবতাসনে,
আইলা চকিতে দেখিতে দেখিতে
সৃজিতে তপন হরষ মনে,

১৫

—লক্ষ কোটি যুগ তমিস্রা রজনী
ঢালিছে যথায় তিমির রাশি,
ভীষণ আঁধারে ঘোর হুহুঙ্কারে
যত দেবগণ উঠিছে ত্রাসি;

১৬

—যথা উন্মাদিনী প্রকৃতি রঙ্গিনী
অট্ট অট্ট হাসে নাচিছে তায়,
সহস্র সহস্র অশনি গর্জ্জনে
শ্রবণ বধির হইয়া যায়;

১৭

—যথায় অনন্ত পরমাণু রাশি
গর্জ্জে অবিরত সাগর হেন,
লক্ষ লক্ষ কোটি যোজন বিস্তার,
ছুটে হুহুঙ্কার প্রলয়ে যেন!

১৮

সেই ভয়ঙ্করা তামসী মূরতি
দেখি দেবগণ স্তম্ভিত হয়!
"রক্ষ ভগবান ব্রহ্ম সনাতন"
ডাকিছে সভয়ে অমরচয়।

১৯

সেই উন্মাদিনী প্রকৃতির পরে
ব্রহ্ম আবির্ভাব হইল যবে,
থামিল অমনি ঘোর হুহুঙ্কার
নিস্তব্ধ নিষ্কম্প হইল সবে!

২০

থামিল প্রলয় অশনি গর্জ্জন,
ঝটিকা হুঙ্কার থামে অমনি,
নোয়াইল শির পরম পুরুষে,
দেখিয়া হরষে প্রকৃতি-রাণী।

২১

সেই প্রকৃতির বিশাল উরসে
ব্রহ্ম সনাতন বসিল ধ্যানে,
সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যাহারে ধেয়ায়
কিবা ধ্যান তার কে আর জানে?

২২

ভাঙ্গিল ধেয়ান, মেলিয়া নয়ান
ব্রহ্ম সনাতন চকিতে চায়,
দেখিতে দেখিতে নয়নজ্যোতিতে
সহস্র বিজলী ছুটিয়া ধায়!

২৩

সহস্র সহস্র অযুত বিদ্যুৎ
ধায় হুহুঙ্কারে ধাঁধিয়া আঁখি,
প্রলয় গর্জ্জনে, ভীম আবর্ত্তনে,
যত দেবগণ চমকে দেখি!

২৪

দেখিতে দেখিতে তড়িতে তড়িতে
মহাশূন্য হ'ল অনলময়,
লক্ষ লক্ষ কোটি যোজন বিস্তার
অগ্নিপারাবার সৃজন হয়।

২৫

জ্বলিছে অনল ধাঁধিয়া নয়ন
অনলতরঙ্গ দাপটে ছুটে,
অনল হুঙ্কার ভীম পারাবারে,
মহামন্দ্রে যেন অশনি ছুটে।

২৬

মুদিত নয়ন যত দেবগণ
কাঁপে থর থর অধীর হয়ে,
ডাকিছে সঘনে সশঙ্কিত মনে
"রক্ষ নারায়ণ!" বলিয়া ভয়ে।

২৭

"রক্ষ নারায়ণ ব্রহ্মসনাতন
সহিতে না পারি আমরা আর,
দহিছে নয়ন ভীমহুতাশন,
উঠে স্বর্গলোকে শিখা তাহার।

২৮

"ওই দেখ অই ভীষণ হুঙ্কারে
জ্যোতির তরঙ্গ আসিছে ছুটে!
ওই দেখ ভাই ভীষণ কল্লোলে
অগ্নিপারাবার উথলি উঠে।

২৯

"সংহর সংহর ওহে বিশ্বম্ভর
কালানল তেজে দহিছে আঁখি,
অনল শিখায় স্বর্গ জ্বলে যায়
রাখ সৃষ্টি তব দেবতা রাখি।

৩০

জয় ভগবান করুণানিধান্
কর কৃপা দান অখিলপতি,
(জয়) শঙ্কর শিব সৃজন পালন
প্রলয়-কারণ দেবের গতি।"

৩১

দেবের দুর্গতি দেখি বিশ্বপতি,
ব্রহ্মতেজে সবে পূরিলা তবে,
আবার সাহসে মনের হরষে
তপন-সৃজন দেখিছে সবে।

৩২

দেখিছে কেমনে ভীম আবর্ত্তনে
কেন্দ্র আকর্ষণী শকতি বলে,
হয়ে গোলাকার অগ্নি পারাবার
হুহুঙ্কার করি ছুটিয়া চলে!

৩৩

দেখিছে আবার বর্ত্তুল আকার
জ্বলদগ্নিময় আটটি গ্রহ,
চলিছে ধাইয়া ঘুরিয়া ঘেরিয়া
পরি চন্দ্রহার সুরয সহ!

৩৪

চলিছে ধাইয়া অই বৃহস্পতি
অষ্ট চন্দ্রহার পরিয়া হায়!
কিরণ-মেখলা বান্ধিয়া যতনে
অই শনৈশ্চর ছুটিয়া যায়!

৩৫

চলিছে ছুটিয়া ক্ষুদ্র পৃথ্বী অই
এক চন্দ্র তার শোভিছে শিরে,
চুম্বি রশ্মিদল সবিতৃমণ্ডল
করে প্রদক্ষিণ ঘুরিয়া ফিরে।

৩৬

চলিছে ধাইয়া সবিতৃমণ্ডল
জ্যোতির তরঙ্গে জগত্ ভাসে।
চুম্বিয়া সে জ্যোতি লক্ষ লক্ষ কোটি
যোজন বিস্তার ব্রহ্মাণ্ড হাসে।

৩৭

দেখিয়া সে জ্যোতি আপনি ভারতী
ভকতি বিহ্বল হইয়া মরি,
পবিত্র প্রণব করি উচ্চারণ
বেদমন্ত্র গায় পরাণ ভরি।

৩৮

"জয় বিষ্ণো! জয় সবিতৃ দেবতা
তোমার বরেণ্য মহিমা রাশি,
স্মরিবে, পূজিবে, গাইবে জগৎ
বিস্ময়ে প্লাবিত, আনন্দে ভাসি!"

৩৯

উরিল অমনি গায়ত্রী রূপিণী
আনন্দ লহরী ছুটিল তায়,
আনন্দে মগন যত দেবগণ
ভকতি বিহ্বল হইয়া গায়;—

৪০

"জয় বিষ্ণো! জয় সবিতৃদেবতা
তোমার বরেণ্য মহিমা রাশি,
স্মরিবে, পূজিবে, গাইবে জগৎ
বিস্ময় প্লাবিত, আনন্দে ভাসি!"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

পরিণয়োপহার

কন্যা-বরণ।

(২০শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩০২)

এই মাল্য, এই বস্ত্র, এ গন্ধ-চন্দন,
পর' শুভে! ক'নে রূপে করিনু বরণ।
শোভে যথা উজ্জ্বলতা এই শুভ্র ফুলে,
আনিও সে পবিত্রতা প্রিয় পতি কুলে!
এক সূত্রে গাঁথা যথা এই ফুলহার,
এমনি আনিও স্নেহ বাঁধিতে সংসার!
এ কুঙ্কুম, এ কস্তুরী মোহে যথা সুর,
এমনি স্বভাব এনো প্রসন্ন মধুর।
এ চুয়া চন্দন-রস স্নিগ্ধকর যথা,
পরাণ-জুড়ান এনো এমনি মমতা!
এই যে সিন্দুর বিন্দু দিনু তব ভালে,
চিরসঙ্গী এনো ইহা আসিবার কালে!
এই যে কৌষের বাস, ইহারি মতন,
আনিও নারীর লজ্জা—পূত-আচ্ছাদন!
অনন্ত অব্যয় যথা অই নীলাকাশ,
এনো সেই পতিভক্তি ঈশ্বর-বিশ্বাস!

বরণোপহার।

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ৩, ৫৫ ও ৫৬।

আজ এই বিশেষ দিনে, বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, পরলোকস্থ পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল আত্মীয়দিগের আশীর্ব্বাদ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের অনুরাগ ও ভালবাসা মস্তকে লইয়া তোমাকে আমরা, এই দরিদ্র পরিবারের উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল আত্মীয় বন্ধু সম্মিলিতভাবে, সাদরে, সস্নেহে প্রফুল্লচিত্তে বরণ করিতেছি। তুমি বিধাতাকে প্রণাম করিয়া আমাদের কথা শ্রবণ কর।

অনেক দিন কাছে কাছে থাকিয়া তুমি এই পরিবারের ছোট বড়, সকলের দোষগুণ জানিয়াছ। জানিয়াছ, আমরা দরিদ্র, অজ্ঞান, এ সংসারে নিন্দিত এবং ঘৃণিত। জানিয়াছ, প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তি অর্জ্জন আমাদের জীবনের ব্রত; লক্ষ্য—মাতৃধাম, চির-বাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ ধাম। জানিয়াছ, সংসার-গত জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমরা ধর্ম্ম-গত জীবন লাভে প্রয়াসী। জানিয়াছ, আমরা সামান্য ভাবে থাকি, সামান্য কাজ করি;—দেশ-সেবা, নরনারীর সেবার জন্য আমরা সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্র-কুটীরে থাকিতেই ভালবাসি। এ পরিবারের লক্ষ্য, বলিয়াছি, মাতৃধাম। সেই মাতৃধামে যাওয়ার উপায় প্রেম-পরিবার সংগঠন করা। রাস্তা হইতে, পল্লী হইতে জগন্মাতার ছেলে মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়া আমরা বাল্যকাল হইতে প্রেম-পরিবার গঠনের চেষ্টা করিতেছি। আমাদের বসনের পারিপাট্য ও ভূষণের চাকচিক্য নাই, আহার বিহারের জাঁকজমক নাই—সামান্য খাই, সামান্য ভাবে থাকি। সর্ব্বজন আদৃত এই মহাসহরের মধ্যে এই দরিদ্র পরিবার ষোড়শ বর্ষ কেবল বিধাতার কৃপাবলম্বনে জীবন ধারণ করিতেছে। আমাদের সম্বল কেবল প্রার্থনা। যাহা নাই, তাহা পাই কেবল প্রার্থনায়। এ সকলই তুমি জান। বিধাতার কৃপাই আমাদের পান আহার, বসনভূষণ, সকলই। এ সকল জানিয়াও তুমি এই দরিদ্র পরিবারের সহিত একাত্মক হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা বিচ্ছিন্ন-পরিবার-প্রথার বিরোধী;—সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে আমরা সকলে এক প্রাণে বদ্ধ হইতে

চাই; বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গে যাইতেও অভিলাষী নই। এ সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি, তবুও তুমি আমাদের ঘরে আসিতেই প্রস্তুত হইয়াছ,ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। তুমি যাহাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, যখন তাহার বয়স চারিমাস, তখন তাঁহার পরমারাধ্যা মা স্বর্গে গমন করেন। সেই হইতে মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন, চিন্ময়ী জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। তাঁহাকে ধরিয়া, তাঁহার কোলে শুইয়া, তাঁহার কৃপায় লালিত পালিত হইয়া যে ব্যক্তি এত বড় হইয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিন্ময়ী মাকে ভালবাসিতে হইবে, এ সকল জানিয়াও তুমি যখন এই কুলে মিলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা আজ সানন্দে, সাদরে,সোৎসুক চিত্তে,আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে বরণ করিতেছি। তুমি প্রসন্ন চিত্তে, আমাদের সামান্য উপহার গ্রহণ কর এবং তৎসহ আমাদের ভালবাসা, অনুরাগ, শুভাশীর্ব্বাদ প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ কর। তুমি প্রসন্ন হইলে জগৎ প্রসন্ন হইবে, পিতৃকুল, মাতৃকুল প্রসন্ন হইবেন, স্বর্গে দেবতারা এবং মর্ত্ত্যে নরনারী প্রসন্ন হইবেন। তুমি প্রসন্ন হইলে, আমাদের বিশ্বাস, বিধাতা প্রসন্ন হইবেন। তুমি এই দরিদ্র পরিবারের সকলের প্রতি অনুরাগিনী হও, সকলকে ভালবাসার সহিত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ কর। পরকে আপন জ্ঞান করা বড়ই দুরূহ কাজ, অথচ বিধাতার ইচ্ছাই এই,এই পৃথিবীতে পরকে আপন করিতেই হইবে, পরের সহিত মিলিতেই হইবে। স্ত্রীপুরুষের মিলন ভিন্ন মানব পূর্ণাঙ্গ হয় না। পূর্ণাঙ্গ মানবই ধর্ম্মলাভে অধিকারী। বহু নদীর একীকরণ হইলে তবে সাগরের উৎপত্তি, বহু হৃদয়ের সম্মিলন হইলে তবে মহাচৈতন্যসাগরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর কল্পনার বস্তু নন্, তিনি প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত, মানব সম্মিলন-ধামে; অথবা মানব-সম্মিলন-ধামই তিনি।

শিক্ষা এই,—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে শত, ক্রমে সহস্র, ক্রমে লক্ষ, ক্রমে কোটি, ক্রমে অনন্ত। সান্তে আরম্ভ, অনন্তে পরিণতি। স্বামীকে ভালবাসিতে চাহিলে স্বামীর আত্মীয়দিগকেও তৎসহ ভালবাসিতে হইবে,তার পর আত্মীয়দিগের আত্মীয়দিগকে, তৎপরে তাঁহাদের আত্মীয়দিগকে, এইরূপে সীমা অসীমে ধাবিত হইবে। ভালবাসা যাহারা পায় নাই, ভালবাসা যাহাদের কথায়, তাহারা একথা বুঝে না; তাহাদিগকে একথা বুঝানও কঠিন। ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই এক, দুই, তিন, ক্রমে শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি শেষে অনন্ত পর্য্যন্ত পৌছিতে হইবে। মুখে ভালবাসা ভালবাসা করে, অথচ সম্মিলন-ধামে যে পৌছে নাই, সে প্রতারক, সে অনুদার, সে পরশ্রীকাতর, সে হিংসা-বিষজর্জ্জরিত।

প্রেম চিরস্থায়ী, ধ্রুব, অটল, অচল। প্রেম-সাধকেরা এই জন্য অটল, অচল, ধ্রুব। পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও প্রেম-সাধকের মত ও মন পরিবর্ত্তিত হয় না। প্রেম-শিক্ষার এক এক বিভাগের জন্য এক এক জন আদর্শের প্রয়োজন। সেই আদর্শ, এক পিতা, এক মাতা, এক স্বামী, এক স্ত্রী। এক চন্দ্র, এক সূর্য্য, এক ধর্ম্ম, এক ঈশ্বর। বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া, এক পিতা, এক মাতা, এক স্বামী, এক স্ত্রীতে অনন্তকাল ভক্তিমান ও অনুরাগী থাকিলে তবে প্রেম কি, বুঝা যায়। প্রেম-কেন্দ্র ঠিক থাকিলে তবে অনন্তের দিকে

যাওয়া যায়। ভালবাসার চাঞ্চল্য ধর্ম্মপথের মহাবিঘ্ন। জীবনে, মরণে, অনন্তকাল স্বামী স্ত্রী একাত্মক হইয়া প্রেম-সাধন করিবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া তোমাকে আমরা বরণ করিতেছি; আশীর্ব্বাদ করি এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায়, তুমি প্রেম-পথে অনন্তকাল স্থির, অটল, অবিচলিত থাক। প্রার্থনা করি, তুমি যে কুলে একাত্মক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, চিরকাল সেই কুলে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায়, অটল হইয়া থাক। সেই কুলের প্রাণ মন তোমার প্রাণমন হউক, সেই কুলের হৃদয় শরীর তোমার হৃদয় শরীর হউক; সেই কুলের সুখ সম্পদ, যশ গৌরব, দুঃখ বিপদ,তোমার সুখ সম্পদ, যশ গৌরব, দুঃখ বিপদ হউক; সেই কুলের প্রেম পুণ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার প্রেম পুণ্য,ধর্ম্ম কর্ম্ম হউক। এই কুলের ইচ্ছা-সাগরে তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা মিলিয়া একাকার হউক। তুমি পূর্ণাবয়বে অনন্তকালের জন্য একীভূতা হও।

বড় কঠিন কথা, বড় কঠিন সমস্যা। কঠিন তাহাদের পক্ষে, যাহারা কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে; সহজ তাহাদের পক্ষে, যাহারা সমস্ত ভার ঈশ্বরের শক্তির উপর বিন্যস্ত করে। বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবে,আমাদের আশা ভরসা কেবল বিধাতার কৃপা! ব্রহ্মকৃপা আমাদের যোগ তপস্যা, ব্রহ্মকৃপা জ্ঞান কর্ম্ম, ব্রহ্মকৃপা পান আহার। ঐ ব্রহ্মকৃপা-সরসীতে আজ স্নাত হইয়া সংসারের ভয় ভাবনা, মান অভিমান, ঘৃণা বিদ্বেষ, অনুদারতা সঙ্কীর্ণতা, এক কথায় সংসারের সকল কলুষরাশি ধৌত করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদের ন্যায় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হও, পদ্মপুষ্পের ন্যায় কোমল ও স্থায়ী সৌরভযুক্ত হইয়া নামের সার্থকতা কর, বৃক্ষের ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণু ও উদার হও। শুভ্র বসন, এদেশে,পবিত্রতার নিদর্শন, আমরা তাই আজ তোমাকে শুভ্র বসন, শুভ্র সুগন্ধি ও শুভ্র পুষ্প উপহার দিয়া বরণ করিতেছি। তুমি আজ হইতে শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র হও। তুমি আজ হইতে উদার, বিনীত, সংযত ও মিষ্টভাষিণী হও। ব্রহ্মকৃপায় স্নাত হইয়া আমাদের বরণ-মালা ইত্যাদি তুমি সাদরে গ্রহণ কর; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুভ ইচ্ছা, শুভ কামনা তুমি গ্রহণ কর। বিধাতা আমাদের সকলের মস্তকে আজ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাদর আবাহন ও গ্রহণ।

২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার—১৩০২ সাল।

* * *—* * *,

আমরা আজ সপরিবারে ও সবান্ধবে মিলিয়া, সস্নেহে, সমাদরে, সপুষ্পে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া, তোমাদিগকে এই পরিবারে আবাহন ও গ্রহণ করিতেছি। তোমরা এতদিন, সংসার-প্রান্তরের এ-পথে সে-পথে, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, লক্ষ্য-হারা হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলে; এত দিন পরে, বিধাতার অযাচিত করুণায়,অতুল দয়ায় তোমরা সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মপথের সহায় পাইয়াছ, বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, একাত্মক হইবার ব্রত লইয়াছ, তোমাদের পবিত্র যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিশেষরূপ আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে বিশ্বপতিকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। বিধাতা তোমাদিগের জীবন-পথের

সহায় হউন এবং তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন।

জগতের অন্তরালে দুই শক্তি,প্রকৃতি এবং পুরুষ,—জ্ঞান আর প্রেম,চিৎ আর আনন্দ। দুই মিলিলেই পূর্ণাঙ্গ হয়। দুই শক্তি যতদিন পৃথক্,ততদিন অপূর্ণ,ততদিন দুর্ব্বল, ততদিন অপটু, ততদিন অক্ষম, ততদিন অন্ধ। দুই মিলনে মহাবল সৃজিত হয়। দুই মিলিলেই পূর্ণাঙ্গ সত্তার উদ্ভব হয়। সেই মিল, একীকরণ। যদি দূর-দূর-ভাব থাকে, যদি সঙ্কোচ থাকে,যদি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকে, তবে সেই মিল হয় না। এই দুই শক্তিরই বিশেষত্ব আছে, এক অন্যকে নিন্দা করিতে পারে না, এক অন্যকে পরিহার করিয়া চলিলে সংসার চলে না। কেন না, দুই একেরই শক্তি। এজগতে কিন্তু দুই শক্তিতে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। সে বিবাদের মূল,সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কার। তোমরা যদি মিলিয়াছ, তবে আমরা আশা করি, মিলনের এই দুই অন্তরায় তোমরা অন্তর হইতে চিরদিনের জন্য উৎপাটন করিয়া ফেলিবে। সঙ্কীর্ণতা ভুলিবে,অহঙ্কার ভুলিবে, অবিশ্বাস ভুলিবে, তবেই পূর্ণাঙ্গ মিলন হইবে। যে মিলন অনন্তকাল-স্থায়ী, আমরা সেই মিলনের কথা বলিতেছি। যে মিলনে ব্রহ্ম-যোগ, ব্রহ্ম-লাভ সহজ হয়, আমরা সেই মিলনের কথা বলিতেছি। বিবাহ মানুষের পরিণাম নয়, বিবাহ লক্ষ্য-পথে যাওয়ার অবলম্বন মাত্র। বিবাহ করিয়া যাঁহারা তাহা ভুলিয়া কেবল সংসারের সুখ অন্বেষণ করে, তাঁহারা প্রতারিত হয়, তাঁহারা দুবৎসর দশবৎসর পরেই সংসারকে বিষময় জ্ঞান করে; এক বিবাহের পর আবারও পুনঃ পুনঃ বিবাহের জন্য ব্যস্ত ও অধীর হয়। মিলন, লক্ষ্য পথে যাওয়ার উপায় মাত্র। লক্ষ্য, প্রতি মানুষের সৎ বা অনন্ত জীবন লাভ, অথবা ব্রহ্ম-যোগ। মনে রাখিবে, ব্রহ্মযোগের জন্য বিবাহ। আশা করি,তোমরা তাহা কখনও ভুলিবে না। লক্ষ্য ভুলিয়া, উপায় লইয়া যাহারা মজে, তাহারা রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ বিষাদময় পৃথিবীতে নানা অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়। তোমরা উভয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। এ পৃথিবী কেবল সুখময় পুষ্পশয্যায় শোভিত নহে, কণ্টকময়ও বটে। সাবধান, সাবধান, কদাচ লক্ষ্য ভুলিবে না।

নরনারী মিলিয়া যখন পূর্ণাঙ্গ হয়,তখন অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা, অপটুতা,অক্ষমতা চলিয়া যায়, তখন মহাশক্তি অবতীর্ণ হয়। মানুষের ক্ষমতা কি জন্য, জান কি? বিশ্বেশ্বরের বিশ্বের সেবার জন্য। বিশ্বপতি আপনি বিশ্বের মঙ্গল সাধনের জন্য অস্থির, মানুষকেও বিশ্ব-সেবার অধিকারী করিয়াছেন। মানব-জীবন পাইয়া যে ব্যক্তি পরের ভাবনা আপনার ন্যায় না ভাবে, তাহার ও পশুর জীবনে কোনই পার্থক্য নাই। প্রকৃত মানুষ সে, পরের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে। পরের ভাবনা, পরের চিন্তাকে যে ব্যক্তি আপনার করিতে পারে, সে-ই মহাপ্রেমের অধিকারী। প্রেম,কথাটা শূন্যার্থক তাহার নিকট,যে অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আপনার হৃদয়কে অপরের হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়াতেই সুখ। কোন কামনা না রাখিয়া যে ব্যক্তি অন্যের প্রাণে ডুবিতে পারে, সে-ই বুঝিয়াছে,প্রেম কি? কোন স্বার্থ না রাখিয়া যে ব্যক্তি পরের শুভকামনা করিতে পারে, সে-ই জানে, ভালবাসা কি? অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্ট, ঘৃণার পরিবর্ত্তে সদ্ভাব, বিদ্বেষের

পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি সদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অম্লানচিত্তে অপরের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, সে-ই বুঝিয়াছে,প্রেম কি ? পশুরাও নিজেরা সুখে খায়, সুখে বিচরণ করে, সুখে ইন্দ্রিয়-চালনা করে। নিজের সুখ অপরের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়াতেই মনুষ্যত্ব। পরিবার-সেবা,সমাজ-সেবা, দেশ-সেবায় যে প্রেমের আরম্ভ, বিশ্ব-সেবায় সেই প্রেম যখন পরিণত হয়, তখনই —কেবল তখনই ব্রহ্ম-যোগ সম্ভব। আর যে সকল ব্রহ্মযোগের কথা এ জগতে শুনা যায়, তাহা কল্পনা-মূলক। আমরা আজ বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক, আমাদের সমগ্র হৃদয় তোমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া, এই অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমাদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পরিবার-সেবা, সমাজ-সেবা,দেশ-সেবা-ব্রত উদযাপন করিতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব-সেবা ও ব্রহ্মযোগের জন্য প্রস্তুত হও। আমরা আশা করি, আমরা যাহা সাধন করিতে পারি নাই,তোমরা বিধাতার কৃপায়, নবজীবনে,বিশ্ব-সেবার সেই সকল অঙ্গ সাধন করিয়া এ পরিবারের,এ সমাজের,এ দেশের, এ বিশ্বের আদর্শ হইবে।

এই অসাধ্য সাধনে, নিজদিগের শক্তির উপর মোটেই তোমরা নির্ভর করিবে না। ব্রহ্মকৃপাই একমাত্র শক্তি, যাহাতে সকল অসাধ্য সাধিত হয়। ঐ কৃপার-সরসীতে অবগাহন কর, সাধন সহজ হইবে। অবনত মস্তকে তোমরা উভয়ে, করযোড়ে ব্রহ্ম-কৃপা-প্রার্থী হইয়া দিবানিশি চাহিয়া থাকিবে। তিনি কৃপাময়, তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার নিকট অনন্যগতি হইয়া যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় ; এ কথা বিশ্বাস করিবে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিবে, তবেই সাধন সহজ হইবে। অনন্যগতি হইয়া কেবল প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনায় সকলই পাইবে।

এই পরিবার, এই ব্রাহ্মসমাজ, এই বঙ্গ-প্রদেশ অভাব-সাগরে ভাসিতেছে। আমরা অনেক আশা করিয়া তোমাদিগকে আজ সাদরে গ্রহণ করিতেছি, দেখিও যেন এ পরিবার,এ সমাজ,এ দেশের মুখ তোমাদের দ্বারা উজ্জ্বল হয়। দেখিও, তোমাদের পুণ্য-ময় আদর্শ-জীবন দেখিয়া যেন আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। তোমরা আমাদের সকলের শুভাশীর্ব্বাদ সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের হৃদয় ও মন অধিকার কর। সকলকে নবভাবে আপনার করিয়া লও। স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ-ব্রত শিক্ষা কর। সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা মস্তকে লইয়া,নববলে বলীয়ান্ হইয়া, নব দাম্পত্য জীবন যাপন কর, এবং দিন দিন ব্রহ্মযোগে যোগী হও। বিধাতার মহান্ ইচ্ছা তোমাদের যুগল-জীবনে পূর্ণ হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাঙ্গা বীণা

একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আমার এ দুঃখের গান, এ বিষাদ-সঙ্গীত আর কত কাল গাইব ? যে গান কেহ শুনে না, যাহাতে কাহারও এক বিন্দু অশ্রুপাত হয় না, সে গান কি অবিশ্রান্ত গাওয়া যায় ? দিন নাই রাত্রি নাই, মাস নাই বৎসর নাই,

অবিরত দুঃখের গান—কতদিনে এ বেসুর বীণা নীরব হইবে, কত দিনে এ বেলয় ঝঙ্কার দিগন্তব্যাপী ব্যোমে মিশিয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা, পর্ব্বত সমুদ্র, অরণ্যক্ষেত্রকে শ্রোতা ও সাক্ষী করিয়া অন্তঃসার-শূন্য ভাঙ্গা বীণায় গান করা আর চলে না! মনে করি, এ গান এই খানেই সমাপ্ত করি; কিন্তু তাহা পারি কৈ? সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বীণার তার ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠে—গভীর রজনীতে যখন সমস্ত জগৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখনও বিরাম নাই। কি রাগ আলাপ করি—কি গান গাই? নিজেই তাহা বুঝি না—হরি বোল হরি, তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? বুঝাইতে পারিলেই কি কেহ বুঝিতে চাহে? বুঝিতে চাহিলেই কি কেহ বুঝিতে পারে? যে নিজের ভাষা বুঝে না, সে অন্যের ভাষা কি প্রকারে বুঝিতে পারে, আমি ত তাহা বুঝি না। আমরা সকলেই মূর্খ, মহামূর্খ—আমরা নিজের ভাষা বুঝি না, অন্যের ভাষা আমাদিগের নিকট গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। মানুষে আমার ভাষা বুঝে না বলিয়াই লোকালয়ে আমার মুখ ফুটে না, বীণার ঝঙ্কার তেজ করিয়া উঠে না, রাগ রাগিণীর তরঙ্গ ছুটে না—পূর্ণ ভৃঙ্গার ভূপতিত হইলে যেমন নিঃশব্দে তাহা হইতে জল বাহির হইয়া যায়, লোকালয়ে আমার গান তেমনই ভাবে ঝরিতে থাকে। এই কারণে আমি লোকালয় অপেক্ষা নির্জ্জন স্থান ভাল বাসি, সহানুভূতিশূন্য মনুষ্য সমাজ অপেক্ষা নির্ব্বাক্ প্রকৃতি-সমাজ আমার আদরের সামগ্রী। মানুষে মানুষে সহানুভূতি নাই; কিন্তু প্রকৃতি তাহাতে কৃপণ নহে—নদীস্রোত আমার অশ্রুজলের সঙ্গে কুলু কুলু শব্দে রোদন করে, সমীরণ আমার দীর্ঘশ্বাসে যোগ দেয়। মানুষ চিরকাল মানুষই থাকিবে—সহানুভূতিশূন্য মানুষের দেবোপম হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রকৃতির সহানুভূতি আছে বলিয়া উহা অচেতন জড় পদার্থ হইয়াও দেবতা—বোধ হয় সহানুভূতির জন্যই দেবতা বলিয়া প্রাচীনকালে উহারা পূজ্য ছিল। আমি শীতে মরিতেছি, তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইলাম; তুমি একখানি বস্ত্র দেওয়া দূরে থাক্, আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলে; কিন্তু সূর্য্যদেব আমাকে অবশ্যই উত্তাপ দিবেন—এমন অবস্থায় তোমাতে দেবভাব বিদ্যমান বলিব, না সূর্য্যদেবে বলিব? সহানুভূতির আগার যে হৃদয়, তাহা মনুষ্যের নাই—শোণিত চলাচলের জন্য auricle ventricle বিশিষ্ট জড় অচেতন হৃদয় আছে মাত্র। প্রকৃতির সে প্রকার হৃদয় না থাকিলেও প্রকৃতিকে সহৃদয় বলি। যাহার হৃদয় আছে, সে ভিন্ন আর কি কেহ পরের জন্য কাঁদিতে জানে? মানুষের হৃদয় থাকিলেই মানুষ দেবতা হইতে পারে—খ্রীষ্টদেব, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মারা মনুষ্যের দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা। আর তুমি আমি, রাম শ্যাম হস্ত পদ বিশিষ্ট মানুষ, কেবল তন্নামধারী—পশুর অতি নিকট কুটুম্ব। তুমি মহামহোপাধ্যায় হও, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হও, হৃদয়বান না হইলে তুমি মূর্খ, মহামূর্খ—পুস্তকের কীট হইতে পার; কিন্তু জ্ঞানোপার্জ্জন তোমার ঘটে নাই। সেইজন্য বলিতেছিলাম, আমার এ গান শুনিবার শ্রোতা মনুষ্য সমাজে নাই। মানুষ সুখের পায়রা, দুঃখের কেহ নহে। সুখের সুখী অনেক মিলে, কিন্তু দুঃখের দুঃখী মিলে না, ঐ বড় দুঃখ! সকলেই বস-

হইলে এ জগতের চৌদ্দ আনা হাহাকার নিবারিত হইত। প্রকৃতি অবশ্য দুঃখ বুঝে সত্য; কিন্তু আমি যে তাহার সহানুভূতি-পূর্ণ ভাষা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারি না! সুতরাং তাহার কাছে এ দুঃখের গান গাহিয়াও সুখ হয় না; তবে যখন গাহিতেই হইবে, তখন মনুষ্যের কাছে গাওয়া অপেক্ষা প্রকৃতির কাছে গাওয়া ভাল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি এবং সেই জন্যই চাঁদ যখন আধ হাসি হাসিয়া মেঘের কোলে মুখখানি ঈষৎ লুকায়, আমি তখন বৃক্ষলতার মধ্যে বসিয়া আমার ভাঙ্গা বীণায় ঝঙ্কার দিই। কিন্তু বল দেখি, যাহার ভাষা বুঝি না, তাহার সহানুভূতিতে কি সুখ পাওয়া যায়? তবে মানুষের কাছে এ বিষাদ-সঙ্গীত গাহিলে কেহ শুনে না, প্রকৃতির কাছে গাহিলে সে শুনে। হরি! হরি! মানুষে আমার বিসাদ-সঙ্গীত শুনিবে কি! মানুষ যে আপনার বিষে আপনি জর-জর! প্রকৃতির সুখ দুঃখ উভয়ই সমান; সুতরাং দুই দণ্ড কাণ পাতিয়া আমার দুঃখের গান শুনে এবং হায় হায় করে।

মানুষ মাত্রেই কাঁদে—কাঁদিবার জন্যই বুঝি মানুষের জন্ম—আমরা কাঁদিয়া ভূমিষ্ঠ হই, কাঁদিয়া সংসার ত্যাগ করি এবং যত দিন সংসারে থাকি, ততদিন কেবল কাঁদিয়াই বেড়াই। সকলেরই দুঃখের ভরা ভরপুর; সুতরাং পরের দুঃখ আপনার হৃদয়ে পুরিবার স্থান হয় না। কিন্তু কথা এই যে, আমরা সকলেই কাঁদি কেন? কাঁদিবার জন্যই কি আমাদিগের জন্ম? কাঁদিবার জন্যই যদি বিধাতা আমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠান, তাহা হইলে তিনি ত অতি নির্দ্দয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তই কি যথার্থ? তাহা হইলে আর কাহার কাছে কাঁদিব—কি জন্যই বা কাঁদিব? তাহা হইলে যে, সমস্তই রসাতলে যায়—ইহকাল পরকাল সমস্তই ভাসিয়া যায়, দর্শন-বিজ্ঞান অগাধ জলে ফেলিয়া দিতে হয়! বিধাতার নির্দ্দয়তা সম্ভব নহে—তিনি নির্গুণ, মুক্ত পুরুষ, কোন গুণেরই অধীন নহেন। দুঃখ বল, সুখ বল, আমাদিগের যাহা কিছু, আমরাই তাহার মূল। এ জন্মে আমরা কেবল জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলভোগ করি এবং পুনরায় কর্ম্ম বীজ বপন করি। আমরা অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যে কর্ম্মবীজ বপন করি, তাহার ফল কেবল দুঃখ, নিরবচ্ছিন্ন রোদন—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক আমরা সমস্ত মহারত্ন লইয়া আসি সত্য, কিন্তু একা অহঙ্কার সকলকে ভাসাইয়া দিয়া স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বর হইয়া আমাদিগের দুঃখের পথ পরিস্কার করিয়া দেয়। পাছে আমরা জীবনপথে কষ্ট পাই, এই আশঙ্কায় বিধাতা আমাদিগকে অনেক সম্পত্তি দিয়া পৃথিবীতে পাঠান; কিন্তু আমরা এমনই মহামূর্খ যে, অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকলই হারাইয়া বসি—কুমন্ত্রী-বেষ্টিত রাজকুমারের রাজ্যনাশের ন্যায় সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়! আমাদিগের কর্ম্মগুণে সকলই যায়; যে মনকে আমরা জয় করিতে আসি, সে আমাদিগের উপর আধিপত্য করে, আর সকল মহারত্ন একে একে ভাসিয়া যায়; থাকে কেবল ইহ-পরজন্মে ভোগ করিবার জন্য দারুণ দুর্ণিবার দুঃখ—দুঃখ, অশান্তি, যন্ত্রণা!

যে স্বাধীন ইচ্ছা বা পৌরুষের গুণে আমরা স্ব স্ব কর্ম্ম বাছিয়া লই, কেহ কেহ বলেন যে, বিধাতা আমাদিগকে তাহার অধিকারী করিয়া ভাল করেন নাই; কেন না, সেই ইচ্ছার দোষেই আমরা কুপথগামী হই। এটা পাগলের কথা! যাঁহারা বিধাতাকে সঙ্কীর্ণ

করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহাদিগের কথা। স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া তিনি ভাল করেন নাই, বল কেন? তিনি যেমন তোমাকে কুখাদ্য খাইবার ইচ্ছা দিয়াছেন, তেমনই ত সুখাদ্য খাইবারও ইচ্ছা দিয়াছেন—তুমি সুখাদ্য না খাইয়া কুখাদ্য খাইয়া পীড়াগ্রস্ত হইলে দোষ তোমার না তাঁহার? তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা আপন দোষেই কাঁদিয়া থাকি, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলেই দুঃখ ভোগ করি। অহঙ্কার হইতেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইল—'আমি' 'আমি' করিয়াই মরিলাম! আমি কে, তাহা জানি না; তথাপি মনে করি, আমিই যেন জগতের সর্ব্বস্ব। আমি কে?—এ জগৎ কি পদার্থ?—এ জ্ঞান মানুষের কবে হইবে? এ জ্ঞান যত দিন না হইবে, তত দিন জগতে আমি কেবল এই আদি-অন্ত-মধ্য-শূন্য বিষাদ-সঙ্গীত গাহিয়াই বেড়াইব। আপনাকে কেন্দ্র করিয়া সংসার পরিধিতে কোটি কোটি যুগ ভ্রমণ করিলেও সুখের সম্ভাবনা নাই, এ বিষাদ-সঙ্গীত নিবারিত হইবারও আশা নাই। অহঙ্কার যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি রিপুগণের রাজা, তাহাদিগের ক্ষুধা কখন নিবারিত হইবার নহে, কেহ কখন তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহাদিগের পরিতৃপ্তিতে যে সুখ, তাহা কখন মানুষের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু আমরা এমনই অবোধ যে, তথাপি তাহাদিগের মোহিনী মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আছি—এ নেশার ঘোর কোন প্রকারেই কাটাইতে পারিতেছি না। আমরা সকলেই এই ঘোর নেশায় আচ্ছন্ন; সুতরাং কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে সহানুভূতি করে? সেই জন্যই বলিতেছিলাম, মানুষে আমার এ গান শুনে না, বুঝে না, আমার সহিত কেহ এক বিন্দু অশ্রুপাত করে না।

কিন্তু কথা এই যে, এ বিষাদ সঙ্গীত যে রাগিণীতে আমরা ধরিয়াছি, সে রাগিণীর কি পরিবর্ত্তন নাই? চেষ্টা করিলে আমরা কি এই ললিত-ভৈরবী রাগিণীকে ঝিঁঝিট-খাম্বাজে পরিণত করিতে পারি না? বীণার তার ছিন্ন করিয়া তিন গ্রাম বিশিষ্ট সপ্তস্বরকে শব্দবাহী ব্যোমে মিলাইয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু তাহা সামান্য মানুষের দুই এক জন্মের চেষ্টায় ঘটিয়া উঠা বড় কঠিন কথা—জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ফলে তাহা যোগী ঋষির পক্ষেই সম্ভব। আমরা সে প্রকার নীরব বীণার শান্তি গানের কথা বলিতেছি না, তাহা সংসারে গাওয়া যায় না, সংসারকে তাহা শুনাইতে হয় না। আমরা সাংসারিক গানের কথা বলিতেছি—তবে যে রাগিণীতে আমরা সকলেই গান ধরিয়াছি, সেই রাগিণীর পরিবর্ত্তন করিলে এমন করিয়া হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হয় কি না, তাহাই বিবেচ্য। আপনাকে কেন্দ্র করিয়া যে গানে সুখ নাই, তাহা ত সকলেই দেখিতেছি—এখন কথা এই যে, আপনার স্থলে পরকে বসাইয়া সুখের অনুসন্ধান করিলে, তাহা মিলিতে পারে কি না?

মানুষ স্বভাবতঃই হৃদয়বান সত্য, কিন্তু জড় সহবাসে হৃদয় জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহাকে রীতিমত কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য অনুশীলন আবশ্যক। অনুশীলন ব্যতিরেকে যেমন কোন বৃত্তিরই উন্নতি নাই, হৃদয়ের পক্ষেও তদ্রূপ। বিনানুশীলনে তাহা জড় সহবাসে জড়ভাবাপন্ন হয় এবং প্রকৃত হৃদয়ের কাজ তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় না—কাঠ খড় সহবাসে হৃদ-

য়ের রস যদি কাঠ খড়ে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা প্রকৃত হৃদয়ের কাজ কি প্রকারে সম্ভবে? হৃদয় যে সহবাস-জনিত দোষে দুষিত হয়, ইংরাজ সহবাসে আমাদিগের হৃদয়ের কাঠিন্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইংরাজ জড়-জীবনজাতি, জড়ত্বই তাঁহার অস্থি মজ্জা, হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক অতি অল্প। প্রায় দেড় শত বৎসর আমরা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া কি প্রকার জড়জীবন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সহজেই একজন প্রাচীন ব্যক্তির হৃদয়ের সহিত একজন নব্যসম্প্রদায়ের লোকের হৃদয়ের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে লোকে যে প্রকার দানশীল ও পরদুঃখকাতর ছিল, এক্ষণে আর তেমন নাই—পাশ্চাত্য সভ্য জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতাই যে এই হৃদয়হীনতার হেতু, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যাহাতে এই হৃদয়হীনতার ধ্বংস হয় এবং মনুষ্য হৃদয় ইট পাথরে পরিণত না হইয়া হৃদয়ই থাকে, তজ্জন্য অনুশীলন আবশ্যক। বিপদাপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে আহার প্রদান, পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ দান ও তাহার সেবা করা, সর্ব্বজীবে সমভাবে দয়া প্রকাশ, যথা পাত্রে স্নেহ প্রীতি ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি হৃদয়ের কার্য্যের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক। এই সকল কার্য্যে যে কি আনন্দ, কি সন্তোষ, কি সুখ, কি চিত্তপ্রসাদ, তাহা বোধ হয় সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে টুকু হৃদয়ের কার্য্য করি, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া নীরস হৃদয় লইয়া আমরা প্রত্যহ যে সামান্য হৃদয়ের কার্য্য করি, তাহা বস্তুতঃই অতি সামান্য, জীবনের সম্পূর্ণ সুখ সন্তোষ তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন করিলে অর্থাৎ আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিলে এবং তাহাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে, আমরা সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারি—এমন করিয়া ভাঙ্গা বীণা লইয়া হায় হায় করিয়া দুঃখ-মাখা, ঔদাসীন্য-জড়িত বিষাদসঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতে হয় না। এবম্প্রকার সুখ শান্তি উপার্জ্জন করিবার পক্ষে কোন অন্তরায় দেখা যায় না—ধন জন হৃদয়বানের কাছে অতি তুচ্ছ সামগ্রী। যেখানে অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক, সেখানে নিজের ভাণ্ডার শূন্য হইলে ভিক্ষা করিতে আপত্তি কি? পরকে হৃদয়ে পূরিতে পারিলে মান অপমান জ্ঞান থাকে না, আপ্ত পর বিবেচনা হৃদয়ে স্থান পায় না। আপনাকে ভুলিলে পরের সুখে সুখী হইতে পারা যায় এবং পরের দুঃখ বিমোচনই জীবনের উদ্দেশ্য হইলে নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই জ্ঞান হয় না। এক দিনে পরকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সুখী হওয়া যায় না, একেবারে সুখের রত্নাকর করায়ত্ত হয় না। হৃদয়কে ক্ষুদ্র হইতে মহৎকার্য্যে ক্রমে উন্নীত করিতে হইবে অর্থাৎ হৃদয়ের অনুশীলন আবশ্যক। অদ্য একজন ভিক্ষুককে কিছু দান করিলাম, কল্য দুই জনকে, পরশ্ব পাঁচ জনকে, এই প্রকারে ক্রমে আপনার মুখের অন্ন অপরকে দিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায়। নিয়ম পূর্ব্বক প্রত্যহ কিছু দান করা আবশ্যক, বিপদাপন্নের উপকার করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে অন্যকে সুখী করা যাইতে পারে, তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা বিধেয়। প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক সামান্য সামান্য

কাজ করিলে এক দিন যে আমার দ্বারা, সমগ্র জগতের না হউক, সমগ্র মনুষ্য সমাজের না হউক, অন্ততঃ দশ বিশ জনেরও মহদুপকার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বালক সন্দেশ খাইবার জন্য মাতার নিকট হইতে একটী পয়সা পাইয়া যদি হৃদয়ের সহিত একজন ক্ষুধিত ভিক্ষুককে দান করে, তাহা হইলে তাহার যে আনন্দ হয়, জগতের সমস্ত সন্দেশ তাহার করায়ত্ত হইলেও বোধ হয় তেমন আনন্দ হয় না। বাল্যকাল হইতে এই ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিলে কালে সে হৃদয়ের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে এবং সে হৃদয়কে কখন দুঃখের মুখাবলোকন করিতে হয় না। পরোপকারে ব্রতী হইলে জগতের কোন কষ্টই কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হয় না—জগাই মাধাইকে "হরি, হরি" বলাইবার জন্য কলসীর কানার দ্বারা প্রহার ও রুধিরস্রাবকে চৈতন্যদেব আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই।

পরকে হৃদয়ে পূরিয়া বিমলানন্দ উপভোগের অভিলাষী হইলে আপনাকে ভুলিতে হয়—'আমি' বলিয়া সংসারে যে কাহারও অস্তিত্ব আছে, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। স্বার্থ ও পরার্থের এমনই সম্বন্ধ যে,একের অধিকার বিস্তৃত হইলেই অপরটী তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে—পরার্থপরতা যাঁহার ব্রত, স্বার্থকে বলি দিতে তাঁহার কোন কষ্টই হয় না, 'আমার' বলিতে যাহা কিছু, পরের জন্য সকলই ত্যাগ করিতে তিনি কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না। ত্যাগ স্বীকারই পুরুষার্থ ও অমৃতলাভের একমাত্র উপায়, এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ ধন, জন ও কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা অমৃত লাভ হয় না; উহা কেবল ত্যাগস্বীকারের দ্বারাই লাভ করা যাইতে পারে। আপনার অস্তিত্ব যদি পরে মিশাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কি রহিল? অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া লয়প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখ ভোগের জন্য কে থাকিবে? যতক্ষণ 'আমি' 'আমার' এই জ্ঞান, ততক্ষণই দুঃখ; তাহার পর আর দুঃখ নাই, কেবল নির্ম্মল চির আনন্দ! যদি আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে এক পরমাত্মাই আমার আশ্রয়—অন্য অবলম্বন কোথায়? কিন্তু তিনি কি, তিনি কোথায়, তাঁহার কি সত্তা, তাহা জানিবার সদুপায় কি? এ সকল জানিতে পারিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না, সংসারে অন্য কর্ম্ম থাকে না—এ সকল জ্ঞান পরমযোগী ব্যতিরেকে অন্যের সম্ভবে না; কিন্তু সংসারাশ্রমে যে তাহার আভাস পাওয়া যায় না, তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সত্য অবলম্বন করিয়া জগতের প্রিয়কার্য্যে রত থাকিলেই তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বরজ্ঞানের অভাবে বিশ্বপ্রেম যে পরম আনন্দ, তাহা ঘোর নাস্তিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। দুঃখকে নষ্ট করিয়া পরম আনন্দ লাভই যখন মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তখন বিশ্বপ্রেম ব্যতিরেকে তাহা আর কোথায় মিলিতে পারে? মনুষ্য জাতিকে প্রীতি করা এবং সর্ব্বজীবে দয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, মনুষ্যহৃদয়কে স্বর্গের দ্বারে লইয়া যায়—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সামান্য স্ত্রীপুত্রের প্রেমে যখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করা যায়, তখন সর্ব্ব জীবে প্রীতিতে যে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহাতে কে সন্দেহ করে? কিন্তু কথা এই যে, বিশ্বপ্রেমে

প্রতিদানের আশা করিলে চলিবে না—বিশ্বপ্রেমে প্রতিদানের আশা থাকিতে পারে না; —যেখানে প্রতিদানের প্রত্যাশা, সেইখানেই ষোল আনা অহঙ্কার—অহঙ্কার থাকিতে বিশ্বপ্রেম জন্মে না। যে প্রেমে প্রতিপ্রেমের আশা আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা সামান্য ভেলা মাত্র, তাহা লইয়া সমুদ্রযাত্রা করা যায় না। যাহাকে ভালবাসিব, স্নেহ করিব, তাহাকে কেবলই ভালবাসিব স্নেহ করিব, প্রতিদানে সে আমাকে ভালবাসিবে, স্নেহ করিবে, এবম্প্রকার বিনিময়ে আনন্দ জন্মে না, কারণ আমি যাহাকে ভালবাসিলাম, সে যদি আমাকে তাহার প্রতিদান না দিল, তাহা হইলে আর আমার দুঃখের সীমা থাকে না। দুঃখ নাশের উদ্দেশে যে প্রেম, তাহাতে প্রতিদান নাই, তাহা কেবলই নিঃস্বার্থ প্রেম। যদি বিনিময়ের আশা ত্যাগ করিয়া কখন কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তবেই বিশ্বপ্রেমের আভাস পাইয়াছ, নতুবা কেবলই ভূতের বোঝা বহন করিয়া মরিয়াছ—ভাঙ্গা বীণায় কেবলই আমার মত বিষাদ-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইয়াছ, অথবা বেড়াইবে।

কিন্তু কথা এই যে, প্রতিদানের প্রত্যাশায় ভালবাসায় সুখ নাই কেন? অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, অহঙ্কার বশতঃ প্রতিদানের আশায় ভালবাসিয়াও তাহার প্রতিদানে সুখ পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালবাসিয়া যেমন সুখী করিয়াছি, তুমিও আমাকে ভালবাসিয়া তদ্রূপ সুখী করিয়াছ। যদি এমনই হয়, তাহা হইলে অহঙ্কার থাকিলেই বা ক্ষতি কি? প্রতিদানের আশায় ভালবাসায় দোষ কোথায়? হরি! হরি! এমন প্রেমে সুখ কোথায়? এ সুখ কয় দিনের? মনে কর, আজ তোমার ভালবাসার পাত্র জীবনলীলা সাঙ্গ করিল—কালি তোমার কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! অহঙ্কার থাকিতে তুমিই কি তাহাকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারিবে? তাহার উপর তুমি যাহাকে আমার বলিয়া জান, তাহাকে যদি অন্যে ভালবাসে, তাহা হইলে তুমি কি ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিবে না? কিন্তু যে প্রেমে অহঙ্কার নাই, সে প্রেমে এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই; সুতরাং তাহা নির্ম্মল, পবিত্র ও সরল সুখের নিদান—অহঙ্কারই যদি না থাকিল, তাহা হইলে বিধির নির্ব্বন্ধে তুমি বা আমি পৃথিবী ত্যাগ করিলে আমার ক্ষতি কি, তোমাকে সহস্র জনে ভালবাসিলেই বা আমার কি? আমার কার্য্য আমি করিয়া যাইব, তাহার জন্য আবার প্রতিদান কি? এমনই করিয়া যদি জগৎকে ভালবাসিতে পারি, তাহা হইলে আমি যখন যে অবস্থায় যেখানে থাকি না কেন, সকল অবস্থায় ও সকল স্থানেই সুখী হইতে পারি। আজ আমি আত্মীয় স্বজন বিরহিত হইয়া প্রবাস যন্ত্রণায় ভাঙ্গা বীণায় যে গান ধরিয়াছি, বিশ্ব-প্রেমে মাতিতে পারিলে তাহা ধরিতে হইত না; কেন না, তাহা হইলে জগতের সকল স্থানই আমার স্বদেশ বলিয়া বিবেচিত হইত, প্রত্যেক মনুষ্যে আত্মীয় স্বজন দেখিতাম।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কামনা বিনাশেই মনুষ্যের সুখ। কামনা বিনাশ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোগ হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহাকে আমি সুখ উপাধি দিতেছি না, তাহাকে শান্তি বা নির্ব্বাণ বলি—সে অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। আমরা যে সুখের কথা বলিতেছি, তাহা যে কামনাযুক্ত, সম্পূর্ণরূপে

তাহা বলিতে পারি না ; কেন না ; বিশ্ব-প্রেমকে হৃদয়ে পূরিলে আমি ফলের প্রত্যাশা করি না—কার্য্যের কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক, আমি কেবল কর্ম্ম করিয়া যাই। সুতরাং জীবের মঙ্গলের ইচ্ছাকে কামনা বলিতে পারি না। ইহাকে যদি কামনা বলা যায়, তাহা হইলে নির্ব্বাণ-প্রয়াসীরও কামনার ধ্বংস হয় না ; কেন না তিনি পরমাত্মার সন্দর্শন লাভের কামনাতেই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া থাকেন। অহঙ্কারপূর্ণ যে কামনা, তাহাই কামনা পদবাচ্য—আমার পুণ্য সঞ্চয় হইবে, ইত্যাকার জ্ঞানের সহিত যদি কেহ দান করে, তাহা হইলে সে দানকে কামনা শূন্য বলিতে পারি না—কেবল দানের জন্যই দান করিতেছি, এবম্প্রকার জ্ঞানের সহিত দান করিলে আর সে দানকে কামনাযুক্ত বলা যাইতে পারে না। সুতরাং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাকে আমরা কামনা-রহিত বলিতে পারি ; কেন না, তাহাতে আমি কর্ম্মফলের প্রত্যাশী নহি। তাহাতে আমি সুখের অধিকারী হই সত্য, কিন্তু আমার সুখ হইবে বলিয়া পরোপকার করা, ভস্মে ঘৃতাহুতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিঃস্বার্থ পরোপকার ভিন্ন অন্য পরোপকারে সুখও নাই। সুখের জন্য পরোপকার নহে—পরোপকারের জন্যই পরোপকার হইলে তবে সুখ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যাহা নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, অর্থাৎ যাহাতে অহঙ্কার নাই, বা আমি করিতেছি, আমার জন্য করিতেছি, ইত্যাকার জ্ঞান নাই, তাহার পরিণাম সম্পূর্ণ সুখ বা বিমল আনন্দ। এই বিমল আনন্দই মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য –ইহা ব্যতিরেকে সকলই দুঃখ সন্তাপ, সমস্তই ভাঙ্গা বীণার বিষাদ-সঙ্গীত।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

সৃষ্টি-রহস্য।

শূন্যে কৈলাস-পুরী।
ভূতগণের আবির্ভাব।

নন্দী।—বল হর হর বম্ বম্ বম্—
হোক্ প্রতিধ্বনি কাঁপাইয়া ব্যোম্।
ওই শুন গ্রহ, উপগ্রহ সনে
রবি শশি তারা মিলিয়া,
উল্কা ধূমকেতু বম্ বম্ বলি
আকাশে নাচিয়া নাচিয়া,
চলে ঘুরে ঘুরে উঠে প্রতিধ্বনি
ওই মহাকাশ ভেদিয়া—
ব্রহ্ম-রন্ধ্র যত সে ধ্বনি পূরিত
উঠিছে যেন কাঁপিয়া।
জড়-পিণ্ড যারা তারাও গাইছে
পরমেশ নাম গান—
আত্মময় মোরা কেন না ধরিব
তাহাদের সনে তান।
অন্ধ জীব মত নাহি মুগ্ধ রব
আনন্দে মাতাব প্রাণ।
বৃথা জীব যত সুধু হাসে কাঁদে
মায়ামুগ্ধ হয়ে রয়,
তারা ত গায় না বিভু নাম গান
অহং মদে মত্ত রয়।
ভৃঙ্গী।--মুগ্ধ—অতি মুগ্ধ জীবগণ
সৃষ্টি মাঝে হায়!

কেন—তারা কেন মায়া মোহে
এত দুঃখ পায়?
দূরে—অতি দূরে ক্ষুদ্র এক
বালুকণা প্রায়
কোটী—কত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের
মাঝে দেখা যায়—
ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র ধরা ওই
নরের নিবাস;
শুন—এই শুন হোথা হতে
উঠে হা হুতাশ!

বেতাল।—ক্ষুদ্র অই ধরার ব্যাপার—
কি হবে ভাবিয়া বল আর।
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
কত কোটী ক্ষুদ্র ধরা আছে;
সবই শ্রেষ্ঠ জীবের নিবাস—
তবু সেথা উঠে হা হুতাশ!

তাল।—ওই ক্ষুদ্র ধরার ভিতরে
কত কোটী নরে বাস করে,
সবে ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রায়
গণনায় সংখ্যা নাহি হয়।
কিন্তু তার আশা অপ্রমিত
চেষ্টা তার সাধ্যের অতীত।
চাহে সে যে 'ঐশ্বর্য্য' লভিতে
ইচ্ছা তার—ব্রহ্মে মিলাইতে;
আপনাকে ব্রহ্ম ভাবে মনে
উড়ায় ব্রহ্মাণ্ড মায়া জ্ঞানে।
কিন্তু—মায়া বশে করে দুঃখ ভোগ,
সুধু—জন্ম জন্ম করে কর্ম্মভোগ।

নন্দী।—সৃষ্টি সুধু হাহা রব ময়?
শোক তাপ দুঃখ নিরদয়—
জীবে কিগো সতত জ্বালায়!
নাহি কি আনন্দ সেথা, নাহি প্রীতি মধুরতা
নাহি হর্ষ সুখ, নাহি প্রেম পবিত্রতা!
নাহি শান্তি নাহি দয়া,নাহি ভোগ,নাহি মায়া,
নাহি কি তথায় তৃপ্তি ভক্তি প্রসন্নতা!
এ সব তবে কি সুধু অলীক কল্পনা!
দুঃখদগ্ধ জীব মনে নিশ্চল কামনা।

ভৃঙ্গী।—সৃষ্টি সনে—অচ্ছেদ্য বন্ধনে
দুঃখ কি রহিবে?
যতদিন—সৃষ্টি রবে হায়!
জীব দুঃখ পাবে?
মৃত্যু কি গো—ফিরি পাছে পাছে
তাহারে কাঁদাবে?
সুধু জীব—সহিবে যাতনা
কেবল কাঁদিবে?
ফিরি কি গো—সুখের লাগিয়া
যাতনা লভিবে?
আশা কি গো—মরিচীকা প্রায়
সুধু ভুলাইবে?
মোহ কি গো—জ্ঞান আবরিয়া
বিপথে লইবে?
কর্ম্ম কি গো—বদ্ধ করি তারে
বিপাকে ফেলিবে?
পাপ রিপু—তারে কি লইয়া
নরকে ডুবাবে?

তাল।—এ সৃষ্টির রহস্য বুঝনা
মিছে কর জীবের ভাবনা।
সৃষ্টি আগে জীবাত্মা সকলে
মগন প্রলয় সিন্ধু জলে।
কিম্বা সুখে যাতনা পাসরি
বিমল আনন্দ পান করি
ছিল তারা মোহ মুক্ত হয়ে
ব্রহ্ম ধামে ব্রহ্ম পদ পেয়ে।
হল পুনঃ বাসনা উদয়
কর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হয়
তাই হল জগত সৃজন
জীব লভে ধরায় জনম।

কোন জীবে রুষ্ট দেবগণ
শাপ দেন ধরা আগমন।
বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম-সূত্রে পরে
পুনঃ পুনঃ জন্মে ধরা-পরে—
সুখ দুঃখ করে যে সম্ভোগ
সে কেবল নিজ কর্ম্ম-ভোগ।

বেতাল। বদ্ধপ্রকৃতির ডোরে, জীবগণ সদা ঘুরে
প্রকৃতি প্রসন্ন বিনা নাহি মুক্তি পায়।
প্রকৃতি প্রবৃত্তি ময়ী, না হলে প্রবৃত্তি জয়ী
জীবের সংসার হতে উদ্ধার কোথায়?
জড় যথা তমোময় নিশ্চেষ্ট হইয়া রয়
জীবও আগে তমোগুণে থাকে অভিভূত,
সুধু খায় নিদ্রা যায় কিম্বা রিপু-বশে রয়
জ্ঞান কর্ম্ম বৃত্তি তার থাকে আবরিত—
বাসনা তাহারে করে কর্ম্মে নিয়মিত।
'আমি আমি' করি ঘুরে, সুখ লাভ হেতু ফিরে
প্রবৃত্তির বশে সুখ পাইবে কেমনে?
কর্ম্ম সনে দুঃখ গাথা, কর্ম্ম পথে সুখ কোথা?
সৃষ্টি মনে দুঃখ বদ্ধ অচ্ছেদ্য বন্ধনে!

নন্দী।—কখন কখন তাহা নহেক সম্ভব—
এ ভীষণ সৃষ্টি চিত্র—অলীক এসব।
পিতা শিবময় মাতা মঙ্গলদায়িনী
কোন হেতু দুঃখময় হইবে ধরণী!
সৃষ্টির রহস্য কিন্তু বুঝা নাহি যায়
কেন সৃষ্টি মাঝে জীব এত দুঃখ পায়!
ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশয় অভিভূত
জীব কেন-পাপ বশে মৃত্যুমুখে নীত!

নারদের প্রবেশ।

নারদ—(গান)
হরি নাম গাও বীণা—হরি নাম সার,
এই 'নাম' বিনা ভবে কিছু নাহি আর।
এ সৃষ্টি ছিলনা যখন
এই নাম ছিল তখন
প্রণব এ শব্দে লীন ছিল এ সংসার।
নাম হতে শক্তি এল
পরমাণু প্রকাশিল
নাম ডোরে আছে গাঁথা সর্ব্ব চরাচর।
নাম নিত্য সব মায়া
নাম সত্য সৃষ্টি ছায়া
লয় কালে এই নামে হবে একাকার।
বীণায় গাইয়া হেন হরিনাম
বেড়াই ধরায় ঘুরিয়া
কি অদ্ভুত সৃষ্টি জড় জীব ধাম
স্তব্ধ হয়ে যাই হেরিয়া।
কোটী কোটী ভানু গ্রহ উপগ্রহ
বেড়ায় শূন্যেতে নাচিয়া
করে কিবা ধ্বনি কাঁপায়ে আকাশ
বুঝি হরি নাম গাহিয়া—
সে শব্দ নর্ত্তনে জন্মে সূক্ষ্ম শক্তি
ফেলে এ জগত ছাইয়া।
এক ধরা হতে ধরান্তরে যাই
জড় জীব মেলা নেহারি—
কি উদ্দেশ্য লয়ে চলেছে সকলে
কে বুঝে কি খেলা ধাতারি।
এত রবি শশী কেন বা সৃজন
এত জড় কেন জগতে—
কিসেরি কারণে এত ধরা সৃষ্টি
কেন এত জীব ধরাতে!
জীব জড় লয়ে কি খেলা ধাতার
এ কি মায়া জাল বিস্তৃত!
প্রবৃত্তি প্রবাহে কেন জীবগণ
শোক তাপ দুঃখে জড়িত!
কত নরে করে বিফল যতন
এ মায়া অজ্ঞান নাশিতে—
প্রবৃত্তি দমিয়া নিবৃত্তির পথে
ধীরে ধীরে সুধু যাইতে!
জন্ম জন্ম করে কঠোর সাধনা
পূর্ণ জ্ঞান তবু পায় না,

কর্ম্মের বন্ধন কঠিন এমন
এত করি ছিন্ন হয় না।
প্রকৃতিজ গুণে নরে বদ্ধ রহে
কর্ম্মে রত হয় মোহেতে
সেই মোহ বশে সুখ খুঁজে ঘুরে
দুঃখ পায় সুধু ধরাতে।
এ প্রকৃতি মায়া বড়ই কঠোর
জীবের অদৃষ্ট ভাবিয়া
করুণা কাতর, অন্তর আমার
তাই ধরা মাঝে ঘুরিয়া,
সতত বেড়াই হরি নাম গাই
কাতরে সান্ত্বনা বিলাতে,
পাষণ্ডেরও কাণে হরি মন্ত্র দিই
পাপ তাপ তার দূরিতে।
তবুও জীবের পাপ তাপ হায়!
নারিনু একটু নাশিতে!
ভবেশে জিজ্ঞাসি কি করিব এবে
কি বিধান জীবে তরাতে।

নন্দী।—এস ঋষিবর করুণা কাতর
জীব দুঃখ হেরি অধীর অন্তর,
ধন্য ঋষি তুমি অন্তরে তোমার
করুণার উৎস বহে অনিবার।
মোরা মুক্তজীব জ্ঞানদেহ ধরি
এ কৈলাস ধামে শম্ভু পাশে ফিরি,
আমরাও আগে জীব জন্ম লয়ে
ছিলাম ধরায় দুঃখ তাপ সয়ে,
কত যে কঠোর করেছি সাধনা,
কত জন্ম ধরি করি আরাধনা—
শিব কৃপা বলে ছেদিয়া বন্ধন,
লভিয়াছি শেষে আনন্দ ভবন।
কিন্তু এবে জীব বড় শক্তিহীন
নারে সে করিতে কঠোর সাধন।
ঋষিবর চল যাই
মহেশে গিয়া সুধাই
আছে কি উপায় কোন জীবেরে তরাতে?
প্রবৃত্তির বশে রত
এবে জীব শক্তি হত
নারে সে দুর্গম ওই মুক্তি পথে যেতে—
আছে কি সুগম পথ তারে উদ্ধারিতে!

(পট পরিবর্ত্তন।)

[সিংহাসনোপরি শম্ভু শক্তি আসীন।]

শম্ভু।—হের দেবি হের ওই
অপরূপ সৃষ্টি লীলা
বিশ্ব চরাচর—
কাল আর স্থান পটে
ওই হের জগতের
অনন্ত বিস্তার।
হের দেবি সর্ব্বদিকে
অসংখ্য মার্ত্তণ্ড আর
নাক্ষত্র জগত—
রয়েছে ব্যাপিয়া বিশ্ব
বেলা ভূমে অগণিত
বালুকার মত।
পরস্পর ঘুরে ঘুরে
চলে সদা শূন্য পথে
কি মহান্ শক্তি বলে
হতেছে চালিত!
হের দেবি এক কালে
সৃষ্টি স্থিতি লয় লীলা
পাইবে হেরিতে।
হেথা সৃষ্টি হোথা লয়
হেথা বৃদ্ধি হোথা ক্ষয়
কোথায় বিকাশ কোথা
বিনাশ জগতে।
যত দিন স্থান কাল
সহ বিশ্ব মহালয়ে
না হইবে নাশ—

তত দিন রবে দেবি
অদ্ভুত অনন্ত এই
লীলার প্রকাশ।
নক্ষত্র জগতে হোথা
অদ্ভুত লয়ের খেলা
হের নিরখিয়া--
গ্রহ উপগ্রহ সহ
সংঘর্ষণে শত সূর্য্য
তেজ প্রকাশিয়া,
ক্রমে ক্ষীণ আলোময়
নীহারিকা রূপে দেবি
হ'ল পরিণত ;
ক্ষণ পরে হের পুনঃ
ঘোর তমঃ অন্ধকারে
হতেছে আবৃত।
হের দেবি অন্য দিকে
হেন ঘোর অন্ধকার
হতেছে দূরিত।
মম অধিষ্ঠান বলে
সত্ত্ব শক্তি ক্রিয়া ফলে
অন্ধকারে রজঃ কার্য্য
হতেছে স্ফুরিত।
হের দেবি হের ওই
প্রকৃতির শক্তিরূপ
প্রথম বিকাশ—
মহাকাশে খেলা করে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে
যত পরমাণু তাহে
হতেছে প্রকাশ।
শক্তি পরমাণু মিলে
পরে এক নীহারিকা
ছাইল আকাশ।
কোথা আকর্ষণ বলে
স্থূল সূক্ষ্ম অণু মিলে
ঘুরিছে ফিরিছে কভু
ঘাত প্রতিঘাতে,
সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি
উগারি প্রচণ্ড অতি
শক্তি ক্ষয়ে ঘনীভূত
হতেছে ক্রমেতে।
কোথা ঘূর্ণিপাক বলে
কেন্দ্রস্থ মণ্ডল টলে
হইতেছে প্রক্ষেপিত
তাহে গ্রহ দল—
তাহাতে হল সৃজন
নক্ষত্র জগত কোন
ব্যাপি কোন স্থল।
হের দেবি হের হোথা
নাক্ষত্র জগতে হোথা
জড় সৃষ্টি কার্য্য এবে
হয়েছে সাধন,
জন্মিছে উদ্ভিদ তাহে
প্রকৃতির পরবাহে
পঞ্চভূত হতে প্রাণ
করি আকর্ষণ।
উদ্ভিদের শক্তি সনে
প্রকৃতির আপূরণে
জড়েতেই জৈব শক্তি
হতেছে নিহিত,
জীব ধর্ম্ম আপূরণে
সত্ত্ব শক্তি আকর্ষণে
ক্রমে শ্রেষ্ঠ জীব যত
হতেছে সৃজিত।
এইরূপে হের দেবি
এক সৌর জগতের
হতেছে বিকাশ,
অন্য দিকে আর এক
সৌর জগতের ওই
হতেছে বিনাশ!

এই সৃষ্টি লয় লীলা
হের সদা চারি ভিতে
হতেছে প্রচার,
আমরা দুজনে মিলি
এই বিশ্ব লীলা খেলি
চিদানন্দ রূপে রই
জ্ঞানে আপনার।
কত রূপে ব্যক্ত হয়ে
পরম আনন্দ লয়ে
তব সনে করি লীলা
হইয়া চিন্ময়।
জড় শক্তি রূপ ধরি
সৃষ্টি লয় লীলা করি
চৈতন্য রূপেতে হই
জগত আশ্রয়।
পরমাণু রূপ হয়ে
বিশেষ শকতি লয়ে
দিক্ কাল জ্ঞানে করি
বিশ্বের বিস্তার;
জড়েতে চৈতন্য দিয়া
জীবরূপ প্রকাশিয়া
মায়াবদ্ধ হয়ে ভুঞ্জি
সৃষ্টি আপনার।
গুণ কর্ম্ম ডোরে করি
বদ্ধ এ সংসার
বাসনা বীজেতে রাখি
সৃষ্টি আপনার।

শক্তি।—এ অদ্ভুত লীলা বিরাট ব্যাপার—
কভু নাহি বুঝি কি রহস্য তার!

শম্ভু।—দেবি, তত্ত্বকথা তোমারে বুঝাই
একা আমি আছি—আর কিছু নাই।
তুমি নহ কভু ভিন্ন আমা হতে
লয়ে এক রই—প্রভেদ সৃষ্টিতে।
ভিন্ন দুটী শক্তি মণিতে নিহিত
যথা কার্য্য কালে হয় অনুমিত।
আমি জ্ঞানময় চিদানন্দ ঘন,
তুমি দেহ জড় অজ্ঞান কারণ।
আমি আলো তুমি ছায়া সঙ্গে তার
তুমি শক্তি আমি তাহার আধার।
আমি জ্ঞাতা তুমি হও জ্ঞেয় মম—
তুমি কার্য্য—আমি তাহার কারণ।
জ্ঞানে হয় কর্ম্ম চেষ্টা বিকাশিত—
কর্ম্ম শক্তি রূপে তুমি বিরাজিত।
শক্তি শক্তিমানে নাহিক প্রভেদ,
আধার আধেয়ে নাহি হয় ভেদ।
জ্ঞান সনে শক্তি নিত্য লীলাময়,
সেই লীলা হতে হয় সৃষ্টি লয়।

শক্তি।—জ্ঞানে সৃষ্টি চিত্র কিরূপে সম্ভবে
জ্ঞান ভুঞ্জে লীলা শক্তি সনে যবে?

শম্ভু।—ব্রহ্ম রূপে আমি জ্ঞানের অতীত,
ব্রহ্মে হয় যবে জ্ঞান উদ্ভাসিত
জ্ঞান সনে হয় অজ্ঞান সূচিত।
অভিন্ন রূপেতে অজ্ঞান যখন
রহে জ্ঞানে—সৃষ্টি থাকে না তখন।
কিন্তু জ্ঞান যবে অজ্ঞানে হেরিয়া
হয় লীলা রত অজ্ঞানে লইয়া,
তবে হয় সৃষ্টি জ্ঞানে উদ্ভাসিত
অজ্ঞানেতে সৃষ্টি সদা অনুমিত।
চিদানন্দে হ'লে লীলার বাসনা,
নিবৃত্তিতে হয় প্রবৃত্তি বেদনা,
অব্যক্তেতে হয় ব্যক্তের ধারণা—
ব্যাপ্তি ভাব হয় জ্ঞানেতে কল্পনা।
তাহা হতে হয় ত্রিবিধ বিস্তার—
মহাকাশ তাহা করে অধিকার।
পরব্যোম সেই মহা শব্দময়
আমি ব্যোমকেশ তাহার আশ্রয়।
ব্যাপ্তি হতে পুনঃ জন্মে কাল-জ্ঞান
—মহাকাল রূপে মম অধিষ্ঠান।
জ্ঞানে হয় তাই ভূত ভবিষ্যত

অনাদি অনন্ত রূপে প্রতিভাত।
"দিক্" "কাল" বোধ নিত্য বদ্ধ জ্ঞানে—
"কারণ" সূত্রের ধারণা তাঁ সনে।
তাহা হতে ক্রমে পড়ে মহাকাশে
অন্য ভূত ছায়া—অজ্ঞানের বশে
তম আবরণে জ্ঞান আবরিয়া।
ভূত হতে পরমাণু প্রকাশিয়া
স্থূল জড় রূপে হয় বিস্তারিত।
তার মাঝে জ্ঞান হয় উপস্থিত—
লীলা ভুঞ্জে হয়ে অজ্ঞান মোহিত।
তাই জীব ভাব জ্ঞানেতে উদয়।
ব্যাপ্তি জ্ঞান হতে সংখ্যা জ্ঞান হয়—
সেই সংখ্যা জ্ঞানে জীব অগণিত।
পুরুষ রূপেতে হয় প্রতিভাত।
অগণ্য মুকুরে প্রতিবিম্ব প্রায়
অগণিত হয়ে জ্ঞানে ব্যক্ত হয়।
শেষে মায়া মোহে—প্রকৃতির সনে
বদ্ধ হয় জীব নিজ অহংজ্ঞানে।
নারে ব্রহ্ম ভাব করিতে ধারণা—
নারে অন্য জীবে ভাবিতে আপনা।
কিন্তু ওই জ্ঞান অনন্ত বিস্তৃত
আছে, অংশরূপে জীবেতে নিহিত।
"ব্যাপ্তি""কাল""কর্ম্ম"বোধ জীবজ্ঞানে
তাই প্রতিষ্ঠিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
তাহার (ও) জ্ঞানেতে এ সৃষ্টি চিত্রিত
সে ও মায়া সনে করমে নিরত,
তাই তার জ্ঞান অজ্ঞান মোহিত।
সাগরের বারি উত্তাপে যেমন
বাষ্পকণা হয়ে করে বিচরণ—
সেই রূপ জীব আপনা প্রকাশে
আমা হতে ভিন্ন ভাবে মোহ বশে।

শক্তি।—বুঝিলাম সৃষ্টি এই
হয় তব বিরাট স্বপন,
তব জ্ঞান পটে দেব
চিরাঙ্কিত ছায়ার মতন।
তব চিদাকাশ মাঝে
দিক্ কাল সদা প্রকাশিত।
তাহে বীজ রূপে ধৃত
জীব জড় অণু অগণিত।
জীব—জ্ঞান কণা তব
জড় অণু—শক্তি কণা মম—
সেই বীজ হতে সৃষ্ট
কোটী রবি গ্রহ তারা সোম।
তাহা হতে কোটী জীব
ধরা মাঝে করে বিচরণ।
এক যায় আর আসে
কালস্রোতে করে সন্তরণ।
যেন ছায়াবাজী প্রায়
এক চিত্র কোথা সরে যায়,
নিমেষেতে জ্ঞানে তব
অন্য চিত্র হতেছে উদয়।
জীব জড় লয়ে আমি,
সদা করি এই অভিনয়—
দিক্ কাল রঙ্গভূমে,
তব জ্ঞান করিয়া আশ্রয়।
না জানি কি সুখ পাও,
হেরি এই প্রবাহ কালের,
না জানি জীবের তত্ত্ব
সে কি ভুঞ্জে এই প্রবাহের।

শম্ভু।— হেরি দেবি তব লীলা অভিনব
কতই আনন্দ করি অনুভব,
জীব জড়ময়ী এই যে সংসার
কাল স্রোতে ভেসে যায় অনিবার
বিচিত্র স্বপন!—ছায়া পড়ে জ্ঞানে
সদানন্দময় রহি তার ধ্যানে।
আমি জীবরূপে বদ্ধ মায়াডোরে
আমিই মোহিত অজ্ঞানের ডোরে।
কিন্তু সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব তার,

জীবগণ যাহা করে অনুভব,
মম জ্ঞানে সদা পড়ে বিম্ব তার—
কিন্তু সুখ দুঃখ অভেদ আমার।
যেই রূপে জীব দুঃখ অনুভবে
মম জ্ঞানে তাহা নাহিক সম্ভবে।
আনন্দে না হয় দুঃখ ছায়াপাত
মুকুরে না হয় বিম্বের সম্পাত।
শক্তি।—ব্রহ্ম হতে জীব কেন ভিন্ন হয়?
কর্ম্ম করি কেন মায়া বদ্ধ রয়?
শম্ভু।—জীবরূপে আমি তোমার খেলনা
তুমি কি জীবের প্রবৃত্তি জান না?
তুমিই জীবেরে দিয়াছ বাসনা,
তুমি কর তারে করমে যোজনা।
ঈশরূপে আমি আশ্রয় তোমার
তুমি জীবরূপী আমার আধার।
জ্ঞানে জীবভাব হইলে উদয়—
মায়া আবরণে অহংজ্ঞান হয়।
যাহে জন্মে বুদ্ধি জগত হেরিতে,
ইচ্ছা—কর্ম্ম করি বাসনা পূরাতে।
জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় তার প্রয়োজন—
তুমি দাও তারে দেহ আবরণ—
তুমি দাও তার সেই দেহে প্রাণ—
যাহা হতে হয়—কর্ম্মে নিয়োজন।
তুমি কর্ম্মসূত্রে তাহারে নাচাও,
কর্ম্ম শেষে তার দেহ কাড়ি লও।
শক্তি।—কিন্তু নাহি জানি জীবের ধরম
কিরূপে তাহার হয় আপূরণ।
শম্ভু।—জড় সৃষ্টি মাঝে জড়াণু যেমন
অন্য এক অণু করি আকর্ষণ
করে নানা জাতি জড়ের সৃজন।
জড় সৃষ্টি পরে হে দেবি যখন
শব রূপী শিব হন সচেতন
জীবাণুতে তবে চেতনা সঞ্চারে
জৈব শকতির আপূরণ করে।

প্রেম আকর্ষণে জীব জীবে টানে,
পূর্ণপ্রেমে জীব মিলে জীব সনে;
তীব্র বাসনাতে জন্ম জন্মান্তরে
মিলে এক দেহ পারে ধরিবারে।
এই প্রেম আসি নানা আকর্ষণে
এক জীব মিলে অন্য জীব সনে।
নানা জাতি জীব এরূপে প্রকাশে
জীব পূর্ণ হয় এ মিলন বশে।
বহু জনমের সুকর্ম্ম যখন
ক্রমে জৈব শক্তি করে সম্বর্দ্ধন
তখনই জীবের উচ্চ গতি হয়
জীবোন্নতির এ রহস্য নিচয়।
শক্তি।—ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ কোথা হতে
আসে এ জগতে জীবে ব্যথা দিতে?
শম্ভু।—এ জগত দেবি হয় কর্ম্মময়
কর্ম্ম হতে দেবি এই সৃষ্টি হয়;
কর্ম্ম করে দেবি এ সৃষ্টি ধারণ,
কর্ম্ম হতে সৃষ্টি হয় আপূরণ।
তব শক্তি জড় রূপে ক্রিয়া করে
কর্ম্ম হেতু জীব তব শক্তি ধরে।
তুমি কুণ্ডলিনী—জীবে অবস্থিত
তুমি কর জীবে কর্ম্মে নিয়োজিত।
যে করমে হয় জীবের উন্নতি
হয় যাহে জীব-ধর্ম্ম পরিণতি
সে কর্ম্মে জীবের সুখ পুরস্কার
খুলিয়া দিয়াছ কত সুখ দ্বার।—
কিন্তু যে করমে হয় অবনতি
যা হতে না হয় জীবের সংহতি
ধারণ রক্ষণ অথবা পোষণ
তাহাতে জীবের হয় যদি মন
তবে দুঃখ ক্লেশ প্রায়শ্চিত্ত তার
তথাপি না হয় তার প্রতিকার—
কুকর্ম্মে অধর্ম্ম হয় অধোগতি
সুকর্ম্মেতে জীব পায় উর্দ্ধগতি।

কর্ম্ম দেখি সুখ দুঃখের কারণ
কর্ম্ম লয়ে হয় দুঃখ নিবারণ।
শক্তি।—সুখলাভ তরে যদি চেষ্টা করে
পারে কি জীবেরা সুখ লভিবারে?
শম্ভু।—সুখ ক্ষণস্থায়ী—সুখ দুঃখময়
ভ্রম বশে জীব সুখ হেতু ধায়।
সুখ আশে গেলে দুঃখ পেতে হয়—
প্রবৃত্তির পথে কুকর্ম্ম আশ্রয়।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে দুঃখ হয়
সুখ আসে গেলে তাহা নাহি যায়।
জীব যদি করে সতত যতন
আত্ম সুখ চেষ্টা প্রবৃত্তি দমন
তা হলে জীবের দুঃখ দূর হয়—
সুখ অন্বেষিলে সুখ নাহি পায়।
এই দুঃখ স্রোত নিবারণ তরে
জীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরে চেষ্টা করে।
সুখ দুঃখ সনে নিত্যবদ্ধ জেনে
সুখ দুঃখ সব ত্যজিতে যতনে।
ত্যজিতে বাসনা—কর্ম্মের বন্ধন
নির্ব্বাণ লভিতে করয়ে যতন।
শক্তি।—মুক্তি তরে জীব করিলে সাধন
পারে কি সে কভু লভিতে নির্ব্বাণ?
কেন মুক্তি তরে করে সে যতন?
শম্ভু।—আমি মুক্ত—জীব বদ্ধ এ মায়ায়
সে যে অভিভূত তোমার লীলায়।
তবু সৃষ্টি লীলা উপভোগ করি—
আমিও এ সৃষ্টি নাশে ইচ্ছা করি।
সৃষ্টির প্রথমে তুমি কার্য্যকরী
শবরূপী মম চেতনা আবরি।
ক্রমে সৃষ্টি যত হয় পরিণত
জ্ঞানে ধরি তোমা হই লীলা রত।
তুমি শান্ত হও—কর সৃষ্টি মাঝ
ষোড়শী, ঈশ্বরী রূপেতে বিরাজ।
পরেতে মাতঙ্গী বগলা হইয়া
কর ক্রীড়া তুমি জীবেরে লইয়া।
শব্দ জ্ঞান দ্বার রোধিয়া তাহার
রাখ বিমোহিয়া মায়াতে তোমার।
ক্রমে জরাজীর্ণ হয় এ জগত
ধূমাবতী রূপে হও প্রকাশিত।
শব্দ ব্রহ্ম বিদ্যা লভিয়া তখন
হয় নর আত্মজ্ঞানেতে মগন;
করে কর্ম্ম ত্যাগ।—আমিও যেমন
রজঃ শক্তি তব করি আবরণ।
যবে তুমি ছেদি মস্তক আপন
পিয়া রক্ত নিজ হও অন্তর্ধান—
জড়রূপে করি সৃষ্টি সংবরণ।
পরে জ্ঞানে তোমা কমলা রূপেতে
ধরি—অবস্থান করি আনন্দেতে।
তব সৃষ্টি লীলা হেরিতে আবার
ইচ্ছা হলে হয় সৃষ্টির প্রচার।
এই সৃষ্টি লয় নিত্য প্রতিভাত
হয় মম জ্ঞানে—দোলকের মত।
উচ্চ জীব জ্ঞানে আমারই মত
আমা হতে হয় লয় চেষ্টা জাত।
সাধনাতে করি কর্ম্ম-বীজ লয়
পূর্ণ জ্ঞান লভি ব্রহ্ম পদ পায়।
মহালয় দেবী হইবে যখন—
মম জ্ঞানে জীব মিশিবে তখন।
(নারদ ও নন্দী প্রভৃতির প্রবেশ)
শম্ভু।—এস ঋষিবর, এস ভূতগণ,—
ধর আশীর্ব্বাদ লভহ নির্ব্বাণ।
ধন্য ঋষি তুমি অন্তরে তোমার
করুণার উৎস বহে অনিবার,
নহে শুষ্ক জ্ঞানে সতত বিভোর
নহে যোগরত তপস্যা কঠোর;
লোক-হিত তরে ঘুরিয়া বেড়াও
পাতকী তরাতে নাম মন্ত্র দাও।
জানি ঋষিবর কি জিজ্ঞাসা তব

মানসে এখন হয়েছে উদ্ভব,
কেন ভূতগণ সনে আগমন,
কেন বা অন্তর করুণা-মগন।
মুগ্ধ ঋষি তুমি—অন্তরে তোমার
যবে যে ভাবনা করে অধিকার;
মম জ্ঞানে জে'ন পড়ে বিম্ব তার
কোন চিন্তা নহে অজ্ঞাত আমার।
জীব দুঃখ দেখি অভিভূত হও,
কর্ম্ম সূত্র তার টুটাবারে চাও,
তুমি কি জীবের নিয়তি লঙ্ঘিবে?
কভু ঋষি তব সাধ্য নাহি হবে।
নিজ কর্ম্ম ফলে জীব দুঃখ পায়,
কর্ম্মবীজ নাশে তার দুঃখ যায়।
পূর্ণ জ্ঞানে কর্ম্ম বীজ নষ্ট হয়।
সুধু নাম মন্ত্রে না হয় নির্ব্বাণ,
ভক্তিতে কেবল নাহি পরিত্রাণ।
যবে জীব হেরে দুঃখ এসংসারে
নিজ দুঃখ দূর তরে চেষ্টা করে।
পর দুঃখ দেখি ব্যথিত অন্তরে
সর্ব্বজীব হিত মহাব্রতধরে।
সুকর্ম্ম সাধনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হলে
নিষ্কাম করমে প্রবৃত্তি জন্মিলে
সে অভ্যাস বশে হয় বুদ্ধি স্থির,
যা হতে উপজে ভকতি গভীর;
ভক্তি বৃদ্ধি সনে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়,
জ্ঞান বৃদ্ধি হলে যোগ যুক্তরয়।
যোগেতে সমাধি জন্মিলে নিশ্চয়
দেশ কাল বাধা তাহে দূরে যায়,
তবে জীব জেন পূর্ণ জ্ঞান পায়।
কত জন্ম ধরে এ সাধনা করে
তবে জীব মোক্ষ পারে লভিবারে।
নারদ।—জানি আমি-জীব জপ তপ নামা
পূজা যাগ পাঠ তোমার অর্চ্চনা,
ধ্যান যোগ আদি অনন্ত সাধনা
কত জন্ম করি ছিন্ন করে পাশ।
কিন্তু এবে দেখি প্রবৃত্তির বশে
ক্ষীণ মতি জীব বড় বদ্ধ পাশে
না করে সাধনা কুকর্ম্মেতে পশে,
কেমনে করিবে অজ্ঞান বিনাশ?
পশু পাশবদ্ধ ইহারা সবাই
পশুপতি দয়া বিনা মুক্তি নাই।
তাই দেব তব দয়া ভিক্ষা চাই
মুক্ত কর জীবে হতে মায়াপাশ।
শম্ভু।—এবে জীর্ণ ধরা সৃষ্টির ভিতর
মহাকাল মুখে হয় অগ্রসর।
কলি পশিয়াছে—কাল তমোময়
শনি তমঃ স্থানে তাহার আশ্রয়।
তাই হয় জীব শক্তিহত এবে
সত্ব রজঃ গুণ—তমাচ্ছন্ন সবে।
প্রবৃত্তির বশে এবে জীবগণ
না পারে করিতে কঠোর সাধন।
যাও ঋষিবর যাও ভূতগণ
ওই ধরা মাঝে—রক্ষ জীবগণ।
আমিও তাদের এ দশা ভাবিয়া
শক্তি সনে তথা আবির্ভূত হ'য়া
নিবৃত্তির পথ দুর্গম কঠোর
করি পরিহার—পথে প্রবৃত্তির
সাধন উপায় করিব প্রচার—
আগমে করিব বিস্তার তাহার।
দেখা সেই পথ তোরা ধরা গিয়া
এ সুগম পথ প্রচার করিয়া,
সুসাধ্য সাধনা বলে জীবগণ
তবে মুক্ত হয়ে পাবে মমধাম।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৬)

(লিচ্ছবী বংশ।)

ইতিপূর্ব্বে লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজ শিবদেবের নামাঙ্কিত ৩১৮ গুপ্তাব্দের লিখিত এক শাসনলিপির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৩১৮গুপ্তাব্দ খ্রীষ্টাব্দের ৬৩৭ বৎসর হইতেছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে,৬৩৭খ্রীঃ মহারাজ শিবদেব মানগৃহের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। সেই সময়ে অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবী রাজের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর প্রকাশিত ৫ নম্বর খণ্ডিত শিলালিপি হইতেও এই বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। এই শিলালিপিতে মহারাজ শিবদেব ও মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মনের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। এই শিলালিপি খণ্ডিত। ইহা কোন্ সময়ে শিবদেবের আদেশে উৎকীর্ণ হয়,তাহা জানা যায় নাই। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবীরাজের সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অংশুবর্ম্মনের শৌর্য্যবীর্য্য ও প্রজাপালন কার্য্যে সুখ্যাতির বিষয় এই খণ্ডিত লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। শিবপুরী গ্রাম ও পর্ব্বতের নিকটে 'বুড্ডনীলকণ্ঠ' নামক সরোবরের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুবিগ্রহের সমীপে এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু নগরের পাঁচ মাইল উত্তরে এই শিবপুরী গ্রাম অবস্থিত। সুপণ্ডিত বেণ্ডল সাহেবের আবিষ্কৃত ৩১৮ গুপ্তাব্দের শাসনলিপি হইতে অনুমিত হইতেছে যে, মহারাজ শিবদেব ৬২০—৬৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নেপালের অন্তর্গত মানগৃহে রাজত্ব করেন। এই শিবদেবের মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মন পশ্চিম নেপালে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি কৈলাসকূট নামক স্থানে আপনার রাজধানী স্থাপিত করিয়া নেপালে ঠকুরীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবদেবের রাজত্বকালে মহাপরাক্রান্ত অংশুবর্ম্মন প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বীয় প্রভুর নামে নেপাল শাসন করিতে থাকেন। এই নিমিত্তই সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অংশুবর্ম্মনকে নেপালের নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত বিল সাহেবের মতে হিয়াংসাঙ্ নেপালে গমন না করিয়াই, ব্রিজি জাতির রাজধানী বৈশালী হইতে নেপালের বিবরণ সংগৃহীত করেন।* হিয়াংসাঙ্ ৬৩৯ খ্রীঃ বৈশালী পরিদর্শন করেন। তিনি নেপালের বিবরণে লিখিয়াছেন যে,নেপালের তদানীন্তন রাজা লিচ্ছবীবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অংশুবর্ম্মন নামে নরপতি ইতিপূর্ব্বে রাজত্ব করেন। অংশুবর্ম্মন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি স্বয়ং শব্দবিদ্যা বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার যশঃপ্রভা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। নেপালের বিবরণ লোকমুখে শুনিয়া সংগ্রহ না করিলে, হিয়াংসাঙ্ কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। নেপালে গমন করিলে, হিয়াংসাঙ্ অংশুবর্ম্মনকে নেপালের ভূতপূর্ব্ব-নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিতেন না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঠকুরী-

* Beal' Buddhist Records of Western Countries (II. 8)

বংশীয় মহারাজ জয়দেবের নামাঙ্কিত শাসন-লিপিতে লিচ্ছবীবংশীয় বৃষদেবের উল্লেখ আছে। এই শাসনলিপি ১৫৩ হর্ষাব্দে(৭৫৯খ্রীঃ)জয়দেবের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে লিচ্ছবীবংশীয় বৃষদেব,শঙ্করদেব, ধর্ম্মদেব,মানদেব,মহীদেব ও বসন্তদেবের নাম স্পষ্টাক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিচ্ছবীকুলজ ছয় পুরুষ গড়ে ২০ বৎসর হিসাবে ১২০ কাল নেপালে রাজত্ব করেন। শিবদেবের সহিত বৃষদেবের সম্বন্ধ এই শাসনলিপি হইতে জানা যায় না। বংশাবলীর মতে এই ছয় জন লিচ্ছবীবংশীয় নরপতি যথাক্রমে নেপালে রাজত্ব করেন। বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট নামমালা হইতে দেখা যাইতেছে যে,শিবদেব ও বৃষদেবের রাজত্বকালের মধ্যে রুদ্রদেব নামে নৃপতি রাজত্ব করেন। বংশাবলীর মতে বৃষদেব রুদ্রদেবের পুত্র ও শিবদেবের পৌত্র ছিলেন। বংশাবলীর এই উক্তির সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য শাসনলিপির প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শিবদেব ও অংশুবর্ম্মন পরস্পর সমসাময়িক। শিবদেবের মৃত্যুর পর তিনি কৈলাসকূট নগরে ঠক্কুরীবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবদেবের বংশধরেরা মানগৃহে রাজত্ব করিতে থাকেন। অংশবর্ম্মনের নামাঙ্কিত তিন খানি শাসনলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ৩৪ হর্ষাব্দের (৬৪০খ্রীঃ) লিখিত বাঙ্গমতী গ্রামের শিলালিপি কৈলাসকূট নগর হইতে প্রচারিত হয়। ইহাতে অংশুবর্ম্মন আপনাকে 'মহাসামন্ত' নামেই পরিচিত করিয়াছেন। এই শিলালিপির সময়েও তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। শিলালিপি হইতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে। দেবপাটন নগরের শিলালিপি ৩৯ হর্ষাব্দে (৬৪৫ খ্রীঃ) লিখিত হয়। যুবরাজ উদয়দেব দ্বারা কৈলাসকূট হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। এই শাসনলিপি উৎকীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মন রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা তাঁহার অন্যতম পুত্র উদয়দেব যুবরাজ নামে কখনও অভিহিত হইতেন না। এই উদয়দেবকে লিচ্ছবীবংশজ অনুমান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর বুলার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অংশুবর্ম্মনের নামাঙ্কিত তৃতীয় শিলালিপি ৪৫ হর্ষাব্দে (৬৫১ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে,৬৫১ খ্রীঃ অংশুবর্ম্মন কৈলাসকূটে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই ক্ষুদ্র শিলালিপি সাতধারায় আবিষ্কৃত হয়। বিভুবর্ম্মন নামে অংশুবর্ম্মনের একজন আত্মীয় ও রাজকর্ম্মচারী এই সাতধারা ৬৫১ খ্রীঃ খনিত করেন।

অংশুবর্ম্মনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূট নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আমাদের বিবেচনায়,তিনি উদয়দেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। জিষ্ণুগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূটে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুগুপ্তের পর তাঁহার পিতৃব্য উদয়দেব রাজাসন লাভ করেন। জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত তিনখানি শাসনলিপির আলোচনা হইতে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পশুপতিনাথের সুবিখ্যাত মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এক পাষাণময় চণ্ডেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মূর্ত্তির সংলগ্ন প্রস্তরে জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত এক খণ্ডিত লিপি বিদ্যমান আছে। ইহা কোন্ সময়ে উৎকীর্ণ হয়, তাহা বলা যায় না। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরাংশে অংশুবর্ম্মনের রাজধানী কৈলাসকূট নগরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কৈলাসকূট এক্ষণে দেবপাটন

নগরের অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই শাসনলিপি হইতে অনুমান হয় যে, জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূটেই রাজত্ব করিতেন। জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত অপর দুই শিলালিপি এই অনুমানের সত্যতা নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদন করিতেছে। পশুপতিনাথ ঠকুরীবংশের কুলদেবতা ছিলেন। অংশুবর্ম্মন ও জিষ্ণুগুপ্তের শাসনলিপি হইতে তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতীতি হইতেছে।

কাটমাণ্ডু নগরীর দক্ষিণস্থ সদর দরজার নিকটে মীন নারায়ণ নামে এক বিষ্ণুদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরগাত্রে একখণ্ড প্রস্তরে জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি পণ্ডিত ভগবানলালের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপি খণ্ডিত। ইহা কোন্ সময়ে উৎকীর্ণ হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূট নগরে রাজত্ব করিতেন। এই শিলালিপি যে জিষ্ণুগুপ্তের রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হয়, লিচ্ছবীবংশীয় ধ্রুবদেব তাঁহার সমসাময়িক। রাজা ধ্রুবদেব মানগৃহে এবং জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূটে একই সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের শাসনকাল এই লিপি হইতে জানা যাইতেছে না।

কাটমাণ্ডু নগরের দেড় মাইল পূর্ব্বে পাটন বা ললিতপট্টন অবস্থিত। ভাটগাঁও হইতে কাটমাণ্ডু যাওয়ার প্রাচীন পথের মধ্যে ললিতপট্টন নগরী নির্ম্মিত হয়। এই নগরের তবঝা মহল্লায় ছিন্নমস্তা (মুমুরা) দেবীর এক মন্দির আছে। এই মন্দিরের পার্শ্বে মৃত্তিকায় প্রোথিত এক প্রস্তর খণ্ডে জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত তৃতীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। রাজা জিষ্ণুগুপ্তের আদেশে এই শিলালিপি ৪৮ শ্রীহর্ষাব্দের কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়াতে উৎকীর্ণ হয়। যুবরাজ বিষ্ণুগুপ্তের প্রতি এই শিলালিপি প্রচারের ভার অর্পিত হয়। ইহাতেও লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজা ধ্রুবদেবের নাম স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৮ হর্ষাব্দে ৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ৬৫১ খ্রীঃ অংশুবর্ম্মনকে কৈলাসকূটের সিংহাসনে আসীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। বর্ত্তমান শিলালিপি দৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, ৬৫৪ খ্রীঃ জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূটে রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব ৬৫১—৫৪ খ্রীঃ মধ্যে অংশুবর্ম্মনের মৃত্যুর পর কৈলাসকূটের সিংহাসনে জিষ্ণুগুপ্ত অধিষ্ঠিত হন। জিষ্ণুগুপ্তের সমসাময়িক লিচ্ছবীরাজ ধ্রুবদেব ৬৫৪ খ্রীঃ মানগৃহে রাজত্ব করিতেছিলেন। আমরা ৬৩৭ খ্রীঃ শিবদেবকে মানগৃহে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি। শিবদেবের ১৭ বৎসর পরে যিনি মানগৃহে রাজত্ব করেন, তিনি শিবদেবের পুত্র কি ভ্রাতা ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। বংশাবলীর মতে শিবদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুদ্রদেব রাজত্ব করেন। অতএব বংশাবলীর রুদ্রদেব ও শিলালিপির ধ্রুবদেব এক অভিন্ন ব্যক্তি। বৃষদেব এই ধ্রুবদেবেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় ধ্রুবদেবের মৃত্যু হয়। ধ্রুবদেবের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃষদেব পৈতৃক সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, ধ্রুবদেব ও বৃষদেব উভয়েই শিবদেবের পুত্র ছিলেন। বৃষদেবকে শিবদেবের পৌত্র বলিয়া বংশাবলীর উল্লেখ একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক।

বৃষদেবের প্রপৌত্র মানদেবের নামাঙ্কিত দুইখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই উভয় লিপিতেই লিচ্ছবীবংশীয় মানদেবের নাম ও সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহার প্রথমলিপি ৩৮৬ গুপ্তাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা প্রতিপদে এবং দ্বিতীয় লিপি ৪১৩ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ হয়। এই দুইখানি প্রস্তরলিপিই খণ্ডিত। কিন্তু ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ৩৮৬ হইতে ৪১৩ গুপ্তাব্দ (৭০৫—৭৩২ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত মানদেব মানগৃহের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন প্রথম লিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, মানদেবের মাতার নাম রাজ্যবতী। ধর্ম্মদেবের মৃত্যুর পর পতিব্রতা মহিষী রাজ্যবতী পতির অনুগমনে ব্যগ্রা হন। রাজা মানদেবের অনুরোধে তিনি নিবৃত্ত হন। মাতার আদেশক্রমে পূর্ব্বদিগ্ জয় করিয়া, মানদেব পশ্চিমদিগ্ বিজয়ের জন্য বহির্গত হন। এই লিপি চঙ্গুনারায়ণের মন্দিরের সমীপে এক শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। কাটমাণ্ডু নগরীর পাঁচ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মানমতী নদীর তীরে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির মধ্যে গরুড়াসীন বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ৮১৪নেপালী সংবতে (১৬৯৪ খ্রীঃ) রাণী ঋদ্ধিলক্ষ্মী বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত করেন। এই শিলালিপিতে বৃষদেব, শঙ্করদেব ও ধর্ম্মদেব লিচ্ছবীরাজ মানদেবের উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৪১৩ গুপ্তাব্দে (৭৩২ খ্রীঃ) মানদেবের রাজত্বকালে জয়বর্ম্মন নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী জয়েশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। পশুপতিনাথের সুবিখ্যাত মন্দিরের উত্তরস্থ দ্বারে এই লিঙ্গ স্থাপিত হয়। লিঙ্গের পরিবর্ত্তে শঙ্করদেবের স্থাপিত পশুপতিনাথের ত্রিশূল এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জনপ্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, ৭০৫ নেপালী সংবতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) রাণী গঙ্গা পশুপতির বর্ত্তমান মন্দির দেবপাটন নগরে নির্ম্মিত করেন। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রাজী মানদেব ও বসন্তসেন দেবের সময় শকাব্দে প্রকাশিত বলিয়া প্রথমতঃ অনুমান করেন। ডাক্তর বুলারের পরামর্শে পরে তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিয়া, বিক্রমাব্দের অনুমান করেন। এই ভ্রান্ত অনুমানের আশ্রয় লইয়া, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবানলাল ও ডাক্তার বুলার নেপালের লিচ্ছবীবংশ সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ভগবানলাল স্বীয় যত্নে ও গবেষণায় আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে নেপালের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যথোচিত ফল লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম মান (মানাঙ্ক) দেব ও অংশুবর্ম্মনের নামাঙ্কিত তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৭-৮৮ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক কার্য্যবিবরণীতে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

লিচ্ছবীবংশের আরও দুইখানি শিলালিপি কাটমাণ্ডুনগরের লগনটোল নামক পল্লীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানিতে মহারাজ বসন্তসেনের ও অপরখানিতে রাজপুত্র বিক্রমসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উভয় লিপিই খণ্ডিত। কিন্তু উভয়ের সৌভাগ্যক্রমে শিলালিপির কাল অবিলুপ্ত রহিয়াছে। মহারাজ বসন্তসেন মানগৃহে রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, বসন্তসেন লিচ্ছবীরাজ বসন্তদেব হইতে অভিন্ন ব্যক্তি। ৪৩৫ গুপ্তাব্দের (৭৫৪ খ্রীঃ) আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদে ইহা উৎকীর্ণ হয়। 'সর্ব্বদণ্ডনায়ক' ও 'মহাপ্রতিহার' রবিগুপ্তের প্রতি ইহার প্রচার ভার অর্পিত হয়। দ্বিতীয় শিলালিপি ৫৩৫ গুপ্তাব্দে (৮৫৪ খ্রীঃ) শ্রাবণমাসের শুক্লা সপ্তমীতে উৎকীর্ণ

হয়। রাজপুত্র বিক্রমসেনের প্রতি ইহা প্রচার ভার সমর্পিত হয়। বিক্রমসেনদেব বসন্ত-সেনদেবের শতবর্ষ পরে লিচ্ছবীবংশে আবির্ভূত হন। তিনি নরেন্দ্রদেবের পুত্র ভীম-দেব নামে বংশাবলীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়।

উপরে যে কয়খানি শাসনলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে শিবদেব ও তাঁহার বংশধর লিচ্ছবীরাজগণের সময় ৬৩৭-৮৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। শিবদেব ও তাঁহার বংশধর-গণের আনুমানিক রাজ্যকাল নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট লিচ্ছবীবংশীয় রাজাদিগের নামমালার অধিকাংশ সত্য বলিয়া শাসন-লিপি হইতে নির্ণীত হইতেছে। বংশাবলীর সহিত শাসনলিপির নামঘটিত পার্থক্য উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে লিচ্ছবীবংশের সমসাময়িক ঠকুরীবংশের নৃপতিবর্গের নাম-মালা ও রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিব। এই সময় নির্দ্দেশের অধিকাংশ স্থলে পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী ধরা হইয়াছে।

(লিচ্ছবীবংশ)।

(১) শিবদেব (৬২০-৪০ খ্রীঃ)
- ধ্রুবদেব (৬৪০-৬০ খ্রীঃ)
- বৃষদেব (৬৬০-৭০ খ্রীঃ)
  - শঙ্করদেব (৬৭০-৮৫ খ্রীঃ)
  - ধর্ম্মদেব (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ)
  - (১) মানদেব (৭০৫-৩৫ খ্রীঃ)
  - মহীদেব (৭৩৫-৫০ খ্রীঃ)
  - বসন্তসেন দেব (৭৫০-৭০ খ্রীঃ)
  - উদয়দেব (৭৭০-৯০ খ্রীঃ)
  - (২) মানদেব (৭৯০-৮১০ খ্রীঃ)
  - গুণকামদেব (৮১০-৩০ খ্রীঃ)
  - (২) শিবদেব (৮৩০-৫০)
  - নরেন্দ্রদেব (৮৫০-৭০)
  - বিক্রমসেনদেব (ভীমদেব) ৮৭০-৯০)
  - বিষ্ণুদেব (৮৯০-৯১০)
  - বিশ্বদেব (৯১০-৩০)

(ঠকুরীবংশ।)

অংশুবর্ম্মন (৬২০-৫২ খ্রীঃ) ভোগদেবী + শূরসেন বর্ম্মা
- ভোগবর্ম্মা
- ভাগ্যদেবী

জিষ্ণুগুপ্ত (৬৫২-৭২) উদয়দেব (৬৮০-৭০০ খ্রীঃ)

বিষ্ণুগুপ্ত (৬৭২-৮০) নরেন্দ্রদেব (৭০০-২০)

শিবদেব (৭২০-৫২) বৎসা দেবী
- বিজয়দেব
- (১) জয়দেব (৭৫২-৮০ খ্রীঃ) + রাজ্যমতী
  - বরদেব (৭৮০-৮০০)
  - শঙ্করদেব (৮০০-২০)
  - বর্দ্ধমানদেব (৮২০-৪০)
  - বলিদেব (৮৪০-৬০)
  - (২) জয়দেব (৮৬০-৮০)
  - বালার্জ্জুনদেব (৮৮০-৯০০)
  - বিক্রমদেব (৯০০-২০)
  - গুণকামদেব (৯২০-৪০)
  - ভোজদেব (৯৪০-৬০)
  - লক্ষ্মীকামদেব (৯৬০-৮০)
  - জয়কামদেব (৯৮০-১০০০)

আমরা ইতিপূর্ব্বে চারি পুরুষে একশতাব্দী গণনা করিয়া ৬৪০ খ্রীঃ লিচ্ছবীবংশীয় প্রথম শিব দেবের রাজ্যারম্ভের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি। শিবদেব ও অংশুবর্ম্মনের নামাঙ্কিত শাসনলি-পির আলোচনা হইতে এই সময়ে লিচ্ছবীরাজ শিবদেবের রাজত্ব সমাপ্ত হয় বলিয়া অনুমান

করিতেছি। এই প্রভেদ অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া, শিবদেবের পূর্ব্বতন ত্রয়োদশ জন নৃপতির রাজত্বকাল ২৬০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। ৬২০ হইতে ২৬০ বাদ দিয়া, ৩৬০ খ্রীঃ জয়দেবের রাজত্ব সময়ের আরম্ভ অনুমান-বলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বংশাবলীর মতে জয়বর্ম্মন (জয়দেব) চন্দ্রবর্ম্মার পুত্র ও ভূমিবর্ম্মনের পৌত্র। ভূমিবর্ম্মন ৩২০ খ্রীঃ নেপালে লিচ্ছবীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং জয়দেব দ্বারা তাঁহাদের আধিপত্য দূরীভূত হয়। গুপ্ত-সাম্রাজ্য মগধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে, লিচ্ছবীবংশ মগধ ও মিথিলা হইতে দূরীকৃত হইয়া নেপালের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ছয় শত বর্ষ কাল অল্লাধিক পরিমাণে নেপালে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সত্য কবীর।

জন্ম বিবরণ।

সৎগুরু হংস উবারণ আয়ে মন্ মে কিনহ বিচার।
জেঠ্ মাস্ বর্ষাৎ শন্তো, পগ্ ঢারোঁ চাঁদোয়ার॥
চোহু দিশ্ দামীন্ দমকে শন্তো শ্বেতকমল গুঞ্জার।
উওহ্ সাহেব তাঁহা আয়্ বিরাজে জল্ পর্ শেজ সত্তার॥
তব্ বালক্ তন্ ঠাঠো সাহেব নিকট সরোবর তীর।
সুর্ নর্ মুন্ সব দেখন্ আয়ে, সাহেব ধরা শরীর॥
চন্দন সাহুকে তীরিয়া শন্তো করণ্ গেয়ি আস্নান্ হো।
সুন্দর বালক দেখ্কে তীরিয়া লেহৎ গোদ লাগায় হো॥
হাসত্ খেলৎ ঘর বালক লায়ি চন্দন দেখ্ রীশান্ হো।
ইহ বালক্ কাঁহা পায়ো তীরিয়া ভেদ বতাও মোহে হো॥
ইহ বালক মোহি সাহেব দীনহা শোননা সৎ ভাও হো।
ইহ বালক প্রতিপালো স্বামী চলিহেঁ নাম তোহার হো॥
যায়্ ডার্ আও বালক তীরিয়া মানো কাহার হামার হো
ইহ বালককা কারণ তীরিয়া তুমহুকো দেব নীক্সার হো।
তব্ চেরিহাত্ মে বালক দীনহা আস্মি জল্ মে ডার হো।
দেহ ধর্তে ইহ দুঃখ, পঁধয়ো চেতো মুরুখ্ গোওঁার হো॥
নীরু নাম জোলাহে শন্তো গওন লিয়ে ঘর যায় হো।
তাকো নারী বড় ভাগিন্ নিমা বালাক জলমে পায় হো॥
নীরু দেখ্ রীশানে নিমা বেগে বালক বহাও হো।
লোক্ কুটুম্ সব দেখেন্ আবে হাঁস মরৎ সন্সার হো॥
তব্ সাহেব দীনহ হুকাঁরি নিমা লে চল্ আপনি ধাম হো।
মুক্তিকে ভেদ বাতাই হোঁ নীরু আই হেঁ তোরে কাম হো॥
পুর্বিলে জনমকে ব্রাহ্মণ নীরু সুরৎ বিসারো মোর হো।
পিছ্লী প্রীত্ কা কারণ নীরু দর্শনলাভ ভ্যাহয় তোর হো॥
মহাদেও তেহি মারগ্ শন্তো জাত্ হতে কৈলাস হো।
পাগ্ ধরি নিমা পুছন্ লাগি ই বালক্ কো আব্ হো॥
অতিবড় ভাগ্ তোমারি নিমা পুরবিলে জন্ম পকি ই হো।
তব্ ইহ তোহরে গৃহ্ আয়ে ইন্ পরতর্ কোই নাহি হো॥
ভাও প্রীতসে লেয়ব্ চলে কাশীছেত্র মাঝার হো।
ধন্য ভাগ্ উহ দেশকে শন্তো যাঁহা সাহেব পাঁগ্ ধার হো॥
অন্ন না পানী গ্রাসে ন কবহু দিন্ দিন্ পরমানন্দ হো।
নারী পুরুষ্ দো হল্সন্ লাগে মহারঙ্ক ধন পায়ে হো॥
অচ্ছয় বৃচ্ছ ঘর যাপেশন্তো আপ্ হতে নীহার হো।
ভাউর দেদে সখীয়া ভেটে গাবে মঙ্গলাচার হো॥
ধরমদাস বর পাইন্ শন্তো সুখ বিলাস তত্ত্ব সার হো॥
নানাভরণ সোহাওন্ শন্তো সুখ সম্পৎ পরিবার হো॥
সাহেব কবীর কা মঙ্গল শন্তো যো সন্মে চিৎলায় হো।
ভবজলপার উৎরে শন্তো সো সৎলোকে যায় হো॥

(অনুবাদ।)

সত্য কবীর।

জন্ম বিবরণ।

উদ্ধারিতে হংসগণে, বিচারিয়া মনে মনে
সদ্গুরু কবীর নারায়ণ,
বর্ষা ঋতু জ্যৈষ্ঠ মাস, চাঁদোয়ারে* স্বপ্রকাশ
হইলেন শুন সাধুজন।

* কাশীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ।

চৌদিক্ করিয়া আলা, দমকে দামিনী বালা,
শ্বেতপদ্মে ভ্রমর গুঞ্জরে,
সেই স্থানে সেই কালে, প্রভু আসি বিরাজিলে
শয্যা করি সলিল উপরে।
সাহেব করিয়া মায়া, ধরিলা বালক কায়া
নিকট সে সরোবর তীর,
সুর নর মুনি তবে, দেখিতে আইলা সবে
প্রভু ধরিয়াছেন শরীর।
চন্দন নামেতে সাহা, দৈবেতে তাহার জায়া
স্নান হেতু গেলা সরোবরে,
শিশু এক মনোহারী, নিরখি সাহার নারী
কোলে তুলি ল'য়ে গেলা ঘরে।
চন্দন সাহার বাসে, ঘরে শিশু খেলে হাসে
চন্দন আসিয়া দেখে তথা,
দেখি সাহা রাগে জ্বলে, ভার্য্যাকে শাসিয়া বলে
শীঘ্র বল শিশু পেলে কোথা ?
নারী বলে শুন বাণী, দেবতা দিলেন জানি
ইহা সত্য বলিলাম আমি,
ভেবে দেখ পরিণাম, তোমারি রহিবে নাম,
এই শিশু প্রতিপালো স্বামী।
সাহা বলে শীঘ্র যাও, শিশুকে ফেলিয়া দাও,
পেয়েছ যেখানে কুড়াইয়া,
নতুবা জানিও মনে, এই বালকের সনে
তোমাকেও দিব তাড়াইয়া,
পতির কঠোর বোলে, ফেলিয়া আসিতে জলে
চেড়ী হস্তে করিলা অর্পণ,
নিজে প্রভু অবতরি, এত দুঃখ দেহ ধরি
চেতহ গোঁয়ার মূর্খগণ।
করিয়া দ্বিরাগমন, নীরু নামে এক জন
জোলা, সেই পথে ঘরে যায়।
অতি বড় ভাগ্যবতী, নীরুভার্য্যা নিমা সতী
সরোবরে গিয়া শিশু পায়।
নীরু দেখি রাগে জ্বলে, বালিকা বধূরে বলে,
শীঘ্র কর শিশু পরিহার।

কুটুম্ব আসিবে দলে, নববধূ ছেলে কোলে
নিরখিয়ে হাসিবে সংসার।
তবে প্রভু হুঙ্কারিয়া, বলে দোঁহে সম্বোধিয়া
"নিমা মোরে নিয়া চল ঘরে।
শুন নিরু অভিমত, দেখাতে মুক্তির পথ
আসিয়াছি তোমাদের তরে।
শুন নিরু পূরবিলে,(১) তুমিত ব্রাহ্মণ ছিলে
আমারে হইলে বিস্মরণ।
পশ্চাতে করিলে প্রীতি, তাতে হলো এ সুকৃতি
পাইলে আমার দরশন"।
দৈবযোগে সেইপথে, শঙ্কর কৈলাস হতে
হেন কালে করেন গমন।
শঙ্করে বিনয় করি, পুছে নিমা পায় ধরি
"এই শিশু হয় কোন জন" ?
শিব কন নিমা প্রতি, তুমি বড় ভাগ্যবতী
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, তাই,
এই শিশু দয়া করে, আসিলা তোমার ঘরে
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।
নীরু নিমা দুই জনে, বহুপ্রীতি করি মনে
কাশীক্ষেত্রে নিয়া তবে চলে,
কি কব ভাগ্যের কথা, প্রভু পদ দিলা যথা
ধন্য দেশ সেই ভূমণ্ডলে।
কিবা অন্ন কিবা জল, কিছু নাহি করে তল
পরম আনন্দ শিশু ধরে।
নিরু নিমা হর্ষ-মন, অতি দীন হীন জন
রতন পাইল যেন ঘরে।
অশ্বত্থ বিটপ তলে, শিশু বসি কুতুহলে
খেলা করে আপন অন্তরে,
বামাগণ মিলিমিলি, দিয়া দিয়া করতালী
মঙ্গল আচার গান করে।
শুন সাধু ধর্ম্মদাস (২) সম্পদ সুখ-বিলাস
নানা রত্ন আর তত্ত্ব সার,

(১) পূর্ব্বজন্মে।
(২) ধর্ম্মদাস কবীরের প্রধান শিষ্য। তিনি গৃহী

তাঁহারি বরেতে সব, পেয়েছ নানা বৈভব
শোভা শান্তি প্রিয় পরিবার।
প্রভু কবীরের কথা, এই যে মঙ্গল গাথা
শুনে যেই হয়ে একমন,
ঘোর ভব পারাবার, অনায়াসে হয়ে পার
সত্য লোকে যায় সেই জন। (৩)

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রাজগৃহ—পঞ্চগিরি।

কে তোমরা উদাসীন ভাই পঞ্চজন—
মহাভারতের এ শ্মশান মাঝারে
কোন্ মাহাব্রতে আজি সমাধি-মগন
যুগান্তের ভস্মরাশি মাখি' কলেবরে ?
অথবা তোমরা কোন্ আর্য্যের সন্তান
স্পন্দহীন শাপভ্রষ্ট অহল্যার মত—
দেখাইয়া জননীর গৌরব নিশান
অধম সন্তানে, শাপ বিমোচনে রত !
তাই বুঝি অবিরাম উষ্ণ অশ্রুজল
ঢালিতেছ দিবানিশি সহস্র ধারায় ?
স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা এখন কি ফল ?
কাঁদিতে তোদের সাথে কেহ নাহি হায় !
কে আসে খুঁজিতে হেথা নিহিত রতন ?
কে শোনে গো তোমাদের অরণ্যে রোদন ?

শ্রীমন্মথনাথ দে।

দয়া।

বসুমতী ক্রোড় হ'তে মহীধর যথা
স্বরগের পানে ধায় ভেদিয়া গগন,
ভাবি কিন্তু বসুন্ধরা হবে মরুসম
হৃদি দ্বার খুলি তাই করে বিতরণ
স্বর্গীয় অমিয়া সম স্নিগ্ধ বারিধার ;—
তটিনীর রূপে যাহা বহি অনুক্ষণ
ধরা মাঝে সুখ শান্তি করিছে বিস্তার ;
ছায়া সমন্বিত তরু তীরে শত শত
ফলদানে তুষিতেছে ক্ষুধাতুর কত।
সেইমত কোন জন দয়া অবতার
মানব মাঝারে জন্ম করিয়া গ্রহণ
নিজগুণে উচ্চস্থান করে অধিকার ;—
পরদুঃখ নিপীড়িত মানস তাহার
হৃদয় খুলিয়া দয়া করে বিতরণ ;
যে দয়া প্রসাদে শান্তি লভে কত নরে ,—
লভি তারা পুনঃ তার সুফল বিতরে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

নিরাশ প্রণয়।

এইত আনন্দে আছি এই মোর বেশ,
এই ভাবে হেসে কেঁদে দিন হোক শেষ।
পূর্ণিমা নিশির শেষে বসন্ত কুসুম হাসে,
তাহাদের কাছে মোর না গেলে কি নয় ?
অমা রজনীর শেষে, না হয় এলানো কেশে,
চুমিয়া আসিব সেই ম্লান কুবলয় !
সন্ধ্যার শ্যামল শাখে, পাপিয়া ঘুমায়ে ডাকে,
করবীর মুখ চেয়ে অনূঢ়া যুঁথিকা,
লাল মাথা লাল চুল, আকাশের লাল ফুল,
সাগরে নামিয়া খেলে নক্ষত্র বালিকা।
প্রকৃতির নীরবতা, স্রোতের অফুট কথা,
না হয় যাবনা সেথা—উষার অঞ্চলে,

ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কবীর স্বয়ং আপনার এই জন্মকথা তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বলিয়াছেন।

(৩) বাঙ্গালী কবীর পন্থী পদমার রাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের নিকট মূল দোহা গুলি পাওয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য তাহার অনুবাদ বাঙ্গালায় করিলাম।

ফুটন্ত কুসুম গাঁথা, আধ হাসা আধ কাঁদা
শিশির সলিলে সুঁদী বাঁধুলীর দলে
জ্যোছনা স্তবক খেলে,সোণায় সোহাগা গলে,
অপরাজিতার লতা এক কোলে নুঁয়ে
যামিনীর শেষ ভাগে আধ মান আব রাগে,
শরত শেফালি ঝ'রে মঞ্জু-কুঞ্জ ছুঁয়ে,
শ্যামল মাধবী লতা, তরু শিরে শিরে গাঁথা।
পুষ্পা ভা পুষ্পিকা পাতি আধ জাগরণে
মেঘের বিজলী কণা, জ্বলন্ত অগ্নির দানা
বুঝিবা স্বরগ খোজে জাগ্রত স্বপনে,
ভাঙ্গিয়া আকাশ ঘর, পড়িতেছে নিরন্তর,
শোভাশান্তি অতুলন তাহাদের গায়,
কি কাজ সেথায় গিয়ে, সেথা হতে পলাইয়ে,
ঘুমাব যমুনা কূলে আঁধার বেলায়,
ছিন্ন বাস ভগ্ন মন, দেহ দহে অনুক্ষণ,
অশ্রুবারি ভারাক্রান্ত নয়ন-পল্লব
নিদাঘে মঞ্জরী চ্যুত, পতিত ফুলের মত,
কাঁদিব নয়ন-বারি ভরিয়া বিভব
জ্যোছনায় ঢেলে দিয়া আঁধারের রাশ
নিঃশ্বাসে উড়ায়ে দিব ফুলের সুবাস।
একটি বকুল ফুলে, ভালবাসা দিব ঢেলে,
কি কাজ আমার দিয়ে শত শত দল
ঘোর আঁধারের কোলে, ঘুমাব জগত ভুলে,
বিছাইয়া অশ্রুমাখা মলিন অঞ্চল।
চাহিনা করিতে লীলা প্রণয় প্রেমের খেলা
উপাস্য দেবতা মম নিষ্ঠুর নির্দ্দয়
দারুণ নৈরাশ্য নিয়ে, অশ্রুজলে দিব ধুয়ে,
বাঞ্ছিত আমার চির নিরাশ প্রণয়॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

দান।

১

সকলি দিয়েছি তারে
খালি বুক খানি আছে,
এখনো ভাবিছি আর
কি দিব পাইলে কাছে!

২

দিয়েছি তাহারে হাসি
বসন্তের উপবন,
শরৎ জোছনা খানি
জগতে যা অতুলন!

৩

বুকভরা—নিদারুণ
নিদাঘ তপন-তাপ
আমি রাখিয়াছি শুধু
জগতে যা অভিশাপ!

৪

মিলন দিয়েছি তারে
বিরহ রেখেছি আমি,
বিচ্ছেদের দুখভার
হয় নাই অনুগামী!

৫

প্রবৃত্তি রাখিয়া আমি
নিবৃত্তি দিয়েছি তারে,
কামনার মহা খাই
সে হৃদয় ছুতে নারে!

৬

নিদ্রা দিয়ে তার চখে
আছি নিয়ে জাগরণ,
এরূপ থাকিব সাধ
করিয়াছি আমরণ!

৭

সুখ—শান্তি ভালবাসা
যা কিছু সঁপিয়া তায়,
দুখের বোঝাটী— নিয়া
আছি নদী কিনারায়!

৮

মিলন হবেনা জানি
এ জীবনে এ জগতে,

তথাপি চাহিয়া আছি
যায় যদি এই পথে !
শ্রীভুবন মোহন দাস গুপ্ত।

তোমারি তরে।

১

শুধু তোমারি তরে ;
অনিমেষ চেয়ে থাকি আকাশ পরে !
ভাবি মনে, একবার যদি গো আস !
চাহিয়া মুখের পানে তেমনি হাস !
সকলি ভুলিব আমি জনম তরে।
শুধু তোমারি তরে !

২

শুধু তোমারি তরে ;
কাটাইব এজীবন ধেয়ান ভরে !
নীরবেতে চেয়ে রব ও মুখ পানে !
করিব জীবন শেষ, অনন্ত গানে !
কাঁপিবে বিশাল বিশ্ব পুলক ভরে !
শুধু তোমারি তরে !

৩

শুধু তোমারি তরে ;
প্রাণ যে কেমন করে বোঝে কি পরে ?
কিরূপে যে যায় দিন কি বলি আমি ?
জানেন সকল কথা অন্তর-যামী !
তুমি ও কি দেখিতেছ ? মন কি করে !
শুধু তোমারি তরে !

৪

শুধু তোমারি তরে !
রব না, রব না আমি, এ ক্ষুদ্র ঘরে !
অসার সংসার পানে আর না চাব !
অসীমে সসীম আমি মিশায়ে যাব !
ডুবিব জন্মের মত ভাব-সাগরে !
শুধু তোমারি তরে !
শ্রীনগেন্দ্রবালা ঘোষ।

খেলা।

এ বড় মজার খেলা,
দেখিতেছি দুটি বেলা,
দেখে দেখে হতজ্ঞান, কথা নাহি সরে ;
হাসি আসে, কান্না আসে,
অশ্রু-জলে বুক ভাসে,
দুটি বেলা হেন খেলা প্রাণ মন হরে।
কেহ পিতা, কেহ মাতা,
কেহ ভগ্নী, কেহ ভ্রাতা,
কেহ শত্রু কেহ মিত্র, কত বেশ ধরে !
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে
কত ভাবে কত ছাঁদে,
কে বুঝে কে কোন্ সাজে কিবা রঙ্গ করে ?
এক আসে, আর যায়,
ফের আসে, ফের যায়,
কত পট, কত নট, কত রঙ্গ করে ;
আজ কি ?—না রোগ শোক,
কাল কি ?—না দুঃখভোগ,
মিলন বিচ্ছেদ কত, কত ঘরে ঘরে !
সূতিকা-ঘরের পাশে,
শ্মশান-আঁধার আসে,
মাঝারে বাসর-আলো চকিতের তরে !
এ লীলার কোথা শেষ ?
কে বলিবে—কোথা শেষ ?
বহিয়া চলেছে কত বংশ পরম্পরে !
বিশ্ব মহারঙ্গ ভূমি,
রঙ্গ করি আমি তুমি ;
যে টুকু যাহার অংশ খেলে যাই সবে ;
আবার আসিবে যারা
এমনি করিবে তারা,
হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে, শেষে যাবে মরে।
এক মহা যাদুকর
খেলাইছে নিরন্তর,
তাহারি ইঙ্গিতে হেথা সবে রঙ্গ করে,

আপনি কোথায় থাকে
কে পাবে খুঁজিয়ে তাকে ?
কে যে খেলে ? কেন খেলে ? কার সাধ্য ধরে ?
ঠিক যেন ছায়াবাজী,
সম্মুখে পুতুল-রাজি,
লুকায়ে সে বাজীকর সূক্ষ্ম সূত্র ধ'রে ;
নাচায় খেয়াল মত
মানুষ পুতুল যত,
কে জানে কি সুখ তার হেন রঙ্গ ক'রে !
হেসে তুমি গ'লে যাও,
কেঁদে তুমি ম'রে যাও,
ব'য়ে গেছে তার ; তুমি যাবে যাও ম'রে ;
নিজে সে পাগল পারা,
লীলামদে মাতোয়ারা ;
প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করে প্রাণ ভ'রে !
খেলান স্বভাব তার,
ভাঙ্গে গড়ে বার বার,
ভেঙ্গে গ'ড়ে তাই তার আনন্দ না ধরে ;
কে তুমি থমকি চাও ?
খেলে যাও খেলে যাও,
দাঁড়ালে শতেক বাজ তব শির পরে।
কি ছার তোমার ইচ্ছা ?
পূরে শুধু তারি ইচ্ছা ;
কে তুমি কীটাণুকীট ? কে তোমারে ডরে ?
এসেছ নাচিতে ভবে
নেচে নেচে যাও তবে ;
কলের পুতুল কেন মিছা ইচ্ছা করে ?
তোমার যে স্বাধীনতা,
তাহারি ত অধীনতা,
সোণাকাটি রূপাকাটি সে যে আছে ধ'রে ;
যত দূর যাবে যাও,
যত পার খেলে যাও,
খেলায়ে নাকাল ক'রে আনিবে সে ধ'রে।
আপনি মানিয়ে হার
লইবে শরণ তার,
সেই আশে আড়ালে সে আছে চুপ ক'রে ;
এত যে গো ছুটাছুটি,
শেষে পায়ে লুঠালুঠি !
সে ধরিবে হা'ত দুটি, তবে যাবে ত'রে !
এ খেলা খেলিতে তবে
কে বা প্রতিবাদী হবে ?
খেলুক সে যত পারে ! খেলে যাই তবে !
খেলায় মুকতি যবে,
কেন খেলিবনা তবে ?
খেলার দাপটে দিক্ হাড় চূর্ণ করে !
তারি হাতে যন্ত্র হই ?
তাহারি শরণ লই,
যা করিতে চায় মোরে তাই যাক্ ক'রে,
ক্ষুদ্র ধূলি-বিন্দু আমি,
সিন্ধু সে আমার স্বামী,
আমার আমিত্ব যাহা লউক সে হ'রে !
তাই বসে দুটি বেলা
দেখি এ বিচিত্র খেলা,
হাসি কাঁদি কাঁদি হাসি যায় প্রাণ ভরে,
মনে বড় সাধ জাগে,
এ খেলা চ'খের আগে
দেখিতে দেখিতে যেন যেতে পারি ম'রে !

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

"রাজরাজেশ্বরী" জলযন্ত্র। *

পতিকোলে রাখি শির লোক মুখে শুনি,
পরাণ ত্যজিলে রাখি ! মহা পিপাসায়,

* মুক্তাগাছার বিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর নামে ময়মনসিংহে উক্ত জলের কল স্থাপন করিয়াছেন। রাণী মৃত্যুকালে অতৃপ্ত পিপাসায় "জল, জল" করিয়া মরিয়াছিলেন।

তাই সে এ ভোগবতী প্রেমিক ফাল্গুনি,
বহাইলা তব চির তৃপ্তির আশায় !
বিশ্বের বিশুষ্ক কণ্ঠ সুধাসিক্ত করি,
তোমার অনন্ত তৃপ্তি করিবে বিধান,
এ জীবন জীবগণে জীবন্ বিতরি,
অনন্ত জীবন শান্তি করিবে প্রদান !
তব এ স্নেহের শ্রাদ্ধ, প্রেমের তর্পণ,
সর্ব্বভূতময় মহা মহান্ মঙ্গল,
জগতের তুষ্টে তুষ্ট নিজে নারায়ণ,
রাখিবে এ পুণ্যকীর্ত্তি চির সমুজ্জল !
'আব্রহ্ম জগত্ তৃপ্যতাম্' মন্ত্র পড়ি,
প্রতিষ্ঠিলা জলযন্ত্র "রাজরাজেশ্বরী !"

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

মায়া।

কে এঁকেছে বিশ্ব ছবি,
গ্রহ, তারা, শশী, রবি,
নিপুণ তুলিটি দিয়ে,
আকাশের গায়,
ঘুরে ফিরে আসে ওরা,
প্রেম ভরে মাতোয়ারা,
ফিরে ফিরে কেন অত
মোর পানে চায় ?
আমার পাগল প্রাণ,
দিবানিশি করে গান,
ওদের স্নেহের কথা
আকুল ভাষায়।
সুদূরে রয়েছে ওরা
তবু যে কেমন ধারা
কি বাঁধেনে আছি বাঁধা
অটুট মায়ায়।
একি এ সম্বন্ধ ঘোর,
বাঁধিয়াছে প্রেম ডোর,
নীরবে টানিছে প্রাণ
দিবস নিশায়।
দেখ দেখি মেশামিশি,
দিবানিশি হাসি খুসি,
টানিছে অমিয়া রাশি
ব্যাকুল হিয়ায়।

২

কেমন করিছে খেলা,
কি হরষে সারা বেলা।
সুনীল শ্যামল রাশি
ধরণীর কোলে,
তুচ্ছ করি অভিমান,
চিরদিন করে গান,
উচ্চ করি নত শির
কি হরষে দোলে
গহন হরষ ভরে,
কেনরে আহ্বান করে,
কি আনন্দে চিরদিন
এত দোলাদুলি ;
মাধবী তমাল গায়,
কি আনন্দে উঠে যায়,
নিয়ত চুম্বন আর
চির কোলাকুলি
থরে থরে ফুটে ফুল,
জড় করে অলি কুল,
মুগ্ধ করে মন প্রাণ
মলয় সুবাসে,
জগতে বিলায় প্রাণ,
নাহি চাহে প্রতিদান
সকলের পানে চেয়ে
কতই না হাসে !

৩

আজীবন একি মেলা,
একি এ মায়ার খেলা,

নিয়তই সুখ-স্মৃতি
কেন বল এত আশা,
কেন এত ভালবাসা,
কেন নাগ-পাশে বাঁধা
আত্ম বিনিময়ে
একিরে বিষম বান,
আকুল করেছে প্রাণ,
মোহনেত্রে হেরিতেছি
সব মহা-মায়া,
বিশ্ব-ব্যাপি ওইকথা,
ওই সূত্রে সবে গাঁথা,

সংসার কুহক মায়া,
কল্পনার ছায়া,
একি মোহ আবরণ,
কেবা করে উন্মোচন,
ভুলায়ে রেখনা চির
কেটে যায় বেলা,
প্রকাশ, তোমার জ্যোতি,
হে অনাদি বিশ্বপতি,
পারিনা খেলিতে আর
এই চির খেলা!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

প্রকৃতি-পুরুষ ও অবতারবাদ।

প্রকৃতি ও পুরুষ আমাদের হাড়ে মাসে জড়িত হইয়া গিয়াছে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমাদের বেশী আপনার। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী, বেদের আদিম অংশ সাংখ্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু আমাদের পুরাণকারেরা, বেদ, সাংখ্য ও বেদান্ত এই তিন মিলাইয়া একটি অপূর্ব্বতত্ত্ব বাহির করিয়াছেন;—জড় অজড়ে ও শেষে জড়ে অজড়ে মিলাইয়া, অপূর্ব্ব পৌরাণিক ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে; পুরাণের ভিত্তি প্রায়শঃই বেদান্ত। পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব কয়টি বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকৃতি-পুরুষ অনেকটা বুঝা যাইবে।

প্রথম সৃষ্টির আদিতে,—তখন ঠিক এই সৃষ্টি হয় নাই, ভগবতী প্রকৃতির প্রথম আবির্ভাব—কালীমূর্ত্তি। তখন পূর্ণ জড়বাদের রাজত্ব, প্রকৃতিই সর্ব্বস্ব, পুরুষ কেবল আছেন মাত্র, তাহাও প্রকৃতির পদতলে। প্রকৃতির নগ্না অন্ধকারময়ী রণোন্মত্তা মূর্ত্তি। মহত্তত্ত্ব নয়, অহঙ্কারও নয়, দুইয়ের মাঝা মাঝি। প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা—সবে পুরুষ মিলিয়াছে। তখনকার শাস্ত্র প্রমাণ দেয় যে, পুরুষের স্থান হইয়াছে বটে, কিন্তু বড় অস্পষ্ট। দশমহাবিদ্যা সবই প্রকৃতির মূর্ত্তি,—কালী হইতে কমলা,—ভীমা হইতে সৌম্যা, প্রভেদ এই মাত্র। "মহতের" পূর্ব্বে যে প্রবল বিপ্লবে প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গাভিলাষী হয়, তাহা হইতে "অহঙ্কারাবস্থা" সৌম্য বটে।

দ্বিতীয় যুগে রাম অবতার। এ যুগেও প্রকৃতির প্রভুত্বটা কিছু বেশী, রাম কৈকেয়ীর অনুজ্ঞায় বনবাসী, সীতার জন্য হরধনুভঙ্গকারী, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ অবস্থায় কখন রাম, কখন সীতা। কিন্তু রাম সীতার অপেক্ষা সীতারামই প্রবল বেশী, রাম সীতা ত্যাগ করিয়াও নকল সীতা করিয়াছিলেন। ইহাও জড়বাদের যুগ, তবে শেষ বটে।

তৃতীয় যুগে কৃষ্ণ অবতার। প্রকৃতির আধিপত্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, পুরুষই সর্ব্বেসর্ব্বা বটে, সহস্র গোপাঙ্গনার একমাত্র

আকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণ। একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুরুষ প্রধান হইলেও প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বিযুক্ত নহেন। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহেরা ভুলেন নাই, ভুল করিতেছি আমরা, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাসরসময়, তেমনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাণ্ডারী;—আর আমাদের? কেবল শ্যামনটবররূপ হাতে বাঁশীটি। জনার্দ্দন! সে শঙ্খ চক্র ফেলিলে কোথায়?

চতুর্থ যুগে বুদ্ধ অবতার। প্রকৃতির নাম মাত্রও নাই। বুঝিবা বুঝিবার ভুল হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃতির সঙ্গত্যাগী বুদ্ধ ভগবান, সংসারকে প্রকৃতিসঙ্গ করিতে লওয়াইতেছিলেন। কান্তা হেয় ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, ইহা এই যুগেরই উপদেশ, সাংখ্য বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তাহাই এই ভুল। কিন্তু ভুল বড় বিষম! যদি মুক্তি কোথায় থাকে, তবে সে সংসারের মধ্যেই আছে, সংসার প্রকৃতি ছাড়া নহে; যিনি প্রকৃতির মোহ ছাড়াইবার চেষ্টা করেন, তিনি এক গর্ত্ত হইতে উদ্ধার হইয়া অন্য গর্ত্তে নিপতিত হন। সাংখ্যই ঠিক বটে,—কিন্তু বিপরীত অর্থে নহে।

শেষ যুগে, শেষ অবতারের ছায়া আমরা পাইয়াছি, অর্দ্ধ প্রকৃতি, অর্দ্ধ পুরুষ, আধা শ্যাম, আধা রাধা মূর্ত্তি,—যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে তাহাতেই আমাদের সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়,—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।

প্রকৃতি নহিলে পুরুষের কার্য্য করিবার ক্ষেত্র থাকে না, আবার পুরুষ নহিলে প্রকৃতির কার্য্যকরী শক্তি হয় না, এই রহস্য! তাহাই সুধু রাধা বা কৃষ্ণ কেহ পূজা করে না, শিব ভিন্ন শক্তির পূজা নাই, গৌরীপট্টে শিব স্থাপনা সৃষ্টি-রহস্যের সঙ্কেত মাত্র। এই রাধাকৃষ্ণ, এই শিবশক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ!

এমন ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের আদ্যন্ত ধর্ম্মেতিহাস কেমন শুনায়?

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৭। The Second Annual Report of the Calcutta Deaf and Dumb School—Session 1894-95.

সৎকাজের সহায় ভগবান, বধির ও মূক বিদ্যালয়ের সূত্রপাত ও তাহার উন্নতি ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ব বর্ষের স্থিত সহ, ৩১শে জানুয়ারি(১৮৯৫)পর্য্যন্ত আয় মোট১৪০৫১।৶০, মোট ব্যয় ৪০৫০৸২ পাই; ব্যয় বাদে ১০০০০৷৵১০ পাই স্থিত আছে। বিদ্যালয় হইতে বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূক বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন। বর্ষের প্রারম্ভে ১১ জন ছাত্র ছিল, বর্ষ শেষের সময় ২১ জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ, ৯ জন কায়স্থ, ৩ জন সুবর্ণ বণিক্, ১ জন সদ্‌গোপ, ১ জন তেলি, ১ জন ফিরিঙ্গি এবং ১ জন অনাথ বালক। স্কুলের সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেক পদস্থ ব্যক্তির নাম আছে। পৃথিবীর শব্দ শ্রবণ ও ভাষা কথনে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য জীব পৃথিবীতে আর নাই। কেন না, তাহারা জ্ঞান লাভে বঞ্চিত। জ্ঞানই মনুষ্যের জীবনী-শক্তি। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর ন্যায়। এতকাল এদেশের বধির ও মূক ব্যক্তিরা পশুর ন্যায় প্রতিপালিত হইত। পরম

সৌভাগ্যের কথা, এই হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের জীবন-সঞ্চারের জন্য এদেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ এতদিন পরে অগ্রসর হইয়াছেন। দেখিতে আনন্দ, ভাবিতে আনন্দ। বিধাতা এই স্কুলের প্রতি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। যাঁহারা এই স্কুলের পরিচালক, শিক্ষক, তাঁহারা এদেশের সকলের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই স্কুলের প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করিলে আমরা একান্ত সুখী হইব।

৩৮। পারিজাতমালা—বাবু হারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ৷৷০। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের একত্র সমাবেশ। তাহার অধিকাংশই সংগৃহীত। গল্পচ্ছলে নীতিপূর্ণ উপদেশ প্রচারই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস' 'পূর্ণতীর্থ' 'মীরাবাই' প্রভৃতি কয়েকটী গল্পের ভাব সুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা গল্প পড়িয়া অবসর কাটাইতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগকে হারাণ বাবুর পারিজাতমালা পড়িতে অনুরোধ করি।

৩৯। পদ্যস্তবক—কোকিলেশ্বর কাব্যতীর্থ বি-এ প্রণীত, মূল্য ৵০। গ্রন্থকার ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব লইয়া কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।

৪০। সারনিত্যক্রিয়া—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী কৃত, বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য।০। স্বামীজি বলেন "জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণা করিলে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্ব্বদা চেতনময়রূপে বিরাজমান পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে।" এ পুস্তকে এইরূপ সাধন প্রণালী সম্বন্ধেই উপদেশ আছে। তিনি নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার লেখা সম্বন্ধে অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন।

৪১। জ্ঞান-প্রসূন—বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। 'বোধোদয়' 'পাঠমঞ্জরী' 'জ্ঞান-মুকুল' 'নূতনপাঠ' প্রভৃতির ন্যায় ইহাও একখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। মাইনর ও মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ান যাইতে পারে।

৪২। সুখতারা—শ্রীদধিভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০। একখানি বিরহ-বিলাপ গীতি। ক্ষুদ্র পুস্তক। একই ভাব ও উক্তির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ভাল লাগে না। ছন্দোভঙ্গ দোষ কচিৎ কচিৎ আছে, স্থানে স্থানে রচনা শক্তির ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল।

৪৩। ভারত-গাথা—বাবু অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০। ছাপা ও কাগজ ভাল। নামেই পুস্তকের পরিচয়। কবিতাকারে ভারত-ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অনুষ্ঠান মৌলিক বটে। ছন্দোবন্ধে ইতিহাস পাঠ বালক বালিকাদের পক্ষে আমোদজনক হইতে পারে। দুই এক স্থলে জটিলতা থাকিলেও মোটের উপর ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে।

৪৪। ঘড়ী ও তাহার সংস্কার—বাবু হীরালাল ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৷৷০। ইহাতে পকেট ঘড়ীর যাবতীয় যন্ত্রাদির বিবরণ ও তাহাদের সংস্কার বিষয়ক সবিস্তার উপদেশ আছে। শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ যে জাতির ভাষায় যত প্রচারিত হইবে, সে জাতি ও ভাষার ততই মঙ্গল। আজ কাল ঘটিকা যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা কিরূপে সংস্কার করিতে হয়, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, এই পুস্তকে আমাদের একটী অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে। উপক্রমণিকাতে সময় নিরূপণ যন্ত্রের একটী সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান ইতিবৃত্ত আছে। পুস্তক সরল ও পরিষ্কৃত ভাষায় লিখিত। যন্ত্রাদির পরিচয় ও আবশ্যকতা চিত্র দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও চিত্রগুলি আর একটু পরিষ্কৃত হইলে ভাল হইত।

৪৫। পুণ্যদাপ্রসাদ—বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এ ক্ষুদ্র জীবনীতে পড়িবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। আত্মীয় স্বজনের হাত এড়াইতে না পারিয়া বিবাহে সম্মতি দেওয়া পুণ্যদা প্রসাদের জীবনের এক অন্ধকারময় পরিচ্ছেদ। এইরূপ দুই একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বাদ দিয়া তাঁহার বিশ্বাস, নির্ভরতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও নৈতিক সাহস অনুকরণীয়। স্বাধীন ও পুণ্যময় জ্যোতিঃ যেখানে যতটুকু ফোটে, তাহাই জগতের মঙ্গলের কারণ।

৪৬। মনের কথা—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৷০। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। লেখক দেব প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া নারী প্রেমে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ছন্দোগত ও রচনাগত দোষ বাদ দিলেও এ পুস্তকে কবিত্ব নাই। মনের কথা মনে রাখিলেই ভাল হইত।

৪৭। নিদর্শন—শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ২৲। গ্রন্থকার পুরাণবর্ণিত সৃষ্টি কল্পনা ও দেবতা কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত আদৌ ইহার ঐক্য নাই। স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন,কিন্তু যুক্তি এক, আর অনুমান এক। এ গ্রন্থের যুক্তি বালুকা-গৃহের ন্যায় দৃঢ়। প্রথমেই গ্রন্থকার দম্ভের সহিত বলিয়াছেন "আমরা ক্রমে যে সৃষ্টি, দেবতা ও ধর্ম্ম রহস্যাদি প্রচার করিব,শিক্ষিত সমাজ যদি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরম প্রজ্ঞাবান হিন্দু হইতে হইবে।" এ কথার পর আমাদের আর বক্তব্য কিছুই নাই।

৪৮। আশা-কাব্য—বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, বি-এ প্রণীত। মূল্য (কাপড়ে বাঁধান) ১৲ টাকা। এ পুস্তকের ছাপা ভাল, কাগজ ভাল এবং পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত। আশা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির চিত্র কয়েক খানি অতি মনোরম হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, আশা মনুষ্য-জীবনের ও জীবন গত উন্নতির একমাত্র অবলম্বন; নিরাশা সর্ব্বত্রই ধ্বংস ও পতন আনয়ন করে। কর্ম্ম,মানব জীবনের মূলমন্ত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য। আশা, সেই কর্ম্মের প্রবর্ত্তিকা। এই আশার শক্তি প্রতিপন্ন করিতে গ্রন্থকার কয়েকটী দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কল্পনা-প্রসূত বিরজা চিত্র, সুনীতি, ধ্রুব, যোসেফিন প্রধান। সুনীতির স্বামী-ভক্তি, ধ্রুবের অটল বিশ্বাস, যোসেফিনের ভবিষ্যে নির্ভরতা সুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গ-বিধবার জন্য কবির খেদ,কারাগারে যোসেফিনের প্রতি তাঁহার হত স্বামীর আত্মার উপদেশ হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণনায় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। যোসেফিনের কারামুক্তি বর্ণনায় প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ অনুকরণ করিয়াছেন। মোটের উপর লেখকের লিপি-চাতুর্য্য ও বর্ণনা শক্তি আছে। যথাযোগ্য উপমা সন্নিবেশ অনেক স্থলে প্রশংসনীয়।

৪৯। ঠগীকাহিনী—প্রথমখণ্ড—বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত,মূল্য ১৷৷০, সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইংরেজী পুস্তকের ভাব লইয়া এ পুস্তক রচিত হইয়াছে। ঠগীদিগের মুখে স্বীয় ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজরাজত্বের মধ্য ভাগে দক্ষিণভারতে ঠগীগণ কিরূপে নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করিত, তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবুর লেখনীর প্রভুত শক্তি আছে।

৫০। অশ্রু—[illegible] রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৵০। বাল্য কালের ভালবাসা অকপট ও পবিত্র। বন্ধুর শোকে বালক বন্ধুর কয়েক বিন্দু নির্ম্মল অশ্রু এ ক্ষুদ্র পুস্তকের উপাদান।

৫১। মোহন-মালা—বাবু হারাণ চন্দ্র রক্ষিত বিরচিত, মূল্য ৷৷০ আনা। মায়া, লীলা, প্রায়শ্চিত্ত ও গণনা এই চারিটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গল্প কয়েকটী মৌলিক দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে যায়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভাষায় দখল থাকাতে যথাস্থানে উপযুক্ত ভাবেরও পরিস্ফুটন হইয়াছে। সন্ন্যাসী, গুরুদেব, জমিদারের অত্যাচার প্রভৃতি চিত্র বঙ্কিম বাবুর আমল হইতে বহু বার চিত্রিত হইয়াছে, সুতরাং পুরাতন।

৫২। হৃদয়োচ্ছ্বাস—বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ রচিত (For private circulation only) ছাপা ভাল, কাগজ ভাল। রুচি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব শক্তি ফুটিয়াছে, পড়িয়া প্রীত হইলাম।

৫৩। সিন্ধু-সঙ্গীত—বাবু শশাঙ্ক মোহন সেন বি-এ প্রণীত, মূল্য ৷৵০। এ ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক খানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। অনেক স্থলে সুন্দর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। পাশ্চাত্য শিক্ষা উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিলে,এবং তাহার সহিত স্বাভাবিক কবিত্বের যোগ হইলে যে ফল সম্ভব, এ সিন্ধুসঙ্গীত তাহারই অঙ্কুর। লেখকের মুকুলিত কবিতা-প্রসূন কালে পূর্ণবিকশিত হইলে,বঙ্গকাব্যের কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্গ পুষ্টি হইবে, আশা করি।

৫৪। পরলোক ও মুক্তি—শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মূল্য ৵০। অতি সংক্ষেপে সরল বিশুদ্ধ ভাষায় পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে মোটামুটি উপদেশ লিখিত হইয়াছে।

৫৫। গান ও কবিতা—বাবু বরদাকান্ত সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥০। নানা বিষয়িণী কতকগুলি কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। বরদা বাবুর গানে প্রাণ, কবিতায় হৃদয় ও ভাষায় কোমলতা আছে। কীর্ত্তিনাশার ঐতিহাসিক সংশ্রবে অনেক নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায়।

৫৬। অনুভূতি বিবরণাদর্শঃ—শ্রীমৎ স্বামী ভাস্বরানন্দ সরস্বতী বিরচিতঃ। শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ, আধ্যাত্মিক ভাব ও হিন্দি অনুবাদ সহিত প্রকাশিত। গ্রন্থের পূর্ব্বাভাসে স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী সরল সংস্কৃত ও বাঙ্গালাতে সংযুক্ত হইয়াছে। মূল শ্লোক মাত্র ১৩টী। তাহা অতি দক্ষতার সহিত রচিত। সরল ভাষায় ভাষ্য লিখিয়া অনুবাদকারক শ্লোকার্থ সহজবোধ্য করিয়াছেন। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। পুস্তক পাঠে প্রীত হইলাম। কিন্তু আমাদের সহিত সমস্ত মত মিলে না। মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধ প্রণালীতে(Un-psychological system) অহংতত্ত্বের মীমাংসা করিলে দ্বিবিধ চরমে উপনীত হওয়া যায়। একদিকে জড় প্রধান মত (Materialistic view)অন্যদিকে আত্মপ্রধান মত(Pantheistic view)। এ পুস্তক শেষোক্ত প্রকার আত্ম-দর্শন-জনিত জ্ঞান প্রচার করিতেছে।

৫৭। ভক্তি-উপহার—শিক্ষকের বিদায় গ্রহণ কালে বালকগণের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র। অনুষ্ঠান ভাল। সমালোচনার কিছু নাই।

৫৮। কবিতা-মুকুল—প্রথমভাগ (সচিত্র) বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ-সম্পাদিত, মূল্য ৵০। রামানন্দ বাবুর বর্ণ-পরিচয়ের চিত্রগুলি এ পুস্তক শোভিত করিয়াছে। বোধদয় ও শিশুশিক্ষা তৃতীয়-ভাগের সহিত এপুস্তক পড়ান যাইতে পারে।

৫৯। শিশুগাথা—(সচিত্র) বাবু বিপিন চন্দ্র পাল প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। বালকবালিকাদের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে। চিত্রগুলি তত ভাল হয় নাই। কোন কোন গল্পের বিষয় কঠিন হইয়াছে, তাহাতে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের বুঝিবার পক্ষে কিছু দুরূহ হইবে।

৬০। কবিতা-মুকুল—প্রথমভাগ, বাবু তারিণীচরণ সেন প্রণীত (তৃতীয় সংস্করণ) সংযুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত। তারিণী বাবুর রচনা ভাল। পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

৬১। সচিত্র-নারী-রত্ন-মালা—বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত। মূল্য ॥০। দেশীয় ও বিদেশীয় ১৩টি রমণী-রত্নের জীবনী সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মাতৃজাতির পুণ্যগাথা স্ত্রীলোকমাত্রেরই একবার পাঠ করা উচিত।

বিদ্যাসাগর। (২)

কার্য্যক্ষেত্রে।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি যে,প্রকৃতি বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত আভরণে সজ্জিত করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় বিদ্যাসাগর পিতৃকুলে মস্তিষ্কশক্তি ও মাতৃকুলে উৎকৃষ্ট হৃদয়-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস ও ভগবতীদেবী তাঁহাকে ধনসম্পদ দিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে যে সম্পদ্ দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নাই। অধিকন্তু তাঁহারা গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে বিদ্যা দিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তিনি দয়া, সৌজন্য, সাহস, সত্যবাদিতা, তেজস্বিতা ও শ্রমশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রচলিত পাশ্চাত্যশিক্ষা তিনি লাভ করেন নাই যে সুকুমার বৃত্তিগুলি শুকাইয়া যাইবে; কোমল সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা আরো কোমলতর হইয়াছিল। পরিবার ছাড়িয়া কলিকাতার বাসায় থাকিলে অনেকের পারিবারিক বৃত্তি হীনবল হয়। তিনি বাসায় পিতা, ভ্রাতা ও দেশীয় অন্যান্য লোকের সহবাসে থাকিয়া পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃসেবার আনন্দ উপভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। এক অপরিচিত মহিলার স্নেহে মাতৃস্নেহ ও হিন্দুনারী চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পাইয়াছিলেন। এতগুলি সুযোগে তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয় কিরূপ উৎকর্ষতালাভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার নিদর্শন সংগ্রহ করিতে হইবে।

জন্মগ্রহণকালে দেশের যে অবস্থা থাকে, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা—মরণকালে যিনি দেখাইতে পারেন যে তাঁ[illegible] গুণে সে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—তাঁহারই জন্মগ্রহণ সার্থক, তিনিই মহাপুরুষ। এ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের মিলে। এ সৌভাগ্য লাভ করিতে উপকরণের প্রয়োজন। কাহার কাহারও ভাগ্যে উপকরণের আয়োজন হয়, কিন্তু বিপথে চালিত হইয়া অপব্যয় হইয়া যায়। বিদ্যাসাগরও উপকরণের আয়োজন করিয়াছিলেন। সে আয়োজনের সদ্ব্যয় কি অপব্যয় হইয়াছিল, জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে, বিদ্যাসাগর মহাপুরুষ কি না। সে কথা বিচার করিবার আমাদের এখনও সময় হয় নাই। বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বিদ্যাসাগর নাম লইয়া বাহির হইয়াছেন মাত্র। পরিবারের এখনও গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন হয় নাই। পিতা ঠাকুরদাস এখন কুড়ি টাকা বেতনে বড়বাজারে চাকুরী করিতেছেন। ভ্রাতা দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র এখনও পঠদ্দশায়। বিদেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান,কলিকাতায় অভিভাবক নাই, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে ভালবাসিতেন,তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কি ক্ষমতা যে গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজনে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করিতে পারেন। বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি নহে যে, জীবন-সংগ্রামে কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিবেন। তাঁহার জীবনচরিতকারেরা কেহই এরূপ সাহায্য ভিক্ষার কথা উল্লেখ করেন নাই। সে সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কয়েকটী ছাত্র লইয়া একটি টোল

খুলিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব পুরুষগণ এইরূপ ছিলেন। ঠাকুরদাস বাধ্য হইয়া চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত পড়াইয়া দেশে লইয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া পিতৃকুলের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিবেন। পিতা, পুত্রের প্রথমাবস্থার বৃত্তিলব্ধ টাকায় বীরসিংহ গ্রামের নিকট কতকটা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জমিতে তাঁহার টোল বসাইবার সংকল্প ছিল। টোল বসাইয়া ছাত্র রাখিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিবেন, পিতার এ সাধ বরাবরই ছিল। পুত্রের বিদ্যা সংবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার চির-পোষিত সাধ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিংশতি বৎসর বয়সে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হন। ইহার কয়েক দিবস পরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকিবার সময় মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরের গুণবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই চাকরী পাইয়াই বিদ্যাসাগর পিতাকে কর্ম্ম হইতে অবসৃত করাইয়া বীরসিংহে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা পাঠাইতেন, অবশিষ্ট ত্রিশ টাকায় কলিকাতার বাসায় ৯।১০ জনের খরচ ও দীনবন্ধু এবং শম্ভুচন্দ্রের অধ্যয়ন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী করিবার সময়েও তিনি সকলের মত নিয়মানুসারে রন্ধন করিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চারিবৎসর চাকরী করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকতা করিবার সময় তাৎকালিক এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারী মৌবাট সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। মৌবাট সাহেব নিজেই বিদ্যাসাগরকে ঐ পদ প্রদান করেন। দুই বৎসর চাকরী করিয়া সম্পাদক রসময় দত্তের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকেন। তাহার পর কিছু দিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্‌রাইটারের কার্য্য করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের পদে এবং তাহার পর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপকের পদে দেড়শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ইহার পর ঐ পদের বেতন ৩০০৲ টাকা হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর এ কর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যালয় সমূহের অতিরিক্ত পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি এই চাকরী পরিত্যাগ করেন, তাহার পর তিনি আর চাকরী করেন নাই। তখন তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র। যে সময়ে লোকে হয়ত চাকরী আরম্ভ করে, বিদ্যাসাগর বিদ্যা বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, কার্য্য-পটুতা ও তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পাঁচ শত টাকার চাকরী ফুৎকারের মত পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকা আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি ধনবান নহেন; বিধবা-বিবাহের আয়োজনে বিষম ঋণগ্রস্ত। পরদিন কি খাইবেন নিশ্চয় ছিল না, তাঁহার

কোন বন্ধু ব্যবসায় বুদ্ধির পরামর্শ দিলে তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "বরং মুদীর দোকান করিয়া খাইব, তথাপি আত্মসম্মান হারাইয়া পাঁচশত টাকার চাকরী করিব না।"

কর্ম্মক্ষেত্রে মনোবৃত্তি ব্যাবৃতি লাভ করে, সাধু অসাধুর সঙ্গতি লাভ হয়, লোক-চরিত্র শিক্ষা হয়, প্রবীণতা জন্মে। শিক্ষা বিস্তারের কৌশলে যে মেট্রপলিটন কলেজ একদিন ভারতবর্ষে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে বিদ্যাসাগর সে কৌশল শিক্ষা করেন। চাকরী করিতে যাইয়া অনেকের স্বার্থপরায়ণতা, কৃপণতা ও পিশুনতার বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে, উপযাচকগণ কর্ত্তৃক অসময়ে বিরক্ত হইতে হইলে, নির্ব্বোধ বালকগণকে বারবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে, অপাত্রে পরিশ্রম অপব্যয়িত হইতে দেখিলে, ধীরস্বভাব মনীষিগণেরও ধৈর্য্যের অবসান হয়। যে অমানুষী পরিশ্রমে বিদ্যাসাগরের দিনপাত হইত, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, অথচ তাঁহার প্রসন্নতার কখন অভাব হয় নাই। অর্থগৃধ্নুতা তেজস্বীকে চাটুকারে পরিণত করে। বিদ্যাসাগর মার্শেল সাহেবের অনুগ্রহে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের চাকরী লাভ করেন। পণ্ডিত মহাশয় পড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিলে সিবিলিয়ানেরা চাকরী পাইতেন।

বিদ্যাসাগরকে মার্শেল সাহেব ইঙ্গিতে একদিন বলিয়াছিলেন যে, পরীক্ষার কঠোরতা একটু কোমল করিলে অনেক পরীক্ষার্থীকে বিফল-মনোরথ হইতে হয় না। অমনি বিদ্যাসাগর আহত সিংহের ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া কঠোর কটাক্ষে অন্নদাতা শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃসম মার্শেল সাহেবকে উত্তর দিয়াছিলেন "ওটী আমাকে দিয়া হইবে না, না হয় চাকরী ছাড়িয়া দিব, তবুও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিব না।" বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কার সাহেব তখন হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ। কর্ম্মোপলক্ষে এক দিন বিদ্যাসাগর কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার আপিসে যান। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বলিয়া কার সাহেব যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ টেবিলের উপর পা তুলিয়া অর্দ্ধশয়নাবস্থায় চেয়ারে বসিয়া বিদ্যাসাগরকে বিনা অভ্যর্থনায় দাঁড় করাইয়া রাখেন। ইহার কয়েক দিন পরে কার সাহেব কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, বিদ্যাসাগর অপমানের প্রতিশোধ দিবার সুযোগ পাইলেন। বিদ্যাসাগর সৌজন্য বিস্মৃত হইলেন, আতিথ্য বিস্মৃত হইলেন, চপেটাঘাতে চপেটাঘাতের প্রতিশোধ লইলেন,—বিস্ময়ের কারণ নাই। বিদ্যাসাগর কাঁধে করিয়া দরিদ্রের মোট বহন করিতেন, দ্বারবানের ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিতেন। কার সাহেব তাঁহাকে অপমান করিলে তিনি প্রতিশোধ লইতেন না। কিন্তু কার সাহেব সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন। জাতির সম্মান রক্ষা করিতে বিদ্যাসাগর রুদ্ররূপী। জাতীয় বেশের সম্মান রক্ষা করিতে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতির সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় বেশের সম্মান রক্ষা করিতে তিনি প্রিয়বন্ধু বাঙ্গালার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জাতীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অপমান তাঁহার সহ্য করা উচিত মনে হয় নাই। তাই কার সাহেব সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সুবঙ্কিম চট্টরাজ পরিশোভিত সুশ্যাম চরণদ্বয় টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া, সাহেবের ন্যায় চেয়ারে হেলান দিয়া, অর্দ্ধ-শয়নাবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাহেবকে গৃহ মধ্যে আসিতে বলিলেন। বসিবার আর দ্বিতীয় আসন নাই। সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তদবস্থাপন্ন বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া কুপিত হন এবং বহুকষ্টে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করেন। কার সাহেব মৌবাট সাহেবের নিকট নালিশ করেন। হীন প্রকৃতি অন্যে রাগের ভরে প্রতিশোধ লইয়া শেষে অন্নের ভয়ে মিথ্যা কথা লিখিয়া অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করিত। তেজস্বী বিদ্যাসাগর ঔদ্ধত্য না দেখাইয়া, একটি কথা মিথ্যা না বলিয়া, যে পরিহাস করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কেবল নর্ম্মপ্রিয় বিদ্যাসাগরই পারিতেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরাজীমতে অভ্যর্থনা করিতে হইলে বুঝি এইরূপ করিতে হয়। আমি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া সাহেবের প্রতি সে সম্মান দেখাইতে কৃপণতা করি নাই। এটি যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, তবে এরূপ ব্যবহারের শিক্ষাদাতা কার সাহেবই সে জন্য দায়ী। ঐ ঘটনায় আমার এক বিন্দুমাত্রও দোষ হইয়াছে বোধ হয় না।"

কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এইরূপ তেজস্বীতার পরিচয় বারবার পাওয়া যায়। এখন একবার তাঁহার নিঃস্বার্থতার অনুসরণ করা যাউক। অন্যের মঙ্গলের জন্য যে আপনার স্বার্থ অকাতরে প্রফুল্লমুখে বিসর্জ্জন দিতে না পারে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মহত্ব সে অনুভব করিতে পারে না। স্বার্থপরতা বর্ব্বরতার লক্ষণ, বালকের প্রয়াস; যে স্বার্থপরায়ণতা বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই, সে মনুষ্যত্ব লাভ করে নাই। পরদুঃখে কাতর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশস্ত হৃদয় নির্ম্মলনীর সরোবরের ন্যায় নিয়ত যেমন ঢল ঢল করিত, পর দুঃখের তৃণ কণা সে হৃদয়-সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার মনের শক্তি ও সাহসও তদনুরূপ ছিল। এমন কোন কর্ত্তব্য ছিল না, যাহা করিতে তিনি ভীত হইতেন। বোধ হয়, কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে আত্মবলিদান দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ লোক বিরল। পরোপকার সাধন এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে কেবল মহামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব।

বিদ্যাসাগর যখন পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে হেড্‌পণ্ডিতের কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ে আশী টাকা বেতনের হেড্‌রাইটারের পদ শূন্য হয়। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর ইংরাজীভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পিতাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা দিয়া ত্রিশ টাকায় বাসার নয় দশ জনের খরচ চালাইতে হইত। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাইতে হইত। বিদ্যাসাগর না চাহিতে মার্শেল সাহেব তাঁহাকে এ চাকরীটি দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণের ১ম ও ২য় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়।

প্রথম পদের বেতন ৯০৲ টাকা। শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ ডাক্তার মৌবাট সাহেব উক্ত পদে এক জন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার জন্য মার্শেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে যান। পরামর্শে স্থির হইল, ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত হইলে,তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার জন্য মার্শেল সাহেবকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন এবং ত্রিশ ক্রোশ পথ হাটিয়া কালনায় গিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট আবেদনপত্র লিখাইয়া লইয়া, পর দিন আবার ত্রিশ ক্রোশ পথ হাটিয়া আসিয়া সাহেবের নিকট বাচস্পতির আবেদন-পত্র অর্পণ করিলেন। "এই একটি ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের উচ্চতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পূর্ণ পরিচায়ক।" টীকা টিপ্পনী করিতে গেলে এই মহৎ কার্য্যের গাম্ভীর্য্যের অপলাপ হয়। ইহা দেখিবার ও বুঝিবার বিষয়।

বিখ্যাত পণ্ডিত রবার্ট ক্রষ্ট অনুরোধ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া দেন। আপ্যায়িত হইয়া সাহেব তাঁহাকে দুই শত টাকা পুরস্কার দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই টাকা নিজে না লইয়া তাহাদ্বারা সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক থাকিবার সময় উক্ত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। উক্ত পদের বেতন অধিক হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে আর কোন প্রকার সুযোগ পাইবেন না এই আশঙ্কায় উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন, এবং যত্ন করিয়া মদন মোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পরার্থপরতার বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থকে তিনি বরাবর অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতেন। পরোপকারে তিনি আপন প্রাণ নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা পীড়া হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পাইয়া ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া তর্কবাগীশের বাসায় উপস্থিত হন। ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করেন, তিনি নিজ হস্তে মল-মূত্র পরিষ্কার করেন। ঔষধের মূল্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে দিয়াছিলেন। (তখন ত্রিশটি টাকায় ৯।১০ জনের খরচ চালাইতে হইত।) কোন অনাথ দুঃস্থ লোক পীড়িত হইলে তিনি স্বয়ং গিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের ব্যয়ে সাধ্যানুসারে ঔষধ, পথ্য যোগাইতেন। একবার নারিকেলডাঙ্গায় অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি নিজের বাসা হইতে বিছানা মাদুর লইয়া গিয়া রোগীর শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখে কোন এক ব্যক্তির ভৃত্য ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। যাঁহার ভৃত্য,তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেন। সেই অনাথ পীড়িতের এমন কেহ ছিল না যে মুখে একটু জল দেয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সংবাদ পাইয়া তখনই গিয়া সেই পীড়িত ভৃত্যকে বুকে তুলিয়া আনিয়া আপনার

শয্যায় শয়ন করাইয়া দেন। তাঁহার অবিরাম যত্ন শুশ্রূষায় এবং সুহৃদ্ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগী দু চারি দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। আর একবার পাইকপাড়া রাজবাটী যাইবার সময় পথি-পার্শ্বে এক পীড়িতা বৃদ্ধাকে পতিত দেখিয়া তিনি তাহাকেও কোলে করিয়া রাজপ্রসাদে উপস্থিত হন। দ্বারবান্ বুঝিতে না পারিয়া রাজাদের খবর দেয় যে, বিদ্যাসাগর আপন মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজারা তাড়াতাড়ি আসিয়া সকল অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। এই বৃদ্ধা আরোগ্য লাভ করিয়া বরাবর রাজবাটীতে আসিত ও কিছু কিছু পাইত। রাজবাটীর সকলেই তাহাকে "বিদ্যাসাগরের মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। "যে বিদ্যাসাগর বড়লাট ও ছোট লাট ভবনে বহু সমাদরে উপবিষ্ট, যে বিদ্যাসাগর মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়া ঘাটা প্রাসাদে বহু সম্মানে গৃহীত ও সমাদৃত, যিনি পাইকপাড়া রাজভবনে পূজিত, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রতি সন্ধ্যা সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত।" এক দিন প্রাতঃকালে এক মেথর কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "আমার ঘরে মেথরাণীর কলেরা হইয়াছে, বাবা, তুমি কিছু না করিলে আর ত উপায় নাই।" তখনই ভৃত্যের দ্বারা কলেরার ঔষধের বাক্স ও একটি বসিবার মোড়া লইয়া বিদ্যাসাগর সেই অস্পৃশ্য ব্যক্তির অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন পর্ণকুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন সেই মলরাশির মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সেই রোগীকে একপ্রকার নিরাপদ করিয়া গৃহে আসিয়া স্নানাহার করিলেন। পাঠক একবার চিন্তা কর। দয়া দাক্ষিণ্যের অনন্ত পারাবার না হইলে, স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি না হইলে, কি কখন এরূপ সম্ভব হইতে পারে? বিধাতার চন্দ্র সূর্য্য ঘরে ঘরে কিরণ বিতরণ করে। বিধাতার বরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রও চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেন। লাট দরবারে অনেকে যায়, বড় লোকের বাড়ীতেও অনেকে যায়, কিন্তু যারা যায়, তারা আর গরিবের ঘরে যায় না, গরিবের সংবাদ রাখে না। বিদ্যাসাগর-চরিতের মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য, এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত নরনারী মণ্ডলীর সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপনের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এই গুণেই তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ; তাঁহার এতাদৃশ লোক-বিরল দেবোপম উদার আচরণেই তিনি বঙ্গের চিরপ্রিয় হইয়া থাকিবেন।

হৃদয়ের কোমলতা সংসারকে আপনার করিয়া লয়, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের আলবাল তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়। জাত্যভিমানে সিংহ, পরোপকারে শিশুর ন্যায় কোমল। বিশ্বসেবা তাঁহার সাধনার ফল নহে; কোমল হৃদয়ের অনায়ত্ত উচ্ছ্বাস। কার্য্যক্ষেত্রের কঠোরতা রেখামাত্র তাঁহার কোমলতার অপলাপ করিতে পারে নাই। যিনি দুঃখী, দরিদ্র, পরিচিত ও অপরিচিতের অনাহূত মিত্র, পিতা, মাতা ভ্রাতৃগণের সেবায় তিনি কতই নিয়োজিত, উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মাতার আজ্ঞার সম্মুখে সাহেবের আদেশ, অর্থের লোভ, চাকরীর লালসা বাত্যাবর্ত্তে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়িয়া যাইত। দুর্দ্দম দামোদর, নৃশংস নরঘাতুক সে দুর্জ্জয় মাতৃপ্রেম প্রত্যাহত

করিতে হীনবল। স্বর্গ তাঁহার মাতৃভূমি, দেবতা তাঁহার জননী। অসংখ্য অভক্ত অকৃতজ্ঞ বঙ্গসন্তানকে বিদ্যাসাগর মাতৃভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মূল গ্রন্থে পাঠক তাহার নিদর্শন পাইবেন। রত্নমালার এক একটী অমূল্য রত্ন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সুখ ও দুঃখ।

জগতে এ বৈষম্য আসিল কেন? কে এই সংসারে সুখ দুঃখের দারুণ চক্র আনিয়া উপস্থিত করিল? এজগৎ যাঁহার সৃষ্ট,—এ সংসার যাঁহা হইতে আবির্ভূত,—শ্রুতি বারম্বার বলিয়া দিতেছে,—তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"। যিনি সদানন্দময়,তাঁহারই রাজ্যে এ বিষম দুঃখ আসিল কোথা হইতে? যিনি সুখ দুঃখের অতীত,—যিনি বৈষম্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত,—তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত জগতে, তবে এ সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বভাব ও বৈষম্য কেন হইল? প্রকৃতি-রাজ্যে চাহিয়া দেখ, দেখিবে এ দ্বন্দ্বভাব সর্ব্বত্র। —দেখিবে, প্রধানতঃ একদিকে একটী সুখের আনন্দময়ী ছবি;—তেম্‌নি অন্যদিকে একটী নিরাবাধ দুঃখের জ্বালাময়ী প্রতিমা!! সন্ধ্যাকালে সেই হরিদ্বারের আহ্লাদময়ী শোভা স্মরণ কর;—পশ্চিম-গগনে অস্তগমনোন্মুখ দিনকরের ঈষদ্রক্তিম কিরণ-জাল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা-ক্রমে দিগ্বলয় বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে;—হিমাচলের তুঙ্গনীল শৃঙ্গ হইতে শব্দময় জল-স্রোত কুল কুল রবে পতিত হইয়া ঊর্দ্ধে অনন্ত বীচি-বিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়াছে;—নাতিদূরে কল-নাদী বিহগকুল শ্রুতিসুখকর তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর শব্দস্রোতে গগনের প্রান্তদেশ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে।—ইহা দেখিয়াছে যে,—এই সুষমা অনুভব করিয়াছে যে,—সে কি বলিতে পারে যে এই সোণার সংসারে আবার দুঃখের একটা হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আছে!! কিন্তু হায়! তা'ত নয়। ঐ দেখ, একবার এই দিকে চাহিয়া দেখ। বৃদ্ধা জননী, যে প্রাণ-প্রতিম পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া, প্রাণাদপি প্রিয়তম স্বামীর শোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন; যে পুত্রকে কত যত্নে, এমন কি স্বীয় বক্ষ হইতে রক্ত দিয়া প্রতিপালন করতঃ, সংসারে যোগ্যতম করিয়া তুলিয়া ভাবিতেছিলেন—'এই রত্ন হইতে আমার জীবনের অনন্ত যন্ত্রণা দূর হইবে,'—হায়! হায়! ঐ দেখ সেই পুত্র বৃদ্ধমাতার হৃদয় শূন্য করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে চির-আশ্রয় গ্রহণ করিল!! এ দৃশ্য যে দেখিয়াছে, এই বিষম অনর্থ যে অনুভব করিয়াছে, সে কেমন করিয়া বলিবে যে এ সংসার আবার সুখময়? সে কেমন করিয়া মনে করিবে যে, এ জগতের বিধাতা-পুরুষ আবার নির্ম্মল আনন্দময়? এইরূপ, সর্ব্বত্রই এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টপদার্থের প্রত্যেক ঘটনাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সুখ ও দুঃখ নামক দুইটী অতি প্রবল ক্ষমতাশালী পদার্থের ক্রিয়া ও আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রভাবে এ সংসার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। ইহারা বিধাতা অপেক্ষা বড় কম শক্তিমান্‌ নহে! কে ইহাদিগকে সংসারে আনিয়া ফেলিয়াছে? কে ইহাদিগের জনয়িতা?

সর্ব্ব দেশে সর্ব্বসময়ে এই সুখ দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে বাইবেলকে এই সুখ-দুঃখের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, সয়তান (Satan) নামক একটী প্রবল পরাক্রান্ত দানবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইয়াছে। এই সয়তানই সুখ দুঃখের মূল কারণ। অথবা, বিশ্বনিয়ন্তা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই বিধান করিয়াছিলেন,দুরন্ত সয়তানই বিধাতার উপর জিগীষা করিয়া, তাঁহার সুখের সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে! এই বৈষম্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, বাইবেলকে জগতের একরূপ দ্বিবিধ কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সয়তানও ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও সমসাময়িক। নিরন্তর এই দুষ্ট ঈশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছে। পাঠক, এইরূপ সিদ্ধান্তের সারবত্তা ও যুক্তিযুক্ততা বিচার করিয়া দেখিবেন।

হিন্দুদর্শন এই সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অন্যরূপ মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন। আমরা আজ্ তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিব। হিন্দুদর্শন এই সুখ দুঃখে কিরূপ কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন, আজ্ আমরা তাহাই দেখিতে অগ্রসর হইব। (হিন্দুদর্শন বলেন, সংসারে সুখ ও দুঃখ নিরন্তর চক্র-প্রবাহরূপে আবর্ত্তিত হইয়া ঘুরিতেছে। প্রত্যেক চেতনাবিশিষ্ট-পদার্থই এই সুখ দুঃখের অধীন। এই সুখদুঃখের কারণ কি? হিন্দুদর্শন বলেন, —ইহার কারণ "অদৃষ্ট";—অদৃষ্ট, অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের চিরার্জ্জিত সংস্কার। তুমি দুঃখী হইয়া সংসারে জন্মিয়াছ; তোমার এ দুঃখের কারণ কে? কারণ আর কেহই নহে; তোমার অদৃষ্টই ইহার কারণ; তোমার কৃত কর্ম্মই এই দুঃখের জনক। 'সংসারের ক্ষীর সর নবনীত তোমার জন্য; কেননা তুমি সুখী, তুমি "বড়লোক"। পথের অদৃষ্টপ্রায় কণ্টকটী তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা তুমি বড়লোক, তুমি এই পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইবে'। আর আমি দুঃখী, সংসারের ঝড়বৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে;—একটী বৃক্ষতলেও আমি আশ্রয় পাইব না। কর্ম্মই এই বৈষম্যের মূলীভূত কারণ। যদি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সুখদুঃখের কারণ বল, তবে তাঁহাতে বৈষম্য (Partiality) এবং নৈর্ঘৃণ্য (Cruelty) নামক দুইটী বিষম দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। যে ঈশ্বর পক্ষপাত দোষদুষ্ট, যে ঈশ্বর দারুণ নিষ্ঠুর, তিনি কদাপি ঈশ্বর হইতে পারেন না। ঈশ্বরের দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই। তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব থাকা একেবারেই অসম্ভব। তবে আর তুমি কেমন করিয়া ঈশ্বরকে সুখদুঃখের কারণ বলিতে পার? মঙ্গলময় বিধাতা কেন তোমাকে অনর্থক দুঃখ প্রদান করিয়া সংসারে প্রেরণ করিবেন, এবং নির্লিপ্ত পমমেশ্বর কেনই বা আর এক জনকে সমস্ত সুখের ভাজন করিয়া পাঠাইবেন? তাই বলি, পরমেশ্বর তোমার সুখ ও দুঃখের কারণ হইতে পারেন না।

(আর যদি বল, ঐশী-শক্তিই সুখদুঃখের কারণ; ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি হইতেই জগতে বৈষম্য আসিয়াছে। তবে ভাবিয়া দেখ, তাহাতেও একটী দোষ আসিতেছে। একটী কার্য্য উৎপাদনের সময়ে কারণের যে রূপ স্বভাব থাকে, কার্য্যান্তর উৎপাদন কালে, কারণের সে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে কেমন করিয়া? যে কারণ হইতে সুখ উৎপাদিত হইল, সেই কারণই আবার দুঃখ

জন্মাইবে কেমন করিয়া? আবার যদি বল যে, পরমেশ্বরের পৃথক পৃথক্ শক্তি সমূহ হইতে বৈষম্য আসিয়াছে। অর্থাৎ শক্তি সমুদয়ই এই সুখ দুঃখের কারণ, শক্তিমান্ ঈশ্বরের তাহাতে কোন দোষ নাই। একটু নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে, এরূপ উক্তিরও অসারতা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি অনুসারে সুখদুঃখ জন্মিয়াছে;—তাহা হইলেই তুমি শক্তি ও শক্তিমানের পার্থক্য স্বীকার করিতেছ। কিন্তু, শক্তি ও শক্তিমানের বিভেদ থাকিতে পারে না। অগ্নি দাহিকা-শক্তি হইতে পৃথক্ নহে। আমরা একটী দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়া দেখাইব যে, শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ নহে। মনে কর,—উপরে একখানি চুম্বক প্রস্তর, তন্নিম্নে একটী ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ড, এবং তন্নিম্নে আর একটা বৃহৎ লৌহ স্থাপন করিলাম। চুম্বকের আকর্ষণ বশতঃ ক্ষুদ্র লৌহ পিণ্ডটী চুম্বকের নিকট-বর্ত্তী হইল, এবং পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে বলিয়া বৃহৎ লৌহটী ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন রহিল। কিন্তু ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ডটী চুম্বকের প্রতিকূলতা ও বৃহৎ লৌহের ব্যবধানতা বশতঃ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লগ্ন হইতেছে না। এস্থলে কি বলিবে যে, পৃথিবীর শক্তি নাই? যদি না থাকিবে, তবে সম-সময়ে বৃহৎ লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইল কেমন করিয়া? অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তি নিত্য বর্ত্তমান এবং উহা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ নহে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সুখ-দুঃখের কারণ ঈশ্বর বা ঐশী-শক্তি কেহই হইতে পারিল না। তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মই উহার একমাত্র কারণ। তুমি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি সুখী হইয়া জন্মিবে;—পাপ কর,—দুঃখী হইয়া জন্মিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুদর্শনানুসারে পূর্ব্বজন্ম আছে। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করিয়া অদৃষ্ট জন্মাইয়াছ, ইহজন্মে সেই অদৃষ্টানুসারে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবে। মেঘ যেরূপ ব্রীহিযবাদি সৃষ্টির প্রতি সাধারণ কারণ মাত্র; কিন্তু উহাদের বীজগত অসাধারণ সামর্থ্যই ব্রীহীযবাদির বৈষম্যের কারণ; তেমনি সেই সেই জীব-গত অসাধারণ কর্ম্মই মনুষ্য পশ্বাদির বৈষম্যের কারণ; ঈশ্বর মনুষ্যপশ্বাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ মাত্র। সুতরাং কর্ম্ম স্বীকার করিলে ঈশ্বরের উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আসিতে পারিল না।

সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনের এইরূপ সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তেও দোষ আছে। কিন্তু সে কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (৭)

ঠকুরীবংশ।

অংশুবর্ম্মন অনুমান ৬৪০খ্রীঃ পশ্চিম নেপালে এই অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান দেবপাটন নগরীর সন্নিহিত কৈলাসকূটে আপনার রাজধানী সংস্থাপিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরাংশে কৈলাসকূটের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইতিপূর্ব্বে অংশুবর্ম্মন ও তাঁহার

অব্যবহিত উত্তরাধিকারী জিষ্ণুগুপ্তের নামাঙ্কিত শাসনলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অংশুবর্ম্মন লিচ্ছবীরাজ শিবদেব ও জিষ্ণুগুপ্ত ধ্রুবদেবের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। জিষ্ণুগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র যুবরাজ বিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অনন্তর তাঁহার পিতৃব্য উদয়দেব রাজপদ প্রাপ্ত হন। জিষ্ণুগুপ্ত ও উদয়দেবের নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র কোন শাসনলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জিষ্ণুগুপ্ত ও অংশুবর্ম্মনের শাসনলিপিতে তাঁহারা 'যুবরাজ' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। জয়দেবের নামাঙ্কিত ১৫৩ হর্ষাব্দের (৭৫৯ খ্রীঃ) শাসনলিপিতে উদয়দেব অভিনব রাজবংশের প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে ঠকুরীবংশীয় জয়দেব উদয়দেবের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"অস্যান্তরেপ্যুদয়দেব ইতি ক্ষিতীশা
জ্জাতস্তদা তত্তনুজশ্চ নরেন্দ্রদেবঃ।
মানোন্নতো নতসমস্তনরেন্দ্রমৌলি
মালারজোনিকর-পাংশুলপাদপীঠঃ ॥১১॥

দাতা সদ্দ্রবিণস্য, ভূরিবিভবো, জেতা দ্বিষৎসংহতেঃ,
কর্ত্তা বান্ধবতোষণস্য, যমবৎপাতা প্রজানামলং।
হর্ত্তা সংশ্রিতসাধুবর্গবিপদাং, সত্যস্য বক্তা, ততো
জাতঃ, শ্রীশিবদেব ইত্যভিমতো লোকস্য, ভর্ত্তা ভুবঃ ॥১

দেবী বাহুবলাঢ্য-মৌখরীকুলশ্রীবর্ম্মচূড়ামণি,
খ্যাতিহ্রেপিত-বৈরিভূপতিগণ-শ্রীভোগবর্ম্মোদ্ভবা।
দৌহিত্রী মগধাধিপস্য মহতঃ আদিত্যসেনস্য যা,
ব্যূঢ়া শ্রীরিব তেন সা ক্ষিতিভুজা শ্রীবৎসদেব্যাদরাৎ॥১

তস্মাদ্ভূমিভুজোঽপ্যজায়ত জিতারাতে রজস্যঃ পরৈঃ,
রাজশ্রীজয়দেব ইত্যবগতঃ শ্রীবৎসদেব্যাত্মজঃ।
ত্যাগী মানধনো বিশালনয়নঃ সৌজন্যরত্নাকরো,
বিদ্বান্ সন্তচিরাশ্রয়ো গুণবতাং, পীনোন্নবক্ষস্থলঃ ॥১৪॥

মত্তেভস্থিত-সমূহ-দন্তমুসল-ক্ষুণ্ণারি-ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ-কোশলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈ যুক্তা প্রভূতাকুলৈ
র্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা"॥১৫॥

মহারাজ জয়দেবের রাজত্বকালে ১৫৩ হর্ষাব্দের (৭৫৯ খ্রীঃ) কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে এই বিখ্যাত রাজপ্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়। রাজমাতা বৎসাদেবী স্বীয় পতির স্বর্গকামনায় রৌপ্যনির্ম্মিত পদ্ম কুলদেবতা পশুপতিনাথকে উৎসর্গীকৃত করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, শিবদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জয়দেবের রাজত্বকালে এই প্রশস্তি রচিত ও উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পাঁচটী শ্লোক রাজা জয়দেব স্বয়ং এবং অপর ২৯টী শ্লোক সুকবি অমাত্য বুদ্ধকীর্ত্তি রচনা করেন।

"শ্রীবৎসদেব্যা নৃপতের্জনন্যা,
সমং সমস্তাৎ পরিবারপদ্মৈঃ।
রৌপ্যং হরস্যোপরি পুণ্ডরীকং
তদাদরৈঃ কারিতমত্যুদারং ॥ ৩১ ॥
পুণ্যং পুত্রেণ দত্তং শশিকরবিমলং কারয়িত্বাম্বুমুখ্যং
প্রাপ্তং শুভ্রং শুভ্রঞ্চ স্বয়মপি রজতৈঃ পদ্মপূজাং বিধায়।
সর্ব্বং শ্রীবৎসদেবী নিজকুলধবলাক্ষিতবৃত্তিং দধানা,
প্রাদৎ কল্যাণহেতো শ্চিরমবনিভুজে স্বামিনে
স্বর্গতায় ॥৩২॥

কঃ কুর্য্যাৎ কুলজঃ পুমান্ নিজকুলশ্লাঘাং, অনিষ্টাচ্ছয়া
রাজ্ঞা সৎকবিনাপি নো বিরচিতং কাব্যস্ববংশাশ্রয়ং;
শ্লোকান্ পঞ্চ বিহায় সাধুরচিতান্ প্রাজ্ঞেন রাজ্ঞা স্বয়ং
স্নেহাত্তুভুজি বুদ্ধকীর্ত্তিরকরোৎ পূর্ব্বামপূর্ব্বামিমাং"॥৩৩॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত ১১—১৫ শ্লোকের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উদয়দেবের মৃত্যুর পর নরেন্দ্রদেব পৈতৃক রাজধানী কৈলাসকূটে রাজত্ব করেন। নরেন্দ্রদেবের পর তাঁহার পুত্র শিবদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ শিবদেব মৌখরীবর্ম্মনবংশীয় ভোগবর্ম্মনের তনয়া বৎসাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ভোগবর্ম্মন মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্য সেনের জামাতা ছিলেন।

শিবদেবের পুত্র জয়দেব রাজ্যমতী দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্ত বংশীয় শ্রীহর্ষদেবের কন্যা। শ্রীহর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলদেশের অধিপতি ছিলেন। এই শাসনলিপি হইতে মৌখরী, গুপ্ত ও ভগদত্তবংশের সহিত ঠক্কুরীবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মহারাজ আদিত্যসেন গুপ্তবংশের এক কনিষ্ঠশাখা হইতে উদ্ভূত হন। কৃষ্ণগুপ্ত এই বংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুমান ৪৭৫ খ্রীঃ কৃষ্ণগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন। মহারাজ আদিত্যসেন অনুমান ৬৪০-৭৫খ্রীঃ মগধে রাজত্ব করেন। অফসঁর নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই অফসঁর অতি প্রাচীন স্থান। ইহা গিরিয়কের বার মাইল পূর্ব্বে ও নোয়াদার ১৬।১৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে সাকরী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। বুদ্ধদেব এখানে সাত দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়াংসাঙ এই স্থানের বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ কর্ণেল মার্কহাম কিটো এখানে আগমন করিয়া একখানি প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ আদিত্যসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি অফসঁরে বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। অফসঁরে অদ্যাপি বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের প্রকাণ্ড পাষাণময় মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকিয়া মহারাজ আদিত্যসেনের ভক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। উক্ত শাসনপত্রে বর্ণিত আছে যে, আদিত্যসেনের পত্নী রাজমহিষী কোণদেবী এক প্রকাণ্ড সরোবর খনিত করান। অফসঁরে অদ্যাপি সেই প্রকাণ্ড জলাশয় বর্ত্তমান রহিয়া মহারাজ আদিত্যসেনের কীর্ত্তি ও পরাক্রমের বিষয় ঘোষণা করিতেছে। আদিত্যসেনের তনয়া দেবগুপ্তার মৌখরীবর্ম্মনবংশীয় ভোগবর্ম্মনের সহিত পরিণয় হয়। এই ভোগ বর্ম্মন গ্রহবর্ম্মনের পৌত্র বলিয়া অনুমান হয়। গ্রহবর্ম্মন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। মালবের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্তের হস্তে গ্রহবর্ম্মন অকস্মাৎ নিহত হন। হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজ্যবর্দ্ধনের দ্বারা নৃশংস দেবগুপ্ত সমরে নিহত হয় এবং মালব কনোজ রাজ্যের পদানত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে ভোগবর্ম্মন কান্যকুব্জ ও মালবে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই ভোগবর্ম্মনের পুত্র যশোবর্ম্মা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সমসাময়িক। অবিমুক্তাপীড় ললিতাদিত্য ক্রমান্বয়ে সাতবার কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া, অবশেষে যশোবর্ম্মার হস্ত হইতে কনোজের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই যশোবর্ম্মার সভায় মহাকবি ভবভূতি ও বাক্‌পতি বিদ্যমান ছিলেন।

ঠক্কুরীবংশীয় মহারাজ জয়দেবের শ্বশুর হর্ষদেব ভগদত্তের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভগদত্ত কামরূপের প্রাচীনতম ক্ষত্রিয় রাজা। ভগদত্তের বংশধর হর্ষদেব সম্ভবতঃ কামরূপেই রাজত্ব করিতেন। এই শাসনলিপির মতে দক্ষিণে উড়িষ্যা, কোশল ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তিনি ভুজবীর্য্যে আপনার আধিপত্য বিস্তারিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশও তাঁহার পদানত হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। ডাক্তার বুলার অনুমান করেন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তাঁহার রাজধানী সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ ৬২৯-৪৫ খ্রীঃ ভারতবর্ষে পর্য্যটন করেন। তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের

(গৌহাটীর সিংহাসনে ব্রাহ্মণজাতীয় নারায়ণ দেবের বংশীয় ভাস্করবর্ম্মাদেবকে অধিষ্ঠিত দর্শন করেন। এই ভাস্করবর্ম্মা কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও নেপালের অংশুবর্ম্মনের সমসাময়িক রাজা। ভাস্করবর্ম্মার অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পরে কামরূপে হর্ষদেব আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ দক্ষিণকামরূপ ও বঙ্গদেশে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথবা ভাস্কর বর্ম্মার বংশধরের হস্ত হইতে এই ক্ষত্রিয় নরপতি হর্ষদেব কামরূপের অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। উড়িষ্যায় সেই সময় কেশরীবংশের ও কলিঙ্গে চালুক্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজ যযাতিকেশরীর প্রপৌত্র ললাটেন্দ্রকেশরী ৬৫৭ খ্রীঃ ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত করিয়া উড়িষ্যায় শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেশরীবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দুই শত বৎসরের মধ্যে তথায় বৈদেশিক কোন রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, উড়িষ্যার ইতিহাসে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। কলিঙ্গে সেই সময়ে চালুক্যবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন। উড়িষ্যায় ও কলিঙ্গে হর্ষদেবের আধিপত্য বিস্তৃতির বিবরণ, কবিসুলভ অতিশয়োক্তি বলিয়া ইহা হইতে বোধ হয়। এই হর্ষদেব সম্ভবতঃ খড়্গাদেবের বংশধর। ৬৫৬ খ্রীঃ(৭১৩ সংবতাব্দে)এই খড়্গাদেব বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। ৭১৩ সংবতাব্দে লিখিত তাঁহার নামাঙ্কিত এক খণ্ডিত তাম্রশাসন ঢাকা জিলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার অধীন আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। এই শাসনপত্রের দ্বারা খড়্গাদেব স্থানীয় এক বৌদ্ধমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি উক্ত বিবাহের অধ্যক্ষ রাজরাজভট্টকে প্রদান করেন। বৌদ্ধ অমাত্য পুরাদাসের প্রতি এই শাসনলিপি প্রচারের ভার অর্পিত হয়।* ১৮৮৬ খ্রীঃ বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তর হুলজ লিপজিক নগরীর 'জার্ণেল অব্ জার্ম্মেন ওরিয়েণ্টেল সোসাইটী' পত্রিকায় রাজা বল্লভদেবের নামাঙ্কিত ৫ খণ্ডে লিখিত এক তাম্রশাসনের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা আসামের অন্তর্গত তেজপুর নগরে তিনি প্রাপ্ত হন।† এই বল্লভদেব পূর্ব্বোক্ত হর্ষদেবের বংশধর হওয়া বিচিত্র নহে। ১৮৯৩ খ্রীঃ বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ "পণ্ডিত" পত্রিকায় এক নূতন তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভেনিস (A. Venis) সাহেব এই শাসনলিপির মূলানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা সংস্কৃত গদ্যপদ্যে ১১৪২ খ্রীঃ লিখিত হয়। কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের আদেশে এই দানপত্র লিখিত হয়। হংসকোনেহী বিজয়ী শিবির হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, কামরূপ 'মণ্ডলের' অন্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর 'ভুক্তির' অধীন বদ ও মন্দর নামে দুই খানি গ্রাম শ্রীধর নামে বিশ্বামিত্রগোত্রজ এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়। শ্রীধরের নিবাস বারেন্দ্র প্রদেশের অন্তর্গত ভবগ্রাম। তাঁহার পিতার নাম যুধিষ্ঠির ও পিতামহের নাম ভরত। বৈদ্যদেবের পিতামহ যোগদেব। বৈদ্যদেবের পিতা বোধিদেব ও মাতা প্রতাপ দেবী। বৈদ্যদেব বিহারের পালবংশীয় রাজা রামপতি পালের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। এই রামপতি পাল কুমার পালের পুত্র ও তৃতীয়

* Proceedings of Asiatic Society of Bengal for 1885, p. 49.

† Do for 1887, p. 56.

বিগ্রহপালের পৌত্র ছিলেন। হর্ষদেব এই বৈদ্যদেবের আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে।

ঠকুরীবংশীয় নেপালরাজ জয়দেবের পিতা শিবদেব এক মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্মধ্যে স্বীয় নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। শিবদেবেশ্বর মহাদেবের পূজার্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত শিবদেব বৈদ্যক নামে এক গ্রাম প্রদান করেন। ১১৯ হর্ষাব্দে ফাল্গুন শুক্লা দশমী তিথিতে এই আদেশ-লিপি লিখিত হয়। যুবরাজ জয়দেবের প্রতি ইহার প্রচার ভার অর্পিত হয়। ইহাতে রাজা শিবদেব 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৈলাসকূটে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া শাসনলিপি হইতে জানা যাইতেছে। কাটমাণ্ডু নগরের অন্তর্গত লগনটোলের এক অভিনব বিষ্ণুমন্দিরে এই প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়। পশুপতিনাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে আর এক খানি খণ্ডিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। ইহা ১৪৩ হর্ষাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে উৎকীর্ণ হয়। শিবদেব ইহা স্বয়ং প্রচার করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শিবদেব বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসের জন্য এক বিহার নির্ম্মিত করেন। এই বৌদ্ধ বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি এক খানি গ্রাম প্রদান করেন। বিহার 'শিবদেববিহার' নামে প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, মহারাজ শিবদেব হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক ছিলেন। তিনি স্বয়ং শিবের উপাসক ছিলেন। পশুপতিনাথ ঠকুরীবংশের কুলদেবতা ছিলেন। ললিতপট্টন (পাটনা) নগরে মীননাথের মন্দিরের সমীপে এক পয়ঃপ্রণালী (তিলমক) বিদ্যমান আছে। এই পয়ঃপ্রণালী সান্নিধ্যে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই লিপি খণ্ডিত। ইহা ১৪৫ হর্ষাব্দের পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে খোদিত হয়। এই আদেশলিপির প্রচার ভার যুবরাজ বিজয়দেবের প্রতি অর্পিত হয়। ইহা হইতে বোধ হয় মহারাজ শিবদেবের আদেশে উক্ত পয়ঃপ্রণালী কৃষিকার্য্যের জন্য খনিত হয়। এই তিন খানি শিলালিপি হইতে ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবদেবের রাজত্ব কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে। শিবদেবের পুত্র জয়দেব ও বিজয়দেবের নাম পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ শিবদেব ৭২০-৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব কৈলাসকূটের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জয়দেবের নামাঙ্কিত ১৫৩ হর্ষাব্দের (৭৫৯ খ্রীঃ) লিখিত শিলালিপির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ঠকুরীবংশের আর কোন শাসনলিপি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

জয়দেবের পরবর্ত্তী ঠকুরীবংশীয় নরপতিদিগের নামমালা বংশাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং শাসনলিপির সময় অনুসারে তাঁহাদের আনুমানিক রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বংশাবলীতে শাসনলিপির উল্লিখিত অংশুবর্ম্মন, নরেন্দ্রদেব ও জয়দেবের নাম মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করদেবের রাজত্বকালে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য নেপালে আগমন করেন। দ্বিতীয় জয়দেবের রাজ্যকালের শেষে ও তাঁহার পুত্রের শাসন সময়ের আরম্ভে ৮৮০ খ্রীঃ নেওয়ারী (নেপালী) সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণকাম দেবের দ্বারা বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গম স্থলে কাষ্ঠি-

পুর নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্তিপুর একণে কাটমাণ্ডু নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। বংশাবলীর মতে ৩৮২৪ কলিবর্ষে (৭২৩খ্রীঃ) গুণকামদেক কান্তিপুর স্থাপন করেন। শাসন লিপির নির্দ্দিষ্ট সময় গণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, গুণকামদেব পূর্ব্বোক্ত সময়ের দুই শত বর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব বংশাবলীর সময় নির্দ্দেশে কোন প্রকার আস্থা স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা গুণকাম দেবের পুত্র ভোজদেব ও পৌত্র লক্ষ্মীকাম দেবের যে সময় নির্ণয় করিয়াছি, সুপণ্ডিত বেণ্ডল সাহেব তদপেক্ষা ৭৫ বৎসর অধস্তন কালে ১০১৫ খ্রীঃ ভোজদেবের এবং ১০৩৯ খ্রীঃ লক্ষ্মীকামদেবের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি নেপাল হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত একখানি পুস্তকের সমাপ্তি বাক্য দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উক্ত পুস্তক না দেখিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

নিঃসন্তান অবস্থায় জয়কামদেবের মৃত্যু হয়। তদনন্তর নবাকোটের ভাস্করদেব নেপালে রাজত্ব করেন। আমাদের সময় গণনা অনুসারে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে এই রাজবংশ নেপালে আধিপত্য লাভ করে। হস্তলিখিত গ্রন্থ দৃষ্টে, বেণ্ডল সাহেব তাহার প্রতিষ্ঠাকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই বংশীয় পঞ্চম রাজা শঙ্কর দেবের সময়ে সুবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রীয় "প্রজ্ঞাপারমিতা" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাফী গ্রামে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর অর্থব্যয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি নেপালের অন্তঃপাতী ঝালগ্রামে বাস করিতেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। বংশাবলীর মতে ২৪৫সংবতে স্বর্ণাক্ষরে "প্রজ্ঞাপারমিতা" লিপিবদ্ধ হয়। এক জন বৌদ্ধজাতির নিকট পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রাজী অবগত হন যে, ২৪৪ সংবতের লিখিত এই বিখ্যাত পুস্তক ললিতপট্টনগরের হিরণ্য বর্ণ-বিহারে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই সংবৎ নেপালী সংবৎ ভিন্ন আর কোন সময় হইতে পারে না। বৌদ্ধজাতির বাক্য হইতে বংশাবলীর এই নির্দ্দেশের সত্যতা প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা হইতে ভাস্করদেবের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শঙ্করদেবের সময় ১১২৪-২৫ খ্রীঃ (২৪৪-৪৫ নেপালী সংবৎ) বলিয়া জানা যাইতেছে। পাঁচ পুরুষে ১২৫ বৎসর রাজত্ব করা সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর। গড়ে ২৫ বৎসর হারে ভাস্কর দেব ও তাঁহার বংশধরগণের শাসন কাল গৃহীত হইলে, আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। বংশাবলার মতে শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর ঠকুরী বংশীয় বামদেবের আধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবকোটের বৈশ্যবংশের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়। আমাদের বিবেচনায় এই উভয় বংশ একই সময়ে নেপালের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করেন। নিম্নে ভাস্করদেব ও বামদেবের বংশধরদিগের নাম মালা ও আনুমানিক রাজত্বকাল প্রদত্ত হইল। এই উভয় বংশের কোনও শাসনলিপি পাওয়া যায় নাই। বংশাবলীর নাম মালা এই নিমিত্ত অবিকল গৃহীত হইল।

ভাস্করদেব (১০০০-১০২৫ খ্রীঃ)
বলদেব (১০২৫-৫০ খ্রীঃ)
পদ্মদেব (১০৫০-৭৫ খ্রীঃ)
নাগার্জ্জুন দেব (১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ)
শঙ্কর দেব (১১০০-১১২৫ খ্রীঃ)
(ঠকুরীবংশ।)
বামদেব (১০০০-২০খ্রীঃ)
হর্ষদেব (১০২০-৪০)

সদাশিব দেব (১০৪০-৬০)
মানদেব (১০৬০ ৮০)
নরসিংহ দেব (১০৮০-১১০০০)
নন্দদেব (১১০০-২০)
রুদ্রদেব (১১২০-৪০)
মিত্রদেব (১১৪০-৬০)
অরিদেব (১১৬০-৮০)
অভয়মল্ল (১১৮০-১২০০)
জয়দেব মল্ল (১২০০-২০)
আনন্দ (অনন্ত) মল্ল (১২২০-৪০)

বংশাবলীর মতে শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর ঠক্কুরীবংশীয় বামদেব নেপালে স্বীয় প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত করেন। কান্তিপুর ও ললিতপট্টনের ঠক্কুরীবংশীয় সামন্তরাজেরা এই কার্য্যে বামদেবকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বামদেবের পৌত্র সদাশিবদেব পশুপতিনাথের মন্দ্রিরের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। তিনি কাটমাণ্ডু নগরের দক্ষিণপশ্চিমে এক পর্ব্বতের শিখর দেশে কীর্ত্তিপুর নগর স্থাপিত করেন। এই সদাশিব দেবের দ্বারা নেপালে লৌহমিশ্রিত তাম্র মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই মুদ্রার এক পার্শ্বে সিংহের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হয়। মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কালে রাজা অরিদেবের এক পুত্র জন্মে। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, রাজা তাঁহার নাম অভয় মল্ল রাখেন। অভয়মল্লের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেবমল্ল কান্তিপুর ও ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। জয়দেবমল্ল দ্বারা নেপালী সংবত প্রচলিত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমল্ল ভক্তপুর (ভাটগাঁ) স্থাপিত করিয়া তথা হইতে সাতটী নগর শাসন করিতে থাকেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজত্বকালে দক্ষিণদিক হইতে কর্ণাটক বংশীয় নান্যদেব নেপাল আক্রমণ করিয়া, ভাটাগাঁয় আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। নান্য দেবের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ঠক্কুরীবংশীয় মল্লরাজগণ ত্রিহুতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বংশাবলীর এই সকল উক্তির কোন্‌টী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট সময় যে নিতান্ত ভ্রান্ত, অমূলক ও বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বংশাবলীর মতে কলিযুগের ৩৮৫১অব্দে (৭৬০ খ্রীঃ) রাজা সদাশিব দেবের দ্বারা পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত হয়। সদাশিবদেবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ জয়দেব মল্লের দ্বারা নেওয়ারী সংবৎ ৮৮০খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম নেপালী সংবতের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে (৮১১ শকাব্দে ৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) নান্যদেব সমগ্র নেপালে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

সূর্য্যবংশীয় নান্যদেব বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই শত বৎসরেরও অধিক পরে নেপাল আক্রমণ করিয়া, তথায় আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অযোধ্যা হইতে নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বলিয়া বোধ হয়। জার্ম্মেন ওরিয়েণ্টেল সোসাইটীর পুস্তকাগারের একখানি হস্তলিখিত পুস্তকের শেষ ভাগ দৃষ্টে, সুপণ্ডিত পিসেল সাহেব নান্যদেবের আবির্ভাবকাল ১০১৯ শকাব্দ (১০৯৭ খ্রীঃ) বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত বেণ্ডল সাহেব নেপাল হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা হইতে বংশাবলীর সময়ের অমূলকতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতি হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় তিনি জয়দেব মল্লের শতবৎসর পূর্ব্বে নরসিংহ দেবের রাজত্বকালের শেষভাগে নেপালে প্রতিষ্ঠিত হন। সমগ্র নেপালে তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপিত হয় নাই। সেই সময়ে নেপা-

লের বিভিন্ন ভাগে তিন স্বতন্ত্র রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, এই নান্যদেবের দ্বারা নেপালে যে সূর্য্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্পর্কিত মল্লবংশ নেপালে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকে। নেপালের প্রাচীনতর মল্লবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, নান্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বংশ ১৪০ বৎসর কালের কিঞ্চিৎ অধিক নেপালে রাজত্ব করেন।

কাটমাণ্ডু নগরে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে এক বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই বিষ্ণুমন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বে নেওয়ারী অক্ষরে খোদিত এক প্রস্তরলিপি পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজীর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। ইহা ৭৬৯ নেপালী সংবতের (১৬৪৯ খ্রীঃ) ফাল্গুনী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে বৃহস্পতিবারে মহারাজ প্রতাপমল্লের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। এই শিলালিপিতে নান্যদেব প্রতাপমল্লের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, নান্যদেব সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অযোধ্যা হইতে আসিয়া তিনি নেপালে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন, বংশাবলীতে নান্যদেব কর্ণাটকবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই শিলালিপিতে নান্যদেবের অধস্তন সপ্তম পুরুষ হর সিংহ দেব কর্ণাটচূড়ামণি" নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

"আসীৎশ্রীসূর্য্যবংশে রঘুনৃপকুলজো রামচন্দ্রো নৃপেশঃ,
তদ্বংশে নান্যদেবোঽবনিপতি-রভবত্তৎসুতো গঙ্গদেবঃ।
তৎপুত্রোঽভূন্ন্‌ৃসিংহো নরপতিরতুল, স্তৎসুতো রামসিংহ
স্তজ্জঃ শ্রীশক্তিসিংহো ধরণীপতি-রতো ভূপভূপাল
সিংহঃ ॥১॥

তস্মাৎ কর্ণাটচূড়ামণিরিব হর-যুৎ-সিংহদেবোঽস্ত বংশে
ভূপঃ শ্রীযক্ষমল্লোনরপতিরতুলো, রত্নমল্লোঽপ্যমুষ্মাৎ।

পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া নিম্নে এই রাজবংশের আনুমানিক রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নান্যদেব ১০৯৭ খ্রীঃ (১০১৯ শকাব্দে) নেপালে প্রতিষ্ঠিত হন।

কর্ণাট সূর্য্যবংশ।

নান্যদেব (১০৯৭-১১২০ খ্রীঃ)
গঙ্গদেব (১১২০-৪০ খ্রীঃ)
নৃসিংহদেব (১১৪০-৬০)
রামসিংহ দেব (১১৬০-৮০)
শক্তিসিংহদেব (১১৮০-১২০০)
ভূপালসিংহদেব (১২০০-২০)
হরসিংহদেব (১২২০-৪০ খ্রীঃ)

শিলালিপির ভূপাল সিংহদেবের নাম পর্য্যন্ত বংশাবলীতে দেখা যায় না। বংশাবলীর মতে শক্তিদেব রামসিংহদেবের পিতা। শিলালিপির নৃসিংহদেব বংশাবলীতে নরসিংহ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বংশাবলীর মতে নান্যদেব ভাটগাঁয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার শেষ বংশধর হরিদেবের দ্বারা কাটমাণ্ডু নগরে রাজধানী নীত হয়। রাজা নরসিংহদেবের সময় ললিতপট্টনের (পাটনার) মল্লবংশীয় রাজা মল্লদেব ও কণ্ঠমল্ল দ্বারা চম্পাপুরী স্থাপিত হয়। ললিতপট্টনের রাজা বিদ্রোহী হইয়া, হরিদেবকে কাটমাণ্ডু পরিত্যাগ পূর্ব্বক থাম্বেল নগরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। পাল্লার রাজা মুকুন্দসেন নেপাল আক্রমণ করিয়া, মৎসেন্দ্রনাথের মন্দির হইতে ভৈরবের মূর্ত্তি স্বীয় রাজধানীতে প্রেরণ করেন। কথিত আছে, পশুপতিনাথের ক্রোধে মুকুন্দসেনের যাবতীয় সৈন্য বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুকুন্দ সেন যোগীর বেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে দেবীঘাটে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর ৭।৮

বৎসর পর্য্যন্ত নেপালে সম্পূর্ণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। নবকোটের বৈশ্যজাতীয় রাজবংশ ২২৫বৎসর কাল নেপালে রাজত্ব করেন। তাঁহারা অনেক বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভাটগাঁয় তখন একজন ঠকুরীবংশীয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। ললিতপট্টন ও কান্তিপুরের প্রতি পল্লী স্বাধীনতা অবলম্বন করে। বংশাবলীর মতে ৮৮৯ খ্রীঃ নান্যদেব নেপালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ২১৯ বৎসর কাল হরিদেবের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ রাজত্ব করেন। বংশাবলীর এই সকল বিবরণের অধিকাংশ অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। বংশাবলী হইতে এই ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাইতেছে যে,নান্যদেবের বংশধরদিগের সময়ে ললিতপট্টনে মল্লবংশের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মল্লবংশীয় অনন্ত (আনন্দ) মল্ল হরসিংহদেবের সমসাময়িক নরপতি।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

উদ্বাহ-বিচার। (২)

আসুর বিবাহ বা কন্যাবিক্রয়।

মহর্ষি মনু আসুর বিবাহের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণংদত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে" ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ৩১ শ্লোক।

স্বেচ্ছা বশতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কন্যা এবং কন্যা পক্ষকে প্রচুর অর্থদান পূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ করাকে আসুর বিবাহ বলে।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে আসুর বিবাহ বা কন্যাবিক্রয় প্রথা ঐহিক পারত্রিক বহুবিধ অশুভ ফলদায়ক বলিয়া, আন্তরিক ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইত এবং উপপাতক মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহাতে এই ঘৃণিত কুনীতি সমাজে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য নানাবিধ কঠোর শাসনও প্রচলিত ছিল।

মহাত্মা মনু বলিয়াছেন ;—

"পঞ্চানাস্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যো কদাচন" ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ২৫ শ্লোক।

এই শাস্ত্রমতে (প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ) পাঁচ প্রকার বিবাহ মধ্যে (প্রাজাপত্য, রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব) তিন প্রকার ধর্ম্মানুমোদিত। ধর্ম্ম-বিগর্হিত পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

মনু আরও বলিয়াছেন ;—

"ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃত বাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্ম ধর্ম্ম দ্বিষঃ সুতাঃ ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ,৪১ শ্লোক।

আর অবশিষ্ট চারিপ্রকার দুর্ব্বিবাহে (আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে) ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, বেদ-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করে।

বৃদ্ধ মনু সন্তান বিক্রয় প্রভৃতিকে উপপাতক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ;—

"গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্যপারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ ॥
পরিবিত্তিতানুজেনোঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দ্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্ ॥
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রত লোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ ॥
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ ॥

সর্ব্বাকরেষধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারোমূলকর্ম্মচ ॥
ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা।
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া ॥
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশলব্যস্য চ ক্রিয়া ॥
ধান্য-কুপ্য পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রী নিষেবণম্।
স্ত্রী-শূদ্র বিট্ ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যংচোপপাতকম্ ॥

মনুসংহিতা—১১শ অঃ, ৬০—৬৭শ্লোক।

গোহত্যা; আযাজ্য-যাজন; পরস্ত্রীগমন; আত্মবিক্রয়; পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ; স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তগ্নিত্যাগ; সুতত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করা; জ্যেষ্ঠ-অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ অর্থাৎ পরিবেদন; ঐরূপ জ্যেষ্ঠের ও পরিবিত্তিত্ব—ঐ দুই ভ্রাতাকে কন্যা দান; ঐ বিবাহে পৌরোহিত্য করা; অরজস্কা কন্যাদূষণ; বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা; ব্রহ্মচারীর স্ত্রী সম্ভোগ; পবিত্র তড়াগ, উদ্যান, স্ত্রী বা অপত্য বিক্রয় করা; ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া; পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ; বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন; বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন; অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয়; রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা; বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা; ওষধি নষ্ট করা; ভার্য্যাদির জার যোগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা; শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্রাদি দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করা; জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন; দেব পিত্রাদির উদ্দেশে নয়—পরন্তু—আপনার জন্য পাকানুষ্ঠান; লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ; অগ্ন্যাধানের অকরণ; সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরী; দেব, পিতৃ ও ঋষ্যাদি ঋণের অপরিশোধ; শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা; নৃত্য-গীত-বাদিত্রোপসেবন; ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু এবং পশুচুরী; মদ্যপানকারিণী স্ত্রীগমন; স্ত্রীহত্যা; বৈশ্যহত্যা; শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও স্বকীয় সংহিতায় (তৃতীয় অধ্যায়ে ২৩৫ হইতে ২৪১ শ্লোক পর্য্যন্ত) উপপাতক সম্বন্ধে মনুমতের অবিকল পরিপোষণ করিয়াছেন।

বিবাহ কালে কন্যাপণ গ্রহণ করা যে সন্তান বিক্রয় মধ্যে পরিগণিত, মহর্ষি মনুর নিম্ন লিখিত বাক্য তাহা প্রমাণ করিতেছে;

"ন কন্যায়াঃ পিতাবিদ্বান গৃহ্নীয়াচ্ছুল্ক মণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কংহি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী" ॥

মনুসংহিতা—৩য় অঃ, ৫১ শ্লোক।

কন্যাবিবাহ সময়ে বিদ্বান পিতা অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না। লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে,অপত্য বিক্রয়ী হইতে হয়।

মহর্ষি কশ্যপ বলিয়াছেন ;—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতং লোভমোহিতাঃ।
আত্ম বিক্রয়িণঃ পাপা মহা কিল্বিষকারিণঃ ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলং।
গমনাগমনেচৈব সর্ব্বং শুল্কোঽভিধীয়তে" ॥

উদ্বাহতত্ত্ব।

যাহারা লোভ-মোহিত হইয়া, শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মকন্যা প্রদান করে, তাহারা আত্মবিক্রয়ী পদবাচ্য এবং "পাপ" সংজ্ঞাক্রান্ত হইয়া, মহা পাপকারী হয়। ইহারা ঘোর নরকে পতিত ও আসপ্তম কুল বিনাশকারী হইয়া থাকে। কন্যা গমনাগমনের পক্ষে যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহাও শুল্ক মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত হইয়াছে ;—

যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদা ধনলোভেন কুম্ভিপাকং স গচ্ছতি ॥

কন্যামূত্র পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দ্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশঃ॥
মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌচ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং।
বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশং॥"

যে কন্যা পালন করিয়া, বিপদ বা ধনলোভ হেতু শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রয় করে, সে কুম্ভিপাক নামক নরকে পতিত হয়; এবং কুম্ভিপাকে অবস্থান করিয়া, কন্যার মল মূত্র ভক্ষণ করে। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থায়িকাল পর্য্যন্ত কৃমি-কাক-দষ্ট এবং মরণান্তে ব্যাধযোনি প্রাপ্ত হইয়া, মাংসভার বহনাদি ব্যাধ বৃত্তিতে নিয়ত নিযুক্ত থাকে।

যোগীশ্রেষ্ঠ-আপস্তম্ব বলেন;—

"অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতাকন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্র মশ্নুতে॥"

আপস্তম্ব সংহিতা—৯মঅঃ, ২৫ শ্লোক।

যে কন্যার পিতা অল্পমাত্র শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করে, সে বহু বৎসর ব্যাপিয়া, রৌরব নরকে অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে আসুর বিবাহের যে সকল প্রতিষেধক মত আছে, তাহার কতিপয় মাত্র উপরে সন্নিবেশিত হইল। মহর্ষিগণ এ বিষয়ে আরও বহুতর কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বিধি দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, আমাদের সমাজে পুরাকালেও কন্যা বিক্রয়মূলক আসুর বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। মহর্ষিগণ ভূয়োদর্শনে ইহার বিষময় ফলবত্তা অনুভব করিয়া, সমাজ হইতে এই কুনীতি সমূলে অপসারণ করিবার জন্যই কঠোর শাস্ত্র-বিধি সমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজ যত দিন শাস্ত্র-বিধি সকলকে জীবনসর্ব্বস্ব ভাবিতেন, তত দিন এই সকল বিধান বা মুনিবাক্যে বহুতর সুফল ফলিয়াছিল। কিন্তু সমাজের অধোগতির সহিত ক্রমেই ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং শাস্ত্রানুগত্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই ভাব দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। স্বার্থই যেন মনুষ্য জীবনের মূল মন্ত্র হইতেছে। ভারতে বিদেশীয় লোকের আধিপত্য পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে যতই বিলাস স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, হিন্দুজাতি ততই বিকৃত হইয়া যাইতেছে। যেখানে স্বার্থ, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজমান। বিলাসে প্রয়োজনের পরিমাণ বাড়িয়াছে। অত্যধিক প্রয়োজন, কঠোর জীবন সংগ্রাম আনয়ন করিয়াছে। জীবন সংগ্রামে মানুষ স্বার্থান্ধ হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল বানে হিন্দুর শাস্ত্র, ধর্ম্ম,সমস্তই ভাসিয়া যাইতেছে। এই বিকৃতি হইতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার অহরহ সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে—আর্য্য সমাজের সহিত এই সমাজের তুলনা করিলে, ক্ষোভে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বোধ হয়, দেবতা পিশাচে যে পার্থক্য, প্রাচীন আর্য্য সমাজ হইতে বর্ত্তমান সমাজের ভিন্নতা তদপেক্ষা অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ দুঃখের কথা বলিব কাহারে, শুনিবে কে? বলিবার ইবা প্রাণ এবং চরিত্র কই?

বুকের মাংস লইয়া ব্যবসায়—আত্মবৎ আত্মজ পুত্র কন্যা লইয়া দোকানদারী! ইহার অপেক্ষা দুষ্কার্য্য কি হইতে পারে? উদার শান্ত-প্রকৃতি মুনিগণ কন্যা বিক্রয়মূলক বিবাহকে আসুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুত, এ পাপ কার্য্যের নিকট অসুরতাও দেবত্ব। অসুর এবং প্রেত হইতে বহুনিম্নে যদি কোন জীবের অস্তিত্ব থাকে,

এ ব্যবহার তাহাদেরই পক্ষে সম্ভবপর। বঙ্গের সহস্র সহস্র গৃহে এই আসুর বিবাহের যে সকল বীভৎস ব্যাপার সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিলে আপনাদিগকে নিতান্ত হেয় এবং অমানুষ বলিয়া মনে হয়। এই ঘোর মহা পাপের দৃষ্টান্তের অন্ত নাই।

এক সম্প্রদায় যেমন পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, কন্যা-বিক্রেতাগণ তদ্রূপ বর পক্ষের শোণিত শোষিয়া লইতেছে। শাস্ত্রীয় নিয়মে দৃক্‌পাত নাই, সামাজিক শাসনের ভয় নাই, দয়ামমতার সহিত সম্বন্ধ নাই, যে যত পার মেয়ে বেচ, টাকা লও। ইহাদিগকে বারণ করিবার বা বুঝাইবার লোক সমাজে নাই বলিয়াই এবম্বিধ পাপস্রোত উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে সমাজকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে।

শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণ, নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ, শূদ্র এবং নানাবিধ ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যেই কন্যা বিক্রয়ের প্রথা অধিক মাত্রায় প্রচলিত। এক কথায় বঙ্গের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা ন্যূনাধিক রূপে প্রচলিত আছে। ইহার অপকারিতাও বহুকাল হইতেই অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্তু এই কু-রীতি দূরীকরণের চেষ্টায় কাহাকেও বড় একটা অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত থাকাতে, পণভারে সমাজ কত দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়িতেছে, আমরা এখন তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

কন্যাবিক্রেতাগণ সত্যসত্যই পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, বর পক্ষ ইপ্সিতপণ প্রদানে সমর্থ কি না, অথবা সমর্থ হইলেও তদ্ধেতু ভবিষ্যতে তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, আছে কেবল অর্থ শোষণের পিপাসা! যে খানে পণের টাকা বেশী, শত বাধাবিঘ্ন বা আপত্তির কারণ থাকিলেও সেই খানেই কন্যার বিবাহ দিবে। অভিভাবকগণের এরূপ স্বার্থপরতা ও পাশব ব্যবহারের দরুণ কত কন্যা যে অপাত্রে বা দুরবস্থাপন্নের হস্তে অর্পিত হইয়া, দিবানিশি দুঃসহ কষ্টে অশ্রুপাত করিতেছেন, তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই প্রকারের স্বার্থান্ধ অভিভাবকগণকে পিশাচ বা রাক্ষস বই আর কি বলা যাইতে পারে? অনেকের আবার কন্যা বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র ব্যবসায়। এই প্রকারের বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের কন্যার অপেক্ষা অর্থের দিকেই অধিক টান। যদি তাহাই না হইবে, তবে তর্থ লালসায় অন্ধ হইয়া, কন্যাকে চিরজীবনের তরে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইতে দেখা যাইত না। এই সকল স্থলে ভাবীবংশের অবস্থা দিন দিন যে কত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, বর্ত্তমান সমাজে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বিবাহার্থী ব্যক্তিগণ দারিদ্র্য ও কন্যাপণ বহন করিতে অসামর্থ্য হেতু বিস্তর টাকা ঋণ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন করিয়াছেন; সারাজীবন খাটিয়াও বিবাহের ধার শোধিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকে আবার কন্যাপণের অনুরোধে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান পর্য্যন্ত—এমন কি, বিবাহের পরের দিবস

খাইবার সম্বল পর্য্যন্তও হারাইয়াছেন। নানাবিধ অভাব ও অশান্তি এই সকল পরিবারের নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাব হেতু ইহাদের বংশে দরিদ্র এবং মূর্খের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া, সংসারে নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

ফুলের বাগান

ফুল ভালবাসে না,এমন লোক আছে কি? বালক বৃদ্ধ,সভ্য অসভ্য,সকলেই ফুলের আদর করে। যে ব্যক্তির কর্ণে সঙ্গীত শ্রুত হয় না, কোন কবি তাহাকে দুরাত্মা বিবেচনা করেন। কিন্তু ফুল ভালবাসে না, এমন দুরাত্মা আছে কি?

বোধ হয়, আজ কাল আমরা ফুল তত ভালবাসি না, কিম্বা ভালবাসিতে জানি না। সে কালের মুনি ঋষিরা জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পদার্থ আশ্রয় করিতেন। তাঁহারা ফুল লইয়া তাঁহার সমীপে যাইতেন। উপবন, তাঁহাদের আলয় ছিল। আমরাও ফুল দিয়া দেবদেবীর আরাধনা করি। ফুলের চেয়ে আর যে কিছু সুন্দর নাই। স্বর্গের নিকটে পার্থিব জিনিস সাজে কি?"ভালবাসা"ই যে ফুলের বাস হইতে পাইয়াছি।

কণ্বমুনি নবমালিকা অপেক্ষাও কোমল শকুন্তলাকে সেই গাছটার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। না জানি তিনি নবমালিকাকে কতই ভালবাসিতেন। শকুন্তলাও তেমনই; সে বকুলের সঙ্গে কথা কহিত; সহকারের সহিত মাধবীর বিবাহ দিত। নবমালিকা তাহার ভগ্নী হইয়াছিল।

যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে,বলিতে গেলেই ফুলের সুষমা ও সৌরভ মনে আসে। বিকসিত কুসুমের সহিত হাসির তুলনা কোথায় পড়িয়াছি, কিন্তু যিনি শোকাশ্রুতে চাঁপা ফুলের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আরও ধন্য।

কিন্তু সকলে সকল ফুল ভালবাসে না। পুষ্প বিশেষের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ অধিক। এই জন্য কেহ বা চামেলী, কেহবা বেলা, কেহবা মাধবী, কেহবা রজনীগন্ধাকে ভালবাসেন। বিস্তৃত ভালবাসা যেন ভালবাসাই নহে, নইলে এক একজনের এক একটা সাধের ফুল থাকে কেন?

আজকাল অনেক ফুলের বাগান দেখা যায়। কিন্তু তাহার অনেক গুলিই বাগান নয়, ফুলের মর্য্যাদা না জানিলে বাগান হয় না। প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে বরাহমিহির লিখিয়াছেন, "এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গাছ প্রতিরোপণ করিবার পূর্ব্বে স্নান ও অনুলেপন দ্বারা শুচি হইয়া তাহার পূজা করিবে।" সেকালের লোকেরা গাছকে এমনই যত্ন করিতেন। ফলফুল দিয়া তাঁহাদিগকে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে হইত।

সাহেবেরা বাগানে যত মন দেন,আমরা তত দিই না। সাহেব ঘরণী স্বহস্তে আলবালে জল সেচন করিয়া থাকেন, কাঁচি লইয়া স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন। তাহাদের বালক বালিকার ক্রীড়নকের মধ্যে ভৃঙ্গারাদি উদ্যান-কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি দেখা যায়।

সেকালের ন্যায় একালেও ধনাঢ্য ব্যক্তির

প্রমোদবন আছে, গৃহের পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডে গৃহবাটিকা আছে। সেকালের মত একালেও সকলে আরাম অন্বেষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রমোদবন বনমাত্র; আরাম, উদ্যানের অপভ্রংশ মাত্র। ধনী ব্যক্তির মান মর্য্যাদা আছে, সুতরাং তাঁহার গৃহবাটিকা বা কেলিকানন আবশ্যক। যেমন গাড়ী, ঘোড়া, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি কত সভ্যতা-ব্যঞ্জক সামগ্রী রাখিতে হয়, তেমনই "নর্সরি" বা বীজতলা হইতে গাছ কিনিয়া মালীদের হাতে সমর্পণ করিতে হয়। গৃহারামই হউক, আর দূরস্থ কেলিকানন হউক, মালীরা তাহার রচয়িতা, পাতা ও ভোক্তা।

সেকালের লোকেরা পুষ্পোদ্যানকে অন্য ভাবে দেখিতেন। দেবদেবীর পূজার নিমিত্ত পুষ্প সংগ্রহ করাই অধিকাংশ পুষ্পোদ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তাঁহারা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামক শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। বরাহমিহির পাঠে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে তাঁহারা গোমাংস পচাইয়া বৃক্ষমূলে সেচন করিতেন; শূকর মাংস অগ্নিতপ্ত করিয়া গাছে তাহার ধূম লাগাইতেন। বরাহ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিও এবিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদ অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

পুষ্পবৃক্ষ সম্বন্ধেও সেকালের ও একালের পুষ্পোদ্যানে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এজন্য হাজার, দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন কথার প্রয়োজন নাই। এখনও নিবিড় পল্লী গ্রামে, যেখানে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার ছায়া প্রবেশ করে নাই, সেখানে এখনও যেমন দুই একটা পুষ্পোদ্যান দেখা যায়, তাহার সহিত সহরে ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহবাটিকার বা তাঁহার প্রমোদোদ্যানের বিস্তর প্রভেদ। একালের উদ্যানে বিলাতি রুচির আধিক্য দেখা যায়, সেকালের উদ্যানে তাহার অভাব ছিল।

সেকালের ও একালের উদ্যানে প্রভেদ আছে বলিয়া কোনটার ভাল মন্দ বিচার করা যাইতেছে না। দেশ কাল পাত্র ভেদে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। বস্তুতঃ ভাল মন্দ রুচির বিচার সহজ নহে। কেননা, রুচি শব্দটারই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সভ্যতার আলোক এবং অসভ্যতার অন্ধকার কখনই একবস্তু ছিল না বা হইবে না। তবে, কোন্‌টা সভ্যতা এবং কোন্‌টা অসভ্যতা, তৎসম্বন্ধে সকলে এখনও একমত হইতে পারেন নাই।

দেবতার পূজার সামগ্রী বলিয়া সেকালের লোকেরা ফুলের আদর করিতেন। আর সকল ফুল দেবদেবীগণ গ্রহণ করেন না। যে ফুলে মধু নাই বা যাহার সৌরভ নাই, সে ফুলের গাছ সেকালের বাগানে স্থান পাইত না। কোন্ ফুল দিয়া কোন্ দেবদেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং অন্যফুলের গাছে সাধারণের প্রয়োজন থাকিত না। আবার পরের বাগান হইতে, এমন কি, পরের রোপিত বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করাও শাস্ত্রে প্রায় নিষিদ্ধ আছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পূর্ব্বে ফুলের বাগান কত ছিল এবং লোকে তাহার প্রতি কত যত্নবান্ হইত।

একালের ফুলবাগানের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। যে ফুলের গাছে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা ছাড়া সেকালের অন্য কোন গাছ বাগানে আজকাল স্থান পায় না। বাস্তবিক সেকালের ও একালের সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গে যেমন প্রভেদ ঘটিয়াছে, পুষ্পোদ্যান রচনা বিষয়েও সেই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়। সেকালের লোকেরা অতি মিষ্ট-লড্ডুতে

রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন, একালে ঈষৎ মিষ্ট বা প্রায় মিষ্ট-রসহীন মিষ্টান্নে তাহা চরিতার্থ হইতেছে। সেকালের লোককে একালের অমিষ্ট সন্দেশ দিলে হয়ত তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতেন না। অথচ আজকাল আক্ষেপ এই যে,ময়রারা মিষ্টান্ন অত্যন্ত মিষ্ট করিয়া থাকে। সেকালের রঞ্জিত বা চিত্রিত বস্ত্র আমাদের নিকট অসভ্য মনে হয়,তাহার প্রখর বর্ণে আমাদের চক্ষুর কোমল স্নায়ু দ্রুতবেগে কম্পিত হয়। এজন্য আমরা রঞ্জিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি; পরিধেয় বস্ত্র শাদা হইলেই ভাল, যদি কখনও রঞ্জিত বা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহাও এত ক্ষীণ বর্ণের গ্রহণ করি যে, তাহা চর্ম্মচক্ষুর প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সেকালের লোকেরা যে আঘ্রাণকে স্নিগ্ধ মনে করিতেন,আমাদের নিকট তাহা তীব্র বোধ হয়। সেকালের আতর অবিমিশ্র অবস্থায় গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। সেকালের ধ্রুপদের উচ্চ সর-সংযুক্ত গানে আমাদের কর্ণপটহ নিপীড়িত হয়, একালের মিষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠের টপ্পাই মনোহর জ্ঞান করি।

একবার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহবাটিকার চামেলীর গাছ না দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তর পাই যে,বাসগৃহের নিকটে তীব্রগন্ধ চামেলী প্রীতিকর নহে! বোধ হয়, সভ্যতা আরও কিছু বৃদ্ধি পাইলে কোন সুগন্ধ ফুল আমরা সহ্য করিতে পারিব না।

যাহা হউক, তিনি কখনও জাতী ফুল দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেন না,তাঁহার বাগানে কেবল বিলাতী গাছেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলাম। তাঁহার বাগানে বিলাতী বাওলেট অতি কষ্টে লালিত পালিত হইতেছে, এক পাশে মেডেল হেয়ার, কুয়ার গায়ে ভিজা দেওয়ালে যে আগাছা গুলা জন্মে, এক পাশে টবে সেই সকল ফার্ণ,তাঁহার পুষ্পবাটিকায় (Conservatory) অর্কিড প্রভৃতি নানাবিধ বিলাতী লতা পাতার গাছ রহিয়াছে। উদ্যান-কর্ম্মে উদ্যানস্বামীর কিঞ্চিৎ মনোযোগ ছিল, অথচ প্রচলিত কয়েকটা দেশীয় সুসম্পন্ন ফুলের গাছ না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তর পাই,তিনি কলিকাতার কোন 'নর্সরির' গাছের তালিকা দেখিয়া গাছ আনাইয়াছিলেন। বাগানে রাখিবার উপযুক্ত কি কি দেশীয় ফুল গাছ আছে, তাহা তিনি জানেন না। বলা আবশ্যক, নর্সরির গাছের তালিকায় ইংরাজিতে গাছের লাটিন নাম দেওয়া হইয়াছিল।

বস্তুতঃ দেখা যায়, যেমন অন্যান্য বিষয়ে আমরা সাহেবি রুচিকে আমাদের রুচি করিয়া লইয়াছি, বাগানের উপযুক্ত গাছ নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও আমরা সেই রুচির অনুসরণ করিতেছি। সাহেবের যে ফুল ভালবাসেন, আমরা ও সেই ফুলভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা যে গন্ধ মনোহর মনে করেন, আমরাও সেই গন্ধই বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তাঁহারা মিনিয়ানেট (mignonette) ভালবাসেন, আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সেই নটে-শলকার মত গাছগুলাকে বাগানে স্থান দিতেছি; তাঁহারা ক্রোটন (Croton) ভালবাসেন, আমরা যেখানে সেখানে সেই গাছগুলা রোপণ করিতেছি। প্রখর গ্রীষ্মের সময় ক্রোটন হইতে যে বিকট গন্ধ বাষ্প উদ্গত হয়, তাহা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে

আমোদ বোধ করি। তবে, জবা করবীর প্রভৃতি কায়েকটা গাছ সাহেবেরা বোধ হয় বিচিত্র মনে করিয়া বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন, আমরাও ঐ রকম দুই চারিটা দেশীয় গাছ বাগানে রাখিতে সাহসী হইয়াছি। বিচিত্র বর্ণ, আকুঞ্চিত পত্র ক্রোটন, দর্শনীয়া (Dracœna) আকালিকা (Acalypha) তাল ও কচুজাতীয় নানাবিধ গাছেই একালের বাগানের শোভা। ইহাদের দর্শন-যোগ্য ফুল হয় না, এবং ফুলের জন্যও ইহারা আদর পায় না। কেবল পাতার বা পত্রময় গাছের বাহার আছে। এই সকল গাছের পরেই গোলাপের রাজত্ব। সকল গোলাপের যে মধুর গন্ধ আছে,তাহা নহে। কোনটার ঈষৎ সৌরভের জন্য কিম্বা কোনটার ছোট বড় আকারের অনেক ফুল ফুটিয়া থাকে বলিয়া গোলাপের এত সমাদর।

বস্তুতঃ,আমাদের চক্ষু-সুখ সম্পাদন একালের বাগানের যত লক্ষ্য, ঘ্রাণসুখ সাধন তত নহে। সেকালের বাগানের গাছের পাতায় কিম্বা ফুলে সুগন্ধ পাওয়া যাইত। একালের বাগানের গাছের সে গুণ থাকে না, তাহা নহে; কিন্তু শোভাই প্রধান। এই নিমিত্ত জবা,রাধিকাচূড়া (বিলাতি কৃষ্ণচূড়া Poincianaregia) মার্সেল নীল নামক হল্‌দে গোলাপ প্রভৃতি গাছ প্রায় সকল বাগানেই দেখা যায়। এখন লতার নিকুঞ্জে বিগনোনিয়া (Bignonia) আন্টিগোনন (Antigonon) প্রভৃতি লতাবল্লী সেকালের মাধবী মালতীর স্থান লইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলি (Bonquet) করিতে হইলে ফুলের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ-পত্র না দিলে, তাহা মনোনীত হয় না।

আমাদের নর্সরিগুলিও বিলাতি গাছ-পালন করিতে পটু হইতেছে। বিলাতী শীত ঋতুর ফুলের বীজ (Season flowers) বিক্রয়ে মনোযোগী হইয়াছে, নানাবিধ অর্কি-ডের অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। ইহাতে দোষ নাই বটে, কিন্তু দেশীয় প্রচলিত গাছের উৎকর্ষ-সাধন পক্ষে একটু দৃষ্টি পড়িলে আরও ভাল হইত। যে কয়েকটা আমাদের পুরাতন গাছের ফুল বহুদল (Double) হইয়াছে, তাহা সাহেবদের যত্নে। সাহেবেরাই আমাদের বিলাসিতা বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারাই ভারতের অরণ্যের ভিতর হইতে একালের বাগানের অনেক গাছ খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

কিন্তু ইহাদের সকল গাছগুলি আমাদের সেকালের লোকদিগের মনে লাগে না। নাগফণা বা ফেণীমনসা জাতীয় গাছগুলা নাকি আমেরিকা হইতে এদেশে আনা হই-য়াছে। সেগুলা না আনিলেই ভাল ছিল। এইরূপ বন হইতে কুণ্ডলতা (Pergularia odoratissiena) পিডিরিয়া (Pœderia) প্রভৃতি কয়েকটা আনিয়া বাগানে স্থান দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।*

* এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটা কিম্ভূত কিমাকার বৈজ্ঞানিক নাম দ্বারা অভিপ্রেত গাছের উল্লেখ করা গিয়াছে। এবিষয় উপায়ান্তর নাই। একালের বাগানের ফুলগাছের নাম করিতে গেলেই এই সকল নাম ব্যবহার করিতে হয়। অন্যান্য দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত গাছের প্রচলন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নাম লইয়া একটা বিষম সমস্যা দাঁড়াইতেছে। বৈজ্ঞানিক লাটিন নাম কোন কালে গাছের সঙ্গে দেশে স্থায়িত্ব লাভ করিবে কিনা, সে বিষয় ঘোর সন্দেহ আছে। তাহার উপর, এক বঙ্গদেশেই স্থানভেদে একই গাছের বিভিন্ন নাম হইয়াছে। যে গাছের সংস্কৃত নাম আছে, এবং মনে হয় এই সংস্কৃত নাম আছে বলিয়া সকলেই তাহাদিগকে চিনিবেন, এমন আশাও নাই।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, দেশে বিদেশীয় নূতন নূতন মনোহর গাছের প্রচলনে লাভ বই অলাভ নাই। কিন্তু তা বলিয়া যে প্রচলিত গাছগুলিকে বাগান হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। উদ্যান রচনা করিতে জানিলে, সেয়ালকাঁটা ও বাঘভেরেণ্ডা দ্বারাও উদ্যানের শ্রী সম্পাদন করিতে পারা যায়। যেখানে সেখানে শতাধিক ক্রোটন গাছ বসাইলেই বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। শীতে কঠিনীভূত দেশে যাহাই হউক, এই গ্রীষ্মদগ্ধ দেশে পুষ্পের মধুর ঘ্রাণ বড় তৃপ্তিকর বোধ হয়। এজন্য পত্রের শোভা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিলে আরামগুলি উপভোগের বস্তু হয়।

অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমালিকা ও নীলোৎপল, এই পাঁচফুলে আমাদের কামদেবের পঞ্চবাণ নির্ম্মিত। বসন্ত সমাগমে ইহাদের যে শোভা হয়, তাহার তুলনা হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলজ পুষ্পের সমাদর না করাই বিচিত্র। কিন্তু কেবল জলজ বলিয়া অরবিন্দ ও নীলোৎপল আদরনীয় নহে। যিনি দূর হইতে সরোবরে বিকসিত পদ্মের সৌরভ পাইয়াছেন, তিনিই ইহার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন। ইহা কবিদিগের কেবল কবিত্ব নহে। বড় দুঃখ হয় যে, কেহ কেহ সভ্যতার এমন উচ্চ সোপানে উঠিয়াছেন যে, পদ্মের পরিমল তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় হয় নাই। পঞ্চশরের মধ্যে কোনটিই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। বসন্তাগমে অশোকের বর্ণচ্ছটায় বিলাতী সাহেবরাও মুগ্ধ হইয়া

গাছের নাম সম্বন্ধে যে কেবল এই দেশেই এরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। সভ্য ও উদ্ভিদবিদ্যানুরাগী জর্ম্মানী দেশে স্থানভেদে গাছের নামভেদ সমস্যার মীমাংসার জন্য সম্প্রতি একটা সমিতির প্রয়োজন হইয়াছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। সংস্কৃত নাম কামলতা, বঙ্গদেশের স্থান বিশেষ তরুলতা বা কুণ্ডলতা নামে প্রসিদ্ধ। আবার এক একটা সংস্কৃত নাম দ্বারা দুই তিন প্রকার গাছ বুঝায়। প্রসিদ্ধ কর্ণিকার দ্বারা মুচকুন্দ ও সোঁদাল উভয়ই বুঝায়। অনেক সংস্কৃত নাম দ্বারা কি গাছ বুঝায়, তাহাও সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারা যায় না। সুরভি, রোচন, চক্র, অরুণ, এগুলি বৃক্ষবিশেষের সংস্কৃত নাম, অথচ তাহারা কোন বৃক্ষ বুঝায়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। আবার দেশভেদে সংস্কৃত নামের এমনই অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, তাহার স্থির মীমাংসা নিতান্ত দুরূহ। বাঙ্গালায় প্রচলিত জবা ফুল উড়িষ্যায় মন্দার নাম পাইয়াছে, আবার বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা মন্দার বা পারিজাত (পালিতে মান্দার) বলিয়া থাকি, তাহার দেবদুর্ল্লভ সৌরভ কই? কিন্তু বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যায় কয়েকটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব গাছের সংস্কৃত নাম হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় Quisqualis Indica বাঙ্গালায় কোন নাম হয় নাই, কিন্তু উড়িষ্যায় তাহার নাম মধুমালতী হইয়াছে, বিদেশীয় পেপের নাম এইরূপ উড়িষ্যায় অমৃতভণ্ডা নাম ধারণ করিয়াছে।

আপাততঃ মনে হয়, বৈজ্ঞানিক লাটিন নাম ব্যবহার করিলে সহজেই বুঝি গাছটা চিনিতে পারা যায়। কিন্তু নানা কারণে একই গাছের বহু নাম হইয়াছে। প্রচলিত দেবদারী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Guatteria longifolia ব্যতীত Uvaria longifolia, Unona longifolia নাম ব্যবহার করিলে সবিশেষ দোষ হয় না। এই সকল বিভিন্ন নাম দ্বারা প্রকৃত গাছ ঠিক করিবার নিমিত্ত নামদাতার নাম উল্লেখ করিতে হয়। আবার, এই দেবদারী গাছকে কেহ বা দেবদারু বলিয়া থাকেন। অথচ ইহার যে নামই দেওয়া যাউক, ইহাকে কোন ক্রমে দেবদারু বলা যায় না। যে গাছের সংস্কৃত নাম দেবদারু, তাহা হিমালয়ে জন্মে, এবং তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Pinus Deodara। যাহাহউক, সম্প্রতি এসকল নাম বিচার করা উদ্দেশ্য নহে। এই প্রবন্ধে যে যে স্থলে বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার অনিবার্য্য বোধ হইল, তৎসমুদয় প্রচলিত নাম বুঝিতে হইবে, এজন্য নামদাতার নাম যোগ করা গেল না।

থাকেন। বিলাতী amherstia nobilis রূপের ভাণ্ডার বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তাহারও রাজা, অশোক। নবকিসলয়-শোভিত চূত পুষ্পে দিক্ আমোদিত হইবারই কথা। নবমালিকা দ্বারা কেহ বেলা, কেহ নেয়ালা, কেহ বা অপর মল্লিকা বুঝিয়া থাকেন। আমরা যাহাকে বনমালিকা বা কাঠমল্লিকা বলিয়া থাকি, সম্ভবতঃ নবমল্লিকা তাহাই। এই বনমল্লিকার সুরভির তুলনায় বাগানের মতিয়া বেলাকেও তুচ্ছ বোধ হয়। কিন্তু বনে ঝোপেই নবমালিকার পরিমল অবসান হয়। নীলোৎপলের (নীলসুন্দি) দশাও তাই। পচাপুকুরে কায়ক্লেশে উহাকে জন্মিতে দেখা যায়। অনায়াসে শতদল পদ্মের ন্যায় উহাকেও বহুদল করিতে পারা যায়।

আম জাম প্রভৃতির ন্যায় তরু, দাড়িম জবা প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুপ (shrub), দ্রোণ দোপাটীর ন্যায় ওষধি এবং মালতী দূর্ব্বার ন্যায় লতা, এই চারিভাগে যাবতীয় উদ্ভিদ মোটামুটি ভাগ করিতে পারা যায়। এই ভাগানুসারে দেখিলে দুইটি জলজ ওষধি, একটী বৃক্ষ, একটি ক্ষুপ ও একটি লতা হইতে কন্দর্প তাঁহার পাঁচটি শর সংগ্রহ করিয়াছেন। চূতের ছায়া, অশোকের কান্তি, পঙ্কজের শৈত্য, নবমল্লিকার আমোদ, আবশ্যকমত সমস্তই বাছিয়া লইয়াছেন। ফুলধনুর জ্যা ভ্রমরময়; কেন না, ভ্রমরের গুঞ্জন নইলে ফুলধনুর টঙ্কার হইত না। বোধ হয়, মাধবীবল্লীর ধনু করিলে তাহা আরও সুন্দর হইত। যাহা হউক, পঞ্চ বাণের বর্ণ দেখিলে, একটির সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, একটির বালারুণের ন্যায় আরক্ত বর্ণ, একটির চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণ, একটির আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ এবং একটির দন্তপঙ্ক্তির ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব কি বৃক্ষের আকারে, কি কান্তিতে, কি পুষ্পগন্ধে, কি রূপে, সকল বিষয়ে মন্মথের পাঁচটি শর বিচিত্র এবং যদি বসন্তকালের ফুলগুলি হইতে কেবল পাঁচটি ফুল বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এই কয়েকটি ছাড়া আর কি লইতে পারা যায়?

কালিদাসের সময়ে গুণে বনলতা উদ্যানলতাকে পরাজিত করিয়াছিল। এখনও নবমালিকা ও তাহার কুটুম্বিনীগণ গুণে অপরকে পরাজিত করে। জাতীর সুবাস অন্য ফুলে সম্ভবে কি? বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে grandiflorum বলিয়া অধিক কি বলিয়াছেন? কুন্দ, যূথী, মল্লিকা, কোন্‌টাই বা পরিত্যাজ্য? সেদিন এক সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি বিলাতী "যাসমিনের" (jasmine) প্রশংসা করিতেছিলেন। কোন্ ফুলকে বিলাতী যাসমিন্ বলিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে ফুলই হউক, তাহা বাস্তবিক যাসমিন হইলে কখনই দেশীয় যাসমিনের নিকটেও আসিতে পারিবে না। বিলাতী নামের সকল বস্তুই উপাদেয় নহে। কৃত্রিম বিষয়ে যাহাই হউক, অকৃত্রিম ব্যাপারে বিলাত এ দেশকে হারাইতে পারে নাই। এদেশে আবার মনোজ্ঞ ফুলের অভাব? বা মনোজ্ঞ পত্রময় বৃক্ষের অভাব? সূর্য্যের কিরণে যেখানে এত তেজঃ, সেখানের ফুলের সুবাস, ফুলের রূপ বা পত্রের কান্তি বৃক্ষের সৌষ্ঠব শীতদেশে সম্ভবে না। যে সকল বিলাতী ফুলের গাছ এদেশে সমাদর হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই চীন ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।

যাহা হউক, আজকাল অনেকে বিলাতী ফুলের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। এই সকল বিলাতী ফুলের গাছ পান না বলিয়া কাহারও কাহারও উদ্যান রচনা করিয়া সুখ

হয় না। কিন্তু যদি ফুলের বা পাতার বা গাছের শোভার জন্য ফুল বাগান করিতে হয়, তাহা হইলে বন জঙ্গলে এখানে ওখানে একটু খুঁজিলে মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্বে কুটজ (কুড়চী) ফুল প্রাচীনদিগকে মোহিত করিত। একালের কোন উদ্যানে কুটজ রোপিত হইতে দেখি নাই। ইহা এখন অরণ্যে নিজের সুষমা ও সুবাস ছড়াইয়া মরিতেছে। অনেক ফুল সর্ব্বত্র দেখিতে পাই বলিয়া আমাদের চক্ষে তাহাদের সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে। নতুবা তিল, শণ, অতসী, কালমেঘ (andrographis) লাঙ্গলিকা (ইষ-লাঙ্গলে) প্রভৃতি ওষধি বাগানে রাখিবার উপযুক্ত। ইজ্জল (হিজ্জল), চালতা, দাড়িম্ব, অঙ্কোট (আঁকড়) প্রভৃতি তরু সকল পুষ্পোদ্যানে স্থান পায় না কেন? এইরূপ শিয়ালকাঁটা, বাঘনখা (martynia-diandra) গর্ভভাস্ত (পরেশপিপল) ভদ্রবল্লী (হাপরমালী), ভার্গী (বামনহাটী), দক্রঘ্ন (দাদ-মর্দ্দন) কেমুক (কেউ) প্রভৃতি বাগানে বসাইলে তাহার সৌন্দর্য্য হানি হয় না। আমাদের দেবদেবীপ্রিয় অনেক পুষ্প আছে। তৎসমুদায় একবারে পরিত্যাজ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বেশীদামের গাছ থাকিলেই বাগান হয় না। রচনায় ও বৃক্ষ-বিন্যাসেই উদ্যানের প্রাণ। কবির কবিত্বের ন্যায় উদ্যান রচনা অপরের নিকট শিক্ষা করা যায় না। উহা চিত্রকরের চিত্রের বিষয় সমাবেশের ন্যায় দুরূহ। ললিতকলার মধ্যে উদ্যান রচনাকে আনিতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য উপভোগই যদি ললিতকলার সারাংশ হয়, উপবনের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আর কি সৌন্দর্য্য আছে? মানুষের রচিত চিত্রে যদি মনমুগ্ধ হয়, আর প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই যদি চিত্রবিদ্যার পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উদ্যান রচনা তদপেক্ষাও উচ্চ। মাধবী সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একথা পড়িলে যদি আনন্দ হয়, দেখিলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবার কথা। বস্তুতঃ চিত্রে কেবল একটা ইন্দ্রিয়পথে সৌন্দর্য্যসুখ আনয়নের চেষ্টা হয়, পুষ্পিত উপবনে, সুশীতল ছায়ায়, শ্যামকান্তিতে, সুরভি আঘ্রাণে, বর্ণ বৈচিত্র্যে, কূজন্ত পক্ষী সহবাসে সকল ইন্দ্রিয়ই চরিতার্থ হয়।

অনেক বাগানে এমন কৃত্রিম শ্রী সম্পাদনের চেষ্টা দেখা যায় যে, তাহা পুরাতন পক্ষযুক্ত সিংহের ন্যায় উৎকট বোধ হয়। উদ্যান রচনা কুশ্রী বা নিতান্ত কৃত্রিম হইলে শতমুদ্রা ব্যয় করিলেও তাহা উদ্যান হয় না। কোন কোন উদ্যান দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলা গাছ জন্মিতে অন্যত্র স্থান পায় নাই বলিয়া সেগুলাকে বাগানে আনা হইয়াছে। কতকগুলা গাছ রোপণ করাই যেন কোন কোন উদ্যান রচনার উদ্দেশ্য। চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময় একদিন কোন ধনবান্ বিষয়ী ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, তিনি তৎকালে কয়েকজন বন্ধুর সহিত সম্মুখস্থ গৃহবাটিকায় সুখালাপ করিতেছেন। অবিরত বিষয় কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে উদ্যান-সুখ সম্ভোগ করিতে শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। নিকটে গিয়া দেখি, তিনি এক প্রকাণ্ড ক্রোটনের বনে শয্যা পাতিয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ সেটা বনও নহে, কেন না তাহাতে ইতস্ততঃ সোজাসুজি কোণাকোণি সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে এবং আরণ্য বৃক্ষ মাত্রেই নাই;

এবং সেটা উদ্যানও নহে, কেন না সেখানে তিনি পৃথিবীর ক্রোটন পুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার সাধের উদ্যানটা একটা ক্রোটনের নর্সরি বলিয়া বোধ হইল।

অনেক উদ্যান দেখিলে মনে হয় বুঝি, সেটা গাছ লইয়া শতরঞ্চ খেলাইবার জন্য রচিত হইয়াছে। কেহবা বৃত্ত, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানা আকারে উদ্যানটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, সুন্দরী প্রকৃতির বিকৃতি দেখাইবার জন্য তাহার উদ্যান রচনা। এদিকেও আবার, প্রকৃতির মধ্যে কুত্রাপি সরল রেখার ন্যায় একটা জিনিস নাই, এপীঠের সহিত ও পীঠের ঐক্য নাই, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়। যিনি মুরারীর আকার ত্রিভঙ্গ করিয়াছিলেন, সৌন্দর্য্য রসজ্ঞতা তাঁহার ছিল। কুটিলগতি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সৌন্দর্য্য অতি ঋজু খালে কোথায়?

যাহাদের স্থান অল্প, তাহাদের উদ্যানে কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু অট্টালিকা কৃত্রিম বটে, অথচ তাহারও এক প্রকার শোভা আছে। অট্টালিকার এপাশে থাম থাকিলে অন্য পাশে থাকে, তাহার এক পাশ দেখিলেই অন্য পাশটা ভাবিয়া লইতে পারা যায়। এই জন্যই উহার সৌন্দর্য্য প্রাণস্পর্শী নহে। অথচ তাহাতেও একটি শ্রীসম্পাদন করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ অল্প স্থানে প্রভূত উদ্যান রচনাতেই সৌন্দর্য্যজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তৃত স্থানে বহুবিধ বৃক্ষ রোপণ দ্বারা রচনার দোষ-বৈচিত্র্য কতকটা খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত উদ্যানে যাহা শোভা পায়, ক্ষুদ্র উদ্যানে তাহা উপযোগী নহে। অল্প স্থানের মধ্যেই নিকুঞ্জ, কৃত্রিমশৈল, পুষ্পগৃহ, পক্ষীগৃহ প্রভৃতি পাইতে গেলে একটা যেন সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে। বস্তুতঃ কোনটাই ঠিক হয় না, অধিকন্তু কৃত্রিমতার উপর কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পায়। অল্প স্থানের বাগানের প্রধান দোষ এই ঘটে যে, স্থানের তুলনায় গাছের সংখ্যা প্রায়ই অধিক হইয়া থাকে। গাছের মধ্যে ফাঁক রাখিলে তাহা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তেমনই তদ্দ্বারা উদ্যানের শ্রী সম্পাদিত হয়।

কিন্তু বিস্তৃত স্থানে বাগান করিবার সময়ও সবিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের কৃত বিষয়ে সহজেই কৃত্রিমতার ভাব আসিয়া পড়ে। বাগানের একটি নাম উপবন। অর্থাৎ বাগানটি দেখিলে কতকটা বন মনে পড়িবে। উহা প্রকৃত বন নহে, অথবা নর্সরি নহে। উভয়ের সামঞ্জস্য করাই কঠিন। অনেক জিনিস আছে, যদ্দ্বারা অসভ্য বর্ব্বর হইতে সভ্য উন্নত ব্যক্তির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তরুলতা-জড়িত উচ্চ শৈলমালা বা ফেণপুঞ্জময় সাগরতরঙ্গ বা তারকাখচিত নীল আকাশ, ইহারা সভ্য অসভ্য সকলের পক্ষেই গম্ভীর এবং সকলেরই পক্ষে চিত্তের অবসাদক। প্রতিদিন দেখুন, তথাপি চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না। পর্ব্বতের প্রস্তরে বা তাহার বৃক্ষাদিতে, সাগরের জলে বা তাহার ফেণমালায়, শূন্য আকাশে বা এক এক তারায় সৌন্দর্য্য নাই; অথচ তাহাদের সংযোগে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, সুন্দরীর বর্ণে বা তাহার এক এক অঙ্গে সৌন্দর্য্য নাই; তাহার লাবণ্য বা অঙ্গ-সৌষ্টবের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু তাহার মুখে তদপেক্ষা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। যে সৌন্দর্য্যের সীমা করিতে পারা যায় না, যাহা ধরিতে পারা যায় না,

তাহাই চিরকাল পরমানন্দকর হইয়া থাকে। এইরূপ, উদ্যানের বৃক্ষবিশেষ, বা তাহার সুবাস বা তাহার বর্ণ দেখিলে চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সমুদয় বৃক্ষের বিন্যাসে, প্রত্যেক বৃক্ষের রমণীয় উপাদানের সংযোগে, এমন একটা ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত, যাহা দেখিলে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়। স্বাভাবিক বন দেখিলে কি যেন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থের প্রতিবিম্ব মনে হয়, কি যেন আরও কত কি আছে, এইরূপ ভাবনায় ডুবিয়া যাইতে হয়। ইহাতেই প্রকৃতির মনোহারিণী শক্তি। সাগরজলের তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন তরঙ্গের শেষ নাই। সেইরূপ প্রকৃত উদ্যানের যেন শেষ নাই, উহার কোন অংশই প্রধান নয়, অথচ কোন অংশই বাদ দেওয়া যায় না। যেখানে যে গাছটি আছে, ঠিক সেইখানে সেই গাছ না থাকিলে চলিত না। যে লতা যে তরুকে আশ্রয় করিয়াছে, সে লতা না থাকিলে যেন সেই তরুটিই থাকিত না। যে পথটি বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই পথটি ঠিক সেইরূপ না থাকিলে পথই হইত না। এইরূপ নানা কৌশলে উদ্যানে জীবনী-শক্তির বিকাশ দেওয়া আবশ্যক।

আর একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে। তাহাকে লৌকিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। এই লৌকিক সৌন্দর্য্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে রুচির বশবর্ত্তী। অট্টালিকা বা বসন ভূষণের সৌন্দর্য্য এই প্রকার। যেন কতকগুলি লোক পদার্থবিশেষ বা পদার্থের সমাবেশ বিশেষকে সুন্দর ভাবিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা থাকে। রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইপ্রকার সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের ছায়া অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ উদ্যানে অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ বা হাবভাবশীলা প্রস্তরময় রমণী-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এই সৌন্দর্য্য প্রকাশের চেষ্টা করেন। একই বৃক্ষের একত্রে বহুল সমাবেশ দ্বারা এই প্রকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহারও সীমা থাকা আবশ্যক। মনে করুন, এক স্থানে কেবল নানাবিধ গোলাপ ফুটিয়া আছে, অন্য স্থানে কেবল বেলা ফুটিয়া রহিয়াছে। এইরূপে উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে পুষ্প বিশেষ প্রস্ফুটিত হইলে একপ্রকার সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। কিন্তু ইহাতে নূতনতা ও বৈচিত্র্যের অভাব ব্যক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই জন্যই ইহার সীমা থাকা আবশ্যক। তবে এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলে অসঙ্গতির ভাব মনে আসে। তাল, হিন্তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, গুবাক, বেত প্রভৃতির একত্র সমাবেশ না দেখিলে কেমন কেমন মনে হয়। বস্তুতঃ সকল বিষয়ে প্রকৃতির অনুসরণ করাই একমাত্র সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে।

উদ্যানের মধ্যে জলাশয় এবং শ্যামল তৃণক্ষেত্র সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সবিশেষ সহায়। যেমন বাগানই হউক, তাহাতে শ্যামল তৃণভূমি সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু উদ্যান বহু বিস্তৃত হইলে এই তৃণভূমির আকারে প্রাকৃতিক ভাব আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এস্থলে তাহাকে বৃত্তাকার বা চতুরস্রাকার না করিয়া উদ্যানের বৃক্ষ বিন্যাসের উপযোগী করিলে তৃণ-ভূমি দেখিতে রমণীয় হয়। লতা দ্বারা জীবজন্তুর কৃত্রিম আকার দিবার প্রয়াস বাঞ্ছনীয় নহে। অথচ লতাগুলিকে অতিরিক্ত গুল্মিনী হইতে দিলেও ভাল দেখায় না।

যাহা হউক, উদ্যানের শ্রী বৃদ্ধি করিবার সমুদয় উপায় বর্ণনা করা সহজ নহে। আমাদের নীরস প্রাণকে সরস করিতে কাব্য যেমন পটু, উদ্যানকেও তেমনি প্রকৃতির কাব্য মনে করা উচিত। যিনি উদ্যানের কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারেন না, প্রকৃতির অনুচর্য্যা করা তাঁহার বৃথা। যিনি বৃক্ষের পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে সঙ্গীতের মনোহারিণী শক্তি অনুভব করিতে না পারেন, তাঁহার উদ্যান-কর্ম্ম নিষ্ফল। এরূপ ব্যক্তি ইন্দ্রের নন্দন-কাননে প্রবেশ করিলেও কেবল কতকগুলা গাছ দেখিতে পাইবেন। যেমন চিত্র দেখিয়া সুখ অনুভব করিতে কিম্বা মধুর সঙ্গীতে আত্মহারা হইতে অনুশীলন আবশ্যক, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেও তদ্বিষয়ে তেমনি অনুশীলন আবশ্যক। যেমন কোন কোন সঙ্গীত একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে কতক দিন পর্য্যন্ত তাহার ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই যে উদ্যানে একবার প্রবেশ করিলে হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, অল্পকালে নিবৃত্ত হয় না, সেই উদ্যানই শ্রেষ্ঠ উদ্যান এবং মর্ত্ত্যের নন্দনকানন।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

ধূলি।

কে গো তুমি জগতের
 এক কোণে আছ স'রে;
পদানত—পদাহত—
 মুখ বুজে—চুপ ক'রে?
কেন এই ভূমি-শয্যা?
 কেন এ বিষাদ-ভার?
কেন গো লুটাও সদা
 পদতলে সবাকার?
সকলেরি স্থান আছে;
 তোমারি কি স্থান নাই?
চিরদিন পদতলে?
 ওই কি তোমার ঠাঁই?

২

আহত—পেষিত তুমি—
 উপেক্ষিত চিরদিন;
অভিযোগ—অনুযোগ
 তবু নাহি কোন দিন!
কি যেন মরম-ব্যথা
 বল বল—বলিলে না?
কি যেন শরমে মাথা
 তুল তুল—তুলিলে না?
ছিল কি লুকান বল,
 কে যেন নিয়েছে হ'রে!
বিষাদ—বসন প'রে
 তাই গো রয়েছ ম'রে!
নির্ম্মম পৃথিবী দিলে
 নিন্দা—ঘৃণা—তিরস্কার!
এলে আর পেলে শুধু
 পদাঘাত—পুরস্কার!
অনেকে অনেক সহে,
 কে পারে যেমন তুমি?
সবারি তুলনা মিলে,
 তোমার তুলনা তুমি!

৩

তোমা পানে চেয়ে চেয়ে
 মোহ-ঘোর যায় ছুটে;
কত কি ঘুমন্ত স্মৃতি
 সচকিতে জেগে উঠে!

মনে পড়ে আদি—অন্তে
ধূলি বিনা কিবা আর ?
অণু—পরমাণু-বিনা
কিসে পূর্ণ এ সংসার ?
মনে পড়ে ধন-জন,
যত কিছু আপনার,
নিশ্বাসে উড়িয়া যাবে !
কে আমার ? আমি কার ?
মনে পড়ে শেষ-শয্যা—
ধূলিতে মিশিবে ধূলি !
কোথা দেহ ? কোথা গেহ ?
চাহিব না মাথা তুলি !
মায়াময়—ছায়াময়—
ধূলাময় কিবা নয় ?
ফুৎকারে এ রচনা,
ফুৎকারে হবে লয় !

নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝি
তোমার আমার সনে ;
অনুরূপ—প্রতিরূপ
তুমি আমি দুই জনে।
তোমাতে আমার ছবি,
আমার মুকুর তুমি !
আমাতে তোমার ছবি,
তোমার মুকুর আমি !
তোমার নিকটে আমি
ছোট বই বড় নই ;
আমার নিকটে তুমি
বড় বই ছোট কই ?
তোমা পানে যত চাই,
আরো চাই সাধ হয়।
তোমাতে আপনা-হারা—
করি আত্ম-বিনিময় !

কি যে এক প্রহেলিকা
তোমায় ছাইয়া আছে !
বুঝেছে যে—মজেছে সে,
অবাক্ হইয়া আছে ?
কে আর করিবে ঘৃণা ?
কে বলে নগণ্য তুমি ?
নগণ্যে অগণ্য গুণ
দেখে বিমোহিত আমি!

৫

গভীর এ ধূলিতত্ত্ব !
এ ধূলি সামান্য নয় ;
ক্ষুদ্রের ভিতরে যে গো,
অনন্ত লুকায়ে রয় !
ধূলির ভিতরে বিশ্ব !
ধূলিতে জগৎ-ছবি ?
ধূলির ভিতরে হাসে
কোটী শশী—কোটী রবি!
সসীমে অসীম লীলা !
বিন্দুতে সিন্ধুর খেলা !
ক্ষুদ্র পরমাণু জুড়ে
বিরাট অনন্ত মেলা !
কোথায় সীমান্ত রেখা ?
কই ক্ষুদ্র বিন্দু ধূলি ?
অনন্তের মহাধার—
এ ধূলি মাথায় তুলি।

৬

ধূলি! তুমি ক্ষুদ্র নও,
তুমি যাহা তুমি তাই ;
তোমার মহিমা গুণ
প্রকাশি শকতি নাই।
আমার পরম গুরু,
ভুলি কি তোমায় আর ?
কত দিলে, কত দিবে
স্বধামের সমাচার।

আপনি দৃষ্টান্ত হ'য়ে
দেও তুমি উপদেশ ;—
কেমনে সহিতে হয়
অপমান—ঘৃণা—শ্লেষ।
কবে গো তোমারি মত,
মুখ বুজে—চুপ ক'রে
শিখিব সহিতে সব,
রব এক পাশে স'রে ?
যে যা বলে যাবে ব'লে,
শুনিব গো কাণ পেতে ;
যে যা নির্যাতন করে
সহিব গো বুক পেতে !
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে
তোমাতে দেখিব আমি ;
আমা পানে চেয়ে চেয়ে
আমাতে দেখিব তুমি !
অমনি তোমারি মত
আমাতে অনন্ত ল'য়ে
আত্মহারা—দিশাহারা—
রহিব অবাক্ হ'য়ে !

শ্রীকালীনাথ ঘোষ

মহর্ষি গৌতমের আত্মা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শিষ্য। বুঝিলাম, বহিরিন্দ্রিয়গণ চৈতন্যবান্ নহে এবং সচেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতীতও অচেতন পদার্থ স্বয়ং কোনও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না ; অতএব অতিরিক্ত চৈতন্য পদার্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বোধ হয়, এই কারণে সৌগত সম্প্রদায় বিশেষ, মনেরই চৈতন্যবত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—

নাত্ম-প্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবাৎ। ৩। ১। ১৬ সূঃ।

অর্থ।

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চৈতন্য পদার্থ নাই। কারণ, অতিরিক্ত চৈতন্য প্রমাপক হেতু সমূহ অন্তরিন্দ্রিয় মনেতে উপপন্ন হইতে পারে।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

মনঃ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিষয়গ্রাহী চৈতন্য পদার্থ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গণ, মনেরই জ্ঞান সাধন মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিশেষের বিনাশ হইলেও অনুভবকর্ত্তা মন বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, বিনষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূত পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। ইত্যাদি—

গুরু।—

জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। ৩। ১। ১৭ সূঃ।

অর্থ।

জ্ঞাতার জ্ঞানের করণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব মনকে চৈতন্যবান্ বলিলে, আত্মাকেই মন নামে অভিহিত করা হয় মাত্র।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

যাহাদ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে করণ বলে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই পঞ্চ বহিঃ করণ দ্বারা মনন, শোক হর্ষ প্রভৃতি আন্তর জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব মনন প্রভৃতি সিদ্ধির নিমিত্ত অন্তঃকরণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। উক্তঃ অন্তঃকরণেরই নামান্তর মনঃ। করণ কর্ত্তার অধীন ও কর্ত্তা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। অতএব কর্ত্তা ও তাহার অধীন

বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত করণ, কখনই অভিন্ন পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তথাপি যদি মনকে চৈতন্যবান্ ও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মনঃ, আত্মারই নামান্তর হইয়া উঠে। ইহা আর অন্তঃকরণের প্রতিপাদক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অথবা মনঃ, নানার্থ শব্দের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে তাৎপর্য্যাদিবশতঃ আত্মা ও অন্তঃকরণ মাত্রকে বুঝায়। ফলতঃ বাচক শব্দের একত্ব বিধান দ্বারা বাচ্যের একত্ব বিধান কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কেবল ইহাই নহে;—

নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ। ৩। ১। ১৮ সূঃ।

রূপ রসাদির প্রত্যক্ষ, করণ সাপেক্ষ। কিন্তু সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষে করণের অপেক্ষা নাই। এ প্রকার নিয়মও অনুমান বহির্ভূত।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

চক্ষুর্দ্বারা কেবল বর্ণজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়; ইহা দ্বারা শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। অতএব করণান্তর কর্ণের সৃষ্টি। চক্ষুঃ কর্ণ দ্বারা রসানুভব হয় না। অতএব রস-করণ রসনার উৎপত্তি। এই প্রকার চক্ষুঃ কর্ণ রসনা, এই তিনের কোনটি দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না; অতএব গন্ধ গ্রাহক নাসিকার জন্ম। আবার চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা রসনা এই করণ চতুষ্টয়ের একটি দ্বারাও স্পর্শজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া ত্বকের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব উক্ত যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখ দুঃখাদি যখন উল্লিখিত পঞ্চবিধ করণের বিষয় বহির্ভূত; তখন অবশ্যই তাহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয় আছে। সুখ দুঃখাদির গ্রহণ সাধন সেই ইন্দ্রিয়ের নামই মনঃ। বহিরিন্দ্রিয়গণের ন্যায় মনঃও অচেতন পদার্থ এবং চেতনকর্ত্তার অধীন জ্ঞান সাধন মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ আত্মার সহিত মনঃ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়, ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে, তবে প্রত্যক্ষজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। মনের পরিমাণ অণু। অণু বলিয়া মনঃ একবারে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের যুগপৎ একাধিক জ্ঞানও নিষ্পন্ন হয় না। কিন্তু আত্মার পরিমাণ মহৎ। মনঃ যদি সেই মহান্ আত্মা হইত, তবে মনের, এককালে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার কোনওই বাধা থাকিত না। সুতরাং আমরাও ইচ্ছা করিলে, যুগপৎ সর্ব্ববিধ বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন তাহা পারি না, তখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে,মনঃ কোনও ক্রমেই মহৎ পরিমাণ আত্মা নহে। অতএব তুমি বলিতেছ যে,অতিরিক্ত চৈতন্যের প্রতিপাদক প্রমাণ সমূহ মনেতে সমাহিত হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

শিষ্য। ভাল, ইন্দ্রিয় মনের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র চৈতন্য বা আত্মা আছেন, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ যে আত্মাকে নিত্য পদার্থ বলেন, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। নৈয়ায়িকগণ প্রমাণ বা যুক্তিবহির্ভূত কোনও কথাই বলেন না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তও তাঁহারা অনেকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যথা—

পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোক সম্প্রতিপত্তেঃ। ৩। ১। ১৯ সূঃ

অর্থ।

পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়ের স্মরণ হওয়াতেই সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের উদয়

হইয়া থাকে। অতএব প্রমাণিত হইতেছে, দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং আত্মা নিত্য পদার্থ।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

ইষ্ট লাভে হর্ষ, ভীষণ হিংস্রাদি জন্তু দর্শনে ভয় এবং ইষ্টনাশে শোকের উদয় হইয়া থাকে। এই সমস্তই হর্ষ ভয়াদির অসাধারণ হেতু। কিন্তু এই সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, সদ্যোজাত শিশুকে কখনও হৃষ্ট, কখনও ভীত, কখনও বা শোকার্ত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অনুমিত হইতেছে, হর্ষাদিকারণ স্মরণ হওয়াতেই শিশুর উক্ত প্রকার বিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর ইহজন্মে ইষ্টলাভাদি উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব শিশুর জন্মান্তরীয় ইষ্টলাভাদি স্মরণ হওয়াতেই হর্ষাদি জন্মিয়া থাকে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং আত্মার পূর্ব্বজন্ম দ্বারা তদীয় নিত্যত্বও প্রমাণিত হইতেছে।

শিষ্য।—

পদ্মাদিষু প্রবোধসংমীলনবিকারবৎ তদ্‌বিকারঃ।
৩। ১। ২৯ সূঃ।

অর্থ

পদ্মাদিপুষ্পের বিকাশ সংমীলন বিকারের ন্যায় সদ্যোজাত শিশুর মুখবিকাশাদি ঘটিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা শিশুর হর্ষাদি কারণ অনুমিত হইতে পারে না।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

যেমন পদ্মপুষ্পের বিকাশ হর্ষ জন্য নহে এবং সংমীলনও শোকাদি জন্য নহে; সেই প্রকার সদ্যোজাত শিশুরও মুখবিকাশ বা মুখমালিন্য হর্ষ শোকাদি হইতে জন্মে না। তথাপি শিশুর মুখ বিকাশ বা মুখমালিন্য মাত্র দেখিয়া, তদীয় কারণরূপে হর্ষশোকাদির অনুমান এবং ইহজন্মে সদ্যোজাত শিশুর হর্ষশোকাদি কারণের অনুপস্থিতি বোধে জন্মান্তর পর্য্যন্তের কল্পনা কোনও ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

গুরু।—

নোষ্ণশীতবর্ষাকাল নিমিত্তত্বাৎ
পঞ্চাত্মকবিকারাণাম্‌। ৩। ১। ২১ সূঃ।

পাঞ্চভৌতিক পদ্মাদি পুষ্পের বিকাশের কারণ, উষ্ণতা, নিমীলন বা সঙ্কোচের কারণ শৈত্য এবং বিকারের কারণ বর্ষাকালাদি। কিন্তু মানবের মুখবিকাশ ও মুখমালিন্য হর্ষ শোকাদি ভিন্ন অন্য কারণ হইতে ঘটে না। ইহা প্রত্যেক মানবের অনুভব-সিদ্ধ। অতএব পদ্মবিকাশাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। আরও দেখ—

প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষঃ। ৩।১।২২ সূঃ।

অর্থ।

সদ্যোজাত গোবৎসাদির স্তন্যপানে অভিলাষ দেখা যায়। কিন্তু অভ্যাস ব্যতীত আহারাভিলাষ সম্ভব হইতে পারেনা। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জন্মান্তরীয় অভ্যাস বশতঃ গোবৎসাদির স্তন্যপানে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

যুক্তি ও তাৎপর্য্য।

শরীরিগণ ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, অভ্যাস বশতঃ আহার্য্য বস্তু স্মরণ করিয়া, তাহাতে অভিলাষী হয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে, সদ্যোজাত বৎসের "অভ্যাস বশতঃ আহার্য্য বস্তু স্মরণ করিয়া, তাহাতে অভিলাষী" হওয়া, কোনও ক্রমেই উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব বৎসের স্তন্যাভিলাষ দ্বারা আত্মার জন্মান্তর প্রমাণিত হইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বিশেষতঃ আহার দ্বারা ক্ষুধার শান্তি হয় এবং সেই আহার এই স্তনের মধ্যে সঞ্চিত আছে,ইত্যাদি জ্ঞান না থাকিলে, সদ্যোজাত গোবৎসের কোনও ক্রমেই স্তন্যপানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। কিন্তু কোন্ বস্তু খাদ্য এবং তাহা কোথায় থাকে, ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে অথবা কেহ উপদেশ না দিলে, কেহ আপনা হইতে জানিতে পারে না। তথাপি যখন গোবৎস আপনা হইতেই স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়,তখন বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, জন্মান্তরীয় ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানই বৎসের এতাদৃশ প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ। অতএব দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, সুতরাং আত্মা নিত্য বস্তু।

শিষ্য।—

অয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণম্। ৩।১।২৩ সূঃ।

অর্থ।

লৌহ যেমন অভ্যাস অথবা উপদেশ ব্যতীত অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বকের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইপ্রকার সদ্যোজাত বৎস প্রভৃতিও অভ্যাসাদি ব্যতীত স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব বৎসের স্তন্যপান প্রবৃত্তি দ্বারা পূর্ব্বজন্ম ও আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না।

গুরু।—

নাণ্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ। ৩।১।২৪ সূঃ

অর্থ।

লৌহ ভিন্ন অন্যপদার্থ চুম্বকের প্রতি-ধাবিত হয় না। সুতরাং লৌহ যে চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার কোনও বিশেষ কারণ আছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কাযেই লৌহের চুম্বকাভিগমন দৃষ্টান্ত দ্বারা কারণ নিষিদ্ধ হইতেছে না। অতএব ইহা-দ্বারা বৎসের স্তন্যাভিলাষের হেতু জন্মান্তরীয় ইষ্টানুসরণও নিষিদ্ধ হইতেছে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে, জন্মান্তর আছে এবং আত্মাও নিত্য বস্তু। অপিচ—

বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ। ৩।১।২৫ সূঃ

জাতমাত্রেই জন্তুগণকে সরাগ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষী দেখা যায়। কোনও জন্তুকেই রাগশূন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। ইষ্ট বিষয়ের অনুস্মরণই রাগের অসাধারণ হেতু। কিন্তু যাহা কখন অনুভব করা যায় নাই,তাদৃশ বস্তুর স্মরণও সম্ভাবিত নহে। অতএব বলিতে হয়, সদ্যোজাত জন্তুগণ জন্মান্তরানুভূত বিষয় স্মরণ করিয়াই তাহাতে অনুরক্ত হয়। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, জন্মান্তর আছে, এবং অনাদি জন্ম মরণ প্রবাহ পতিত আত্মাও নিত্যবস্তু।

শিষ্য।—

সগুণদ্রব্যবৎ তদুৎপত্তিঃ। ৩।১।২৬ সূঃ

অর্থ।

ঘটাদিদ্রব্য যেমন আপনা হইতেই সগুণ অর্থাৎ শ্যামরক্তাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার আত্মাও স্বতঃ সরাগ অর্থাৎ সাভিলাষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অতএব সরাগ জন্ম দ্বারা পূর্ব্বজন্ম বা আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না।

গুরু।—

ন, সঙ্কল্প নিমিত্তত্বাদ্ রাগাদীনাম্। ৩।১।২৭ সূঃ

অর্থ।

"এতদ্বারা আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে" এই-প্রকার ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অনুস্মরণই রাগ বা বিষয়াভিলাষের একমাত্র কারণ। ইহা ভিন্ন অন্যপ্রকারে রাগোদয় উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব সগুণদ্রব্যোৎপত্তির ন্যায় সরাগ আত্মার জন্ম, ইহা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং "জন্ম প্রবাহ পতিত আত্মা নিত্য" ইহা সরাগ জন্মদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। ইতি।

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি (১৬)।

গো-বসন্তের চিকিৎসা।

গো-বসন্তের চিকিৎসায় যে কয়েক প্রকার টিকা-রস প্রয়োগের ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে লিয়োঁ নগরের পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শোভো সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা কিরূপে টিকা-রস প্রস্তুত করা যায়, তাহা এক্ষণে বর্ণিত হইবে। প্রথমতঃ গো-বসন্ত রোগে সদ্যঃমৃত একটী মেষ বা গো হইতে শোণিত সংগৃহীত হয়। জন্তুটী কালবিলম্ব না করিয়া ব্যবচ্ছিন্ন করিতে হয়। উহা যে গো-বসন্ত রোগেই মরিয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এক কণা শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। উহার মধ্যে গো-বসন্তের কৈশিকাণু (Bacilli) আছে কি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া জন্তুটীর হৃদয়ের আবরণ খুলিয়া হৃদয়ের এক অংশে কাচের একখণ্ড নল অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করিয়া স্পর্শ করাইয়া দিয়া (অর্থাৎ উপরিস্থিত অণু অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিয়া লইয়া), হৃদয় মধ্যে একটী কাচের পিপেট্ (pipette) বিদ্ধ করিয়া দিয়া উহা হইতে রক্ত শোষণ করিয়া লইতে হয়। পিপেট্‌টী পূর্ব্ব হইতেই তুন্দুলের মধ্যে থাকিয়া অণু-বিচ্যুত (sterilized) হইয়া থাকা আবশ্যক। পিপেট্, বোতল, প্রভৃতি সরঞ্জাম কিরূপে অণু-বিচ্যুত করিতে হয়, ইহা পরে বর্ণনা করা যাইবে। পিপেট্ বা শোণিত শোষণের জন্য কাচের নলটীর সূক্ষ্ম অন্ত বদ্ধ এবং অপর অন্ত অণু-বিচ্যুত তুলা দ্বারা আট্‌কান থাকে। রক্ত শোষণ করিবার পূর্ব্বেই সূক্ষ্ম অন্তের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশের উপরিভাগ দ্রুত হস্তচালন দ্বারা অগ্নিশিখায় অণু-বিচ্যুত করিয়া লইতে হয়। পূর্ব্বে যে তুন্দুলের মধ্যে রাখিয়া অণু-বিচ্যুতির কথা বলা হইয়াছে, উহা পিপেটের অভ্যন্তরের অণু-বিচ্যুতি। একবার অণু-বিচ্যুত হইবার পরে পিপেটের একটী অন্ত এককালীন বদ্ধ এবং অপর অন্ত তুলা দ্বারা আট্‌কান থাকায়, পিপেটের অভ্যন্তরে অণু প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তুন্দুলের বাহিরে থাকিয়া পিপেট্‌টী শীতল হইয়া গেলেই, উহার উপরিভাগে বায়ু সংযোগে পুনরায় নানাবিধ অণু সংলগ্ন থাকা সম্ভব। এই সকল অণু পাছে শোষিত রক্তের সহিত আসিয়া পড়ে, একারণ হৃদয় মধ্যে পিপেট্‌টী বিদ্ধ করার পূর্ব্বক্ষণেই একবার উহার সূক্ষ্ম অন্তভাগটী তাতাইয়া লইতে হয়। পিপেট্-নলের যে অন্তভাগে তুলা থাকে, ঐ ভাগে মুখ দিয়া পিপেটের মধ্যে রক্ত শুষিয়া লইতে হয়। রক্ত যেন তুলার অনেক নিম্নে থাকে, অর্থাৎ তুলা যেন না স্পর্শ করে, ইহা দেখা আবশ্যক। গো-বসন্তে সদ্যঃমৃত জন্তুর রক্ত এইরূপে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, উহা মাংসের কাথে 'রোপণ' করিয়া গো-বসন্তের অণু জন্মাইয়া বাড়াইয়া লইতে হয়। মাংসের কাথ কিরূপে প্রস্তুত করিয়া কাচের ভাণ্ডে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হয়, কিরূপেই বা এই কাথ ব্যবহার করিবার সময় ছোট ছোট বোতল (flacon) মধ্যে ঢালিতে হয়, কিরূপে বোতলস্থিত কাথের মধ্যে কোন জাতীয় অণু আসিয়া

পড়িয়াছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্য কয়েক দিবস অপেক্ষা করিতে হয় এবং শেষে কিরূপে এই অণু-বিরহিত ক্বাথের মধ্যে পিপেটস্থিত শোণিত পাতিত করিতে হয়, এ সকল বিষয় পরে বর্ণনা করা যাইবে। পিপেট্ হইতে ক্বাতে গো-বসন্তের 'বীজ বপন' অতি সামান্য বিষয় মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু অতি সাবধানে পূর্ব্ব হইতে সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিতে না পারিলে 'বীজ বপন' প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে, অর্থাৎ গো-বসন্তের বীজ বোতলের ক্বাথে না জন্মিয়া অন্য কোন প্রকার অণু জন্মিয়া যাইতে প্রায়ই দেখা যায়। এমন কি,গৃহ মধ্যে যদি ধূলা অধিক থাকে, অথবা গৃহাভিমুখে যদি অবারিত দ্বার দিয়া বেগে বায়ু প্রবেশ করিতে থাকে, তাহা হইলে পরীক্ষিত (proved) অণুবিচ্যুত ক্বাথের মধ্যে তুলার ছিপি খুলিয়া গো-বসন্তের বীজ পাতিত করিয়াও পরে দেখা যাইবে, কোথা হইতে নানাবিধ অণু ক্বাথের মধ্যে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কত সাবধানে যে এই সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যাহা হউক,এখন ধরিয়া লওয়া যাউক,পিপে-টের বীজ বোতলের ক্বাথের মধ্যে পাতিত করা হইয়াছে। বোতলটীকে এখন ২০ ঘণ্টা কাল ৪২° সাণ্টিগ্রাদ উত্তাপে রাখিতে হইবে। দিবা রাত্র ঠিক একই উত্তাপে রাখিবার জন্য দুইটী কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী আর্সোন্‌ভাল্ সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত, অপরটী পাস্তার্ সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত। এই দুইটী আবিষ্কার সম্বন্ধে পরে প্রসঙ্গ করা যাইবে। এখন স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, ২০ ঘণ্টাকাল ঠিক ৪২° উত্তাপে ক্বাথের মধ্যে গো-বসন্তের বীজ থাকিয়া ক্বাথের মধ্যে অনেক কৈশিকাণু জন্মিয়া গিয়াছে। পরে এই ক্বাথ কতকগুলি অণু-বিচ্যুত কাচের নলের মধ্যে শোষণ করিয়া লইতে হয়। নলগুলির সূক্ষ্মাগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া, অগ্নি-শিখায় এই ভাগটী চালিত করিয়া পূর্ব্ববৎ তুলা-বিশিষ্ট অগ্রভাগে মুখ লাগাইয়া নলগুলির মধ্যে গো-বসন্তের কৈশিকাণু-বিশিষ্ট ক্বাথ ক্রমশঃ শোষণ করিয়া লইতে হয়। নলের মধ্যে তুলা হইতে অনেক নিম্নে ক্বাথ থাকা আবশ্যক। বুন্সেস্ অগ্নিশিখায় ধরিয়া সূক্ষ্মা-গ্রভাগটী পুনরায় গলাইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তুলাবিশিষ্ট স্থূলাগ্রভাগটীও ঐ অগ্নি শিখায় ধরিয়া গলাইয়া বন্ধ করিয়া লইতে হয়। নলটী তুলা হইতে অনেক নিম্নে গলা-ইয়া বন্ধ করিতে হয়, নতুবা তুলা জ্বলিয়া উঠিয়া নল বা পিপেট্‌কে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। কাচের নল বা পিপেটের মধ্যে যে রস আবদ্ধ করা হইল,উহা তীব্র বা মারাত্মক্ (virulent) রস। এই রসের হ্রস্বতা সম্পাদন করিতে হইলে রস সহ বদ্ধ পিপেট্‌গুলিকে একটী আধারে (rack) সাজাইয়া বসাইয়া লইয়া, আধারটী তিন ঘণ্টাকাল ৪৮° সাণ্টি-গ্রাদ্ উত্তাপ বিশিষ্ট জলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখিতে হয়। আর্সোন্‌ভাল্ ও পাস্তার্ আবি-ষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা জল তিন ঘণ্টা ঠিক ৪৮° উত্তাপে রাখিয়া দিবার উপায় অনায়াসেই করা যাইতে পারে। পিপেট বা নলস্থিত রস এই প্রক্রিয়া দ্বারা এতাদৃশ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় যে, উহা টিকা দিবার জন্য ব্যবহার করিলে গো-বসন্তরোগ উপস্থিত না হইয়া গো-বসন্ত হইতে জন্তুগণকে ভবিষ্যতে রক্ষা করে। শোভো আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে টিকারস প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই,

ইহা দ্বারা প্রস্তুত টিকারস টাট্‌কাটাট্‌কি ব্যবহার করিয়া লইতে হয়। পাস্তার্ আবিষ্কৃত উপায় দ্বারা প্রস্তুত টিকারস ৫।৭ দিবস পরে ব্যবহার করিলেও ফলদায়ক হয়। ইহার আর একটী দোষ এই, ইহা সহাইয়া সহাইয়া ব্যবহার করা চলে না। পাস্তারের প্রথম টিকারস অতি ক্ষীণ, দ্বিতীয় টিকারস তদপেক্ষা তীব্র। শোভোর টিকারসের মাত্রার তীব্রতা একই। শোভো আবিষ্কৃত উপায় অপেক্ষা পাস্তার আবিষ্কৃত উপায় আর এক কারণে শ্রেষ্ঠ। পাস্তারের টিকারসের বীজাণু কাচের নলের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় অনেক কাল ধরিয়া জীবিত থাকে। এই বীজাণু অনায়াসে এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাওয়া যায় এবং মাংসের ক্বাথে বপন করিয়া যখন ইচ্ছা এবং যত পরিমাণ ইচ্ছা, টিকারস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। পাস্তারের টিকারস প্রস্তুতের ব্যবসায় যেরূপ চলিতে পারে, শোভোর টিকারস প্রস্তুতের সেরূপ ব্যবসায় চলিতে পারে না। অথবা যদিও চলে, সে নিতান্ত 'কাঁচা' ব্যবসায়।

গো-বসন্তের টিকারস প্রস্তুতের দ্বিতীয় উপায়টী লিঁয়ো নগরের পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আর্লোয়াঁ সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত। এই উপয়টী অবলম্বন করিতে গেলেও প্রথমে গো-বসন্তরোগ সদ্যঃমৃত জন্তুর রক্ত, পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে সংগ্রহ করিয়া, উহা পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে পরীক্ষিত মাংসের ক্বাথে বপন করিয়া কৈশিকাণু বাড়াইয়া লইতে হয়। পরে কৈশিকাণু-সঙ্কুল মাংসের ক্বাথ পূর্ণ বোতলটী একটী লৌহের আবরণ বা আধারের মধ্যে রাখিয়া, আধারটী একটী বায়ুবল-প্রবেশ-যন্ত্রের (force-pump) সহিত স্ক্রু করিয়া সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। পরে কোন একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একটী রবারের ব্যাগের মধ্যে বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ু প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ব্যাগটার স্ক্রু-যুক্ত মুখ বল-প্রবেশ-যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। পরে যন্ত্রের হাতল চালন দ্বারা ব্যাগের মধ্যস্থিত অম্লজান বায়ু পূর্ব্বোক্ত লৌহাধারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। লৌহাধারে সংলগ্ন একটী মানোমিটার্ যন্ত্র থাকে। ঐ যন্ত্রের গায়ে ১,২,৩ ইত্যাদি যে অঙ্ক নিপাত থাকে, তাহার অর্থ একগুণ বায়ু-চাপ, দুইগুণ বায়ু-চাপ (atmospheric pressure) ইত্যাদি। মানোমিটার্ যন্ত্র দ্বারা যখন বুঝা যাইবে, আধারের মধ্যে ২ কিম্বা ২॥০ গুণ বায়ু-চাপ হইয়াছে, তখন অম্লজান বায়ু প্রবেশ-কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে এবং এই ২।২॥০ গুণ চাপ্ বায়ু (compressed oxygen) আধারের মধ্যে স্থিরভাবে রাখিবার জন্য আধারের মুখের কাছে যে একটী স্ক্রু থাকে, উহা আঁটিয়া দিতে হয়। এইরূপ আবদ্ধ চাপ্-বায়ুর সহিত আধার ও আধারের মধ্যগত গো-বসন্তের কৈশিকাণু-সঙ্কুল ক্বাথ-পাত্র (যাহার মুখ পূর্ব্ব হইতেই কেবল তুলাদ্বারা আট্‌কান) ১৪ হইতে ২০ দিবস পর্য্যন্ত দিবা-রাত্রি ৩৬° সাণ্টিগ্রাদ্ উত্তাপে রাখিতে হয়। পাস্তারাবিষ্কৃত এতুভ্ (Etuve Pasteur) ব্যবহার দ্বারা দিবারাত্রি ৩৬° উত্তাপে আধারটী রাখিয়া দেওয়া শীতকালে অতি সহজ। গ্রীষ্মকালে এদেশে কখন কখন স্বভাবতঃই ৩৬° অধিক উত্তাপ হইয়া দাঁড়ায়; এমন স্থলে পাস্তারের এতুভ-যন্ত্র ব্যবহার দ্বারাও ১৫।১৬ দিবস ক্রমাগত ৩৬° উত্তাপ লাভ করা যায় না। কিন্তু শীতকালে বঙ্গদেশে, এবং সকল ঋতুতেই শীতপ্রধান দেশে এতুভ্ যন্ত্রের সাহায্যে, অনায়াসেই ১৫।১৬ দিবস

ধরিয়া যন্ত্রের মধ্যে দিবারাত্রি সমভাবে ৩৬° উত্তাপ রক্ষা করিতে পারা যায়। চাপ্ অম্লজান বায়ুর সহযোগে ১৫।১৬ দিবস কাল অণুগুলি ৩৬° উত্তাপে থাকিয়া উপযুক্ত পরিমাণে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। এখন এই হ্রস্ব-অণুর (attenuated virus) পরিমাণ মাত্র বাড়াইয়া লওয়া আবশ্যক। পরীক্ষিত, অণুবিচ্যুত ক্কাথের মধ্যে এই হ্রস্ব-অণু বপন করিয়া পূর্ব্বকথিত উপায়ে যত ইচ্ছা টিকারস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। লৌহাধারের মধ্য হইতে হ্রস্ব-অণু-সঙ্কুল ক্কাথের বোতল বাহির করিয়া অনেক পরিমাণ ক্কাথে এবং অনেক গুলি বোতলে বপন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে টিকারস প্রস্তুত করিতে হয়। বোতলগুলির মধ্যে ক্কাথ প্রথমে নির্ম্মল অবস্থাতেই থাকে। অণু বপনের পরে ক্রমশঃ ক্কাথ ঘোলা হইতে থাকে। ক্কাথ ঘোলা হইলেই বুঝা যাইবে, কৈশিকাণু ক্কাথের মধ্যে জন্মিয়াছে। তখন ক্কাথ টিকা-রসের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেষ ও মেষের আকারের অন্য জন্তুকে গো-বসন্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এই টিকা-রসের দুই ফোঁটা মাত্র জন্তুটীর শরীরাভ্যন্তরে (অর্থাৎ রক্তের সহিত) পিচকারি দ্বার চালাইয়া দিতে হয়। গো এবং গো সদৃশ আকারের অন্যান্য জন্তুর শরীরাভ্যন্তরে চারি ফোঁটা টিকারস ব্যবহারের নিয়ম।

আর্লোয়া আবিষ্কৃত নিয়মে গো-বসন্তের টিকারস্ প্রস্তুত করাতেও 'পাকা' ব্যবসায় চলিতে পারে, কেননা, ১৫।১৬ দিবস চাপ্ অম্লজান বায়ুর মধ্যে থাকিয়া কৈশিকাণু বীজাণুতে পরিণত হয়। বীজাণুর অবস্থায় বদ্ধ বোতল বা নলে করিয়া অনেক কাল ধরিয়া বিকার বীজ রক্ষা করা এবং একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আর্লোয়ার টিকা-রসের তীব্রতার মাত্রা একই বলিয়া ইহার ব্যবহারে অনিষ্ট পাতের অধিক সম্ভাবনা।

পাস্তার্ আবিষ্কৃত টিকারস প্রস্তুতের প্রক্রিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া, এই প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বিদেশী বাঙ্গালী।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় তাঁহার নবযৌবন বয়সের রচিত "অবসর-সরোজিনীর" কোনও স্থলে লিখিয়াছেন—

"রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি।
অতি উচ্চ রবে, যারে তারে ক'বে,
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি॥"

আর এক জন কবি, সিংহল দ্বীপে বঙ্গাধিপতি-কুমার বিজয় সিংহ কর্তৃক সিংহল-বিজয়োপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"বাজা ঢাক, বাজা ডঙ্কা॥
(মনে নাহি কর শঙ্কা),
অদূরে ভাসিছে লঙ্কা,
বাঙ্গালী জাতির বীরত্ব নিশান॥"

একজন বটতলা-ব্যবসায়ী নাটককার বলিতেছেন—

"যেখানে সেখানে যাই।
বাঙ্গালী দেখিতে পাই ॥
তবে কি ভয়, কি ভয়।
বল বাঙ্গালীর জয় ॥"

এই সকল কবি-উক্তির মধ্যে কোন্‌টী সত্য, তাহার নিরাকরণের আবশ্যক নাই। সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বাঙ্গালী যে অধিক পরিমাণে অধমত্বের কূপে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা প্রকারের শিক্ষা ও নানা প্রকারের সভ্যজনোচিত চিন্তা, এখন এ দেশকে অভিপ্লুত করিয়া সমাজকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি গিরির অত্যুন্নত সোপানাভিমুখে অগ্রসর করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু মহারাণী শ্রীমতী ভিক্‌টোরীয়ার হস্তে ভারতীয় শাসনভার অর্পিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজের যে বল, যে স্পৃহা, যে স্থির প্রতিজ্ঞা, যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এবং যে উৎসাহ ও সাহস ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির এমন দুরাবস্থা ছিল না।

বর্ত্তমান কালের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্থাপক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক একবর্ষ কাল পূর্ব্বে, তাঁহার কোনও অকৃত্রিম বন্ধুকে, বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ ভরসা সম্বন্ধে, কথোপকথন ছলে বলিয়াছিলেন, "আমি আমার জীবনে বহুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা, শিক্ষক, প্রচারক, লেখক এবং পরামর্শদাতার কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু আমার জীবনের প্রথমাবস্থায় যেমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী দেখিয়াছি, এখন আর তেমনটি প্রায়ই দেখিতে পাই না। অতি পূর্ব্ব কালের বাঙ্গালী-গুণপণা বুঝি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে।" আমরা মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন মহোদয়ের এই অভিমতি সারগর্ভ বলিয়া বিবেচনা করি। এদেশে যখন রেল ছিল না, যখন তার বা ডাকঘরের সৃষ্টি হয় নাই, যখন সংবাদ-পত্রের গন্ধ পর্য্যন্ত লোকের নাসিকায় পৌছে নাই, সেই সময়ে বঙ্গদেশের এক এক জন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বঙ্গ দেশান্তরে আপনার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও গুণপনা বলে, কিরূপ কীর্ত্তি স্থাপন ও যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন, অনেকে তাহার বিন্দুমাত্রও সংবাদ রাখেন না।

অতি সামান্যাবস্থা হইতে উন্নত হইয়া, গভীর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, অসীমক্লেশ ও বিপদের মধ্যে কেবল সততার সহায় লইয়া, বিদেশে কত শত বাঙ্গালী কত শত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, অদ্যকার প্রস্তাবের শীর্ষদেশোক্ত মহাপুরুষের জীবনচরিত তাহার অন্যতম অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "বিদেশী বাঙ্গালী" প্রবন্ধে ন্যূণাধিক বিংশতি জন মহাত্মার অত্যাশ্চর্য্য জীবনী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে; বলা বাহুল্য, এই চরিতমালা সংগ্রহে বঙ্গ সমাজের ভবিষ্যৎ ভরসার বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে। অদ্যকার প্রস্তাবে বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতের মুসলমান সম্রাটকুলতিলক আকবর বাদসাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি বাস করিতেন। কবি ভারত চন্দ্র ইঁহার বল বিক্রম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"যশোর নগর ধাম,
প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাদসায়,
কেহ নাহি আঁটে তায়,
চল্লিশ লস্কর ব্যারস্থ ॥"

বঙ্গজ কায়স্থকুলোদ্ভব যশোহরাধিপতি, প্রতাপাদিত্য, ক্রমে বল ও বিক্রমে এতাদৃশ উন্নত হইয়া উঠিলেন যে, দিল্লীশ্বর বাদসাহের "খিরাজ" (খাজানা অথবা কর) পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে, কুণ্ঠিত হইলেন না। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বাদসাহ আকবর দেখিলেন, এই বঙ্গজ কায়স্থ সহজে দমিত হইবার নহে। যাঁহার নামে বাঘে ও ছাগে এক ঘাটে জল খায়, সেই দিল্লীশ্বর বাদসাহকেও যখন কর দিল না, তখন প্রতাপাদিত্য নিশ্চয়ই সামান্য শত্রু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

মহাবলী মানসিংহ এই সময়ে মুসলমান সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন। কাবুল জয় করিয়া সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন, একমাস কালও বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই, এমন সময়ে আকবর তাঁহাকে বঙ্গবিজয় ও প্রতাপাদিত্যের শাসন জন্য বঙ্গ দেশে পাঠাইলেন। যথাকালে বঙ্গে প্রতাপে ও মানসিংহে মহাসমর বাধিয়া উঠিল; মানসিংহের সৈন্য হারি মানিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেনাপতি মানসিংহ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে সম্বাদ দিল, "মহাশয়! প্রতাপের মৃণ্ময় দুর্গে যশোরেশ্বরী নাম্নী এক দেবী আছেন, ঐ দেবীমূর্ত্তি প্রতাপের সৈন্যের সহিত যুদ্ধকালে স্বয়ং যোগ দিয়া বৈরীকুল দমন করেন। এই দেবীকে যদি দুর্গ হইতে স্থানান্তরিতা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রতাপসৈন্য ভয়াতুর হইয়া পলাইবে।" মানসিংহ দেখিলেন, কেবল প্রতাপের সৈন্য নহে, তাঁহার নিজের হিন্দু সৈনিকদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস যে, প্রতাপের পক্ষে এই দেবী যতদিন সহায় স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আকবর বাদসাহের পক্ষে কোনও প্রকারেই জয় লাভের ভরসা নাই। যাহা হউক, অনেক কষ্টে ও কৌশলে, যশোরেশ্বরী মূর্ত্তিটিকে দুর্গ হইতে স্থানান্তরিতা করিয়া মানসিংহ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এই যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল এবং প্রতাপের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া গেল।

মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাগমনকালে, যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি এবং (স্ত্রীপুরুষে) প্রায় তিনশত বাঙ্গালী বন্দী সঙ্গে লইয়া ছিলেন। যথা সময়ে বাদসাহ সমীপে মানসিংহ উপস্থিত হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিটি ও বন্দীগণকে বাদসাহ সমীপে "নজর" দিলেন। সম্রাটের অনুজ্ঞায় বঙ্গবাসী কয়েদীগণ যথারীতি বন্দীগৃহে আবদ্ধ হইল এবং মূর্ত্তিটি যমুনাজীবনে নিক্ষিপ্তা হইবার জন্য আদিষ্টা হইল। কিন্তু মানসিংহ হিন্দু ছিলেন, সুতরাং যশোরেশ্বরী মূর্ত্তিকে জলগর্ভে নিক্ষেপ না করিয়া সম্রাটের নিকটে ভিক্ষা স্বরূপে প্রার্থনা করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বঙ্গীয় বন্দীর মধ্যে বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য অন্যতম।

দিল্লী দরবারে প্রতাপ নাটকাভিনয় শেষ হইলে, মানসিংহ বাঙ্গালী কয়েদীবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া এবং যশোরেশ্বরী মূর্ত্তিকে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহিতা করিয়া, কিছু কালের অবসরোপলক্ষে স্বদেশে (জন্মভূমিতে) গমন করিলেন। "মানসিংহের স্বদেশ" বলিলে কি বুঝায়, তাহা এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। মানসিংহ সামান্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। দায়ুদ বংশে যেমন মহামতি খ্রীষ্ট, যদুবংশে যেমন জগদ্বিখ্যাত কৃষ্ণ, অথবা প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্যাসুর বংশে যেমন ভক্তাধিক প্রহ্লাদ, রাজা মানসিংহ তেমনি বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয় বংশের

অন্যতম শাখা "ঠাকুর" কুল হইতে, রাজ পরিবারে, ধনাঢ্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রাজপুতানান্তর্গত আরাবল্লী পর্ব্বতের অন্যতম শাখার এক শিখরে অম্বর (অথবা আঁবের) নামে এক প্রকাণ্ড দুর্গ ও মহানগর স্থাপনা করেন। বর্ত্তমান জয়পুর হইতে ইহা তিনক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। এই স্থানেই মানসিংহ জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লী হইতে এই স্থানেই অবকাশ কাল কাটাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ তখন জীবিত ছিলেন না, পিতা জয়চাঁদ সিংহ বৃদ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজা জয় চাঁদ, আপনার দুর্গে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী দেবী মূর্ত্তিকে স্থাপনা করেন। ঐ মূর্ত্তি আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান; ঐ দেবী রাজপুতানায় অন্যনামে প্রসিদ্ধা; অন্য নাম "সল্লা দেবী"। পারস্য, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় "সল্লা" শব্দের অর্থ 'পরামর্শ'। কথিত আছে, রাজারা সকল বিষয়েই দেবীর অনুজ্ঞা ও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন, এবং দেবীর নিকট হইতে যে "হুকুম" পাইতেন, তাহা প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হইত, এই জন্য যশোরেশ্বরী মূর্ত্তি কালপ্রভাবে সল্লা দেবী নামে আখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজা জয়চাঁদ, বাঙ্গালী বন্দীদিগকে শান্তিতে ও অভয়ে নগরবাসী রূপে রক্ষা করেন এবং বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেবীর পৌরহিত্যে নিযুক্ত করেন। ঐ মন্দির রাজবাটীর অন্তর্ভুক্ত সীমানার মধ্যে স্থাপিত ছিল, সুতরাং দিনে দিনে সাধু বিদ্যাধর রাজপ্রসাদে ও রাজপ্রাসাদে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন।

অম্বর নগরের প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে সঙ্গানীর নামে এক প্রাচীন নগর আছে। রাজারা প্রায়ই বৎসরে দুই তিন বার এই নগরে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। ঐ সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন নগর, অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় এখনও রেলওয়ে ষ্টেসনের প্রায় ৩ মাইল দূরে বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজাদের সহিত এই নগরে সময়ে সময়ে গমনাগমন করিতেন। এই নগরের শোভা সমৃদ্ধি ইত্যাদি দেখিয়া মহারাজা জয়চাঁদ সিংহ (অথ বা জয়সিংহ) বিদ্যাধরকে বলিয়াছিলেন, "আমি এই মহানগরটীকে ইন্দ্র ভবন তুল্য বলিয়া বিবেচনা করি।" বিদ্যাধর বলিলেন, "যদি হুজুরের অনুজ্ঞা ও অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার রাজধানীর জন্য এমন এক সুন্দর নগর প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, যাহা প্রকৃতই ইন্দ্রভবন অপেক্ষা অধিকতর শোভাময় বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে।" রাজা জয়সিংহ সম্মত হইলেন, যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সংগৃহীত হইল, এবং সেকালের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনিয়ার মহামতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা জয়চাঁদ সিংহের নামে এক অপূর্ব্ব নগর প্রস্তুত করিলেন; বঙ্গদেশের সেই বিশ্বকর্ম্মা-বিদ্যাধরের অপূর্ব্ব নগর "জয়পুর" নামে বিখ্যাত হইল। সমগ্র রাজপুতানার ইহা এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। বর্ত্তমান জয়পুরের শোভাময়ী অট্টালিকাদি অবশ্য বিদ্যাধরের কৃত নহে, ইহা মহারাজা রামসিংহের (অর্থাৎ জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজার পিতা মহাশয়ের) কীর্ত্তি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্থাপিত ও বিরচিত জয়পুর সম্বন্ধে, পৃথিবী ভ্রমণকারী ইউরোপীয় ভৌগলিকেরা লিখিয়াছেন "কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতের অন্যান্য দেশেও এমন মনোহর নগরের সংখ্যা অধিক নাই।" জয়পুর নগরের প্রধান রাজবর্ত্ম (Main

road), যাহা জহুরী বাজারের পার্শ্বদিয়া সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত ভাবে চলিয়াছে, আজিও "বিদ্যাধর কা রাস্তা" নামে সমগ্র রাজপুতনায় প্রসিদ্ধ। বীরপ্রসূতি রাজপুত ভূমিতে, দুর্ব্বল বাঙ্গালার লোক (বিদ্যাধর) এখনও মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত; বিদ্যাধরের সাধুতা, পাণ্ডিত্য,অমায়িকতা, দক্ষতা, কৌশল, বীরত্ব, রাজনীতি জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞতা এখনও সমগ্র জয়পুরে বাঙ্গালীর নামকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া যখন তিনি কিছু কাল সঙ্গানীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে খেৎড়ী, শিকড় এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নরপতি দিল্লীশ্বর বাদসাহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং অবশেষে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন যে, যবন সেনাকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হয়। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, জয়পুরের মহারাজাকে পরামর্শ দিয়া, ঐ স্বাধীন রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হইয়া সমরসাজে গমন করেন। বলা বাহুল্য, রাজগণ দমিত হইলেন, বাদসাহ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই অবধি এ পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি মহারাজা জয়পুরের অধিকার ভুক্ত হইয়া আছে। শুনা যায়,ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধকরা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয় বটে,কিন্তু অত্যাচারী নৃশংস রাজার দমন করা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই শোভা পায়"। এখন দেখিলে কি,সুদূর রাজপুতানায় দুর্ব্বল বাঙ্গালী কেমন অসাধারণ সাহসে ও কৌশলে, এক আশ্চর্য্য রাজনৈতিক শক্তির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন? কেমন আশ্চর্য্য চরিত্র বলে, বন্দীর অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া অত্যুচ্চ সেনাপতির পদে বরিত হইয়াছেন? কেবল তাহাই কি, তিনি গোপনে গোপনে রাজপুতানায় যে অদ্ভুত বাঙ্গালী-শক্তির (Bengalee Power) বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ বীজ হইতে যে মহাদ্রুম উৎপন্ন হইয়াছে, অনেক বাঙ্গালী বাবু বোধ হয় তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রস্তাবান্তরে, রূপসনাতন গোস্বামীর কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিবার সময়ে একথার আমরা পূর্ণ প্রসঙ্গ করিব।

যে সময়ে বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে ভারতে সতীদাহ প্রথা বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত ছিল। রাজপুতানায় কোন স্ত্রীলোক "সতী" হইলে, তাহার পিতৃ ও মাতৃ কুলজগণ পর্য্যন্ত পবিত্র হইতেও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বিদ্যাধর স্বচক্ষে অনেক সতীদাহ দেখিয়াছিলেন। নিজে মন্দিরের পুরোহিত, হিন্দু সমাজের অন্যতম নেতা, "সাধু" এবং গোড়া রাজার ও গোড়া হিন্দু প্রজার প্রিয় পাত্র হইয়াও তিনি এই প্রথা অশাস্ত্রীয় এবং অমানুষিক বলিয়া প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক অথবা রাজা রামমোহন রায়ের পিতামহদিগেরও জন্ম হয় নাই। যাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে ছিল, রাজা রামমোহন রায় রাজকীয় সহায় পাইয়া তাহার পূরণ করেন।

অম্বরের ও সঙ্গানীরের প্রবৃদ্ধ পুরুষদিগের মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাধর প্রায়ই একপ্রকার অবধূত ভাবে জীবন যাপন করিতেন। ফল মূলের ও দুগ্ধের উপরই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ নির্ভর করিত। একথাও শুনা যায়,

তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গুহাশ্রম করিয়া তীব্রতপে নিযুক্ত হয়েন।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য সঙ্গানীরে প্রাণত্যাগ করেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহার সমাধিস্থল নিরাকরণ করিতে পারি-নাই। বিদ্যাধর দেখিতেও সবল, সুস্থ ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্য ও সততার জন্য লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত; মন্দিরের পুরোহিত বলিয়া ভক্তি করিত; রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া মান্য করিত এবং অবধূত বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত এবং তিনি নিকটে আসিলে লোকে সতর্ক হইয়া পার্শ্বে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইত। (১)। বিদ্যাধর দেবীভক্ত (শাক্ত)ছিলেন এবং মৎস্য মাংস আহার করিতেন। অতিবৃদ্ধ অবস্থায় তিনি নিরামিষাহারী হইয়া উঠেন। তিনি শাক্ত ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব বা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট তাঁহার আদর কম ছিল না। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য কেহ হইয়াছিল কিনা আমরা ঠিক জানিনা, কিন্তু তাঁহার যে বহুসংখ্যক ভক্ত ও সেবক ছিল, তাহার সুপ্রমাণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার সল্লাদেবী এখনও বর্ত্তমান; রাজপুতানার মহারাজারা এখনও মাথায় মুকুট, পায়ের জুতা খুলিয়া, সভয়ে দেবীমন্দীরে উপস্থিত হয়। লোকে বলে,বিদ্যাধরের আত্মা এখনও এই মন্দিরে বিরাজ করিতেছে।

বিদ্যাধরের সঙ্গে আরও যে সকল কয়েদী আসিয়াছিল, তাঁহারাও নগরবাসী হইয়া পড়ে। জয়পুরে প্রায় ২০০ শত বৎসরের বাঙ্গালী পরিবার এখনও দেখা যায়। কোনও কোনও বংশের বাঙ্গালীরা ঠিক মাড়োয়ারী হইয়া পড়িয়াছে,ইহাঁরা বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না। অনেকে অনুমান করেন, মানসিংহের সমসাময়িক বাঙ্গালী বন্দীগণ ইহাদেরই আদিপুরুষ। বিদ্যাধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মগদিতে ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী একটি বাঙ্গালী যুবককে শিষ্যরূপে তিনি উপবিষ্ট করাইয়া যান। ইঁহারাই বংশপরম্পরায় (আজি পর্য্যন্ত) সল্লা দেবীর পৌরহিত্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। রাজকীয় সাহায্যে এই মন্দিরের ব্যয় চলে, কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে কোনও মতেই বাঙ্গালীর হস্ত হইতে মন্দিরের অধ্যক্ষতা কিম্বা পৌরহিত্য স্বতন্ত্র করিতে পারেন না। গত বৎসরে যিনি সল্লাদেবীর পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহাদের আদিপুরুষেরা বাঙ্গালা দেশের চব্বিশ পরগণা জেলা হইতে আসিয়াছিল।

রাজপুতানায় রূপসনাতন গোস্বামীর কীর্ত্তি-কলাপ প্রবন্ধে বিদ্যাধর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী।

(১) ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকের এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা দেশের লোকেরা মন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ ইহারা "যাদু" বা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গালী সাধু দেখিলে এখনও লোকে ভয় খায়; লোকেরা বলে, বাঙ্গালা দেশের মন্ত্রসিদ্ধ লোকেরা মানুষকে পশু করিতে পারে এবং মন্ত্রদ্বারায় লোকের ইষ্টানিষ্ট সম্পাদন করিতে সমর্থ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৬২। কবিতা-কোরক।—শ্রীমোক্ষদাচরণ সেন প্রণীত। মূল্য ৵১০ আনা। বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত। দুই একটী গল্পের রচনা বেশ কোমল হইয়াছে। গ্রন্থকার আর একটু সতর্ক হইয়া লিখিলে 'পদ্যমালা' 'বাল্যসখার' ন্যায় পাঠ্যোপযোগী হইত।

৬৩। অবলাচরিত।—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য।০ আনা। কয়েকটী ইয়ুরোপীয় বিদুষী ও গুণবতী রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। এ পুস্তক বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। স্কুল পাঠ্য না হইলেও ইহা পড়া উচিত। ইহাতে বালক বালিকাগণের শিখিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে।

৬৪। সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ(সচিত্র) শ্রীমন্মথ নাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য।৵০ আনা। কয়েক জন বড় বড় লোকের জীবনী সংক্ষেপে,সরল ও মার্জ্জিত ভাষায় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারতের গৌরব মহাপুরুষদিগের জীবনী। স্বদেশীয় বড় বড় লোকের ইতিহাস পাঠ করিলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক হৃদয়ে উচ্চাভিলাষের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়। এ পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইলে আমরা পরম সুখী হইব। ইহা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর এবং মধ্য ইংরাজী ও বঙ্গ বিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণীর উপযোগী হইয়াছে।

৬৫। ভূগোল শিক্ষা।—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য।৵০ আনা। এ পুস্তক পড়িয়া বালক বালিকাদিগের ভূগোলবিষয়ক মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে। বিষয়ের শৃঙ্খলা সুন্দর। ইহা মাইনর ও মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

৬৬। নারীপূজা (ধর্ম্ম-রহস্য)।—এইচ্ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। মধ্যে মধ্যে ভাল কথা আছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নাই। অনেক স্থলে লেখকের আবেগের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

৬৭। বিরাগ সঙ্গীত।—শ্রীবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় লেখক বিষাদ ও বিরাগ-গীতি গাইয়াছেন। রচনা আশাজনক। অনেক স্থানে কবিত্ব আছে। প্রতি কবিতার শীর্ষে দুই একটী ইংরাজী "কোটেশন" আছে। উদ্ধৃতাংশের মাত্রা বাড়াইলে কবিতার সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে

৬৮। রাজলক্ষ্মী-অদর্শন।—এইচ্ দে এবং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্নী বিয়োগে গ্রন্থকারের গদ্য-বিলাপ। ভাব অসম্বদ্ধ ও বিশৃঙ্খল। ভাষা ও রচনা সাধারণের তৃপ্তিকর হইবে না। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "আমি পাগল বলিয়া সাধারণে জানিবে, সেই আশায় এই পুস্তকখানি প্রচার করিলাম * * যদি আমার মত কোন উন্মাদ উদাসীন এই ভারতে থাকেন, তিনিই এই পুস্তক পাঠ করিবেন। নতুবা আবশ্যক নাই।"

৬৯। সত্যনারায়ণ-কথা।—শ্রীরসিক লাল ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহা হিন্দুমতে সত্যনারায়ণের পুঁথি। মুসলমানী ও হিন্দুয়ানীতে মিশাইয়া 'সত্যপীরের পাঁচালী' নহে। রচনা ভাল, ভাষা সরল, স্বাভাবিক ও মনোহর। পূর্ব্ববঙ্গে সত্যনারায়ণের যে কথা প্রচলিত আছে, এ অবিকল তাহাই।

৭০। গয়ামাহাত্ম্যম্—(মূল ও বঙ্গানুবাদ) শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৷৷০ আনা। হিন্দুতীর্থ গয়াক্ষেত্রের কল্পিত পৌরাণিক ইতিহাস এবং হিন্দুজীবনে গয়ার আধিপত্য কতদূর, তাহা সুন্দর ও সরল সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুর পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ। সাধারণেও গয়া সম্বন্ধে হিন্দু-

কল্পনা জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। বঙ্গানুবাদ অনেকটা যথাযথ হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল নহে।

৭১। গয়ায় পিণ্ডদান পদ্ধতি।—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মূল্য।০ আনা। গয়াযাত্রীর অবশ্যজ্ঞাতব্য শ্রাদ্ধ তর্পণের নিয়ম মন্ত্রাদি সম্বন্ধে মোটামুটি উপদেশ আছে। গয়ালী পুরোহিতের পক্ষে ইহা মূল্যবান্ গ্রন্থ। পিতৃষোড়শী ও মাতৃষোড়শীর সংস্কৃত শ্লোকগুলি সরল ও মনোরম।

৭২। ন্যায়দর্শন।—(২য় খণ্ড) মহর্ষি গৌতম প্রণীত, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী দ্বারা প্রকাশিত। ইহা বিখ্যাত ষড়দর্শনের অন্যতম। সংস্কৃত টীকা পাণ্ডিত্য পূর্ণ। বাঙ্গালা ব্যাখ্যা অতি বিশদ ও সরল হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক উহার সাহায্যে গৌতমদর্শনের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন রত্ন হইবে। প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

৭৩। সাধক সহচর।—(প্রথম ভাগ) শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ১৲ টাকা। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু প্রেমিকদিগের উক্তি সংগ্রহ করিয়া, এ পুস্তকখানিকে সাধুদিগের রুচিকর করিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আনুপূর্ব্বিক মনোযোগ সহ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভগবান্ ও অবতারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য ইহার ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লেখক একজন রামকৃষ্ণ-পথে পুনরুত্থানকারী। তিনি বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গ অবতারে ঠাকুর আমার স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই। রামকৃষ্ণ অবতারে ঠাকুর আমার প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাতৃরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।" অযথা অন্য ধর্ম্মের বিদ্বেষ ও নিন্দার ভাব না থাকিলে এ পুস্তক সকলের নিকট আদরনীয় হইত। ইহাতে অনেক ভাল কথাও আছে।

৭৪। ধর্ম্মের অভিব্যক্তি (ব্রাহ্মসমাজ) শ্রীসুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। এই প্রসঙ্গে লেখক দেখাইয়াছেন যে, ক্রম বিবর্ত্তনে মানব সমাজ যেমন পূর্ণাবয়বে পরিণত হয়, সেইরূপ মানবধর্ম্ম ও প্রকৃতি পূজা ও প্রেত পূজা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে উন্নীত হয়। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের তিন বিভাগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুনাম রক্ষা করিতে অভিলাষী এবং আদিব্রাহ্মসমাজকেই ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি বিজ্ঞতার সহিত বলিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের নানা শাখার সামান্য সামান্য বিভিন্নতা থাকিলেও সকলের মূলধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য এক।

৭৫। Theistic Essays (Part I.) by a member of the new dispensation Church in India. কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রবন্ধ দক্ষতার সহিত লিখিত। এ পুস্তক স্কুলের বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বিষয়গুলি সুন্দর। এ নাস্তিকতার দিনে বিশ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ চরিত্রগঠনের পক্ষে সহায় হইবে। আমরা বাঙ্গালীর ইংরাজী গ্রন্থ লেখার পক্ষপাতী নহি। মাতৃভাষায় অভাব অনেক।

৭৬। তত্ত্বোপনিষদ।—(প্রথম ভাগ) শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ। সাধারণ ব্রহ্মসমাজের মত প্রবন্ধগুলির ভিত্তি। তত্ত্বান্বেষী ইহাতে পড়িবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার অভ্রান্ত গুরুবাদ স্বীকার করেন না, তিনি গৃহস্থাশ্রমে সন্ন্যাসীধর্ম্মের পক্ষপাতী এবং জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া নিরাকার একেশ্বরের উপাসনাকেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করেন। পুস্তকখানি একজন ভক্ত সাধকের জীবনের অতি সার কথায় পূর্ণ। যিনি পাঠ করিবেন, তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

৭৭। বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সভা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বাপর তুলনায় দেখাইয়া-

ছেন, পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া দেশের অভাব দূর করুন।

৭৮। আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য (বিলাতী বাঁধাই) ।৵৹। অতি সংক্ষেপে ফটোগ্রাফ তুলিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক ফটোগ্রাফ বিজ্ঞান শিক্ষার্থিদের উপযোগী করিতে গ্রন্থকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্যম প্রশংসার্হ। কিন্তু সরলভাষায় বিস্তৃত বিবরণ না হইলে এরূপ কঠিন বিষয়ে কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা হওয়া অসম্ভব।

৭৯। ছায়াবিজ্ঞান।—(ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক) আলোকচিত্রের গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য ।৵৹ আনা। এই অংশে কেবল আলোকের প্রকৃতি ফটোগ্রাফের কোন কোন আবশ্যক উপাদান প্রস্তুত প্রণালী ও আরোকাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আলোকচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া বিজ্ঞান পড়িলে শিক্ষার্থিগণ উপকার পাইবেন।

৮০। সীতাহরণ কাব্য।—শ্রীনীলকান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। রামায়ণ অবলম্বনে কবিতাকারে ইহা লিখিত। চরিত্র ও বর্ণনা স্থানে স্থানে মূল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে এবং লেখনীতে রচনা শক্তি আছে। দুই এক স্থলে অনুপ্রাস ও যমক অবতারণা করিতে যাইয়া বর্ণনার অঙ্গহীন ও ভাব জটীল করিয়াছেন। মোটের উপর এ নবীন কবির প্রথম রচনা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম।

৮১। হরিদাসী।—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ক্ষুদ্র উপন্যাস। বিষাদচিত্রে পাপের বিষময় ফল দেখাইয়া নীতি ও উপদেশ প্রচার, এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কিরূপে মদে সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল, পরম সতী আদর্শ হিন্দুরমণী কিরূপে স্বামীর জন্য জীবনের সকল সুখ উৎসর্গ করিয়া উপায় থাকিতেও কষ্ট নির্যাতনের একশেষ সহ্য করিয়া জীবন পর্য্যন্ত হারাইলেন, তাহা অতি উজ্জ্বল রূপে এ গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে। জীবন বাবুর লেখনীর প্রভূত ক্ষমতা আছে।

৮২। প্রেম।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ, প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রেম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আলোচনা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। লেখকের ভাবপ্রকাশের শক্তি আছে, বাঙ্গালা ভাষায় খুব দখল আছে। কিন্তু বিষয়ের ও যথাবশ্যক ভাব পরিস্ফুটনের শৃঙ্খলা নাই। উদ্দাম ও বিশৃঙ্খলভাবে অনেক মূল্যবান উক্তি ও গভীর গবেষণার ফল গ্রথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, রচনার মধ্যে মধ্যে ইংরেজী ও বাঙ্গালী কবিদিগের উক্তি-পরিপূর্ণ। রচনার শীর্ষে বা পদতলে (foot note) দুই একটী উদ্ধৃতাংশ চলিতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত পরকীয় উক্তির সমাবেশ রচনার মাধুর্য্য নষ্ট করে, ভাব-প্রবাহের গতিরোধ করে এবং বিষয়ের সম্যক্ পরিস্ফুটন হইতে দেয় না। এ পুস্তকে লেখকের স্বাধীন চিন্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

৮৩। লহরী।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৷৹ আনা। এই কবিতা পুস্তক, লহরী, বীণাপাণি, সাগরোচ্ছ্বাস ও ইন্দু এই চারিটী স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। লেখক নানাছন্দে ইচ্ছাক্রমে লেখনী পরিচালনা করিতে পারেন। পুস্তকখানি কবিত্বপূর্ণ। স্থানে স্থানে রচনা মধুর। কোথাও কোথাও ছন্দোভঙ্গ ও যতি পতন হইয়াছে। লহরীর কবিতা পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

৮৪। অতুলচন্দ্র।—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা। কেবল সামাজিক চিত্র আঁকিয়া দেখানই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে; আদর্শ চরিত্র সম্মুখে ধরিয়া পাঠকের জীবন গঠনে সহায়তা করা ও ইহার গৌণ-উদ্দেশ্য। চরিত্রগুলির রেখাচিত্র বেশটানা হইয়াছে। লেখকের মার্জ্জিত বিশুদ্ধরুচি সকলের উপর প্রশংসনীয়। অতি বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত আপত্তিজনক বীভৎস অংশ বর্জ্জন করিয়া আবশ্যকস্থলে কুৎসিত পাপ-কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

৮৫। হীরা বাই—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত; মূল্য ১॥০ টাকা। তিনখণ্ডে সমাপ্ত। এবিষাদ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে দুঃখ ও শান্তি পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করিবে এবং পরিসমাপ্তিতে বিষাদের গাঢ়চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। বরদাবাবু অধিক দিন বোম্বে পার্শি সমাজে মিশিয়া তাহাদের রীতি নীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ভারতভ্রমণে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পার্শিদের ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

৮৬। সমাজ।—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৷০ টাকা। ঐতিহাসিক লেখক ও ঔপন্যাসিক মহাত্মা রমেশচন্দ্র সাধারণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার লেখনার নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং আমরা বিস্তৃত সমালোচনায় বিরত রহিলাম। সংস্কারক হিন্দুদিগের সহিত সংরক্ষক সম্প্রদায়ের কিরূপ বিবাদ বিসংবাদ চলিতেছে এবং পরিণামে কি প্রকার সংস্কারকেরাই জয়ী হইয়া নূতন ভাবে নূতন রকমে হিন্দুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে, তাহার আদর্শ উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দেখানই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এ সংস্কার ও বৈদিকভাবে পুনরুত্থান এক। পুলীস ও বিচার চিত্র আনুসঙ্গিক মন্তব্যসহ মূল্যবান হইয়াছে। ঘসিয়া মাজিয়া জরাজীর্ণ হিন্দু-সমাজের পুনরুত্থান সম্ভব মনে হয় না।

৮৭। ভগবদ্গীতার সমালোচনা—শ্রীজয়গোপাল দে প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। পুনরুত্থান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গীতা লইয়া আজকাল হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। অনেকেই আপন আপন ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন। জয়গোপাল বাবু মার্জ্জিত শিক্ষা, সহজ জ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বাধীন চিন্তায় যেরূপ আসিয়াছে, সেই ভাবে গীতার সমালোচনা করিয়াছেন। এ সমালোচনায়-গীতা কাহার দ্বারা কতদিন হইল কিরূপ ভাবে রচিত, উহা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কিনা, কৃষ্ণের উক্তি কি না, বা কৃষ্ণ বলিয়া কেহ ছিলেন কিনা এইরূপ তর্কবিতর্ক নাই। অন্যান্য আনুসঙ্গিক ও অবান্তরিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়া স্বাধীন যুক্তি তর্কের সহিত গীতায় প্রচারিত ধর্ম্মমতের বিচার করাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। আমাদের পরপদানত, পতিত ও অবনত দেশে স্বাধীন মতের ও স্বাধীনভাবের আদর নাই। সকলেই চিরপ্রচলিত অভ্যস্ত পথে অন্ধের ন্যায় অবিচারে গড্ডালিকাপ্রবাহে চলিতে ভালবাসে। সুতরাং অপর কাহাকেও স্বাধীন মতে মানুষের ন্যায় হিসাব করিয়া কথা বলিতে দেখিলে দেশশুদ্ধলোক হাড়ে চটিয়া তাহাকে টিট্‌কারী দিয়া অপদস্থ, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করে। অতএব এ যুগে এ পুস্তক সাধারণে কিরূপ আদর পাইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার স্থানে স্থানে এক দেশ দর্শিতা ও চঞ্চলতার চিহ্ন থাকিলেও মোটের উপর এ এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে।

৮৮। নির্ঝরিণী—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। নির্ঝরিণী-রচয়িত্রীকে, এ পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। যে বালিকা-হৃদয়ের অস্ফুট ঝঙ্কারের মধুর 'প্রতিধ্বনি' এক দিন সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠকদিগকে মাতাইয়াছিল, আজ আবার সেই কবি-হৃদয়ের কয়েকটী অনুপম লহরী আমাদিগকে মোহিত করিয়াছে। বঙ্গ কবিতা-ক্ষেত্রে চির কবিত্বময়ী রমণীর আবির্ভাব দেখিয়া বর্ত্তমানে পুরুষ কবিগণ সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে দূরে সরিতেছেন। আমাদের কবিতাকাশে আর একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে; যে দিন ইহার আলোকে সমগ্র বঙ্গ উদ্ভাসিত হইবে, তাহা অদূরবর্ত্তী। সহানুভূতির দুই এক বিন্দু অশ্রুর যোগ হইলে অচিরাৎ এ নির্ঝরিণী মহা নদীতে পরিণত হইবে। নূতন কবিও কাতর ভাবে বলিতেছেন—"তোমাদের ও হৃদয়ে এক টুকু দিও ঠাঁই।"

ইংরেজ কবি পোপ বলিয়াছিলেন—"I lisped in numbers for the numbers came." আমাদের কবি—'প্রতিধ্বনি'র ত্রয়ো-

দশবর্ষীয়া লেখিকাও দর্প করিয়া বলিতে পারেন "I lisped in numbers." অধিকন্তু পোপের সে আধ আধ কবিতা-বাক্য শুনিয়া তাঁহার জনক জননী ভিন্ন আর কেহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিনা, জানি না, কিন্তু এই বালিকা-কবির অমৃতময়ী মধুসিক্ত lisping যাহার কর্ণকুহরে ক্ষণেকের তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকেই চমৎকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিমতী রচয়িত্রী ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'হৃদয়ের মধ্যে যখন যেরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছে, কবিতাতে তাহারই সামান্য বিকাশ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।' আমরাও তাহা স্বীকার করি। জগতে যাহা কিছু স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম, তাহাই সুন্দর ও মনোরম। যাহার প্রাণে কবিতা, মনে ভাব ও হৃদয়ে উচ্ছ্বাস আছে, তাহার ভাষা কতই চিত্তহারিণী! কতই মনমুগ্ধকরী!! এইজন্যই ভর্তৃহরির কটমট, মাঘের যুক্তি-তর্ক, ভারবীর গভীরতা ও বররুচির পাণ্ডিত্য স্বভাবকবি কালিদাসের প্রাণের কথার নিকট পরাভূত—মিল্টনের সাব্লিমিটি (sublimity) সেক্ষপিয়রের wild note এর নিকট অপ্রতিভ! মৃণালিণীর কবিতাময় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল, লোহিত ঊষার মনোহর কিরণ পাইয়া স্বভাবকবির মধুময় কলকণ্ঠ "প্রতিধ্বনিতে" নিনাদিত হইয়াছিল।—

"প্রভাত অরুণালোকে নবীন উৎসাহ ভরে,
চলিনু বিলাতে প্রেম মানবের ঘরে ঘরে।

কিন্তু বিধাতার অজ্ঞেয় ইচ্ছায়, নিদারুণ ঘটনা-দুর্বিপাকে মৃণালিণীর কৈশোর জীবনে এক বিষম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যৌবন্মুখী কোমল-বালিকার সরল প্রাণ বৈধব্য-নিশার গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাই এ বিরহবিধুরা nightingale কাতর নিনাদে বিষাদ-সঙ্গীত-ধারা ঢালিতেছে।—

"এক বৎসরের আগে,—বহিত আর এক ভাগে
এ হৃদয় নির্ঝরিণী, গাহিত আরেক গান;"

কবিত্বের এমনি মোহিনী শক্তি, এ বিষাদেও মাধুর্য্য আছে, এ অন্ধকারেও জ্যোতিঃ আছে। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সহৃদয় পাঠক এ গান শুনিলে আপনা হারাইবেন। প্রাণ মন মিলাইয়া কবির সহিত পাঠককেও অশ্রু মোচন করিতে হইবে। আর্ত্তের কাতরোক্তি অনেক শুনিয়াছি, বিরহীর বিলাপ কর্ণে অনেক আসিয়াছে, কিন্তু এমন বিশুদ্ধ অথচ স্বাভাবিক, সরল অথচ ভাবপূর্ণ, বিষাদমাখা অথচ মধুর কবিতা আর কখনও শুনি নাই। প্রিয়জন-শোকে ভাবের আবেগে কবিত্বোচ্ছ্বাস অনেকেই দেখাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক মার্জ্জিত উচ্চরুচি আর কোথায়ও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মৃণালিনী, ধন্য তুমি, যাহার হৃদয়ে এমন ভাবলহরী ক্রীড়া করে, ধন্য বঙ্গ যে তোমার মত দুহিতা-রত্ন মিলিয়াছে, ধন্য বাঙ্গালা ভাষা, তোমার লেখনী যাহাকে সাজাইতে ব্যস্ত, ধন্য আমরা যে তুমি আমাদের মাতৃবংশে জন্মিয়াছ!!

ভারত রমণীর পতি-প্রেম জগতে দুর্লভ। মৃণালিনীর পতি-ভক্তি দেবদুর্লভ। কল্পনা-করিয়াও কেহ এমন সুন্দর আদর্শ আঁকিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সাধ্বীসতী পতিকে বলিতেছেন :—

"মানব সন্তান বলে ভাবি না তোমায়,
আমি বুঝি দেবতা বলিয়া,"
* * * *
"নাহি পাও স্নেহ কোথা, আমি স্নেহ দিব'
আমি দিব বাড়াইয়া হাত।"
"ঢাকিয়া রাখিব তোমা এ হৃদয় দিয়া,
নাহি দিব পরশ করিতে—
পবিত্র ও দেহে তব বিষাদ বাতাস;"
* * *
"অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য যদি পাই তব কাছে,
হাসি মুখে সহিব সকলি;"

আরম্ভ হইতে না হইতে দুঃখিনীর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে—বিধাতার বজ্রাঘাতে কবি-বালিকার আশা ভরসা মুকুলেই শুকাইয়া গিয়াছে। ভগ্নচিত্তে কবি গাহিতেছেন :—

"পূজা করা হল নাত', তাড়াতাড়ি কেন এত,
পলাইয়া গেলে তাঁরে ল'য়ে?"

হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রনায় কাঁদিয়া বলিতেছেন :—

"কি আর বলিব নিশা! প্রাণ হারায়েছে দিশা
মরিয়া বাঁচিয়া আছি শুধু।
কিছু নাহি ভাল লাগে, হৃদয় মরণ মাগে
বুকেতে আগুন জ্বলে ধূধূ!!

হৃদয়বান্ পাঠকের উষ্ণ অশ্রু ঝড়িল না কি? আবার :—

"কতকি বলিতে হইতেছে সাধ
হৃদয়ের ভাবা দেখাতে নারি;
নয়নের জলে,—বক্ষঃ ভেসে যায়;
উথলে ততই যত নিবারি।"

বুকের দারুণ যন্ত্রণায় গলা আটকাইয়া যায়, উচ্চ কান্না আসে না। অন্যত্র :—

"জ্বলন্ত আগুন যেন ঢেলে কে দিয়েছে বুকে
জ্বলে গেল,— গেল বুক পুড়ে।"

হিন্দু সমাজে "বিধবা' কি আদরের নাম; পতিহীনা ব্রতপরায়ণা যোগিনী হতভাগিনী-গণ কি সুখ সম্মান ভোগ করে, তাহা এই নবীনা বিধবার বুক-ফাটা উক্তি শুনিলে বুঝিতে পারা যায়:—

"জ্বলন্ত আগুন মাখা যেন
মোর কাছে ও 'বিধবা' নাম।"
* * *
"কিন্তু তবু পারি না সহিতে—
বিধবা আমারে যদি বলে;
বুক ফেটে যায় যেন মোর,
সপ্তসিন্ধু নয়নে উথলে"।

পতি অদর্শনে অধীর হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবি বলিতেছেন:—

"কঠিন পাষাণ দিয়া কি গো
সৃজিত সে দেবলীলা তুমি?
* * *
নাহি গলে তাই কি ও মন
এ অশ্রু, এ হাহাকার রবে?"

স্বামীর প্রতি নির্দ্দয়তা আরোপ করিতে হৃদয়ে আঘাত লাগে বলিয়া তার পরেই আবার বলিতেছেন:—

"না, না, না, এ শুধু ভ্রম মোর,
তোমার যে মহান্ হৃদয়;
হেরিলে বিষণ্ণমুখ, ফেটে যেত যার বুক,
আজ সে এমন হবে সম্ভব এ নয়"।

অন্যত্র:—
"সুখেতে থাকুন তিনি, না হয় সহিব আমি
যাতনা যন্ত্রণা প্রাণে পাবে"।

সতী মৃণালিনী! অপূর্ব্ব তোমার পতি-ভক্তি, পবিত্র তোমার প্রেম! তোমারই পাতিব্রত্য পুণ্যফলে তোমার স্বামী অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিবেন। তুমি রমণী কুলভূষণ!! নির্ব্বাসিতা-সীতা-বিরহে কাতর রামচন্দ্রকে বাসন্তী নিষ্ঠুর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। অদৃশ্যরূপিনী সীতার প্রাণে তাহা সহিল না, তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন "সহি বাসন্তি কিং ত্বমং সি এববং বাদিণী।" ভবভূতির কল্পনাচিত্র হইতে কি এই জীবন্ত সত্য চিত্র উজ্জ্বলতর নহে?

নিজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য বুঝিয়া হৃদয়ের আবেগ কমাইয়া বলিতেছেন:—

"যাও তবে যাও।
* * *
নয়নের অন্তরাল যেয়ে কিছু কাল
শিখ বিভুপ্রেম তবে—এ মোর কামনা।"

ধন্য তোমার মার্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার জ্ঞানময় প্রেম!

ইহার পর যত কষ্ট যন্ত্রণা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। কবি বলিতেছেন:—

"করে হেন দেঁহোপরি কত অত্যাচার;
* * * *
একাদশী তার কাছে কষ্ট কিছু নয়।
একাদশী প্রিয় সখী এখন আমার,
তার কথা মনে পড়ে আজি বার বার"।

ইহার পর এক নূতন শক্তি নূতন ভাবে আমাদের নূতন কবির প্রাণ জাগাইয়া তুলিল:—

"মনে হয়, 'কি যেন গো হোলোনা হোলোনা হায়'।
মনে হয় 'এ জীবন বুঝিবা বৃথায় যায়'।
ভুলেছিনু যে আদেশ,—কে যেন গভীর স্বরে
জাগায়ে তুলিছে পুনঃ হৃদয়ের স্তরে স্তরে।"

বালিকার কচি প্রাণ বলিতেছে:—

"ঘুচেছে সকল সাধ, সাজিব যোগিনী,
* * * *
আপনারে জগতের বুকে দিই মাখাইয়া;
সবারি হৃদয় সাধ দিই হৃদি মিশাইয়া।
* * * *
প্রাণ মন ঢেলে দিব জগতের সুখে।

বিধবা বাল্য সখীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন:—

"নিজ রক্ত দিয়া অপরের প্রাণ
বাঁচাতে শিখিব কবে?"

দুর্গোৎসবে দেবী পার্ব্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন:—

"আর আর কিছু নাই, স্বদেশ ভগিনী ভাই—
ইহাদেরি মুখ চেয়ে আছি;
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন গো বুক,
তাই তোর কাছে এই যাচি"।

রাণী মা, তোমার রাণীর মত মনই বটে— তোমার জননীর মত প্রাণই বটে। জগতের দুঃখ মাতৃ-জাতি বুঝিবেন না ত কে বুঝিবে?

ক্রমে কবি সীমাবদ্ধ পতি-প্রেম সাধনা হইতে বিশ্বপ্রেমে উপনীত হইয়া অনন্তরূপ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের বিকাশ দেখিয়া মোহিত হইলেন। প্রেমসাধনে ব্রহ্মলাভ করিতে চলিলেন

"ধরিতে ছুঁইতে তোমা পারে নাই কেহ কভু;
সবারি অতীত তুমি, সবেতেই আছ প্রভু"।

তখন বুঝিলেন, সাকার মূর্ত্তি-পূজা হইতে ব্রহ্মলাভ সম্ভব নহে।

'সীমা পূজা অসীমার পরিপূর্ণ হবে কভু?'

'নিন্দুক' কবিতাটীতে দেখা যায়, কবির এমন সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয় যে, পরনিন্দা সহ্য করিতে পারে না।

প্রার্থনা [illegible]

 [illegible]